অভিজাত গল্প সংকলন

সম্পাদক

মানসকুমার রায়চৌধুরী

অভিজাত গল্প সংকলন

সম্পাদক

মানসকুমার রায়চৌধুরী

সহ সম্পাদক

মানব চক্রবর্তী ও সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাশ্বতী প্রকাশনী
১৯/ই সতীন সেন সরণী
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

AVIJATA GALPA SANKALAN : a Compilation of selected short stories in Bengali from Post Second World War Period Kolkata

স্বত্ব : মানসকুমার রায়চৌধুরী

সম্পাদক : মানসকুমার রায়চৌধুরী
সহযোগী : মানব চক্রবর্তী ও সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিকল্পনা ও বিন্যাস : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম শাশ্বতী সংস্করণ বইমেলা ১৯৫৪

মূল্য : ২৫০ টাকা

প্রকাশক :
শাশ্বতী প্রকাশনী
১৯/ই সতীন সেন সরণী
কলকাতা-১০০০৫৪

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান
তপন পুস্তকালয়
স্টল নং-২৫
ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণসংস্থাপনে : টিঙ্কু প্রেস
৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬,

মুদ্রক : পদ্মনাভ ইম্প্রেশন
ভীম ঘোষ লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : সুবল সরকার

কিছু কথা

শুরুতেই একটা অপ্রিয় কথা বলে নেওয়া জরুরি।

সংকলনের ক্ষেত্রে বইয়ের বাজারে নানা কারচুপির সত্য মিথ্যে গল্প প্রচলিত আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকাংশে সত্য অভিযোগটি হচ্ছে কিছু প্রকাশকের অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে। কিছু অসাধু প্রকাশক সংকলিত গল্পের লেখক বা তাঁর উত্তরাধিকারীর সম্মতি নেয় না, গল্পবাবদ তাঁদের সঙ্গে যুক্তিবদ্ধ হওয়া বা চুক্তি অনুযায়ী স্বত্বের অর্থমূল্য দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যে ক্ষেত্রে লেখকরা সামান্য সম্মানদক্ষিণা পান, তাও লিখিত চুক্তিবিহীন, এবং পান বই প্রকাশের অনেক পরে। আমরা এ জাতীয় অসদাচার থেকে বিরত থেকেছি।

পাঠক লক্ষ করবেন কপিরাইটের মেয়াদ অতিক্রান্ত একটি ছাড়া কোনও লেখক বর্তমান সংকলনের লেখকসূচিতে নেই। তেতাল্লিশটি গল্পের জন্য তেতাল্লিশ জন স্বত্বাধিকারীকে খুঁজে বের করেছি আমরা। সহযোগী সম্পাদক প্রতি জনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের লিখিত সম্মতি সংগ্রহ করেছেন। আর তখনই সম্মানসূচক আগাম অর্থমূল্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তবু প্রকাশনাকে সম্পূর্ণ বৈধতা দেওয়ার জন্য কোনওরকম অর্থব্যয়েই আমরা কুণ্ঠিত হইনি।

আরও একটা জিনিস পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, সেটা হল সংকলিত গল্পগুলির আয়তন। একাধিক প্রচলিত সংকলনে এইখানেও কারচুপি করা হয়। গুণগত বিচারের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় গল্পের হ্রস্বতা। যে পৃষ্ঠাসংখ্যায় তেতাল্লিশটি গল্প আঁটে, পৃষ্ঠাসংখ্যা না বাড়িয়ে সেই পরিসরে অবলীলায় গুঁজে দেওয়া যায় অর্ধশতাধিক গল্প। গল্প গুনে যাঁরা সংকলনের দামের বিচার করেন, তাঁদের কাছে দামটা সঙ্গতিপূর্ণ নাও মনে হতে পারে। গল্প গুনে নয়, গল্পের গুণে পাঠক উপলব্ধি করবেন আর্থিক এবং পারমার্থিক উভয় অর্থেই সংকলনটি দামি।

বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারটি বিশাল শুধু নয়—এর বৈচিত্র্যও দারুণ আকর্ষণীয়। বহুমুখী বিষয়বস্তু, প্রকরণগত বহুমাত্রিকতা এবং ভাবনাগত বৈশিষ্ট্যে এত বিচিত্রতা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার গল্পে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ; এবং আরও বলার, এত রকম সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে প্রবহমান স্রোতের মত বাংলা ছোটগল্পের ধারা আজও সমান বহমান। বাংলা ছোটগল্পের এই বিশাল ও বিস্তৃত ভুবনে এমন বহু গল্প আছে যার উৎকর্ষ অনায়াসে দেশ-কালের গণ্ডি ডিঙিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে পারে। পেতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পায়নি যে, তাতেও সন্দেহ নেই। এই-ই বোধহয় শিল্পের ধর্ম। কারণ শিল্প-সম্মত এমন কোনও নিরপেক্ষ ব্যারোমিটার নেই যা দিয়ে সবাইকে, দেশে এবং বিদেশে, একবাক্যে তার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করিয়ে নেওয়া যায়। ফলত, বহু গল্প অনন্যসাধারণ দ্যুতিতে ভাস্বর

হয়েও শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক পাঠকের কাছে আটকে থাকে। উৎকর্ষে দেশকালের গণ্ডি ডিঙোলেও তা বিশাল সংখ্যক পাঠকের অগোচরেই থেকে যায়। এর জন্য কাকে দায়ী করতে পারি! যদি বলি সামাজিকতার নব্য সংজ্ঞা বা সামাজিক কলুষ? রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট এক সদা-নিরাপত্তাহীনতার ভয়? যদি বলি মূল্যবোধের অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে এক দিশাহীন দিশা-র অন্বেষণ? প্রাদেশিকতার মোহে আচ্ছন্ন আমাদের বুদ্ধিমত্তার ক্রম-সংকোচন? অথবা যদি বলেই ফেলি ভারতীয় কাঁকড়ার সেই বহুকথিত গল্পটি?

কিন্তু এ-সবই তো শিল্পের সার-জল। এ ব্যতিরেকে শিল্প সদর্থে শিল্প হয়ে ওঠে না। ক্রাইসিসের কম্‌বাসশন ছাড়া কোনও শিল্পের-ই বুঝি পূর্ণতা নেই, অন্তত সেই মাত্রাটুকু অর্জন করতে পারে না, যা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি প্রদেশ এতবড় শ্লাঘার উচ্চারণ করতে পারে।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য—স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কাল থেকে আজও বিভিন্ন ঘটনাক্রমের দাপটে, যথা—যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, বঙ্গভঙ্গ, বন্যা, খরা ইত্যাকার জ্বলন্ত অভিসম্পাতের মধ্যেই এই বঙ্গের পুনর্জীবন। গ্রামীণ জীবনের অন্তিমকালীন আর্তনাদের মাঝেই নগরায়ণের ঢক্কানিনাদ, শিল্পের সংস্থান ও বিভিন্ন উপনগরীর জাঁকজমকের মাঝে নিম্ন-মধ্যবিত্তের ক্রমশ ছিন্নমূল হওয়ার ইতিহাস, প্রোলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার সীমারেখার ক্রম-অস্পষ্টীকরণের কারণে উদ্ভূত বিচিত্র শ্রেণীগত অবস্থান ও তার বিভাজন এবং অভাবনীয় জীবননামা, সেইসঙ্গে বন্যার স্রোতের মত উদ্বাস্তুদের অব্যাহত আগমন—সব মিলে, 'সৌভাগ্য' এই কারণেই বলি—শিল্পীর চোখ আরও তীক্ষ্ণ হল, আরও অন্তর্ভেদী, আরও সমকালীন ও বাস্তববাদী। এইখানেই তো শিল্পের বেঁচে থাকা। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শিল্প বাঁচে না, তার পুষ্টিও হয় না। সে চায় নিরন্তর আঘাত ও অভিঘাত-সৃষ্ট দর্শনের মধ্যে থেকেই দ্বন্দ্বমুখর, প্রাণভরপুর, জীবনসঙ্গীতের বহুমাত্রিক শব্দরূপ খুঁজে নিতে। এখানেই তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সার্থকতা। বাংলা ছোটগল্পের সার্থকতার বীজ ঠিক এই জায়গাতেই নিহিত, একথা স্বীকার করতে সামান্য সংশয় নেই।

বাংলা গল্পের সুবিস্তৃত ভুবন থেকে মাত্র-ই ৪৩টি গল্প বাছাই করে একটি সংকলন হয়তো করা যায়, কিন্তু অসুবিধা যেটা, তাকে সঠিকভাবে কোনও কালসীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন গল্পসংগ্রহ' নামটি দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু তাহলে প্রথম দিকের আরও ক'জন অগ্রণী গল্পকারের গল্প রাখতে হতো। নইলে পূর্ণতা আসে না। কিন্তু সব রকম সংকলনেরই যে প্রধান দিকটি চিন্তা করতে হয় তা হল মুদ্রারাক্ষসের দাপট। এটি একটি বিভীষিকার মতই চোখ রাঙায়। ফলে শুরু করতে হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে এবং শেষ হল স্বপ্নময়-এ। প্রথম দিকে যেমন, শেষ দিকেও তেমনি আরও ক'জন প্রতিভাবান গল্পকারের গল্প অন্তর্ভুক্ত হতে পারত—হল না যে, সেটাই খামতি। ফের বলি, মুদ্রারাক্ষসের চোখ-রাঙানি।

তবু একটা কথা বলতে চাই। দশক ভাগে কোনও সংকলনকে গ্রন্থিত করার বা দশকওয়ারি বিভাজনে গল্পকারকে বেঁধে রাখার নীতিতে আমাদের বিশ্বাস নেই। কারণ কোনও সার্থক গল্প-ই, একটা নির্দিষ্ট সময়ে লেখা হলেও, সেই দশকে আবদ্ধ থাকে না। তার সৌরভ থাকে বহুদশক জুড়ে, এমনকি শতকেও তা ফুরোয় না। আর তা ছাড়া লেখকের জন্ম বা তাঁর লেখার সন-তারিখ ইত্যাদিতে নির্ভুল কালপঞ্জি হয়ত হয়, কিন্তু যদি সেই সৃষ্টি সার্থক হয় তবে তা সাহিত্যের প্রবহমানতায় অঙ্গাঙ্গি হয়ে এক পরবর্তী মিথ-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে; মিথ-কে যেমন দশক ভাগে আবদ্ধ রাখা বাতুলতা, সার্থক সৃষ্টিকেও তাই।

প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও যথার্থ উৎকৃষ্ট গল্পের নির্ভরযোগ্য জহুরি অমিতশ্রমী মানব চক্রবর্তীর নিরন্তর সহযোগিতা না পেলে এই সংকলন হতো না। মানব সুদূর চিত্তরঞ্জনবাসী, কালেভদ্রে কলকাতায় আসেন। হাওড়া স্টেশন, কলেজ স্ট্রিট, এস্‌প্ল্যানেড আর ধর্মতলা ছাড়া কিছুই চেনেন না। অথচ সংকলনের পরিকল্পনার সময় থেকে সর্বস্তরে যুক্ত থেকেছেন সানন্দে। প্রথমেই আমরা ভেবে নিয়েছিলাম একটু অন্যরকম সংকলন করব। প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প তো বটেই, কিন্তু তা যেন গত পাঁচ সাত বছরের সংকলন-গ্রন্থগুলির মত অতি চেনা বহুপঠিত গল্পের পূণর্মুদ্রণ না হয়। ফলে, এক একজন লেখক ধরে তাঁর প্রচুর গল্প পড়ে ফেলার যে দায়িত্বটা এসে পড়ে, মানব তার বেশিটাই স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমার কাজ অনেকটা হালকা করে দিয়েছেন। গল্পের প্রাথমিক নির্বাচনটা বেশ কঠিন কাজ। বহু লেখকের বহু গল্পগ্রন্থ সহসা পাওয়া যায় না। একটা কোনও গল্পপাঠের স্মৃতির অনুষঙ্গ ধরে হয়তো গল্পটা খুঁজছি পুনর্পাঠের জন্যে, এমনও হয়েছে অন্বিষ্ট গল্পটি লেখকের কাছেও নেই। তবু মানবের জন্যই কোনও কমপ্রোমাইজ করতে হয়নি। যেটি চাই বলে আমরা স্থির করেছি সেটি তিনি ঠিক খুঁজে বের করেছেন। গল্প বাছাই, এক একজনের তিন-চারটি প্রায় সমমানের গল্পের তুলনামূলক বিচার করে মাত্র শ্রেষ্ঠটি নির্বাচন করা, সময়-ও শ্রমসাপেক্ষ যৌথ প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রেও মানবের বিচার বিবেচনাকে আমি অগ্রাধিকার না দিয়ে পারিনি। লেখকদের বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বের করার, তাঁদের অনুমতি সংগ্রহ করার কাজটা মানব একাই করেছেন। সঙ্গে পেয়েছিলেন তাঁর অনুজপ্রতিম বন্ধু সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ইদানীং তো নানা সংকলনে চোখ বুলিয়ে মনে হয় এটিই বুঝি সহজতম কাজ। পাঁচটা সংকলন হাতের কাছে রাখলেই সব সমস্যার সমাধান। গল্প-বাছাইয়ের পর্ব দু'দিনেই শেষ। কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই এই রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমরা সেই গল্পের তালাশেই মগ্ন ছিলাম যেখানে আবিষ্কারের আনন্দ আছে। ফল-পরিণতি— ননী ভৌমিকের 'ছবি' দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নরকের প্রহরী', তপোবিজয় ঘোষের 'কপাটে করাঘাত', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিলটি', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'তারিণীর বাড়ি-বদল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাসংগম', বিমল

করের 'সোপান', দেবেশ রায়ের 'জরিপ', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'উড়োচিঠি' বা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাখাল কড়াই'। 'শবাগার'-খ্যাত মতি নন্দীর 'গুণ্ডাদ্বয়' যে তাকে ছাপিয়ে যাওয়া গল্প তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা' যে সব দশক অতিক্রম করে সার্থকতার শাশ্বত স্তরে উপনীত তা সন্দেহাতীত। গৌরকিশোর ঘোষের 'শরৎদা' বা আবুল বাশারের আশ্চর্য সংকেতময় গল্প 'হবা', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মেহগনি' বা শিশুশ্রমিকদের নিয়ে রচিত অজস্র গল্পের মাঝে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কাননে কুসুমকলি অথবা ছোটদের গল্প' অসাধারণ দীপ্তিতে উজ্জ্বল। অন্তত আমাদের তাই মনে হয়েছে। স্বতন্ত্র বা বিপরীত মত থাকতেই পারে। শিল্পসাহিত্যের বিচারে ঐকমত্য কদাচিৎ ঘটে।

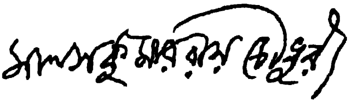
এইভাবে, এই সংকলনের প্রতিটি গল্পকেই, যথাসম্ভব মনস্কতায় একটা শীর্ষবিন্দুর নিরিখে রাখতে চেয়েছি। যাঁরা নেই, অথচ থাকতে পারতেন, তাঁদের কাছে মার্জনা চাই। যেটুকু হল, বিচার্য হোক তা দিয়েই।

সাহিত্যকর্মীর স্বজন সুহৃদ বিমল কর, দেবেশ রায়, মানব চক্রবর্তীকে নানা সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে শুধু তাঁর শ্রমই লাঘব করেননি, পরোক্ষভাবে আমাদের সংকলনকে পরিকল্পনামত সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। আরও যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বপন সাহা, মিহির সেনগুপ্ত, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিতেন ঘোষ, সৌগত ঘোষ ও হেমন্ত মালিকের কাছে আমরা ঋণী। অভিজাত প্রকাশনীর প্রতিটি কর্মীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য।

আর একটি কথা, নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও, এখানে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। সহযোগী সম্পাদক মানব চক্রবর্তী ঘন-ঘন মধ্যরাত্রির ট্রেন ধরে চিত্তরঞ্জন থেকে কলাকাতায় এসেছেন। সারাদিন লেখকদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরেছেন। সম্পাদকীয় আলোচনায় বসেছেন আমার সঙ্গে। ফের যখন বাড়ি ফিরেছেন তখন গভীর রাত। তাঁর এই আসা-যাওয়ার ফলে সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব একা হাতে সামলেছেন তাঁর স্ত্রী বনানী। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এতকাল জনপ্রিয়তার নিরিখে যেভাবে গল্প সংকলন সম্পাদিত হয়েছে সেই প্রচলিত রীতি থেকে সরে এসে আমার যা করেছি অনেকাংশে তা অতি অলক্ষিত গল্প, নব আবিষ্কার।

ভূমিকা শেষ। বাকি কথা সংকলন বলুক।



সূচিপত্র

সংসার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপেন ভটচাজের পুত্র বেশ সুন্দরী। একটি মাত্র ছোট ছেলে নিয়ে অত বড় পুরনো সেকেলে ভাঙা বাড়ির মধ্যে একাই থাকে। স্বামীর পরিচয়ে বউটি এ গ্রামে পরিচিতা নয়, অমুকের পুত্রবধূ এ-ই তার একমাত্র পরিচয়। কারণ এই যে স্বামী ভবতারণ ভটচাজ ভবঘুরে লোক। গাঁজা খেয়ে মদ খেয়ে বাপের যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে, এখন কোথায় যেন সামান্য মাইনেতে চাকরি করে, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসে, কোনও শনিবারে আসেই না। শ্বশুর উপেন ভটচাজ গ্রামের জমিদার মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে নিত্যপূজা করেন। সেখানেই থাকেন, সেখানেই খান। বড় একটা বাড়ি আসেন না তিনিও। ভাল খেতে পান বলে ঠাকুরবাড়িতেই পড়ে থাকেন, নইলে সকালের বাল্যভোগের লুচি ও হালুয়া, পায়েস দই ও বৈকালির ফলমূল বারভূতে লুটে খায়।

কোনও কোনও দিন সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়ি আসেন। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটলি, তাতে প্রসাদি লুচি ও মিষ্টি, ফলমূল, একটা বা ক্ষীরের ছাঁচ থাকে। তাঁর নাতি করুণার বয়স এই সাত বছর! না খেতে পেয়ে সে সর্বদা খাইখাই করছে যা হয় পেলেই খুশি, তা কাঁচা আমড়া হোক, পাকা নোনা হোক, চালভাজা হোক, তালের কল হোক, আধপাকা শক্ত বেল হোক। খাওয়া পেলেই হল, স্বাদের অনুভূতি তার নেই। ঝাল, টক, মিষ্টি, তেতো তার কাছে সব সমান।

—ও করুণা, এই দ্যাখ—কি এনেছি—

—কি ঠাকুরদাদা?

'দাদু-টাদু' বলার নিয়ম নেই এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে, ওসব শৌখিন শহুরে বুলি করুণা শেখেনি। সে ছুটে যায় উৎসুক লোভীর ব্যগ্রতা নিয়ে। ঠাকুরদাদা পুঁটলি খুলে দুকানা আখের টিকলি, একটা বাতাসা ওর হাতে দেন। ও তাতেই মহাখুশি। ঠাকুরদাদা যে জিনিস দেন, তার চেয়ে যে জিনিস দেন না তার অনেক ভাল ও অনেক বেশি। পুঁটুলির সে অংশে থাকে বৈকালি ভোগের লুচি, কচুরি, মালপুয়া ও তালের বড়া। যখনকার যে ফল সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করার প্রথা এ ঠাকুরবাড়িতে বহুকাল থেকে প্রচলিত। এখন ভাদ্র মাস, কাজেই তালের বড়া রোজ বিকেলে নিবেদিত হয়।

করুণা এক আধবার পুঁটুলির অন্য অংশে চাইলে।

কিন্তু তাতে তার লোভ হয় না, ও রকম দেখতে খুব ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত। সে জানে ও অংশে তার কোনও অধিকার নেই।

ঠাকুরদাদার দিকে ও বোকার মত চেয়ে থাকে। উপেন ভটচায় গলায় কাশির আওয়াজ করে পুত্রবধূকে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করতে করতে বাড়ি ঢোকেন এবং সটান দোতলায় নিজের ঘরটিতে চলে যান।

রোজ তাঁর ঘরটিতে নিজে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যান এবং এসে আবার খোলেন। পুত্রবধূকে বিশ্বাস করার পাত্র নন তিনি। কোনও মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস নেই।

—ও বউমা—বউমা, ওপরে এস—

—কে? বাবা?

—একবার ওপরে এস।

পুত্রপধূ ওপরে গিয়ে দেখে শ্বশুর পুঁটুলি খুলে কি সব খাবার জিনিস ত্রস্ত ভাবে হাঁড়ির মধ্যে পরছেন। পুত্রবধূকে দেখে তাড়াতাড়ি তিনি হাঁড়িটার দিকে পেছন ফিরে বসে বললেন—বউমা? ইয়ে কর তো—আমার ঘরে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে যাও।

—আপনি রাতে কি খাবেন? ভাত রাঁধব?

—না। তুমি শুধু খাবার জল একঘটি দিয়ে যেও এর পরে।

এ সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূর রাঁধবার নিয়ম নেই। যার যার, তার তার। ছেলে যখন আসে, বাপের খোঁজ নেয় না। ওরা নিজে রাঁধে, নিজেরা খায়। উপেন ভটচাজ এসে নিজের ঘরের তালা খুলে বড় জোর একটু জল কোনওদিন একটু নুন চান পুত্রবধূর কাছে। এর বেশি তাঁর কিছু চাইবার থাকে না, কেউ তাঁকে দেয়ও না। আজ পুত্রবধূর তাঁর জন্যে রান্না করার প্রস্তাবে তিনি খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারেননি মনে মনে। বোধ হয় সেজন্যেই পুত্রবধূর প্রতি তাঁর মনোভাব হঠাৎ বড় দরাজ হয়ে গেল। তার ফলে যখন আবার সে জলের ঘটি নিয়ে ঢুকল, তখন তিন হাঁড়িটা সামনে নিয়ে বললেন—দাঁড়াও বউমা। করুণাকে দিইছি—আর তুমি এই দুখানা লুচি আর এই একটু মিষ্টি নিয়ে যাও। জল খেও।

পুত্রবধূ দুই হাত পেতে শ্বশুরের দেওয়া আধখানা ক্ষীরের ছাঁচ, খানচারেক লুচি, আধখানা ছানার মালপুয়া ও দুটি তালের বড়া নিয়ে একটু অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

শ্বশুর হঠাৎ কেন এত সদয় হয়ে উঠলেন তার ওপরে? না খেয়ে থাকলেও তো কখনও পোছেন না সে খাচ্ছে, না উপোস করছে।

সে বললে—আমি যাই বাবা?

—হ্যাঁ যাও। পান আছে?

—না তো বাবা। এ হাটে আমার হাতে পয়সা ছিল না। করুণার পাঠশালার

মাইনে চার আনা বাকি। তাগাদা করছে মাস্টার। তাও দিতে পারছি নে।

পুত্রবধূর নাম তারা। গরিব ঘরের মেয়ে না হলে আর এমন সংসারে বিয়ে হবে কেন? নিচে নেমে এসে সে ছেলেকে ডেকে দুখানা লুচি আর মিষ্টিগুলো সব খেতে দিলে। নিজের জন্যে রাখলে দুখানা লুচি আর দুটো তালের বড়া। ছেলেকে তালের বড়া খেতে দিলে ওর পেট কামড়াবে রাতে।

সত্যি, তার হাতে পয়সা না থাকায় কোনওদিনই রাতে সে কিছু খায় না। করুণার জন্যে দুবেলার চাল নেওয়া হয় ওবেলা, জল দেওয়া ভাত সন্ধের পিদিম জ্বালিয়েই করুণাকে খেতে দেয়। তারপর মায়ে-পোয়ে শুয়ে পড়ে।

নিত্য নক্ষত্র ওঠে আকাশে, নিত্য চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় ওদের মস্ত বড় ছাদটা। ও ছেলেকে নিয়ে অত বড় বাড়ির মধ্যে একখানা ঘরে শুয়ে থাকে, ইঁদুরে খুটখাট করে, কলাবাদুড় পুরনো বাড়ির কোণে কোণে চটাপট শব্দে ওড়ে, ছাদের ধারের বেল গাছটাতে বেলের ডাল বাতাসে দোলে—কোনও কোনও দিন ওর ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, ভয়ে মাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে—ও কি খুটখুট করছে মা?

—কিছু না, তুই ঘুমো। ও ইঁদুর।

—বাইরে ছাদে? ওই শোনো—

—ও কিছু না। তুই ঘুমো।

—শাঁকচুন্নি আছে মা বেলগাছে?

—না। সে সব কিছু না।

—শোনো মা, রেতার দাদা গল্প করছিল, তাদের বাঁশঝাড়ে শাঁকচুন্নি আছে—রেতা নিজেও দেখেছে একদিন, বুঝলে মা?

—তুই ঘুমো। ওসব বাজে গল্প্য আচ্ছা খোকন, আমি একা একা রাত আটটার সময় পুকুরে কাপড় কেচে আসি, আমি কিছু তো দেখি নে?

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূর সাহস খুব, একথা গাঁয়েও সকলে বলাবলি করে। অত বড় প্রাচীন অট্টালিকায় বহু ঘরদোরের মধ্যে ছোট্ট একটি ছেলে সম্বল করে বাস করে—ওই ভূতের বাড়িতে। বাবা! শ্বশুর তো কালেভদ্রে বাড়ি ফেরে, সোয়ামিও প্রায় তাই। শনিবারে যদি বা এল, রবিবার বিকালেই চলে গেল। ধন্যি সাহস বটে মেয়েছেলের।

কেউ কেউ বলে—মেয়েমানুষের ভাই, যাই বল, অতটা সাহস ভাল না। স্বভাবচরিত্তির কার কি রকম তা তো কেউ বলতে পারে না।

শেষ রাত্রে করুণা আবার মাকে ঠেলা মেরে বললে—ওমা, ওঠ না। কিসের শব্দ হচ্ছে—

—তুই বাবা আর ঘুমুতে দিলি নে। কই কোথায় শব্দ?

কে এসে দরজায় ঘা দিলে। কড়া নাড়লে ওদের ঘরের বাইরে।

তাড়া ধড়মড় করে উঠে বললে—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি! দোর খোল।

করুণা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল প্রায়।

—ও, বাবা!

তারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খিল খুলে দিয়ে একগাল হেসে বললে, এস এস। একেবারে শেষ রাত্তিরে? ভাল আছ?

—হ্যাঁ। বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আসতি যা কষ্ট হয়েছে! তালপুকুরের মাঠের মধ্যে বাস খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাত দশটা থেকে। এই খানিকটা আগে তখন চলল।

—তুমি হাত-মুখ ধোও। জল গামলায় আছে, গাডুতে আছে। আমি ভাত চড়াই।

—ভাত? শেষ রাত্তিরি ভাত খেয়ে মরি আর কি। আমার পুঁটুলির মধ্যে সরু চিঁড়ে আছে, তাই দুটো ভিজিয়ে দ্যাও। খোকা, সরে আয়, তোর জন্যি জিলিপি কিনেছিলাম, তা মিইয়ে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। এই ন্যাও, খোকারে দুখানা দ্যাও, তুমি দুখানা খাও।

—আমি খাব না, তুমি খেয়ে এট্টু জল খাও।

—ওগো না না। যা বলছি শোনো না আমার পেট ভাল না কদিন থেকে। সরু চিঁড়ে ভিজিয়ে নেবুর রস আর নুন মেখে বেশ কল্‌চে কথ বের করে—

—থাক, থাক, তোমাকে আর শোনোতে হবে না। হাত-মুখ ধুয়ে এস।

—যাব। তার আগে একবার গাডুটা দাও দিকি।—গামছাখানা এখানে রেখে দিও। আসছি আমি।

তারা তখুনি চিঁড়ে ভেজাতে দিলে। স্বামী এসে হাত-মুখ ধুয়ে বসল, তার সামনে পাথরের একটা বড় বাটিতে চিঁড়ের কথ নুন লেবু মিশিয়ে তাকে খেতে দিলে। স্বামী একটুকু মুখে দিয়েই বললে—বাঃ, বেশ! নুন নেবু মিশিয়ে বড় চমৎকার খেতে লাগছে!

—আর দেব?

—না না, এই বেশি হয়েছে। হ্যাঁগা, ধার দেনা কত এবার?

—মাছ কিনেছিলাম একদিন চার আনা, একদিন দু আনা। আর খোকা আমসত্ত্ব খেতে চেয়েছিল, তাই বোষ্টম বাড়ি থেকে কিনে এনেছিলাম দু আনার।

—আমসত্ব আবার কিনতে গেলে? বড় নবাব হয়েছ, না?

স্বামীর মুখে কড়া সুরের কথা এই প্রথম নয় তারার। ওর চেয়ে অনেক বেশি রূঢ় ব্যবহার ও কথা সে সহ্য করে আসছে স্বামীর।

গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে তার।

তাও বিনি দোষে। খোকা খেতে চেয়েছিল, ছেলেমানুষ আবদার ধরলে, ও কি বোঝে কিছু? অবোধ। না দিতে পারলে কষ্ট হয়।

—বা রে, খোকা কাঁদতে লাগল, দেব কি কিনে?

—না। বাপের বাড়ি থেকে পয়সা এনে দিও।

—মুখ সামলে কথা কও বলছি। বাপ তুলো না, খবরদার।

—ওরে বাপ্‌রে! দেখ ভয়েতে ইঁদুরের গর্তে না ঢুকি। তবুও যদি বাপের বাড়ির চালে খড় থাকত!

—ছিল না বলেই তো তোমার মত অজ পাঁড় মুক্‌খু আর মাতালের হাতে বাপ দিইছিল ধরে!

—তবে রে—

স্বামী ভবতারণ হাতের কাছে ছাতা পেয়ে তাই উঁচিয়ে গেল তারার দিকে। করুণা চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। ওপর থেকে উপেন ভটচাজ বলে উঠলেন—কে? কে? কি হল? কে ওখানে?

ভবতারণ উদ্যত ছাতা নামিয়ে বললে—তোমায় আমি—ফের যদি—ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার!

—খবরদার! আবার বাপ তুলছ? বেরোও তুমি বাড়ি থেকে। দূর হও। তোমার মুখে ছাইয়ের নুড়ো দেব বলে দিচ্ছি। বেরোও—

—হারামজাদি, দ্যাখ, এখনও মুখ সামলা বলে দিচ্ছি। বেরুব কেন, তোর কোন বাবা এ বাড়ি করে রেখে গিইছিল জিগ্যেস করি? তুই বের—

করুণা আকুল সুরে কাঁদছে বাবা মার ধুন্ধুমার ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে গিয়ে। ওর মা এসে ওকে কোলে নিয়ে বললে—চল্ খোকা, আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাই—ওরা থাকুক, যাদের বাড়ি। তোর-আমার বাড়ি তো না!

—খবরদার, খোকাকে ছুঁয়ো না বলছি। যাবি হারামজাদি তো একলা মর গে যা—খোকা তোর না আমার?

—বেশ! রাখ খোকাকে। আমি একলাই যাচ্ছি।

—যা—বের—

করুণা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মা, তুমি যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব—

ভবতারণ বললে—খোকন, কেঁদ না। তোমায় আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। রেলগাড়ি কিনে দেব। মোটর কিনে দেব—এস—

করুণা কান্নায় জড়িত সুরে বললে—না—

—এস—

—না—

—কলকাতায় যাবি নে?

—না—

মাকে সে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে।

এমন সময়ে ওপর থেকে উপেন ভটচাজ নেমে এসে ছেলেকে বললেন—তুই কী চেঁচামেচি আরম্ভ করলি ভোর রাত্তিরি? তুই মানুষ হলি নে এই দুঃখে আর আমি বাড়ি আসি নে। কেন মিছিমিছি বউমাকে যা তা বলছিস? আমি সব শুনছি নে ওপর থেকে? তোরই তো দোষ। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—

—আপনাকে তো কিছু বলিনি—আপনি ওপরে যান বাবা—আমাদের কথার মধ্যে আসতি কে বলেছে আপনাকে?

—আমি যাই না যাই সে আমি বুঝব। আর তুই যে বলছিস বউমাকে বাড়ি থেকে বেরুতি—আমার বাড়ি না তোর বাড়ি? আমি আজও বেঁচে নেই? তবে কী দাবি আছে এ বাড়ির ওপর? আমি ওপর থেকে সব শুনছি। বদমাইশ পাজি কোথাকার। আমি মরবার আগে খোকনকে বাড়ি লিখে দিয়ে যাব—কালই যাচ্চি আমি সদরে। বউমাকে অছি করে যাব। তোমার বাড়ির আম্বা ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ, হতচ্ছাড়া বদমাইশ! রাত দুপুরের সময় এসে উনি ঘরের বউকে বলবেন, বের, বের, মুরোদ নেই এক কড়ার—হ্যাঁরে হারামজাদা, ও ভদ্দরনোকের মেয়ে সারা মাস কি খায় তুই তার কোনও হদিশ রাখিস? না কেউ রাখে? বের বলতি লজ্জা করে না? এস তো খোকন, এস—চল বউমা—ওপরের ঘরে চল—

তারা ঘোমটা টেনে নিয়েছিল শ্বশুর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সে ফিস ফিস করে খোকনকে কি বললে।

খোকন বললে—ঠাকুরদাদা, তুমি ওপরে যাও—মা বলছে।

ভবতারণ সাহস পেয়ে বললে—আমি তাড়িয়ে দেবার কথা আগে মুখে এনেছি না আপনার গুণধর বউমা? জিগ্যেস করুন তো কে আকে কাকে বেরিয়ে যাবার কথা বলেছে! হ্যাঁ খোকা, বল তো? আপনার বউমাই বললে না আমাকে বেরিয়ে যেতে? কেন, ওর বাবার বাড়ি?

—হ্যাঁ, ওর বাবার বাড়ি। আলবাত ওর বাবার বাড়ি। হারামজাদা, ফের যদি তুমি ওসব কথা মুখে এনেচ তবে তোমাকে আমি—

উপেন ভটচাজ ওপরে উঠে গেলেন। ভবতারণ চুপ করে বসে রইল তক্তপোশের এক কোণে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ ভবতারণ উঠে জামার পকেট হাতড়ে একখানা দু টাকার নোট বার করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, এই দিলাম। ধার-দেনা শোধ দিও। আমি এক্ষুনি চললাম। দেশলাই কে নিল আমার?

তারা বললে—খোকন, দেশলাইটা ওই রয়েছে, দে তো।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ভবতারণ জামা গায়ে দিতে দিতে বললে, এসেছিলাম অনেক আশা করে। তা এক বাড়ি আমি থাকব না। এখানে আমার পোষাবে না বুঝলাম। কেউ যখন আমাকে দেখতে পারে না এ বাড়িতে। খাওয়া হল না, শরীরটা খারাপ। তা হক, যাবই। আর আসছি না। দ্যাখ খোকন, যাবি কলকাতায়? চল্

আমার সঙ্গে, মোটর কিনে দেব, লবেঞ্চুস্ কিনে দেব—

করুণা নিরুত্তর।

—যাবি?

—না।

—এস আমার সোনা, আমার মানিক, চল আমার সঙ্গে—

এই সময়ে তারা এগিয়ে এসে স্বামীর হাত ধরে বললেন, কেন পাগলামি করছ? বস। এখনও অন্ধকার রয়েছে। এখন কোথায় যাবে? ছিঃ—

—ছাড় হাত—

ঝটকা মেরে ভবতারণ হাত ছাড়িয়ে নিলে।

—তোমার মত ইতরের সঙ্গে আমি কথা বলিনি। আমি খোকনের সঙ্গে কথা বলছি।

—রাগ করে না—ছিঃ—

—ফের আবার? এইবার কিন্তু ভাল হবে না বলছি। খবরদার, আমার গা ছুঁয়ো না—

—আচ্ছা ছোঁব না। বস ওখানে।

—ফের কথা বলে! খোকন, ও খোকন—যাবি আমার সঙ্গে? আয়—আর কখনও যদি এ ভিটেতে পদার্পণ করি তবে আমার—

করুণা মায়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আছে। তার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না—

সকালবেলা। বেশ রোদ উঠেছে।

তারা স্বামীকে দুখানা পেঁপের টুকরো হাতে দিয়ে বললে, খাও। পেট ঠাণ্ডা হবে।

ভবতারণ এই ঘুমিয়ে উঠেছে। চোখ ভারী-ভারী। পেঁপের রেকাবি হাতে নিয়ে বললে, উনি কোথায়?

—ওপরে।

—যাবেন না?

—তা কি জানি।

—খাবেন?

—উনি কবে খান? কাল সন্দের সময় এলেন, বললাম ভাত রেঁদে দিই। উনি বললেন, না।

—পেঁপে আর আছে? দিয়ে এস না ওপরে।

—সে তুমি বললে তবে দেব? সে দিয়ে এসেছি, তুমি তখন ঘুমিয়ে।

—দিও। বুড়ো মানুষ।

—সে তোমাকে শেখাতে হবে না।

—খোকন—ও খোকন—শোন্—

—ও খেয়েছে। ওকে ডাকছ কেন? তুমি খেয়ে ফেল। তোমার পেট ঠাণ্ডা হবে পেঁপে খেলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে?.

—এখনও গোলযোগ যায়নি। ভাতে জল দিয়ে নুন লেবু দিয়ে তাই খাব। তেল দ্যাও, নেয়ে আসি।

করুণা বাপের কাছে এসে বললে, কি বাবা?

—এ নে, খা—

তারা বললে, আহা, কেন আবার—তুমি খাও—

এই সময় উপেন ভটচাজ খড়ম পায়ে দিয়ে ওপর থেকে নেমে এলেন। ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন—কে? ভবতারণ? ভাল পেঁপে, খা। ইয়ে বউমা, আমি আসি। ওখানেই খাব। ভবতারণ আজ আছিস তো?

ভবতারণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, না বাবা, ওবেলা চলে যাব। আপনি আসবেন না ওবেলা?

—আচ্ছা, তুই যাবার আগে আমি ফিরে আসব। আমি—

এই সময় তারা ফিস ফিস স্বরে কি বললে স্বামীকে। ভবতারণ ডেকে বললে, বাবা—

—কি?

—এবেলা এখানে দুটো খাবেন, আপনার বউমা বলছে। কই মাছ আনতে যাচ্ছি বাঁধালে। একসঙ্গে বসে অনেকদিন খাইনি—কেমন?

উপেন ভটচাজ সম্মতি জ্ঞাপন করে রোয়াক থেকে উঠানে পা দিলেন। কি ভেবে এসে আবার বসলেন রোয়াকে।

পুত্রবধূ বললে—তামাক সেজে দেব?

—দ্যাও দিকি।

ছেলে ভবতারণ নিজেই তামাক সেজে নিয়ে এল। বৃদ্ধ উপেন ভটচাজ চোখ বুজে হুঁকোয় টান দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলেন, এমন সকালবেলা কতকাল আসেনি তাঁর জীবনে। স্ত্রী মারা গিয়েছে আজ বোধ হয় বিশ বছর, ভবতারণ তখন এগারো বছরের বালক। তারপর থেকেই ছন্নছাড়া সংসার-জীবন চলছে, আঁটসাঁট নেই কোনও বিষয়ে কারও। তার ওপরে দারিদ্র্য তো আছেই। হাতে পয়সা ছিল না বলেই ভবতারণকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। লেখাপড়া শেখালে অত খারাপ হত না সে। অবহেলিত পুত্রের প্রতি উপেন ভটচাজের মায়া হল। কাল অত বকুনি দেওয়াটা উচিত হয়নি।

ভবতারণ বাড়ি ফিরে এল আটটার সময়। স্ত্রীকে বললে—দেখ, কারে বলে যশুরে কই! আধ পোয়ার নামো নেই, ওপরে এক পোয়া, পাঁচ ছটাক। বাবাকে দেখাও।

পুত্রবধূ বললে—এই দেখুন—

—বাঃ বাঃ—কত করে সের নিলে!

—সাড়ে তিন টাকা।

—তা হবে। যুদ্ধের সময় ছিল ভাল। এ দিন দিন যা হয়ে উঠল—

অনেকদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবাযত্ন জুটল উপেন ভটচাজের ভাগ্যে। এমন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কতকাল হয়নি। তিনি পড়ে থাকেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে পেটের দায়েই তো। ছেলে উপযুক্ত হয়নি, নিজেরই ছেলেটাকে সে খেতে দিতে পারে না। ওদের ভার লাঘব করবার জন্যেই তিনি পরের বাড়ি খান।

খাওয়া-দাওয়ার পর উপেন ভটচাজ দিবানিদ্রা দেবার জন্যে ওপরের ঘরে চলে গেলেন। পুত্রবধূ তামাক সেজে দিয়ে গেল। আঃ, কি আরাম। সব আছে তাঁর, অথচ নেই কিছুই।

আজ দিনটা একটা চমৎকার দিন। এমন দিন আবার কবে আসবে!

বারমেসে সজনে গাছে ফুল ফুটেছে। ডালপাতা নড়ছে বর্ষার সজল বাতাসে! ঘুমিয়ে পড়লেন উপেন ভটচাজ। উপেন ভটচাজের পুত্রবধূও আপন মনে আজ খুব খুশি। ছন্নছাড়া ভাঙা বৃহৎ বাড়ি আজ যেন কার পাদস্পর্শে লক্ষ্মীর সংসারে পরিণত হয়েছে। দোতলায় শ্বশুরকে তামাক সেজে দিতে যাওয়ার সময় এই কথাই তার মনে হচ্ছিল। তার আছে সবাই। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র—যা যায় মেয়েরা, এত বড় বাড়ি, জাজ্বল্যমান সংসার যাকে বলে। ওদের সকলের পাতে পাতে ভাত-মাছ দিয়ে আজ কত সুখ পেয়েছে সে। ওদের খাইয়ে সুখ। ভাবতে ভাবতে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভবতারণ অন্য দিন খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিতে বেরোয় রায়-পাড়ার হরু রায়ের নাতি অমূল্য রায়ের ওখানে। স্থলপথের যাত্রী দুজনেই। দুপুরের পর ভরা পেটে মৌতাত জমে ভাল।

আজ কিন্তু সে বাইরে গেল না। স্ত্রীকে ঘুমুতে দেখে সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হল। কেন, দুটো গল্প করতে কি হয়েছিল। তারাকে কি সে রোজ রোজ পায়? কত কষ্টে থাকে এই বাড়িতে একা। সে নিজে অক্ষম স্বামী, কিছু করবার পথ তার নেই সামনে।

সে ভাল হবে ভাবে, ভেবেছে কতবার। কিন্তু তা বহার জো নেই। সে জানে কেন। সঙ্গ বড় খারাপ জিনিস। সে-সব বন্ধুদের সঙ্গ তাকে এইখানে নামিয়েছে। জলপথ ও স্থলপথ, কোনও পথ বাকি রাখেনি। আজকের সংকল্প কাল উবে যাবে কর্পূরের মত।

তবুও আজকের দিনটি একটা সুন্দর, জাঁকালো, শান্ত দিন হয়ে থাক তার জীবনে। তারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললে,—চা আছে ঘরে? চা কর। বাবাকে দিয়ে এস। আমিও একটু খাই—

—না, চা খায় না। নেবু আর নুন দিয়ে চিঁড়ের কথ করে দি—

স্ত্রী সত্যি তাকে যত্ন করবার চেষ্টা করে। তার অদৃষ্টে নেই, কার কি দোষ?

তারা সত্যি ভাল মেয়ে বড্ড।

এদিকে দিবানিদ্রা ভেঙে উপেন ভটচাজ সবে উঠেছেন, অমনি পুত্রবধূ গরম চায়ের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলেন। বিস্মিত চোখে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন—কি? চা? বাড়িতে ছিল?

—ছিল।

—বেশ, বেশ।

পুত্রবধূ হাসিমুখে বললে—আর কিছু খাবেন?

—হ্যাঁ, তা—কি খাওয়াবে?

—বেশ দোভাজা করে চিড়ে ভেজে নারকোল-কোরা দিয়ে নিয়ে এসে দেব?

—বেশ বেশ। কাঁচা লঙ্কা অমনি ওই সঙ্গে একটা এনো। আর শোনো ভবতারণকে আর খোকনকেও দিও।

—তামাক দেব বাবা?

—এখন না। চিড়েভাজা আগে খাই, তার পরে। বাঃ, মৌতাতটা নষ্ট করে দেবে বউমা? এমনি সুন্দর হাসিখুশির মধ্যে সেদিনের সূর্য ডুবে গেল জামদার বড় বিলের ওপারে।

সারাদিন কেউ কোথাও নেই।

ভবতারণ চলে গিয়েছে। যা সামান্য দুটি টাকা দিয়ে গিয়েছে তাতে পাঁচদিনের চালও হবে না। উপেন ভটচাজ গিয়ে উঠেছেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে।

একা রয়েছে তাঁর পুত্রবধূ সেই প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়িতে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে রাত্রে। আবার কলাবাদুড় ওড়ে কড়িকাঠের খোপে খোপে, পেঁচা ডাকে ডুমুর গাছের নির্জন অন্ধকারের মধ্যে, করুণা ঘুমের মধ্যে মাকে বলে—ও কিসের শব্দ মা? ওঠ ওঠ—ওটা কি মা?

মাটি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের অন্তত সিকি লোক লোকটিকে বোধ হয় চেনে, অর্ধেক লোক ওর কণ্ঠস্বর শুনেছে এবং শুনলেই চিনতে পারে—এ সেই কণ্ঠস্বর! ষোল আনা লোকই ওর কণ্ঠস্বর চেনে বলতে দ্বিধা করতাম না, কিন্তু মধ্য-দ্বিপ্রহর ছাড়া অন্য কোনও সময়ে লোকটির হাঁক শোনা যায় না। মধ্য-দ্বিপ্রহরের একটা অবসাদ আছে, মহানগরীও কিছুক্ষণের জন্য পাখির রাজ্যের মত ঝিমিয়ে পড়ে। রাজপথে লোক বিরল হয়, ট্রামে-বাসে সিট খালি পড়ে, গতিও যেন মন্থর হয়, ড্রাইভারের হাতের মুঠি বোধ হয় আলগা হয়ে আসে ; দোকানে খরিদ্দার কমে যায়, কর্মচারীরা কেউ পেন্সিল ঠোঁটে চেপে জনবিরল পথের দিকে চেয়ে থাকে, বসে বসেই অনেকে ঘুমোয়; আপিস-অঞ্চলেও এ সময়টায় কাজকর্ম ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে সাড়া পেতে দেরি হয়, ফুটপাতে জুতো-পালিশওয়ালারও ঢোলে ঝিমোয়; বাড়িতে দরজা বন্ধ থাকে, মেয়েরা হয় ঘুমোয়, নয় আস্তে-ধীরে কিছু বোনে বা সেলাইয়ের কল চালায়, রেডিও-তে গান-বক্তৃতা বেজেই চলে। এ সময় আকাশের দিকে তাকালে ক্বচিৎ দু-একটা চিল বা শকুন উড়তে দেখা যায়, নইলে আকাশটাও খাঁ-খাঁ করে। আমার পাশের বাড়িতে আছে একটা অ্যালসেশিয়ান, সেটাও এ সময়ে চোখ বন্ধ করে জিভ বের করে হাঁফায়; তার মাথার উপরে বারান্দার কড়িতে পায়রাগুলো পা ভেঙে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকে, কিন্তু কুকুরটা ধরবার জন্য লাফায় না। পথে খাবার পড়ে থাকে, কাক দেখা যায় না।

এরই মধ্যে অকস্মাৎ উত্তর কলকাতার কোনও-না-কোনও পথে বা গলিতে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—মাটি চা-ই, মা-টি-ই—

কণ্ঠস্বরই শুধু তীক্ষ্ণ নয়, লোকটির হাঁকের ভঙ্গিও বিচিত্র; শেষের মাটি শব্দটার 'মা' পর্যন্ত চিৎকার করে হেঁকে 'টি'র শেষে হ্রস্বটাকে বেপর্দায় খাদে নামিয়ে দেয়, তার প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত, সমস্ত শরীরের, স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন চমকে শিউরে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে এই বিচিত্র ভঙ্গিমায় উচ্চারণে স্নায়ুর উপর ধ্বনির প্রভাব সর্বজনীন কিনা জানি না, তবে আমি এ প্রভাব অনুভব করেছি এবং আমার বাড়ির একটি শিশুকে

চমকে উঠে ঠোঁট ফুলাতে দেখেছি। গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরে আমার ঘুমের আমেজ ভেঙে গিয়েছে, বন্ধ দুয়ার-জানালা, অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে কতদিন মনে হয়েছে—আমি শুয়ে আছি আমার দেশের বাড়িতে, বাড়ির পিছনেই তালগাছ-ঘেরা খিড়কির পুকুরের কোনও তালগাছের মাথায় বসে রৌদ্রশ্রান্ত চিল তীক্ষ্ণ-করুণ সুরে ডাকছে চি-লো-চি-ল-অ। শেষে অ-কারটা ঠিক এমনি বেপর্দায় নরম সুরে নেমে এসে থেমে যায়। চিলটার ঠোঁটের নিচে গলার কাছটা ধুক-ধুক করে কাঁপে।

উত্তর কলকাতায় বাসা করার প্রথম সপ্তাহেই ওর ডাক শুনেছিলাম। তখন বৈশাখ মাস। মনে আছে বাসা পেতেছিলাম ছয়ই বৈশাখ। গলির মোড়ে সেদিন ওর হাঁক উঠতেই দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। খাঁ-খাঁ করছে গলিপথ, পিচের উপর মোটরটায়ারের ও নালমারা জুতোর দাগ ফুটে উঠছে, বাতাস ঝলসাচ্ছে, বাড়ির গায়ে এক টুকরো কোনাচে জায়গায় একটা কনকচাঁপা গাছের লম্বা পাতাগুলি অবসন্ন হয়ে ঝুলে পড়েছে। আকাশের দিকে চোখ তোলা যায় না, হাপর থেকে বের করার কয়েক মুহূর্ত পরে নীল হয়ে যাওয়া ধাতুপাত্রের মত উত্তাপ বিকীর্ণ করছে। সে উত্তাপ চোখে এসে লাগছে। এরই মত ওর এই হাঁক উঠছে—মাটি চা-ই, মাটি-ই—

তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে। আবার হাঁক উঠল—মাটি চাই—মাটি-ই। হাঁকটা এবার দূরে চলে গেল।

মাটি চা-ই, মা-টি-ই। এবার আরও দূরে। বাঁকের ওপারে আমাদের গলি থেকে একটা অত্যন্ত অপ্রশস্ত গলি এঁকে বেঁকে চলে গেছে দক্ষিণমুখে, সম্ভবত লোকটা সেই গলিপথে ঢুকে চলে গেছে। কিন্তু লোকটার কণ্ঠস্বর, তার এই হাঁকের বেসুর সমাপ্তি সমস্ত মনটাকে শুধু অস্বস্তিতে ভরে দিয়ে গেল না, শরীরেও একটা চকিত চাঞ্চল্য বইয়ে দিয়ে গেল।

কিছুদিন পর ওকে দেখলাম। সেদিন দুপুরেই বেরিয়েছিলাম কাজে। ফড়েপুকুর স্ট্রিটে ঢুকে খানিকটা অগ্রসর হতেই ওই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের বেসুর হাঁক কাছেই কোথায় ধ্বনিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তে যে কৌতূহল স্তিমিত হয়ে পড়েছিল সে দীপ্ত হয়ে উঠল, ওই হাঁকটা যেন ফুৎকার দিয়ে জাগিয়ে তুলল—দপ্ করে জ্বালিয়ে দিল। দিক অনুমান করে এগিয়ে গেলাম।

—মাটি চা-ই, মা-টি-ই—

থমকে দাঁড়ালাম। হাঁকটা পিছনে পড়ে গেছে। পিছন ফিরলাম—দেখলাম পিছনে একটা পাশের গলি থেকে মাটিওলা বেরিয়ে আসছে। বিচিত্রদর্শন উলঙ্গপ্রায় মানুষ, পরনে শুধু একটা নেংটি, সর্বাঙ্গ কাদায় আবৃত। সন্ন্যাসীরা যেমন ভস্মে সর্বাঙ্গ আবৃত করে তেমনিভাবে কাদায় মাখা লোকটির সর্বাঙ্গ। সময়টা তখন বোধ হয় আষাঢ় মাস কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতা বৈশাখের চেয়ে কম নয়. উপরন্তু বাতাস [illegible] হয়েছে সজলস্পর্শ,

মাটিও হয়েছে সরসসিক্ত, তার ফলে একটা গুমোট ভাপানিতে ভরে উঠেছে বাংলাদেশ, জ্বালার বদলে ঘেমে মানুষ সারা হয়ে গেল। লোকটির গায়ের ধুলো কাদা হয়ে উঠেছে, সেই কাদা ঘামে লাগছে। ঘামের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে দেহখানাকে যেন বিচিত্র করে তুলেছে। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখলাম। কাদা এবং ঘামের রং ও রেখার বৈচিত্র্য নয়—অবাক হলাম লোকটার দেহের গঠন-বৈচিত্র্য দেখে। একজন সুস্থ সহজ মানুষের দেহ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায়! লম্বা একটি মানুষ বোঝা বয়ে খাটো হয়ে যায় এমনভাবে? পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের নিচের দিকটা সহজ স্বাভাবিক, সরল সোজা পা, প্রতিটি পেশি সুগঠিত। কিন্তু উপরের দিকটা—কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা বিপুল চাপ দিয়ে কেউ যেন দেহের কাঠামোটা পর্যন্ত ভেঙে চুরে বিকৃত করে খাটো করে দিয়েছে। চওড়া বুকটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে; পেটটা গিয়েছে ভিতরে ঢুকে—সেখানে দড়ির মত গোটা-তিনেক পেশি দাঁড়িয়ে গেছে, সেগুলি এখন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে কাঁপছে। ঘাড়ে মাটির বস্তার জন্য ওর মুখখানা আমি দেখতেই পাচ্ছি না, মাটির দিকে মুখ করে লোকটা হেঁটে চলেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মাথার একটা দিক; কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলে ভরা প্রকাণ্ড মাথাটার একটা দিক। একটু দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেলাম। এবার নজরে পড়ল—কাদার প্রলেপের মধ্যে দেখতে পেলাম—ছোট-বড় কাটা দাগ, সংখ্যায় অনেক।

একটা বাড়ি থেকে কেউ ওকে ডাকলে—এই মাটিওলা।

লোকটা ঘুরল সেই দিকে; আমি তার পিছনে পড়লাম। এবার আমার বিস্ময় উঠল চরমে। ঘাড়ের নিচেই একটা কুঁজ। কুঁজের উপরে একটা খাঁজ তৈরি হয়ে গিয়েছে, তারই উপরে মাটির বস্তা চাপিয়ে লোকটা ভারী-পায়ে পা ফেলে; কিন্তু চলার ভঙ্গি সহজ—কাঁধে ভার চেপেছে বলে দ্রুত চলছে না, বেশ সহজ চালে চলেছে। মাটির বস্তা বয়ে ঘাড়ে ওর খাঁজ তৈরি হয়েছে—ওর সবল সহজ দেহ ভেঙেচুড়ে পিঠে কুঁজ ঠেলে উঠেছে, বুকটা ফুলে ঠেলে বেরিয়েছে—পেটটা ঢুকে গেছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই লোকটা ঘাড়ের বস্তা দাওয়ার উপরে নামিয়ে মাটি বেচতে বসল। যুক্তি ও অনুমানের দিক থেকে আশ্চর্য হবার কথা নয়, তবুও আশ্চর্য হলাম, যুক্তি-যুক্তি ও অনুমানের শক্তি বোধ হয় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল আমার। ঘাড়ের বস্তা নামিয়েও লোকটি সহজ মানুষের মত সোজা হতে পারল না। ঘাড় বেঁকেই রইল—পিঠের কুঁজটা তেমনি উঁচু হয়েই রইল—শুধু মুখটা একটু তুললে মাত্র। নির্বোধ মানুষের মুখ-চোখে স্থূলদৃষ্টি, কিন্তু একটি সুন্দর মানুষের মুখ। মুখের গড়নে বড় বড় চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটি শান্ত মধুর সুন্দর মানুষের সন্ধান বিবর্ণ বিজ্ঞাপনের মত যেন ফুটে রয়েছে। বিস্মিত এবং বেদনাহত হয়ে কতক্ষণ তাকে দেখেছিলাম, সেকথা আজ মনে নেই। অনেক চিন্তাও মনের মধ্যে উঠেছিল, এই যুগের চিন্তাই সে-সব, কিন্তু তাও সব আজ স্পষ্ট নয়; পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম,

কোটি কোটি মানুষকে এইভাবে যারা বঞ্চিত করে রেখেছে শিক্ষা থেকে, সম্পদের ন্যায্য অংশ থেকে, তাদের ধ্বংসকামনাও করেছিলাম—এতে কোনও সন্দেহ নেই। আরও অনেক কথা মনে হয়েছিল; সে-সব মনে পড়ছে না আজ। না পড়ুক। তবে এর পর যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিলাম তা আজও মনে পড়ছে শুধু তাই নয়, ঐদিন থেকে ওর সঙ্গে আমার মনের একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সম্পর্কই স্থাপিত হয়ে গেছে। যখন মনে হয় ওর কথা—যখনই স্তব্ধ দুপুরের অবসন্ন অবসরে—দূরে হোক, কাছে হোক—নগরীর পথে ওর ডাক শুনতে পাই, তখনই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস আপনি ঝরে পড়ে বুক থেকে; শত ব্যস্ততা অথবা একাগ্র চিন্তার মধ্যেও কয়েক মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গিয়ে কেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। শীতের অরণ্যগর্ভ থেকে ঘনিয়ে-ওঠা কুয়াশা যেমন বনস্পতির পত্র-পুষ্পের সূর্যারাধনাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে তেমনি ভাবেই একটি উদাসীনতা আমার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠে সচেতন মনের সকল উদ্যমকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

এরপর কতবার ওকে দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, বাগবাজার, বউবাজার, পোস্তা, টালা, বেলেঘাটায়—ঠিক এমনি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছি; তীক্ষ্ণস্বরে এই বেসুরা ভঙ্গিতে ওর হাঁক ভেসে চলেছে—মাটি চা-ই, মা-টি-ই-

সব দিন দেখতে পাইনি। অনুসরণের স্পৃহা আর নাই। দু-এক দিন চোখে পড়েছে। নুয়ে পড়া ঘাড় এবং ঠেলে ওঠা পিঠের কুঁজের মধ্যবর্তী খাঁজে মাটির বস্তা বয়ে বিকলাঙ্গ মাটিওয়ালা সর্বাঙ্গে কাদা মেখে হেঁকে চলেছে মাটি—চা—ই, মা—টি—ই—

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি আমি। তারপর চলে গেছি নিজের পথে।

হঠাৎ সেদিন নিতান্ত অসময়ে—একেবারে ভোরবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে ওর বাসাও আবিষ্কার করলাম। সবে তখন গ্যাসের আলো নিভেছে, রাস্তায় তখনও জল পড়েনি। আমি অভ্যাসমত প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম; বেড়াবার বাঁধাধরা স্থান ছিল পার্ক অথবা গঙ্গার ধার। সেদিন দিক পরিবর্তন করে চলে গেলাম একেবারে খালের ধারে। খালের পুল পার হয়ে গেলাম গঙ্গা এবং খালটার সংযোগস্থলের গেটটার দিকে। পাম্প লাগিয়ে খালের জল মেরে ফেলা হচ্ছিল; খালটা মজে এসেছে, সংস্কার হবে। কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, দু'ধার জেগে উঠেছে; জল পড়েছে মাঝখানে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে পাঁক দেখা যাচ্ছে। পুল পার হয়ে খালের ধারে চলেছিলাম। গঙ্গার ওপারে জুট মিলের ইয়ার্ডে এখনও আলো জ্বলছে। হঠাৎ দেখলাম মাটিওলাকে। নুয়ে পড়া ঘাড়, পিঠে কুঁজ, ঠেলে ওঠা বুক—দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। গঙ্গায় স্নান করে একখানা গামছা পরে হাতে একটি জলের ঘটি নিয়ে ফিরছে। আমি থমকে

দাঁড়াতেই মাটিওলা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপরই প্রসন্ন-বিনয়ে হেসে বললে—আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই মাটিওলাই বটে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় হিন্দি মিশিয়ে কথাটা বললে— হাঁ, ওহি মাটিওলাই আছে হামি বাবুজি। যেন স্নান করে পরিচ্ছন্ন-দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেচারি লজ্জা পেয়েছে।

আমি প্রশ্ন করলাম—কোথাও যাবে বুঝি আজ?

তার স্থূলদৃষ্টিতে বিস্ময় জেগে উঠল আমার প্রশ্নে। বললে—আঁ? যায়েগা? কাঁহা যায়েগা?

—স্নান করে এলে—এই ভোরে—

—হাঁ। এখন রামজির নাম নোব, উস্‌কে বাদ—দুটো চানা খেয়ে নেব, তারপর চলেগা মাট্টি আনতে। আচ্ছা বাবুজি রাম-রাম।

—রাম-রাম ভেইয়া।

সে চলতে শুরু করে দিলে। কয়েক পা গিয়েই কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—খোকি ভাল আছে বাবুজি? আপনার লেড়কি?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ওর কথা। আমার বাড়িতে তো খুকি নাই।

—আপনার খোকি! আপ তো বেলিয়াঘাটামে রহেতে হ্যায়? লাল রঙের কোঠি?

বুঝলাম, ও আমাকে বেলেঘাটার কোনও লাল রঙের বাড়ির বাসিন্দে বলে ভুল করেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। ওরই ভুলের মধ্য দিয়ে পরিচয়ের সুযোগ নিতে চাইলাম। বললাম—ভাল আছে।

মুখ ভরে হেসে সে বললে—আমি গেলেই ছুটে আসবে। একটি খোলা-ভাঙা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে—এক পয়সার মাটি দেও—মাটিওলা। হামি বলে—কি হোবে খোকি? বলে—চুলহামে মাটি দেনে হোগা, মাটিওলা। ছোটা হাতমে একমুঠি মাট্টি—বাস চলা যায়ে গা।

এবার সে হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বললে—য্যায়সা দেখতা হ্যায় না—ওইসাই—ঠিক ওইসাই কলেগা উ-লোক।

ছোট্ট একটি গিন্নি-মেয়ের ছবি আমার চোখেও ভেসে উঠল। অন্তর ভরে উঠল অনাবিল প্রসন্নতায়। সে এবার ঘটিসুদ্ধ হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বললে—আব যাতা হ্যায় বাবুজি! হাঁ রাম-রাম।

চলে গেল সে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলাম তার দিকে চেয়ে। খালের এপারটা অপরিচ্ছন্ন, প্রাচীন আমলের ভাঙা বাড়ি, বস্তি, গোলা আর গুদামে ভর্তি। আবর্জনা এবং আগাছার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে বস্তির পথ। সেই পথে চলে গেল সে।

আবার কয়েকদিন পর ওপর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এবার দেখা হওয়ার পটভূমি একেবারে কল্পনার বাইরে। গিয়েছিলাম পোস্টাপিসে, পোস্টাপিসে একটা

লম্বা কিউয়ের মধ্যে দেখি মাটিওলা দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টাপিসে ওকে কিউয়ের মধ্যে দেখবার প্রত্যাশা যেন কল্পনার বাইরে। মুহূর্তের জন্য আমার কপাল কুঞ্চনরেখায় ভরে উঠল। পরমুহূর্তে নিজেই একটু হাসলাম, ওরও দেশ আছে, ঘর-সংসার আছে, ইঁটে কাঠে পাথরে মাটির ধূলাকে ঢেকে যে মহানগরী গড়ে উঠেছে, তারও ঘরে মাটির প্রয়োজন হয়। ওই শিক্ষায়-দীক্ষায় বঞ্চিত মাটিওলা—ওরও প্রয়োজন হয় ডাকঘরে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? কিউটা মনিঅর্ডারের কিউ। টাকা পাঠাচ্ছে দেশে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে উঠল—ঘুমন্ত বাড়ির খোলা দরজার সম্মুখে চোরের উঁকি মেরে দেখবার প্রবৃত্তির মত। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও আমার মুখের দিকে চাইলে, চোখে ফুটে উঠল অপরিচয়ের বিস্ময়; শঙ্কিত হ'ল বোধ হয়, কারণ গামছার খুঁটটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে। বুঝলাম, একেবারে ভুলে গেছে আমাকে। সেদিনের খোকির গল্পটা মনে পড়ে গেল। বললাম—পছানতে নেহি?

নির্বোধের মত উত্তর দিলে—আঁ?

হেসে বললাম—সেদিন তোমার সঙ্গে খালধারে দেখা হয়েছিল। বেলেঘাটার খোকি—মাটি কেনে তোমার কাছে—!

আশ্বাসের হাসিতে ওর নির্বোধ মুখখানি ভরে উঠল, বলল—হাঁ—হাঁ। কাল গয়া থা আপনাক কোঠিমে। খোকি কাল আমাকে নেওতা দিয়া।

হেসে আমি বললাম—দেশে টাকা পাঠাবে?

—হাঁ। দেশমে রুপেয়া ভেজবে।

—এ তো অনেক দেরি হবে। এস আমি তোমার মনিঅর্ডার তাড়াতাড়ি করিয়ে দেব। আমার সঙ্গে আলাপ আছে মাস্টারবাবুর।

—হাঁ! সে অবাক হয়ে গেল আমার প্রতিষ্ঠা দেখে।

—কই, দেখি তোমার মনিঅর্ডার।

একখানা সাদা ফর্ম আমার হাতে দিয়ে সে বললে—তা হ'লে তুমি এটা লিখে দাও বাবুজি। খুশি হয়েই বাইরে একটা দাওয়ার উপর বসে গেলাম ওকে নিয়ে।

—লিখিয়ে বাবুজি। রুপেয়া দশঠো। পানেওলী—লছমনিয়া, অকলু মুসহরকে বিটিয়া। আমি লিখতে শুরু করে ওর নামগুলি প্রশ্নের সুরে বলে গেলাম, ভুল হলে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

—লছমনিয়া।

—হাঁ।

—অকলু মুসহরকে বেটি।

—হাঁ। গাঁও—। গঙ্গাজির কিনারমে জাহাজি টিশন।

গাঁও পোস্টাপিস মনে নাই আজ, মনে আছে জিলা পাটনা। তারপর বললাম—অব্ তুমাহারা নাম-পাতা বোলো।

—হাঁ, লিখিয়ে, মেওয়ালাল।

—মেওয়ালাল মুসহর?

—নেহি, নেহি। মাট্টিওলা লিখিয়ে।

—আচ্ছা। হাসলাম একটু। বাতাও উস্‌কে বাদ। পত্তা বাতাও।

বলে গেল ওর ঠিকানা। বিচিত্র বস্তির সে ঠিকানা।

অব্—কেয়া লিখনে হোগা বাতাও।

—কুছ না।

—কুছ না? ইসমে লিখনে কা জাগা হ্যায়, লিখনে কা একতিয়ার ভি হ্যায়—

—নেহি—নেহি—কুছ্ না। নেহি—নেহি।

সে প্রতিবাদ জানালে। কিছু না। কিছু লিখতে হবে না। আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম। ও তখনও ঘাড় নাড়ছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসলে, বিচিত্র সে হাসি। তারপর বললে—আজকের দিনটাই আমার মাটি বাবুজি। কোনও কাজ হ'ল না। মাহিনার পহেলা রোজ হামার এই কাজেই যায় বাবুজি! মহাবীর কাহারের মা বলে—বরবাদ করিস দিনটা তুই মেওয়ালাল।

পরের মাসের পয়লা তারিখটা বিশেষ করে খেয়ালে ছিল। মাটিওয়ালার জন্য নয়, তারিখটা স্মরণীয় করে তুলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারে আবির্ভূতা হলেন—এক দৌহিত্রী। ধাত্রী ডাক্তার এঁদের বিদায় ক'রে ডায়রিতে লিখছিলাম নবজাতার জন্মের তারিখ, সময় ইত্যাদি। ১লা অগ্রহায়ণ...। হঠাৎ খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল মেওয়ালাল মাটিওলা। আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমার বাড়ি ও চিনলে কেমন করে!

একগাল হেসে মেওয়ালাল বললে—পরণাম বাবুজি।

—রাম-রাম ভাই।

—আপ্‌কা কোঠি হম পহছান লিয়া বাবুজি! সে হাসতে লাগল। বললে—বেলিয়াঘাটা তোমার বাড়ি নয়। যো রোজ তোমার সঙ্গে পোস্টাপিসে দেখা তার পরদিন আমি তোমার জন্যে বহুত আচ্ছা গঙ্গাজির মাটি নিয়ে তোমাকে ভেট দিতে গিয়েছিলাম। টবে ওই মাটি দিয়ে গাছ লাগালে আচ্ছা গাছ হবে। কিন্তু গিয়ে একদম বুড়বক বনে গেলাম। মালিক, ওহি খোকির বাপ, খোকির হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। আমি বাবুজি ওহি বাবুজিকেই বললাম—মালিকবাবুকে একটু 'ডেকে' দেবে হুজুর? এই খোকি মায়ির পিতাজিকে? বাবুজিকে গোস্‌সা হো গিয়া, আরে—বাপরে বাপ? আঁখ পাকাকে—বলব কি বাবুজি—বলে—কেয়া কাম হ্যায় তুমহারা? খোকিকে পিতাজি তো হম হ্যায়। হায় রামজি! হম একদম বেওকুব বন গেয়া।

আমি নিজেও একটু অপ্রতিভ হলাম। এইবার যদি ও আমাকে প্রশ্ন করে বাবুজি,

তুমি এমন মিথ্যে পরিচয় কেন দিলে আমাকে—তবে আমি কি উত্তর দেব? সত্য উত্তর মেওয়ালাল কতখানি বুঝবে? হঠাৎ মনে এসে গেল, আমিও তাই খুলে বললাম—আমি তোমার সঙ্গে জুয়োচুরি কিছু করিনি মেওয়ালাল। মনিঅর্ডারের রসিদ পেয়েছ তুমি?

—হাঁ-হাঁ-হাঁ। বারবার স্বীকার করতে চাইলে যেন কথাটা শুধু বাক্যে নয়—ঘাড় নেড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে স্বীকার করলে যেন। এর পর অপরাধীর মত হেসে বললে—তোমার কাছে আমার কসুর আমি লুকাব না বাবুজি। প্রথম দিন—বেলিয়াঘাটায় যেদিন দেখলাম খোকির বাপ তুমি নও, সেদিন আমার বহুত ডর হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাবুজি, কি কোন জুয়াচোর হয়তো আমাকে ঠকিয়ে দশ-দশঠো টাকা আমার মেরে দিয়েছে। মনিঅর্ডারকে বিল্‌টি যেঠো আমাকে দিয়েছে, সেটা হয়তো একদম ভুয়া হবে। পোস্টাপিসে কি ঝুটমুঠ বলে একটা বাজে কাগজ আমাকে দিয়েছে। বাবুজি, বেলিয়াঘাটসে একদম দৌড়কে-দৌড়কে বাসামে ফিরলাম। বিল্‌টি নিয়ে ছুটে গেলাম একঠো ডাকডরখানামে। ডাকডরবাবুকে বললাম—দেখিয়ে তো হুজুর—ডাগডর সাব, কেয়া লিখা হুয়া হ্যায় ইস বিলটিমে? মেহেরবানি ক'রে গরীবকে বলে দাও তো গরীব পরবর! তা ডাকডর সাব পড়লে—দেখলাম—ঠিক টিক নাম আওর পতা লেখা রয়েছে। ডাগডর আরও বললে—বিলটি ঠিকঠাক আছে—ডাংখানার মোহর আছে—মাস্টারবাবুকে সহি ভি আছে। খানিকটা ভরসা হল। তবু বাবুজি—পুরা ভরসা পাইনি। রাত্রে ঘুম হত না। ভাবতাম—কলকাতার জুয়াচুরি—একঠো জাল মোহর বানাতে আর কি লাগে? তারপর একদিন রসিদটা ফিরে এল। যেমন সঙ্গে সঙ্গে একঠো খত ভি আসে—তাও এল। তখন বারবার মনে মনে বললাম—সীয়ারামজি—বাবুজির কাছে আমার কসুর হ'ল—এ পাপের আমি কি করি! তারপর একদিন তোমার বাসা দেখলাম। দেখলাম বহুত ভারি বাবু আমির লোকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। আবার এক রোজ দেখলাম সাহেব লোগ বসে আছে তোমার কাছে। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিরে গিয়েছি। আজ ফিন মাহিনাকে পহেলা রোজ বাবুজি—তুমি আমার মনিঅটারঠো লিখে দাও, আর যদি সেদিনের মত জলদি করিয়ে দাও বাবুজি—

মেওয়ালাল হাতজোড় করে দাঁড়াল। আমিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সহজ সরল মানুষ—তাই এত সহজে ওর সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। নইলে এই মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার পর এ সততাকে বড়-রকমের জুয়াচুরির ভূমিকা ভাবতে বাধা কোথায় ছিল।

বললাম—দাও ফর্ম। কি নাম যেন? লছমনিয়া—না?

—জী। লছমনিয়া, অকলু মুসহরকে বেটিয়া।

লছমনিয়া—অকলু মুসহরকে বিটিয়া—বাড়ি পাটনা জেলার একটা গ্রামে একেবারে গঙ্গাজির কিনারার উপর।

মেওয়ালালের সঙ্গে সেদিন আলাপ জমে উঠল। মেওয়ালাল বললে—বাবুজি যে লোক-ডেকে আমার দুঃখ লাঘব করে দিল, আমির আদমি, লিখাপড়া জানা লায়েক আদমি হয়ে আমার মত গরীব মাটিওয়ালার সঙ্গে এমন মিষ্টি কথা বললে—তার কাছে কি কিছু লুকুতে আছে? তোমার কাছে বলি। মনের কথা আমার দুনিয়ার বলবার লোক পাই না। বহুত রোজ আগে—বলেছিলাম এক সাধুজির কাছে—গঙ্গাজির কিনারায় এসে একঠো মন্দিরের দাওয়ায় আসন গেড়েছিলেন—তাঁকে বলেছিলাম। আর বলেছিলাম—মহাবীর কাহারের মাকে, আমাদের বস্তিতে থাকে বুড়িয়া, সে আমাকে ভালবাসে আপন বেটার মত; একবার ভারি বেমারি হয়েছিল আমার—ওহি বুড়িয়া আমাকে বাঁচিয়েছিল—তাকে বসে ছিলাম। আজ আমাকে বলি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মেওয়ালাল। বাইরে শীতের ঝরঝরে হাওয়া বইছে। বাড়ির পাশের চাঁপাগাছের পাতা ঝরে পড়েছে সে হাওয়ায়।

মুসহরের বেটি লছমনিয়ার যে গাঁয়ে বাড়ি—ওই একই গাঁয়ে রতনলাল নামে এক—বলতে গিয়ে থেমে গেল মেওয়ালাল। একটু যেন সামলে নিয়ে বললে—বাবুজি, রতনলাল নামে একজন খুব ভাল লোক ছিল। লোকে বলত মুনশিজি। লিখাপড়ি জানত, গোস্বামী মহারাজ তুলসীদাসের রামচরিত কথা পড়ত। গরীব গৃহস্থি; ঘরে দু'তিনটে গাই ছিল—একটা ভঁইসা ছিল, একজোড়া বয়েলও ছিল, আর গঙ্গাজির কিনারায় পাঁচ বিঘা ক্ষেত। তারই ছেলে আমি—আমার নাম 'জীওনলাল'; অই অকলু মুসহরকে বিটিয়া—লছমনিয়া আমার নাম দিয়েছিল—মেওয়ালাল। অকলু মুসহর আমার বাপের ক্ষেতিতে কাম করত—কিষাণ মজদুর ছিল। গাই, মহিষ, বয়েলের সেবা করত ওর বেটি। ওই লছমনিয়া ছেলেবেলা থেকেই আসত আমাদের বাড়ি। পাটকাম করত, ঝুঁটাবর্তন মলাই করত। ওরও মা ছিল না, আমারও মা ছিল না বাবুজি, ছেলেবেলা একসঙ্গে খেলা করতাম আমরা।

রতনলালকে লোকে বলত সুখী মানুষ। কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। গাঁয়ের লোক সম্ভ্রম করত। ক্ষেতিকে গঁহু, যব, অড়হর হ'ত প্রচুর। ছেলে মেওয়ালাল বার চৌদ্দ বরিষ উমর থেকেই এমন ক্ষেতির কাম শিখেছিল আর ওই ক্ষেতি নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা এমন খাটত যে, দু'তিনখানা গাঁয়ের মধ্যে এমন বঢ়িয়া 'ক্ষেতি' আর কারুর ছিল না। তাতে আর আশ্চর্য কি বাবুজি! একজন লোক যদি বারো মাহিনা তিরিশ রোজ ওই ক্ষেতিতে সকাল থেকে সন্ধে ইস্তক বুক দিয়ে পড়ে থাকে, এক কণা ঘাস বের হলে টেনে তুলে মাটিতে পুঁতে দেয়—যাতে ঘাসও যায়, আবার জমিও হয় আরও উর্বর; দু'হাতে গঙ্গার কিনারায় দিয়ারা ক্ষেতির মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে সামান্য 'কঙ্কর' কি

'পখল' থাকলে বেছে ফেলে দেয়, পথে ঘাটে এতটুকু গোবর দেখলে কুড়িয়ে এনে ওই 'ক্ষেতি'তে ঢালে, খুরপি আর কোদালি নিয়ে হরদম জমির তরিবত করে তবে ওই ক্ষেতির সঙ্গে পাল্লা দিতে অন্য ক্ষেতি পারবে কেন? বাবুজি—দুনিয়াতে সকল মায়ের বুকেই ক্ষীর আছে, কিন্তু যে মা পেট ভরে খেতে পায়, ভাল মেওয়া চিজ খায়—সে মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণের সঙ্গে অন্য মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণ কি সমান হয়? না, হতে পারে?

একটু থামলে মাটিওয়ালা। আমার মুখে দৃষ্টি তুলে মিষ্টি হাসি হেসে বললে—অকলু মুসহরকে বেটি লছমনিয়া এই কথা শুনেই আমাকে ঠাট্টা করে বলত—মেওয়াখানেওয়ালী জমিনকে মালিক তুমি—তোমার জমিনমে যে ফসল হয় তার মধ্যেও মেওয়ার পোস্টাই—ওহি লিয়ে তোমার নাম দিলাম আমি মেওয়ালাল।

তখন মেওয়ালালের বয়স হবে ষোল-সতরো, ফুল ধরবার আগে গঁহু কি যবের ফসল যেমন লকলকে তেজালো ঘন সবুজ হয়ে ওঠে—তেমনি তখন মেওয়ালালের চেহারা। ক্ষেতিতে খেটে খেটে আর কুস্তি করে গঙ্গাজিতে সাঁতার কেটে গায়ের জোর হয়েছে তেমনি। দুনিয়াতে কারুর পরোয়া করে না। কিন্তু, লছমনিয়ার এই তামাশায় কেমন শরম লাগত। লছমনিয়া হেসে বলত—আরে বাপরে, গাল কলাপ যে আনারের দানার মত টসটসে লাল হয়ে উঠল। এ একেবারে খাস মেওয়ালাল তুমি!

লছমনিয়া মেওয়ালালের চেয়ে বয়সে বছর-খানেকের বড়ই হবে। তেমনি কি তার চেহারা! দেখে মনে হ'ত পাঞ্জাব দেশের রহনেওয়ালী। এই লম্বা বাবুজি। বাঁশির মত নাক, পাঞ্জাবি মেয়েদের মতই চোখ ছোট ছোট। গায়ের রঙ কিন্তু কালো। মেয়েটাকে মুসহররা বলত 'সাপিন্'। সাপিনের মতই লম্বা—তেমনি চোখ—চেহারাতেও যেমন—ভাগ্যের দিক থেকেও তাই। ছেলেবেলায় বছর-তিনেক বয়সে হয় সাদি, বছর না পেরুতেই বর মারা গেল; তারপর ফের সাগাই—বাবুজি এক মাহিনা যেতে না যেতে সে স্বামীও মারা গেল; তারপর ফের সাগাই দিলে ওর বাপ—তখন ওর বয়স বারো। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড—ওই সাগাইয়ের রাত্রেই বর মারা গেল; ইয়া জোয়ান, এই ছাতি, লোকটা হঠাৎ বললে—বুকটা কেমন করছে। ব্যস্, তারপরই দু'হাতে খামচে ধরলে কনের মুখ আর কাঁধ—বার কয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করে ঢলে পড়ে গেল। এরপর লছমনিয়াকে কেউ সাগাই করতে সাহস করলে না। বললে—সাপিন্কন্যা। মেয়েটাও বাপকে বললে—আবারও যদি সাগায়ের ব্যবস্থা কর, তবে আমি হয় দরিয়ায় ঝাঁপ দেব, নয় তো জহর, মানে বিষ খাব।

বাপ বলেছিল—তবে শেষে তোর হবে কি? আমি যখন মরব—তখন—

লছমনিয়া বাপের কথার মাঝখানেই বলেছিল—তুই থাম বুঢ়োয়া, মনিববাড়ি রয়েছে, বাবু জীওনলালজির ক্ষেতি আছে, খাটব খাব। ক্ষেতে খাটবার তাগদ গেলে

জাওনবাবুর নাতি হবে পুতি হবে—ওহি লোকের খিদমদ খাটব—জীওনবাবুজির বহুজির সঙ্গে ঝগড়া করব আর বলব—আলবাত খেতে দিতে হবে—দাও খেতে।

এরপর থেকে জোর করে সে বাপ অকলুর সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে আসত। সমানে খেটে যেত। অকলু বসত মধ্যে মধ্যে, ক্লান্ত হলেও বসত, না হলেও বসত—মজদুরির নিয়ম ওটা। তাগদ তোমার যতখানি ততখানি কখনও খাটবে না। না। খাটতে নাই। যা তোমার আয় তাই যদি তুমি খরচ করে দাও, তবে আর তোমার থাকবে কি? তাই মজুদুরেরা ঠিক এক-একটা সময় অন্তর বসে জিরিয়ে নেয় খানিকটা। তবে ফুরানের কাম যদি হয় তবে সে আলগ্ মানে আলাদা কথা। লছমনিয়া কিন্তু বসত না, সে খেটেই চলত উদয়াস্ত। বসতে বললে বাপকে বলত—বাবু জীওনলালের চেয়ে আমাকে কাম বেশি করতে হবে। আমি দেখিং. দেব কি বাবুজির চেয়ে আমার তাগদ বেশি।

খিল-খিল করে হাসত সে।

মাটিওলা বললে—তা বলে মনে কর না বাবুজি কি মুসহর মেয়েটার মতলব ছিল কিছু। কি মেওয়ালালের মনে কোন পাপ ছিল। আমি তোমাকে সূরয নারায়ণের হলপ নিয়ে বলতে পারি যে দু'জনেরই ভিতরটা তখন সূর্যের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল, গঙ্গাজির পানির মতই পবিত্র ছিল। আসল ব্যাপারটা ছিল কি জানো? এই যে গায়ের জোরের পাল্লা দেওয়া, এটা ওদের দু'জনেরই সেই ছেলেবেলা থেকেই চলে আসছে। লছমনিয়া ছিল বয়সে বড়, মেওয়ালালের ছেলেবেলার সঙ্গী, ফল মাকড়—এটা ওটা, এই ধর—রঙিন কাঁচের টুকরো, কি গঙ্গাজির কিনারায় বালুর ভিতরের ঝিনুক—এই নিয়ে বহুবার শক্তির প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছে, ওটা ওদের একটা খেলা ছিল। নেহাতই খেলা।

একটু থেমে সে বোধ হয় ভেবে নিলে কিছু। তারপর আবার বললে—আর জীওনলালের তখন এসব খেয়ালই ছিল না। দেখতে অবশ্য সেও তখন জোয়ান হয়ে উঠছে, হাতের গুলি ফুলে উঠেছে, বুকের দু'পাশে দু'খানা যেন পাথরের চাঁই দেখা দিয়েছে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ঘাসে নতুন ডগার মত গোঁফ দেখা দিতে শুরু করেছে—কিন্তু ও খেয়াল জাগেনি। ওর এক খেয়াল ক্ষেত! ক্ষেত-ক্ষেত আর ক্ষেত। ক্ষেতে কাজ নাই তবু সে বসে থাকত খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে—আপন মনেই পিষত—আর গঙ্গাজির জলের দিকে চেয়ে দেখত।

জীওনলালের বাপ এতে খুসি ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল ছেলে 'লিখাপঢ়া' শিখে মুনশির কাজ করে, আদালত কি জিমিদারি কাছারি কি কোথাও কলম চালায়। কিন্তু জীওনলালের মগজ ভাল ছিল না। বাপের অনেক চেষ্টাতেও তার কিছু হয়নি, দশ বছর বয়সেই সে লেখাপড়া ছেড়েছিল—বাপও হাল ছেড়েছিল। মনে দুঃখ থাকলেও

সে কথা সে বলত না কারও কাছে। তবে জীওনলাল জানত। এই কারণেই তার বাপ ইদানীং ক্ষেতির ধার দিয়ে হাঁটে না। বসে বসে তুলসীদাস পড়ে, পূজা অর্জনা করে, ক্ষেত থেকে ছেলে ঘরে ফিরলে একেবারে মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে—দুঃখের হাসি, আবার কাজে মন দেয়।

জীওনলাল এতে দুঃখ পায়। সে বুঝতে পারে না বাপের এত আক্ষেপ কেন? কি অন্যায় সে করছে? দুঃখ যত পায় তত তার ক্ষেতের নেশা বাড়ে। এক-একদিন ঘরে ফিরে বাপের ওই হাসি দেখে আবার চলে যায় ক্ষেতের দিকে। রাত্রে সে অন্ধকারেই হোক আর জ্যোৎস্নাতেই হোক বসে থাকে ক্ষেতের মধ্যে।

বাবুজি, গঙ্গার কিনারায় আমির জমিদার এরা বসে হাওয়া খায়, গঙ্গাজির বুকে ঢেউ ওঠে, পাল তুলে দিয়ে নৌকা যায়—ব'সে ব'সে দেখে; জ্যোৎস্নারাত্রে দরিয়ার জলে ঝিকিমিকি ওঠে—তাহার বাহার দেখে একদম বিভোর হয়ে যায়। তুমিও তো আমির লোক, তুমিও নিশ্চয় দেখেছ। কিন্তু জীওনলাল ওই ক্ষেতির মধ্যে বসে গঙ্গাজির যে শোভা দেখেছে তা তোমরা দেখনি; যে আরাম পেয়েছে সে তোমরা পাবে না।

তার চোখের সামনে চাঁদের আলো, দরিয়ার জল—এর সঙ্গে মিশে ভাসত তার ক্ষেতির ফসলের শোভা। একদম দুধবরণ জ্যোৎস্নায় যখন গঙ্গাজির পানি তার কিনারা দূর—দূর—বহুত দূর—হো-ই আকাশের কিনারতক ঝলমল করত বাবুজি, যখন লোকের মনে হত ইন্দ্রদেওকে হাতি শুঁড় দিয়ে চাঁদের কলসি ধরে ধরতি মায়িকে দুধে আস্নান করাচ্ছে, তখন জীওনলাল দেখতে পেত, শুধু দুধ নয়, দুধের সঙ্গে খুব অল্প সবুজ কিছুর আমেজ যেন মিশে রয়েছে। তার ক্ষেতির ফসলের সবুজ রঙ দুনিয়ার সব-কিছুর মধ্যে দেখতে পেত যেন। দেখত আর দু'হাতে মাটি ডলত। আঃ—সে যে কি মোলাম—কি মিঠা—কি ঠাণ্ডা, সে তুমি বুঝবে না বাবুজি! কতদিন ওই ক্ষেতির সেই মিঠে মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়েছে জীওনলাল। এ একটা নেশা! ওই ক্ষেতি তার ছিল স্বরগ বাবুজি! যেমনই হোক না কেন দুঃখ—ওখানে গেলেই সে দুঃখ জুড়িয়ে যেত।

বাবুজি, রতনলাল যেদিন হঠাৎ মারা গেল সেদিন জীওনলাল দুনিয়ায় একা। মা নাই, ভাই নাই, বহিন নাই—কে তাকে সান্ত্বনা দেবে? জীওনলালকে সেদিন সান্ত্বনা দিয়েছিল তার ওই ক্ষেতির মাটি। বাপের কাজকর্মে সেরে শ্মশান থেকে ফিরে সে বাড়িতে থাকতেই পারলে না, সন্ধ্যার পর এসে ওই ক্ষেতির মধ্যে বসে রইল। জুড়িয়ে গেল তার মন। ভুলে গেল সে বাপের কথা। জীওনলালকে মন্দ যদি বলতে চাও এজন্য বল, কিন্তু এ কথাটা সত্যি বাবুজি! তার চোখের সামনে ক্ষেতে গঁহুর চারা বের হ'ল, বাতাসে দুলতে লাগল, কৌয়া এল—আরও কত পাখি এল ক্ষেতের ফসল খেতে, সে তাদের তাড়ালে, তারপর ফসল তার চোখের সামনে পেকে উঠল, অকল্লু,

তার বেটি আর জীওনলাল সে ফসল কাটলে, লছমনিয়া মুখ টিপে হেসে বলল—গঁহু নেহি, এতো মেওয়া হ্যায়!

সেদিনের কথা আজও জীওনলালের দিব্যি মনে আছে বাবুজি! সেদিনও মাঝরাত্রে অকলু আর লছমনিয়া—এরাই এসে ক্ষেত থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরে বাপরে! আজ তোমার বাপ মারা গেল, তার আত্মা এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে এই ক্ষেতির চারিপাশে ঘুরছে না?

অকলু শুধু হুঁ পুরে গেল।—হুঁ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিল। রাত্রে সে ঘুম থেকে উঠল—চোখ বন্ধ করেই হাঁটে।

একটু থেমে একটা বিড়ি খেয়ে মেওয়ালাল বললে—বাবুজি, তুমি তো শুনেছি লিখাপঢ়ি করেছ অনেক। এই গলির লোকদের কাছে আমি শুনেছি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বল তো এহি দুনিয়ামে কোন্ জিনিসকে জানা সবচেয়ে শক্ত?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মেওয়ালাল আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললে—মানুষকে বাবুজি! গাছপালা জানোয়ার ওদের সঙ্গে সামান্য দিন কারবার কর—ঠিক জেনে যাবে ওদের। ওদের মেজাজ চালচলন সব ধরাবাঁধা। মানুষ—আরে বাপরে বাপ! নিজেকেই নিজে জানতে পারে না—তা পরকে জানবে কি করে? এই জানা হয় কি করে জানো? জানা হয় দুঃখের সময়। তোমার যখন খুব দুঃখ হবে বাবুজি—যখন তোমার মনে হবে বুকের ভিতরটা থেকে কলিজা ছিঁড়ে গেল—তখন ঠিক তুমি দুনিয়ার মানুষকে চিনতে পারবে। নিজের মনের খবরও জানতে পারবে সেই দিন। তোমার যে এই শরীর বাবুজি—এই যে তোমার জনম—এ তো একটা ক্ষেতি। তোমার মন বসে বসে এতে বীজ ছড়াচ্ছে। কিন্তু বীজ মাটিতে পড়লেই তো গাছ হয় না—ফাটে না! বীজ ফাটে কখন জানো? যখন আকাশে ঘনঘটা আঁধিয়ার করে মেঘ আসে, দুনিয়ার চোখ ঝল্‌সে দিয়ে যখন বিজলী চমকায়, কড়কড় আওয়াজে যখন তিন লোক কাঁপিয়ে দেওতার বজ্জর হেঁকে ওঠে, ঝাপট মেরে ঝড় উঠে যখন সব ওলট-পালট করে দিয়ে যায়, ধরতি তখন থরথর করে কাঁপে—কিন্তু তখনই তার সারা বুকময় মনের আনন্দে ফাটে লাখো লাখো বীজ। যেসব বীজ বাবুজি মাহিনার পর মাহিনা মাটির অন্দরে শুকায়ে ঝলসেছে—কোন্ পাত্তা কেউ জানত না—ওই যে ঘনঘট, ওই তার লগন, ওহি, লগনমে তারা নিজেকে ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের পাত্তা জানিয়ে দেয়। তারপর যে বীজের যেমন তেজ যেমন তার গোড়ার মাটির সঙ্গে মিল—মিতালি—সে তেমনি বাড়বে।

বাবুজি, অকলু মুসহরের বিটিয়াই বল আর জীওনলাল কি মেওয়ালালই বল—দু'জনের কেউ না জানত নিজেকে, না জানত কেউ কাউকে। হঠাৎ একদিন তুফান

এল জীওনলালের নসিবে। আর সেই তুফানকে আপনার খেয়ালে মুসহরের বিটিয়া আপনার মাথায় টেনে নিলে।

রতনলালের মৃত্যুর মাস-চারেক পর, সেটা অগহন মাহিনা বাবুজি, আমার ক্ষেতে তখন গম, যব, আলু, মটর ছোলার বীজ একদফা ফেটে মাটির উপর বেরিয়ে পড়েছে, আশপাশের দিয়ারা জমিন তখনও সব সাদা, শুধু চষা হয়েছে মাত্র—আমার জমিনে সবুজ রঙ ফুটেছে। সারাদিন ক্ষেতে পাটকাম করে আমি বাড়ি ফিরে চুলাতে আগুন দিয়েছি, দিনে খেয়েছি সত্তু, রাত্রে দু'টি ভাত পাকাব, থারিতে চাওর ভিজিয়ে দিয়েছি, কিছু আনাজ নিয়ে কুটতে বসেছি, খাওয়া-দাওয়া সকাল সকাল সেরে যেতে হবে জিমিদারের কছহারি। সেখানে বাবুজি মস্ত হাঙ্গাম।

তুমি তো বাবুজি পণ্ডিত আদমি, দেশকে কানুন তো তোমার সব জানাই আছে, বাপজি আমার ফৌত হয়েছে—এখন জিমিদারের দপ্তরখানায় বাপজির নামের বদলে আমার নাম কায়েন করতে হবে; সেলামি লাগবে—কেননা, জমিনের মালেক তো জিমিদার, জিমিদার আমাকে রায়ত মেনে নেবে—সেলামি খাজনা নিয়ে আমাকে দাখিলা দেবে তবে জমিন হবে আমার। তবে জিমিদারেরা বাপের বদলে ছেলেকে রায়ত মানতে না বলে না। ভগোয়ানকে বিধান বাপের স্বভাব পায় ছেলে, চেহারা পায় ছেলে, বাপের রোগ পায় ছেলে, বাপের দেনা শোধ করে ছেলে, তখন বাপের ক্ষেত-খামার এই বা ছেলে পাবে না কেন? জিমিদারে এটা মানে। তবে তারা যদি ইচ্ছে করে বাবুজি, তবে না মানতেও পারে। আদালত থেকে 'লুট্রিশ' জারি করে হুকুম দিয়ে তোমাকে উচ্ছেদ করতে পারে। 'ওহি লিয়ে' জিমিদারের কছহারিতে যাব, তহশিলদার এসেছেন। কিছু ঘিউ তৈরি করে রেখেছি। তহশিলদারের নজরানা ৷ ঠিক করে রেখেছি। আজ রাত্রেই কাজটা সেরে নেব। এর আগে কয়েকবারই গিয়েছি। জিমিদারের বাড়ি বিহার শরিফ—তা জিমিদার বলেছেন—হবে। তহশিলদারের সঙ্গেও দেখা সেখানে হয়েছিল—তিনি বলেছেন—হবে।

কুটনো-কাটা শেষ করে থালায় ভিজানো চাল ধুয়ে শেষ করেছি এমন সময় বাবুজি আমার নসিবে তুফানের প্রথম ঝটকা যেন আচমকা মারলে ধাক্কা। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল লছমনিয়া। আমি চমকে উঠলাম। অকলুর ক'দিন বেমারি হয়ে বুড়ো মানুষ অল্পেই ঘায়েল হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে—ক'দিন। তবে কি—? আমি বললাম—লছমনিয়া—?

লছমনিয়া বললে—ঝটসে এস। আমি আস্নান করে খানা পাকাচ্ছি, মুসহরের বেটি সে কথা খেয়ালেই আনলে না, আমার হাত ধরে টানলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অকলু—

—নেহি—নেহি। ক্ষেতিমে—। ক্ষেতে—আমাদের ক্ষেতে দু'জন কালা সাহেবলোক—সঙ্গে আর্দালি। সে হাঁপাতে লাগল—ছোট চোখ দু'টো ঝক্‌মক্ করতে

লাগল। দম দিনয়ে বললে—ক্ষেতের ফসল মাড়িয়ে তেকাঁটার উপর যন্তর চাপিয়ে দেখছে আর জরিপের শিকলি টানছে—ইধরসে উধর। হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা আবার—।

দাঁতে দাঁতে সে কিসকিস করে উঠল।

বাবুজি, ওই কালা সাহেবলোকের একজন লছমনিয়াকে মন্দ কথা বলেছে। সে একে মুসহরের মেয়ে, তার উপর সে লছমনিয়া—পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত তেজ—সে উত্তরে গাল দিয়েছে। সাহেবটা হাত চেপে ধরতে গিয়েছিল, এক ঝাঁকিতে হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

খবর শুনে আমার নখ থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত যেন বর্ষার দরিয়ার পানির মত ছুটতে আরম্ভ করলে। আমি লাফ দিয়ে পড়লাম। লছমনিয়া বললে—দাঁড়াও।

সে মাচান থেকে দু'গাছা লাঠি পেড়ে নিয়ে বললে—অব চল।

জমিনের কাছে এসে বাবুজি আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। শুধু সাহেবরা নয়—জমিদারের তহশিলদারও বরকন্দাজ নিয়ে সরজমিনে হাজির হয়ে গেছে। ধমক দিয়ে এক হাঁক মারলে তহশিলদার—খবরদার! তারপর বললে—আর এক পাও যদি এগুবি চাষার বেটা, তবে তোকে গুলি করে মেরে এই জমিনের মধ্যে পুঁতে দেব।

মেওয়ালাল এক লহমায় পাথর বনে গেল। লছমনিয়া বলতে গেল, হুজুর—আমাদের ক্ষেতের ফসল—

তহশিলদার বললে—নেহি। এ জমি এখন জমিদার সরকারের খাস জমি হয়েছে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে এ জমি জাহাজ কোম্পানিকে বন্দোবস্ত কিয়া যায়েগা। কোম্পানিকে হিঁয়া টিশন বনেগা।

বরকন্দাজেরা ততক্ষণে ক্ষেতের চারিদিকে খুঁটা পুঁতে দখলের লাল নিশান উড়িয়ে দিলে। একটা খুটাতে একটা কাগজে লেখা নোটিশও ঝুলিয়ে দিলে।

আমার নসিবের আকাশে চারিদিক ঝলতে দিয়ে বিজলী ঝলকে উঠল—আমার তামাম দুনিয়া কাঁপিয়ে কড়্কড়্ ক'রে বাজ ডেকে উঠল। আমার কি হয়েছিল, আমি তখন কি করেছিলাম জানি না, লছমনিয়াই আমাকে দু'হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে বললে—চলে আও।

বাবুজি, ঠিক এই সময়েই তুফানের এই শুরুতেই বোধ হয় লছমনিয়ার বুকের অন্দরে বীজ ফাটল।

বাড়িতে ফিরে আমি যত কাঁদলাম সে তত কাঁদলে। মেওয়ালালের দুঃখে সে আগেও কেঁদেছে, কিন্তু এমন করে তো কাঁদেনি। 'শাওন ভাদো' মাসের মেঘ যেমন 'বর্খায়' বাবুজি, বাতাস না, বিজলী না, আওয়াজ না, শুধু ঝিরঝির ঝিমঝিম—তেমনি ভাবে, শুধু দরদর করে জলই ঝরে পড়ল তার চোখ থেকে, সারা রাত।

গঙ্গাজির বুকের উপর দিয়ে কলের জাহাজ চালায় যেসব কোম্পানি, তাদেরই এক কোম্পানির জাহাজ চলত আমাদের গাঁওয়ের সামনে দিয়ে। আমার গাঁওয়ের দেড় কোশ উপরে ছিল জাহাজ কোম্পানির টিশন-ঘাট। ওই টিশন-ঘাট আজ কয়েক বছর—বোধ হয় পাঁচ-সাত বছর ধরে ভাঙতে শুরু করেছে। কোম্পানি বাঁশ, কাঠ, ইট, পাথর বহুত ঢেলে রুখতে চেষ্টা করেছে গঙ্গাজির জলের তোড়ের মুখ। কিন্তু হাওয়ার মুখে খড়ের কুটোর মত সেসব ভেসে গেয়েছে। বর্ষার সময়—পনের রোজ বিশ রোজ বাদ এক-একদিন চাঙড় ধ্বসে পড়েছে। এমনিভাবে প্রতি বছরই খানিকটা সরে সরে শেষপর্যন্ত এ বছর টিশন-ঘাট সরিয়ে ফেলার মতলবই পাকা করেছে কোম্পানি। এর জন্যে এই বছরে বর্ষার সময় কোম্পানির বড়া-ভারী মগজওলা সাহেবলোক—হর-রোজ জাহাজে করে গিয়েছে আর এসেছে। দেখে গিয়েছে, কোন্ জায়গায় নতুন টিশন বানালে পর নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এদিকে গঙ্গাজির কিনারের গাঁওয়ের যত জমিদার, কোম্পানির সাহেবলোককে বহুত বহুত ভেট পাঠিয়ে, জাহাজের খানাটেবিলে খানা খাইয়ে, দামি দামি বিলাইতি মদ খাইয়ে আপন-আপন সীমানায় টিশন বানাতে রাজি করবার কোশিক অর্থাৎ চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত জিত হয়েছে মেওয়ালালের জমিদারের। নসিব, সবই নসিব। মেওয়ালাল এই সার বুঝেছে। নইলে ঠিক যখন টিশন বসাবার উদ্যোগ হচ্ছে—তখনই মেওয়ালালের বাপ মরে গিয়ে—একদম কিনারার পাঁচ বিঘা দিয়ারা—তার খাস হয়ে যাবার সুযোগ হবে কেন বল? এই জন্যেই এতদিন তারা জমিনটা জীওনলালের নামে পত্তন করে নেয়নি।

দুনিয়া আমার আঁধার হয়ে গেল বাবুজি। ছেলের মা ম'রে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মেওয়ালাল ওই দুঃখটা জানত, ছেলে বয়সে যখন মা তার মারা গেল—তখন ঘরদোর খেলনা—খাওয়া—সব কেমন বিস্বাদ বেরং হয়ে গিয়েছিল। কিছু ভাল লাগত না, শুধুই কান্না পেত। আঠারো বছরের মেওয়ালালের আবার সেই হাল ফিরে এল। তার জমি—সকাল থেকে সন্ধে ইস্তক যে জমিতে সে বসে থেকেছে, বসে থেকেছে, বসে থেকেছে, শুধু ইটের টুকরো—পাথরের কুচি বেছে ফেলেছে, কোদাল দিয়ে একবার কেটেছে—আবার কেটেছে, বারবার কেটেছে, মুঠোতে ধরে ভুরভুর করে গুঁড়ো করেছে,—আঃ বাবুজি, মেওয়ালালের সে স্বর্গ—দুঃখ ভুলবার জায়গা। বাপ মরে গেলে সেখানে গিয়ে বসে থেকে সে সান্ত্বনা পেয়েছে, বাবুজি, খুব যখন 'শির দুখিয়েছে' মাথার যন্ত্রণায় যখন অস্থির হয়েছে সে—তখন—

উপরের দিকে হাত তুলে মাটিওলা বললে—সূরয নারায়ণের নাম নিয়ে বলছি বাবু—ঝুট বলছি না। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেওয়ালাল ওখানে গিয়ে বসলে—যন্ত্রণার উপশম হত। গঙ্গাজির হাওয়া তো বটেই কিন্তু তার ক্ষেতের শোভায় চোখ

মন তার জুড়িয়ে যেত, বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। ঘুম ভেঙে যখন উঠত—তখন বিশ্বাস কর বাবুজি—মাথার যন্ত্রণা এতটুকু আর থাকত না।

সেই জমি হারিয়ে সে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল। সমস্ত রাত্রি তার থেকে একটু দূরে বসে রইল ওই মুসহরের সাপিনকন্যা। সেও কাঁদলে অনেক। মধ্যে মধ্যে অনেক সান্ত্বনা দিলে সে। বললে—এমনি ছাড়বে কেন জমিন? আদালত কর। বলো হাকিমকে—হুজুর এই জমিন কত কষ্ট করে তোমরা হাসিল করেছ। বিলকুল কথা বলে—বলো—অব হুজুর বিচার কিজিয়ে—ইয়ে জমিন কিস্‌কা হ্যায়?

বাবুজি, আমি হাসলাম, কাঁদতে কাঁদতেই হাসলাম মুসহরের বিটিয়ার কথা শুনে। কি করে জানবে সে কানুনের প্যাঁচ! ভগোয়ান করলে ধরতির সৃষ্টি, রাজা হাতি ঘোড়া হাতিয়ার পল্টন নিয়ে সেই ধরতির মালিক হল। সে আবার সেই মাটি দিলে জমিদারকে। এখন বাপের দাদার রোগই তোমাকে বইতে হোক—আর দেনাই শোধ করতে হোক—আর বাপের চেহারাই তোমার মধ্যে দেখা যাক, তার সঙ্গে মাটির মালিকানির সম্পর্ক কি? রাজার হাতিয়ারে ওখানে বাপ-বেচার সম্বন্ধ খচাখচ কেটে দিয়েছে। ও কানুন আলাদা! মুসহরের মেয়ে, সে কানুন তুই বুঝবি না।

লছমনিয়া ভোরবেলা উঠে চলে গেল। সমস্তটা দিন এল না। মেওয়ালাল গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল তহশিলদারের কছহারিতে। কিন্তু মিথ্যে পড়ে থাকা। ফিরে আসতে হল অনেক গালিগালাজ খেয়ে—বেওকুফ! মুরুখ! মুনশিকে বেটা চাষা! উল্লু কাঁহাকা! আমি কি করব? তুই এতদিন ফেলে রাখলি কেন?

সন্ধ্যায় লছমনিয়া ফিরে এস বললে—জোড়ো মামলা। জুড়তেই হবে। আমি গিয়েছিলাম কোশভর দূরের গ্রামের এক বুড়ো মুকতিয়ারের মুনশি সাহেবের বাড়ি। সব বলেছি তাঁকে—তিনি বলেছেন আলবত জিত হবে।

তাই করলাম। না করেই বা করি কি? মনের ভেতরটা যে খাক হয়ে যাচ্ছিল। আগুন লেগে গিয়েছিল। চোখের ঘুম গিয়েছে সে আগুনে পুড়ে, পেটের খিদে গিয়েছে ছাই হয়ে তাতেই, মনে হত এই আগুন লাগিয়ে দিই জমিদারের কছহারিতে, তহশিলদারের ঘরে, জমিদারের পাকা বাড়িতে, জাহাজ কোম্পানির জাহাজে—তামাম দুনিয়ায় আগুন লাগাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা তো পারি না। কাজেই একটু কিছু করে এ আগুনের দাহ থেকে বাঁচতে হবে। বাড়ির যা ছিল রূপার গহনা বিক্রি করলাম, দায়ের করলাম মামলা।

ওদিকে কোম্পানি এসে আমার ক্ষেতের উপর স্টেশন তৈয়ারি করবার মালমশলা এনে ফেললে। জাহাজের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে এল একটা টিশন, সেটাকে আমার ক্ষেতের কাছে এনে, ক্ষেতটা কেটে ফেলতে শুরু করলে। নিয়ে এল একটা যন্তর। শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে ফেলে দেয়, রাক্ষসের মত হাঁ করে—তেমনি ধারাল লোহার দাঁত নিয়ে নদীর কিনারায় পড়ে একেবারে ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি মাটি গিলে—হাঁ বন্ধ করে উঠে

আসে, ফেলে দেয় পাড়ের উপর। কিনারা গভীর হতে লাগল। ওইখানে এনে লাগাবে ভাসা টিশনটাকে। উপরের জমি থেকে ফেলে দেবে একটা কাঠের তৈরি সড়কের মত লম্বা সাঁকো। পাড়ের উপরে পাকা ভিত করে তার উপর টিন লাগিয়ে বানাতে শুরু করলে মুসাফেরখানা। আর পুঁতলে মাস্তুলের মত লম্বা চার-চারটে শালের লকড়ি, তার মাথায় কপিকল দিয়ে ঝুলিয়ে দিলো মস্ত মস্ত আলো। কিনারা থেকে আধা দরিয়া পর্যন্ত আলো ঝলমল করতে লাগল দিনের মত, সেগুলোকে ঘিরে উড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা। সিধা সড়কের মত রাস্তা বানিয়ে দিলে কোম্পানি, গঙ্গাজির কিনারা থেকে গাঁওয়ের ভিতর হয়ে নিয়ে গিয়ে জুড়ে দিলে সরকারি পাকা সড়কের সঙ্গে। কোথা থেকে—কোথা থেকে আসতে লাগল হরেক হরেক চিজের দোকানি। বাবুজি, গাঁওকে বানিয়ে দিলে তিন-চার মাহিনার অন্দরে ছোটোসে একটা গোলগঞ্জ। গাঁওয়ের আদমির সুখ বেড়ে গেল, যাদের জমি ছিল দিয়ারায়, তারা দাম পেলে কোম্পানির কাছে। তাদের তো বাপ ফৌত হয়নি বাবুজি! তারা ব্যবসা শুরু করে দিলে। অন্য অন্য লোক আনাজ নিয়ে চেপে বসে রইল, বিক্রি করতে যেতে হবে না গাঁওয়ের বাইরে। যারা গতরে খাটে তারা খাটতে লাগল কোম্পানির কারবারে, ইমারতে। বাবুজি, মুসহরটুলির পর্যন্ত হাল ফিরে গেল। গায়ে নীল কুর্তা চড়িয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তারা হল কুলি। মুসহরদের সর্দার জগনুর বেটাকে সাহেব ডেকে কাম দিলে, বানিয়ে দিলে মেট, জগনুকে বানালে সর্দার।

শুধু এক মেওয়ালাল—হতভাগ্য মেওয়ালাল ফকির বনে গেল একদিনে। বাবুজি, রাত্রি হলে ঘরে থাকতে পারত না সে, বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে—গাঁও ছেড়ে দূরে চলে যেত গঙ্গাজির কিনারায়-কিনারায়, সেখানে ছিল জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরনোকালের পড়ো ভাঙা ইমারত, কোন্ রাজার নাকি বাড়ি ছিল, একঠো ছোটাসে গড় ভি ছিল, সেসব ভেঙে গিয়েছে—জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, সেখানে লোকে কেউ যায় না, বলে পিরেত লোক ওখানে বাস করে, ওখানকার ভাঙা ইমারত পাহারা দেয় ওখানকার একটা পত্থলের টুকরো, যে সরায় তার মুখে লহু উঠে সে মরে যায়, পাছে পায়ে লেগে একটা পত্থল সরে যায় এক অঙ্গুলি, তাই লোকে যায় না সেখানে—যায় শুধু একদিন গঙ্গাজির পূজার দিন,—সেখানে যায়, সেখানে আছে গঙ্গাজির একদম কিনারায় পত্থলের এক পাঁচিলের মত এক বেদী, সেই বেদীর গায়ে আছেন এক মহাদেওজি গঙ্গাধর মহাদেও, যিনি নাকি মাথার জটায় ধরে আছেন গঙ্গামায়িকে—সেই ভগোয়ান শিবজিকে পূজা দিতে। পূজা দিতে হয় বাবুজি—ফুল—বেলের পাত্তা—ফলমূল—আর চাপাতে হয় বাবা মহাদেওজির পায়ের তলায় জনা হি এক ঝুড়ি গঙ্গাজির মাটি। সারা বরিসের অন্দরে—আর কোনও আদমির ওখানে যাবার একতিয়ার নাই। মেওয়ালালের বুকে আগুন জ্বলে বাবুজি, দুনিয়ায় তার শান্তি নাই, সে তো জানের পরোয়া করে না—সে গাঁওয়ের ওই আলো, ওই বাজারের হাসিহল্লা সইতে না পেরে চলে যেত সেখানে।

মরণ'হয় তো হোক। বিশ্বাস কর বাবুজি, সে বাউরা আদমির মত ওই গঙ্গাধরজির আস্তানে—বুক চাপড়ে চাপড়ে কেঁদে বেড়াত—চিৎকার করে কাঁদত।

—হে গঙ্গাধরজি—মেরে জমিন! হে মহাদেওজি—মেরে ক্ষেত! হে দেওতা, মেরে জমিন! এক-এক সময় শুধুই চিৎকার করত—হে ভগোয়ান! হে ভগোয়ান! হে ভগোয়ান!

তারা কান্না শুনে গঙ্গার বুকে নৌকার মাঝিরা ভাবত পিরেত কাঁদছে। তার কান্নার আওয়াজে চমকে শেয়ালেরা ছুটে পালিয়ে যেত পাশ দিয়ে, হুড়ার চলে যেত গোঁ গোঁ শব্দ করে, মধ্যে মধ্যে আঁধারের মধ্যে দূরে দাঁড়িয়ে দেখত, তাদের চোখগুলো জ্বলত জ্বলজ্বল করে, বুনো বরাগুলো চরের মাটি খুঁড়ে কঁদ্ খেতে খেতে চমকে উঠত, তীরের মত ছুটে চলে যেত জঙ্গলের মধ্যে। মেওয়ালাল গ্রাহ্যই করত না সেসব। সে তখন সত্যিই পাগল হয়ে যেত।

মেওয়ালালজি! বাবু মেওয়ালাল!

এক মুসহরের বেটি লছমনিয়া জানত তার এই ঠিকানা—তার কলিজার অন্দরের এই হাল। মেওয়ালালের ক্ষেত-খামার চলে গেছে, মেওয়ালালের ঘরের যা কিছু ছিল, সেসবও গেছে, এমন লছমনিয়া অন্যত্র চাকরি করে। গোটা গাঁওয়ের লোক কাম করছে জাহাজ কোম্পানির কারবারে, শুধু মুসহরের বেটি ওপথে হাঁটে না, কে চাকরানির কাম নিয়েছে ভিন গাঁওয়ে, সেই বুড়া মুকতিয়ারের মুনশি বাবুর বাড়িতে; সকালে উঠে চলে যায়, ফেরে রাত্রে। ফিরে মেওয়ালালের বাড়ি এসে খবর দেয় মামলার। বুড়া মুকতিয়ারের মুনশি মামলার ভার নিয়েছে, সে নিজে তদ্বির করে; ওই জমিদার ওর উপর মুকতিয়ারের মুনশি বুড়ার ভারি আক্রোশ, মুকতিয়ারের কেনা এক জমিন জিমিদার মেওয়ালালের জমিনের মতই কেড়ে নিয়েছে কিছুদিন আগে; মুকতিয়ারের মুসশী বলে—জিমিদারের জিভ আমি নিকালকে ছোড়বে। লছমনিয়া ফেরে সেইসব আশার কথা নিয়ে। মেওয়ালালকে বাড়িতে পেলে বলে সেই সব কথা। না পেলে—গঙ্গার কিনারায়-কিনারায় চলে আসে একা পিরেতের মত; মুসহরের বেটির ভয় নাই, এক ডাণ্ডা হাতে চলে এসে ওই গঙ্গাধরজির জঙ্গলে ভাঙা গড়ের দেওয়ালারে উপর দাঁড়িয়ে ডাকে—মেওয়ালালজি! বাবু মেওয়ালাল!

মেওয়ালালের কানে ওর আওয়াজ এলে সে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়। মেওয়ালালের মনে হয়, ওই লছমনিয়া যদি দিন-রাত বসে থাকে তার পাশে, তবে তার বুকের এই দাহ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু বলতে পারে না সে কথা! লছমনিয়ার আওয়াজ শুনে সে এগিয়ে এসে সাড়া দেয়—লছমনিয়া!

—বাবু মেওয়ালাল! ছি মেওয়ালালজি! তোমাকে কত বারণ করি, তবু তুমি এসেছ এখানে? হররোজ আসছ! আমার কথা শুনছ না তুমি? বাবু সাব—এখানে—।

মেওয়ালাল হাউহাউ করে কাঁদে। লছমনিয়া তার হাত ধরে টেনে পাথরের দেওয়ালের

উপর বসায়; নিজের আঁচলখানা মেওয়ালালের হাতে দিয়ে বলে—নাও চোখ মোছ। তারপর বলতে শুরু করে মুকতিয়ারের মুনশিবাবুর কথা। মেওয়ালালকে উঠিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যায়। বলে—মুকতিয়ার বলে, দেখে লেঙ্গে জিমিদারকে। পিচাশ. ঘড়িয়াল। এত বড় হাঁ মেলে দুনিয়ার রায়তের যথাসর্বস্ব পেটে পুরেও খিদে মেটে না। এবার আমি একটা লোহার শিক তাতিয়ে ওর মুখে পুরে দেব। পুড়িয়ে খাক করে দেব ওর পেট' খিদে ওর খতম করে দোব।

আইনকানুনের কথা মুসহরের বেটী বুঝতে পারে না, সেসব বলতে পারে না লছমনিয়া। বলে—তোমাকে একদফে যেতে বলেছে বাবুজি!

মেওয়ালালের মুরুখ হলেও মুনশির বেটা, সে কানুন বুঝতে পারে কিছু কিছু। দিয়ারা জমির অবস্থা—রায়তি জমির চেয়েও খারাপ। ওর বন্দোবস্তি রায়তি জমির মত—ওইটুকু শক্তও নয়। তার আশা ছিল না। তবে মুকতিয়ারের মুনশি বলে দেশের হাল নাকি অনেক বদল হয়েছে। হোক না দিয়ারা জমিন। তিনপুরু তোরা এই জমিন ভোগ করছিস, এইটাই হল বড় কথা।

এমন এমন কথা বলে মুকতিয়ারের মুনশিবাবু যে, মেওয়ালালের ঠাণ্ডা রক্ত চনচন করে ওঠে! তার আশা হয়। নতুন কিছু বেচে আবার টাকা সংগ্রহ করে মুকতিয়ারের মুনশির হাতে এনে দেয়।

সেদিন লছমনিয়া মেওয়ালালের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললে—মামলা ফতে হো গেয়া বাবুজি—মেরে মেওয়ালালজি—!

—ফতে হো গেয়া! চিৎকার করে উঠল মেওয়ালাল! ও—হো! হো-হো! হায়! হায়! গঙ্গাজির বুকের উপর যাচ্ছিল একটা কেরায়া নৌকা, তার উপরে কারা কেঁদে উঠল। বোধ হয় যাত্রীরা ভয় পেয়েছিল। ভাঙা গড়ে পিরেতের কথা কদিন থেকে চারিদিকে খুব জোর ছড়িয়ে পড়েছে।

ওদের ভয়ের কান্না শুনে খিলখিল হেসে উঠল মুসহরের বেটি। পাঞ্জাবের রহনেওলীর মত চেহারা লছমনিয়ার গলার আওয়াজ তুমি শোননি বাবুজি—শুনলে বুঝতে পারতে! আঁধিয়ার যেন নেচে উঠল সে হাসির সঙ্গে!

সে বললে—জিমিদারের তহশিলদার আজ নিজে এসেছিল মুনশিজির বাড়ি। মামলা যদি আমাদের ফতে না হবে মেওয়ালালজি, তবে তহশিলদার এতটা পথ ভেঙে মুনশির বাড়ি আসবে কেন? সে নাচতে শুরু করে দিলে! সেই আঁধিয়ার রাত, কালো লছমনিয়া, মুসহরেরা তাকে বলে সাপিনকন্যা, বাবুজি, আমার আঁখের উপর আজও ভাসছে সে নাচন—সে আঁধিয়ার—; বাবুজি, আমি নাচতে লাগলাম। চিৎকার করলাম কত! লছমনিয়া খিলখিল করে হাসলে।

হঠাৎ কিনারা আলোয় ভেসে গেল। জাহাজ আসছিল। আমরা দুজনে একেবারে

জঙ্গলে ভরা পাথরের যে মহাদেওজির আস্তান তার পিছনে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে ঢুকতে মানা আছে বাবুজি। মহাদেওজির 'ভূত-পিচাশেরা' সেখানটা পাহারা দেয়। কিন্তু বাবুজি, মহাদেওজির মন্দিরের চূড়ার উপরেও বীজ ফেটে গাছ গজায়, বীজ যে তখন ফেটেছে ওদের বুকের মধ্যে! এইখানে সেই ভূত-পিরিতে ভরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে মেওয়ালালের হাত চেপে ধরে হঠাৎ খুব চাপা গলায় বললে—মেওয়ালালজি!

গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ছোট একটা টুকরো ছটা তার মুখের উপর পড়েছিল। সে মুখের চেহারা দেখে মেওয়ালালের দিশা হারিয়ে গেল, সে যা করলে বাবুজি—তা তার করা উচিত হয়নি, সে বাবুজি—পাগল হয়ে গেল বোধ হয়, সে লছমনিয়াকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলে। মুখে শুধু একটি কথা সে বলতে পারলে—পিয়ারী!

অদ্ভুত বাবুজি মেয়েজাত! লছমনিয়া কথা বললে না—বার্তা বললে না, কাঁদতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সারাটা রাত কেটে গেল। সকাল হয়ে গেল। সূরয় নারায়ণের ছটা ঝলক দিয়ে উঠল সামনে পুরব দিকে! চোখে আলো জেগে মেওয়ালাল দেখলে লছমনিয়া নাই। সে ভয় পেল ভূত পেরেতের এই আস্তানায় কি হল তার? 'দানা কি দইত' তুলে নিয়ে গেল নাকি?

—মেওয়ালাল! কোথা থেকে ডাকলে লছমনিয়া।

—লছমনিয়া!

দেখ তাজ্জব—চলে আও! মাটির ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে লছমনিয়ার!

—কাঁহা—কোথায় তুই?

—সামনে দেখ একটু সড়ঙ্গ, নেমে এস—

—সুরঙ্গ?

সত্যই সুড়ঙ্গ, একখানা পাথর আধখান হয়ে ভেঙে গিয়েছে; একটা প্রকাণ্ড বটগাছের মোটা ঝুড়ি—পাথর ফাটিয়ে নেমে গিয়েছে নিচে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লছমনিয়া। সুড়ঙ্গ অন্ধকার নয়—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লছমনিয়াকে! সে বললে—নেমে এস বটের ঝুরি ধরে।

তাজ্জবই বটে বাবুজি! একটা ফাঁপা সুড়ঙ্গ, জলের কাদায় থিকথিক করছে; সামনে এক পাথরের দেওয়াল, তা থেকে একটা পাথর আধখানা খসে ঝুলছে, সেই ফাঁক দিয়ে আলো এসে লছমনিয়ার উপর পড়েছে। লছমনিয়া দেখালে আঙুল দিয়ে—দেখ!

দেখলাম, সূরয় নারায়ণের আলোর ছটা বাজিয়ে ঝকমক করে বেয়ে চলেছে দরিয়ার পানি!

মুসহরের বেটির চোখও ঝকঝক করছে—সে বললে, ভাল করে খুঁজতে হবে, এখানে নিশ্চয়ই অনেক টাকা আছে।

মেওয়ালাল শিউরে উঠে বললে—টাকার কাজ নাই লছমনিয়া, টাকা থাকলেই সেখানে হয় অজগর, নয় থাকবে যক্ষ।

সে বললে—যেই থাক, আগে থাকব আমি। আমি ওকে পাকড়াব। তুমি মারবে মাথায় ডাণ্ডা তার আগে এই দেওয়ালের আধভাঙা পত্থলটাকে ভেঙে, ফেলে দিতে। আলো চাই।

সেইদিন রাত্রেই সে এল দুই গাঁইতিয়া কাঁধে নিয়ে। মেওয়ালালের হাতে একটা দিয়ে বললে—পাকড়ো।

কিন্তু রাত্রের আঁধিয়ারে কাম হয় না। সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আলো দপ করে নিভে যায়। মুকতিয়ারের মুনশীর বাড়ির কাম সে ছেড়ে দিলে। ভোরবেলা থেকে পত্থলে গাঁইতিয়া চলতে শুরু হয়। বাপরে—সে কি শব্দ! যেন কামা দাগার শব্দ। কিন্তু আশ্চর্য, সুড়ঙ্গের বাইরে কিছু শোনা যায় না। দশ দিনে খসে পড়ল এক পত্থল, আর একটার আধখানা সরল। সেই আলোতে লছমনিয়া খুঁজতে শুরু করলে কোথায় টাকা! কিন্তু কোথায় টাকা? শুধু হিম হয়ে যেতে লাগল সর্বাঙ্গ! ওদিকে ভিতরে জল দিন দিন বাড়ছে! বর্ষা শুরু হয়েছে। সর্বাঙ্গে কাদা মেখে উঠে এসে একদিন লছমনিয়া বললে—নসীব মেওয়ালালজী! মিলল না! চল ঘর।

গঙ্গায় নেমে আস্নান করে দু'জনে দু'পথে ফিরলাম। গঙ্গায় সেদিন বান ডেকেছে—পাথরের দেওয়ালের ভিতে এসে ঠেকেছে লাল জল, ফেনা—খড়কুটো।

বাড়ি এসে সবে পৌচেছি বাবুজি—দেখি আদালতকে পিয়াদ এক লুটিশ হাতে দাঁড়িয়ে।—কি? কিসের লুটিশ? বুকটা ধড়াস করে উঠল বাবুজি?

পিয়াদা বললে—রতনলালের বেটা জীওনলালের এই বাড়ি কোরক হল।

—কোরক? কেন?

—মামলা করেছিল জিমিদারের সঙ্গে। মামলায় হেরে গেছে। তারই খরচার দায়ে কোরক করেছে—মামলার আগে কোরক, কেও কি—ওর তো আর কিছু নাই, বিক্রি করে পালিয়ে পাছে ফাঁকি দেয়—তাই আদালত এই হুকুম দিয়েছে।

—মামলায় হেরে গিয়েছে জীওনলাল?

হেসে পিয়াদা বললে—উজবুকেরা এমনি করেই হারে। সে তো দশ রোজ আগে রায় হয়ে গিয়েছে, মুকতিয়ারের বুঢ়া মুনশির সঙ্গে জিমিদারের আপোষ হল—ওর কোন্ জমিন জিমিদার নিয়েছিল—ফিরে দিলে—বাস—মুনিশবুঢ়া একদম গায়েব করলে নিজেকে, উকিল পেলে না টাকা, মামলা হল জিমিদারের মায় খরচা ডিকরি।

খুব একচোট হাসলে পিয়াদা হা হা করে—

জীওনলালও হাসলে—হা—হা—হা—হা করে ওরই সঙ্গে।

বাস্—একদম মগজ বিপড়ে গেল! জঙ্গলে বসে দিনরাত হাসতে লাগল। হা—হা—হা—হা! লছমনিয়া মুসহরকে বেটি ডাকলেও সাড়া দেয় না।

লছমনিয়া সেদিন ওর হাত ধরে টানতে শুরু করলে—বললে, হেসো না! এস। চোখ তার ঝকমক করছে। মুখখানা হয়ে উঠেছে কি-এক রকম!

ঝাঁকি খেয়ে মেওয়ালালের খানিকটা সম্বিৎ ফিরল, বললে—কি?

—দেখ! আও হামারা সাথ!

বাবুজি, ওই যে সুরঙ্গের মুখ—ওই মুখের কাছে এনে—দেখালে ভিতরটায় জলে থৈ থৈ করছে। শব্দ উঠছে হুড়—হুড়হুড়—হুড়! ওই পাঁচিলের পাথর সরেছে—তারই ভিতর দিয়ে ঢুকছে দরিয়ার তুফান।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ করছে থমথম, ছাইয়ের মত রঙ। ঝিকমিক করে বিজলি চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে বাবুজি গুম গুম করে—যেন পুলের উপর দিয়ে চলেছে ডাকগাড়ি তুফান মেল। দরিয়া তখন চলকে উঠছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। মেঘের বিজলির ইশারায় যেন চমকে চমকে উঠছে। মধ্যে মধ্যে উথলে ফেঁপে উঠছে—চলকে পড়ছে যেন! এক-এক সময় শব্দ উঠছে—প্রচণ্ড শব্দ। মাটি ধ্বসছে। পাড় ভাঙছে দরিয়া।

সারাটা রাত দু'জনে বসে রইলাম সেই গর্তের ভিতর মুখ রেখে। দেখতে কিছু পাই না—শুধু শব্দ শুনি হড়—হড়—হড়।

ভোর রাত তখন বাবুজি। ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে ওই বর্ষার মধ্যেই বটগাছটার তলায়। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যে একটা প্রলয়ের মত আওয়াজ—মনে হল আকাশের মেঘ ভেঙে বোধ হয় নেমে আসছে। চমকে উঠ বসল দুজনে। মেঘ নয় বাবুজি—ওই গঙ্গাধর মহাদেওজির পাথরের বেদী—ওর পাঁচিলটা। লছমনিয়া আমাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে টানলে—বললে, জলদি জলদি—ওঠ—গাছের ওপর উঠে পড়।

গাছের ওপর উঠে দেখলাম, তুফানের জলে ভরে গেল পুরনো গড়টা, গোটা দরিয়ার বাঁকা মুখ যেন ঘুরে সোজা হয়ে গেল, জল ছুটল তীরের মত। আরে বাপরে—সে কি জল!—সে কত জল! বাসুকি নাগ যেন লাখো ফণা তুলে ছোবল মারতে মারতে এগিয়ে চলল—গাঁওয়ের মুখে। ভেসে যাবে গাঁও।—হে ভগোয়ান।

নেহি। চীৎকার করে উঠল লছমনিয়া।—এ ধারে দেখ। হেসে উঠল সে।

দেখি ওই পাঁচিল ভেঙে গঙ্গাজির মুখ ঘুরে গিয়ে জাহাজের টিশন-ঘাট পড়ে গেছে মাঝ দরিয়ায়, আলোর খুঁটিগুলো উপড়ে পড়ছে, মুসাফেরখানার টিনের চালাটা ভেসে যাচ্ছে, ওই যে লোহার জবরদস্ত ভাসা-টিশন—তার মোটা শিকল ছিঁড়ে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছে—কোথায় চলেছে কে জানে!

আমিও এবার হা-হা করে হেসে উঠলাম। আমরা দু'জনে নাচতে লাগলাম ওই বটগাছের ডালে—ভূত আর প্রেতিনীর মত।

তিনদিন পর পুলিশের নৌকো এসে আমাদের গিরিপতার করলে। আমাদের কাণ্ড

জানাজানি হয়ে গেছে বাবুজি! জাহাজ কোম্পানির কলের নৌকো তদন্ত করতে এসে দেখেছে আমাদের, দেখে গেছে ভাঙা পাঁচিল। তার আগেও নাকি আমাদের দেখেছে জাহাজি আলোয়। গঙ্গাধরজির আস্তানের মুখে মস্ত বাঁক, ওই যে পাথরের পাঁচিল, ওতেই পানি ধাক্কা খেয়ে ঘুরে চলত, পাঁচিলের নিচে একটা চড়া পড়েছিল—পাতলা চড়া, বর্ষা ছাড়া জল ওখানে থাকত না, কিন্তু বর্ষরা সময় জল চড়া থেকে পাঁচিলের গায়ে এসে ঠেকত; তখন কোম্পানি চড়ার সীমানা বরাবর পুঁতে দিত খুঁটির নিশানা—সেই নিশানাকে পাশে রেখে জাহাজকে চলতে হত হুঁশিয়ারির সঙ্গে—না হলে জাহাজের তলা ঠেকে বেধে যাবে ওই চড়ায়। রাত্রে জোর আলো সামনে ফেলে সারং নিজে দাঁড়িয়ে দেখত জাহাজ ঠিক নিশানাকে পাশে রেখে চলেছে কিনা। বাঁকের মুখে আলোটা এসে বরাবর এসে পড়ত ওই ভাঙা গড়ের জঙ্গলে, সেই আলোয় সারং আমাদের কয়েকদিনই দেখেছিল, খালাসি লোকও দেখেছিল, তারা ভয়ও পেয়েছিল—পিরেত কি দানা-দৈত্যের খেলা! সারং দুরবিন কষে আমাদের চিনে, হেসেছিল। ভেবেছিল—। যা ভাবে বাবুজি মানুষ—তাই ভেবেছিল। ভাবতে পারেনি—এক জোয়ান আর এক জোয়ানি—দুজনে এই নিরালা ঠাঁইয়ে এসে গাঁইতিয়া চালিয়ে মহাদেওজির বেদীর পাথর খসাচ্ছে। তাছাড়া ওই দিন কেউ ভাবতে পারেনি যে, পাথরের পাঁচিলের পিছনে আছে এমন সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটা নাকি এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সিধা টানা ছিল আগে। এত সব যদি কোম্পানি জানত বাবুজি, তবে ওরা হুঁশিয়ার হয়ে যেত। তা হলে বন্দুক নিয়ে সান্ত্রী বসিয়ে রাখত বাবুজি। নিজে থেকে ওরা ওই পাঁচিলকে 'মেরাম্মত' করত। বড়া বড়া লালমুখ সাহেবলোক এসে সব দেখলে। ওহি যে কালাসাহেব—যে নাকি এসেছিল জরিপ করতে, টিশনের জাওগা দেখতে বাবুজি—ওর নোকরি ওহি কসুর লিয়ে এক কলমমে খতম হয়ে গেল।

আমাদের দুজনের মেয়াদ হয়ে গেল। বড়া আদালতে জুরি নিয়ে বিচার হল বাবুজি। তামাম দেশ ভেসে গিয়েছে। টিশনের পাত্তা পর্যন্ত নাই। বাবুজি, আমার দিয়ারা জমির বিলকুল মাটি গঙ্গাজি খেয়ে নিয়ে পেটে পুরেছে। সেখানে বিছিয়ে দিয়েছে মিহি বালুকে পথ। তার উপর দিয়ে চলেছে এখন গঙ্গাজি।

আমার সাজা হল পাঁচ বছর। লছমনিয়ার হল দু'বছর। সরকারি উকিল-সাব সাওয়ালে বললে—যে কাম করেছে তাতে ওদের ফাঁসিতে লটকে দেওয়া উচিত। কে'ও কি তামাম এক এলাকা বরবাদ করে দিয়েছে—দরিয়ার তুফান।

আমি মনে মনে বলেছিলাম সেদিন—দাও লটকে। কুছ আফশোস নেহি। জানো বাবুজি—জিমিদারের কছহারি গিয়েছে তুফানে, টিশন গিয়েছে, আওর বাবুজি—ওই যে মুকতিয়ারের মুনশি—যে বেইমানি করেছিল তারও বাড়িঘর—তামাম পড়ে গিয়েছে। আমার আর ফাঁসিতে লটকাতে আফশোস কি তখন?

আমার উকিল,—সরকার থেকে দিয়েছিল উকিল—আমি দিইনি, সে বললে—

কসুর খুব বড় তাতে আর ভুল কি? কিন্তু ওরা ও মতলবে পাথর সরায়নি। ওরা কি করে জানবে—এমন হবে? বড় বড় সাহেব-লোকের মগজে যা আসেনি—সে ওদের মগজে আসবে কি করে? ওরা সুড়ঙ্গ দেখে সেকানে খুঁজতে গিয়েছিল টাকা।

জজবাহাদুর আর জুরি লোক মানলে সে কথা। আর মেনে নিলে—লছমনিয়ার কসুর এতে কম। ভাবলে তারা—আমিই তাকে ভুলিয়ে এ কামে সঙ্গে নিয়েছি। ওকে দিলে দুবছর। আমি খুব খুশি হলাম। ভগোয়ানকে বললাম—এদের তুমি মঙ্গল কর। পরণাম করলাম—গঙ্গামাইয়াকে। পরণাম—তোমাকে লাখো পরণাম মাইজি। আমার উপর অবিচারের তুমি সাজা দিয়েছ। হাসতে হাসতে চলে গেলাম ফাটকে। মগজে আমার সাফ হয়ে গেল বাবুজি। পাচ বরিষ কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতে পারলাম না।

কি করে জানতে পারব বল? তখন যে আমি পেয়েছি। মিল গিয়া হামারা—কি বলছ বাবুজি? কি পেয়েছি? লছমনিয়াকে—পেয়েছি আমি। থাক না কেন সে আলাদা জেলে তবু তাকে পেয়েছি। এ এক মজার পাওয়া বাবুজি। কি করে পায় তা জানি না, তবে পায়। দিন-রাত ও আমার আঁখের সামনে থাকত। রাত্রে বাবুজি—আঁধিয়ারের মধ্যে ওর সঙ্গে সত্যি সত্যি কথা কইতাম আমি। অন্য অন্য কয়েদিলোক—আমাকে বলত, পাগল—বাউরা। আমি হাসতাম। হাসতে হাসতে একরোজ বেরিয়ে এলাম জেল থেকে।

হঠাৎ মাটিওলার চেহারা পালটে গেল। ভুল বললাম। চেহারা ওর আগেই পালটে গিয়েছিল। গল্প বলতে বলতেই পালটে গিয়েছিল। ওর বাঁকা ঘাড়টা যেন সোজা হয়ে উঠেছিল, ধনুকের মত মেরদণ্ডটা এক অস্বাভাবিক শক্তির টানে যেন ছিঁড়ে—সোজা হয়ে কাঁধের কুঁজটাকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মিলিয়ে দিয়েছিল পিঠের সঙ্গে; ঠেলে বেরিয়ে আসা বুক—স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে চওড়া দেখাচ্ছিল যেন একজন শক্তিশালী প্রচণ্ড মানুষ—যেন ওর ওই ভাঙাচোরা বিকৃত দেহ কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলছিল এতক্ষণ। চোখ দুটোয় দৃষ্টির মধ্যে যে শান্তশিষ্ট মানুষটি—অহরহ ভেসে থাকে জলের মধ্যে সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর মত—তার অস্তিত্বই ছিল না। গল্প বলতে বলতে সে দুই হাতে আমার তক্তপোশের সতরঞ্চি চাদর খামচাচ্ছিল অবিরাম।

সেই চেহারা আবার পালটে গিয়ে—ফিরে এল পূর্বের চেহারা। সেই ভাঙা মানুষ। জীওনলাল যেন আমার চোখের সামনেই হয়ে গেল মাটিওলা মেওয়ালাল। মাটির বস্তা মাথায় বয়ে—মাটির ভিতরের—কাচা-পাথরের কুচিতে কেটে—ক্ষতচিহ্নে ভর্তি হয়ে গেল, ঘাড়ে বস্তা বয়ে বসে ক্রমশ ঘাড়ের পেশি বেঁকে জমে—বেঁকে গেল, বুকটা ঠেলে বেরুল, বুকের পাঁজরা বেরুল, কাঁধের নিচে হাড় উঁচু হয়ে উঠে কুঁজ তৈরি হল। সুদীর্ঘকাল বৎসরের পর বৎসর মাটি বয়ে ক্ষেতের মালিক জীওনলাল

হয়ে গেল মাটিওলা মেওয়ালাল। চোখের দৃষ্টি গেল পালটে, হয়তো এই মহানগরের এই দীন কাজ করে করে—সেখানেও লাগল মাটির প্রলেপ—ঘোলা চোখে দীনতাভরা দৃষ্টি উঠল ফুটে' যাকে আমার মনে হচ্ছে—শান্তশিষ্ট এবং সুন্দর।

মেওয়ালাল বললে—ফাটক থেকে বেরিয়ে এলাম বাবুজি, মনে ঠিক দিয়ে নিলাম কি—গাঁওয়ে ফিরেই মুসহরের বিটিয়াকে নিয়ে দুনিয়াতে ভেসে পড়ব। গাঁওয়ে থাকব না, থাকতে পারব না, চলে যাব ওকে নিয়ে। জাতে ধরমে জলাঞ্জলি আগেই দিয়েছি—এবার ওর ঘরে—ওর রান্না—ওর থারিয়াতে—একসঙ্গে খেয়ে আমিও হয়ে যাব মুসহর। দুনিয়াতে ওই মুসহরের বিটিয়াই তো আমার সত্যি—আর সব তো আমার কাছে ঝুট। ওকে পেলেই আমি পেয়ে যাব তামাম দুনিয়ার মালিকানি! কিন্তু বাবুজি।

—কি? কি হল লছমনিয়ার? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সেও তখন আলগ দুনিয়া পেয়েছে আমারই মত। মুসহরদের সর্দার—জগনু—, সে হেসে বলল—তোমার লছমনিয়া সাহেবের বেটার মা হয়েচে। মেমসাহেব বন্ গিয়েছে। তার আগে বলেনি বাবু দুটো কথা। গাঁওয়ের কথা। দেখলাম বাবু নতুন গাঁও বসে গিয়েছে শহরের মত। সব ওই জাহাজ কোম্পানির দৌলতে বাবু। জাহাজ কোম্পানি আবার গড়েছে নয়া টিশন। বড়া ভারি টিশন হয়েছে এবার। বুঝেছ বাবুজি—মহাদেওজির আস্তানাকে আবার গড়েছে, লোহা দিয়ে—আর কঙ্কর বিলাইতি মাটি দিয়ে, তার কোলে—লোহার জাল দিয়ে বেঁধে বিছিয়ে দিয়েছে বড় বড় পত্থলের চাঁই। টিশনের কিনারা আগাগোড়া পাক্কা করে বাঁধিয়ে দিয়েছে! এবার চারটে আলো নয়, শালের লকড়ি নয়, লোহার খুঁটি পুঁতেছে দশ-দশঠো, তাতে জ্বলছে বড় বড় আলো কি টেলিগিরাপ বসে গিয়েছে। বাজার বসে গিয়েছে—শহরের মত; চা-পানিকে দুকান সমেত বসে গিয়েছে দু-তিনটে। বললাম—ভাল—ভাল ভগোয়ান মালিক, উনকে মর্জি! জীওনলাল—তোর কসুর ভগোয়ান শুধরে দিয়েছেন! ভাল হয়েছে।

দেখতে দেখতেই চলে গেলাম—ওই মহাদেওজির আস্তানের দিকে। ওখানে ওই যে নয়া বাঁধ হয়েছে—সেখানে এক বাংলা বনে গিয়েছে—এই টিশন—এই বাঁধ—তদারকের জন্যে সেখানে থাকে কোম্পানির এক অপসর এক কালা 'সাহেব'। এইখানেই থাকে মুসহরের বিটিয়া লছমনিয়া।

মুসহরদের সাপিনকন্যা—পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত লম্বা। বাংলা থেকে বেরুবামাত্র আমি চিনলাম। কিন্তু কাছে যখন এল তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে কি তার সাজপোশাক। রঙিন ছিটের ঘাগরা কাঁচুলি রং, ধপধপে সাদা কাপড়—ধপধপে সাদা জামা, খসখসে চুলে লম্বা বেণী। সাহেবলোকের আয়া! সাহেবের মেম মরে গিয়েছে—তার দুই ছেলেকে সে মানুষ করে।

সে বললে—তারও বেশি মেওয়ালাল! এস আমার সঙ্গে। বাগানের এক পাশে

ছোট ঘর—সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখালে বছর-খানেকের এক বাচ্চা। বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার জীওনকে আঁধিয়ারা রাতের চাঁদ, মেওয়ালালবাবু।

এমন মিষ্টি হাসলে লছমনিয়া যে, সে তোমাকে কি বলব। তারপর বললে—বলতে তার এতটুকু শরম হল না—বললে—সাহেব আমাকে দিয়েছে। আমার নিজের ছেলে।

তারপর বললে—তুমি সেসব ভুলে যাও জীওনলালবাবু।

আমি আর কিছু বললাম না তাকে। কি বলব? আগেই আমার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল ওর কথা শুনে। চলে এলাম। দুখ হল না এমন নয়—হ'ল তবু খুশি হয়েই চ৻ এলাম। ওর খুশি মুখ দেখে খুশি হয়ে চলে এলাম। ঝুট বাত নয় বাবুজি, সূরয নারায়ণ গঙ্গামাইজির নাম নিয়ে বলছি আমি। এ কথা সাধুকে বলেছিলাম, সাধুজি খুব ঘাড় নেড়েছিলেন—সীয়ারামজির জয় দিয়েছেন। মহাবীর কাহারের মা শুনে আমাকে ঘেন্না করেছিল, লছমনিয়াকে খারাপ কথা বলেছিল। তুমি কি বলবে আমি জানি না। লছমনিয়ার খুশি মুখ আমার চোখের উপর ভাসছে।

খুশী হয়েই চলে এলাম। চলে এলাম বাবুজি কলকাতায়। ওখানে থাকতে মন চাইল না। আর ওখানের লোকে আমার উপর ভয়ানক চটা। চটবেই তো বাবুজি। আমি তো অনেক কষ্ট ওদের দিয়েছি। কলকাতা এলাম, ভাবলাম—মজুর খাটব কিংবা কোনও চাকরি-বাকরি পেলে করব। খাটব খাব। মুসহরের বেটিকে ভাবতে ভাবতেই আমার জীবন কেটে যাবে; কিন্তু হয়ে গেল অন্যরকম। গঙ্গামাইজি তা হতে দিলেন না। প্রথম রোজই বাবুজি, হাওড়া টিশনে নেমে কলকাতায় ঢুকে—কোথা যাব ঠিক করতে না পেরে গঙ্গাজির ঘাটে বসলাম। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, গাড়ি ঘোড়া, লোক, এত বড় বড় বাড়ি দেখে কান্না পাচ্ছিল। কেন এলাম এখানে? রাস্তাঘাটে—কোথাও এতটুকু মাটি নাই, পাথরের—ইটের—লোহার পিচের উপর পা ফেলে শরীর কেমন শিউরে উঠছিল বাবুজি। গঙ্গাজির ঘাটে বসে থাকতে থাকতে ও-সব ভুলে গেলাম। মনে হ'ল—এইতো সেই গঙ্গাজি! গঙ্গাজির ঘাটে এই যে এখানে ঘোলা জল, ওই জলেই তো আমার সেই ক্ষেতির মাটি! ভাবছি, এমন সময় ভাটি পড়ল গঙ্গায়। কাদা মাটি, চিকচিকে বালি মেশানো মিহি পলি। ঠিক আমার ক্ষেতির মাটি। কি মনে হল—তুলে নিলাম খানিকটা মাটি, দুহাতে ঘাঁটলাম, পিষলাম, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলাম। মনে হল অবিকল সেই মাটি। দু'হাত ভরে মাটি আমি তাল বেঁধে তুলে নিলাম—বাউরার মত। স্নান করে সেই মাটি নিয়ে ঘাট থেকে উঠে এলাম। একটা আস্তানা কোথাও দেখে নিতে হবে। কাদার তালটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ব দু'পহর বেলা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। চলেছি আমি। হঠাৎ একটা কুঠির দাওয়ায় খেলছিল এক খোকি—সে আমাকে ডাকল—এই! এই মাটিওলা! এই!

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দোর খুলে বেরিয়ে এলেন এক মাঈজি। বললেন—বাঁচলাম, দাও তো বাবা মাটি।

গোটা তালটাই নামিয়ে দিলাম আমি। মাঈজি বললেন—এতনা নেহি! চার পয়সার।

বাবুজি এই শুরু হয়ে গেল আমার ব্যবসা। গঙ্গাজি আমার গচ্ছিত ধন আমাকে দিয়েই চলেছেন, আমি নিয়ে তাই বেচি আর খাই। খেয়ে-দেয়েও বাঁচে বাবুজি। তাই থেকে দশটি করে টাকা আমি লছমনিয়াকে ভেজে দিই। লছমনিয়া—পেয়েছে তার ছেলেকে—আমার তো মুসহরের বেটিই সব। ওকে পাঠিয়েও আমার থাকে। যা থাকছে—তাও সব মরবার আগে মুসহরের বিটিয়াকে পাঠিয়ে দেব।

একটু ঘাড় নেড়ে বললে—সে অনেক হবে, হ্যাঁ—অনেক হবে। এই এত পয়সা। আনি, দু-আনি আর পয়সা। মরবার আগে লছমনিয়াকে ভেজে দেব। লছমনিয়া—মুসহরকে বিটিয়া, পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত লম্বা। সে ওর লেড়কাকে দেবে।

অভিভূত হয়ে ভাবছিলাম। চমক ভাঙল ওরই হাঁকে।

অপরাহ্নের প্রারম্ভকালের মাধুর্যটুকু যেন অকস্মাৎ চমকে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের বেসুরা ভঙ্গির হাঁকে।

—মাটি—চা—ই, মা—টি—ই—

মেওয়ালাল? না—এ আর একজন। এমনি ভাঙা-চোরা দেহ। এমনি করেই হেঁকে চলেছে! এও হয়তো মাটি হারিয়ে—মহানগরীতে মাটি কুড়িয়ে—বেচে বেড়াচ্ছে দোরে দোরে—মাটি—চা—ই—

বিক্রম হেম্‌ব্রোম

বনফুল

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন সাঁওতাল পরগনায় এক ডিস্‌পেনসারিতে ডাক্তার হইয়া গিয়াছিলাম। তখন ট্রানজিসটার আবিষ্কৃত হয় নাই, ড্রাই-সেল ব্যাটারির রেডিও তখন অজ্ঞাত ছিল। সমস্ত দিন রোগীদের লইয়া কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার পর নিজের ভাঙা হারমোনিয়মটি লইয়া একাই গান করিতাম। শ্রোতা ছিলেন স্থানীয় পোস্টমাস্টার হরিভূষণবাবু। তিনিও সন্ধ্যার পর আমার বাসায় আসিতেন এবং চক্ষু বুজিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে আমার সঙ্গীত উপভোগ করিতেন। তাঁহারই মুখে খবর পাইয়াছিলাম দুমকা শহরের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রেডিও আছে। নাম শুনিয়া মনে হইয়াছিল, ডাক্তারবাবু সম্ভবত আমার সহপাঠী। ভাবিলাম একদিন দুমকা গিয়া খোঁজ করিব। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি যেখানে ছিলাম দুমকা সেখান হইতে বেশ দূর। আজকালকার মত ঘন ঘন 'বাস'ও ছিল না তখন।

তখনও আমার বিবাহ হয় নাই, একা একাই থাকিতাম। হাসপাতালের কাজ হইয়া গেলে, সময় যেন কাটিতে চাহিত না। এই সময় একদিন বনবিভাগের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় যোগ দিবার জন্য একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। সভাটি নাকি প্রতি বছরই হয়। যদিও সভা আমার ডিস্‌পেনসারি হইতে বেশ একটু দূরে হইবে শুনিলাম—প্রায় ক্রোশখানেক দূরে—তবু ঠিক করিলাম যাইব।

সেই সভাতেই প্রথমে আমি বিক্রম হেম্‌ব্রোমের সাক্ষাৎ পাই। দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত পোশাক এবং চেহারা। মাথায় প্রকাণ্ড পিগ্‌স্টিক্ হ্যাট্ (হ্যাট্‌টা তিনি সর্বদা পরিয়াই থাকেন শুনিলাম), গায়ে ফুল-হাতা শার্ট, পায়ে ভারী বুটজুতা এবং পরিধানে খাকি ফুল-প্যান্ট। সৌম্য শান্ত চেহারা। মনে হইল যেন কালো পাথরের একটি মূর্তি একধারে বসানো রহিয়াছে। গোলগাল ভারী মুখ। পরিষ্কার কামানো। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং একাগ্র। দেখিয়া মনে হইয়াছিল বয়স চল্লিশের কোঠায় হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম সত্তরের কাছাকাছি।

বনবিভাগের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় কৃতী কর্মচারীদের গভর্নমেন্ট পারিতোষিক বিতরণ করেন। পারিতোষিক বিতরণের পর সেদিন এস. ডি. ও সাহেব (অবশ্য তিনি

সাহেব নন, বাঙালি) নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনারা কেউ যদি বলতে চান, বলুন।'

বিক্রম হেম্‌ব্রোম উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, 'আমি কিছু বলব।'

'বলুন।'

হেম্‌ব্রোম বলিতে লাগিলেন, 'এই বনকে আমরা ভালবাসি। এই বনের আশ্রয়ে আমরা লালিত, এই বনের দাক্ষিণ্যে আমরা পালিত। এই বনের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ, এই বনের গাছপালা, লতাগুল্ম, পশুপক্ষী, ফুল-ফল আমাদের পরম আত্মীয়। এই বনকে আমরা ভালবাসি, খুবই ভালবাসি, বনকে কেন্দ্র করেই আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা আনন্দ সব। এই বনই আমাদের জীবন। এই বন যখন আমাদের অধিকারে ছিল তখন এই বনকে আমরা সেবা করতাম, এই বনকে আমরা রক্ষা করতাম। এই বনকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পারতাম। বনে যখন আগুন লাগত তখন আমরা দলে দলে ছুটে যেতাম সে আগুন নেবাতে। বনের ছোট গাছকে কেউ যদি আঘাত করত আমরা শাস্তি দিতাম তাকে। অকারণে কোনও গাছ কাটবার নিয়ম ছিল না, অসময়ে বা অকারণে বনের পশুপক্ষী শিকার করাটা আমরা পাপ বলে মনে করতাম। এখন কিন্তু বন আর আমাদের অধিকারে নেই। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আপনারাই বনের রক্ষাণাবেক্ষণ করেন। বনের সম্বন্ধে আমাদের কথা আর কেউ শোনে না। আইনত এখন আপনারাই বনের রক্ষক। সত্যিই যদি রক্ষক হতেন, সত্যিই যদি এই বনদেবীকে আপনারা সেবা করতেন তাহলে আমাদের দুঃখ হতো না। এখন কিন্তু বড় দুঃখ হয়, কারণ আপনারা রক্ষক নন, ভক্ষক। সকলেরই লক্ষ্য বনকে লুট করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি, কিছু বলতে পারি না, কারণ বললেও আমাদের কথা কেউ শোনে না। আজ আপনি সুযোগ দিলেন তাই আমার মনের কথাটা বলে ফেললাম। আপনারা বনকে ভালবাসতে শিখুন, তাহলেই আমার মনের দুঃখ আপনারাও অনুভব করতে পারবেন। আর আমার কিছু বলবার নেই, এইবার আমি থামলাম।'

বিক্রম হেম্‌ব্রোমের স্পষ্টবাদিতায় সেদিন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। সভার পর সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিক্রম হেম্‌ব্রোম সভার পরই চলিয়া গেলেন। শুনিলাম কোথাও তিনি খান না।

আর একদিনের ঘটনা।

হাসপাতালে কাজ করিতেছি। চারিদিকে সাঁওতাল রোগীর ভিড়। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিল। ঘাড় ফিরিয়াই দেখি দ্বারপ্রান্তে বিক্রম হেম্‌ব্রোম আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। প্রতিটি সাঁওতাল রোগী হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আগাইয়া গেল এবং নতমস্তকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ইহাই নাকি সাঁওতালদের মধ্যে সম্ভ্রম প্রকাশের কায়দা।

অনুভব করিলাম বিক্রম হেম্‌ব্রোমকে সকলে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে তাহা আন্তরিক এবং অকৃত্রিম। আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখের চেয়ারটায় বসিতে বলিলাম। তিনি একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবটা যেন তাঁহাকে যে আমি বিশেষ খাতির করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিতেছি ইহা তিনি চান না। তিনি সকলের সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতে চান।

আমার আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে তিনি চেয়ারে বসিলেন এবং বলিলেন তাঁহার একটি নাতির জ্বর হইয়াছে তাহার জন্যই ঔষধ লইতে আসিয়াছেন। পাঁচ দিনের টেম্পারেচার চার্ট তিনি মুখস্থ বলিয়া গেলেন। অন্যান্য লক্ষণও এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করিলেন যে মনে হইল আমি রোগীটিকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

আমি একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলাম, তিনি সেটি লইয়া ঔষধ লইবার জানালায় দাঁড়াইতে যাইতেছিলেন।

আমি বললাম, 'আপনি বসুন। আমি এখানেই আপনাকে ওষুধ আনিয়া দিচ্ছি।'

কম্পাউন্ডারকে ডাকিয়া প্রেসক্রিপশনটা তাঁহাকে দিলাম। বিক্রম হেম্‌ব্রোম কুণ্ঠিত অপ্রস্তুত মুখে বসিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহাকে কেহ বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছে ইহা তিনি চান না।

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাঁহার নজর পড়িল।

'ঘড়িটা বন্ধ দেখছি। সেট্ টমাসের ভাল ঘড়ি, চলছে না কেন?'

'কি জানি! আমি এসে থেকেই বন্ধ দেখছি।'

'আমাকে যদি দেন, আমি দেখতে পারি। যদি ভেতরে কিছু ভেঙে না গিয়ে থাকে বোধহয় ঠিক করে দিতে পারব।'

'আচ্ছা, আমি ওপরে লিখে দেখি, তাঁরা যদি বলেন সারাতে, দেব।'

'আচ্ছা।'

কম্পাউন্ডারবাবু একটু পরে ঔষধ আনিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন হেম্‌ব্রোম। যতক্ষণ বসিয়া ছিলেন মাথার হ্যাট্ একবারও খোলেন নাই। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেলাম। দেখিলাম তিনি সাইকেলে করিয়া আসিয়াছেন, সাইকেলের পিছনে জলের একটি ফ্লাস্ক বাঁধা রহিয়াছে। শুনিলাম তিনি বাহিরে কোথাও জল খান না, যেখানে যান সঙ্গে করিয়া ফুটানো জল লইয়া যান।

কম্পাউন্ডারবাবুর মুখে বিক্রম হেম্‌ব্রোমের আরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। জাতিতে তিনি সাঁওতাল, ধর্মে ক্রিশ্চান। ইংরেজদের আমলে অনাবারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে সময় ইহার প্রবল প্রতাপ ছিল। ইঁহার চারিত্রিক নিষ্ঠার জন্য সকলেই ইঁহাকে খুব খাতির করিত, এমনকি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা পর্যন্ত। ইঁহার বিচার-বিবেচনার

উপর সকলেরই আস্থা ছিল। ইংরেজদের আমলে ইনিই প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।

স্বাধীনতার পর ইঁহার সে প্রতাপ আর নাই। ইনি এখন বনে একা ঘুরিয়া বেড়ান, বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই ইঁহার অধিকাংশ সময় কাটে। ইঁহার আর একটা কাজ ঘড়ি-সারানো। এ অঞ্চলের সকলের বাড়ির ঘড়ি ইঁহারই তদারকে চলে। ইনি প্রতি সপ্তাহে গিয়া সকলের ঘড়ির খবর লইয়া আসেন।

কয়েকদিন পরে একটা 'কলে' যাইতেছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়িল বিক্রম হেম্‌ব্রোম একটি বাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আমি সাইকেলে যাইতেছিলাম, নামিয়া পড়িলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম বাড়িতেও তিনি সেই বিরাট হ্যাট্ পরিয়া বসিয়া আছেন।

'এইটে আপনার বাড়ি নাকি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন।'

'আমি একটা রোগীর বাড়ি যাচ্ছি এখন। পরে আসব। সেদিন আপনাকে হাসপাতালের দেওয়াল-ঘড়িটি দিতে পারিনি। কারণ ওটা সরকারি জিনিস, ওপরের হুকুম না পেলে দিতে পারি না। তবে আমার একটা পুরনো সোনার ঘড়ি আছে। বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম। সেই ঘড়িটা চলছে না, সেটা আপনাকে সারাতে দেব।'

'বেশ দেবেন। দেখব।'

আমি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'আপনার এই হ্যাট্‌টি বড় অদ্ভুত। এত বড় হ্যাট্ আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, এটি আমি সর্বদা পরে থাকে। রাত্রে ঘুমোবার সময় কেবল খুলি। খুলে মাথার শিয়রেই রেখে দি। এটি আমার কাছে অতি মূল্যবান জিনিস। আমার স্ত্রী বনের কাঠ কুড়িয়ে হাটে বিক্রি করত। সেই পয়সা জমিয়ে সে তখনকার কমিশনার সাহেবের স্ত্রীকে দিয়ে বলেছিল—আপনি বিলেত থেকে আমার স্বামীর জন্য একটা উপহার আনিয়ে দিন। সেটা তাঁর জন্মদিনে তাঁকে দেব। মেমসাহেব এই হ্যাট্‌টা আনিয়ে দিয়েছিলেন। মেমসাহেব আমাকে স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। তিনি হঠাৎ এসে একদিন ফিতে দিয়ে আমার মাথার মাপ নিলেন। কেন নিলে কিছু বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কিছু বললেন না, মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন কেবল। কিছুদিন পরে এই হ্যাট্ লন্ডন থেকে এল। আমি যৌবনে খুব ভাল শিকারি ছিলাম। বর্শা দিয়ে শুয়োর শিকার করতে পারতাম। তাই বোধহয় এই হ্যাট্ আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমার স্ত্রীও নেই, সেই মেমসাহেবও নেই, হ্যাট্‌টা কেবল আছে। তাই ওটাকে মাথা থেকে আর নামাই না।'

হেম্‌ব্রোম একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। আমি রোগী দেখিতে চলিয়া গেলাম। রোগীর বাড়ি হইতে ফিরিয়া দেখিলাম তিনি আমার ডিস্‌পেনসারিতে আসিয়া বসিয়া আছেন।

'কই আপনার ঘড়িটা দিন, দেখি।'

তাঁহার মুখে একটা শিশুসুলভ আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভারি ভাল লাগিল।

ঘড়িটি বাহির করিয়া আনিলাম। এরকম ঘড়ি আজকাল দেখা যায় না। ঘড়ির সঙ্গে আলাদা চাবি থাকে, সেই চাবি দিয়া দম দিতে হয়। ঘড়ির সামনেটা ঢাকা দেওয়া। মাথার দিকে টিপলে ঢাকনা খুলিয়া যায়। পিছনের দিকেও একটা ঢাকনা আছে, সেটাও স্প্রিংয়ের কৌশলে খোলা যায়। সেখানে ঘড়িতে দম দিবার জন্য একটি এবং ঘড়ির কাঁটা সরাইবার জন্য আর একটি ছিদ্র আছে।

হেম্‌ব্রোম বলিলেন, 'এ তো একটা অমূল্য জিনিস!'

দুই একবার নাড়িয়া ঘড়িটি কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন।

'না, চলছে না। কাল আমি বলব এটা সারাতে পারব কি না। যদি সারাতে না পারি, কালই ফেরত দিয়ে যাব। এখন আমি যাই। আপনি ধনেশ পাখি দেখেছেন?'

'না—'

'যদি এখন হাতে কাজ না থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আজ দুটো ধনেশ পাখি আসবে।'

'তাই নাকি? আজই আসবে কি করে বুঝলেন?'

'আমি জানি। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন ওরা আসে। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি—'

'চলুন'।

সাইকেলে চড়িয়া উভয়ে রওনা হইলাম। বনের প্রান্তে আসিয়া হেম্‌ব্রোম বলিলেন, 'সাইকেল থেকে এবার নামতে হবে। সাইকেল দুটো এখানেই থাক!'

'কেউ নিয়ে যাবে না তো—'

'না। আমার সাইকেলে গরম জলের বোতল বাঁধা আছে। কেউ নেবে না ওটা। আপনারটাও নেবে বলে মনে হয় না।'

এমন সময় বনের প্রান্তে একটি সাঁওতাল কিশোরীকে দেখা গেল। হেম্‌ব্রোমকে দেখিয়া সাঁওতালি কায়দায় অভিবাদন করিল সে। বনের ধারে সে কাঠ কুড়াইতেছিল।

'ঝুমরি, তুই আমাদের সাইকেল পাহারা দে। আমরা বনের ভিতর যাচ্ছি।'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া আগাইয়া আসিল। কুচকুচে কালো রং, তবু সে শ্রীমতী। মাথায় একটি নীলকণ্ঠ পাখির পালক গোঁজা।

বনের ভিতর কিছুদূর গিয়া হেমব্রোম দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন—'সামনে ওই দূরের গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন।

দুটি ধনেশ বসে আছে। আজ সমস্ত দিন এই বনে থাকবে, তারপর চলে যাবে।'

বিরাট চঞ্চু ধনেশ পাখি দুইটিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

হেম্‌ব্রোম বলিলেন,—'ওরা আসাম থেকে আসে। আসামের বনের খবর ওরা আমাদের বনকে দিয়ে যায়। আর আমাদের বনের খবর নিয়ে যায় আসামের বনে।'

'কি করে বুঝলেন?'

অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন হেম্‌ব্রোম—'আমি জানি।'

আমি অবাক হইয়া ধনেশ পাখি দুইটিকে দেখিতেছিলাম, হেম্‌ব্রোম বলিলেন, 'চলুন ওই গাছটার তলায় বসা যাক—'

একটা বড় গাছের ছায়ায় গিয়া আমরা দুইজনে উপবেশন করিলাম।

হেম্‌ব্রোম বলিলেন, 'এই গাছটার উপর আমার বিশেষ মায়া আছে। এই গাছের তলায় আমার জন্ম হয়েছিল। আমার মা রোজ বনে কাঠ কুড়োতে আসতেন। যখন প্রসব-বেদনা ধরে তখন তিনি এখানেই ছিলেন।'

একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বহিলেন, '—আমি সময় পেলেই এখানে চলে আসি—'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, 'ওই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখছেন, ওখানেও একটা গাছ ছিল। ঠিক এই গাছের জুড়ি। কেটে ফেলেছে ওরা গাছটাকে। কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। চুরি করে নিয়ে গেছে। বনের প্রতি কারও মমতা নেই, সবাই চোর।'

নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। দুইজনে।

পরদিন হেম্‌ব্রোম আসিয়া বলিয়া গেলেন ঘড়িটি তিনি সারাইয়া দিতে পারিবেন। তবে সারাইতে মাসখানেক লাগিবে। একমাসের কিছু পূর্বেই আমাকে আর একবার হেম্‌ব্রোমের বাড়ির দিকে যাইতে হইয়াছিল। ভাবিলাম জানিয়া যাই ঘড়িটা সারানো হইয়াছে কিনা। হেম্‌ব্রোম বাড়িতেই ছিলেন।

'ঘড়ি ঠিক হয়ে গেছে। তবে এখনও এক মিনিট স্লো যাচ্ছে। আজ ওটা দেব না, ঠিক একমাস পরেই পাবেন।'

তাহার পর ঘড়িটি বাহির করিয়া কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার চোখের পাতা দুইটি বুজিয়া আসিল, তন্ময় হইয়া তিনি ঘড়ির শব্দ শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন।

'আর একটু রেগুলেট করতে হবে। চমৎকার ঘড়ি। যত্ন করে রাখবেন আর ঠিক সময়ে খাবার দেবেন।'

'খাবার?'

'খাবার মানে দম। ঠিক একই সময়ে দম দেওয়া চাই। আমি সকাল সাতটার সময় রোজ দম দিচ্ছি। আপনিও তাই দেবেন।'

আবার ঘড়িটি কানের কাছে ধরিলেন। আবার তাঁহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

ঠিক একমাস পরে ঘড়িটি তিনি আমাকে দিয়া গেলেন। আমি একটু স-সংকোচে জানিতে চাহিলাম এজন্য কত দিতে হইবে।

হেম্‌ব্রোম হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কিছুই দিতে হবে না। এটা আমার পেশা নয়। এটাকে আমি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। আগে আমি এ অঞ্চলের সবই নিয়ন্ত্রণ করতাম। এখন আমার সে ক্ষমতা নেই। এখন কেবল ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করি। ঘড়ি ঠিক না থাকলে পাংচুয়ালিটি থাকে না। আর তা না থাকলে সমস্ত জীবনটাই এলোমেলো হয়ে যায়।'

হেম্‌ব্রোম হাসিমুখে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হেম্‌ব্রোম কতদূর লেখাপড়া করিয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। কিন্তু ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছিলাম তিনি শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি।

একমাস পরে দৈবাৎ একদিন আমার সেই দুমকার ডাক্তার বন্ধুটির সহিত দেখা হইয়া গেল। নানা কথার পর সে বলিল,—'বিক্রম হেম্‌ব্রোমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে না কি।'

'তুমি কি করে জানলে—'

'ও প্রায় প্রতিদিনই রাত নটার সময় আমার কাছে যেত, রেডিওতে ঘড়ি মেলাবার জন্য। তখনই ও বলেছিল তোমার একটা খুব ভাল ঘড়ি ও সারাচ্ছে!'

'অতদূর যেত রোজ?'

'হ্যাঁ, সাইকেলে যেতে। অদ্ভুত লোক!'

'ও রকম লোক আমি দেখিনি।'

আরও প্রায় বছরখানেক পরে একদিন একটি সাঁওতাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে খবর দিল—'শিগ্‌গির চলুন। হেমব্রোম অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

'বাড়িতেই?'

'না, বনের মধ্যে?'

যে বনে ধনেশ পাখি দেখিতে হেম্‌ব্রোমের সহিত গিয়াছিলাম সেই বনে সাঁওতালটি আমাকে লইয়া গেল। যে গাছের নিচে আমরা বসিয়াছিলাম সেই গাছের নিচেই হেম্‌ব্রোম চিত হইয়া শুইয়া আছেন। মাথার হ্যাটটি খুলিয়া গিয়াছে। গাছের গুঁড়ির উপর কুড়ালের দাগ। মনে হইল গাছটাকে কাটিয়া ফেলা হইতেছিল। কুড়ালের ক্ষতচিহ্ন হইতে রস ঝরিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হেম্‌ব্রোম মারা গিয়াছেন।

স্টোভ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্টোভটা আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে যায়। কোনরকমে যদি, বা তারপর ধরে তবু থেকে থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে এমন দপ দপ করে ওঠে যে, ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে-না-উঠতেই স্বামী শশিভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক করে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'কী গো, এখনও চা হল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?'

'তা হলই বা ট্রেন ফেল। জলে তো আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।'

শশিভূষণ কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বাসন্তী একটু ঝংকার দিয়েই বলে, 'বুঝতে খুব পারছি, কিন্তু কী করব বল! দুটো বই দশটা হাত তো আর নেই!'

শশিভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে বলে, 'তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ?'

'বার করব না তো করব কী? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়?' শশিভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে, 'তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে তো আর বিদেয় করতে পারি না।'

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে!

শশিভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনও স্টোভটার দিকে। চিন্তিতভাবে বলে, 'স্টোভ কিন্তু না জ্বালালেই পারতে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও, তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি। আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। 'কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা, এসব হচ্ছে কী বলুন তো বউদি', মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায়ে থাকার দরুন চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অনেকক্ষণ হয়েছে, তবু বউদি ডাকটা একেবারে

নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধ হয় একটু দেরি হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে, 'কী আর হচ্ছে ভাই! কিছুই তো পারলাম না।'

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে বসে পড়ে। 'আহা, শুধু মাটিতে বসলে কেন?' বলে বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে, 'থাক, শুধু মাটিতে বসলে আমার মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমত কুটুম্বিতে শুরু করে দিলেন! তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ করে না আসতে হত।'

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলে, 'সে দোষ তো ভাই আমার নয়।'

এতক্ষণ নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধরে উঠেছে। চায়ের কেতলিটা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে বলে, 'আমায় একটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা বসে ততক্ষণ গল্প করুন।'

বাসন্তী উঠে চলে যায়। মল্লিকা মাথা নিচু করে বসে থাকে। শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারে না। স্টোভের সাইলেন্সরটাও খারাপ। তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকর।

মল্লিকা মাথা নিচু করেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা গলায় বলে, 'এভাবে এসে বোধ হয় ভাল করিনি।'

কথাগুলো আরও মৃদুস্বরে মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। স্টোভের আওয়াজের দরুন গলটাকে একটু বেশি চড়াতে হয়। মনে হয়, কথাগুলো যেন উঁচু পর্দায় ওঠার দরুনই খানিকটা মর্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু সুলভ হয়ে পড়ে।

'না, না, খারাপ আবার কিসের?' শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্টভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশিভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে, 'কেন যে এতদিন বাদে এ খেয়াল হল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরও দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদলাবার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষাও করেছি চার-পাঁচ ঘণ্টা। তখনও জানতাম তোমরা এখানেই আছ।'

শশিভূষণ কোনও জবাব দেয় না।

স্টোভটা হঠাৎ দপ দপ করে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নেমে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু সরে বসে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভরে যায়।

হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে, আরে, করছ কী। অত পাম্প দিয়ো না।'

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'কেন'?

'মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হয়ে গেছে, হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।'

শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে, 'তাহলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়, না?'

শশিভূষণ কেমন একটু সংকুচিতভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে, 'তোমার স্ত্রী—মানে বউদি তো এই স্টোভই জ্বালেন?'

শশিভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে, 'না, খারাপ হয়ে গেছে বলে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বার করেছে কে জানে!'

'ও!' বলে মল্লিকা এবার মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

হঠাৎ শশিভূষণ চমকে উঠে বলে, 'ও কী, হচ্ছে কী? বলছি পাম্প দিয়ো না, বিপদ হতে পারে।'

স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড় একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'বিপদ আবার হল কী হল?'

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে, 'দেখুন তো বউদি। আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে? স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি?'

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর-থেকে-আনা গরম খাবারের থালাটা ছোট টেবিলটার উপর রেখে বলে, 'খারাপ হতে যাবে কেন? ওঁর ওই রকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হলেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায়!'

'আমিও তাই বলি।' মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেতলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে চারিধারে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ কী বলতে গিয়ে যেন পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায়ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে মল্লিকার পাশে বসে পড়ে, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে, 'থাক ভাই থাক, আর দরকার নেই। দু'দণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে এত খাটলে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ও ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা একা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।'

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে! হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে বলে, 'আপনি বোধ হয় পাচ্ছিলেন যে, স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।'

'না, ভয় পাব কেন? ফাটবার হলে ও স্টোভটা অনেক আগেই ফাটত।' বাসন্তী

গলার সুরটা তারপর পালটে বলে, 'আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ও গরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি-সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে গেছে।'

'না, আপনি লৌকিকতার চরম করে ছাড়লেন।' বলে মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চলে যায়।

স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশিভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চমকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সংকুচিতভাবে বলে, 'তোমার ভাই আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে যাবে বলে ভয় দেখালাম, তবু শুনল না।'

'তা যাকগে। তোমার ভয় নেই। ট্রেন আমরা কিছুতেই ফেল করব না।'

কথাটা কোনওরকম ঝাঁজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর শশিভূষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশিভূষণ কি এ কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশিভূষণ কিন্তু নীরবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয় হঠাৎ চিৎকার করে বলে, 'তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাব বলে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেকদিন নিবে গেলেও একটা দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়ত এখনও আছে, নির্লজ্জের মত এই আশাই করেছিলাম।'

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে, 'তোমার এখানকার চাকরি তো প্রায় চার বছর হল, না?'

'হ্যাঁ, প্রায় তাই।'

'ভাল লাগে এইরকম মফস্বল-শহরে পড়ে থাকতে?'

'না লাগলে উপায় কী? কলকাতার কোনও কলেজে চাকরি পাওয়া তো সোজা নয়।'

উপায় কী? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্য গয় চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে বসে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি করেই সে দুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়তো তাদের জীবনের ইতিহাস আর-একরকম হতে পারত।

সে দিনটা এখনও তার ভাল করেই মনে আছে। অনেক ভেবেচিন্তে মিউজিয়মের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক করে নিয়েছিল। কলেজে দেখা হলেও কথা বলা সমীচীন নয়। তাই সময় ও সুবিধা হলেই একজন আরেকজনের জন্যে এই ঘরটিতে এসে অপেক্ষা করত। মিউজিয়মের সেটা পাথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্‌বেল মুহূর্তের সাক্ষি এই ঘর। বার বার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বার বার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ

হয়ে আশ্চর্য পাথর হয়ে গিয়েছে, গ্রহলোক থেকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গিয়েছে, সে ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।

সেদিন মল্লিকাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিশাল ঘরের সব কটা নিদর্শন দু-তিনবার ঘুরে দেখেও সময় আর ফুরাতে চায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শশিভূষণ ঘরে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখেই মল্লিকার যেন কিছু বুঝতে আর বাকি থাকেনি। তবু সে এ হতাশা আমল দিতে চায়নি।

খানিকক্ষণ কেউই কোনও কথা বলেনি। নিঃশব্দে একটু ঘোরবার পর মল্লিকাই আর থাকতে পারেনি। সমস্ত সংকোচ জয় করে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছে, 'কী বললেন?'

'মা?' শশিভূষণ যেন চমকে গিয়েছে একটু। তারপর একটু চুপ করে থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে, 'মাকে কিছু বলিনি এখনও।'

মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে একেবারে। শশিভূষণই আবার ক্লান্ত হতাশ স্বরে বলেছে, 'মার শরীর খুব খারাপ। আজই দেওঘরে যাচ্ছেন কিছুদিন চেঞ্জের জন্য।'

অনেকক্ষণ, প্রায় যেন একযুগ, স্তব্ধ হয়ে থাকবার পর মল্লিকা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি—তুমিও যাচ্ছ নাকি?'

একটু ইতস্তত করে শশিভূষণ বলেছে, 'মা যেতে বলেছেন। তাছাড়া—তাছাড়া ভাবছি, যা কিছু বলার সেখানে বললেই সুবিধে হবে।'

মল্লিকা আর কোনও কথা বলেনি। সে যেন বুঝতে পেরেছে সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজন তখনই শেষ হয়ে গিয়েছে।

শশিভূষণই খানিক বাদে বলেছে, 'আমি না বললেও সবাই জানে, মাও জানেন।'

এ কথারও কোনও উত্তর দেওয়ার প্রবৃত্তি মল্লিকার হয়নি। একান্তভাবে ছোট একটা উল্কাপিণ্ডের নমুনার দিকে মনোনিবেশ করে সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে।

শশিভূষণ আবার বলেছে, অত্যন্ত অপরাধীর মত, 'শরীর খারাপের ওপর মা হয়তো বড় বেশি বিচলিত হয়ে উঠবেন, এই ভয়েই এখনও কিছু বলিনি। আমি জানি মাকে আমি শেষপর্যন্ত বোঝাতে পারব।'

একটা জ্বালাময় উত্তর মল্লিকার বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত উথলে উঠেছে। শুধু তোমার মাকে বোঝানোটাই কি এত বড়! আমার কি বাড়ি-ঘর আত্মীয়-সমাজ কিছু নেই? তোমার মার অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপরই কি আমার জীবন নির্ভর করছে?

মল্লিকা কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে আবার। এবং সেইখানেই বোধ হয় জীবনের চরম ভুল করেছে। শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস করে চিনতে চায় না। তাদের পেতে হলে জোর করে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয়। কী ক্ষতি ছিল সেদিন আর একটু নির্লজ্জ হয়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমার করে দিলে? সে জানে, সেদিন চেষ্টা করলে শশিভূষণকে সে আর ফিরে না যেতে দিতে পারত। শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোনও প্রেরণা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে

সমস্ত বাধা, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারীসুলভ সংকোচে আর লজ্জায় আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কী ভুলই সেদিন করেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল করেছে কি? চকিতে এ প্রশ্ন তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। এই আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্তে সে নিঃশব্দে পুড়ে পুড়ে খাক হয়েছে, কিন্তু একে জয় করে নিলে সে কি সত্যি সুখী হত? ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হয়ে উঠত না কি?

'স্টোভটার আওয়াজটা বড় বিশ্রী শোনাচ্ছে, না?' শশিভূষণের কথায় মল্লিকার চমক ভাঙে।

অদ্ভুতভাবে হেসে সে বলে, 'ভয় হচ্ছে নাকি। কিন্তু বউদি তো বললেন স্টোভ মোটেই খারাপ নয়।'

কেতলির জল ফুটে উঠে স্টোভের উপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর যেন হুঁশ হয়। কেতলি নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিবিয়ে দেবার জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরানো আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এ বাজি খেলবার সাহস তার আছে কি? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই স্টোভটাই সে শেষ মুক্তির পথ বলে ঠিক করে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোনও অপবাদ কারও গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে, শুধু একটা দুর্ঘটনা হল।

সেদিন অত বড় নিদারুণ সংকল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। কিন্তু এ বাড়িতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিনরাত্রি বিষাক্ত করে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কী ভাবেই না কল্পনা করেছে! সে কল্পনার সঙ্গে আজকে এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাত হবে সে ভাবতেও পারেনি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে বলে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকনো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাত কম তো হল না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনওদিন শোনেনি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী তো আছে সাবধান করবার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘরে পাঠাবার আগে আর সব মেয়েদের

উদ্দেশ করে ঠানদি-সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা করে বলেছিলেন, 'ওরে সাজিয়ে তো দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস তো? নইলে ও উড়ো পাখিকে বাঁধবে কী দিয়ে?'

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরনে বাসন্তী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বোঝানোই যাদের আনন্দ, তারা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু একটু করে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকি থাকেনি।

স্বামীর মুখে একবার আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধহয় অতটা আহত হত না, যতটা হয়েছে তাঁর আপাত নির্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভিতরটা জ্বালা করে উঠেছে। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রি ধ্যান তো আমায় বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন?—ইতরের মত ঝগড়া করে একথা বলতে পারলে বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমত। কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চলে গিয়েছে।

শশিভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চমকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।'

ব্যস্, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোনও কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোনও কৌতূহলই নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলত, গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি, তাহলেও স্বামী বোধ হয় শুধু একটু 'ও' বলে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে থাকতেন। অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভাল ছিল।

একদিন এই স্টোভের সামনে বসেই তাই তার মনে হয়েছে, কী ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ করে দিলে। শাশুড়ি তখনও বেঁচে। তাকে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান করে গিয়েছেন, 'ও স্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বউমা? ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখ বাপু, ফেটে-টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়।'

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারি! হ্যাঁ, এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোনও দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে ধীরে কবে থেকে যে সব বদলে গিয়েছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোনও ভালবাসা তার মনে চিরন্তন হয়ে আছে, এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য? যার মনের হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মত স্বচ্ছ, এমন কোনও আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে, যেখানে অত

বড় ভালবাসা নিঃশব্দে গোপন করে রাখা যায়! কোনওদিন কোনও রং যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে রং অনেক আগেই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকার কথা তুলেছে স্বামীর কাছে।

'ওগো, এখানকার গোকুলপুরের মেয়েদের স্কুলে নতুন কে হেডমিস্ট্রেস হয়েছেন জানো? তোমাদের সেই মল্লিকা রায়।'

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ এই প্রথম। তবু বাসন্তীর কথায় বা কথার ধরনে শশিভূষণের কোনও ভাবান্তরই চোখে পড়ে না। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সে বলে, 'হ্যাঁ, শুনেছি।

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা করেনি। সে আবার একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বলেছে, 'আমাদের এই জংশন স্টেশনেই তো গাড়ি বদল করে যেতে হয়। একবার আসতে বলে না কেন?'

'কী জন্যে?' শশিভূষণ যেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

'কী জন্যে আবার! একবার একটু দেখতাম।' বলে বাসন্তী সেখান থেকে চলে গিয়েছে।

শশিভূষণ আসতে অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোনও জ্বালা, কোনও সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই। সে বরং খুশি হয়েছে মনে মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে, এ যেন তারই ঋণ শোধ।

ও ঘরে বসে এখনও ওরা গল্প করছে। কী গল্প করছে কে জানে? যা-ই করুক, কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে, তার কোনও ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বাসন্তী চমকে ওঠে। কী ভাববে তাহলে মল্লিকা? কী ভুল ধারণাই না সে করতে পারে। অনায়াসেই ভারতে পারে, এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সে-ই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনায় এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ!

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা নেবাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়। হঠাৎ চাবিটা এত এঁটে গেলই বা কী করে? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে তার মনে হয় শশিভূষণকে ডাকবে কিনা! কিন্তু না, সে বড় লজ্জার ব্যাপার। তাহলেও মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মত হিংস্র গর্জন করছে। উঠে কোথাও সরে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই আজ কোনও দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।

বৈয়াকরণ

সতীনাথ ভাদুড়ি

...টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। একটু যেন তেষ্টা পেয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে চেঁচাতে হবে—গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে। পাশেই পানের কৌটো। কৌটোটার ভিতর থেকে খানিকটা ভিজা খয়েরি নেকড়া বেড়িয়ে এসেছে—দেখলেই গা ঘিনঘিন করে—দিনরাত দাঁত খোঁটেন মৌলবীসাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া নেই, কিছু না, সেই হাতেই পান বার করে খাবেন। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না। তাঁর দিককার দেওয়ালের পেরেক টাঙানো জল-তুলবার দড়িটা পেড়ে নিলে পণ্ডিতজি। আর এক হাতে লোটা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পূজা-আহ্নিক করেন—শুদ্ধাচারে থাকেন—কুক্কুটাণ্ড দেখলে বমি ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারি চাপরাসিটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর মেয়েস্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু ক'টা টাকার জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেননি এখানে। স্কুলের দাইদের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? লোটা মেজে নিজ হাতে ইঁদারা থেকে জল তুলে, আলগোছে ঢকঢক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?...

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজির মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই; এ হচ্ছে নিছক একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। মনের এই অস্থিরতার জন্য পণ্ডিতজি আজকাল নিজে উপযাচক হয়ে মৌলবীসাহেবের সঙ্গে বেশি করে গল্প করা আরম্ভ করেছেন।

...আরে যদি তিনি স্কুলের দাইদের হাতের জল খেতেনও, তাহলেও কি এখান থেকে চেঁচিয়ে দাইকে ডেকে এক গ্লাস জল আনতে বলতে পারতেন?...

'মৌলবীসাহেব, কোনও একটা কাজে এখান থেকে দাই দাই বলে চিৎকার করতে লজ্জা করে না?'

'লজ্জা মনে করলেই লজ্জা। দাই বলতে দ্বিধা হয় তো হরখুরমা বলে ডাকলেই পারেন।'

...মৌলবীসাহেব ঠিক বুঝতে পারেননি কেন এই দ্বিধা, কিসের এই লজ্জা। সে দ্বিধাটুকু ওঁর মনে জাগে না যে কেন, তাই আশ্চর্য!...দ্বে বিধে—দ্বিধা...তদ্ধিতান্ত শব্দ।

'মেয়েস্কুলের পুরুষ শিক্ষক। আমাদের অবস্থাটা এখানে একটু কেমন-কেমন না?'

আফিংখোর মৌলবীসাহেব এতক্ষণে চোখ খুললেন পণ্ডিতজির কথার সমর্থনে একটু রসিকতা করবার জন্য।

'আপনাদের সানস্‌কির্তে আছে না—হাংস মধ্যে বগুলা যথা—তেমনি আর কী আমরা এখানে।'

না। ঠিক এই ভাবনাটার কথা পণ্ডিতজি বলতে চাননি। তবু মৌলবীসাহেবের কথার প্রতিবাদ সোজাসুজি করতে পারলেন না। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

'আপনাকে আর বক বলি কী করে। বকের পালকের মত আপনার সাদা চুল আর দাড়ি, আবার ভ্রমরের মত কালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন—আপনি হলেন ভ্রমর।'

সম্প্রতি মৌলবীসাহেব আবার আর-একটা নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। কালো কুচকুচে দাড়িগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—'হাতি চলে বাজারে, কুকুর ডাকে হাজারে।'

'কিন্তু বুঝলেন কিনা মৌলবীসাহেব—সেই হাতি যখন পাঁকে পড়ে...

মৌলবীসাহেব কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না।

'আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন। না? বগুলা-ভকত (বকধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌলবীসাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না পণ্ডিতজি। বকধার্মিক শব্দটা তীরের মত তংার মনের গভীরে গিয়ে বিঁধেছে। আজ দুই মাস থেকে যে কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তারই সঙ্গে যেন বকধার্মিক কথাটার সম্বন্ধ আছে। আচমকা একটা স্পর্শকাতর জায়গায় ঘষটানি লেগেছে। মৌলবীসাহেব নিজের খেয়ালখুশিতেই অষ্টপ্রহর মশগুল; পণ্ডিতজির মুখ-চোখের চকিতের বৈলক্ষণ্য তাঁর নজরে পড়ল না। তাঁর টেবিলে-তোলা নড়ন্ত পা দুটোকে দেখে হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল পণ্ডিতজির মন। চাকরির জীবনে অনেক কিছুই গা-সওয়া করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। মেয়েস্কুলে তাঁদের গতিবিধি অবাধ নয়; সর্বত্র বাঞ্ছিতও নয়। স্কুলঘর থেকে একটু দূরে তাঁদের এই ঘরখানি। আগে ছিল স্কুলের ঝাড়ুদারনীর ঘর। এখন সেই ছোট্‌টো ঘরখানার মধ্যে পাতা হয়েছে একখানা টেবিল, দু'পাশে দুখানা চেয়ার। টেবিলখানাকে দিয়ে অলিখিত আইনে তাঁরা ঘরখানাকে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন; একদিকে থাকে ঘটি, আর একদিকে থাকে বদনা। নিজের ঘটিটাকে নিয়ে তিনি বার হলেন ঘর থেকে। বহুকাল

তিনি আর মৌলবীসাহেব একসঙ্গে কাজ করেছেন জেলা স্কুলে। কিন্তু তাঁর পা-দোলানো এত খারাপ এর আগে আর কখনও লাগেনি। ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলানো তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেডমাস্টারমশায়রা বলে বলে হার মেনে গিয়েছিলেন; মৌলবীসাহেব তাঁদের ধমক পর্যন্ত গায়ে মাখতেন না। এমন একটা খোসমেজাজি লোক হঠাৎ তাঁকে বকধার্মিক বললেন কেন? নিজের জ্ঞানত তিনি তো মিথ্যাচার কখনও করেন না। টোলে পড়বার সময় কিশোর বয়সে একবার কৃচ্ছ্রসাধনার বাতিক জেগেছিল। তাঁর জীবনযাত্রায় আজও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাত্তাবালী কালীর চরণে জবাপুষ্প দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কামরূপ কামাখ্যায়ও তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও তো একটুও ফাঁকি নেই! তিনি যা নন তা দেখাতে তো কোনওদিন চেষ্টা করেননি! তবে কেন মৌলবীসাহেব তাঁকে বকধার্মিক ভাবলেন? টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিতমশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন 'তুরন্ত, তুমি ব্যাকরণ পড়। কাব্য পড়ে কী হবে? বড় মনকে চঞ্চল করে ও জিনিস। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা। ইন্দ্রিয়াসক্তির অবলম্বনেই কাব্যের রস জীবিত থাকে।' সেইজন্য গুরুর আদেশে, লঘুচাপল্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পণ্ডিতজি মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন। ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মধ্যে বিচ্যুতি নেই। তবে কেন মৌলবীসাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, ওটা একটা নির্দোষ রসিকতা—কিছু না ভেবে বলা—ঠাট্টা করে কথার পৃষ্ঠে বলা কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ও বিশেষণটা কখনই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দু'মাস থেকে তাঁর মনে কিরকির করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম; তার উপর বহু বচন। দুটোর মধ্যে কোনও মিল নেই, কোনও সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে 'ওরা'। বাক্যটি হচ্ছে 'ওরা কি ওই চায়!' এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ তে।...

হঠাৎ নজরে পড়ল হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ নামিয়ে নিলেন; চোখাচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হতে হত। হেডমিস্ট্রেস যখন আসছেন, তখন টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বসবার ঘরে পৌঁছে তবে মাটি থেকে চোখ তুললেন উপরে পণ্ডিতজি। অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্বিঘ্ন দ্বীপ এই ঘরখানি। টেবিলের উপর পা-জোরা নড়ছে। মৌলবীসাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেননা সব ক্লাসে উর্দু পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে কম নয়। পণ্ডিতজি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অন্য সব ফাঁকির বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কি করে, নৈতিক অনুশাসন আসবে কোথা

থেকে—এ কথা কেউ বুঝবে না! মৌলবীসাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটল কিনা, সেসব বিষয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনও কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া দেখায় খারাপ; ভেবে নিতে পারেন যে 'বকধার্মিক' বলবার জন্য চটেছেন তিনি। তাই পণ্ডিতজি জিজ্ঞাসা করলেন—'ও মৌলবীসাহেব, ক্লাস নেই নাকি?'

মৌলবীসাহেব চোখ বুঁজেই উত্তর দিলেন—'আমার আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনওদিন ক্লাস থাকে নাকি?'

'বেশ আছেন মৌলবীসাহেব!'

'যে যেমন নসিব নিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ ঝিমুতে ঝিমুতে পা দোলান; আমি ক্লাস ঠেঙিয়ে আসি।'

নিজের অতর্কিতে তিনি আজ মৌলবীসাহেবের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছেন বার বার। কিন্তু যাঁকে বলা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

'আরে ভাই, যে কটা টাকা মাইনে দেয়, তার বদলে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পা দোলানোর মেহনতই যথেষ্ট।'

পাটকরা চাদরখান পণ্ডিতজি কাঁদের উপর সাজিয়ে নিলেন। পাকা গোঁফজোড়ার উপর হাতের উলটো পিঠটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ খটকা লাগল মনে—ছেলেদের স্কুলে চাকরি করবার সময়ও ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে, চাদর ও গোঁফের বিন্যাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকতেন? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই; চিরকাল তিনি নিজের জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিতেন; ইদানীং ধোপার বাড়িতে দেন। তবে এসবগুলো ঠিক প্রসাধন কর্ম নয়। দাঁত খুঁটে হাত ধোবার মত, খেয়ে কুলকুচা করবার মত নির্দোষ অভ্যাস।...

ঘণ্টা পড়ল। পণ্ডিতজি ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অসাক্ষাতে সবাই তাঁকে তুরন্ত পণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম দস্তখত করবার সময় লেখেন—তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠিতে পর্যন্ত। ব্যাকরণ যেমন তাঁর অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, ব্যাকরণতীর্থ পদবিটাও তেমনি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

প্রতি মাসে একবার করে আগে থেকে কোনও সূচনা না দিয়ে, পুরনো পড়ার পরীক্ষা নেন পণ্ডিতজি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ এই ক্লাসের ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবেন।

...এই ক্লাসের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি বকুনি খায় হেডমিস্ট্রেসের কাছে, সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করে বলে।...মহান্-শব্দঃ মহাঞ্ছব্দঃ...। ছেলেদের দুষ্টু বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের দুষ্টু বলতে বাধে। অবাধ্য কথাটও ঠিক হয় না। হ্যাঁ, একটু চঞ্চল বেশি। ...নৃত্যন্‌চকোরঃ—নৃত্যংশ্চকোরঃ...। কোনও ক্লাসের শান্ত-অশান্ত হওয়া নির্ভর করে সেই ক্লাসের লিডারদের

সাহসের দৌড় কতদূর, তারই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্ররাই সংস্কৃত পণ্ডিতের পিছনে লাগতে ভালবাসে। দেবভাষার অনুস্বার বিসর্গ সংবলিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রীদের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের ছোট করে দেয় কিনা কে জানে। ব্যাকরণের 'ষষ্ঠী চানাদরে' বিধানটি পড়াবার সময় হাসেনি, এমন ক্লাস তিনি দেখেননি। প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকেন, তখন ভাবতেন যে ইংরাজি-না-জানা পণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এই জন্য, আর কতকটা ক্লাসে পড়ানোর সুবিধার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরাজি শিখেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উলটো; ছাত্ররা আর বেশি করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরাজির জ্ঞানটুকু তাঁর অতি গর্বের জিনিস। সুবিধা পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে তিনি ইংরাজি জানেন।...

এই ক্লাসের লিডার মালবিকা। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ে; কিন্তু প্রগল্‌ভতা যেন আর-একটু কম হলেই ভাল হত! ক্লাসের সজীব গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে।...

একটি মেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখেই ক্লাসে খবর দিল—'তুরন্ত পণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হনহন করে—যেন এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না! ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল হলে তিনি বেশ কয়েকটি চপেটাঘাত দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন; কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কি হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মত পূজ্যা কুমারীরা। তাঁদের যুগে এই বয়সের মেয়েদের কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবার জন্য তুরন্ত পণ্ডিত চেঁচিয়ে সুর করে বললেন—'বা-আ-আই ইন্‌টেলেকট্‌।' অর্থাৎ মতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কী হয়? খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ; এ শুধু গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন; পরে আস্তে আস্তে শক্ত হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ গতিক সুবিধার নয়। অমন হন হন করে ঘরে ঢুকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রিত করেছেন লিলির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকাতে তাঁর মনে কোনওরূপ সংকোচ আসে না। মেয়েটি কুরূপা।

'এসব নামতার মত কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ইউ! ইউ বয়! তুমি বলো!'

সারা ক্লাস হেসে ফেটে পড়ল।

...কেন? হঠাৎ এত হাসির কী হল? মালবিকাই নিশ্চয় আরম্ভ করেছে। ওঃ! অভ্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন! এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মাঝে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পণ্ডিতজি চোখ নামিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি!

'একটা কথা বলি পণ্ডিতজি, কিছু মনে করবেন না। আপনার পইতাটা কানে জড়ানো রয়েছে।'

...ছি, ছি, ছি! (পশ্যন্-চকিতঃ—পশ্চ্যংশ্চকিতঃ)...লজ্জায় পণ্ডিতজির মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পইতাটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য আরও জোরে সুর করে চেঁচালেন—'বা-আ-আই ইন্টেলেক্ট্।'

উচ্চ হাসির রোল তাঁর গলার স্বরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—'আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজি?'

অন্যদিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজি বললেন—'আবার ব্যাকরণ শব্দটির ভুল উচ্চারণ করছ? প্রতিদিন কি একবার করে বলে দিতে হবে?'

উপরের ক্লাসগুলোর সব মেয়েই বাঙালি। অবাঙালিদের আগেই বিয়ে হয়ে যায় বলে তারা অতদূর পৌঁছতে পারে না। বড় ভাল লাগে পণ্ডিতজির, এই সব বাঙালি মেয়েদের। ওরা হাসতে জানে; ওদের কথার ধ্বনি মৈথিলীর মত মিষ্টি; কিন্তু এক দোষ ওদের—সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ মোটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কী করে শেখাবো বলো এদের! কিন্তু ওদের মুখের ভুল উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন।...(মহতী ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)...ষ কুক্কুটাগুলোভী বাঙালি পুরুষরা বিচ্যুতিটুকু মেয়েরাই পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও ঠিক আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কোনওদিন মিটবার নয়।...

কোন্ কথার কী প্রতিক্রিয়া হয় পণ্ডিতজির উপর, সেসব ছাত্রীদের মুখস্থ।

'কেমনভাবে ব্যাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজি?'

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

'বলো—বিয়াকরণ, বিয়াকরণ।'

'বিয়া-করণ, বিয়া-করণ'—বিয়া আর করণ শব্দ দুটিকে ভেঙে আলাদা করে বলছে সে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজির পরীক্ষা নেবার ঝাঁজ আজকের মত কমিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

'আবার বলো! ত্রিশবার বলো!'

...এই চটুলা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।...মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা তিনি ভোলেননি। তখন তাঁর মাথায় অত বড় বিপদ। ছোট শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। শৌখিন মানুষ; দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টোভ। কে বোঝাতে যাবে এইসব ছেলে-ছোকরাদের যে বাপ-দাদারা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হলেও কি তাই!

স্টোভ ধরাতে গিয়ে শালজের শাড়িতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। জামা-কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বেগুনপোড়ার মত পুড়ে থসথসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য! সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটুও পোড়েনি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙক্ষা মোটেই ছিল না, যেতে পারলে যেন বাঁচেন...সেই সময় বোঝা গিয়েছিল, মালবিকা মেয়েটি কত ভাল। এত প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও কত কোমল ওর হৃদয়। সে এসে বলেছিল—'পণ্ডিতজি, সীতাকুণ্ডের সন্ন্যাসীর দেওয়া একটা পোড়ার ওষুধ মা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তয়ের করতে হয়। খুব ভাল ওষুধ; পোড়ার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর শালার অ্যালোপ্যাথিক ছাড়া আর অন্য কোনও ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সে কথা বললেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে ডাব যোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে দিয়ে ওষুধ তৈরি করিয়েছে, সে-ই জানে। ব্যবহার করলে কী হতো কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী দোষী মনে হয়; খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোট-শালার মুখের দিকে তাকানো আর যেত না, শালাজ স্বর্গে যাবার পর। অনেক মৃতপত্নীক দেখেছেন, কিন্তু অত মুষড়ে ভেঙে পড়তে আর কাউকে দেখেননি। ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! বড় অনুরাগ ছিল দুজনকার মধ্যে; সচরাচর দেখা যায় না অমন। এত অনুরাগ, তবু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পতিব্রতার?...

'হয়ে গেল ত্রিশ বার? গুড্। Expound সমাস—অর্ধদগ্ধ-শরীরঃ।'

'অর্ধদগ্ধং শরীরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি।'

'গুড্। কিন্তু অর্ধদগ্ধটুকু যে বাকি থেকে গেল।'

'অর্ধং যথা তথা দগ্ধম্...সুপ্‌সুপেতি সমাস।'

'গুড্। কিন্তু চংড়ী মছলি খাওয়া বাঙালিরা দন্ত্য স উচ্চারণ করতে পারে না। শমাশ নয়, বলো সমাস। দন্ত্য স দিয়ে।'

'ও তো পণ্ডিতজি সামাসা হয়ে যাচ্ছে।'

'ওই ঠিক উচ্চারণ। ওই বলো দশবার!'

...কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যেরকম ভাল লাগে, সেই রকমই ভাল লাগছে এই মেয়েটির শুধু উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টার ধ্বনি। সংগীতের ঝংকারের মত এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

...মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ—মধুরঝঙ্কারাঃ।...

'হলো দেশবার? সিট ডাউন! এবার গৌরী তুমি বলো। Expound সমাস—মৃতপত্নীকঃ। ভেবে বলো, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ভয় কিসের?...আশ্‌ন-কতে। আশঙ্কতে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। গুড্। সিট ডাউন। নেক্সট্। গীতা। গীতা নম্বর এক, তুমি বলো। আজকাল গীতা নামটা এত বেশি কেন তোমাদের মধ্যে? কিন্তু নামটি বেশ ভাল। ওরকম গ্রন্থ আর নেই পৃথিবীতে।'

...স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি শালাজের মৃত্যুশয্যার পাশে গীতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন শেষ সময়। যাঁকে শোনানো, তাঁর তখন শোনবার বা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। আগের দিনও শালাজ কথা বলেছেন, জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। যে কথাটি তাঁকে গত দু'মাস থেকে পীড়া দিচ্ছে সেটা তো তার আগের দিনই বলা। ...তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন শালজের গায়ে। পুরুষমানুষদের সে ঘরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু কোনও ভরসা দেননি রোগিণী সম্বন্ধে। ননদ কত কী বলে চলেছেন...'খুব কষ্ট হচ্ছে? ওষুধ দিতে লাগছে? ভাবনা কী, সেরে যাবে দিনকয়েকের মধ্যে। মা আবার কিসের? সারবে না। কত লোকের কত শক্ত শক্ত রোগ সেরে যাচ্ছে, আর তোমার এই ঘা-ফোসকাটুকু সারবে না।'

'না না, আমার আর বেঁচে দরকার নেই'...'ছি, ও কথা বলতে নেই।' 'আমার মরে যাওয়াই ভাল।'...'কী যে বলো। কেন, হয়েছে কি তোমার?'...এর পরের কতকগুলি কথা তিনি মাঝের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে বুঝতে পারেননি। একটু পরে আবার কানে এল...'না না, সেসব ভেব না তুমি. সর্বাঙ্গ পুড়েছে তোমার কোথায়? দেখ দিকিনি, এই ব্যথা-বিষের মধ্যেও তোমার মুখখানি কী সুন্দর দেখাচ্ছে!'...'ওরা কি ওই চায়'...যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটিও তাঁর কানে এল। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে হৃদয়-নিঙড়ানো কথা কয়টি। এই বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলছে গত দুই মাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। বহু টীকা ভাষ্য করেও আজও বোঝা গেল না, ঠিক কী মন করে মহিলাটি ওই ওরা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন...

'পণ্ডিতজি, আমিও কি সমাসের উচ্চারণে অভ্যাস করব নাকি?'

'ও, তুমি। নো। তুমি বলো সন্ধি—তদ্-ছবিঃ কী হয়? তচ্ছবিঃ। গুড্। সখী-উক্তম—সখ্যুক্তম্। গুড্। বাণী ঔচিত্যম্। ঠিক হচ্ছে। বলো। হ্যাঁ। বাণৌচিত্যম্। গুড্। সিট ডাউন। কিন্তু মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ হল না। তোমরা যে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ-এর একই উচ্চারণ করো। আচ্ছা এবার বাণী উঠবে। বাণী, তোমার নামের উচ্চারণ কর। সংস্কৃত উচ্চারণ। বাংলা নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পারে না, সে নাম রেখে লাভ কী? দশবার বলো।'

এই চেষ্টায়, হাসির ধুম পড়ে গেল ক্লাসে। হেডমিস্ট্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজির ক্লাসের সময় এ তাঁর ডিউটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অপ্রতিভ পণ্ডিতজি কথার খেই হারিয়ে ফেললেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

...মালবিকা আসছে। কেন তা তিনি জানেন। ফাঁকি দিতে পারলে ও ছাড়ে না; কিন্তু

কী বুদ্ধিমতী! ...ও গন্ধতেল মাখে। পায়ের নখ কাটে না কেন? ...সে এসে টেবিলের উপর থেকে বাইরে যাবার 'পাস'টা নিয়ে গেল। ছেলেদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস'-এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পকেটে করে নিয়ে যান প্রতি ক্লাসে। প্রথমে গিয়েই টেবিলের উপর রেখে দেন, যাতে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। শোভন-অশোভন সম্বন্ধে এত সজাগ কেন তিনি মেয়েদের বেলায়? এত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার প্রয়াস কেন? এসব মেয়েরা তাঁর নাতনির বয়সী; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন না? ছেলেদের স্কুলের সেই নিঃসংকোচ ভাব এখানে আসে না কেন?... ক্লাসে এর পরে কী প্রশ্ন করবেন, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হেডমিস্ট্রেস একবার ক্লাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে যাবার পর এমনিই হয়।...স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ—দ্বন্দ্ব সমাস নিপাতনে সিদ্ধ—তাঁর বড় পছন্দসই প্রশ্ন, ছেলেদের স্কুলে থাকাকালের। নির্দোষ শব্দটি, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে বাধল। আবার খটকা লাগল মনে—আচ্ছা বাঙালি ছেলেদের মুখের ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত বলা, তাঁর কানে কি এত মিষ্টি লাগত?...মনে পড়েছে আর-একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ছেলেদের ক্লাসে পড়াবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কী হয় বলো। বিম্বোষ্ঠী ও বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন; কিন্তু এ প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের অনুপযোগী। এসব শব্দ ব্যবহার না করেও যদি পারা যায়, তবে দরকার কী! কে কোন্ মানেতে নেবে কে জানে। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবাদের মত তাঁকেও সে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়; কে আবার কী কোথা থেকে বলে দেবে।...আচ্ছা ব্যাকরণের অমোঘ বিধানগুলি তো স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ। তবে তাঁর পড়ানোর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন? মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম, ছেলেদের ক্ষেত্রে আর এরকম হয়ে যান কেন তিনি?...দুজনের মনের ভাবই যে আলাদা। আদর্শ ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলে ভক্তি করে—সেটা ভয়ের সম্বন্ধ; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিদি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধ।...কারণটা ঠিক মনের মত হল না।...

'লিলি! কাম্ টু দি বোর্ড।'

যখনই দিশেহারা পণ্ডিতজির মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই রুগ্না কুরূপা মেয়েটিই তাঁর খেই হারানো নিবারণের ওষুধ।

'লেখ, ওরা শব্দের সংস্কৃত কী? এর মধ্যে আবার ভাবছ কী?'

'আমি ভাবছিলাম যে আপনি সমাস না-হয় সন্ধি জিজ্ঞাসা করবেন।'

'বাঃ বেশ জবাব। তাই শব্দরূপ জিজ্ঞাসা করলে পারবে না? তুমি হচ্ছো বিদূষীকল্পা—অর্থাৎ ঈষদূনা বিদূষী। বুঝেছ? সম্ভবত বোঝনি। শব্দরূপ যে জানে না, তার পক্ষে তদ্ধিত বোঝা কঠিন। ব্যাড। গো টু ইয়োর সিট।'

অযথা দরকারের চেয়েও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজি। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ঝাড়ন তিনি টেনে নিলে। অন্য কোনও সময়ে হলে তিনি অপেক্ষা করতেন তার খড়ি আর ঝাড়ন যথাস্থানে রাখবার; তারপর নিতেন।

এতক্ষণে নজরে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আগে থেকেই লেখা আছে—'বিয়াকরণ শব্দটি দিয়া একটি বাক্য রচনা কর। উত্তর : মৌলবীসাহেবের ন্যায় পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে শ্রীতাড়াতাড়িলাল মিশ্র, বিয়াকরণতীর্তে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। গুড। সিট ডাউন।'

মৈথিলী আর বাংলার লিপি একই। সেইজন্য পণ্ডিতজির বাংলা পড়তে কোনও অসুবিধা হয় না। তুরন্ত শব্দটির হিন্দিতে অর্থ তাড়াতাড়ি। তাই তুরন্তলাল নামটা চিরকাল বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের হাসির খোরাক জুটিয়ে এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে তুরন্তলাল নামটার মানে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল। দুষ্টু ছেলেরা তো চিরকাল বাইরে যাবার ছুটি নেবার সময় বলত—তুরন্ত ফিরে আসব পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাসযুদ্ধ সবাই হাসত, আর তিনি বেশ উত্তম-মধ্যম প্রহার দিতেন তাদের। কিন্তু তিনি এখানে মনে মনে হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙালি মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর সম্বন্ধে কৌতূহলের তাঁর সীমা নেই। বোর্ডের লেখাটি নিশ্চয়ই মালবিকার; হ্রস্বইকারটা রেফের মত করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। শব্দবিন্যাসে কিন্তু বেশ রসনিপুণতা আছে। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসছে। মেয়েরা জানে যে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভয়ে পণ্ডিতজি কোনওদিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব বোঝে। তারা যে সব সময় বলাবলি করে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় পণ্ডিতজি অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুঁজে আড়ষ্ট হয়ে কেমন করে বসেছিলেন। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজি ঝাড়ন দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সঃ তৌ তে। 'তে বহুবচন, তে মানে ওরা। শব্দটির সঙ্গে ইংরাজি they শব্দটির কী রকম মিল লক্ষ করেছে লিলি?' তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বলছেন। 'তে'র জায়গায় গিয়ে খড়িসুদ্ধ হাত থেমে গিয়েছে।...সেই সতীসাধ্বী মরবার আগের উক্তিতে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি ওই চায়'। 'ওরা' বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি তখন ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমগ্র পুরুষ জাতিকে তিনি বোঝেননি তো? তা কী করে হবে। ওরূপ সামান্যীকরণ যে ভুল, সে কথা নিশ্চয়ই তাঁর শালাজও জানতেন। তাঁর জানাশোনা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সংযমী পণ্ডিত তিনি দেখেছিলেন। সকলে সে-রকম হতে যাবে কেন! স্বামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যের তীব্রতা বয়স্থা ননদের সম্মুখে কমাবার জন্যই কি তিনি অনিচ্ছায় একবচনের বদলে বহুবচন ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই বা ওরকম ধারণা হল কেন সে পতিব্রতার?

কী ভেবে সে মহিলা 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।...আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবীসাহেবকে একই শ্রেণীর লোক বলে ভাবে নাকি? ব্ল্যাকবোর্ডের উপকার লেখাটা দেখে তো তাই মনে হয়? কেন এরকম ভাবে?...কী দেখে তাঁকেও ওই দলে ফেলল?...

স্কুলের দাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। খামে চিঠি এসেছে পণ্ডিতজির। ডাকপিওন হেডমিস্ট্রেসের কাছে স্কুলের ডাক দিয়ে যায়, তিনি তারপর যার যার চিঠি তার তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দাই-এর হাত থেকে চিঠিখানা নেবার সময়, খুব সাবধানে নিলেন পণ্ডিতজি, যাতে দাই-এর আঙুলের সঙ্গে তাঁর আঙুল না ঠেকে। এসব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সদাজাগ্রত। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল মনে। প্রশ্ন করলেন নিজেকে—পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য এই এত শুচিবাই কেন?...কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজি চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখেছেন তাঁর দিদিকে। এদেশে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই খামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই বোন আর ভগ্নীপতিকে যেতে লিখেছেন। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজি হচ্ছিল না; অতি কষ্টে ধরে-বেঁধে রাজি করানো গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কী জানি কেন পণ্ডিতজির মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।... দুই মাসও কাটেনি! সবুর সইছে না! আর কিছুদিন পর করলেই তবু কতকটা শোভন হত!...

'লিলি, বুঝেছ—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণত অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলো তো একজন লোকের বেলায় কখন বহুবচন ব্যবহার হয়? জানো না? নেক্সট্! নেক্সট্! এনি বডি ইন্ দি ক্লাস? কেউ জানো না?...(মালবিকা থাকলে পারত)...। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জানো না? স্ত্রী উক্তিতে পতির সম্বন্ধে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হাতে পারে। বুঝেছ?

পণ্ডিতজি ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—'গৌরবে বহুবচন'। লেখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল লিলির দিকে। কাঁদছে তাঁর বকুনি খেয়ে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রহার খেয়েও কাঁদত না; কিন্তু সামান্য কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু রূঢ় ভর্ৎসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে!...

'ললিতা, এবার তুমি বলো। সন্ধি। খুব সহজ প্রশ্ন করব তোমাকে। মধুউৎসবঃ কী হয়? বানান করে বলো। গুড। হ্যাঁ, দীর্ঘউকার, মনে করে রেখ। সমাস কর—দ্বিতীয়া ভার্যা যস্য সঃ। হ্যাঁ। গুড। সিট্ ডাউন। নেক্সট্। গায়ত্রী, তুমি ভ্রম সংশোধন কর এই বাক্যটির—ভ্রমরাঃ পুষ্পমধু পিবতুম ধাবন্তি। না। ভেবে বলো। হল না। এনি বডি ইন

দি ক্লাস; কেউ পার না?...(মালবিকা এখনও ফেরেনি)।...পিবতুম ভুল। পাতুম হবে। মনে করে রেখ।'

...আজকে মালবিকাকে বেশ করে বকে দিতে হবে। এ কী অন্যায় কথা! গিয়েছে, সে কি এখন! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে! প্রতিদিন সে এই করে! নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়েছে! এতটুকু আক্কেল নেই—অন্য মেয়েদেরও তো ওই পাসখানা নেবার দরকার হতে পারে!...

মেয়েরা সকলেই জানে যে পণ্ডিতজির সবচেয়ে কড়া ধমক হচ্ছে 'ব্যাড' শব্দটি।

মালবিকা এসে ক্লাসে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবার আর দু-চার মিনিট মাত্র দেরি আছে। পাসখানা পণ্ডিতজির টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। তেলের গন্ধটা নাকে এল।

...শোভনঃ গন্ধ শোভনোগন্ধ। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন?...

'অনেক দেরি হল তোমার।'

'আমি তো পণ্ডিতজি পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ আর সামাসার উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।'

মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে না হেসে উপায় নেই। বড় বড় পাকা গোঁফের মধ্যে হাসিটুকু আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরাও হাসছে। পণ্ডিতজি হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।'

'উচ্চারণের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজি?'

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, 'না না। তুমি বলো তো বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কী হয়?'

এত সহজ প্রশ্ন? মালবিকার মত ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া মেয়েকে? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

'বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়।'

এতক্ষণে পণ্ডিতজি নিজেকে সামলে নিলেন। গুড, সিট ডাউন, বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্তে আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসা মাত্র আগেই ওকে কড়া ধমক দিতে হবে—ব্যাড বলতে হবে! মুহূর্তের অসংযতচিত্ততায় তিনি ব্যাড বলতে ভুলে গিয়েছেন! শুধু তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিহগ জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই বিচ্যুতির কথা ধরতে পেরেছে? আতঙ্ক, বিষাদ, আর অনুশোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের কুহেলির মধ্যে একটু জিনিস তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। 'ওরা' শব্দের অর্থ। ভদ্রমহিলা কাউকে বাদ দেননি। পক্ককেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পর্যন্ত না। অদ্ভুত অর্থবোধিকা শক্তি কথা কয়টির। বৃথাই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অলঘু বিষয়কে লঘু করবার

চেষ্টা করছিলেন, গৌরবে-বহুবচন সূত্র দিয়ে। বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিলেন না।

ঝাড়নখানাকে নিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'গৌরবে বহুবচন' কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিনকার পোষা আত্মগৌরবটুকুও মুছে গেল এরই সঙ্গে।

'এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন কখনও আসে না।'

ঘণ্টা পড়ল ক্লাস শেষ হবার।

খড়ির গুঁড়ো ফুঁ দিয়েছে উড়িয়ে নেবার ছলে, নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাকরণের সমস্যাটা মিটেছে; কিন্তু অঙ্কর উত্তর মিলে যাবার পরিতৃপ্তি নেই এর মধ্যে। নিজের উপর অপ্রসন্নতায় সব-কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—তিনি, মৌলবীসাহেব, ছোটশালা,—সবাই!...গতৌঔৎসুক্যম—গতাবৌৎসুক্যম...। শোভন আচরণের পথ দিয়ে তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে বিশ্রামঘরের দিকে চলেছেন। ...আকৃষ—তঃ আকৃষ্টঃ...। সহস্রজোড়া কৌতূহলী চোখ নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ করছে,—চিনে গিয়েছে সবাই তাঁকে—বিবস্ত্র, নগ্ন তিনি আজ—লজ্জার ভারে ঝুঁকে পড়েছেন—ঘরে ঢুকবার আগে চৌকাঠে হোঁচট খেলেন।

টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে, অবিরাম গতিতে। এর জ্বালায় টেবিলের উপর একখানা বই পর্যন্ত রাখবার জো নেই!—পুস্তক হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই বকধার্মিক লোকটা যদি চোখদুটোও খুলে রাখত পা দোলানোর সময়, তাহলে আর তাঁর কানে পইতা জড়ানো অবস্থায় ক্লাসে যেতে হতো না আজ।

'ও মৌলবীসাহেব, ঘুমিয়ে নাকি? একটা কথা বলছি—এতদিন বলি-বলি করেও বলিনি—কিন্তু মনে করবেন না। আপনি যদি আবার বিবাহ করেন, তাহলে হেডমিস্ট্রেস আর স্কুল কমিটির মেম্বাররা বিরক্ত হবেন।'

মৌলবীসাহেব চোখ বোজা অবস্থাতেই ছড়া আওড়ালেন, 'জো গুল কি জোহিয়া হ্যায়, উসে কেয়া খার কা খট্‌কা? যে গোলাপ তুলতে চায় তার কি কখনও কাঁটার ভয় করতে চলে?'

...বলা বৃথা লোকটাকে। অলঘুম লঘুম্ করোতি—লঘু-করোতি। ঘ-এ দীর্ঘউ হবে, বুঝলে মালবিকা। ...আচ্ছা, আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে চেপে গেলে কেমন হয়? পোস্ট অফিসে কত চিঠিই তো হারিয়ে যায়। তাহলে তাঁকে আর যেতে হয় না ছোটশালার বিয়েতে।...কিন্তু, মেয়েমানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ! তাঁরা যে সব ধরে ফেলে। তারা যে পুরুষদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়।...কোনও উপায় নেই। ...তবু তিনি চেষ্টা করে দেখবেন আজ।—আজ প্রথম জেনেশুনে মিথ্যাচার করবেন।...কিন্তু সত্যিই কি বকধার্মিকের এই প্রথম মিথ্যাচার?

মহাসংগম

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পশুপতি থুরথুরে বুড়া হইয়া পড়িয়াছে।

এই মাঘে তাহার বয়স সাতাশি পূর্ণ হইল। দু'টো একটা যুগ নয়, পশুপতি প্রাণপণ চেষ্টায় সাত যুগের বেশি পৃথিবীতে টিকিয়া আছে।

বিপুল সুদীর্ঘ জীবন।

কিন্তু তার সামনে যে মৃত্যু, সে আরও বিপুল, আরও সুদীর্ঘ! মৃত্যুকে কে ঠেকাইয়া রাখিবে? সাতাশি বছরের আয়ু নয়; সে বরং মৃত্যুকেই কাছে ডাকিতেছে বেশি। পৃথিবীতে যে যতদিন বেশি বাঁচবে সে তত গিয়া পড়িবে মরণের কাছাকাছি। একদিন দেখা যাইবে তাহার দেহে তাহার মনে, তাহার ক্ষীণ স্পন্দিত প্রাণের জগতে মরণকে যেন অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জীবনেই যেন হইয়াছে জীবনের মরণের মহাসংগম।

পশুপতি বিকল হইয়া পড়িয়াছে, অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে। গায়ের চামড়া তাহার বিবর্ণ, লাল, সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত। মাথায় কুড়ি বছরের পুরনো টাকটি পর্যন্ত তাহার ঢিলা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কানে সে ভাল শুনিতে পায় না। একটি অলৌকিক মর্মরিত জগতে সে বাস করে। বিরাট বায়ুস্তর হইতে কোটি মিশ্রিত শব্দ। অহরহ তাহার দুই কানে আঘাত করে, কাছে কলরব করে মানুষ পশু আর পাখি, সব মিলিয়া তার শুধু একটি অবিচ্ছিন্ন চাপা গুঞ্জন ধ্বনির অনুভূতি হয়। বাড়ির লোকে তাহার সঙ্গে কথা বলে চেঁচাইয়া।

বাড়ির লোকে তাই তাহার সঙ্গে কথা কয় কম। কত চেঁচাইবে!

চোখে এখনও সে অল্প অল্প দেখিতে পায়, কিন্তু চোখের পাতা দুটি সিসার মত ভারী হইয়া সর্বদাই তাহার চোখদু'টিকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, টানিয়া খুলিয়া রাখিতে তাহার কষ্ট হয়, পরিশ্রমও যেন হয়। ভ্রূ পাকিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মুখে আর একটাও দাঁত নেই। চোয়ালের দু'পাশ দিয়া গালের গোড়া হইতে দুটি নিস্তেজ নীল শিরা তাহার শীর্ণ গলাটি বাহিয়া নিচে নামিয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ডটি তাহার ধনুকের মত বাঁকা। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাটি সে কোনও মতে নিজের কোমরের লেভেল ছাড়াইয়া উপরে তুলিতে পারে না। দুই হাতে মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়; লাঠি না থাকিলে সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। দেহের ভারকেন্দ্র তাহার পায়ের আয়ত্তাধীন সীমানা ছাড়াইয়া অনেকখানি সামনে আগাইয়া গিয়াছে।

উবু হইয়া বসিলে দুই হাঁটু মাথার কাছে ঠেলিয়া ওঠে।

পশুপতি থাকে চাঁদ পুতিয়ার শ্রীমন্ত সরকারের বাড়ি।

শ্রীমন্ত তাহার কেহ নয়। দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে। পশুপতির একটি ছেলে ছিল। হয়তো এখনও আছে। কেহ তাহার খবর রাখে না। অনেক কাল আগে সে পলাইয়া গিয়াছিল সেই বর্মামুলুকে। মাঝখানে একবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল সেইখানেই বিবাহাদি করিয়া সে সুখে বসবাস করিতেছে, তারপর আর কোনও খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমন্ত মোক্তার; মফঃস্বলে মোক্তারি করিয়াও অনেকে পাকা দালান তোলে কিন্তু শ্রীমন্ত এখনও সেটা পারিয়া ওঠে নাই। বাড়িটা তাহার বড় কিন্তু কাঁচা। সদরের ঘরটা শ্রীমন্তের মোক্তারি ব্যবসার জন্য লাগে। অন্দরের ঘরগুলি তাহার দখল করিয়া থাকে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। বাড়ির একেবারে পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের নিচু ভিটাতে একখানা ছোট ঘর আছে। মাঝখানে বেড়া দিয়া ঘরখানাকে দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তার একটা ভাগে কতকগুলি চাষের যন্ত্রপাতির সঙ্গে বাস করে পশুপতি।

পাশের ভাগটাতে থাকে কুন্দ, তাহার দু'টি ছেলেকে লইয়া। ধরিলে কুন্দ হয়তো শ্রীমন্তের কেহ হয়, না ধরিলে সে পরের চেয়েও পর। কিন্তু শ্রীমন্ত বোধহয় সম্পর্কটা ধরিয়াই এই খোপটার ঘুঁটেগুলি সরাইয়া তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছে। কারণ, পশুপতি তাঁহার পিতৃবন্ধু, মাননীয় ব্যক্তি। পশুপতির পাশের খোপে যাকে-তাকে শ্রীমন্ত থাকিতে দিতে পারে না।

রাতটা পশুপতি তাহার ঘরে ছোট একটি চৌকিতে শুইয়া কাটায়। দিনেরবেলা ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়াটির একপ্রান্তে দু'পরল চটের উপর পুরু করিয়া বিছানো একটা কাঁথায় বসিয়া থাকে। পাশে একটা ওয়াড়হীন তেলচিটা বালিশ দেওয়া আছে। বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কাত হইয়া বালিশে মাথা রাখিয়া সে শয়ন করে।

গ্রীষ্মকালে এখানে থাকে ছায়া। ঘরের ডাইনে সূর্য উঠিয়া বাঁদিকে অস্ত যায়, শীতকালে ঘরের আড়াল হইতে সূর্য সামনে সরিয়া আসে। বড় ঘরের চাল ডিঙাইয়া, রান্নাঘরের পাশে ঝাঁকাল আমগাছটার মাথার ওপর দিয়া সমস্ত শীতকালটা পশুপতির বসিবার স্থানটিতে রোদ আসিয়া পড়ে।

মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়াও সমস্ত রাতে পশুপতি হি হি করিয়া কাঁপে, দেহে তাঁহার উত্তাপ এত কম যে শীতে হাড়ের ভিতরে পর্যত যেন একটা জ্বালা কাঁপুনি ধরাইয়া দেয়। সকালে তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া যে যার তাহাকেই সে জিজ্ঞাসা করে রোদ উঠল গা? হ্যাঁগো দাওয়াতে রোদ এল, আঁ?

কাঁপানো জড়ানো গলায় সে সকলের কাছে রোদের, উত্তাপের, জীবনের আবির্ভাবের সুসংবাদটি শুনিতে চায়। কেহ সংক্ষেপে জবাব দিয়া বলে 'এই উঠল', কেহ নিজের বিপুলতর প্রয়োজন কিছু না বলিয়াই চলিয়া যায়, কেহ নির্বিকার চিত্তে শোনায় হতাশার বাণী। 'রোদ কি এত সকালে ওঠে? ঢের দেরি এখন দাওয়ায় রোদ আসতে।'

কুন্দ কোন্ সকালে উনান ধরাইয়া ডাল চাপাইয়াছে। সে একসময় আসিয়া বলে, 'কি হাড় কাঁপানো জাড় গো বাবা এবছর! ছেলেপুলে মোল। একটু আগুন দেব গো দাদামশায়?'

আগে রাত্রে শুইতে যাওয়ার সময় উনান হইতে এক মালসা আগুন কুন্দ পশুপতির কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু একবার মালসার আগুন তাহার বিছানায় লাগিয়া যাইবার উপক্রম হওয়ার পর হইতে এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছে। আগুন পোহাইতে গিয়া বুড়ো কি শেষে পুড়িয়া মরিবে। সকালে চারিদিকে অনেক লোক, সে ভয় নাই।

পশুপতি সাগ্রহে বলে, 'দে দিদি, একটুকু আগুন দেত'।

কুন্দ মালসায় একটু আগুন করিয়া পশুপতির কাছে রাখিয়া যায়।

রোদ উঠিলে কুন্দ অথবা তাহার ছেলে কেশব পশুপতিকে ধরিয়া দাওয়ায় লইয়া যায়। কুন্দর দু'বছরের ছোট ছেলেটির মত সেও যেন অবোধ অসহায় শিশু। বার্ধক্যের গোড়াতেই পিছু চলিতে আরম্ভ করিয়া এখন সে যেন আবার তাহার সেই আদিম অর্থব শৈশবে গিয়া পৌছিয়াছে।

পশুপতি দাওয়ায় বসিয়া থাকে নির্বাক নিস্পন্দ জড়পিণ্ডের মত। তাহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই; হৃদয়ের অনুভূতি নাই। ঠাণ্ডায় সে ভেতরে বাহিরে জমিয়া গিয়াছে। চোখ বুজিয়া সূর্যদেবতার অন্ত্যজ ভক্তের মত সে শুধু সবিনয়ে ব্যাকুল আগ্রহে সূর্যকিরণকে সর্বাঙ্গ দিয়া শুষিয়া লইতে থাকে।

সে বাঁচিতেছে। রাত্রে সে একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার বাঁচিতেছে। দেহে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চিত হইলে সে ঘোলাটে চোখ মেলিয়া তাকায়।

প্রভাতে আপন আপন ক্ষুধা তৃষ্ণা হিংসা ও ভালবাসা লইয়া শ্রীমন্তের বৃহৎ পরিবারটি জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খেলা ও কর্তব্য পালন চলিবে। পৃথিবীর মাটিতে, গাছের ডালে, আকাশে সর্বত্র বিচিত্র চঞ্চল প্রাণ। কিন্তু পশুপতির স্থান এই সজাগ উদ্বিগ্ন ব্যস্ততার বাহিরে, দাওয়ার এই কাঁথাটির উপর। তাহার স্তিমিত নিষ্প্রভ জগতে আবছা মানুষগুলি চলাফেরা করে, কেহ কাছে আসিলে মনে হয়, কুয়াশার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। মাঝে মাঝে কারও চিৎকার করিয়া বলা কথার দু'এক টুকরা কথা তাহার কাছে ভাসিয়া আসে— বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসে। পৃথিবীর মানুষের জীবনে, পৃথিবীর আলো শব্দ ও গন্ধে পশুপতির দাবি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

না থাক। পশুপতির বিশেষ কোনও ক্ষোভ নাই। সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয় করিয়া রাখিবার উৎসাহও তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অভ্যাস, কতকগুলি নিয়ম এখানে তাহাকে পালন করিয়া চলিতে হয়, সে তাহা অনেকটা যন্ত্রের মতই করিয়া যায়— প্রায় বিগড়াইয়া আনা যন্ত্রের মত। জীবনের অসংখ্য বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, জীবনের প্রতি মমতাও বুঝি তাহার গিয়াছে কমিয়া, মানুষের প্রতিও। আপনার বয়সের দুর্বিসহ ভারটা বহিয়া সে বুঝি ভয়ানক স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষেরা তাহাকে

যে আশ্রয় দিয়াছে সেই উপকারী মানুষটিও তাহার পরিবারের, দৈনন্দিন সুখদুঃখের প্রতি তাহার আসিয়াছে উদাসীনতা।

তবু, ওর মধ্যেই শরীর একটু ভাল থাকিলে সে একটু কৌতূহল বোধ করে, মনে মনে কি যেন ভাবে। ইশারায় শ্রীমন্তকে সে ডাকিয়া বলে, খেঁদির জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে? হোক, ভাল করে খোঁজ-খবর কর বাবা, মেয়ে বড় লক্ষ্মী।

গভীর দায়িত্ববোধের উপযোগী মুখভঙ্গি করিয়া পশুপতি জবাবের প্রতীক্ষা করে। শ্রীমন্তের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মাথার চুল তাহারও প্রায় অর্ধেক সাদা হইয়া আসিল। সে অবাক হইয়া বলে, খেঁদির পাত্র? সাতবছরে পড়ল না মেয়ে এখনি পাত্র কিসের?

কথাটা সে দু'বার বলিলে পশুপতি শুনিতে পায়। তাহার মাথার মধ্যে কেমন একটা গোল বাধিয়া যায়। সায় দিয়া বলে, তা বটে, খেঁদি এখনও ছোট বটে খুব।

নিঝুম হইয়া একটু ভাবিয়া সে আবার বলে, খেঁদি নয় গো, বলছি মুখীর কথা। বলছি মুখীর কথা তুমি শুনেছ খেঁদি। মুখীর কি হল— পাত্তরের?

যেমন-তেমন একটা জবাব দিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে বুঝায়। পশুপতির চোখ মিটমিট করে। ক্ষণে ক্ষণে মাথা নাড়িয়া সে শ্রীমন্তের অর্ধেক শোনা অর্ধেক না-শোনা কথায় সায় দিয়া যায়।

মুখীর বিবাহের তাহার চিন্তা ও উদ্বেগের যেন সীমা নাই।

কিন্তু পশুপতির হৃদয়যন্ত্রটি একেবারে বিকল ও অসাড় হইয়া যায় নাই। কুন্দর জন্য মার বুকে মমতা আছে।

হয়তো এই মমতার মর্ম কথাটি এই যে কুন্দর সেবা তাহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা দোষের কথা নয়। মানুষের ধর্মই এই, সাতাশি বছর বয়সেও মানুষকে এই ধর্মই পালন করিতে হয়। সেবা হোক, মমতা হোক, তোষামোদ হোক, অর্থ হোক, দু'পক্ষের প্রয়োজন আছে বলিয়াই সংসারে এসবের আদান-প্রদান চলে।

শোয়ার আগে কুন্দ যখন পশুপতির খবর লইতে আসে, রাত্রি তখন অনেক। চারিদিকে নিস্তব্ধ। পশুপতি এক একদিন ফিসফিস করিয়া বলে, দরজা বন্ধ কর দিদি।

কুন্দ দরজা বন্ধ করিলে পশুপতি আরও বেশি ফিসফিস করিয়া বলে, দেখ তো আছে কি নেই? কুন্দ হাতের ডিবরি নামাইয়া চৌকির কোণের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া এখনও বাঁধা আছে, কেহ লইয়া যায় নাই।

পশুপতি শঙ্কিত হৃদয়ে অপেক্ষা করে। কুন্দ সিধা হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলে, আছে দাদামশাই যাবে কোথা? পশুপতি নিশ্চিন্ত হইয়া বলে, তোকে দিয়ে যাব দিদি, তোর কেউ নেই তোকেই দিয়ে যাব।

এটা স্তোকবাক্য নয়, টিনের তোরঙ্গটি পশুপতি সত্যসত্যই তাহাকে দিয়া যাইবার কামনা পোষণ করে। কুন্দও যে লোভ না করে এমন নয়। কিন্তু বাক্সে কি আছে পশুপতি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। তাহার ভাসা ভাসা জবাবে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে,

বাক্সে গহনা আছে, টাকা আছে, অনেক লোভনীয় দামি জিনিস আছে। কুন্দ এতটা বিশ্বাস করে না। কিছু টাকা আছে। দু-একশো। বাক্সটা কুন্দ একদিন সন্তর্পণে নাড়িয়াও দেখিয়াছে। ভিতরে ঝম ঝম শব্দ হয়।

কুন্দর ছোট ছেলেটিকে পশুপতি ভালবাসে।

সকালে দাওয়ায় দু'টি মুড়ি ছড়াইয়া কুন্দ ছেলেটাকে তাহার কাছে বসাইয়া দিয়া যায়। খোকার দিকে তাকাইয়া ফোকলা মুখে পশুপতি একটু হাসে। দুটি শুষ্ক শীর্ণ হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলে, আ আ—মনি আ—সোনা আ—বেশ একটু সুর করিয়াই যেন বলে। দু-আঙুলে একটি মুড়ি খুঁটিয়া মুখে তুলিতে গিয়া তাহার কচি দাঁত কটি চিক-মিক করিয়া খোকাও হাসে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিবার সামর্থ পশুপতির নাই। হাত বাড়াইয়া ওকে সে ছুঁইতে পারে, ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে আনিতে পারে, ওর গায়ে মাথায় বুলাইতে পারে হাত। আর কিছু পারে না।

খোকা টলিতে টলিতে হাঁটিতে পারে। একদিন সে পশুপতির পায়ের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা জানিত মার মত পশুপতিও খুশি হইবে এবং যে ভাবেই ঝাঁপ দিবে দু'হাতে তাহাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু খোকাকে সামলানো দূরে থাক, পশুপতি নিজেই হুমড়ি খাইযা পড়িয়া গিযাছিল।

দু'জনেই সেদিন কাঁদিয়াছিল—জীবনের দুই প্রান্তের দুটি শিশু। খোকাব কান্না বাড়ির লোকে শুনিয়াছিল আর পশুপতির কান্না দেখিয়াছিল। দন্তহীন মুখখানি হাঁ করিয়া অবলা প্রাণীর মত সে কাঁদিয়াছিল। সামান্য ব্যথাও সে আজকাল সহিতে পারে না। দেহেব কোথাও তুচ্ছ একটি আঘাত লাগিলে বহুক্ষণ অবধি তাহার সর্বাঙ্গে বেদনায় কন কন করিতে থাকে।

অথচ আঘাত মাঝে মাঝে লাগেই।

কুন্দরের অনেক কাজ। সব সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। লাঠিতে ভর দিয়া পশুপতিকে উঠিতে হয়। তিনটি পায়ের সাহায্যে কষ্টে সে নিচু দাওয়া হইতে নিচে নামে, আরও কষ্টে দাওয়ায় উঠে। চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরে যায় এবং বাহিরে আসে। পড়িয়া যাওয়ার মত ভয়ানক ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু প্রায়ই পায়ে চোট লাগে, লাঠিটা মাথায় ঠুকিয়া যায়; চৌকির কোণে হাঁটুর কাছে ঠোক্কর লাগে। কোনওরকমে শ্বাস রোধ করিয়া ঘরের শয্যায় অথবা দাওয়ার আশ্রয়ে পৌঁছিয়ে পশুপতি অনুশ্বাসীয় হা হা শব্দে কাতরতা প্রকাশ করে; তাহার স্তিমিত চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

একদিন কুন্দর বড়ছেলে কেশব তাহাকে প্রাণান্তকর আঘাত দিয়াছিল। খোকার মত সেও একরকম পশুপতির গায়ের উপরে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে ইচ্ছা করিয়া নয়।

কেশব ষোল-সতেরো বয়সের দুরন্ত শয়তান ছেলে। স্কুলে যায় না, লেখাপড়া কবে

না, একটু একটু শ্রীমন্তের মুহুরির কাজ শেখে, ফাইফরমাশ খাটে, খায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে কুন্দ ও পশুপতির কাছে পয়সা আদায় করে।

যত সে শয়তান ছেলে হোক, প্রাণ যে তাহার প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। সে গাছে ওঠে, কাঠ চেলায়, মারামারি করে, আর প্রবল নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মত সর্বদা তাহার চেয়ে অসহায় মানুষ ও পশুকে নির্যাতন করার সুযোগ খোঁজে।

তাহার এই অধীর চঞ্চল প্রাণাবেগের কাছেই পশুপতি বোধহয় আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ছেলেটাকে সে ভালবাসে, ভয় করে, পূজা করে, এবং ঘৃণা করে। সামনে সজনে গাছের ডালে কবে এক অজানা পাখি বাসা করিয়া ছিল, ডিম ফুটিয়া বড় হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তবু গাছে উঠিয়া কেশবের তাহা নিজের চোখে দেখা চাই। সজনে গাছের ডাল ভারি বিশ্বাসঘাতক। কত মোটা ডাল কত সহজে ভাঙিয়া যায়—ভিতরে শাঁস নাই। কেশব ঢিপ করিয়া পড়িয়াছিল পশুপতির সামনে। সে আতঙ্ক পশুপতি বাকি জীবনে ভুলিবে না। আর গাছ হইতে পড়িয়া কেশবকে সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া যাইতে দেখিবার বিস্ময়। কেশব ঘরে ঢোকে উঠান হইতে একলাফে দাওয়া ডিঙাইয়া এবং এক এক সময় অকারণে ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া বোঁ করিয়া এক পাক ঘুরিয়া যায়। এবং তারপরে আরও অকারণে ওই উঠানের প্রান্তে শ্রীমন্তের উদাসীন ছেলেমেয়ে বৌদের দিকে আড়চোখে চাহিতে থাকে।

কিন্তু তাহার বাহাদুরিটা সম্যক বুঝিতে পারে শুধু পশুপতি। হৃদয়ের যতটুকু উষ্ণতা তাহার আজও জীবনের কামনা করে তাই দিয়া কেশবকে সে বোধ হয় হিংসা করে। তাই ভালও বাসে। শিহরণ আজ পশুপতির দুর্লভ নয় কিন্তু ছেলেটার কাণ্ডে তাহার যে শিহরণ জাগে তাহা অভিনব, তাহা মৌলিক। তাহার ভীরু দুর্বল বুক আতঙ্কে ঢিপ ঢিপ করে ব্যাকুল হইয়া কেবশকে মুখে এসব কাণ্ড করিতে বারণ করে। কিন্তু দু'চোখ প্রাণপণে কুঁচকাইয়া এই চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখিতেও ছাড়ে না।

শেষে বলে, শোন্ কাছে আয় দিকি! আয় না দাদা, আয়। ওরে আয় না!

কেশবকে কাছে আনিয়া সে কি করিবে কি? কিছু না। শুধু বসাইয়া রাখিবে। নিজে তো দিবারাত্রি বসিয়াই আছে, এই উত্তাল প্রাণ-শক্তিকেও সে একটু কাছে বসাইয়া রাখিবে। হয়তো প্রাণপণে দেখিবে ও দুই হাতে স্পর্শ করিবে। কিন্তু সেটা বাহুল্য। জীবনের এই অসংযমকে নিজের কাছে সংযত করিয়া রাখাই তাহার আসল কামনা।

একদিন দুরন্তপনার মধ্যে অতবড় ছেলে পশুপতির গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তেমন ভাবে পড়িলে পশুপতি বাঁচিত কিনা সন্দেহ, মাটিতে প্রথমে একটা হাত ফেলিয়া কেশব নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। তবু তাহার হাঁটুর আঘাতে পশুপতির বাঁকা কোমর যেন ভাঙিয়া গেল। দু'দিন তাহার উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

কেশব প্রায়ই নানা কারণে শাস্তি পায়। সেদিন তাহার শাস্তিটাও হইল ভীষণ। শ্রীমন্তের হাতের শেষ থাপ্পড়টাতে সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

এবং শুধু কেশবের উপর নয়, কুন্দকেও অনেক কথার মার সহ্য করিতে হইল। ছেলেকে যদি সে শাসন না করে এ বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না, এমন আশঙ্কাজনক কথাটাও যেন শোনা গেল।

কোমরের ব্যথায় সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিলেও ওর মধ্যেই পশুপতির কি রকম একটি ব্যথিত আনন্দ হইয়াছিল। বাড়িতে যে হইচই বাধিয়াছিল, দু'তিন জনে তাকে যে পাখা করিয়াছিল, কেশব যে চেঁচাইয়া কাঁদিয়াছিল। এসব দিয়া যেন এই সত্যটাই যাচাই হইয়া গিয়াছে যে জগতে আজও তাহার মূল্য আছে। তাহাকে দুবার 'আহা' শুনাইয়া কেশবকে একটু বকিয়া এ ব্যাপার তো সকলে শেষ করিয়া দিতে পারিত। তার বদলে একেবারে সমারোহ বাধিয়া গিয়াছিল।

কয়েক বছর ধরিয়া পশুপতির মনে একটা কষ্ট ছিল। তার মনে হইত, এতকাল বাঁচিয়া আছে বলিয়া বুঝি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, মরণকে এভাবে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষের কাছে সে বুঝি অপরাধ করিতেছে। কবে সে মরিবে তারই প্রতীক্ষায় কারও আর ধৈর্য নাই। ব্যাপারটা চুকিয়া গেলে সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ছেলের বর্মা পালানোর আগে বৃদ্ধ বয়সে যে পরিমাণ আরাম ও সুখ পশুপতি কল্পনা করিত তাহার কিছুই সে পায় নাই! চারিদিক হইতে আসিয়াছে শুধু অবহেলা, অনাদর! সকলে তাকে যেন ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। দিনের পর দিন যত সে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, মানুষকে তাহার প্রয়োজন হইয়াছে যত বেশি, মানুষ তাহার তত দূরে সরিয়া গিয়াছে। মানুষের সুখদুঃখে পশুপতি আর ভাগ বসাইবার কামনা রাখে না জীবনের সমারোহে তাহার বরং বিতৃষ্ণাই আসিয়াছে। কিন্তু মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছে বলিয়া সকলে রাগ করিবে, তাহার অপরিহার্য সেবা ও যত্ন সে পাইবে না, জীবনের শেষ দিনগুলি কষ্ট ও অসুবিধায় থাকিবে এটা সহ্য করা একটু কঠিন। ছ'মাসের জন্য কেহ বিদেশ যাওয়ার আয়োজন করিলে মানুষের কাছে হঠাৎ তাহার নাম বাড়িয়া যায়। সে চিরকালের জন্য বিদেশের চেয়েও সুন্দর বিদেশে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, অথচ মানুষের কাছে তাহার দাম গেল কমিয়া।

কোমরে ঘা খাইয়া সকলকে ব্যস্ত করিতে পরিয়া পশুপতির এই দুঃখটা কমিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মৃত্যুর সঙ্গে তাহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে মানুষ অবহেলা করে নাই, মর্যাদা দিয়াছে। জগতে সে নিরাশ্রয়, তাহার ছেলে থাকিয়াও নাই। তাহার দেহ পঙ্গু, মন কুয়াশায় আধ অন্ধকার। তবু পথে পথে তাহাকে যে আজ ভিক্ষা করিতে হয় না। একটি ঘেরা আশ্রয় ও দু'টি অন্ন যে তাহার জুটিতেছে, সে শুধু তাহার বয়সের জন্যে। মরিতে তাহার বেশিদিন বাকি নাই বলিয়া। বেশি কিছু হয়তো মানুষ দেয় নাই, কিন্তু যতদিন সে না মরে ততদিন তাহার বাঁচিয়া থাকার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছে সকলেই।

এই জীবনের সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া আসিয়াছে বলিয়াই পরের বাড়ি থাকিয়া পরান্ন ভোজনে লজ্জা নাই।

সেদিনের ব্যাপার পশুপতিকে এই সান্ত্বনা দিয়াছে কিন্তু তাহার পর হইতে কুন্দ ও

কেশব একটু বদলাইয়া গিয়াছে। কুন্দ করিয়াছে রাগ আর কেশব পাইয়াছে ভয়।

কুন্দ মুখে কিছু বলে নাই, রাগ নাই, রাগ দেখাইয়াছে কাজে। তাহার কাছে যে পরিমাণ সেবা পশুপতি না চাহিয়াই পাইত এখন আর সেরকম পায় না। পশুপতির টিনের তোরঙ্গ টি চৌকির পায়ার সঙ্গে আজও বাঁধা আছে। তাছাড়া বুড়ো অসহায় মানুষকে একেবারে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কুন্দর ছিল না। সে সাহসও ছিল না। সাহস না থাকার কারণ এই পশুপতিকে শ্রীমন্ত ও তাহার পরিবার যতই ভুলিয়া থাক কুন্দ যে তাহার সেবা করে এটা তাহারা জানিত এবং এই ব্যবস্থাই সকলে মানিয়া লইয়াছিল। রান্না করার মত এও কুন্দর একটা কর্তব্য।

তবে ইচ্ছা করিলে আইন বাঁচাইয়া রাজার আইনও ভাঙা যায়। কুন্দও তেমনিভাবে নিজেকে বাঁচাইয়া পশুপতিকে মারিতেছিল। শেষের দিকে শীত আরও তীক্ষ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে মৃতপ্রায় বৃদ্ধটিকে এক মালসা আগুন দেওয়ার সময় কুন্দ করিয়া উঠিতে পারে না। কোনওদিন রোদ উঠিয়া পড়িলেও পশুপতিকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে না আসে কুন্দ না আসে কেশব, সারারাত শীতে জমিয়া গিয়া নিজে নিজে বাহিরে যাওয়ার শক্তিও পশুপতি তখন খুঁজিয়া পায় না। কোনওদিন দেখা যায় তার ছেঁড়া কাঁথা রাত্রে কেহ তুলিয়া রাখে নাই, বাড়ির লোম ওঠা বুড়ো কুকুরটা তার উপরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। পশুপতির ভিজানো সাগু মাঝে মাঝে থাকিয়া যায়, তার মাছের ঝোলে মশলা বেশি হয়, তার বলক-তোলা বরাদ্দ দুধটুকু অর্ধেকের বেশি সে পায় না। রাত্রে সরাসরি কুন্দ নিজের ঘরে গিয়া দরজা দেয়।

পশুপতি মাঝের বেড়া ভেদ করিয়া ডাকে, ও কুন্দ? ও দিদি, শুলি নাকি? শোন দিদি একবার।

কুন্দ ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব হাঁকিয়া বলে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশুপতি খানিক চুপ করিয়া থাকে। তারপর আবার বলে, এই তো শুল।

একবারটি ডাক না কেশব? ডাক দাদা, ডাক তোর মাকে।

কুন্দ আবার ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব বলে, মার জ্বর গো দাদামশায়, ডাকতে মানা ক'রে শুয়েছে।

পশুপতি তারপর চুপ করিয়া যায়। বড় শীতল পৃথিবী, বড় প্রাণহীন। হয়তো আজ রাত্রে সেও হয়তো শীতল হইয়া যাবে। এমন তো কত লোকে যায়, বিছানায় শুইয়া শীতার্ত আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় পশুপতির ছেলে বর্মা পালাইয়াছে, সাতান্ন বছর বয়সের সময় মরিয়াছে তার বউ, আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এমন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পশুপতি আরও নিঃসঙ্গ আরও গাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিয়াছে।

ও ঘরে ছোট ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিলে কোন্ জাগ্রত মাতার আদরে হঠাৎ তাহার কান্না থামিয়া যায় পশুপতির বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু কুন্দকে আর সে ডাকে না। বরফের মত শীতল নির্বোধ পা দু'টি হইতে দেহের দিকে জমজমাট মৃত্যুর ক্রমিক অগ্রগমনে বাধা

পড়ায় কষ্টে লেপ কাঁথা সরাইয়া লাঠি খুঁজিয়া যে চৌকির নিচে নামে। উবু হইয়া বসিয়া লাঠিটা পাঠাইয়া দেয় চৌকির তলে সেইখানে, যেখানে তার টিনের তোরঙ্গটি আছে। লাঠি দিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তোরঙ্গটির অস্তিত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চৌকিতে ওঠে।

তখন ঈশ্বরকে পশুপতির মনে পড়ে। পৃথিবীর আর কারও ঈশ্বরের সঙ্গে পশুপতির ঈশ্বরের মিল নাই। অনাদি অনন্ত কোনও কিছুকে মনে আনিবার চেষ্টা করিলে মাথা বোধহয় ফাটিয়া যাইবে, সাধারণ মানুষ সীমাহীনকে যে অনুভূতি দিয়া যতটুকু উপলব্ধি করে ততটুকু জোরালো অনুভূতিও পশুপতির নাই। তাহার ভাবিবার শক্তি ক্ষীণ, অনুভূতি দুর্বল। তাহার ঈশ্বর একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে খানিকটা আলো মাত্র।

যে আলোকে একদিন সে দু'চোখ দিয়া পৃথিবীকে ঢের বেশি উজ্জ্বল, ঢের বেশি ব্যাপক ভাবে দেখিতে পাইত। পশুপতির ঈশ্বর আলোর একটু স্মৃতি মাত্র।

কিন্তু তাহা দিয়াই যে তাহার চিরন্তন ভবিষ্যের স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারে। স্বর্গের কামনাও তাহার এতখানি নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

এ শীতটাও কোনওরকমে কাটিয়া যায়। বসন্তের আবির্ভাবে পশুপতির দেহে মনে জীবনের ক্ষীণতম জোয়ারটিও আসে না বটে, কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ক্ষীণ জীবনীটুকুর অপচয় বন্ধ হইয়া যায়। কুন্দর অবহেলা সহিতে না পারিয়া তাহাকে শীতের শেষে পশুপতি কয়েকটা টাকা দিয়াছে। কেশবও গোপনে একটি টাকা আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে নাই। কুন্দর রাগ অবশ্য এমনই কমিয়া আসিতেছিল, টাকাটা হাতে পাওয়ায় তাড়াতাড়ি কমিয়া গিয়াছে। পশুপতি ডাকিলে এখন সে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়। পশুপতির সাগু নরম হয়, মাছের ঝোলে মশলা কম থাকে, দুধ কমে না। কেশব দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া পাক খায়, তার কাছে বসে, দু'টো একটা কাজও করিয়া দেয়।

শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বিবাহের দিন বিকালবেলা কেশবকে দিয়া টিনের তোরঙ্গটির দড়ির বাঁধন খোলাইয়া সেটি পশুপতি চৌকির তলা হইতে বাহিরে আনায়। কেশবকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করে।

বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিয়া কেশব কিন্তু ভিতরের ব্যাপারে সব দেখিতে পায়। একটা রিপু করা ফর্সা শার্ট ও একটি কুচানো পাতলা কাপড় বাহির করিয়া পশুপতি তোরঙ্গ বন্ধ করে এবং দরজা খোলে।

কেশবকে ডাকিয়া বলে. 'যেমন ছিল তেমনি আবার পায়ার সাথে বাঁধ দি' নি দাদা, বুঝি কেমন বাহাদুর!

তোরঙ্গটি বাঁধিয়া চৌকির তলা হইতে বাহির হইয়া কেশব জিজ্ঞাসা করে, জামাকাপড় কি হবে দাদা মহাশয়?

পশুপতি ফোকলা হাসি হাসে।

দেখিস কি হয়। দেখিস।

সন্ধ্যার সময় জামাকাপড় পরিয়া সে বাবু সাজে। আট বছরের পুরনো চটি জোড়াটি কিন্তু তার চেয়েও নানা দিকে এত বেশি বাঁকিয়া দুমড়াইয়া গিয়াছে যে কোনওমতেই পায়ে দেওয়া যায় না। না যাক্। এই বয়সে এত বেশি বাবু পশুপতির না সাজিলেও চলিবে।

ঘরের বাহিরে গিয়া কেশবকে দিয়া দরজায় সে পিতলের তালাটি লাগায় এবং কেশবকে নির্ভর করিয়া হাজির হয় একেবারে বিবাহের আসরে। সকলের মাঝখানে বসিবার ইচ্ছা থাকলেও সে সাহস পায় না। একদিকে বেড়া ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে।

বিবাহ-বাড়ির আলোয় পশুপতির নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আজ একটু আলো হইয়াছে। এতগুলি মানুষের দেহের উত্তাপ সে যেন অল্প অল্প অনুভব করিতে পারিতেছে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আজ পশুপতির একটু সজাগ মনে হয়। জীবনের ঘোলাটে অস্পষ্ট স্মৃতিগুলিও যেন খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের সঙ্গে পশুপতির আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার ডাইনে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিঃশব্দ শুধু তামাক টানিতেছেন তাহার বুকে খোঁচা দিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাধ যায় : মহাশয়ের নাম?

তারপর একটু হাসিয়া: আমার নাম আজ্ঞে, পশুপতি ঘোষ দস্তিদার। এখানেই ইস্কুলে মাস্টারি করি, ভর্নাকুলার মাস্টার আজ্ঞে আমি। মেয়ের বাপ আমার বন্ধু পুত্রও বটে ছাত্রও বটে—বড় মানে আমাকে, বড় খাতির করে।

বসিয়া বসিয়া পশুপতি ঝিমায়। তার চোখ ঢুলিয়া ঢুলিয়া আসে। একসঙ্গে অতীতে ও বর্তমানে থাকিবার সাধ্য তাহার নাই বলিয়া, যখন সে অতীতের কথা ভাবে তখন এই বিবাহ-সভা তাহার কাছে মুছিয়া যায়, চারদিকে আলো ও গণ্ডগোলে সে যখন এখানে ফিরিয়া আসে তখন অতীতকে তাহার মনে থাকে না। তাই চোখে পূর্ণ দৃষ্টি, দু'কানে তীক্ষ্ন শ্রবণ-শক্তি ও মুখে সুস্পষ্ট ভাষা লইয়া একদিন এমনই সভায় সে যে অভিনয় করিত তার এতটুকু নকলও করিতে পারে না।

তারপর একসময় সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেহ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকায়, কেহ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, কেহ তাকাইয়াও দেখে না।

পশুপতির ঘুমের আড়ালে শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহোৎসব চলিতে থাকে।

নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য

আশাপূর্ণা দেবী

রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সত্যিই একদিন মারা গেলেন।

ঘটনাটায় নিবারণ ভবনে রীতিমত আলোড়ন উঠল। শোকে অবিশ্যি নয়, ব্যাপারটা যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখানে শোক শব্দটাই হাস্যকর, আলোড়ন উঠল, ঘটনাটা যে সত্যিই কোনওদিন ঘটবে, এ বিশ্বাস নিবারণচন্দ্রের ছেলে-বউ নাতি-নাতনি ও তস্য-তস্যদের আর ছিল না বলে। ওরা ধরেই নিয়েছিল চিত্রগুপ্তর হিসেবের খাতা থেকে নিবারণচন্দ্রের নামের পৃষ্ঠাটা সেলাই খুলে পড়ে হারিয়ে গেছে।

অতএব এটা অবিশ্বাস্যের পর্যায়ে পড়ল।

এতকাল যেন আগে দু-একবার মর-মর হয়েও না মরে জীবিতদের জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়ে নিবারণচন্দ্র এই বিরাট তিনতলা প্রাসাদতুল্য বাড়িটার কোনও একটা কোণে হারিয়ে গিয়ে পড়ে থেকেছেন, সে কথা আর কারুর মনে নেই।

দূর সম্পর্কীয়রা কখনও কখনও বলে, কী সর্বনাশ! বুড়ো এখনও বেঁচে আছে? আরও দূর সম্পর্কীয়রা বলে, বল কী? বুড়ো এখনও মরেনি?

নিবারণচন্দ্রের বাঁচা মরায় কি লাভ লোকসান তা কেউ ভেবে দেখে না। যেন লোকটা অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে, যেন প্রাপ্যের অধিক পাচ্ছে।

বাড়ির লোকেরা এসব বলে না, কারণ তারা কেউ ওঁকে নিয়ে আর মাথাই ঘামায় না। ওদের নিজেদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহকে কেন্দ্র করে যে জীবনলীলা আবর্তিত হচ্ছে নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই; নিবারণচন্দ্র ওদের পথ জুড়েও বসে নেই।

বছরে দু-একবার হয়তো বাড়ির সদস্যরা কোণের দিকটার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, বিজয়া দশমীর পরদিন সকালে, অথবা পয়লা বোশেখের দুপুরে। মাঝে মধ্যে কোনও নতুন বর-কনেকে নিয়ে, এই পর্যন্ত।

তা ছাড়া আর কী করবে? এটাই তো যথেষ্ট। যে লোকটা ছিয়ানব্বই বছর আগে এ পৃথিবীতে এসে, এখন পর্যন্ত নড়বার নামটি করছে না, তাঁর সম্বন্ধে এর বেশি সৌজন্যবোধ কতদিন আর বাঁচিয়ে রাখা যায়? কে মনে রাখতে যায় রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের নামে একদিন বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত, এই নিবারণ ভবনের মেঝেগুলো তাঁর পায়ের

চাপে টলমল করত এবং এই ভবনের প্রতিটি ইটকাঠে তার সতর্ক দৃষ্টির ছাপ ছিল। সময়ে মরতে পারাটাই যে বাঁচা, এ কথাটা যারা ভুলে যায়, তাদের সম্বন্ধে কার কি দায়?

তবু তো এখন এরা এতদিনের সব বিস্মৃতির ত্রুটি সুদে-আসলে শোধ দিচ্ছে, দানসাগর শ্রাদ্ধ করছে।

এ জিনিসটার তো নামই ভুলে গেছে এ যুগের লোকেরা। নিবারণচন্দ্রের ছেলেরা মানুষের মত মানুষ বলেই না সেই অতীত বস্তুকে বর্তমানে এনে ধরে দিচ্ছে? অবিশ্যি নিবাচরণচন্দ্রের ছেলেরাও এখন অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ, যা করবার তাদের ছেলেপুলেরাই করছে, কিন্তু তাদের ইচ্ছেতেই তো? নিবারণচন্দ্রের তিন ছেলেই রীতিমত কৃতী ছিল, যাকে বলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত, তবু তাদের সমগ্র সংসার এখনও একান্নবর্তী।

এমন নজির এ যুগে দুর্লভ।

দুষ্টুলোকে অবশ্য বলে এর কারণ ওই দুঁদে বুড়োর চতুর বুদ্ধি। বুড়ো না তাঁর উইলে লিখে রেখেছে আমার জীবদ্দশায় যে ছেলে ভিন্ন হাঁড়ি হবে, সে নিবারণ ভবনের ভাগ পাবে না।

এদিকে সেই জীবদ্দশার মেয়াদটা তিনি এত বেশি বাড়িয়ে নিলেন যে, ছেলেদের মাথার চুল বিলকুল সাদা হয়ে গেল। এখন তারাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে তাদের ছেলে বউরা কে কখন ভিন্ন হয়ে বসে।

ভাগ্যক্রমে এখনও তা করে বসেনি কেউ।

বরং বাপ-কাকার কাজে আগ্রহের সঙ্গে সহযোগিতাই করে। এই তো বাড়ির বড় ছেলে এই উপলক্ষে বাড়িসুদ্ধ সমস্ত মেয়ে-বউয়ের জন্যে ভাল ভাল জরিপাড় টাঙাইল শাড়ি এনে দিয়েছে, মা কাকিমার জন্যে চওড়া চওড়া পাড়ের ধনেখালি, মেজছেলে বাপ-কাকার নিয়মভঙ্গের ধুতি, আর ছেলেপুলেদের নতুন জামা।

ধুতি আজকাল আর কেউ পরে না, এই একদিন পরে পড়েই থাকবে, তবু দুই কাঁচি ধুতিই কিনেছে। এটাও যেন রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষার একটা অংশ।

তার উপযুক্ত মর্যাদাই রক্ষিত হচ্ছে এই শ্রাদ্ধকার্যের প্রতিটি অঙ্গে। ঝি-চাকর পুজোয় এমন ভাল কাপড় পায় না, যেমন পেয়েছে কর্তাবাবার ছেরাদ্দয়। 'দেশ জানিত' একটা মানুষ যে এই বাড়ির মধ্যে ছিলেন এতদিন, সেটা দেশসুদ্ধ লোক জানুক।

নিমন্ত্রণের তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেছে, যজ্ঞির রান্নার মেনুও প্রস্তুত, তবু মাঝে মাঝেই তাতে নতুন সংযোজন চলছে, চলছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন।

হঠাৎ হঠাৎ ছেলেদের মনে পড়ছে, বাবা এটা খেতে ভালবাসতেন; মেয়েদের মনে পড়ছে, এটা বাবার রোগের জন্য খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ভোজের মেনুতে সেগুলো জুড়লে বাবার আত্মার তৃপ্তি।

অতএব জোড়া হচ্ছে তাই।

ব্রাহ্মণ ভোজন-টোজন হাবি-জাবিগুলো শ্রাদ্ধের দিনই মিটিয়ে ফেলে প্রধান ভোজন রাখা হচ্ছে নিয়মভঙ্গের দিন।

নিমন্ত্রণপত্রের নিচের দিকে—'আত্মীয় বন্ধু ও কুটুম্বদিগের জলপান' মার্কা মেরে দিয়ে লুচি কুমড়োর ঘ্যাঁট আর ধোঁকার ডালনার সম্ভারে শ্রাদ্ধের ভোজ সেরে দেওয়ার মত নীচু নজর নয় নিবারণের বংশধরদের। তারা ওই সব আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুদের দুটো ভাল মন্দ খাওয়াতে চায় এই উপলক্ষে।

এ তো আর কারও ছেলের নাতি ভাত পৈতে বিয়ে নয় যে, একজনের পকেটের ব্যাপার? এ হল গিয়ে পুরো পারিবারিক দায়, নিবারণের কৃতী প্রপৌত্রটি পর্যন্ত এতে হাত মিলিয়েছে।

আত্মীয়জন ছাড়াও কর্তাদের প্রাক্তন কালের অফিসের সহকর্মী (যাঁরা এখনও বেঁচে বর্তে আছেন), তাঁদের ছেলেদের অফিসের বস-টস্—এঁরা রয়েছেন নিমন্ত্রিতের তালিকায়, রয়েছেন দু-চারজন সাহেব-সুবোও। কাজেই রান্নার মেনুতে মাছ-মাংস, চপ কাটলেট, ফ্রাই ছাড়াও মুরগিটা রাখতে হয়েছে, ওটা না হলে ফ্রায়েড রাইসটা তেমন জমে না।

অবশ্য এটা নিয়ে বেশ কিছু মতভেদ আর কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে জিনিসটা তালিকায় ওঠার আগে। সদ্য পরলোকগত রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের তিন কুলের সবাই তো এসে পড়েছে, গিন্নি-টিন্নি মেয়েরা তো বটেই, আধা-গিন্নি নাতনিরা নাতবউয়েরাও এসেছে তাদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল—একদল প্রতিবাদে মুখর হয়ে বলেছিল, শ্রাদ্ধয় মুরগি? ছি ছি! হিন্দু বাড়িতে এ কি অনাচার!

অপর দল প্রতিবাদের প্রতিবাদে প্রখর হয়েছিল, শ্রাদ্ধ তো হিন্দু বাড়িতেই হয়, ওটা কোনও কাজের কথা নয়; আভ্যুদয়িকে তো আর দেওয়া হচ্ছে না জিনিসটা? আত্মীয়জনকে ভালও খাওয়ানোরই তো প্রথা।

নিবারণের মেজমেয়ে নাক বাঁকিয়ে বলল, তা বললে কি হবে, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গায়ে ধুলো দেবে।

নিবারণের ছোটছেলে বলল, কেন মেজদি, ওঁরা কি খান না জিনিসটা? মেজ জামাইবাবু তো মুরগি পেলে আর কিছু খান না।

সে আলাদা কথা। তা বলে পিতৃশ্রাদ্ধে?

নিবারণের বড়ছেলে ক'দিনের না কামানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, তাতে কি? বাবা ওটা খেতে কি ভালই না বাসতেন, তা মনে নেই তোর? তখন তো আবার রান্নাঘরে মুরগি-টুরগি ঢুকত না, আলাদা বাবুর্চি রেখে বাড়ির বাইরে রান্না করিয়ে—

গলাটা একটু বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল, তারপর আস্তে বলল, সামান্য বিচার-আচারের ছুতোয় কত বঞ্চিত হতে হতো সেকালে।

মেজমেয়ের মন ঘুরে গেল, বলল, তা সত্যি দাদা! তুমি বললে বলে মনে পড়ল। মনে পড়ে আমরা সেই বাইরে গিয়ে খেতাম, চাকরদের নাইবার কলে হাত-মুখ ধুতাম, আর জামা ছেড়ে তবে বিছানায় শুতে পেতাম।

নাত বউয়েরা কে কে যেন ঘরে ছিল, তারা সিনেমার নায়িকার ভঙ্গিতে মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

একজন বলে উঠল, এই শুচিবাইটি কার ছিল?

কার আর, আমাদের মা জননীর। ওই সব নিয়ে কত জ্বালাতনই যে করেছেন বাবাকে।

কথায় কথায়, স্মৃতির রোমন্থনে আসল প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল, তারপর হঠাৎই প্রস্তাবটা পাকা হয়ে গেল। মুরগি রইল। একদার সুযোগ বঞ্চিত নিবারণচন্দ্রের সদ্য-বিগত আত্মা পরিতৃপ্ত হবে সন্দেহ নেই।

মুরগি প্রতিষ্ঠিত হবার পরই হঠাৎ নানা দিক থেকে স্মৃতির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, দেখা গেল শুধু মেয়েরাই নয় নিবারণের প্রৌঢ়া প্রৌঢ়া ভাইঝি-ভাগনিরাও মনে রেখেছে মামা কি খেতে ভালবাসতেন, জেঠু কি খেতে ভালবাসতেন।

কোনও একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী ভাগনি বলে উঠলেন, তোমাদের যা লিস্ট আছে থাক, মামার কাজে আমি কেষ্টনগরের সরপুরিয়া আনব। ওটা মামা ভীষণ ভালবাসতেন। আমার শ্বশুর বাড়ির দেশ তো। যখন-তখন আসা যাওয়াও ছিল। আমি এলেই বলতেন, কই রে, তোর শ্বশুরের দেশের সরপুরিয়া কই?

ভাগনির দিদি অন্য এক ভাগনি বলে উঠল, 'নেমন্তন্নি' তো শুনছি দেড় হাজারের ওপর —অর্থাৎ কিনা ভেবে চিন্তে দেখ, সাদা কাগজে সই করে বোস না।

প্রতিপত্তিশালিনী বলে উঠলেন, তা দেড় দু-হাজারে যাহোক এসে যাবে না কিছু দিদি! মামা আমাদের কত আদর আহ্লাদ করেছেন, আমরা আর কবে কি করতে পেরেছি বলো? দশ-বিশ বছরের মধ্যে তো দেখা সাক্ষাৎই নেই।

অতএব নিমন্ত্রিতদের ভাগ্যে আর একটা পদ বাড়ল। ভাগনির পদমর্যাদাও অবশ্যই। আর তারপর হঠাৎ ঝপাঝপ বেড়েই যেতে লাগল পদ।

কে যেন গুপ্তিপাড়ার মাখা সন্দেশের দায় নিল, কে একজন ডিমভরা কই মাছের পাতুরির কথা তুলে তার ভার নিল, কে একজন অসময়ের কাঁচা আমের চাটনির দাম জোগাবে কথা দিল, এবং এক ভাগনে পর্যন্ত হঠাৎ বলে বসল, তোমাদের সব সাহেব-সুবো বন্ধু-বান্ধব তো আসবে, কিছু স্কচ-হুইস্কি আনব আমি।...আমার চাকরির উন্নতিতে ওই স্কচ-হুইস্কির একটি অবদান ছিল। মামা নিজে তো একটু আধটু ইয়ে করতেন, একবার এক সাহেব বন্ধুর সঙ্গে— মানে তখন তো বৃটিশ আমল, বেশ জমজমাটই আমল, মামার সেই সাহেব বন্ধু—

মস্ত একটা গল্প ফাঁদতে বসছিল বোধহয় সে, হঠাৎ বিঘ্ন ঘটল, সভাক্ষেত্রে একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। সকলেই প্রায় চমকে উঠল।

এই কঙ্কালসার প্রেতাত্মাটি আবার বাড়ির কোন্‌খানে অবস্থান করছিল?

নিবারণের এক নাতনি নিচু গলায় বলল, সাজে মানুষকে কি বদলেই দেয়। এই তো কিছুদিন আগেও দিদিমাকে দেখে গেছি, তখন তিরাশি বছর বয়স। রোগা একখাবলা মানুষ। তবু বড় সিঁদুরের টিপে, চওড়াপাড় শাড়িতে, একগোছা চুড়িতে কি জ্বলজ্বলেই দেখিয়েছে! আর এখন দেখ— কে বলবে সেই মানুষ! রংটা সুদ্ধ কালিঝুল হয়ে গেছে। বুড়োতেও তো পাকা আমটি ছিলেন।

যাঁর সম্পর্কে মন্তব্যটি উচ্চারিত হল, তাঁর কানে অবশ্য কথাটা পৌঁছল না, কারণ বয়েসের দাঁত তো তাঁরও চোখে কানে দাঁতে সর্বত্রই পড়েছে।

রায়বাহাদুর যদি এতাবৎ কাল টিকে না থাকতেন, ওঁর সম্পর্কেই হয়তো বলা হতো, ও বাবা, বুড়ি এখনও আছে? কি সর্বনাশ, এখনও মরেনি?

কিন্তু যেহেতু হেমাঙ্গিনী দেবী নিবারণচন্দ্রের থেকে তেরোটি বছরের ছোট, তাই ওর বয়েস নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। এমনকি, একটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সেবা চালিয়ে যাওয়া ওঁর সাধ্যসাপেক্ষ হওয়া উচিত কিনা, সেটাও কেউ ভেবে দেখেনি। একটা চাকর তো রয়েছে ওঁকে নড়াতে সরাতে, তবে আর কি?

বাবার সেবা মা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া বাড়ির সবাই তো চিরকাল জানে গিন্নির কাজ ভিন্ন কর্তার পছন্দই হয় না। অবশ্য যখন এই পৃথিবীতে থাকার মত করে ছিলেন তিনি, এটা তখনকার কথা।

হেমাঙ্গিনীর হাতে গড়া রুটি ভিন্ন হজম হতো না নিবারণচন্দ্রের, হেমাঙ্গিনীর হাতের রান্না ভিন্ন ঝোল মুখে রুচত না। তবে? এসব অপমানের পর আবার কোন্ বউমা, নাতবউমা তাঁর জন্যে এগিয়ে আসতে যাবে?

তারপর তো নিবারণচন্দ্র নামের লোকটা এই নিবারণ ভবনের মাটি থেকে মিলিয়ে গেল, এ বাড়ির কোনও দর্পণে আর তাঁর ছায়া পড়ল না, এ বাড়ির কোনও টেবিলে আর তাঁর পাত পড়ল না, শুধু হেমাঙ্গিনী নামের একটা রোগা পাতলা মানুষের হেফাজতে রয়ে গেলেন যুগ-যুগান্তকাল ধরে।

ওই যুগগুলো যে হেমাঙ্গিনীর ওপর দিয়েও বয়ে যাচ্ছে, সেটা কারও খেয়ালে এল না।

প্রথম প্রথম হেমাঙ্গিনী, মানে ছেলেদের যখন কৃষ্ণকেশদাম ছিল, যখন তখন ছুটে আসতেন, ওরে ডাক্তারবাবুকে শিগগির একবার খবর দে, বুকে ব্যথা বলছেন,—তারপর ক্রমশ মাঝে মাঝে এসে বলতেন, দ্যাখ, ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিলে হতো, কদিন ধরেই বলছেন—বুকটায়—

তারপর অনেক অনেক দিন পরে পরে কখনও-সখনও আস্তে ওদের দরজায় এসে দাঁড়াতেন, বলতেন, তোরা কেউ একবার আসতে পারবি, কি রকম যেন করছেন—তখন ছেলেদের চুলও সাদা হয়ে এসেছে, কারও ব্লাডপ্রেসার, কারও ডায়বিটিস। নাতিরা একবার ঘুরে এসে বলত, ও কিছু না, বোধহয় পেটে গ্যাস হয়েছিল। নাতবউরা চুপি চুপি হাসাহাসি করত; ঠাকুমার ভয়ের কিছু নেই, ওনার অমর বর পাওয়া আছে।

তারপর কতদিন যেন হেমাঙ্গিনী আর ছেলেদের কাছে এসে দাঁড়াননি কে জানে। শেষের দিনটা এল একেবারে নিঃশব্দে, চাকরটা এসে বলল, বাবু, ঠাকুমা বললেন আপনারা সবাই ওঘরে আসুন।

বহুদিন পরে হেমাঙ্গিনী আজ এঘরে এসে দাঁড়ালেন, আস্তে বললেন, তোমাদের কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

হেমাঙ্গিনীর ছেলে বউ নাতি নাতনিরা কিন্তু হৃদয়হীন নয়, তাই সবাই মিলেই ব্যস্ত হয়ে বলল, তা তুমি নিজে বলতে এলে কি বলে? আমাদের ডাকলেই তো হতো।

থান-পরা হেমাঙ্গিনীকে দেখে ওদের এই প্রথম মনে পড়ল মা-ও বুড়ো হয়েছেন। তবুসেজনাতি বলে উঠল, আচ্ছা ঠাকুমা, একেবারে এই বিছানার চাদরটা কি না পরলেই চলে না? আজকাল তো বাবা সকলেই দেখি শাড়ি-ফাড়ি চুড়ি-টুড়ি পরে।

হেমাঙ্গিনী এ কথার উত্তর দেন না, শুধু তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলেন, কর্তা কি কি খেতে ভালবাসতেন তার ফর্দ তৈরি হচ্ছে ভোজ খাওয়ানো হবে বলে। তাই মনে করলাম সত্যিই যদি এর কোনও মানে থাকে তাহলে ওই ফর্দার সঙ্গে দুটো ভাল আঙুর লিখে নি—

কি লিখে নেব? চমকে উঠল উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা।

হেমাঙ্গিনী বললেন, ওই তো বললাম, বড় বড় ভাল আঙুর। আর একটু থামলেন, সকলের দিকে চোখ ফেলেও, কারুর দিকে না তাকিয়ে বললেন, অনেকদিন থেকেখাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, কেবলই বলতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।

হয়ে ওঠেনি! অনেকদিন ধরে বলছেন! ঘরের লোকেরা প্রায় সর্পাহতের মত আর্তনাদ করে উঠল, অনেকদিন ধরে ইচ্ছে হয়েছিল! বাবার! দাদার! মামার! জেঠুর!

কি লজ্জা! কি লজ্জা! শরমে মরে গেল ওরা সব্বাই।

হেমাঙ্গিনী ওদের দিকে তাকাচ্ছেন বলে মনে হল না, বোধ হয় দেয়ালের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরে বোধহয় সামলে নিয়ে ছোটছেলে বলে উঠল, একথা বলার থেকে তুমি আমদের গালে একটা চড় মারলে না কেন মা? বাবার দুটো আঙুর খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, কেবলই বলেছেন, সে-কথা, অথচ সেই তুচ্ছ বস্তুটা আনা হয়ে ওঠেনি? ভাবতে পারা যায় কথাটা?

হেমাঙ্গিনী দেয়ালের দিক থেকে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, দেখলেন, সে মুখে ধিক্কার ভর্ৎসনা অর ক্ষোভের তীব্র অভিব্যক্তি।

মেজছেলের কণ্ঠস্বরে ধিক্কার ধ্বনিত হল, বেশ তো মা। অমরা যদি এতই পাষণ্ড ছেলে বাবার । চাকর-বাকরকে দিয়েও তো আনাতে পারতে—

হেমাঙ্গিনী এখন কথা বললেন। আস্তে থেমে থেমে, আনিয়েছিলাম, দু'দিন, ছোট্ট ছোট্ট, টকে বিষ দেখে রেগে জ্বলে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

তা দিতেই পারেন; এক ভাইঝি প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে ওঠে, নিজে কি জিনিসটা আনতেন জেঠু সেটা ভাব জেঠিমা। নিউ মার্কেটের ফল ভিন্ন মনেই ধরত না তাঁর। বড়দিনের সময় ঝুড়ি করে ফল এনেছেন, এত বড় বড় কমলা, লাল টুকটুকে আপেলের কাঁড়ি, থোকা থোকা বড় বড় আঙুর, আর সেই মানুষ কিনা দুটো আঙুর খেতে চেয়ে টক টক আঙুর পেলেন! ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না? কণ্ঠরোধ হয়ে গেল তার।

বড়ছেলেও রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কথাটা একবার কেন আমাদের কানে তুললে না মা? বাড়িতে এত জিনিস আসছে। এত টাকা খরচ হচ্ছে, আর—মেজমেয়ে বলে উঠল, দুঃসময়ে কিছু বলা উচিত নয় মা। তবু না বলেও পারছি না, ইদানিং তুমি বাবাকে বড্ড হেয়ে করেছ। মানুষটা যে চিরদিন কি শৌখিন, কি বাবু, কি নবাব মেজাজি ছিলেন, সেটা যেন ভুলেই গিয়েছিল।...মাঝে মাঝে তো দেখে গেছি। বিছানার কি ছিরিছাঁদ পরিচ্ছদেও—তারও বলতে বলতে গলা ধরে এল।

ছোটছেলে আর একবার বলল, ওসব ধরছি না, কিন্তু ভাবতে মাথা কাটা যাচ্ছে বাবার একটু আঙুর খেতে ইচ্ছে হয়ে চেয়ে চেয়ে পাননি। কি করে পেরেছিলে মা?

হেমাঙ্গিনী তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চোখে সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বোলাতে চেষ্টা করলেন, ঝাপসা ঝাপসা একটা অবয়ব ছায়া কিছু বুঝতে পারলেন না, তাই বোধহয় আবার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ওই দেয়ালটায় কি আরও বহু বহু মাথা কাটা যাওয়ার ইতিহাস লেখা রয়েছে? সেটাই পড়ছেন?

কিন্তু এই আবেগের স্রোতের মধ্যেও কেমন করেই যে তিনি নিজেকে এমন নিরাবেগ রাখতে পারলেন। একেবোরে শুকনো খটখটে গলায় আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন, তোমরা নিজেদের নানান জ্বালায় ব্যস্ত থাক বাবা, তাই তোমাদের ব্যস্ত করতে লজ্জা করেছে।

লজ্জা! লজ্জা করেছে!

একযোগে কে কে যেন বলে উঠল, বলতে তোমার লজ্জা করেছে?

একটা টনটনে গলা বলে উঠল, এইটা বলতেই তোমার লজ্জা করা উচিত ছিল দিনা! ছি ছি! ভাবতে গেলে বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার এই অদ্ভুত লজ্জা দেখে হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না—

সারাঘরে এই কথার সমর্থনের ঢেউ খেলে যায়।

কিন্তু এই লজ্জার আঘাতে জর্জরিত হেমাঙ্গিনীদেবী কাঠগড়ার আসামির মত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে না থেকে হঠাৎ কেমন এক বেসুরো ভাঙা গলায় বলে ওঠেন, ওমা, কি আশ্চর্যি! তোদেরও তাই মনে হতো? আমিও যে ভাবছি ওই কথা—

হঠাৎই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কোনটা করতে কে জানে।

ভাট তিলক রায়

সুবোধ ঘোষ

ভাট তিলক রায়ের কথা আমরা এখনও ভুলে যাইনি। তাকে আমরা ভাল করে চিনতাম, তার মুখে অনেক গান শুনেছি। মাঝে কিছুদিন সে বহুরূপীর পেশা ধরেছিল। সে সময়ের একটা ঘটনা আজও মনে পড়ে যায়। গয়লানি সেজে তিলক রায় ব্রজবাবুর বাড়ির বারান্দায় এক হাঁড়ি দই নিয়ে এসে বসেছিল, আমরা পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে জটলা করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। ব্রজবাবুর মত গম্ভীর রাশভারী মানুষের কাছে এত বড় একটা ফস্টি নিয়ে তিলক রায় কোন সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে দরদস্তুর করলেন, দই চেখে দেখলেন, তারপর এক সের দই কিনলেন। দামটা হাতে নিয়েই সেই কৃত্রিম গয়লানি এক টানে তার মাথার পরচুলা আর নাকের নথ ফেলে দিয়ে তিলক রায়ের মূর্তিতে দেখা দিল। হাত পেতে বকশিশ চাইল। ব্রজবাবু হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা প্রচণ্ড খুশির উচ্ছ্বাসে তাঁর জমাট গাম্ভীর্য ধুলো হয়ে উড়ে গেল। একটি দশ টাকার নোট তিলক রায়ের হাতে ফেলে দিলেন।

বিষুয়া পরবের সময় ভাট তিলক রায় গেরুয়া পাগড়ি প'রে কালীবাড়ির চত্বরে এসে বসত। ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু ঝড়া কেটে আর গান গেয়ে পার করে দিত তিলক। গানের ভাষাটাও ছিল অদ্ভুত—না ভাখা, না ঠেঁট হিন্দি, না খাড়ি বোলি, না বাংলা, না মগহি। মনে হতো ওই সব ভাষা মিলিয়ে যেন তিলক নিজস্ব একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা মুণ্ডারী কুরুম্ কারুম্-ও থাকত। আজ তিলক রায় বেঁচে থাকলে তার কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করার মত একটা উপাদান পাওয়া যেত। এমনও হতে পারে, তিলক রায়ই আমাদের দেশের সেই অখ্যাত মনস্বী, যে প্রথম এই বহুবচনাবৃত ভারতের উপযোগী একটি এস্পারান্টো তৈরি করেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারল না। তিলক যখন মাঝে মাঝে কাঁচা হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে তার গাথাগুলির ভাষ্য করে আমাদের বোঝাত, তখন অমরা সবই বুঝতে পারতাম আর মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ভাট তিলক রায়ের গানের মধ্যে কী না ছিল? বুনভুটুক্‌কুর গুহার রাজার ছেলে মুলটুংলা এক হরিণীর প্রেমে পড়ে সারা অরণ্য ঢুঁড়ে ফিরছে— চোখে ঘুম নেই, মুখে

জল নেই। দূর্বা ঘাসের পোশাক গায়ে দিয়ে নদীর ধারে চুপ করে শুয়ে থাকে— যদি ভুলে ভুলে সেই ছলনাসুন্দরী হরিণী একবার কাছে চলে আসে। রাজা হাতির দাঁতের কুড়ুল নিয়ে সদল-বলে বের হয়েছিল। হয় সে হরিণী, নয় এই উদ্‌ভ্রান্ত কুপুত্র—দু'জনের একজনকে পেলেই হবে—নিজের হাতে সংহার না করে তিনি আর শান্ত হবেন না।

ভাট তিলক রায়ের গানের এই রূপকথার আস্বাদ আমাদের তখন কিছুক্ষনের জন্য যেন হতবুদ্ধি করে দিত। তিলকের গানের সেই চরম অবাস্তব কত সত্য বলে মনে হতো। তার মধ্যে ভেবে দেখবার মত কোনও প্রশ্নই থাকত না। তিলকের গান আর ছড়ার প্রতিটি পদের সঙ্গে আমাদের বিস্ময় এক ইন্দ্রজালের জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াত। আমরাও যেন মনে মনে ঘাসের পোশাক প'রে সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকতাম, কতক্ষণে সেই হরিণী এসে পৌঁছায়। বুন্‌-ডুটুক্‌-কুরু—কথাগুলি এক একটি টোকা দিয়ে অমাদের বোধরাজ্যের কুয়াশার মধ্যে যেন ছোট ছোট এক একটি সূর্য জ্বালিয়ে দিত।

অজ বড় হয়ে ভাট তিলক রায়ের রূপকথার একটা অর্থ বুঝতে পারি বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। তিলক রায় কি সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদেরী শ্রুতিধর? যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেশীর মত থাকত? তিলক কি সেই পুরাকল্পের মানুষের সংসারে প্রথম বিজাতীর প্রণয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল? বন্‌-ডুটুক্‌-কুরু গুহার যুবরাজ মুলুটুংলা কি সেযুগের ওথেলো আর সেই শৃঙ্গবতী হরিণী কি তার ডেসডেমোনা? আজঅবশ্য অনেক মাথা ঘামিয়ে—এথ্‌নোলজি আর সাইকোঅ্যানালিসিসের প্রয়োগ বিয়োগ করে এই তত্ত্বটা বুঝে খুশি হচ্ছি। কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম, তখন ভাট তিলক রায় ছিল হ্যামলিনেব বাঁশিওয়ালা আর আমরা ছিলাম ছেলের দল।

আমাদের মুগ্ধাবস্থা হঠাৎ চমকে উঠত। তিলক অন্য একটা গাথা গাইতে শুরু করে দিত। এটা আবার অন্য ধরনের। এই গাথার কথা কাহিনী ও সুরে সেই নিশির ডাকের মত আহ্বান ছিল না। কথাগুলি আমাদের হাতে হাতে যেন এক একটি তলোয়ার ধরিয়ে দিত। —কার্নাইল ডালটন সাহেবের পল্টন পালমৌ কেল্লা ঘিরে ধরেছে। মুর্হুমুহু তোপ পড়ছে। ফটকের মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এক একটা সওয়ারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফটকের ওপর। কালো কালো কোল তীরন্দাজ আর তলোয়ারবাজ রাজপুতেরা দলে দলে ফটকের মুখে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হটবে না। খাড়া দাঁড়িয়ে লড়ছে আর মরছে।

মিউটিনির সর্দার রাজার খুড়ো। থুড়থুড়ো বুড়ো। ফটক সামলাতে যখন আর কেউ নেই, কার্নাইল ডালটন যখন পল্টন নিয়ে কেল্লার ঢুকতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমস্ত কেল্লাটা যেন শেষ বারের মত হুঙ্কার ছাড়ল। দেখা গেল, এক আশি বছরের লোলচর্ম বুড়ো রাজপুত তার মাথার পাগড়িটাকে ঢালের মত এক হাতে তুলে, আর এক হাতে তলোয়ার ঘুরিয়ে মত্ত সিংহের মত যেন কেশর ফুলিয়ে, নাচতে নাচতে, হুঙ্কার দিয়ে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যেন একটা মৃত্যুর হোলি খেলে নিয়ে রাজার খুড়ো, থুড়থুড়ো বুড়ো, সেইখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রইল।

ভাট তিলক রায় মারা গেছে অনেকদিন। আজ মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যে ইতিহাসের প্রেতাত্মাটি সরে গেছে। যুগে যুগে কত ঘটানা দেখা দিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক মানুষ আমরা, ইতিহাসের জীব হয়েও আমরা তার খপ্পরে থাকি না। আমরা বদলে যাই। আজ যে-ব্যথায় আমরা কাঁদছি, কাল তা শুধু স্মৃতি হয়ে যায়, পরশু সেই স্মৃতি হয়ে তা আমাদের শুধু হাসাতে থাকে।

কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ-তাপ, আনন্দ-বিষাদ, প্রেম-প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহারায় সে আগলে ছিল। যা বিস্মরণীয়, তাকে সে ভুলতে দেয়নি। যা ক্ষমার্হ, আজও সে তাকে ক্ষমার যোগ্য হতে দেয়নি। যে গ্লানি আমরা ভুলে গেছি, সেই গ্লানিকে তিলক বাঁচিয়ে রেখেছিল। সেই কবেকার সভ্যতার হরিণীপ্রেমবিধুর বনবাসের লজ্জা আর এই সেদিনের কর্নেল ডাল্টনের হাতে রাজপুত বিদ্রোহীর চরম শাস্তির জ্বালা—তিলক রায় এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মত উঁকি দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আমরা আর একটু বড় হয়েছি তখন, শুনতে পেলাম তিলক রায় শহর ছেড়ে দেশে চলে গছে। আমরা শুনেছিলাম লালকি নদীর ওপর একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরি হচ্ছে, নিমিয়াঘাটের কাছে। তিলক রায়ের বাড়ি নিমিয়াঘাট থেকে কিছু দূরে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গেলে মাত্র আধঘন্টার সফর।

কলকাতার একটা কোম্পানি, জ্যাকব অ্যান্ড জ্যাকব, সেই বাঁধটার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। জায়গাটার জরিপ হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, কুলি কারিগর আর ইঞ্জিনিয়ারেরা আসছে। তিলক রায়ের মনের মধ্যে সজীব ইতিহাসের প্রেতটা বোধ হয় সতর্ক হয়ে উঠল। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিল তিলক। শহরে ছড়া গাইতে আর আসে না। নিমিয়াঘাটের আশেপাশে জত গাঁ আছে, সব জনপদের কানে কানে তিলক এক সাবধান বাণী শুনিয়ে বেড়াতে লাগল।—ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি? বাঁধ তৈরি এমনিতেই হয়। লাল্‌কি নদীর ঢল সামলাবে সিমেন্ট আর লোহার কয়েকটা দরজা? কেউ বিশ্বাস কর না। একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না। ছেলেধরার দল ঘুরছে, বাঁধ কোম্পানি টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাত্রে হাত-পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ওই যে একটা নতুন থাম তৈরি করেছে, ওইখানেই বলি দেওয়া হয়। বলির আগে আফিং খাইয়ে দেয়, কেউ বুঝতেও পারে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কী পরিণাম হবে।

নতুন নতুন ছড়া বেঁধে তিলক রায় তার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগল।—ইঞ্জিন এসেছে, কত রকমের কলকবজা আসছে। কিন্তু কী সাধ্য আছে তাদের লাল্‌কি নদীর ঢল বেঁধে দেবে? আগে নরবলি হবে, তবেই কল চলবে। তাছাড়া আর কোনও পথ নেই। অতএব গাঁয়ের মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলির খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরি দিলেও না।

এসব খবর আমরা তিলকের মুখেই শুনেছিলাম। বিষুয়া পরবের দিন একবার শহরে আসত তিলক। তিলকের চেহারাটাও কেমন পাগ্‌লা গোছের হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটাও একটা সংশয়ে উদ্বেল হয়ে থাকত। চুপি চুপি বলত—ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে খোকাবাবু। নিমিয়াঘাটে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি হচ্ছে। কখন যে গরিবের প্রাণটা চলে যায় ঠিক নেই!

আমরা বলতাম।—কেন?

তিলক।—এক একটি থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

আমরা।—কেন?

তিলক।—নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন? লাল্‌কি নদীর রাগ কি এমনিতেই শান্ত হবে?

তিলক একটা ছড়া গেয়ে শোনাল। এই গাথা সে কোনও উত্তরাধিকার হিসাবে পায়নি, এটা তার নিজেরই রচনা। তিলক রায়ের গাথার ঝুলিতে যুগ যুগান্তের ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে। এইবার নতুন একটা ক্ষোভ তার সঙ্গে যোগ হল।

আমরা গল্প শুনেছিলাম, গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন যখন নতুন তৈরি হয়, তখন কিছুদিন হাতির উপদ্রবে ট্রাফিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। হাতিরা তাদের জঙ্গলে এই কলকবাজার অনধিকার প্রবেশ ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তারা দল বেঁধে লাইনের ওপর বসে থাক্‌ত, কখনও বা এসে শুঁড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে দিত।

তিলক ভাট যখন তার সেই বড় বড় চোখ কুঁচকে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল, তখন আমাদের এই হাতিদের রাগের গল্পটা একবার মনে পড়েছিল। তিলক ভাটের চোখে যেন সেইরকম একটা আক্রোশ।

তার কিছুদিন পরে আমরা শুনে শিউরি উঠলাম, নিমিয়াঘাটের কাছে কোন একটা গাঁয়ে তিনটে ছেলেধরাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কারা মেরে ফেলেছে। শহর থেকে একটা পুলিশ ফৌজ নিয়ে এস-পি সেইদিনই নিমিয়াঘাট রওনা হয়ে গেলেন।

তার দু'দিন পরে শুনলাম—ছেলেধরা নয়, তিনটে কুলি রিক্রুটারকে মেরেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সদরে আনা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই কেমন একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—এই প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্রে তিলক রায়ও থাকতে পারে। তাই স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা সেশন জজের আদালতের ভিড়ের মধ্যে এসে ভিড়ে পড়তাম। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম, আসামিদের মধ্যে তিলক আছে কি না। না, তিলক রায় নেই। চার পাঁচজন গাঁয়ের লোক তারা, তাদের কাউকে আমরা চিনি না।

তিলক রায়কে আসামিদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমাদের একটা উদ্বেগ শান্ত হতো, একটু খুশি হতাম। কিন্তু ঘটনাটা আবার একটু কেমন পানসে হয়ে যেত আমাদের কাছে। এর মধ্যে তিলক রায় থাকলেই যেন ভাল হতো। হিরো হিসাবে তিলক রায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে একটু খাটো হয়ে যেত।

আরও বড় হয়েছি। তিলক রায়কে আরও কয়েকবার দেখেছি। তখন লাল্‌কি নদীর বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বড়মামার সঙ্গে নিমিয়াঘাটের অফিস কোয়ার্টারে থাকি। সারা দিন ঘুরে ফিরে বাঁধের কাজ দেখতাম। স্মৃতি থেকে সেদিনের অনুভবের কিছুটা, আর আজকের বিচার দিয়ে তার পরিশিষ্টের কিছুটা বলতে পারা যায়।

তিলক রায়ের বাণী ব্যর্থ হয়নি। নিমিয়াঘাটের কাছাকাঠি কোনও গাঁ থেকে কোনও কুলি তখনও এই বাঁধের কাজে খাটতে আসেনি। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনও তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে। গুপ্তচরের মত যেন সে ছদ্মবেশে বাঁধের কীর্তি দেখে যায়। দেশি মজুর কেউ নেই, সবই ছত্রিশগড় থেকে এসেছে। কেরানিরা সবাই বাঙালি। ইঞ্জিনিয়ারেরা বেশির ভাগ সাহেব। মিস্ত্রি আছে সব জাতের লোক—পাঞ্জাবি, পাঠান আর চাটগেঁয়ে। তিলক রায় সবারই সঙ্গে খাতির জমায়, নানা রকম প্রশ্ন করে। তার সন্দেহ দূর হয় কিনা বোঝা যায় না। এমনি করেই মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দেয় তিলক—তারপর আবার চলে যায়।

আমাকে একদিন দেখতে পেয়ে চিনতে পারল তিলক। তিলক খুশি হয়ে ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।—আপনি এখানে কেন দাদাবাবু?

—বড়মামা এখানে আছে যে।

—আপনার বড়মামা? তিলক চিন্তিতভাবে তার স্মৃতি হাতড়ে বড়মামার পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করল।

আমিই সাহায্য করলাম।—লালকুঠির জিতেনবাবুকে মনে নেই, তিনিই আমার বড়মামা।

তিলক খুশি হয়ে উঠল।—ওঃ হো, চিনতে পেরেছি। চলুন দাদাবাবু, তাঁকে একটা আদাব জানিয়ে আসি।

তারপর বড়মামাকে অভিবাদন জানিয়ে তিলক রায় মেঝের ওপর বসে পড়ল।—একটা কথা আমার মত বোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বড়বাবু, এই বাঁধ তৈরি হয়ে কী হবে? কারও কোনও ভাল হবে কি?

উত্তরে বড়মামা যা বললেন, তা'তে তিলক শুধু হাঁ করে রইল, যেন গিলতে পারছে না কিছু।—বলিস কী তিলক? দশ বছর পরে নিমিয়াঘাটকে আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সড়ক বের হবে—চোস্ত ম্যাকাডাম করা সড়ক। মিটার গেজ রেললাইন বসবে। এরই মধ্যে সিমেন্টের কারখানা খোলার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গেছে। বাঁধটা একবার শেষ হয়ে নিক তো, তখন বিরাট একটা পাওয়ার স্টেশন হবে এখানে। তিনটে জেনারেটর বসবে, সঙ্গে একজোড়া টার্বাইন। ছে'ষট্টি হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্যন্ত—ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।

বড়মামার কথার মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সম্পন্ন উপনিবেশের বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি আরও জাঁকালো করে শুনিয়ে দিলেন—কত কারখানা খুলে যাবে দেখবি। বাঁশের জঙ্গল পড়ে রয়েছে, কাগজের মিল বসবে। একটা কাচের কারখানা

খুলবে—এই যে পড়ে রয়েছে টন টন সাদা বেলেপাথরের ধুলো, এসব তখন গ'লে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে রে তিলক।

আমরা ছেলেবেলায় যেভাবে সম্মোহিতের মত তিলক রায়ের গান শুনতাম, তিলক নিজেই আজ যেন সেইরকম একটা কিশোর, কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে বড়মামার কথাগুলি শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বড়মামাই একজন ভাট, তিলক একজন শ্রোতা মাত্র। আধুনিক যুগের এক ভাটের মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনছে স্বয়ং তিলক। তবুও তিলকের মুখে একটা বেদনার্ত ছায়া পড়ছিল যেন। ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুষড়ে পড়ছে। তিলক চলে গেল।

তিলক আবার একদিন এল। জ্যাকব অ্যাণ্ড জ্যাকবের নিমিয়াঘাটে ব্যারেজ কনস্ট্রাকশনের একটা প্রস্পেক্টাস হাতে নিয়ে বড়মামা তিলক রায়কে নানা তথ্য পড়ে পড়ে শোনালেন। তিলক কী বুঝল তা সেই জানে। বড়মামা পড়ছিলেন নিজের আগ্রহের আবেগে। নিজেকে উৎফুল্ল করার জন্যই যেন তিনি নতুন ধরনের একটি লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছিলেন। কারণ আছে, বড়মামা কিছু শেয়ার কিনেছেন।

আজ তিলককে দেখে কেমন একটু শান্ত মনে হল। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সব রোষ সংযত করে লাল্‌কি নদীর বাঁধকে যেন একটু সুনজরে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপরেই একদিন তিলক রায় এল। সেদিন সে আর একা নয়। শত চারেক গাঁয়ের কুর্মি আর জোলা তার সঙ্গে এসেছে। সবাই সুবাধ্য ছেলের মত কুলি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাম লেখাল; নম্বরের চাক্‌তি আর কোদাল হাতে নিয়ে দল বেঁধে নতুন একটা মাটির ধাওড়াতে গিয়ে সবাই উঠল। আগামীকাল থেকেই ওদের কাজ শুরু হবে। শুধু আজকের দিনটা ওরা জিরিয়ে নিচ্ছে। শুকনো পাতা পুড়িয়ে বড় বড় হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে ওরা খেল। তখনও ওদের মনের সন্দিগ্ধ ভাবটা বোধ হয় একেবারে কেটে যায়নি। এই নতুন ঘরের সুখ আজ ওরা অস্বীকার করতে পারছে না; তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে—এই সুখ সইবে তো?

লাল্‌কি নদীর বাঁধটি সত্যিই একটা কীর্তি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম—উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত স্বলীলায় ছোঁ মেরে এক একটা কংক্রিটের চাঙড় তুলে নিচ্ছে—পর মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের ওপর, স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটের নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখ একটা শাণিত দন্তের হাসি। সমস্ত যন্ত্রমুখ যেন হাসছে।

ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশোর ওপর। তাছাড়া ফিটার, টার্নার, লেদমিস্ত্রি, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর সব

নিয়ে হবে হাজারের ওপর। দূর ছত্রিশগড় থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলেমাটির তেপান্তরে লাল্‌কি নদীর ধারে একটি বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনি ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পরেশনাথের ডাকবাংলোতে বসে নিচের দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প দেখা যায়—নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রের মত যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে; কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

সত্যি কথা, এ'ও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির জড়ত্বের বিরুদ্ধে। লাল্‌কি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুকনো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক চিক করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলেমাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গেছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুরটি এইখানে জল বাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গেছে।

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে—আবাদ করলে ফলত সোনা। নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লাল্‌কি নদীর খামখেয়াল শান্ত করে দিতে হবে—এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটি খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌসুমী বৃষ্টি এই লাল্‌কি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, ফাল্গুনে হাজার মাইল দূরের হিমগিরির বরফগলা জল গড়িয়ে আসে; কিন্তু সবই বৃথা হয়। এক অন্ধ বেগ সব জলভরা লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ—আট কোটি টাকার স্কিম। দেশ-বিদেশের মহাজনেরা সাতদিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, কম করে সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গেছে। ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলদের রহস্য জানা হয়ে গেছে। এই খাল দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে—উর্বরতায় অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থ জগতের বিরুদ্ধে—সমস্ত নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে বুদ্ধির দাস করে রাখতে।

এরই মধ্যে বেনেদের জুয়ো আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে নয়, দূর কলকাতা ও লণ্ডনের এক একটি দালালি হৌসে নিমিয়াঘাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাটকা শুরু হয়ে গেছে। বেতারে খবর বিলি হয়—কাজ কতদূর এগিয়েছে। শেয়ার নিয়ে হানাহানি চলে। নতুন এক ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আস্বাদে নিখিল-বিশ্ব-দালালি মস্তিষ্কে নেশা জমে এসেছে।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। নিমিয়াঘাটের এই সুন্দর ইষ্টপূর্ত রূপ হঠাৎ বীভৎস হয়ে গেছে। সংগ্রামের সেই বুদ্ধির ঐক্য ঘুচে গেছে, দীপ্তি নিভে গেছে। এক আত্মবিচ্ছেদের

বিষে শিবিরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম, কন্ট্রাক্টর জ্যাকব অ্যাণ্ড জ্যাকবের ক'জন সাহেব অফিসার, গোটা দশেক ইঞ্জিনিয়ার আর বড়মামা ছাড়া সবাই ধর্মঘট করেছে। দশদিন থেকে কাজ বন্ধ।

সেদিনের ঘটনাগুলি আজও খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে। দশদিন ধরে সেই ময়দানের পুরী যেন নিঝুম হয়ে রইল। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে মাঠের উপর একটা গুর্খা ফৌজ এসে ডেরা নিয়েছে। সাহেবের ফুলবাগানে রোজ একটা জটলা দেখা যায়। তার মধ্যে অফিসারেরা আছে—কয়েকজন মিস্ত্রি, টাণ্ডেল আর সর্দারও আছে। বোধ হয় মীমাংসার জন্য একটা বৈঠক বসে সেখানে।

বড়মামার কাছে শুনতাম, স্ট্রাইক তাড়াতাড়ি না মিটলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। আরও মিলিটারি নাকি আসছে। নতুন এক জোগাড়ের জন্য রিক্রুটারেরা বেরিয়েছে। কী বেয়াদব আর বেইমান এই মজুর মিস্ত্রি আর কেরানিগুলি! এমন ঠেঙানি দিয়ে হাত-পা ভেঙে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোথাও যেন আর রোজগার করবার আশা না থাকে, এখানে তো নয়ই।

কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজকে বড়মামা কষে গালাগালি দিলেন। এই স্ট্রাইকের খবরটা তারা এরই মধ্যে ইনডিফারেন্ট হয়ে পড়েছে। এরপর নামতে আরম্ভ করবে। আমারও মনে হতো, এই স্ট্রাইক একটা বড় বেশি গোঁয়ার্তুমি। সামান্য কয়েক আনা মজুরির রেটের দাবি গ্রাহ্য হয়নি বলেই একেবারে কাজটা নষ্ট করে দিতে হবে, এ কীরকম ব্যবহার? একটু কৃতজ্ঞতা নেই? এক এক সময় ভাবতে খুবই খারাপ লাগত, এতবড় একটা কীর্তি অসমাপ্ত থেকে যাবে! এত বড় একটা উন্নতির স্কিম এইখানে জঙ্গলের মাঝখানে জল বালি আর পাথরের ওপর মরচে ধরে পড়ে থাকবে। কোনারকের মন্দির দেখেছি—একটা অসম্পূর্ণতার ব্যথায় সেই মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে আছে। কিন্তু সেটা খুব বেশি দুঃখ দেয় না। কোনারকের স্থাপত্য গরিমা যৌবন পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল, তার পরেই কোন এক দুর্ভাগ্যে শুধু তার রূপসজ্জা পূর্ণ করার সময়টুকু আর হয়নি। ভগ্নস্তূপও কত দেখেছি; গোয়ালিয়রের প্রান্তরে উজ্জয়িনীর গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কাঁটার ঝোপে ছেয়ে গেছে। দেখে তবু খুব বেশি দুঃখ হয় না। এক বৃদ্ধের কঙ্কালের মত মনে হয়—জীবনের সব ভোগের মুহূর্ত পার হয়ে আয়ুক্রমের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন কিছু শোকাবহ ব্যাপার নয়। কিন্তু নিমিয়াঘাট ব্যারেজ লাল্‌কি নদীর বাঁধ যদি আজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের কোনও সার্ভেয়ার সত্যিই দুঃখে চমকে উঠবে—এক বিরাট কীর্তির শিশুদেহের এই চূর্ণাস্থি দেখে। অভিশাপ দেবে অতীতের এই মৃঢ়দের, যারা এই বাঁধকে অকালে হত্যা করল—এই স্টাইকওয়ালা মজুরদের।

স্টাইকটা আমারও ভাল লাগছিল না। একটা দুর্বুদ্ধির চক্রান্ত বলেই মনে হতো। তারপর সত্যি করে একদিন আমিও বড়মামার মত একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন ছটফট করে উঠলাম। কারণ, যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মনের মধ্যে আর কোনও ক্ষমার অবকাশ রইল না। হোক না মজুর আর কেরানি, যতই গরিব হোক না কেন—

ওদের বুদ্ধিতে পাপ ঢুকেছে। দেখলাম দুটো গার্ড তিলক রায়কে কাঁধে তুলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে নিয়ে এল। তিলকের গায়ের জামাকাপড় রক্তে ভিজে গেছে—মাথায় একটি পটি বাঁধা। ধর্মঘটিরাই তিলককে মেরেছে। এই সর্ববিভাগীয় ধর্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলির দল যোগ দেয়নি। যোগ দেবে কেন? তিলক রায়ের দল খুশিই ছিল। দিন ছ'আনা হিসাবে তারা হপ্তা পায়, মেঠাই কাপড় কেনে, দৌড়ে দৌড়ে ঘন ঘন বাড়ি যায়, ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। বাড়ি থেকে পুঁটুলি বেঁধে চিঁড়ে নিয়ে আসে। কাজ করতে করতে যখন একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা নয়, তখন শালপাতা ভেঙে ঠোঙা তৈরি করে নেয়। লাল্‌কি নদীর বালি খুঁড়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বার করে। খেতে খেতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির তোয়াজে ওরা নিজেরাও যেন চিঁড়ের মত ভিজে যায়। তিলক রায়ের দল এই মজুরির দাবির লড়াইয়ে শামিল হয়নি। সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠিক নিয়ম মত কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

কোম্পানির গার্ডেরা আর একটি লোককে ধরে নিয়ে এল। একে আমরা আগে কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের ছেলে, বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না, চোখে চশমা আছে, গায়ে খদ্দরের চাদর।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন।—তুমি কে হে জেন্টেলম্যান? কোত্থেকে এসেছ?

যুবকটি উত্তর দিল—আমি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমার পেশা। এখানে আমার বহু পেসেন্ট আছে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার।—আমাদের এখানে বুঝি ডাক্তার নেই? তুমি এখানে ট্রেসপাস করতে এসেছ কেন?

যুবক।—আপনি চিফ জাস্টিস নন যে আমার বিচার করতে আরম্ভ করেছেন। আমার যদি কোনও অপরাধ হয়ে থাকে তবে পুলিশে খবর দিন। আদালতেই বিচার হবে, আমি ট্রেসপাস করেছি কি না।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার একটা বেত দেখিয়ে বললেন।—আপাতত এইটাই হল আদালত। এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার কর, আর কখনও আমার এলাকায় ঢুকবে না।

যুবক।—আমার রোগী দেখতে আমি আসবই।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার।—অল রাইট।

ডাক্তারকে গার্ডেরা ধরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝলাম না। সমস্ত দিন একটা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা বড়মামাকে বললাম।—কী ব্যাপার, বড়মামা?

বড়মামা।—ওই ছেলেটাই এই স্ট্রাইক্‌টা বাধিয়েছে।

রাত্রিবেলা একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামাকে একটা চাপরাসি ডাকতে এল। মজুরেরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলো ঘিরে ফেলেছে। ইট পাথর ছুঁড়ছে। থেকে থেকে সেই ক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়ছে।—ডাক্তারবাবুকো ছোড়্ দো।

বড়মামা গিয়ে চিৎকার করে জনতাকে আশ্বাস দিলেন।—ডাক্তারবাবু আমার কাছে আছে, ভাল আছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বিশ্বাস কর।

মাঠের দিক থেকে গুর্খা ফৌজের বিউগ্লের শব্দ শোনা গেল। বড়মামা হাতজোড় করে জনতাকে বললেন—ডাক্তারবাবুর জন্য আমি তোমাদের কাছে জামিন রইলাম। আমার কথা শোন, এখনি সরে পড় সব।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর ফটকটা আর কয়েকটা ফুলের টব ভেঙে দিয়ে ধর্মঘটি জনতা একটু মনের ঝাল মিটিয়ে সরে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত একটা মানসিক উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সকালবেলা উঠতে একটু দেরি হল। একটা খবর শুনেই কিন্তু মনটা হালকা হয়ে গেল। স্ট্রাইক মিটে গেছে। বড়মামা সালিশি করে সব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। চার আনা নয়, মজুরির রেট দু'আনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আর কখনও এদিকে আসবেন না। ধর্মঘটি মজুরদের আর একটা দাবি স্বীকৃত হয়েছে—তিলক রায়ের কুলির দল নতুন রেটে মজুরি পেতে পারবে না। যা আগে পাচ্ছিল, তারা তাই পাবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই শর্ত মেনে নিয়েছে।

তিলক রায় লোকটা আর তার ভাগ্যটা চিরকালই হেঁয়ালির মত। এইখানে একটু দুঃখ রয়ে গেল। আমাদেরই ছেলেবেলার ভাট তিলক রায়। ওর মনের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা ছিল। তাই বড়মামার ব্যবস্থাটা ন্যায়োচিত মনে হল না। বড়মামা আমার আপত্তি শুনে হেসে ফেললেন।—তিলকটা একটা গবেট; ঠিক হয়েছে।

বাঁধের কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার আগেই পিলারের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুনলাম, নতুন একটা এক্সক্যাভেটার এসেছে। বড়মামা খুব প্রসন্ন, শেয়ারের দাম বাড়ছে।

কদিন পরেই তিলক রায় এসে মুখভার করে বলল—বড়বাবু, আমাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বড়মামা।—হাঁ, আর তোমাদের দরকার নেই। নতুন মেশিন এসে গেছে, এখন ফালতু লোক ছেঁটে ফেলতে হবে।

তিলক।—আমরা তো মাত্র এই কটি দেশি কুলি। সবারই কাজ রইল, শুধু আমাদের থাকবে না কেন বড়বাবু?

বড়মামা।—ওরে বাবা, তোর মত চার হাজার গেঁয়ো কুলির কাজ করে দেবে ওই একটা এক্সক্যাভেটার। তারপর তোদের কত রকম মরজি আছে, স্ট্রাইক করবি, ঘুমোবি, ছুটি চাইবি। কিন্তু এক্সক্যাভেটার তা করে না। তাকে বিশ্বাস করা যায়, তোদের করা যায় না। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলি। এইবার তোদের ছুটি।

তিলক।—আমরা তো কখনও স্ট্রাইক করি নাই বড়বাবু।

বড়মামা।—করতে পারিস তো। হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ?

তিলক রায়কে দেখতাম, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর বাইরে বটগাছটার ছায়ায় সকাল-বিকেল বসে থাকত তিলক। বড় সাহেবের কাছে একবার ধরনা দেবে—এই তার উদ্দেশ্য।

আর একদিন এসে তিলক বড়মামার কাছে প্রায় কেঁদে পড়ল।—বড়বাবু, আজ আমাদের চাকতি আর কোদাল কেড়ে নিয়ে গেল।

বড়মামা।—মিছামিছি পড়ে আছিস কেন তোরা? কতবার তো তোকে বলেছি, এইবার তোদের চলে যাওয়া উচিত। যা, ঘরে গিয়ে খেত-খামার দেখ। একদিন তো যেতেই হতো।

তিলক।—বিনা দোষে কোম্পানি আমাদের সর্বনাশ করে দিল বড়বাবু।

বড়মামা।—কি বলছিস তিলক? তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায় গিয়ে উঠবে, ভাবতে পারিস? তোদের মাটিকে কোম্পানি যে সোনা করে দিল রে মূর্খ।

তিলক মাত্র আর একদিন এসেছিল। সেদিন ধাওড়া খালি করে দেবার জন্য ওদের ওপর অর্ডার হয়েছে। জোলা কুলিরা প্রায় সবাই তখনই এলাকা ছেড়ে গাঁয়ের পথে মেলা দিয়েছে। কুর্মিরা কিছু কিছু রযে গেছে। ধাওড়ার সামনে একটা পাকুর গাছের তলায় একটা পাঁঠা বলি দিল কুর্মিরা। মাংস রাঁধল, হাঁড়ি ভরে ভরে পচাই মদ কিনে আনল। দুপুর থেকেই মাদল পিটিয়ে বিদায় উৎসবকে মাতিয়ে তুলল।

রাত্রিবেলা গার্ডদের চিৎকার দৌড়াদৌড়ি আর জলস্রোতের শব্দে আবার একটা অতিপ্রাকৃত কোনও কাণ্ড ঘটেছে মনে হল। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। জেগে বসে আছি। প্রায় শেষ রাত্রে বড়মামা ফিরলেন।

বড়মামা বললেন।—তিলক রায় খতম।

—কী হল?

—বারুদ দিয়ে একটা পিলার ব্লো করে দিয়েছে তিলক। বাঁধের একটা সাইডে ভয়ানক জলের চোট এসে লাগছে। আজ সারারাত কাজ হবে।

—তিলক কোথায়?

—মরে পড়ে আছে, একেবারে থেঁতলে গেছে।

ভাট তিলক রায়ের জীবনী এইখানে শেষ। ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, আজ এতদিন পরে তিলক রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে গেল। ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের প্রেতের মত। যখের মত অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্তমানকে ব্যঙ্গ করত। ভবিষ্যৎকে সে সইতে পারল না। তার সংশয়টাকে শেষ পর্যন্ত সে চরম সত্য বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন সেই প্রচণ্ড বন্য আত্মা, ক্যাপিটাল আর ইন্ডাস্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যে ফুরিয়ে গেল।

তারিণীর বাড়ি-বদল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

টেনে-টেনে ওরা সব এনে ঠেলাগাড়িতে তুলল। কুনো ডেক্‌চি, মশারি, ছাতা, লণ্ঠন, মাদুর, বালিশ, জুতো, ফুটো একটা কড়াই। একটা ফানুস, রং-চটা ফাটল ধরা গণেশের মূর্তি, দুটো হাতি, গামলা, ইঁদুর-মারা কল, বাক্স, জীর্ণশীর্ণ একটা স্যুটকেস।

তার অর্থ তারিণী চ'লে যাচ্ছে।

তারিণী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র স'রে পড়ছে। পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রতিবেশীদের কারও বুঝতে কষ্ট হ'ল না ব্যাপারটি কি।

চৈত্রের গনগনে রোদ।

দুপুরবেলা, রাস্তার দোকানপাট অধিকাংশ বন্ধ।

এমন সময়, এমন অসময়ে প্রেসে না গিয়ে জামার আস্তিন কনুই'য়ের ওপর গুটিয়ে খালি-পা রুক্ষ-চুল ব্যস্তসমস্ত তারিণী ঘরের তৈজসপত্র ও স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ কোনদিকে যাত্রা করছে, দাঁড়িয়ে যার-যার দরজা-জানলায় মুখ বাড়িয়ে পাড়ার লোকজন নিজেদের মধ্যে গুনগুন স্বরে নানারকম গবেষণা করল।

ওরা কতকালের বাসিন্দা। ঠিক কবে এসেছিল এই গলির মধ্যে, সতের নম্বর ঘরে, অনেকেই জানে না। বুঝি ওটা সতের'র বি, কেউ-কেউ ভাবল।

এখন মনে পড়ে, এখন শুধু চোখের ওপর ভাসছে সবারই, তারিণীর বউ ঘরের সামনের ছোট্ট রক্‌টুকুর ওপর রোজ সকাল-সন্ধ্যা একটা তোলা-উনুন ধরিয়ে নিয়েছে। প্রেস-ফেরত তারিণী রেশনের থলে, কখনও-বা বাজার অর্থাৎ বার্লির ডিবি কি ডাঁটামুলো নিয়ে ঘরে ফিরছে লম্বা পা ফেলে। আর তারিণীর এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হোস-পাইপের মুখে, রাস্তায়, লোকের বারান্দায়, উড়ের পানের দোকানের সামনে, যোগেশ রুদ্রের ড্রাইংক্লিনিং-এর দরজায় হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি মারামারি ক'রে পাড়া গরম রেখেছে, রাখছিল এ-অবধি।

আজ সব ঠাণ্ডা।

যার যেমন জামাটি জুতোটি প'রে, ঠেলায় ধরছে না এমন এক-একটা বস্তু, যেমন হাতপাখা, খুন্তি, ভাঙা হারমোনিয়ামের খোলা রিড্‌, বাঁধানো ফটো, কি ছেঁড়া-মলাট তেলচিটে

বছর-পুরনো গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাটি হাতে করে গাড়ির সামনে-পিছনে দু-পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন জিনিস বার করা হচ্ছিল।

তারিণীর স্ত্রীর খোঁপা খুলে গিয়ে পিঠের ওপর লুটোপুটি। ঘোমটার আঁচল একটা ব্র্যাকেটের বোল্ট-এর সঙ্গে আটকে গিয়ে জড়িয়ে প্রায় কোমরের কাছাকাছি নেমে এসেছে। ব্র্যাকেটের আর-এক প্রান্তে হাত রেখে ওটাকে জোরে টানতে-টানতে তারিণী শাসাচ্ছে, গর্জাচ্ছে। তারিণীর স্ত্রীর মুখ কান গরমে লাল ঘামে ভেজা দুঃখে কালো হ'য়ে গেছে, অনেকের চোখে পড়ল।

কোথায় যাচ্ছে, তার আগে গবেষণা চলল কেন যাচ্ছে, হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবার কি হ'ল।

পানের দোকানের উড়ে চোখ টিপে তারিণীর বড় মেয়ে এগার বছরের ধিন্দিকে কাছে ডাকল। ধিন্দি নয়, ধন্‌দি। ছোটোগুলোর ডাক শুনে উড়ে কুমারী মীরা ব্যানার্জির এই নাম ঠাউরে নিয়েছে। মীরা এখন বাপের সামনে শান্তশিষ্ট, অন্য সময়, তারিণী যখন বাইরে থাকে, ছুটে গিয়ে উড়ের পিঠে কিল্ বসিয়ে দেয় আর ওর কাটা-সুপুরি এলাচদানা মুঠো-মুঠো ক'রে মুখে পুরে খিল্‌খিল্ হাসে।

সেই দস্যি মেয়ে ধিন্দিকে আর দেখতে পাবে না, কাছে পাবে না ভেবে এবং মেয়ের গায়ে বাক্স-পুরনো বেজায় জ্যালজেলে টিয়ে-রঙের লম্বা একটা জামার দিকে চেয়ে অবাক চোখে উড়িষ্যার মধুসূদন চুপ ক'রে গেল। আর চোখ টিপল না।

ডাইংক্লিনিং-এর ছোক্‌রা নরেশ তারিণীর দ্বিতীয় সমবয়সী ডাণ্ডা, মানে সন্তোষকুমারকে কাছে ডাকল না। সাহস পেল না ডেকে জিজ্ঞেস করে ঘর ছেড়ে রাতারাতি ওরা কোথায় চলল, কেন গেল।

ডাইংক্লিনিং-এর ধোবার কাছ থেকে ডাণ্ডা অনেক নীল অনেক চুম্‌কি মুঠ-মুঠ ক'রে নিয়ে গেছে লুঠ ক'রে, অনেক সময় চুরি ক'রেও। নরেশ সমবয়সী বন্ধুর অত্যাচার সহ্য করেছে—করত। আজ অবাক চোখে দেখল, ডাণ্ডা চটি ও পেন্টুলন প'রে ভদ্র হ'য়ে একটা আরশি হাতে ঠেলার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তেলেভাজার গিরীশ তারিণীর বাকি ছোট আটটার উৎপাতে উত্তেজিত হ'য়ে বেসনের কাই মাখিয়ে দিত সবগুলোর মুখে, তবু ওরা তেলেভাজা খাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়নি। সারা প্রহর মাছির মত ভন্‌ভন্ ক'রে উড়ত, ঘুরত, গিরীশকে জ্বালাতন করে মারত। আজ সব চলল কোথায়।

গিরীশ একটিকেও ডাকল না, তেলেভাজার ঝুড়ি সামনে নিয়ে তারিণী আর তারিণীর স্ত্রী ব্র্যাকেট তোলা দেখতে লাগল ঠেলার ওপর। তারিণী তুলছে, বউ ঠেকা দিচ্ছে। বউ ঠেলছে, তারিণী শক্ত ক'রে ধরেছে।

ঠেলাওয়ালা কোমরে গামছা বেঁধে হাত লাগাতে এসেছিল। তারিণী হটিয়ে দিয়েছে। নিজের জিনিস সে নিজে দেখেশুনে নেবে। একটা-কিছু ভেঙে গেলে এ-জীবনে আর

করা হবে না, গজগজ ক'রে তারিণী বলছিল, তার মুখের ভাবে সবাই বুঝল। জিনিস তুলতে জিনিস বাঁধতে তারিণীর যত্নের ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, আর থেকে-থেকে বউ ধমক খাচ্ছিল, 'ওটা এমন ক'রে রাখলে কেন, জ্বালা!'

'ইজেক্ট্‌মেন্টের নোটিশ এসে গেছে।' হোমিওপ্যাথ হেমাঙ্গবাবু হুঁকো-হাতে ডিস্‌পেনসারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও-বাড়ির রিটায়ার্ড ওভারসিয়র মঙ্গলবাবুর সঙ্গে মৃদুমন্দ গলায় আলোচনা করেন।

'এই রাবুণে গুষ্টি নিয়ে এ-দিনে ও এ-পাড়ায় কি ক'রে ছিল,' বলছিলেন রিটায়ার্ড মুন্সেফ তারকবাবু প্রতিবেশী সোমনাথবাবুকে। 'ঘরের ভাড়া তো কম নয়।' সোমনাথবাবু হা-হা ক'রে শুধু হাসলেন।

সামান্য একটা প্রেসে চাকরি যার, যার এতগুলো ছেলেমেয়ে, এই দুর্মূল্যের বাজারে সবদিক সামাল দিয়ে শহরের মোটামুটি সচ্ছল একটি পাড়ায় রীতিমত দুই-কোঠার একটি ঘর দখল ক'রে প্রতি মাসের ভাড়াটি মিটিয়ে যাওয়া তারিণীর পক্ষে আর কোনওমতেই সম্ভব ছিল না, তারকবাবুর অভিজ্ঞ পাকা হাসিতে সে-কথা ঝ'রে পড়ল। সোমনাথবাবু মাথা নাড়েন।

'ওর চাকরিটিও যে না-গেছে বিশ্বাস কি।' কে একজন বলল।

'হবে।'

'হাহাকার প'ড়ে গেছে দেশে। মানুষ মোটা মাইনের ওপর দাঁড়িয়েও একলা চালাবার মত ক'রে ঠিক পেটটি চালাতে পারছে না, আর এ তো—'

'আ-হা, এতগুলো কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এখন দাঁড়ায় কোথায়।'

কে-একজন মহিলার দরদভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গোলাপের জঙ্গলে জানলা আবৃত। তাই সুভাষিণীর মুখ দেখা গেল না।

'তেমন বয়েসও যে হয়নি দু'জনের।' কে আর-একজন মহিলার গলা শোনা গেল।

একটা সুন্দর প্রজাপতি উড়ছিল জানলায়। কয়েক জোড়া কালো ঠাণ্ডা চোখ তারিণী আর তারিণীর স্ত্রীকে নিরীক্ষণ করছিল।

কিন্তু কারও দিকে তাকাবার, কারও কথা শোনার সময় ছিল না তারিণীর, তারিণীর স্ত্রীর।

তারিণীর শার্টের কলার ছিঁড়ে গেছে ব্র্যাকেটের একটা জং-ধরা-পেরেকের খোঁচা লেগে।

তারিণী স্ত্রীকে বকছিল।

বউ-এর শাড়ির আঁচলও ছিঁড়েছে দু-জায়গায় ব্র্যাকেটের খোঁচায়। পাছে তারিণীর চোখে পড়ে, আবার বকুনি খাবে ভয়ে বউ আচলের ছেঁড়ার দিকটা বাঁ-মুঠোর মধ্যে গুঁজে ডান-হাতে ব্র্যাকেটের শেষ প্রান্তটি ধ'রে অনবরত ঠেলছিল, ডেক্‌চি ও কলসির কানার ফাঁকে কায়দা ক'রে ওটাকে ঢুকিয়ে রাখা চলে কিনা। তারিণীও গলদঘর্ম হ'য়ে তার চেষ্টা করছিল। এবং শেষ পর্যন্ত পারলেও।

বউ-এর ফর্সা আঙুলে হলুদের দাগ প্রতিবেশী ও প্রতিবেশনীদের চোখ এড়াল না।

'ছেলেপুলের মুখে দুটি গুঁজে দিতে পেরেছে যাত্রার আগে?' কে-একজন বলল।

'কিন্তু যাচ্ছে ওরা কোথায়?' একজন আবার প্রশ্ন করল।

'বেলেঘাটায় নাকি ঘর পেয়েছে, শুনলাম।' উত্তর হ'ল।

অদৃশ্য মুখ, অস্ফুট গলায় গুঞ্জন।

তারিণী ততক্ষণে মালপত্র বাঁধার কাজ শেষ করেছে। চৈত্রের বাতাসে ছোট একটা ধুলোর ঘূর্ণি উড়ল, তারিণীর স্ত্রীর পায়ের কাছে শুকনো পাতা ও ছেঁড়া কাগজের টুকরো গিয়ে উড়ে-উড়ে পড়ছিল।

এইবার রওনা হবে।

বউ মাথায় কাপড় তুলেছে। একটা বিড়ি পকেট থেকে বার করে টানতে টানতে তারিণী ঠেলার সঙ্গে হাঁটবে ভেবে সবে মুখে গুঁজেছিল। চমকে উঠল। বিড়িটা প'ড়ে গেল মাটিতে।

'শালা, আমার বিল না মিটিয়ে পালাচ্ছো কোথা? উনিশ টাকা চোদ্দ আনা এখানে রেখে যাও।' মুদি। পাড়ার মুদি এককড়ির গলা, সবাই বুঝল।

আমাদের জানলাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছিল। 'এই শালা ডাণ্ডা, মেরা ঢাই মণ কয়লাকো দাম জল্‌দি মেটাও।'

কয়লার দোকানের রামশরণের গলা।

এসেই রামশরণ তারিণীর বড় ছেলে ডাণ্ডার, সন্তোষের, হাত চেপে ধরেছে। তারিণী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল বলে শেষবারের কয়লাটা সন্তোষই নাকি ধারে এনেছিল।

কয়লাওলা গলা বড় ক'রে প্রতিবেশীদের দরজা-জানলার দিকে মুখ ক'রে কথাটা প্রচার করল।

'ভদ্রলোকদের সঙ্গে কারবারে এ-দিনে এই লাভ!' রামশরণ পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথা বলল, 'আড়াই মণ জ্বালানির দাম না মিটিয়ে তারিণীবাবু চোরের মত ঠিকানা পাল্টাচ্ছে।'

পরনে জুতো, গায়ে শার্ট।

তারিণী যে বাবু-শ্রেণীর, কথাটা অস্বীকার করার উপায় ছিল কি। পুরনো এবং জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেলেও ছেলেমেয়েগুলোর প্রত্যেকের গায়েই জামা ছিল। সম্ভবত বিয়ের সময়ের পুরনো একটা বেনারসী জড়িয়েছে তারিণীর স্ত্রী। দুই পায়ের গোড়ালিতে ফ্যাকাসে একটুখানি আলতার পোঁছও দেখা যাচ্ছে।

'বড়ো যে সাজগোজ ক'রে চললে বৌঠান, মোট এগারো সের দুধের দাম পাওনা, ওটি মিটিয়ে যাও।' মিশিমাখা কালো দাঁত বের ক'রে গয়লা-বউ প্রথম তারিণীর স্ত্রীর দিকে, তারপর কটমটে চোখে ঠেলার ওপর স্তূপীকৃত মালপত্রের দিকে, তারিণীর দিকে, তারিণীর ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে রইল। গয়লানির হাতে শূন্য দুধের বালতি। দুধ বিলানো শেষ ক'রে ঘরে ফিরছিল।

প্রস্থানোদ্যত তারিণীর পা সরল না। আনত চক্ষু। ছেলেমেয়েগুলো নীরব। হেঁটমুখ হ'য়ে ওরা পোকায়-খাওয়া ফটো, খুন্তি, পঞ্জিকা, হাতপাখা, হারমোনিয়ামের কতকগুলো ভাঙা রিড, যার যেটি ব'য়ে নেবার শূন্যের ওপর ঠিক ধ'রে রেখে অপেক্ষা করছিল কখন বাবার আদেশ হবে 'হাঁটো'—ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা হাঁটবে, বলতে গেলে ঠেলাগাড়ির চাকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এই শহরের রাস্তায় ট্রাম-বাস, ট্যাক্সি-রিক্‌শা লাখো-লাখো দ্যাখে ওরা, দেখছে। গাড়িতে না চাপুক, গাড়ি সঙ্গে কি পিছু-পিছু ছুটে যাবার কল্পনা করছিল রোজ। আজ অসময়ে, হঠাৎ দুই চাকার এই কাঠের গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াল, তার ওপর উনুন ঝাঁটা ডেক্‌চি মশারি পিঁড়ি কম্বল, সব-ঘরের সব-কিছু চাপিয়ে ওরা গাড়ির সঙ্গে হেঁটে দীর্ঘ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোড পার হবে, তারপর এক-সময়ে সার্কুলার রোড হ'য়ে বেলেঘাটার সড়কে গিয়ে পড়বে। অচেনা জায়গা, নাম-না-জানা ঠিকানায় নতুন নম্বরের বাড়ি। ভাবছিল প্রত্যেকটি শিশু। প্রত্যেকটির চোখে ছিল সেই শঙ্কা, উত্তেজনা, আশা, ভয়, শিশিরের ফোঁটার মত টলমলে কম্পমান কৌতূহল।

তারিণীর স্ত্রী হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে ছোটোটার নাকের সিক্‌নি মুছে দিল।

'কখন যাব মা?' বলছিল ওর বড়টি।

তারিণীর স্ত্রী চোখের ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। 'আমি ঠিকানা দিচ্ছি,' বলছিল তারিণী এককড়ির হাত ধ'রে, 'যেয়ো, সামনের মাসে টাকাটা দিয়ে দেব।'

'ঠিকানা দিচ্ছি!' ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এককড়ি ভেংচি কাটল, 'কত শালা ঠিকানা দিয়ে পালাল, নতুন ঠিকানায় পা দিতে না দিতে বেঠিক হ'ল। আমি ছাড়চিনে তারিণীবাবু, তোমার মালপত্র আট্‌কাব, টাকা ফেল।'

'হ্যাঁ, এইসা বাত্‌।' রক্তচক্ষু রামশরণ ঠেলার পিছনটা চেপে ধরেছে।

'হামি বেইজ্জত করব তারিণীবাবু টাকা লা দিয়ে গেলে।'

কথা কাটাকাটি চলছিল গয়লানি আর তারিণীতে। গয়লা-বউ শক্ত হাতে ঠেলার মাথা চেপে ধরল। 'হামি মালসাটি ছাড়ব না দুধের দাম লা মিটিয়ে গেলে, অত সময় নেই রোজ তোমার বেলেঘাটার ঘরে গিয়ে তাগিদ লাগাব।'

তারিণী চুপ।

আর-একটা ধুলোর ঘূর্ণি উড়ল।

একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে থেমে গেল।

ডিস্‌পেনসারির বারান্দা ছেড়ে হেমাঙ্গবাবু ভিতরে চ'লে যান। সোমনাথবাবু স'রে পড়েন।

আরও দু-জন প্রতিবেশীর জানলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হ'ল, যেন শার্সিগুলোও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'তুম শালা ঠোট্টা আছ।' তারিণী কথার উত্তর দিচ্ছে না তাই রামশরণ গর্জে উঠল।

তারিণী প্রতিবেশীদের দরজা-জানলার দিকে একবার সকাতরে তাকাল।

তাতে ফল হ'ল না বিশেষ।

'বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছে', নিচু-গলায় প্রতিবেশীরা বলাবলি করছিল 'ঋণের দায়ে পালাচ্ছে, স'রে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কি আগে জানতাম, না, কোনওদিন এসেছিল ও কারও কাছে। অমন একটাকা দু-টাকা ক'রে সাহায্য করলেও তো তারিণী অনেকটা হালকা হ'তে পারত, পাড়ায় এতজন ছিলুম আমরা।'

তারিণী শুনল কি শুনল না ঠিক বোঝা গেল না।

'আত্মসম্মানবোধ টন্‌টনে।' মৃদু-গলায় কে আর একজন মন্তব্য করল, 'আট গণ্ডা ছেলেপুলের বাপ, একটা সুবৃহৎ তরণীর হাল ধ'রে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। চাকরি করছে বাজারে নামও লিখিয়েছে। এখন ওর খুকির দুধের দাম, রেশন খরচের জন্যে আমাদের দরজায়—বুঝলে না?'

'মানুষের দুর্বুদ্ধি।' আর-এক জন প্রতিবেশীর ঘন নিশ্বাস-পতন শব্দ শোনা গেল।

কি, তারিণীর ধার করতে যাওয়া, না সে-সব শোধ না ক'রে পালিয়ে যাওয়া মতলব, প্রতিবেশীদের আলোচনা থেকে এর পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেল না।

হঠাৎ দেখা গেল তারিণী উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, ঘাড় সোজা ক'রে এককড়িকে বলছে, 'টাকা পাবে কোর্টে গিয়ে নালিশ কর, খবরদার, মালপত্রের গায়ে হাত দিয়ো না, ফ্যামিলিম্যান, আমি ভদ্রলোক, এই—এই'—

কিন্তু শোনে কে?

এককড়ি ঠেলা ধ'রে ঝাঁকুনি মেরেছে। রামশরণ সাহায্য করছে। আর হাততালি দিয়ে মজা দেখছে গয়লা-বউ। হাসছিল না, বরং দাঁতে দাঁতে ঘ'ষে কঠিন শপথবাণী উচ্চারণ করছিল তারিণীকে, তার পরিবারকে। গয়লা-বউ আরও দু-জায়গা ঠকেছে এমন ক'রে।

টাকা না দিয়ে সব পালিয়েছে।

বছর-ভর ভদ্রলোকদের বাচ্চাদের সে দুধ খাওয়ায় আর গরিব গয়লানিকে তারা এমনভাবে ঠকায়। রুপোর বৈঁচিপরা দু-খানা হাত বার-বার শূন্যে উত্তোলন করে দুধওয়ালী পাড়ার বাতায়নবর্তিনী অন্যান্য প্রতিবেশনীদের কানে যায় এমন চড়া গলায় বলল, 'টাকা দিতে পারে না তো বছর-বছর নতুন ছানা ছাড়বার শখ কেন। বেশ তো, ছানা আটকাতে লা পারো নুন খাওয়াও, পানি পিয়াও, কমলার বাল্‌তির একটাকা সেরের দুধ বাচ্চার গলায় ঢালবার বাবুগিরি কেন!'

যেন কমলার জিহ্বা থেকে আগুন ঝরছিল।

বাগে পেয়েছে ও, সস্তা চটি-পায়ে প্রেসের বাবুর স্ত্রীকে দুটি কথা শোনাচ্ছে।

গয়লানির পায়ে জুতো নেই, কিন্তু পরনের শাড়ি তারিণীর স্ত্রীর শাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। দামি। পাড় ও আঁচল অনেক বেশি জমকালো। পান-দোক্তার রসে জিহ্বা ও ঠোঁট রক্তিম। চোখে প্রচুর রসিকতা।

কথা শেষ ক'রে পুরুষ পাওনাদার দু-জনের দিকে চেয়ে তেরছা ঠোঁটে কমলা হাসল।

এককড়ি মুদি চড়া গলায় জানিয়ে দেয়, টাকা শোধ না ক'রে তারিণীবাবু ঘরের একটা ভাঙা পিঁড়িও সরাতে পারবে না।

ব'লে সে ঠেলার পিছন ধ'রে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিল যে জিনিসপত্রের মচমচ আওয়াজ শোনা গেল, এখনি কোনটা পড়ে, কোনটা ভাঙে।

একটা অপমান, উলঙ্গ লজ্জা ভদ্রপাড়ার মাঝখানে যেন ঝুলছিল না। রক্ষা প্রতিবেশীদের শেষ জানলাটিও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

তারিণী ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে দেখছে।

ঠেলার বাঁ-দিকে বেতের মোড়ার ওপর চিত ক'রে দুটো কড়াই বসানো। কড়াই দুটোর পেটের মাঝখানে তারিণী খুব সাবধানে শিশি ও কাচের বয়ামগুলো বসিয়ে দিয়েছে।

এককড়ির হাতের প্রথম ধাক্কায় একটা বড় বয়ামের গলা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় ধাক্কায় ভাঙল তারিণীর স্ত্রীর উনুনের চূড়া। আলগা হ'য়ে গেল।

তারপর ভাঙল তারিণীর অনেক কষ্টে গ'ড়ে-তোলা বৈঠকখানার বাজার থেকে কিনে-আনা গড়গড়াটা। গাড়ির মাঝামাঝি এক জায়গায় লেপ-তোশকের ভাঁজের ভিতর বেশ কায়দা ক'রে তারিণী ওটা বসিয়ে নিয়েছিল।

বিড়িতেও কম পয়সা যায় না, রোজ বউকে অনেক বুঝিয়ে এক মাসের মাইনে থেকে টেনে-হিঁচড়ে পাঁচটা টাকা বের ক'রে তারিণী কবে যেন বেশ দুঃসাহসে ভর করেই ওটি কিনে ফেলেছিল। অনেক আগে। একমাত্র বিলাসের সামগ্রী গড়গড়াটা ভাঙবার পর তারিণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল।

কিন্তু তারিণী হঠাৎ এমন কাণ্ড করবে কারও জানা ছিল না।

পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে, জুটফ্লানেলের শার্ট গায়ে, ক্ষীণদেহ, অম্বলরোগী, এই শহরেরই কোনও প্রেসের স্বল্পবেতনভোগী কর্মচারী তারিণী দত্ত গরম ক'রে এমন কাণ্ড বাধাবে কেউ কোনওদিন কল্পনায় আনেনি।

'এই হয়', প্রতিবেশীদের মধ্যে পরে একজন মন্তব্য করেছিল, 'অক্ষরের এত রাগ ভাল না। প্রবল আত্মসম্মানবোধ সক্ষমের অঙ্গভূষণ, গরিবের পক্ষে তা আত্মঘাতস্বরূপ।'

তারিণী শেষ মুহূর্তে তুবড়ির মত ফেটে পড়ছিল রাগে।

কারও সাহায্য চাওয়া দূরে থাক, ঠেলাওলাকে বরং ধমকাচ্ছিল সে চিৎকার ক'রে।

'আমি বলছি, তুমি গাড়ি টানো। আমি বলছি, আমি পিছন থেকে ঠেলব ডরো মৎ। ক'টা মোট!' কিন্তু বোঝার ভয়ে ঠেলাওলা গাড়িতে হাত ঠেকানো বন্ধ রাখেনি।

'মেরে কাঠ ক'রে দেব।' শাসাচ্ছিল এককড়ি ঠেলাওলাকে। 'তফাত থাক্।'

কাঠের মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঠেলাওলা হাঙ্গামা দেখছিল। বাড়ি বদলের সময় অনেক বাবু আজকাল এরকম ফ্যাসাদে পড়ছে। হাঙ্গামার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই নিরাপদ, অভিজ্ঞ ঠেলাওলাকে বেশি বলতে হ'ল না। তার ঠেলা তো স'রে যাচ্ছে না ও গিয়ে না হাত ঠেকানো তক্।

কিন্তু আশ্চর্য, ঠেলা সরল, ঠেলার চাকা ন'ড়ে উঠল।

'আমার মাল আমি নিয়ে যাব, দেখি কোন্ শালা আটকায়।' তারিণী আস্তিন গুটিয়ে

ঠেলার সামনের ডাণ্ডা দুটো চেপে ধরেছে। 'হ্যাঁ, তুমি পেছন থেকে ঠ্যালো; এই, তোরা সামনে আয়!'

সত্যিই তারিণীর স্ত্রী পিঠের আঁচল কোমরে বেঁধে গাড়ির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, ছেলেমেয়েরা গেল সামনে।

কোঁক করে একটা শব্দ হ'ল—তারপর ঠেলাটা গড়গড় ক'রে নেমে গেল নিচে, বড় রাস্তায়, উঁচু পেভমেন্ট্ ছেড়ে গিয়ে পড়ল গরম অ্যাশফল্টে।

এককড়ি মুদি চুপ।

ঠেলাওয়ালা ও কয়লাওয়ালা হাঁ ক'রে কেবল দেখছিল।

কেউ কিছু বলল না।

একটা গুমোট, অবিশ্বাস্যরকম স্তব্ধতা।

গাড়ি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল কুকুরটা গিয়ে শূন্য জায়গাটা বার-বার শুঁকতে লাগল।

ঠেলা মোড় ঘুরে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে বৈঁচি-পরা হাত শূন্যে তুলে চিৎকার ক'রে কমলা গয়লানি তারিণীকে, তারিণীর স্ত্রীকে এবং দশটি সন্তানকে নানারকম অভিশাপ দিতে-দিতে একদিকে স'রে পড়ল।

'জেদী—' খই ফোটার মত প্রতিবেশীদের মুখে কথা ফুটছিল। 'মূর্খ।' বলল আর-একজন, 'তারিণী রাস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে বেরুল।'

'বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন?'

'ওই যে, একলা ঠেলতে পারছে না, বড় ছেলেমেয়েগুলোকে রাস্তায় নামাল তার সংসার-তরণীর হাল ঠেলতে।'

'বাহাদুর!' কার ঠাট্টার সুর শোনা গেল। 'আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে সম্মানে বাধছিল, এখন, এখন লোকে বলছে কি! ছি-ছি—'

'ভাবতেও পারছি না এ-পাড়ায় ও কী ক'রে এতকাল ছিল, আমাদের মধ্যে!'

'ঠেলা নিয়ে তারিণী বেলেঘাটায় পৌঁছুবে কখন?'

'কে জানে, আদৌ পৌঁছব কিনা তা-ই বা কে জানে!'

বিকেলের পর থেকে খবর আসতে লাগল।

না, বেলেঘাটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তারিণী, তার আগেই অ্যাক্সিডেন্ট হ'ল রাস্তায়।

'কি রকম?' প্রতিবেশীরা উৎসুক।

প্রত্যক্ষদর্শী বলল, 'কলেজ স্ট্রিট-হ্যারিসন রোডের জংশন পার হবার সময় একটা ট্রাম এসে পড়েছিল ঠেলার ওপর। তারিণীর ঘাড় মচ্‌কে গেছে, হাসপাতালে, বাঁচবে না বোধ হয়।'

'আঃ' কেউ বলল, 'ওই হয়, মূর্খ এমন ক'রেই মারা পড়ে।'

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

একটু পরে আর-একজন এল খবর নিয়ে। নিজের চোখে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে ঘটনা।

'শুনি শুনি।'

তারিণী আত্মহত্যা করেছে। অ্যাক্‌সিডেন্ট তো বটেই কিন্তু স্বেচ্ছায় সে ঘটিয়েছে তা। কি রকম? প্রতিবেশীরা আবার উৎসুক।

'ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, হাঁটতে পারছিল না কেউ। তারিণীর স্ত্রীও হয়রান হ'য়ে গেছে ঠেলা ঠেলতে-ঠেলতে।'

'তারপর?'

'তারিণী আর-একটা ঠেলাওলাকে ডেকেছিল কিন্তু বেনামি গাড়ির মাল নিজের গাড়িতে তুলে নিতে লোকটা রাজি হয়নি।'

'তা তো হবেই না, প্রতিবেশীরা একসঙ্গে মন্তব্য করল, 'বেওয়ারিশ মাল নিয়ে তারিণী পালাচ্ছিল না তার প্রমাণ কি।'

প্রত্যক্ষদর্শী আস্তে-আস্তে বলল, 'রাস্তায় বউ-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তারিণীর। বউ শুধু বলছিল, "এমন জিদ্ করে রওনা না হলেও পারতে, এখন—এখন যে আর পারা যাচ্ছে না," —সকলের ছোটটাকে সে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, তারিণীর মাথা গরম হ'য়ে যায়। মুখিয়ে উঠেছিল সে স্ত্রীকে, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে, গলা ফাটিয়ে তারিণী বলছিল বউকে, ছেলেমেয়েগুলোকে— "বেশ তো, জিরিয়ে-জিরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে আয় সব। দরকার নেই ঠেলা ধ'রে— আমি একলাই পারব টেনে নিতে'।

'তারপর?'

'তারপর তারিণী ঠেলা দিয়ে একলা পাগলের মত ছুটে যায়। ভিড়, ভয়ানক ভিড় ছিল ট্র্যাফিকের তখন, একটা বাস এসে হুড়মুড় ক'রে পড়ে তারিণীর ঘাড়ের ওপর, গাড়ির ওপর।'

'পাগল, পাগল। সংসার চালাবার জন্যে তারিণী উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি।' প্রতিবেশীরা আলোচনা করছিল।

কিন্তু ছেলেমেয়ে ও বউ-কে পিছনে ফেলে তারিণীর যে কেবল ডেক্‌চি-বিছানা ঘটি-বাটি লণ্ঠন ঠেলায় চাপিয়ে বাসের তলায় ছুটে গেল, সে-খবরও ঠিক নয়।

সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ প্রত্যাগত এক প্রতিবেশীর নিকট। ঠেলার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, একটি-দুটি করে তারিণী আটটিকে গাড়িতে তুলে নেয়। তারপর আর পারেনি।

'বেলেঘাটার পুলে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল বুঝি?' একজন প্রশ্ন করল।

'উঠেছিল ঠিক।' প্রত্যক্ষদর্শীর গলার স্বর গম্ভীর হ'য়ে গেল। 'হ'লে হবে কি। পুলে উঠতে-না-উঠতে তারিণীর স্ত্রীর পা কাঁপছে, চোখে জল এসে গেছে, বাকি দুটি সন্তানকেও

ঠেলার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, ইচ্ছে করেই তারিণী বসিয়ে দেয়। "আর ভয় নেই,"—তারিণী বলছিল, "এখন ঢালু পথ, ঠেলা হড়হড় ক'রে পুল থেকে নেমে যাবে। তোরা সবাই চেপে বোস"।'

'তারপর?'

প্রত্যক্ষদর্শী আস্তে-আস্তে বলল, 'বউ প্রথমটায় আপত্তি করে, কিন্তু তারিণী তা গ্রাহ্য করে না, চিরকালই জেদি একগুঁয়ে লোক, বউকে মুখ ঝামটা দেয়, বলে, "শেষটায় তুমিও শত্রুতা আরম্ভ করলে, যা বলছি শোনো, হ্যাঁ, একলাই আমি চালাব গাড়ি, না-পারব তো সংসার গড়েছি কেন"।'

'অর্থাৎ বউকেও ঠেলায় বসিয়ে দেয়, এই তো?' মৃদু হেসে হোমিওপ্যাথ হেমাঙ্গবাবু মন্তব্য করেন।

ঘাড় নেড়ে প্রত্যক্ষদর্শী বলল, 'পুল থেকে নামবার সময় ঠেলাটা হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে একদৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় তার ফল কি দাঁড়াতে পারে বুঝতেই পারেন।' বক্তা থামল।

শ্রোতৃবৃন্দ নীরব।

প্রতিবেশী একজন বলল, 'তা যাবেই, এমন ভারী বোঝা নিয়ে গাড়ি একবার সামনের দিকে ঝুঁকলে আর রক্ষে থাকে! ঠেলাটা তারিণীর ওপর দিয়ে চ'লে গেছে তো? মূর্খ তারিণীর এভাবে ঘাড় ভাঙবে, বুকের হাড় ভাঙবে, আমরা ধ'রে রেখেছিলাম।'

ছেলেমেয়ে এবং তারিণীর স্ত্রীর অবস্থা কি, কোথায় তারা আছে সে-সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করল না। প্রত্যক্ষদর্শী ধীরে-ধীরে গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সবাই চুপ।

চুপ থেকে কুকুরটা সকলের মুখে দিকে তাকিয়ে দ্রুত লেজ নাড়ছিল।

হঠাৎ একজন কথা বলল, 'কিন্তু ও কি জানত না, ঠেলা যখন ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তখন তার আগে থাকতে নেই পিছন ধ'রে চলাই নিরাপদ, সবাই তা করে।'

সে কথার উত্তর দিতে কেউ নেই, যে যার ঘরের দিকে চ'লে গেছে। দেখা গেল, অদূরে লম্বা টর্চ হাতে তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরের দরজার তালা খুলতে খুলতে বাড়িওলা নতুন কোনও এক ভাড়াটাকে বাড়ির জলকল, পায়খানা ও রসুই-ঘরের চমৎকার ব্যবস্থার কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শোনাচ্ছে।

কয়েদখানা

কমলকুমার মজুমদার

প্রায়ই উবোল ন্যাড়া টিলাদার জমি, কোথাও নিভে গেছে। খালি পেটের মত অসম্ভব ফাঁকি-পড়া প্রকৃতি; অতিদূরে ভূমিষ্ঠ রুগ্‌ণ আকাশ। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে-উঠা চড়াই এবং পলাতক উতরাইয়ের উপর তালবৃক্ষের ছোট ছোট ঝিলমিল। এ চরাচরে ওইটুকুতেই মাত্র কাপড়ে নকশার বাতিক ছিল। সেই ঘোড়াটি এখন এখানেই।

ঘোড়াটির ঘাড় যেমন বা মাছ-পড়া ছিপ, অতি সহজেই চকিতেই বাঁক হয়ে গেল; অথবা ধনুকের-মত দৃপ্ত তীক্ষ্ণ রমণীয় রেখা। এটি হয় একটি সুন্দর পিঙ্গল বলীয়ান আরবি-বংশজ ঘোড়া। ভুটে নয়। চড়াইয়ের নিম্নে উতরাইয়ের নিঃসঙ্গতা যেখানে যেখানে; যেখানেই কিছু ঘাসের ঝালা আখর, বর্তমানে সেখানেই ঘোড়াটি ঘুরেফিরে; খুরের ঠোকানিতে কিছু ধূলিকণা ইতস্তত বিথার। নিচে, কখনও বা, যেখানে ছোট গোল রুপালি জলাশয়—যার কিনারে হলদেটে-সবুজ ক্রমাগত খাড়া খাড়া জলজ-ঘাস, সেখানেই, জলের উপর দিয়ে তার পিঙ্গল ছায়াটা জোর করে চলে যায়। এ জলাশয়ে কেবলমাত্র ট্যাবা শাঁখ মেঘের বিম্ব থাকার দস্তুর। ঘোড়ার পিছনে, উত্তরে বহুদূরে অনেক পাহাড়, এবং তালগাছের জোটের মধ্যে দিয়ে দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ের রেখা উদ্ধৃত। কোথাও সহসা খিঁচিয়ে উঠা রুক্ষ পলাশ, ডালে ডালে শুকনো পাতা এবং ফুল। এই মুহূর্তে যারা যৌবন হারাল তাদের আর্তনাদ এখানে; আদপোড়া হাওয়া বইছিল। ঘোড়াটি ভিজে ভিজে সবুজ ঘাস থেকে আপনকার ঘাড় খেলিয়ে দুলিয়ে কখনও বা নামিয়ে নিলে। এখন নাক স্ফীত করে খররর আওয়াজ করে, ফলে ক্বচিৎ ঘাসফড়িং এবং ঝিঁঝিঁ লাফিয়ে সরে যায়।

যেহেতু সন্ধ্যা হয়; আকাশ অনন্ত হয়েছে, টিলাগুলি সোনা হলুদ; ঊর্ধ্বে বাদুড়ের টানা স্রোত, এখন পথভোলা পাখির ডানা লাট খায়; এবং গঙ্গাচিল বিন্দু হতে বিশাল প্রতীয়মান। ঘোড়াটি এখনও নির্লিপ্ত হয়েই ঘুরেফিরে, জলে তার নিপট কালছায়া। এমতকালে, দূরে ডুকরে-উঠা টিলার সোনা হলুদ ভেদ করে ক্রমে কে একজনা বেঁকে উঠে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরিদৃশ্যমান চরাচর ঋজু কলেবরের গুণে ইদানীং ভরাট। লোকটি মুখের পাশে একটি হাত রেখে হাঁকল, 'ও হো হালম রে।'

জলাশয়ে মুক্তকেশী অন্ধকার।

সুন্দর ভাট গাছ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া ডাল, সেখানে ঘোড়াটি—মাটির আধো সবুজ ঘোড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভাটফুলের কমলালেবুর রং অটুট হয়ে উঠল। ঘোড়াটি মুখ তুলে, সুলক্ষণ কানদুটি খাড়া করে। ল্যাজটি নাড়ল। কেশর স্থানচ্যুত হয়।

টিলার লোকটি তাকে দেখলে। লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবি তীরেলা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেট্টি, তার গায়ে নকশা করা ভারী কাঁথা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা; কড়া হাঁটু—তার পাশেই আঁটলি মাংসপেশি। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত, কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে। হাতে হাত মিলান, লোকটি অবাক হয়ে ঘোড়াটিকে দেখল, সম্পূর্ণ ছবি। নিশ্চয়ই সে খুশি হয়েছিল। খানিক ধূলা ভেঙে টাল খেয়ে খেতে খেতে সে নেমে এল। দীর্ঘ চেহারাটি ঘোড়ার কাছে আরও দীর্ঘ হয়ে উঠল।

হাঃ করে একটি নাতিদীর্ঘ হাঁফ ছেড়ে সে বলেছিল, 'হা হি! ঈ ডহরেকে ঘাস খাইছিস রে বটে, একা একা স্যাঙাবিনু হে হালম বাঃ জীন'—বলে আদর করলে। লোকটির পাঁচটা আঙ্গল পিঙ্গল বর্ণনার উপর দিয়ে চলে গেল। এবং এই সময়েই আরও কিছু কিছু বলেছিলই; ফলে ঘোড়াটির গায়ে শিহরন খেলে গেল। এই ঘোড়াটি তার, তার নাম শাজাদ।

শাজাদের গায়ে এখনও জ্বর। তবু রাত থাকতে খড়গ্রাম থানার শেরপুর থেকে, নিকটেই দাদাপীরের থানে মাথা ঠেকিয়ে, বাদশাহী সড়ক ধরে এখানে এসে পড়ছে। একুনে তিরিশ-বত্রিশ মাইল পার হতে হয়েছে। এদের কাছে এরূপ পদব্রজে খুব একটা গর্বকথা নয়, এরা লোধাদের মত হাঁটে। তার জ্বর এই হেতু যা কষ্ট। তথাপি এমত অবস্থায় তাকে আসতেই হয়েছে পায়ের গুলে পর্যন্ত ধূলা।

কিছুদূরে ডাঁই করা উঁচু পাকা সড়ক উত্তরে পারোই ইস্টিশান, দক্ষিণে তড়খা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সড়কের ঠিক পশ্চিমে এক-দৌড় ক্ষেত, তারপরই সেঁজুতি ব্রত আলপনার মত রুনখগাঁ। পাঠানসদৃশ শাজাদ এসে উঠল সড়কে, ঘোড়াটি তার পিছনে। সে একবার সড়কটার উত্তর-দক্ষিণ নজর নিল—সুড়ঙ্গ যেমত, দুই ধারে অশ্বত্থ বট মহুয়া এবং আর আর গাছ। সড়ক পার হয়েই, ঢাল বেয়ে নামবার কালে চোখে পড়ল একটি চলমান শাড়ি, একটি মেয়ের। মেয়েটির কোমরে ঠেস দেওয়া একটি ঠেকা (ঝুড়ি)। এখান থেকে তাকে বেঁটে দেখায়, হাওয়ায় তার কাপড় উড়ে; এর তারই ঠিক পিছনে বখরাকরা খরকাটা উদোম কোরা ধানক্ষেত। মেয়েটি হাতে তাল দিয়ে বুঝি বা কিছু গীত গায়। শাজাদ চোখ ছোট করে বড় করে ঠাওর করে নিয়ে হাঁকল, 'হে হি গো অমলি হে, অমলি কোতি?'

সড়ক তথা রাস্তার ঢালে নিম্নে নালা, জলে টইটম্বুর। তার উপর দিয়ে তালের গুঁড়ির সাঁকো, অমলি এখন সেখানে। শাজাদের ডাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'রাঘবপুর ঠেন ঘরকে যাবু অ।'

'খাড়াও হে খাড়াও রে ধনি।'

এখন, যখন শাজাদ সাঁকোর কাছ বরাবর, তখন অমলি দাঁড়িয়ে আছে। তার বসন উড়ছে, বাঁ পায়ের উরুতখানি দেখতে ইচ্ছাসুখ হলে দেখা যায়। সুঠাম কালো হিমশিম

নিটোল উরুতখানি। শাজাদ ক্লান্ত, ঘোড়ার ঘাড়ের শেষে কনুইটি রেখে, হাতের উপর মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁট শুকনো জিব দিয়ে ভিজাবার চেষ্টা করেছিল। অমলির মুখে বেফাঁস এলোচুলের ছেনতাই, সে যেমন বা উন্মাদিনী ভূতুড়ে।

'এ হি ডোমের ঘরনী, শুধাই রাঘবপুরের খাস বাড়িতে দিনমানে নাকি ভূত দেখায়?'

'ভূত দেখায়'—ইহি করে হেসেই অমলি থমকে থেমে গেল। অমলি ডোম শাজাদের কথা বুঝবার চেষ্টা করলে সহজেই বুঝতে পারত। হাসি জন্য সে ত্রস্ত। এরপর এমনভাবে করলে যে সে বুঝেনি, নাসাপুটে আঙুল ঘষলে, তারপর কানের বেলকুঁড়ি টিপতে টিপতে মাথা দুলিয়ে বললে, 'ভূত কুত্থাকে! সে ঠেন কাজকে লাগলাম বটে, টাকা দরে মাহিনা হে, তোমার কথা সুজিনা গো, খড়ির আঁচড় বুঝি না গো।'

শাজাদ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে হাতদুটি রেখে বললে, 'কাজকে লাগলি তাইতো শুধাইরে।' এরপরই তার গলা যেন কার টুটি চেপে ধরেছে, বললে, 'ডগর বখনা, ভরা ভাদুরে যৈবন তোর লো, তিন তিন স্যাঙা করলি বটে, আর সাদা কথা আন জবাব দিস লো...আহে, মানুষের কথা বুঝিস না কেনে? কানে কি বাঁশি শুনস্ বটে', আরও শক্ত করে বলেছিল, 'ভূত ভূত জীন! শুনি বুনবিহারী লায়েব নাকি বহাল হইছে।'

অমলি এইবার পরিষ্কার বুঝলে, কিঞ্চিৎ ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূ কপালে তুলে ঠোঁট উল্টে বললে, 'হোঃ ইঃ ইকথা।' এরপর মাথা নিচু করে ঠেকার কানা খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'লায়বটো আইছে ডিহি জমিন জানপরচানি করাইতে গো, ছিট বুঝায়।' একটু যেন সরল নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে, ঈষৎ দুলে দুলে বলতে লাগল, 'লায়েবের একটা পাশ-দেওয়া চেংড়া ভাগনাই কাজ লিবেক বটে।' তার কথার শেষে ক্রন্দনের ধরতাইয়ের খুঁ-খুঁক শোনা গেল।

'বটেক' বলেই শাজাদ চোখ ছোট করে ঘোড়ার কেশরে আঙুল চালাতে চালাতে তার চোখে চেয়ে বললে, 'কেমন মানুষ বটে ভূতটা রে?'

অমলি তার নিজের মত করেই বুঝেছিল যে এ প্রশ্নের মধ্যে ধমকের আওয়াজ ছিল না। এ কারণে তাঁর ঠোঁট চঞ্চল হল, তবু থেমে সম্মুখের লোকটির দিকে আলগোচে চেয়ে নিয়ে, একটু হেসে দুলে দুলে বলতে লাগল, 'দেখলে মন লাচবে গো, ঘোর আমুদকে বটে, দশ-বিশ রাত-ইয়ার ঝুমুরলাচ পচুই পারবন', হঠাৎ কি যেন ভেবে বললে, 'বড্ড লোক কাজ পাবে গো, হাটে হাটে ধ্যাড়া দিইছে, মাড়ভাত পাব গো কাঙাল মানুষ মোরা হে— কচুপাতার অধম গো, পাইক বরকন্দাজ কতক লাগবে, তুমার কাজ মিলবিক'—মিলবেক স্থানে আড়ষ্টতায় 'বিক' হয়ে গিয়েছিল।

শাজাদ ছিলার মত টান হয়ে গেল, ঘোড়ার কেশর থেকে চোখ তুলে অমলির দিকে চেয়েছিল। চোয়াল দুটি নিষ্ঠুর হয়েছে, কেশরে একটি স্থিতিবান হাত ক্ষিপ্রগতিতে কেশর মুঠো করে ধরলে, গায়ের কাঁথা নড়ে উঠল। ঘোড়াটি ঘাড় আন্দোলিত করতে হ্রেষাধ্বনি করেছিল। নালার কাল জলে অমলির ছায়া কেঁপে উঠেছিল, সে সহজ হবার চেষ্টা করে এক পা দিয়ে অন্য পা চুলকোল। শাজাদ লাফ দিল না কথা বললে, 'হে শালী শালার ঢুকিয়ে দুবো ওর...'

ভয়ে স্পষ্টতই অমলির চোখদুটি অদলবদল হয়ে গেল। সে নষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং ত্বরিতে

মুখে কাপড় দিয়ে ঘাড় কাত করে, শঙ্কিত হয়েছে এমতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা কাপড়ের উপরে ভীত দুটি চোখ আর মাঝে মাঝে চুলের ছেলেখেলা। শাজাদ আপনকার মাথার ফেট্টিতে ঠিক দিতে দিতে বললে, 'ঈহি ডরে মরলি, বল ডুমনী মানুষ কেমন? উপর কি বা?'

গলাটা পরিষ্কার করে, মুখলগ্ন বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে থেকেই, সে যেন চোখ দিয়ে কথা কইল, 'দু কুড়ি মন লয়, গোরা গাট্টা ঢ্যাঙা, ঠাকুর ঠাকুর আদ্দল।' আবার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল, 'বড্ড মানুষ গো, সব কোলে যায় সব কোলে আসে মন বুলে গঙ্গাজল...'

শোনার পরক্ষণেই শাজাদ গরুতাড়ানো শব্দ করে বলল, 'ই হি গঙ্গাজল। আঁচল বিছানি মাগী ক'বার...যা শালী ট্যারা সিঁথি কেটে হাঁসকল পাতগে যা সদরে' এই ঝাপটায় অমলি থরহরি, সে রোগা হয়ে গেল। এখন দুজনাই চুপ। রুনুখগাঁয়ের ছেলেমেয়েদের গোলমাল আসছে না। শুধুমাত্র ঝট্‌ঝট্ কচিৎ ডানার শব্দ মধ্যে মধ্যে শেয়াল অথবা বোধ হয় খরগোসের অন্তর্ধান। শাজাদের ঠোঁট নিঃশব্দে কাঁপছিল। স্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'আমাদের গা লিয়ে কোনও কথা শুনছিস? আসছিল তারা...।'

'শুনি নাই...আসে নাই'

'মিছাই বলছিস'

'কেনে? মিছাই বললে রক্ত উঠে...'

'দো দো হারামজাদী...যা ঘরকে যা।' তারপর অন্যমনা হয়ে বললে 'ঘরকে বলিস জলপস্তু (পোস্ত) করতে, প্যাঁজ পুড়াতে, একটু খোল (সরিষার) চমকাতে বলিস বটে।'

এবার কাল জলের উপর থেকে অমলির আতুর ছায়া সরে গিয়েছে। শাজাদ মুখ তুললে, জমে উঠা নিঃশ্বাস ছাড়ল, নিঃশ্বাস গরম— হাতে সে উষ্ণতা পরখ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। অমলিকে হারামজাদী গালপাড়া সূত্রে বললেও শুধুমাত্র তার আওয়াজই হয়েছিল, এবং এ কথাই সত্য যে, তার বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছিল। যে বিরক্তি, গত পরশু ঠিক এমত সময়, তখন একটি তারার সন্ধ্যা— তখন থেকেই মনে চমকাচ্ছিল। অনেকবারই সে মুঠো শক্ত করে নিজের ক্ষমতার হিসেব নিয়েছে।

পরশুদিন এমতকালে, ঘোতাই মাগুী বহু ডিহি ডহর পাঁচ-ছটা চুটাতে পার হয়ে খড়গ্রাম গিয়ে শাজাদকে খবর দিয়েছে যে, রাঘবপুরের খাস বাড়িতে পুনর্বার হুজুর দেখা দিয়েছে। রাঘবপুর যে আবার পত্তন করছিল সে খবর সবাই জানত। নূতন হুজুর! হুজুর কথাটা শুনে শাজাদের ভ্রূদ্বয় হাইয়ে উঠল। সে জ্বরে কাঁপছিল, কাঁথার নকশায়, চোখ বড় বড় জনমানুষ পাখিগুলো হাস্যকর, তারা নড়ছিল। খপ্ করে মাথার ঢাকাটা খুলে সরিয়ে ঘোতাইয়ের দিকে তাকালে। ঘোতাই মাগুী তখনও বসেনি, দাওয়ার উপর একটা পা রেখে এবং হাঁটুর উপর একটি হাত রেখে নাক খুঁটতে খুঁটতে আবার যেই বলেছে, 'লুতুল হুজুর।'

শাজাদ বেয়াড়া-তাড়ানো গলায় হে হে করে বলে উঠল, 'থাম শালা পাখুরে হারামি শালা 'হুজুর হুজুর' বলি হুজুরের বুকজোড়া ব্যাঙ্গামি-রাঢ়! হুজুর বলতে পরাণ তুয়ার লগব গাইছে রে...দাখিলা পরচা চিনলাম না...হুজুর কেনে?' শ্রান্ত ঘোতাই একটু টাল খেয়েছিল।

শাজাদ আরবার কাঁথা মুড়ি দিলে, ঘোতাই কথা বলতে শুরু করেছে! কাঁথা মুড়ি দেওয়া পদদ্বয়, যা চেটাই ছাড়িয়ে বার হয়েছিল, তা নড়ছিল, কাঁপছিল, থামছিল।

ঘোতাইয়ের বক্তব্য এই যে নতুন সকালবেলা। বনবিহারী নায়েব কোমরে ময়াল কুণ্ডলী করে চাদর বাঁধা। এক হাঁটু ভেঙে অন্য হাঁটু উঁচু করে বসে, দূরে দূরে আঙুল দিয়ে নিশানা পয়চানি করায়। নায়েবের সম্মুখেই, মাটিতে নুড়ি চাপা দেওয়া ছিট (ম্যাপ); ঠিক তার পাশেই এক গাদা গুটান পাকানো ছিটের বাণ্ডিল। এবং সেখানেই বিরাট একটি ছাতার শান্ত ছায়া। অনেক দূরে চড়াই আর উতরাই, তালগাছের এলেক, অতীব দূরে অনেকটা আকাশ, লম্বা হাতে-গড়া মেঘরাশি। রোদে নায়েবের চোখ ছোট, বলছিল, 'হাই দূরে পুবে কুসুম গাছ উয়ার পাশেই বটেই পতিত জমি, —উ যো উপরে শিরীষ উটা কেন্দ বটে তা'পর হল ড্যাঙা ডিহি—ইধারে পশ্চিমে' বলেই চোখ ফেরাতেই নায়েবের চোখ পড়েছিল ঘোতাইয়ের দিকে। গায়ে কাদা মাখা হলে যেমত অস্বস্তি হয়, ঘোতাইয়ের শরীরময় নায়েবের নজর বাবদ তেমন তেমন অস্বস্তি। নায়েব তার কুলোঝাড়া আওয়াজওয়ালা গলায়, 'ঘোতাই লয়, ঘোতাই কেতি! কত জনম দেখি লাইরে আয়', তারপর আর একটু সাহস করে বলেছিল, 'আয় আয়, লে লে সোনার মানুষ দেশকে এল রে' বলে নিকটে কে যেন ছিল তার দিকে মহাসম্ভ্রমে মহাগর্বভরে তাকাল, এবং বলেছিল, 'আর ফিকির লাইরে ঘুতাই, আকাশ ভাঙি জল বরখাবে গো এমন মানুষ আঁজলা ভরি জল পাবি, ডবল মিঠাই আখ' বলে একগাল হেসে বললে, 'লে লে ঝপ করে লে' বলেই পুনর্বার নালঝরা চোখে বাবুর দিকে চাইল।

সম্মুখেই বাবুহুজুর। তাঁর মাথায় লাল পশমের বিরাট একটি ছাতা তার রুপোর দণ্ডে ফিনফিনে নকাসির কারুকার্য। দণ্ডটি ধরে দাঁড়িয়ে কয়েক দিনের তাজা একটি অভুক্ত মুখ, এর পাশেই আর একটি লাল চাপকান পরিহিত মুখমণ্ডল, তার নাকের ডগায় সাদা কাঁটা কাঁটা, এর হাতে টাঙির মত মনোরম একটি পাখা, সে ঘুরায়। পাখার হাওয়ায় ছাতার রুপালি ঝালরে খাড়া স্রোত গোলাম হয়ে আছে। অথচ বাবুহুজুরের হাতে কোঁচার তোড়া চুনট করার ফলে ফুলয়াড়ি হয়েছিল। সেটাকেই নাড়িয়ে হয়তো বাবু হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নায়েব এমত দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না, এ কারণে তার আটাত্তর বছর বয়সের বঁড়শির মত ক্বচিৎ ভ্রূগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, মনে মনে ভাবলে, 'কোথাকার বুনো বে-আক্কেলে বাবু গো।' এবং দুম করে ধমক, পাঙ্খাবরদারকে, 'হেই বেটা আঁকাড়া মাকড়া ঢপ গাইছিস না হাওয়া—।' নায়েবের ধমকে বাবুহুজুর যৎপরনাস্তি বেয়াকুব বয়ে কোঁচা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাখা নিশ্চিত জোরে চলতে থাকল।

নায়েব আহ্লাদ করে, ঘোতাইকে দেখিয়ে বললে, 'হুজুর, আপনার প্রজাখাতক, লে লে তোকে আর ঠেটি টানতে হবে না।' নায়েব যদি একথা না বলত তাহলে ঘোতাইয়ের কোমর থেকে ঠেটি খসেই যেত, 'লে বড্ড কাঙাল মনিষ গো, উয়ারা সাঁওতাল, হাঁ হাঁ কথার মানুষ বটে বিষ-তঞ্চকতা নাই, ওই মৌজা রুনুখগাঁয়ে বাস, আপনি হুজুর এসেছেন শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছে। লিকটে আয় ঘোতাই আর লিকটে আয় হা লে লে গড় কর তোর জন্মজন্মান্তরের দোষঘাট মকুব হবে— লে।'

ঘোতাই কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না; যদিচ এ কথা সত্য যে, সে কথার ফটকে পড়ে গিয়েছিল। কাঙাল চাষা তারা জন্মজন্মান্তর, তত্রাচ বাবুকে প্রণাম করতে আসেনি, এ কথা জজে মানবে, আকাশে যিনি আছেন তিনি সাক্ষি। ঘোতাই মাণ্ডীরা উত্তরে সাঁওতাল, বহু পুরুষ দেকোদের সঙ্গে বাস, তুড়ক শাজাদের সহচর তবু সেও ফেরে পড়ল।

নায়েব দুধ-তোলা গলায় 'তোদের কত ভাগ্যি তোর বাপ জানত বুড়ো রাজাকে পুণ্যাত্মা লোক লাট কৌসুলের মেম্বার দরবার লিষ্টিতে নাম তারই লাতি রে' বলে নিজেই হাতজোড় করে বললে, 'কত পাপ করেছিলুম তাকে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।'

ঘোতাই তখনও মাটিতে গড়-করা অবস্থায়। নায়েব বলেছিল, 'লে লে উঠ বেটা।' সে উঠতে উঠতে শুনেছিল, 'সব্বাইকে খপর দিবি হে, চাল কটা বেশি খাবি।' নায়েব থামল সম্ভবত। ঘোতাই উঠে দাঁড়াল। তার নাকে এবং কপালে এবং হাঁটুতে লাল মাটির দাগ, কিছু অতি ক্ষুদ্রকায় কাঁকর, সে একটু চুলকাতেই খসে ঝরে পড়ল। হাঁটু আর কনুই ঝাড়তে তার কেমন বাধ বাধ ঠেকল। সভয়ে এক ফাঁকে সে হুজুরের দিকে তাকিয়ে ফেললে। মাথায় ছত্র দু-এক স্থানের জরির ঝালর ছিঁড়ে ঝুলছে। পায়ে দিকে নজর পড়ল, পায়ে ভেলভেটের উপর রেশমের কাজ-করা পাম্প। সিল্কের মোজা, গোলাপি গার্টার, ঢাকাই কাপড়ের কোঁচার রোক, স্টিফবুক শার্ট, পাকানো উড়ানির মধ্যে হীরের বোতাম জ্বলছে। তার ঠিক উপরে পরম রমণীয় সুন্দর বিহ্বল। মুখমণ্ডল। আকর্ণবিস্তৃত দুটি লাল চোখ, কালো চুলে সিঁথি করে চুমকি ছুঁড়ি পাতাকাটা। ঘোতাই বিস্ময়ে হতবাক্ এ যেন কোনও ঠাকুরদেবতা। একবার মাত্র তার নিজের ঠেঁটির কথা মনে হয়েছিল। ঘোতাই হঠাৎ চোখ ফিরাল।

অদূরে পাল্কি তার গায়ে নূতন রং। বারওয়ান থানার ছুতোবার করা নকশা, সিধি আদিলপুরের পটুয়ার হাতে লেখা নিখুঁত লতাপাতার কেয়ারি এবং পরী চিত্তির করা। ঘোতাই এই পাল্কিটা চেনে, রাঘবপুরের আস্তাবলে পড়ে থাকত, বহুদিন পূর্বে ওখানে ছাগল চরাতে গিয়েছিল সে আর শাজাদ। শাজাদ মস্করা করে ওই পরী-পাল্কির চটা-উঠা পরীর মুখে গোঁফ এঁকে দিয়েছিল। এখন, এই পিছনে এখন বেশ কিছু দূরে দু-একটি ঘোড়া অনেক গরু চরছে, আরও দেখা যায় নেংটিপরা রাখাল বাঁশের লাঠি বগলে ঠেকো দিয়ে আড়বাঁশি বাজাচ্ছে, তার হাতের বালাটি এখান থেকে সুস্পষ্ট। ঘোতাই এখান থেকে ওখানে পালাতে মরিয়া হয়ে উঠল।

হুজুর একরকম কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির বাংলায় বলেছিলেন, 'নায়েবমশাই ওদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিন।'

কথাটা শোনা মাত্রই নায়েবমশাই হো হো করে উঠল, ক্ষণিকে, ত্বরিতে উঠেই তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'হুজুর এ সকল কথা উয়াদের সামনে বলবেন না, আদবকায়দায় তা লয়, আড়ালে আমাকে হুকুম তলব করবেন উয়ারা লীচ কাঙাল আদপেটা আপনার জুতাচাটা প্রজা-খাতক উয়াদের সঙ্গে কথার লেগে আমরা আছি বটে।'

হুজুরের মুখটা পাক দিয়ে উঠল, অবশ্য সরমে নয় যেহেতু নায়েবের মুখে বেয়াড়া গন্ধ সেইহেতু। এবং লজ্জার জন্য বড় বড় চোখ দুটি অন্য কোনও কিছুকে আশ্রয় করতে চেয়েছিল; সুতরাং হুজুরের লাল ছাতার মধ্যে আপনার মুখখানি আড়াল করতে বাসনা হয়। আপনার

অভিজাত গৌরবটা ভুলে যাওয়ার জন্য হাত ঘেমেছিল। বনবিহারী নায়েব হাঁটুর ধুলা ঝেড়ে পানক্লিষ্ট দাঁত বার করে বললে, 'যা রে ঘোতাই আমরা তোদের গাঁয়ে খবর দিলে যাস, সকলকে বলবি।'

ঘোতাই, এরপর ল্যাকপ্যাক করতে করতে তারপর জোরে পা চালিয়ে দিলে। ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠে, সাহস করে এদিকে বরাবর চেয়ে দেখেছিল। ছোট গোষ্ঠী, লাল ছত্র, পাল্কি, লোকলস্কর সব কিছু—আর দুরে গরু, ঘোড়া, কাঁড়া, তাদের গলার ঘন্টি টুংটাং করে বাজছে। আর মেলা রোদ। তার মনে হয় এ দৃশ্য যাত্রার দৃশ্য যেমত। তার মনে হতে পারত এ সকল পোশাক জিলা আদালতের পিয়ন-আর্দালির মত। যে, যা সে দেখেছে।

ঘোতাইকে কেউ যেমন তাড়া করেছে, যেহেতু সে দ্রুত পায় আলডহর পার হয়ে রুনুখগায়ে এসে পৌছল। কোনদিকে যায়? যে সে, কি সে করে? একবার এদিক অন্যবার আর-দিক সে করেছিল। তার মতিচ্ছন্নতায় মুরগি ভীত হয়ে তার বাচ্চাটিকে নিয়ে অন্যত্র সরে পড়ল। ছোড়া মোরগগুলো কোঁ কোঁ করে পালাল। ছাগল একটা, ঝটতি সরে দাঁড়াল মাটির দেওয়ালের গা ঘেঁষে, তার মাথাটা চীনে তুলির ঝটকা টানে পরিবর্তিত হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

ঘোতাই ডুমুর গাছে মাথা গুঁতিয়ে, আতা গাছটায় দোলানি দিয়ে এক টানে এসে দাঁড়াল নিমাই হেলের বাড়ি।

'আহ আহ ঘোতাই ললদিনী পরাণ, সামাল দাও বুকের কাপড়ে হে খসি কোমরে গেল এমন ছুটলেক...।' বসন্তের দাগওয়ালা রসিক মুখখানি তুলে ইয়াসিন বলেছিল। এখানে আরও অনেকে উপস্থিত।

অন্য সময় ঘোতাই ননদ কথাটা নিয়ে বাতবচসা করে, যখন করে, তখন অনেকে ঝুমুর গাইতে গাইতে লেটো ধরে অবশেষে ডিহি খেমটা ধরত। যেমন এখন শোনা গেল, 'ধনি মোর গঞ্জনায় গোঁয়ার, ও সে মানবে না কার কথা।'

অবশ্য ঘোতাই বাতবচসা না করে একটু গম্ভীর হতে চেয়েছিল। এত অল্প ছোট তার চোখ যে, সে গম্ভীর একথা কখনই মনে হয় না। সে শাজাদের অনুকরণ করলে, এবং রববানির মত করে যাত্রার দৃশ্যটির কথা বলেছিল। এই প্রথম নিজেকে কেউকেটা বলে ধারণা হয়েছে—অত্যন্ত। অসভ্যভাবে নাক ঝেড়ে ঠোঁটিতে আঙুল মুছে আরম্ভ করলে—ফলে সে যথাযথ করে ঘটনা গোছ করে বলতে পারেনি। দোষঘাট মকুব কথাটা মনে করবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারেনি। সবকিছু বেগোড় করেছিল।

নিমাই হেলে এ যাবৎ চুপ করেই শুনছিল। ঘোতাই এক হাত্তায় কথা বলে নিয়ে, এখন থেমে থেমে ভেবে কিছু বলতে। নিমাই হাঁটু নাচিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'শা-আ গোলামের এঁড়ে পাথুরে, শালা আঁচল পেতে দিলি না কেনে? গড় করলি রে! হায় হায় পোয়াসত্ত্ব ভোগ না কি... হে হে একি একে বলতে বটে...।'

'আমি বলি ললদের কোনও দোষ নাই, উয়াকে একা বেস্যাঙা পাইছে! ব্যস! ইয়াসিন গম্ভীরভাবে আরও বললে যে 'লায়েবটাই "মিরাহা টিছুবি" (উলটে নিলে বিছুটি-হারামি হয়) এক লম্বরের, উয়ার বাপ ওঃ!'

নিমাই হেলে ঘোতাইয়ের ঘাড় নাড়া দেখে ক্ষেপে উঠেছিল। বোধ হয় সে ভীত সে একা। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সে ঠেন থিকে চলে আসতে পারতিস হে।...যাঃ শালা সাঁপিটো ভিজাই আন।'

নিমাইয়ের এহেন কথায় ঘোতাই বটে ছোট হয়। এখানকার রোদ তার গায়ে বড় কড়া হয়েই লাগল, যেহেতু অপমানে মন দেহগত হয়েছিল। তার রাগ প্রবেশ পেয়েছিল, সে নিমাই হেলের হাত থেকে সাঁপিটা নিয়ে চলে গেল। এই ফাঁকে নিমাই বলেছিল, 'তুমি বলছ বটে উয়ার দোষ লাই আমি বলি ও হুঁদো মাগীর হধম কোম্পানি শুনলে বুলবে কি?'

কেউই এই তুরুপের জন্য খাড়া ছিল না। ইদানীং সকলেই ভীত হয়েছিল, কে একজনা অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, 'ভারি শলো মায়ের দয়া হইছে, নিমঝোল খাব।'

ইতিমধ্যে ঘোতাই ভিজে সাঁপি বুড়ো আঙুলের চাপে নিঙড়োতে নিঙড়োতে ফিরে আসতেই নিমাই অতীব ঘেন্নায় বললে, 'যা শালা ছানা পেটে ধর গা...লীহ্যে শুগা।'

ঘোতাই নিজেকে সহজ করবার মানসে ক্রমাগত কফ টানছিল। গড় করার অপমানের থেকে সকলেই বেশি ভীত হয়েছিল। মনে মনে ভারি ভয় পেয়েছিল। ইয়াসিন সাত ছেলের বাপ, আকাশের প্রতি তার বড় মায়া, প্রতি জুম্মাবারে (শুক্রবারে) সে এগারো মাইল পথ ভেঙে কোরান শুনতে যায়। মাথা তার হিসাব জানে, খুব ঠাণ্ডা। কল্কে ধরে দু-একটি ফোকাই টান মেরে, এবার ঠেঁটিতে তালু ঘষে কল্কে ধরে দিলতোড় টান দিয়েছিল। মুখখানি তার লহরী তোলা জলে প্রতিফলিত যেন বা, গাঁজার ধ্বকে কুঁচকে কুঁকড়ে স্থির হল। তারপর শুরু করলে, 'শ শ বছর বিতাল হে, এ মৌজা পতিত লিখা।' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'কত জখমির কষাকষি হল, বুড়া...রাজা গো তার পাইকের হাত থেকেন শাজাদের বাপ বন্দুক কেড়ে নিলে, গুলির ঘায়ে আছাড়-পিছুড়ি খেলে ঠিন্‌কি গহিরার সোঁতায়, শুনি মরণকালেও সে ঘা ছিল। তখন মানুষগুলো মরদ ছিল। সায়েব ম্যাজিস্টর রুনুখগাঁয়ের সব্বাইকে ডাকি খাজনা দিতে হুকুম দিলে সে—খাজনা লিতে কেউ এল না' বলে হাসল এবং বললে, 'এ লাটের মালিক ওই ঠেন আকাশে থাকে'।

এরপর বহুদিন গত হয়েছে। ছাগলের মুখের গাছ আজ ছায়া দেয়। রুনুখগাঁয়ের কথার আওয়াজ বহুদূর থেকেই কানে আসে। লোক বেড়েছে জমি একই আছে। কেমন যেন কমজোরই হয়েছে সকলে। তবু শাজাদ খুব জবরদস্ত, ফলে এ গায়ের কোম্পানি বলতে তাকেই বুঝায়, তাই সকলে মতলব ঠাওর করলে শাজাদকে একটা খবর দেওয়া হোক। এ কারণে ঘোতাই খড়গ্রাম যায়।

শাজাদ রাস্তার ঢালে এখনও দণ্ডায়মান, গত পরশু সন্ধ্যার কথা ভাবছিল। ঘোড়ার ন্যাজটা গায়ে পড়তেই সে যেন চমকে উঠল, ঘোড়াটাকে একটা যতনচাঁটি মেরেছিল।

অমলিকে দেখা যায়, খরপায়ে আল ধরে সে যাচ্ছিল। একটি বিজোড় যখন, ছাগল যেমত লাফ দিয়ে পার হয়— তেমনি সেও পার, তখন শাজাদের গলার স্বর তার কানে এল: 'হো অমলি দৌড়ে যা রে হে ঘরকে বল্লিস গো আলমের সাজ পাঠাইতে বল্লিস হে হে।' অমলি শাজাদের দিকে ঘাড় না ফিরিয়েই শুনেছিল। এবার সে ঘাড় ফিরালে, বেশ দূরে

আবছায়া আবছায়া, একটি শাজাদ আর একটি তার ঘোড়া। অমলি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষামাণা। এখন আর কোনওই হুকুম এল না, সে আবার পথ ধরলে।

শাজাদ কিছুকাল সেইদিকে চেয়ে থাকার পর রাস্তার বটগাছ থেকে নেমে-আসা ডাল ধরে ঢাল বেয়ে, রাস্তায় খাড়া উঠে গেল। রাস্তায় উঠে সে বসেছিল, পিছনেই ঘোড়াটিও ছিল। শাজাদের আর দম ছিল না সত্য, কিন্তু তার এ বোধ ছিল যে আপনার মনের ভিতরে কি যেন আনচান করছে। অনেকক্ষণ পরে আলপথে খাড়া অন্ধকার দেখা গেল, তারপর তাদের কথা ভাঙা ভাঙা আওয়াজ, এরপর স্পষ্ট হল নিমাই হেলে আর শিবাই বামুন।

নিমাই ঘোড়ার সাজ রাখতে রাখতে বললে, 'শুনি তোমার নাকি জ্বর বটে' বলেই শাজাদের গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলে। শাজাদ ক্লান্ত না গম্ভীর বুঝা গেল না। দু-একটি পাতা খসে পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য বৈচিত্র্য ছিল না। সুতরাং কেবল ঘর্মাক্ত স্তব্ধতা ছিল।

শিবাই শাজাদের সমীপে বসে, গাঁজা টিপতে টিপতে কয়েকটা শীত-শীত কথা বলেছিল, শাজাদ হাঁটুর উপর কনুই ঠেকো দিয়ে মুখখানি হাতে ঢেকে রেখেছিল। সহসা পাতা খসে পড়ল, এবং তৎক্ষণাৎ শোনা গেল ঘোড়ার খররর শব্দ, ওরা দুইজনে যেন নিঙড়ে উঠল, এবং অকারণে যে ভীত হয়েছে এ কথা স্মরণ করে দুজনে হাসির ঝিঁক দিল, শাজাদের পিঠটা চমকে উঠেছিল, ধীরভাবে পাশ ফিরে সে কিছু নজর করবার চেষ্টা করেছিল।

নিমাই বললে, 'লৌতুন মালিক খাস কুঠিতে আসছে, ডাগর দুটো ঘোড়া আনছে, বলে হোয়লব ঘোড়া শুনি পচুই খায়...' বলে ঘোড়ার গায়ে পাশাপাশি হাত চরাতে লাগল তাঁতির মতন।

'বটে', বলে শাজাদ আরও বলেছিল, 'আর সমাচার?' একথায় মনে হয়, এই প্রশ্নটি করবার জন্য সে মন বাঁধছিল। গর্ত ছেড়ে যেন একটি ভীত ইঁদুর পালাল।

প্রশ্নের মধ্যে তবু বুঝি শ্লেস ছিল, শিবাই নিমাইয়ের হয়ে উত্তর করলে, 'কোনও খবর নাই...ওই যা শুনছ', বলবার কালে সে নিজের জটা খামচে ছিল, অবশেষে বললে, 'ই ঠেন আসে নাই।'

'জমি নাকি শুনি মাপ জরিপ হয়', শাজাদ হাতের তালু দুটি ফাঁক করেছিল মুখের উপর থেকে।

'ভিন মৌজায় হয়', এরপর ভীত সাহসী গলায় বলেছিল, 'লিহো-হে, হি সে গোঁফতা আছেন, ই ঠাঁই আসবে...' তারপর রাল-রগড় করে বললে, 'লাও আর...চুলকায় কোথাকার রাজা মরেছে গো' নিমাই হেলে যেন অন্ধকারে মিশে গেল।

গম্ভীরভাবে শিবাই বললে, 'ঘুতাইকে বলেছে ই আপনার প্রজা-খাতক' বলেই সে খস্ করে দেশলাই জ্বালল। দড়ি ধরে উঠল। বামুনের জটাজুট আর দাড়ির মধ্যে রুগ্‌ণ মুখটা প্রতীয়মান হয়েছিল। শাজাদ শক্ত করে আগুনের দিকে চেয়েছিল, এবার ঘোড়ার পিঠের উপর মাথা হেলিয়ে দিল। বৃক্ষের পত্রসমূহের মধ্যে মধ্যে আকাশ, শাজাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তার মন যেন বিন্দুবৎ হতে চাইছে। অথচ স্মরণে এমন কিছু নেই যাকে আঁকড়ে ডাক-ছেড়ে কাঁদতে পারে। যা আছে, তা নিঃসঙ্গতা মাত্র। তথাপি সে গলাটা কেমন

যেন আড়ষ্ট করে বলেছিল, 'শিবাই মনে পড়ে আমরা সেই দাদাপীরের ঠেন গেছিলাম, মনে পড়ে? পৌষমাস শিং-কাঁপানো ঠাণ্ডা। আমি, তুমি, কালিয়াচকের নিকের—সে বেটা বললে, আমরা আগা জ্বালি গোল হয়ে বসে সে বললে, লোকে বলে মাছের মত এমন হালাল জীব আর এই দুনিয়ারে নাই কিন্তুক আমার মন বলে, আমাদের মত মানুষের মত এমন হালাল জীব আর কেউ লয়', নিকেরের উক্তিটি বলে শাজাদ ক্রমে ক্রমে একটি ধূসর নিঃশ্বাস ছাড়ল, এবং বলেছিল 'আমার তাই মনে লয়।'

শিবাই কল্কেতে ফোকাই টান মারতে মারতে শাজাদের এহেন উল্লেখ করার হেতু কি তা বুঝবার চেষ্টা সম্ভবত করেছিল। নিমাই হেলে ঈষৎ হেসে, তারপর ছেছুড়ি দিয়ে একটু সরে এল। পুনর্বার শাজাদের গলা শোনা গেল, 'শিবাই ভগবান কি সত্যই আছে?'

এ কথার উত্তরে একটি সাঁ সাঁ করে শব্দ হল, এবং পরক্ষণেই সক্ করে একটি শব্দ হওয়ার পরই শোনা গেল 'আছেঃ!' শিবাই কল্কেটি এগিয়ে দেবার সময় আপনার বাঁ হাতটি দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করেছিল।

কল্কেটি বেশ করে ধরবার সময়, শাজাদ রয়ে রয়ে বললে, 'বামুন মনে কি লয় তোমার? আমার গতর তেমন তেমন লায়েক আর লয় না হে।'

এ কটি কথায় হিম ছিল, শিবাই কি যেন ঠাওর করবার কারণে চারিদিক চাইল, তারপর বললে, 'ই কথা কেনে?'

'লয় কেনে বল? ভারি হাঙ্গামার কথা মনে...'

কথাটা শেষ না হতেই নিমাই ঝলকে বলে গেল, 'আমারও তাই মনে লয়, ভারি হাঙ্গামা অর্শাবে' বলে থেমে লজ্জিত হল, ভীত হল।

একটু শান্ত। তারপর শোনা গেল, 'তাই বলি গতরের কথা।'

'[illegible] কেনও মরদ ভুলবে? তোমার গায়েকে দশ বন্দুকের বল [illegible] ইংরেজ দারগা ম্যাজিস্টরের বল তুমার গায়: মন করলে পাহাড় চাষি আঁখ ফলাইতে পার — এক আখে আদ্ মণ গুড়।' শিবাই মাটিতে চাঁটি মেরেছিল।

দু-একটা টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ যেন বা আমলকী পাতার মত; সে, শাজাদ, কল্কেটি হস্তান্তরিত করার পর বললে, এখন কি জানো ঠাকুর, তুমি আমি বড় কাঙাল হইছি; হাতমুখ ভাসুর ভাদ্দরবউ, দু-একটা মেরে ধরি খাই....তাও জুটে না, দেখ না তড়খা পারোই এ হেন সড়ক দিনমানে লোক হাঁটে না? লুটব কাকে? তাছাড়া মাড়ভাত জুটা ভার তেজ তাকত নাই— তাই বড়...শালা ধর যতি হাঙ্গামা করে...?' শাজাদের মত মারাঠা লোক এমন অসহায়ভাবে এ সকল কথা বলেছিল।

শিবাই তার জটা খাম্চাতে খাম্চাতে চটকা-ভাঙা শব্দে বললে, 'কেনে শালা, আমরা কি মরিছি নাকি?' নিমাই হেলে কল্কের ঠিক্‌রে ফেলতে গিয়ে থমকে চমকে গিয়েছিল, শিবাইয়েরা শেষ কথাটি সে নিঃশব্দ উচ্চারণও করেছিল।

এ প্রকার হলপে শাজাদ নিশ্চিত ভারি খুশি হয়েছিল। এ সন্দেহ তার মনে ছিল যে, এরা সকলেই তার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে, সে কথা অযথা! এরা আজও তেমনি তারই পাশে আছে।

শাজাদ আরও জানতে চেয়েছিল যে, এই রাস্তার ঢালের নিম্নে যে ধানক্ষেত, তারপর রুনুখঁগা—এখন যেখানে মিটমিটে আলো এবং ওপাশে ঠিনকি গহিরার সোঁতা আর সেপাশে মহুয়া গাছ অবধি যে সিঁড়ি-ভাঙা স্থাবর জমি, এখন অন্ধকারে যা ভয়ঙ্কর—মেলাখেলার লে-তরাবটে তরমুজি রাঢ়ের মত, আঁট নেই আঠা নেই; দেহে ঝুরি নামবে অত্রাচ পিরিত পাবে না। সেই জমিকে আপনার বলে, নিজের শির বলে মনে করে কি না!....এ কথার জবাব সে পেয়েছিল, ফলে তার শরীর দশ-মরদ হয়ে উঠল। একটি পা দিয়ে সে সজোরে লাথি মেরে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'লে রে নিমাই সাজ দে।'

শিবাই মুখখানি উঁচু করে বললে, 'কোতি যাবে হে?'

'দেখিব সখি সে কেমন জনা, কেমনে বাঁশি বাজায়' কলিটি গীত করে গেয়ে সাদা গলায় বললে. ভূত দেখে আসি হে...চক্ষে দেখি তাকত কেমন কাঁটি কাঁটি।'

ক্রমে ঘোড়ার সাজ পরানো হল, শাজাদ ঘোড়াটির উপর উঠে বসে বললে, 'তুমরা ঘরকে যাও আমি এলাম বলে,' থেমে আবার বললে, 'এবার যতি জিতি ঠাকুর পীরের দরগায় আমার ছাগলটা—'

নিমাই হেলে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'আমারও মানসিক আছে হে, টিলাতে আমি চিনি দিব গো'। তার গলার স্বরে ভীতি প্রকাশ হয়েছিল!

শাজাদ চকিতে যেন ক্ষেপে উঠল, বললে 'ভয়ে শালা' এবং থড় করে ভারি চপেটাঘাতের শব্দ প্রকাশিত হয়ে উঠল, 'ভয়ে সুক্‌সুক্ করছ'।

নিমাই চড় খেয়ে টালটা কোনওমতে সামলে, ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল। শিবাই তাকে নিয়ে মাঠে নেমে গেল। কান্নার আওয়াজ, ছেলেমানুষের স্তন-খোঁজার কান্নার আওয়াজ যেমত!

একমনে দূরাগত ক্রন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে সহসা শাজাদ কেঁপে উঠল। লাগাম কষে ধরে, বললে, 'শালা হারামি কেঁদে খর মাঠ নোনা যতি করবি তো আবার...' তার কথা আপনা আপনি উল্‌টোপাল্‌টে যাচ্ছে একথা ভাবতে ভাবতে কখন যে থেমে গিয়েছিল তা সে জানতে পারেনি।

কান্নার শব্দ, এক্ষণে, আর নেই। কেবলমাত্র মাঠালি-হাওয়া সোঁ সোঁ করে উঠে নামে, বিরাট গাছের মাথাগুলি দুলে। রাস্তা আবছায়া মাঝে মাঝে জোনাকির ঝাঁক! পুতুল যেমত—শাজাদ নড়ে নড়ে চলে। এখানে তার ছায়া নেই এ কারণে যে সমগ্র দিকই অন্ধকার। খানিক পথ অতিক্রম করে, সে একটা ঝুমুর ধরলে, সুর ছিল না, গলায় ছোঁড়া মোরগের মত স্বর। সে নিজের গীত খানিক কান খাড়া করে শুনলে, ঠিক স্বর লাগানোর চেষ্টাও সে করেছিল, মধ্যরাতে ভীত পথিকের গানের মত উত্থিত হল, 'কাজল পরা চুক তোমার আঁচল পেতে লুব।'

অনেকটা পথ সে পার হয়ে এসেছে। সোজাই যদি যায়, তাহলে পারোই ইস্টিশান। ডাইনে নটা-গোবিন্দপুর, বাঁয়ে রাঘবপুর। ক্রমে চাঁদ সুপষ্ট, শাজাদ রাঘবপুরের রাস্তায়। আর কিছু দূরে অনেক ভাঙা-ভাঙা ইমারত—প্রাচীন কোনও বাড়ির, এখানে কখনও নীলের আড়ং ছিল। ঠিক এরপরই আড়ং-এর কুঠিবাড়ির প্রকাণ্ড ভাঙা লম্বা দালান। পর পর খিলান।

খিলানের মধ্যে দিয়ে রূঢ় চাঁদের আলো রাস্তায় পড়েছে। পড়ে এক অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করেছে। শাজাদ একটির পর একটি চন্দ্রালোক পার হয়ে এসে দাঁড়াল, সম্মুখেই বিস্তীর্ণ মাঠ। এইখান থেকেই স্পষ্টতই দেখা যায়, দূরে জলের তলার স্বচ্ছতার মধ্যে একটি আশ্চর্য!

কাঁচকড়ার তৈরি বিরাট একটি বাড়ি, গ্রীক মন্দির যেমত। এর সঙ্গেই জোড় দেওয়া আর পদ্ধতির দালান, এই দালানের উঁচু দেওয়ালের মাঝে মাঝে ছোট ছোট জানলা, অবশেষে খোলা ছাদ— ছাদের একান্তে দেওয়াল—মনে হয় ঘর তুলবার বাসনা ছিল। অন্য পাশে নবরত্নের চূড়া দেখা যায়। এতকাল হাওয়া বাজত, নিঝুম ছিল। মন্দিরে ঠাকুর আছেন লক্ষ্মী-জনার্দন ফলে সূর্য চাটুজ্জে, বেশকার নীলাম্বর আর পচা মালাকার তিন বিঘে ভোগ করে সে, এবং টগর ঝাড়ুদারনী।।. * আনা মাহিনায় বহাল ছিল—সে, তা ব্যতীত রামছবিলা দুবে দরওয়ান এ বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করত— সে, এ ছাড়া আর কেউ ছিল না। আজ যেন বেশি লোক। শাজাদ খানিক নিরীক্ষণ করে আপনকার দেহটিকে খেলিয়ে সোজা হয়ে বসল।

এটা যেন বাড়ি নয়। বাণবিদ্ধ রাজহংস, অনড় প্রস্তর যেমত; তার অঢেল শৌখিন উড্ডীয়মান জীবনের পরমার্থ একভাবে এইখানে দেওয়ালেই খুঁজে পেয়েছে। ঘুরন্ত সিঁড়ির শেষ ধাপের অলৌকিকতা এখানে। তবু তথাপি কেন যেন মনে হয়, যেন বা কোথায় সমস্ত কিছুতে হাড়ের জঘন্যতা রুক্ষ হয়ে আছে। শুভ্রতার অন্তরীক্ষে সম্যকভাবে যা নেই; যা এখানে স্মৃতি—ভৌতিক, নিপীড়িত, গোঙানিতে পূর্ণ। এ কথার ভাব শাজাদ পেয়েছিল, তার মনে অবশ্য হয়নি। শবদেহ যেন পুনর্বার উঠে বসেছে, এবং এই সত্য তার মধ্যে হিম হয়ে দেখা দিল। সে কেঁপেছিল, তার মনে হল পাশে তো কেউ নেই, মনে হল কারা যেন আছে বা।

তার মত লোক কতটুকু ভাবতে পারে? খুব জোর আলুর কল, আঁখের টিকলি, ধান যদি হয়। শাজাদ এখনও এখানে, তার পিছনে পাশে আলুলায়িত গজপিপুল লতা, আরও পিছনে ছক্কটা আলো অন্ধকার তথা তেরচা চন্দ্রালোক এবং রহস্যময় পরিপ্রেক্ষিত। সহসা এই পরিপ্রেক্ষিত তার মধ্যে দুস্তর অভ্যন্তর সৃষ্টি করেছিল—সেখানে ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ। এ শব্দে তার রোমহর্ষ হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে, সে উপর দিকে তাকাল, গাছে গাছে অন্ধকার, এবং বাদুড় দেখে সে হুস করতে গিয়ে থেমে, আবার পিছন দিকে চাইল, কোনও উত্তর নেই—শুধু চাঁদের আলো। একবার তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, 'হা খুদা, আমায় ভূত করলে না কেনে' অতীব ভীত দারিদ্র্যের উক্তি।

সে দেখেছিল, অনেক লণ্ঠনের তৎপর যাওয়া-আসা, তাদের কথার আওয়াজ এখানে হাওয়ায় হাওয়ায়ে আসে পট্‌পট্ করে উঠে। কুয়ার লাটটা উঠে নামে, বড় কুয়ার ঘিরনির শব্দ, জলে বাল্‌তি পড়ার দম করে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। এই আবহাওয়া শাজাদকে সত্যই নাড়া দিয়েছিল, সে আলমের ঘাড়ে মাথা রেখে বিশ্রাম চাইল। তার যেন হার হয়েছে।

কখন যে সে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়েছে, আর যে কখন সে আলমের ঘাড়ে চাপড় মেরেছিল, এবং বাবুই দড়ির লাগাম টেনেছিল তা তার চোখ দেখেনি। সম্মুখে আরবার খিলানের রহস্য, ঘোড়া মন্থর গতি যায়, খিলান-ভেদী চাঁদের আলোয় তাদের ছায়া ত্যাওড়

বেঁটে বেঁটে। শাজাদের মনে এখন আর ঝুমুর নেই, নিদেন একটা অশুদ্ধ খেমটাও নেই। আড়ং সে পার হয়েছে, ভারী কাঁথাটা দুই কাঁধে তুলে দেওয়া, জ্বর বহুক্ষণ ছিল না। এখন শুধু তার মনে হল, পেটে খিদে নাল ঠুকছে, ফলে শরীরটা তার পাক দিয়ে উঠেছিল। পেট নিঙড়ানো খিদে। এমন খিদে তার কেনে? ঘোড়াকে 'খাড়াও খাড়াও' বলে রেকাব থেকে পা বার করে ঝুলিয়ে দিলে, স্থির হয়ে ভাবল একি জলতৃষ্ণা না খিদে, দেখতে চাইল কোথা জল। এই দুস্তর ফাঁকা মাঠের মধ্যে সে জলচিহ্ন কোথাও নেই। বেশ কিছুকাল এইভাবে তাকাতে তাকাতে তার কি একটা কথা মনে হল! মনে হল যে মাঠে মাঠে সে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। কোনওমতে নিজেকে পাঁজকোলা করে ফিরিয়ে আনতে পারছে না, অনাথ অসহায় বালকের মত সে অপলক নয়নে সেই দিকে ঠায় চেয়ে আছে। তার মধ্য হতে একটি ছোট ক্ষণস্থায়ী শব্দ উত্থিত হল : ভারি ন্যাকা আঁ-আঁর মত। কিন্তু এ শব্দ নিজেই সম্ভবত শোনেনি।

এ ক্ষুধা বৈধব্যের অনেক শোকের পরের ক্ষুধা। এই সঙ্গে উর্ধ্বে উড়ার প্রথম ডানা ঝাপটানোর তীব্রতা নিয়ে তার মনে উদয় হয়েছিল আর এক ছবি। সেই সাদা বাড়ি, মনে হল তাকে যেন বা তাড়া করে আসছে। ভয়ে সে জগদ্দল। তাহলে এটা খিদে নয়, এটা ভয়। তৎক্ষণাৎ শাজাদ কোনও এক কাল্পনিক আক্রমণ থেকে, সত্যসত্যই নিজেকে সরিয়ে নিল। কে একজনা তাকে আঘাত করতে এসেছিল, সে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে। ভয়ে হাত দুটি দেহের সঙ্গে আঠা হয়ে গিয়েছে। কুয়োতলের শীত মাকড়সা যেমত, গায়ে চলাফেরা করে। শাজাদ কাঁধে জড়ো-করা কাঁথা নামাতে গিয়ে, দৃঢ় হয়ে আবার উঠিয়ে রাখলে। তার চোয়াল যদি, অভ্যাসমত শক্ত না হতো তাহলে সে মরতই নিশ্চয়। দাঁতে এখনও তার ঠোঁট কামড়ানো, ট্যাঁক থেকে একটি দেশলাই এবং কানের পাশ থেকে আদপোড়া চুটা বার করে এখন দাঁতে চেপে ধরলে। দাঁত তার অযথা বেশি খেলছিল। চুটার ধোঁয়া গলায় যেতেই সে খুব করে কেশে উঠল। আদপোড়া চুটার স্বাদ ভারি বদরাগী, তথাপি তার বেশ আরাম লাগছিল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে সাহস ভরে চতুর্দিকে চাইল। ইদানীং যে পৃথিবী আলমের—তার ঘোড়ার পায়ের তলায় ঝাটতি তা সাবালক হয়ে বিরাট বেইমান খাড়া; পৃথিবীর থই নেই। সে ত্বরিতে চৌকিদারি গলায় 'হো-হো-হোই' দিলে; জলজ পানার যেমত ভয় আবার ভেসে উঠেছিল।

আর ভয় হয়েছিল শাজাদের নটা-গোবিন্দপুরের চাঁদের আলোয় ড্যাঙা দেখে, দিনে যা নিত্য-সবুজ। অজস্র তচনচ হয়ে থাকা হাড়পাঁজরা, হাওয়া এখানে লাট খায়, সোঁ-খিপ্-খিক্ করে উঠে। এটি আধা ভাগাড়। শাজাদ এদিকে আর তাকাতে পারল না, ঘোড়ার উপর নিজেই দুলতে লাগল এমনভাবে যেন ঘোড়া ছুটছে খুব কদমে। অবশ্য অনেক পরে ঘোড়া ছুটল। আবার সেই সুড়ঙ্গ মলিন পথ।

ঘোড়াসওয়ার জীবনে এই প্রথম ভাবতে চেষ্টা করলে, ভাবা তার কোনওদিনই হয়নি। কত বিস্তর আকাল গেছে। ভাবনা তার কখনই হয়নি—মায়ের দয়া অথবা কূট গরম হলেও হয়নি। যা এ সকল ক্ষেত্রে করণীয় শাজাদ তাই নির্লিপ্তভাবে করেছে, গাছের মাথায় হলুদ ছোপান ন্যাকড়ার নিশেন টানিয়ে দিয়েছে। আর তার ভাবনা তা আকাশে যিনি আছেন তাকে অনায়াসে বকলমা দিয়েছে।

ঘোড়া মচকে মচকে চলেছে, শাজাদ দূর শতচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে চেয়ে, সে মনস্থ করে এই যে, আর পশ্চাশ কদম পরে যদি পাকুড় অথবা শিমুল গাছ হয়, তাহলে 'ভূতে'র সঙ্গে কোনও হুজ্জতহাঙ্গামা হবে না আর যদি আম বা মহুয়া হয় তাহলে ভারি খুনখারাবী হবে। 'খুনখারাবী' কথাটি মনে উঠতেই সে আপনার অজানিতে 'হো-হো-হোই' দিয়ে উঠে, গা তার রোমাঞ্চিত। ঘোড়ার কদম গোনা বারবার ভুল হয়। কতবার গাছ চেনা মিথ্যা হল। পুনর্বার সে মনস্থ করেছিল।

খানিক পথ অতিক্রম করার পরই অতর্কিতে আলমকে দাঁড় করালে সে যেন-বা কিছু দেখতে পেলে। কান খাড়া করে রইল, এবার সে-ধ্বনি স্পষ্ট হল, এ তার রক্তের ধারা-স্রোতের ধ্বনি ঘটে, অসম্ভব দুর্ধর্ষ গতি নিষ্ঠুর লাল। আপনার গায়ে সে আদরে হাত বুলাতে লাগল, সহসা সে-স্রোত চোখের সামনে, কে যেন ছোট ডোঙা বেয়ে আসে। যাকে দেখতে পেলে, তাকে দেখে সে থমকে স্থির। এ যে তার বাপজান! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা হয়ে ছিটকে গেছে, একারণে সে কম্পিত ত্রস্ত। শুধু মুখে আল্লা নাম। অপরিচিত সাদা আর কালোয় ব্যক্ত রুগ্ণ মানুষের চোখ যেমত অথচ বীভৎস! ইতিমধ্যে ডোঙা আরও কাছে এল, সত্যই তার বাপজন, সুন্দর দৃপ্ত মুখখানি তাঁর নড়ছে, কবরের ধূলা খসে খসে পড়ছে।

শাজাদ আর্ত ভীত, চেঁচিয়ে উঠল, 'বাজান বাজান।'

বাপজান চুপ, শুধু কবরের ধূলা ঝরার শব্দ। এবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শাজাদ তুই মাইয়ের দুধ খাস নাই'।

শাজাদ মুখখানি উঁচু করে গাছের মাথার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে।

'শাজাদ', সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁপে উঠে শুনতে লাগল, 'তুই ডরাস, হেঃ তোর রক্তে আজ্‌জিও আমি নাও বাইরে।'

এ কথার পর শাজাদ আরও ভাল করে তাঁকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখল পাতা পাতা আর চন্দ্রালোক। সে তারস্বরে হো হো করে বললে, 'বাজান বাজান' তারপর মুখখানি নিচু করে শুধু বলেছিল, 'আল্লা' এবং আপনার আঙুল ঘোড়ার কেশর মধ্যে চালাতে লাগল, মুখ তুলে অনেক অনেকবার সে চেয়ে দেখেছিল, কোথাও কিছু নেই। শুধু পাখির অস্বস্তি, আর প্যাঁচার তিরিক্ষি ডাক। তার দেহ নিশ্চয়ই কাঁপছিল, কেননা একদা তার মনে হয়েছিল কোথাও পালাই। নিজে এলোমেলোভাবে সে চেঁচিয়েও উঠেছিল। ঘোড়াকে ঠোক্কর দিয়ে সে বেসামাল হয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনওমতে সে নিজেকে ঠিক দিলে।

ঘোড়া অল্প কদমে ছুটছে, মুখে তার শুধু 'বাজান' আর 'বাজান'। এক্ষনে আর এক দৃশ্যের সঞ্চার হল, অনেকক্ষণ পূর্বের সন্ধ্যার কালো জলে, অমলি ডোমের সরবতি উরুত এখন হি হি করে উঠছে। তার শরম হল, ইচ্ছা হল এক দৌড়ে বাড়ি যাই, ফুলসন ফুলসন। এখন শাজাদ ঘোড়ার ঘাড়ে মাথাটি এলিয়ে দিয়েছে, চোখগুলি থেকে থেকে বড় হয়ে উঠে, মুখ কখনও বা স্পষ্ট কখনও আঁধার। কিসের আতিশয্যে সে বিদঘুটে হয়েছিল তা তার জানা ছিল, সহসা মধুর জলতরঙ্গের শব্দে তার কান তার ঘোড়ার কান এককালই খাড়া হয়ে উঠল।

অনেক দূরে দুটি লালচে আলো, মধুর ঠুং ঠাং শব্দ, অদ্ভুত লয়ে পড়ছে, এই সঙ্গে খট্

খররর মৃদু আওয়াজ, ক্রমান্বয়ে অক্ষর হয়ে উঠছে। তার নিজের ঘোড়ার শ্লথ পায়ের শব্দ সেই মাধুর্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এখন উদ্ভাসিত হল, গাড়ির আলোতে কালো উথলে-উঠা ঢেউ। জোনাকিগুলি ছিটকে আরও উঁচুতে, তৎসহ সেই বাজনা টহলদারের মন্দিরা যেমত; ভেরোই চোখ এনে দেয়। শাজাদ এ সঙ্গীতে ক্ষণকাল কিছু ভুলেছিল। বালকের মত সে হাসল। পরক্ষণেই সে গম্ভীর হয়েছিল।

সম্মুখের অশ্বদ্বয় যেন কষ্টিপাথরে তৈয়ারি, তাদের কেশর ফেঁপে ফুলে উঠে গাড়ির আলোকে ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে। চাকাগুলি ফিনফিনে। গাড়ি রুখে দাঁড়াল এ কারণে যে, এই রাস্তার একপাশে, চাঁদের আলোতে স্পষ্টই প্রতীয়মান, যে ধসে গিয়ে গড়ায় পরিণত হয়েছে আর সেখানে অন্ধকার বোঝাই। গাড়ির আলোতে তা ভয়ঙ্কর। গাড়ি রুখে দাঁড়াতেই, নাজুক গানের কলি ভেসে এল, ঘোড়াদুটি এখন টগবগ। কচুয়ান হাঁকল 'এই ঘোড়াওয়ালা নিচু সে উতরো, নিচুমে।'

শাজাদ এতাবৎ চমৎকার চোখে ঘোড়াদুটিকে দেখছিল। লোকটির কথায় ত্রস্ত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, ভীষণ জোরে বাবুই দড়ির লাগাম কষে ধরল, হাত তার জ্বলে গেল তবু হাত তার দড়িতে কামড় দিয়েছিল। সঙ্কল্প চোয়ালে খেলতে লাগল। এবং মুখ তুলে তাকাল, গাড়ির উপরে আলোতে দেখা যায় তাসের ছবির মত পোশাকপরা একটি লোক, পাশে আর একজন। শাজাদ তাদের দিকে একটি চোখ ইচ্ছে করেই ছোট করে বললে, 'আঃ হো তুমার মর্জি হয় তুমি লাম্ না কেনে?' গলার স্বরে নিজেই কেঁপে উঠেছিল।

ঘোড়াদুটি এখন টগবগে, তাদের খুরের আওয়াজ ভেদ করে ব্রুহামে আসীন সকলকেই, শাজাদের কণ্ঠস্বর, চাপকে চঞ্চল করে তুলেছিল। গাড়িতে এক টুকরো শুবনাম মসলিন পড়ে ছিল, তিনি নাতিহুজুর। তিনি সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়েছিলেন, সঙ্গে দুইজন সঙ্গিনী, একটি তাঁর ইহুদি মেয়েমানুষ, অন্যটি বাইজি—যার গান শোনা যাচ্ছিল। এছাড়া বাবুর সামনের আসনে, তাঁর পেয়ারের মোসায়েব ভব, তার পাশে সারেঙ্গিবাদক, এবং ঠিক তার পাশে নায়েব বনবিহারী মাথায় কম্ফর্টার জড়ানো (এখন ফাল্গুন মাস)। এ গাড়ির পিছনে আর একটি ট্রটিং তাতে খাদ্য মদ্য পাইক বেহারা ঠাসা।

হুজুর মোহনগোপাল এমত কণ্ঠস্বরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁর ঘোর একটু ফরসা হয়েছিল। জিব নেড়ে কিছু বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসে আবার চেষ্টা করে বললেন, 'ভব টর্চ'।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ভব নায়েবের শরীরের উপর দিয়ে নিজের দেহ আঁকাবাঁকা করে টর্চটা ফেললে। আলো লম্বা হয়ে পড়ল, পড়েছিল কঠিন একগুঁয়ে একটি মুখের উপর, এবং তা ব্যতীত আরও দূরে। হুজুর কোনওরকমে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটা কে?'

নায়েব বুঝেছিল এ হুকুম তাকে করা হয়েছে, ফলে তৎক্ষণাৎ দুই হাতে গাড়ির মলম ধরে মুখটা বার করে ঠাওর করবার চেষ্টা করলে, নায়েবের দেহে টর্চ আড়াল পড়েছিল সুতরাং ভব আরও হাতটি বাড়িয়ে টর্চ ঘুরিয়ে ধরেছিল। নায়েব দেখল, গামছার পেট্টির তলায় জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, এইমাত্র মুখখানি টর্চের আলো থেকে চোখ সরিয়ে নিল। এবার

আর একবার সে বিরক্তিতে মুখখানি আলোর দিকে ফিরাল, তার কপিশ চোখদুটি নায়েবের মুখে গিয়ে লাগল।

শাজাদ আর সময়ক্ষেপ করলে না। কেবলমাত্র একবার বিরাট কালো জানোয়ার দুটির দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে ক্রমে ঘোড়াগুলির পাশ কাটিয়ে যতই এগিয়ে আসে নায়েবের মুখ সেই অনুপাতে গাড়ির মধ্যে সরে সরে যায়। নায়েব এখন একেবারে নিজের আসেন স্থির। শাজাদ গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় অতি ভদ্রভাবেই টর্চটা সরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে। ভবতারণের হাতও ঘুরেছিল এবং এতে করে দেখা গেল অত্যন্ত সুন্দর একটি মুখমণ্ডল, পার্শ্ববর্তিনী ইহুদি মহিলার থেকেও রং অনেক গৌর। মাথায় সেই পাতাকাটা তেড়ি, অবশেষে আর একটি স্ত্রীলোক যার নাকের নথ অতি সূক্ষ্ম চুড়ির মতন। মন-জুড়ানো ফরাসি আতরের (?) গন্ধে স্থানটি উদ্বেলিত অথচ কেমন যেন তা জংলি পাশবিক! শাজাদ পার হয়ে গেল। এখন সে বেশ দূরে গেছে।

হুজুর হঠাৎ রেগে বললেন, 'এই ইস্টুপিড টর্চ হাটা।' টর্চ সরে গেল তিনি আবার প্রশ্ন করলেন 'কে ও?'

নায়েবমশাই যে কিভাবে শুরু করবে তার ধাঁচ ঠিক করতে পারেনি, কম্ফর্টারে একটু ঠিক দিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হুজুর ও বেটা রুনুখগাঁয়ের শাজাদ।'

'রুনুখগাঁ আগে বলেননি কেন?'

'জ্ঞে...' কি বলা উচিত ঠিক ভেবে না পেয়ে বললে, 'বেটা ভারি বদমাশ খুনে ডাকাত...' তিনি যে রয়ে রয়ে জোর দিয়ে বলেছিলেন একথা সকলেই বুঝেছিল। নায়েব তটস্থ, সকলেই বিব্রত।

'ঘুমাও গাড়ি...'

'এই ঘুমাও গাড়ি' বলেই ভব বললে, 'কিন্তু ও তো ধানক্ষেতে নেমে গেল।'

'গাঁ জ্বালিয়ে দেব'

'বাবু হুজুর, ও যদি জানত যে খোদ মালিক হুজুর গাড়িতে আছেন তাহলে ই হে হে...'

হ্যাঁ তা বটে, খোদ মালিক যদি... ওর তো আর পাঁচটা বাপ নয়...'

ইতিমধ্যে ইহুদি মেয়েমানুষটি বাবু হুজুরকে ছোট একটি গেলাসে পানীয় দিলে। মোহনগোপাল গেলাসটি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলেছিলেন। এ কথা ঠিক যে তাঁর, এহেন ব্যাপারটা গায়ে লেগেছিল, আর যে তিনি জখম হয়েছিলেন, মদের ঝোঁকে এক একবার তাঁর স্মরণে আসছিল, কিন্তু এখন কোনও কিছুই করবার নেই। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ও বুঝতে পারেনি আমি আছি?'

নায়েব আর ভব সমস্বরে বলেছিল, '....আজ্ঞে না না, জানলে, কখনও....হ্যাঁ'—এরপর নায়েব একই কথা একাই বললে। এবং আর একটু দম্ভ প্রকাশ—'হি আর কিছু বেগোড় করলে আমি জুতিয়ে...হেঁ', বলেই ভীত হল, কম্ফর্টার ঠিক করলে।

'কালই ওদের ডেকে পাঠান।'

'হ্যাঁ হুজুর, কালই' বলে নায়েবের ভারি অস্বস্তি হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল রুনুখগাঁ অতি কোড়, তারা আসবে কি?

গাড়ি চলেছে মোহনগোপাল তাঁর হাতের হীরে-আংটির দিকে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। মনে রাগ নয় ক্ষোভ নয় অন্য কোনও কিছু ছটফট করছিল; এক চুমুকে ব্রাণ্ডি শেষ করার জন্য কপালে চোখের আশেপাশে সর্বত্র ঘাম, কোঁচার খুপি দিয়ে মুখ থুবলেন। এবং বললে, 'ভবাই, মদ।'

হুজুর মোহনগোপাল, যথাযথ হুজুর আজ কয়েকদিন। সুতরাং প্রজাসাধারণের যে হঠকারিতায় পাগল হবার মত মন এখন তৈরি হয়নি,—অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, কিছু একটা বেগোড়, চুন খসলেই যে ঝটিতি ক্ষেপে উঠবে এমন অবস্থা হয়নি। এ কারণে যে মাত্র দুদিন অথবা তিনদিন হয়, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নিজে অতীব প্রাচীন। বড় প্রাচীন। খুব আশ্চর্যও হয়েছিলেন, যেক্ষণে তিনি জানতে পারলেন, নিরবধি কাল তিনি জীবিত। আপনার অভ্যন্তরে কে একজন ভারী চোখ তুলে বারবার চাইতে চেষ্টা করছিল। আর সামনেই রতি পাইক কত কথা বলছিল।

তখন সম্মুখে লতাপাতার বাট করা আয়নায় আপনার চেহারা দেখবার চেষ্টা করলেন, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। খাঁড়ার খোদাই করা চোখের থেকে এ চোখ দুটি অতীব অঘোরচারী। শরীর এ মুহূর্তে ছিল না, মোরগের মত মুখটা এপাশ করলেন। একটির পর একটি দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে সংঘাত হল। ওপাশে মেহেগনির উপর, চালাসির (চেলজি) পুতুল নৃত্যরত; কখন বা ফরাসি ঘড়ি সোনায়,—দারুণ ষাঁড়ের উপর আলুলায়িত বসনে মেয়েটি সময় ধরে বসে। তালদার বাতিদানের রুপার দণ্ডে ফুলকারি করা। কভু বা ভিনিসীয় কাচের পাত্রের আয়তলোচনা মাতৃমূর্তিতে। অথবা এবার ঊর্ধ্বে।

উলঙ্গ সুন্দর বারোক শৌখিনতা, মোহনগোপাল এখানেই স্থির ছিল, এখন ছিল। ভাল করে লোকটির দিকে একবার চাইলেন। এবং একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোরা কি জাত?'

'বাউরি'

হাতের ছোট পুতুলটির দিকে চেয়েছিলেন, পুতুলের মুখের কাব্যধর্মী সরলতা তাঁকে বেশিক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখতে পারেনি। সহসা তাঁর, এক ফাঁকে, মনে হয়েছিল এই পুতুলটি কেনার কথা। কোনও এক ধনী বেনেবাড়ির ছেলে, তখন প্রায় খড়ি-কাপ্তেন, আধো গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে পুতুল দেখাল, মোহনগোপাল তাঁকে শ-পাঁচেক টাকা দিতেই সে চলে গেল। মোহনগোপাল আস্তে আস্তে পুতুলটি দেখেছিলেন, এক তিলের মধ্যে এত সৌন্দর্য জগতে অনেক আছে, এটি আরখানি। তিনি গভীরভাবে পুতুলের ঠোঁটে চুম্বন করেছিলেন। তাঁর ঠোঁট পুতুলের ঠোঁট ছাড়িয়ে শূন্যতায় স্তব্ধ হয়েছিল। তিনি সূক্ষ্ম হতে পারেননি। এখন আবার হেসে সম্মুখের লোকটির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'মুচি নোস তো?'

'মুচি কেনে' হুজুরের সরলতায় সে হেসেছিল।

হুজুর মোহনগোপালের মুচি হওয়ার কারণ এই যে, লোকটি এতাবৎ যে কথা বা গল্প বলেছিল সেগুলিতে পচা গলিত দেহের গন্ধ। সে অনর্গল বলে গিয়েছিল, আবার শুরু করলে, 'আমায় দশ ঘা জুতা মারুন হুজুর, যদি মিছাই কিছু বলি, দেখন হুজুর আপনার নুন

খাই— গা আমার জরা, ফাটা ফাটা দশ গাঁ ফেলে এলাম, এ কেমন কথা আপনার নাম কেউ জানল না, পাঁছরী মৌজার কুয়োতলা বসি কাঁদলাম, আমার মনিবের লাতি গো তাকে চিনল না, তারপর ভাবলাম না চেনা দিলে হে চিনবে কেমনে...?' তার বলার ভঙ্গিতে কেমন নাচের ভঙ্গিমা ছিল। মাঝে মাঝে হাঁটু ভাঙে, কভু শূন্যে হাত আছড়ায়। এই লোকটি রতে পাইক। চোখে তার মনসপাতার কাজল।

মোহনগোপাল শুধু এইটুকু ভেবেছিলেন, তা কি করা যাবে। এবং বুড়ো রতিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'কি করে চিনবে!'

'চিনবে মানে, উয়াদের কাঁকের মাইধরা ছানা পর্যন্তকে ঠুঁটি ধরি আনব তোমায় আপনাকে চিনাতে গো...রাজা চিনবি না রাস্তা চিনবি না...'

'দুঃ'

'দুঃ কি বাবু...বহুত দিন নুন খাইলাম, তাদের অখণ্ড পরমায়ু, আজও যিনি আপনার মধ্যে ভোগ দখল করে গো' বলে লাঠিসুদ্ধ কান ধরে কুর্নিশ মত করলে। এবং বললে তাদের কি প্রেতাপ ছিল, ভয়ে তারসে লোকে কাপড়ে-চোপড়ে হত, প্রজাখাতক কি কথা এক সায়েব লালমুখো সদরঅলা, রাজার সঙ্গে বখেড়া করলে, সাহেব হাঁসিল হল, তার লালমুখোর অখণ্ড দোষ বল্‌লেক, তুয়ার রাজাকে আমি চিনি না, ব্যস খতম' বলেই বেসাট দাঁতগুলো বার করে হাসল। 'লাশ তলাশি হল না কাক-শেয়াল বহুত রক্ত খেলে, ওতলো চৌকিদার খানিক রক্ত মাখা মাটি লিয়ে দেখালে...'

'আঃ থাম থাম'

'আমি মিছাই বলি না হুজুর, হাঁ, দোরতণ্ড ছিলেন গো, বুনেদি কত বড় ঘর...কি হাঁকডাক!'

হুজুর মোহনগোপাল বুড়োর কাছ থেকে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন, সনাতন যেখানে বসে বন্দুক সাফ করছিল, দ্রুতপদে হাল ছেড়ে সেখানে, এটা ডাক-বারান্দা; একপাশে পাথরের টেবিলে, লম্বা বাক্সর ডালা খোলা, লাল বালতি হা হা করে আছে। দামি সুন্দর বন্দুকটি এক্সন ঘাট পরানো হয়েছে, হয়েছে, হঠাৎ বাবু-হুজুর বন্দুকটাকে তুলে নিলেন। নল কাঁপে বসতেই খাচ্ক্‌ করে শব্দ হল। তিনি বললেন, 'ভব, গেলাস দিতে বল', বলে গলার চেনহারটি একটি আঙুল দিয়ে কেবলমাত্র আলগা দিলেন।

অভিজাত গৌরবের প্রতি এ কথা সত্য তার লোভ ছিল, আকর্ষণ ছিল। কেননা যেহেতু আবাল্য তিনি সাহসের নামে অনেক নীচ গল্প শুনেছেন। ছেলেবেলায়, এইরূপ একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী লোককে সর্বসময়ে খাটে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। অভিজাত গৌরবের মধ্যে রূপার গেলাস, আর একমাত্র প্রজা হিসাবে একটি বিড়াল। তারপর তাঁর পিতা অল্পবয়সে বেশ্যালয়ে ভবলীলা সম্বরণ করেন। এবং তারা দুই-তিনটি প্রাণী আশা পোষণ করেছিলেন, পুনর্বার জমিদারি ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এবং মোহনগোপাল অবশেষে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কোনও নীচ কাজ নেই যে তাকে করতে হয়নি, আর পাঁচটা প্রভূত ধনশীল যে পথে টাকা উর্পাজন করেন, তিনিও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এখন তিনি এখানে, রাঘবপুরে, সমস্ত প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর। সুতরাং রতে পাইকের কথা

কেমন কেমন লাগলেও এ তার মনের কথা। কেননা এখানে এসেই প্রথম দিনেই তিনি কয়েদখানাটি পরিদর্শন করেছিলেন।

ব্রান্ডি গ্লাসটি হাতে নিয়ে মোহনগোপাল বারান্দা ছেড়ে, হলে এসে চারদিকে কি যেন তাঁর চোখ খুঁজেছিল। পরে, একটি ললিতসুন্দর চেয়ারের হাতলে বসে পিঠদান হাতের উপর হাত রেখে মাথাটি ন্যস্ত করে বেশ কিছুকাল তাঁর কেটেছে, কখন তাঁর চোরা চাহনি এ সকল সৌন্দর্যের দিকে মানুষ যখন মানুষকে ভালবেসেছিল তার নিদর্শনের দিকে ঘুরেফিরে। কিন্তু দরজার আলো আটকে রতে পাইক এখন হাঁটু ভেঙে মহা উল্লাসে কি যেন বলছিল।

ক্রমে গোলাপের স্বাদ এ সকল কিছুর মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হল। রতে পাইককে হুজুর আর ছাড়লেন না। কেননা যেহেতু প্রজাশাসনের রীতি, চৌধুরীদের দর্পের কথা সে অনেক, অনেক জানে। নাতিহুজুর মোহনগোপালকে অতি সহজেই তার বংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার যত কিছু পথ আছে তার নিশানা সে দিতে পারে। রাত্রে মদ যখন মেয়েমানুষ হয়ে যায় সেইকালে তাঁকে জাগিয়ে রাখবে ইত্যাকার বিষধর গল্প কথা।

সেইদিন রাত্রেই তাঁর রূপান্তর ঘটল; শুধু মনে হল, আমি অতীব অতীতের মাংসপিণ্ডের আর একজন। ক্রমে হৃদয়ের স্থানে পেট এসে দেখা দিলে, দাঁত তাঁর ভাবপ্রবণতা, নখে ক্ষুরধার হয়েছিল ভালবাসা। রতে পাইকের মুখে আলো ঠিক্‌রে পড়েছে, আলোর অস্থিরতা রতির মুখখানাকে নিড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বারবার। 'ও ভজা লাপতে, কি কপাল লোকটার গো, জগা-তারা রুইদাস তার ফোঁড় কেটেছিল; কারণ জগার বউ লাপতের সঙ্গে লষ্ট ছিল! ব্যস, কাল হল রাজাহজুর তার আঙুল কেটে দিলেক!'

এরপর হুজুরের ঘুম কোথায়? ঘুম সে তো রোমক সভ্যতার বাটলির যে অনায়াসে মাংসের উপর মনের উপর অনৈসর্গিক আলো খেলিয়ে দিয়ে থাকে। যাতে করে সৃষ্টি আরবার, শিশু যেমত, সেইরূপ মাই খোঁজে। ঘুম নেই, ওডিকোলনের ঝারি আর ফলদায়িনী নয়, শুধুমাত্র তিনি ইসলামীয় টিউলিপ অঙ্কিত ভিনিসীয় ঝারির দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকেন। রুপার বাতিদান বিচ্ছুরিত আলোয় ঝারির তলায় তরলতায় আশ্চর্য সৃষ্টি করে, পূর্বে হলে হয়তো মোহনগোপাল ভাবত, ওখানে যেন অনেক মৎস্যকন্যা! কিন্তু এতে ইদানীং কোনও বংশগৌরব নাই মাথায় কোলনের জল, উপরে টানাপখায় গোলাপসুন্দরী আঁকা হলহল করে যায় আসে। এতেক বৈভব, সুদীর্ঘ সৌন্দর্য ঘুড়ি ধাইয়ের গল্পের কাছে ম্লান। ঘুড়ি ধাই, দশ বিশ মৌছায় লাট খেয়ে ফিরত তাই তার নাম, ঘুড়ি কেনে এক কাতরান মেয়ের নাড়ি কাটতে গিয়েছিল—তাকে ছেলে দিইয়ে লেখিয়ে...ছেলে বিয়োন করালে...হুজুরের রক্তের স্রোতে ভোদড় উঠানামা করেছে, অধিকন্তু এ কথা সত্য যে শঙ্কর মাছের রুপা বাঁধানো চাবুক, জুতো বা লাথিঝাটার কি ঘুম হয়!

খোলা ছাদে , এ ছাদের একপাশে দেওয়াল তোলা, সেখানে অনেক কোনও এক অতি সভ্যতার সাধনার মাধুর্য-মূর্তি। চাঁদের আলোয়, এক্ষণে রসিলা হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের ছায়া চিবুকে বিস্তৃত! এতে করে মনে হয়, কাল তথা সময় দীনতম দীনের মতই এ-বাড়ির নিচের তলায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় অপেক্ষামাণ।

আরাম-কেদারায় ফুলের ছায়া-করা মখমলের উপর মোহনগোপাল তাঁর মুখখানি ঘষলেন, সেখানে হিম ছিল। নিকটে কার্পেটে তাঁর মেয়েমানুষরা ছিট্‌কে পড়ে ঘুমায়, বাইজিরা ঘুমে কাতর তথা মদে অচেতন। অদূরে বেহারারা ঢুলছে, পড়ছে। তিনি একাই জাগ্রত। কোনওক্রমে বেসামাল পায় মোহনগোপাল ছাদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলেন, কার্নিশের উপরেএকটি পা তুলে দাঁড়িয়ে, তাকালেন, কার্পেটে এক ঝলক স্মৃতি; ওপাশে স্থিতিবান শাশ্বত মূর্তিনিচয়, আর পিছনে পোড়া পৃথিবী। সম্মুখে দুপুরের লাল সই দূরত্ব এখন আঁশখোয়া ধোঁয়াটে! তিনি একপাশের ঠোঁট ফাঁক করে বললেন, 'সব আমার—যা খুশি'...

অপ্রকৃত ঘুম, তথাপি জয়পুরি নাচওয়ালি, আগ্রাওয়ালি মেহেরউন্নিসার, পা লেগে সোডার বোতল গড়িয়ে, ঘুঙুরের আওয়াজ আর রয়ে রয়ে সোডার বোতলের গুলি ছিপি গুলগুল করে উঠেছিল। হুজুর ঘুরে দাঁড়ালেন। যা কিছু চিকন, যা কিছু ফুরফুরে তা হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। মোহনগোপাল নিজের মুঠো খুলে কি যেন দেখতে চাইলেন; বহুক্ষণ আগে এই দিগন্তকে পিছনে রেখে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, বেহাগের লহেরা নিপট, ধানিও লাট লাট খেয়েছিল। মেহেরউন্নিসা হোঁদলা ভেড়ুয়াকে দেকে তিনি কেমন যেন ভীত হয়েছিলেন, ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে ভেড়ুয়াকে ধরতে গিয়ে মেহেরকে ধরে ফেলেন। মেহের আই আই করে খানিক কুকুর কাঁদুনি দিয়ে সোহাগ কামড় দিয়েছিল হুজুরের হাতে, সে-কামড়টিকে বারবার খুঁজেছিলেন।

সত্যিই তিনি কি খুঁজেছিলেন? হয়তো না। মদ ইদানীং তাকে আরও জাগ্রত করেছে, মদের রীতি তা না হলেও ধর্ম তাই; আর তাই যদি তবে তিনি অদ্ভুদভাবেই জাগ্রত। মেহানগোপাল সঙ্কল্প করেছেন হাওয়াকে দেখবই। দূর প্রাচীন অতীতের অমোঘ পাথুরে দেওয়ালে ক্রমাগত টুঁ মেরে চলেছেন অতীত আমার চাই, সাক্ষাৎ অতীত। ফলে অতি সহজেই তাঁর নিজের ভিতরে একটা হাঁকপাঁক ঢুকে পড়েছে, অতিকায় গোঁয়ার মাংসপিণ্ডবৎ দিন রাত এইটুকু মাত্র বিচার, কোনও উষ্ণতা নেই।

খাঁচা ডানার পক্ষাঘাতে আনে না। নানাবিধ মুখচোরা লাজুক সৌন্দর্য তাঁর কাছে নামমাত্র হয়েছিল, তাই এখন যখন তিনি সাহস করে অথবা অসাবধানতাবশত, মূর্তিগুলির দিকে তাকালেন, দেখলেন, পরীগুলি অসম্ভব জীবন্ত। চন্দ্রালোকে নাতিসবুজ, এ পাথরের মায়া যেন বা তাঁর রক্তকে সত্যই লাল করে দিয়ে মনের মধ্যে শিশুর পরাধীনতা এনে দিতে চাইছে। ক্রমাগতই তাঁকেই কোনও এক স্বপ্নলোকের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি যেন কোথায়—টিট ন্যাড়া রক্ষার উপর দাঁড়িয়ে। একবার তাঁর মনে হয়েছিল এক ঝটকায় এ সকল সরলাতে তিনি তছনছ করে দিতে পারেন। উত্তেজনায় মোহনগোপাল এখ শঙ্কর মাছের চাবুক অথবা ছেঁড়া জুতা।

পরক্ষণেই তিনি যেন শুনতে পেলেন, অগণন মৌজা মহাল থেকে, এই বিরাট লোক চরাচর গরুড়ের মতো করজোড়ে প্রভু প্রভু বলে উঠেছে। অদূরবর্তী কয়েদখনা থেকেও প্রাণন্ত আর্তনাদ। সকলের বুকে তাঁর নাম—এরা কারা যাদের মেরে না ফেললে জীবিত ছিল বলে লেখা যায় না। মোহনগোপাল জানত না, ভয়ঙ্কর হওয়ার মধ্যে এমন এক মেজাজি আনন্দ আছে। সহজ মানুষের মত উঠেই তিনি বন্দুকটা তুলে নিয়েই, ভবকে দেখতে চেষ্টা

করলেন। ভব উপুড় হয়ে শুয়েছিল, কাপড় তার এলোমেলো, সেখানেই এক লাথি মারতে ভব উঠে কাপড় সামলে, চোখ কচলাতে লাগল। বব চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলে, সামনে বন্দুকের নল, বোকার মত সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শুনল তিনি কিছু বলছেন।

ভব নল দেখে ভয় পেয়েছিল। কারণ তখনও আলো দেওয়া হয়নি। মোহনগোপাল বন্দুক নিয়ে তাকে তাড়া করেছিল। বাইজি গান থামিয়ে চুপ ভব হলঘরে ঢুকেছিল, হুজুরও এসে পড়লেন, একটি আয়নার সহসা প্রতিফলিত ভবকে গুলি মেরেছিলেন, তারপর এক অট্টহাস্য। সেই থেকে ভব ভয়ে ভয়ে আছে। তবু এখন সাহস করে সে বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে, তাকে শুইয়ে দিতে গেল।

টিলার উপর দিয়ে আলো অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে, কুসুমের শীতলতা আর নেই, এখন খাক, তবু বেলেরাস্তা এখনও তপ্ত নয়। এমত সময়ে গেট পার হয়ে নাতি দীর্ঘ একটি ভিড় ক্রমে এই বিরাট বিরাট থামওয়ালা তিন-চার গাড়ি দাঁড়ানো মত প্রশস্ত গাড়িবারান্দায় এসে ঠেক খেলে। নিমাই হেলের ছেলেটি মাথা উঁচু করে 'হোউ' বলে উঠেই নিচু করে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি সহকারে হাসতে লাগল, এর পূর্বেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি হয়েছিল। যারা যারা বয়সী তারা তাকে তাড়া দিয়েছিল।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চটির ফটফট আওয়াজ শোনা গেল। এবং দেখা গেল নায়েব যে কষি বাঁধতে আঁটতে, এসে উপস্থিত, একগাদা অভিবাদনের হাসির উপর দিয়ে নজর চালিয়ে নিজের কাঁধ মচকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঠিক করে বললেন, 'কোন্ হারামজাদা রে?' বলেই দাঁতের ফাঁকে কি যেন আটকেছে, সেটাকে ছিক্‌ছিক্ শব্দ করে অদ্ভুতভাবে টানতে থাকলেন। সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, 'হুজুর বে উঠলেন, (বেলা এগারোটা) চাম তুলে লিবে'...

ইয়াসিন কার যেন কানে কানে বলেছিল, 'জাতে মুচি নাকি...'

নিমাই হেলের ছেলেটি বাপের নিকটে কাছ-ঘেঁষে আপনাকার মাথায় হাত দুটি স্থাপন করত; দাঁড়াল। কিয়ৎক্ষণ চুপ, শুধুমাত্র পায়রা শব্দের বোল পড়ন নির্দয় হয়ে উঠেছিল। পুনশ্চ নায়েব বললে, 'কুথাকার গেছ পাথুরে, বেহুডুলে (হোড়া মানুষ) গাঁ-মৌজা উজাড় করি আনছিস হে, কুকুরটাও লিয়ে এসেছিস হে...'

রববানি কানের মধ্যে কড়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে ঝাঁকি দিতে দিতে বললে—'ই কি গো, ছেইলা ছানা রাজদর্শন করবে বটে গো, তাই লিয়ে এলাম হে, কাঙাল মানুষ রাজা দেখি নাই—রাজা দেখুক।'

রাম সম্ভবত, একথা বলেছিল যে 'তুমি তো বুঝলে সব্বাইকে লিয়ে আসতে এখন'... রামের মত নিশ্চয় আর সকলেরই নায়েবের ব্যবহার বেশ অবাক লেগেছিল। গতকল্য সন্ধ্যায় ব্যবহারে একটু হাত কচলানো ভাব ছিল।

রামের কথার উত্তর দেবার মত মন নায়েবের ছিল না। যেহেতু রববানির জবাব তার কাছে লাগসই বলে মনে হয় এ কারণে যে এ সকল কথা নায়েব হুজুরকে বলতে পারবে এবং হুজুর এহেন কথায় বড় তুষ্ট হবেন। নায়েব বললে, 'লে তুরা বস, এখনই হুজুর লামবেন... হাঁ হাঁ চুটাফুটা খাস্ নাই ই ঠাঁইকে... সহবৎ সম্ভ্রম দেখাস...' বলেই চলে গেলেন. কেননা বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানোর মত জোর ছিল না।

এখানে এইভাবে ভুঁয়ে বসাটা যদি খুঁতখুঁতে ব্যাপার, তথাপি বসতেই হল। যেহেতু সকলেই শলাপরামর্শ করে এসেছে, মনে সকলেই ভেবেছিল হাঙ্গামা আটকাতেই হবে, কার সময় সুযোগ পালটেছে। শাজাদ সেদিন কারও কথা কাউকে ভাঙেনি।

শাজাদ খুদাতালার নাম স্মরণ করেই এসেছে, আসবে না এমন তো হতে পারে না। এই বোধ হয় প্রথম রুনুখগাঁয়ের লোক রাঘবপুরের তলবে এলে। এখানে ছাগল-গরু চরাতে অনেকবার এসেছে, কিন্তু এইভাবে কখনও আসেনি। সত্যই তাহলে প্রমাণ হয় সে রুনুখগাঁ কমজোরই হয়েছে। একথা বড় দুঃখের বটে। রুনুখগাঁয়ের রোগাপাতলা তাগড়া মিলিয়ে জন পঞ্চাশেক যারা এসেছে তাদের মুখে একই ভাব; এদের চোয়াল যেন নেই, চোখ ছোটবড় হবে না। সকলেই চুপচাপ করে বসে, গুনগুনানি যদি একটু বড় হয় তৎক্ষণাৎ একে অন্য গায়ককে 'হিঃ রে' বলে চোখ মটকে ধমক দেয় অবশ্য দু-এক দানা রস-রগড়ের কথা হয়েছে, এ ওর কানে ফিসফিস করেই বলেছে। কোনও কোনও শ্রোতার কাঁধে বক্তা দাড়ি লাগার জন্য, সুড়সুড়ি খেলে গিয়েছিল। শব্দ করে কেউ হাসেনি, অট্টহাস্যের মূক অভিনয় করেছিল। এক-একটা হাঁ যেন কলে খুলে নিভে যায়।

রববানিকে ইয়াসিন একটা ঢিল দিয়ে মাটি আঁচড় কাটতে কাটতে বলেছিল, 'চাচা তুমি বলেছিলে, রাজবাড়ি এসেই আগে চিঁড়ে গুড় দেয়, লাস্তাপানি দেয়—সে কেমন জলপান গো? লায়েব যেমনি দিলেক? সেই রকম না ধরে খেও মা?' ইয়াসিনের গলা জোর হয়েছিল। ফলে অনেকগুলি রেখাঙ্কিত অট্টহাস্য দেখা গেল।

এমত সময়ে সিঁড়ির উপরে দরজার কাঁচে কে যেন প্রতীয়মান। সাদাটে লতাপাতার কেয়ারি করা লম্বা কাঁচের শার্সিতে একটি মুখমণ্ডল, এবং তার রেশমের চীনে কোটের অনেকটা অংশ। এই দরজার কিছু দূরে একটি বন্ধ খড়খড়ি হঠাৎ বন্ধ হল, সেখানে ছিল মোসায়েব ভব, সে বোধ হয় ইয়াসিনের মন্তব্যের কিছুটা শুনেছিল। তাকেও শার্সিতে দেখা গেল, হুজুরের ভ্রূদ্বয় কুঁচকে উঠল। তিনি নায়েবকে কি যেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রশ্নকালে তাঁর মুখ ছিল নায়েবের দিকে, এবং আঙুল এদের দিকে সেই সময় উঁচানো ছিল।

হুজুরের রাগতভাব, বেশি আঙুল চালাতে গিয়ে শার্সিতে অসাবধানতাবশত লেগেছিল, ফলে একবার আঙুলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন কিছু দেননি...'

নায়েব অতিমাত্রায় ভীত স্বরে বললে, 'জ্ঞে ভাঁড়ারিকে বলিনি, কারণ এরা তো ঠিক আমাদের প্রজা নয়।' কথা নায়েব বুদ্ধি করে বলেছিল, যেহেতু এতেক লোকেদের চিঁড়া যোগান দেওয়ার মত ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

'থামুন', বলেই বলে ফেললেন, 'হোক না হোক' অর্থাৎ ভাবটা এই যে আমি একজন বিরাট কিছু, রাজা। আর অন্য কোনও অর্থে নয়। কিন্তু এই কথার পরই নায়েবের ধৃষ্ট উত্তর তাঁর কানে বাজল। বললেন 'প্রজা নয় মানে?' যেন তিনি কামড়াতে প্রস্তুত।

'জ্ঞে, জ্ঞে, হুজুর, ওরা হুজুর...'

ওরা হুজুর মানে আমার প্রজা... মানতেই হবে' বলেই চুপ করে থেকে কিয়ৎক্ষণ কিছু যেমন বা ভেবেছিলেন, ভাবলেন তাঁর বলা উচিত ছিল, 'ওদের... চৌদ্দপুরুষ মানবে' অন্তত

ইত্যাকার উক্তিকে তাঁর বনেদিয়ানা স্পষ্টতর হতো। নিজের কাছে তো বটেই, অধিকন্তু সমবেত সকলের কাছে। এরপর তিনি বললেন, 'মানাতে না জানলে কেউ মানে না' বলেই দরজা খুলতে হুকুম করলেন।

দরজাটা কিছু শব্দ করত খুলে গেল। সম্মুখে হুজুর এবং তার পিছনে রূপকথার ঐশ্বর্য। হলঘরের খানিক দেখা যায়। বেহারারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটি রাজসিক চেয়ার এনেছিল, পাদানি এনে দিল, প্রকাণ্ড পাখা এল। সমবেত জনমণ্ডলী যারা এতাবৎ মাটিতে বসে ছিল তারা একে একে উঠে দাঁড়াল (শার্সির পিছনে আবির্ভাবের সময় কেউ ওঠেনি)। ইয়াসিন উঠতে গিয়ে তাঁর কাঁধের ছেঁড়া নেতাটা (গামছা) পড়ে যাচ্ছিল। কে একজনা নাক ঝাড়তে গিয়ে স্থির হল। শুধুমাত্র শাজাদ দেহের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত উদ্ধত ভঙ্গি জোর করে খাড়া রেখেছিল, কেননা তার পেটে বুকে শীত চলে ফিরে, সে তার আপনার বাঁ হাতখানি কোমরে স্থগিত রেখেছিল।

পরীর মত মুখখানি দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক, তারা 'পৃতিমা' তারা 'যাত্রার রানি' বলে তাঁকে ধরেছিল। কথঞ্চিৎ ঘোর কাটার পর, ছোট ছোট কুর্নিশ—কিছু গড় (আভূমি নয়) চঞ্চল হয়ে উঠল। হুজুর দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে আবির নয়নে দেখেছিলেন। হসহস করে হাতপাখা আসে যায়, ফলে কিছু লোক যখন দেখে, অন্যেরা তখন বঞ্চিত হয়।

হুজুর চেয়ারে এখন যেন ঠিকভাবে বসতে পারেননি। প্রজা দেখে ভারি খুশি, দু-একবার গলা পরিষ্কার করলেন, নানান অস্থিরতা প্রকাশ পেল। ইতোমধ্যে শুনলেন নায়েব তারস্বরে হাঁকছে, 'ওরে লে গড় কর, ঈশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ব্রজগোপাল চৌধুরী বাহাদুর হুজুরের লাতি... শ্রীল শ্রীযুত রাজা মোহনগোপাল চৌধুরী বাহাদুর তোদের বাপ-মা, লে লে' বলে নিজেই বিনয়ে পাপোশ সদৃশ হয়ে গিয়ে বললেন, 'গরিবের মা-বাপ...'

পৃথিবীর হুজুররা সকলে মা-বাপ দুই, ফলে ক্লীবলিঙ্গ! হুজুর সলজ্জভাবে নায়েবের দিকে চেয়ে কখনও মুখ নিচু করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নায়েব ভুঁড়িটা যথাসম্ভব নাচিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর দরবার ঘরে যদি...'

'না... দু'মিনিটে সেরে নেব' বলেই তিনি সম্মুখের ভিড়ের দিকে বেনামা নজরে চাইলেন। ইতঃপূর্বে এরূপ দুঃখময় ভিড় দেখেননি। কতগুলি অনিশ্চিত শীতে কাঁপছে। নিজের অস্থিরতায় পাদান উলটে গেল, তিনি নিজেই তুলতে যাচ্ছিলেন, সহসা কৈলাস এসে ঠিক করে দিলে। হুজুর নিজের ব্যবহারের জন্য মর্মাহত হয়েছিলেন। হুকা-বরদার এসে একটি বিচিত্র আলবোলা রাখল অনতিদূরে, কাটগেলাসের উপর সোনার কাজ করা বৈঠা; তাতে দশ-বার নহর নল। মুখদানটা অত্যন্ত আদবকায়দায় হুজুরকে দিলে। হুজুর মোহনগোপাল যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। কস্তুরীর গন্ধ পরিব্যাপ্ত হল।

হুজুর অধিক নাটকীয়ভাবে বসে মুখদানটায় টান দিলেন, পুনঃপুনঃ দিয়েছিলেন কিন্তু কোথা ধোঁয়া! তাকে কেমন যেন বা জীবন্ত রগড় বলেই বোধ হল। মুখদানটা সরাতে পারছেন না কারণ এটি অহঙ্কার, এটি অহঙ্কার। ত্বরিতে সকলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় বেয়াকুফ বলে বোধ হল। সকলেই তাঁকে যেমন অনুপযুক্ত ভাবছে। মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েই

নায়েবের কথাটা মনে হয়েছিল, সুতরাং আর আর কথা, যথা এদের সঙ্গে পুরাতন বিবাদ, যথা শাজাদের অবজ্ঞা করার কথা মনে হয়েছিল। কে যেন তাঁর ভিতরে 'মাঁভে মাঁভে' বলে একবার যেন বা হুকুম করেছিলেন, 'রতি পাইক', কিন্তু প্রকাশ্যে নানাবিধ স্বরে একটি রূঢ় পদ শোনা গেল 'কয়েদখানা দেখিয়ে নিয়ে আয়।'

এমন যে নায়েব সে পর্যন্ত এই উক্তিতে যেন ধাক্কা খেয়ে গেল। ভবও যারপরনাই স্তম্ভিত! হুজুর নিজেই তার অসর্তক মুহূর্তে পাখিরা যেমত ঘাড় কাত করে কথা শুনে, তেমন শুনেছিলেন। মনে হয়েছিল এ গলা অনেক অন্ধকার পার হয়ে হয়ে এল। তিনি বলে উঠলেন, 'নিয়ে যা'। কোনও কিছু ভেঙে পড়বে, ভয়ঙ্কর শব্দ যেন প্রকম্পিত হল।

ইদানীং জনসমাজ অস্পষ্ট হয়েছিল, হুজুরের বাক্যে কেবলমাত্র তাদের বুকটা ধক্ করে উঠে ঢিপ্। কে একটা বাচ্চা ছেলে সর্দি টানতেই যেটুকু শব্দ হয়েছিল তাতে তারা কেঁপে উঠেছিল। এতক্ষণ কেউ কারও দিকে চায়নি। এমত সময় দুজন নীলকোর্তা পরা তকমা-লাগানো লোক এসেই বললে, 'চল হে।'

হাওয়া চালিত শুষ্ক পাতা যেমত চলে, তেমনি সকলেই। কিন্তু তবু ছোট বড় নানাপ্রকারের দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গিয়েছিল। ইশ্বরকে স্মরণ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সকলেরই মুখ নিচু, শবযাত্রায় যেরূপ দেখা যায়। গাড়িবারান্দার অন্যদিক দিয়ে বার হয়ে, যখন তারা প্রথম লতানে গোলাপযুক্ত বাতিখাম্বা পার হয়েছে, এ সময় বরবানি কিছু পাশ কাটিয়ে শাজাদের পাশে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে... 'মন মানাও গো, আমরা ছোট হই নাই... আমরা আল্লার নামে আছি...'

শাজাদ এ কথায় হেঁট মুখটা তুলে, একবার তার দিকে, অন্যবার সারা প্রকৃতির দিকে চক্রাকারে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল, মাথা নাড়ল।

অনেকটা আসার পর, সারি সারি গুমটিঘর। তারা সকলেই গুমটি ঘরের বারান্দায় উঠল। অনেক ঘরে তালা দেওয়া, সর্বশেষে ঘরটি বড় এবং এইটিই কয়েদখানা। কয়েদখানার সম্মুখে এক পিপে চুন ভিজানো আর নানাবিধ কলিফেরানোর সরঞ্জাম; কিছু বালি, কিছু সুরকি বারান্দার নিচে মাঠে ডাঁই করা।

লোহার মোটা গরাদওয়ালা দরজা। হুড়কোতে মুঠোর মত দেখতে বেশ ভারী তালা লাগানো। অসম্ভব একটা ঝাঁঝাল গন্ধ এরা সকলেই পেয়েছিল। সমস্ত ইজ্জত ভুলে সত্যই সকলেই কয়েদখানা দেখতে লাগল। গরাদে মুখ রেখে জটা খামচাতে শিবাই বামুন বললে, 'মেলা আঁচড় মোচড় দিলে গো মিএগ।'

কারু কথা কইবার মত মন নাই, যেমন লোকে ঐতিহাসিকফাঁকা ঘরসমূহ দেখে, তেমনি এরা বড় চোখে দেখছিল। ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে একজন যখন সরে আসে, অন্যজন তখন সলজ্জভাবে গরাদে মুখটা লাগিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করে। ছোটছেলে যে কজন ছিল, তারা হামাগুড়ি দিয়ে বড়দের হাঁটুর ফাঁকে ঢুকে দেখছিল, মজার কিছু দেখা যাবে বলে চারিদিকে চাইছিল।

কয়েদখানার ছাদ খুব নিচু, উপরে ছাদ গোল হয়ে ভাঙা। খিলানের ইট খোয়া মশলার

স্তর কালো হয়ে আছে। কাতক চামচিকে। ছোঁড়াদের মধ্যে কে একজন 'হুক' করে উঠতেই, চামচিকে ছুটে পালাল। ছাদের গোলা ফাটের আগাছা আর কালমেঘ এতাবৎ যা হাওয়ায় নড়ছিল, তা সকল চামচিকের চোটে দুলে উঠল। ঘরের উত্তরে একটি ছোট জানালা, দেওয়ালে দেওয়ালে ইকড়িমিকড়ি ফাটল, সেখানে ফার্ন গাছ।

শাজাদ শিবাই বামুনের হাত ধরে বললে, 'দেখছ গো দেখছ...।' শিবাই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ দুটি যথেষ্ট বড় করে ছিল। শাজাদ পুনর্বার বললে, 'ওগুলো হাতের ছাপ না বটে?'

দেওয়ালের ভৌতিক হাতের ছাপ, কখনও ফার্নের তলে, কখনও বা ফাটলের ধারে। মহাসাগরের নিমজ্জমানের শেষ চেষ্টাটুকু। শাজাদ ভীত হয়েছিল, দুধেল গলায় সে প্রশ্ন করলে, 'এতেক হাতের সই ছাপ কেনে গো বামুন, উটা কি লিখা বটে?'

শিবাই নিরীক্ষণ করতউত্তর দিলে, 'মনে লয় যারা ছিল ইখানে তাদের সই ছাপ হবে...উটা ভ-বা-লন্দ...কে জানে কোন শালা।'

শাজাদ কি একটা কথা বলতে চেয়েছিল, দু-একবার শিবাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলি বলি করে বললে, 'তুমার কি মনে লয় উয়ার... মধ্যে' বলে থেমে মাথার ফেট্টিতে ঈষৎ ঠিক দিয়ে এক দমকে বলে গেল, 'উয়ার মধ্যে আমার তুমারও বাপদাদার ছাপ আছে নাকি বটে...?' এরপর গরাদ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হস্তদ্বয় একটির পর একটি প্রসারিত করে অতি ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। এখন তার আয়ত চোখ দুটি হাইয়ে বড় হয়ে গিয়েছিল। সে শিবাইয়ের দিকে চেয়ে পুনর্বার আপনার হাতের দিকে চেয়ে সহসা অকারণে শুঁকে দেখে বলেছিল, 'লাও দেখ না হে কি মনে লয় গো তোমার।'

শিবাই জটা খামচাতে খামচাতে দেওয়ালগুলির দিকে চেয়েছিল, এবং পরে শাজাদের হাতখানি অবহেলাভরে সরিয়ে বলেছিলে, 'ই রে ক্ষ্যাপা হইছ নাকি?'

'দেখ।'

'আঃ কোনও পালাগানের ক্ষ্যাপা তুমি বা।'

শাজাদের চোখ তখনও আপনকার উন্মুক্ত হস্তে নিবদ্ধ। হঠাৎ মাথাটা দুলিয়ে বড় অসহায় গলায় বলেছিল, 'ক্ষ্যাপা হই নাই, মন মরে গো, কে যেন বলে, কেউ না কেউ ছিল?' বলে ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালের ছাপের দিকে তাকাল, তার মাথাটা অন্তরের দুঃখে কাঁপছিল। ইতিমধ্যে আর আর অনেকেই আপন আপন হাত দেখে কোনওমতে উঁকি মেরে দেওয়ালের ছাপ দেখার চেষ্টা করে। শাজাদ দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললে, 'বল হে কি বলে বটে' তখনও তার হাত উন্মুক্ত।

সেই হাতের উপর একটি তড়কা চাঁটি মেরে, মিথ্যা কোপ সহকারে শিবাই বললে, 'লাও! ছিল তো ছিল, হা কপাড় এমন খ্যাপ্পা তো দেখি নাই, এক ছটাক আটকল নাই—বলি ছাপ যদি এখানেই থাকত তাহলে কি জমি কি ভোগসুখ করতাম হে? জমি পতিত বলে লিখা হত হে?

ইত্যাকার উত্তর, আশাতীত বর্ষা আনলে, এরা থই পেয়েছিল। খানিক চুপের পর সকলেই যাত্রাই ঢঙে মাথা দুলিয়েছিল, কেউ হাতটা মুছে নিলে পরনের তেনাতে। শাজাদ বড় বড়

চোখ করে হেসে ফেলেছিল, বললে, 'বটে বটেক হক কথা গো—আয় তোর...ধরে চুমু খাই' বলেই এতাবৎ প্রসারিত ডান হাতের উপর বাঁ হাতের শেষ-তেহাই মেরেই ছোট একটা লাফ দিল, এবং বলেছিল, 'বামুন আর জম্মে তুমি জজ ছিলে গো, আল্লা করে তুমি একভাতারি ঘুসকি পাও।' বলেই নিমাইয়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বললে, 'লে লে নিমাই, ছোট জাত দেখরে, ঠাওর কর তুর বাপদাদার ছাপ কোনটা হে।'

নিমাই তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে, 'লাও! পুড়া কপাল হে, ঠাওর কি কারণ? উ ঠাঁই সে ছাপ লেই গো, ছিল বটে সে তো বুড়া রাজার গালে,' বলেই আড়ে দেখলে পাইক কোথায়। দেখেই গম্ভীর। এ কারণে যে তার গলা একটু চড়া হয়েছিল।

নিমাইয়ের রগড় উমকে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে গিয়ে, এক বল্‌গা হাস্যের ধোঁয়া ছেড়ে গলা নামিয়ে নিলে। ফলে সকলেরই গলা-কাত্‌রানো শব্দ শোনা যায়।

শাজাদ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ওহে পারোইয়ের বাগদির ছেইলা পাইক, ই কোঠা তেমন লায়েক সোমত্ত লয় হে—শালীর উমর পন্‌তান্ন' বলেই তার তকমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আ হে, আ হে পোশাক-আশাক বড় ডাগর দেখি! বড় খাসা দিইছে হে, আ হে তকমা তো বড় জবর খুব খুব, মনে লয় আর্শি বা বটে' বলেই মাথাটা নিচু করে তকমা দেখতে লাগল।

পাইক দুজনেই একটু নড়বড়ে হয়, তারা পোশাকের গর্বে কথঞ্চিৎ ন্যাকা হয়েছিল। তারা কথার গায়কিতে একটু বুনো তামাশার ইঙ্গিত পেয়েও কিছু বলেনি, কেননা যেহেতু এদের সকলকেই তারা চেনে জানে। তারা কর্তব্যের খাতিরে শুধুমাত্র নিজেদের সোজা সুঠাম রেখেছিল।

শাজাদ ইতিমধ্যে তকমায় আপনার প্রতিবিম্ব দেকে, মোচ চুমরে নিয়ে গুনগুন করে গান ধরলে—

'শাল বনে শাল পাঁউড়া
কদহুঁ গাছে কলি রে
বঁধূর গায়ে লাল গামছা
তার ছটক দেখে মরি রে'

গানের সঙ্গে সঙ্গে সে এবং আর সকলেই হাঁটু ভাঙতে থাকল। মাথা দুলিয়ে অনুচ্চস্বরে গানটি ধরেছিল।

পাইক নিজের মেরুদণ্ডটি খাড়া করে বললে, 'ঝটপট লাও হে।'

'ই কি দিল্লির দরবার যে ঝটজলদি দেখে লুব' কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'ই হু পাথর-চাপটি মেলার খেদা রাণ্ডীর দরবার' এটা অন্য চাপা গলা।

সকলেই তাকত ফিরে পেয়েছিল। শাজাদ তার দুই হাত দ্বারা দুই পেশী চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'চল হে...'

আবার তারা গাড়িবারান্দায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। খুব উবল নকশা করা পিঠদানে মুখখানি ঠেকিয়ে রেখে হুজুর তামাক খাচ্ছিলেন। এখন কিছু ধোঁয়া বার হয়। সম্মুখে ভিড় উপস্থিত। রব্বানি বুড়ো আগে এবং আর সকলে তার কাছাকাছি। হুজুর দুই আঙুল দিয়ে ঠোঁট মুছে প্রশ্নমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলবোলার নল নাড়তে লাগলেন।

রব্বানি কুর্নিশ করত বলেছিল, 'দেখলাম বটে হুজুর।' তার ঠোঁটে মুখের হাসির রেখা ছিল, অন্যান্য সকলের ঠোঁটে অল্পবিস্তর ছিল। দুঃখ চেটে মুখের হাসি যেরূপ হোক, অন্তত তাচ্ছিল্য এ কথা হুজুর ভাবতে পারলেন না। অনেকেরই চোয়াল এখন নড়ছিল।

হুজুর মোহনগোপাল মুখদানিটা দেখতে দেখতে, সহসা একবার শাজাদকে দেখে নিলেন, বেশ কিছুটা মূল্য দিয়ে এই মুখখানি মনে রাখতে হয়েছে। কিন্তু কয়েদখানা দেখানোর মধ্যে এমন এক শৌখিন আরাম ছিল যে, নিজেকে এই প্রথম তিনি অভিজাত বলে ভাবতে পারলেন, আনন্দে চেয়ারের উপর উবু হয়ে হাঁটুতে তার মন বাহু জড়িয়ে ধরে বসে দুলতে ইচ্ছে করল। এ কারণে যে এই প্রথম আল ডহর, নিগূঢ় অন্ধকার ভেঙে, অতীতের মধ্যে, স্থান লাভ করতে সক্ষম হল। আপনকার অন্তরের বোকা-ধড়ফড়ে অস্থিরতা এখন ডাঙায় উঠেছে; আপনার গোঁফের দুই পাশ একটু বিন্যস্ত করে অল্প করে মোচড় দিয়ে বললেন, 'তোরা সবাই জমির দাখিলা-পাট্টা নিয়ে কাল সকালে নায়েব মশাইদের সঙ্গে...'

'হুজুর, দাখিলা-পাট্টা আমাদের নাই, আমরা...' রব্বানি ধৈর্য সহকারে এ কথা বললে।

'দলিল নেই, দাখিলা নেই', বলেই নায়েবের দিকে ধনুকের মত ভ্রূ উঁচু করে চাইলেন; এটা প্রশ্ন করার জন্য নয়, নিজের খুশি ঢাকবার জন্য। যেহেতু তিনি ভেবেই পাননি, যে তিনি এত চতুরভাবে কথা কইতে পারবেন, নিজের উপর বিশ্বাস বেড়েছিল। এবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'নেই কেন?'

'জ্ঞে হুজুর', বলে স্কুলের ছাত্র মনে করবার জন্য যেমন উঁ উঁ শব্দ করে তেমনি করেছিল, কারণ হুজুরের চতুর অজ্ঞতা দেখে সে অবাক! সে এই সঙ্গে হাতও কচলাচ্ছিল।

'আজ্ঞে আমাদের ওই ছটাক ছটাক জমি', রব্বানি বলতে গিয়েছিল 'দলিলের থেকে জমি ছোট হুজুর—'

'ছোট হোক আর যা হোক আমি...ওর খাজনা...ধার্য করতে হবে। যাক নায়েব মশাই, ওদের যখন ওসব নেই, এই এক কাজ করুন কে কত জমি ভোগ দখল করছে তার একটা হিসেব নিন। মৌজায় সর্বসমেত কত জমি আছে?'

'জ্ঞে—জ্ঞে...' নায়েববাবু হুজুরকে সুবিধা দিলে।

'থামুন থামুন, দেড় হাজার বিঘে রুনুখগাঁ, ঠিনকি, টাবুই মিলিয়ে গাছপালা, সড়ক ডহর টিলা খর সোঁতা বাদ দিলে তেরশো বিঘে দাঁড়ায়।'

রব্বানি বললে, 'হুজুর হিসাব যখন করছেন, তখন খয়রা গুমটো লপ্ত আছে হুজুর?'

হুজুর এ-কথায় কান দেননি। মিষ্টি লাগা আঙুল শিশু যেমত চুষে, তেমনি তিনি মুখদানটি চুষে চুষে টান দিচ্ছিলেন, মাজে মাঝে উপর দিকে ধোঁয়া ছেড়ে নিজেকে ভারি মজার তৈরি করেছিলেন, পা তাঁর নড়ছিল। এরূপ আরাম তিনি জীবনে পাননি, রতি পাইক ঠিক কথা বলে। হঠাৎ বলে ফেললেন, 'দেখ বাপু তোমরাই আমার একমাত্র প্রজা যারা...' বলেই তাঁর লজ্জা হল এরপর আড়ে নায়েব এবং এদের দেখে নিয়ে হুড় হুড় করে বলে গেলেন, 'তোমরা কস্মিনকালে খাজনা দাওনি, তোমাদের হয়ে আমরা দিয়েছি, ঠাকুরদাদা ভাল মানুষ ছিলেন। (নায়েব হাত দুটি কপালে ঠেকালে) তিনি বরাবর...'

বড় পাখার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। রব্বানি অন্যমনস্কভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল, তার চোখে পড়ল পাঙ্খাবরদার সনাতন আপনার কোমরের দাদ চুলকাচ্ছে, এ দৃশ্যে সে খানিকটা সোজা সিঁধে হয়ে দাঁড়াল, বললে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর, আপনার জানতে আজ্ঞা হয়, হুজুর ও-লাট কোম্পানির ঘরে হাজা শকুনবসা পতিত বলে লিখান...' আর বলতে সক্ষম হল না রোষে আবেগে উপরন্তু বিনয়ে তার হাড় খটখট করে উঠল; প্রকাশ্যে কষ বয়ে জল আসছিল মুছে নিলে, ঘাড় তখনও নড়ে।

এ সকল লোক চোখের সামনে থাকলে থাকার কথা নয়। দীন যারা তারা যে এতেক বিসদৃশ তাকে যেন ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর সত্য প্রকাশে হুজুর চেয়ারে হাস্যকরভাবে নড়েচড়ে উঠেছিলেন, গলার স্বর শুধুমাত্র লাফ দিয়ে উঠল, শুধু শোনা গেল, 'কি বললি রে'র—'ও-ল্‌লিরে'। তবু তার রাগ প্রকাশ পায়নি।

'জানতে আজ্ঞা হয়—হুজুরের গোলাম আমি', বলে একদা ডাকসাইটে মানে লোক—অদ্য বৃদ্ধ রব্বানি মাথাটা নিচু করলে। সরু ঘাড়ের উপর মাথাটি নড়ে, ঘড়ির ধুকধুকির মতই চাপদাড়ি এপাশ ওপাশ করছিল!

যদিচ নিমকখোর গোলামের কণ্ঠস্বর ছিল না, তথাপি রব্বানির কথা কইবার ধাঁচ, বাক্য ব্যবহার, যা তিনি থিয়েটারেই শুনেছেন তাঁর কানে যেন বা শিশিরের পয়ার ঢেলে দিলে। আপনার হাত দুটি দেহের সঙ্গে জুড়ে আঁট হয়েছিল, হাত ছাড়িয়ে কি যে কর্তব্য তা এক পলকে ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন। মনে হল তিনি যেন সাবালক হয়ে উঠেছেন, দুরন্ত জন্তুর মাংসপেশী দিয়ে সমস্ত অন্তরীক্ষটা গড়া। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলে উঠল 'রাসকল যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, ফের যদি শুনি মেরে হাড় ভেঙে দেব' গলার আওয়াজ আঁশপাট, মোরগ-কোঁকানি ছিল। সম্মুখের স্তব্ধতা দেখে বুঝলেন, এ তাঁরই গলার স্বর। ভয় ভাঙল, দুঃখ হল, এ কারণে যে স্বরে তেমন তেমন দর্প ছিল না। মান্য লোক স্ত্রীর ছেঁড়া কাপড় দেখলে যেমত ছোট হয় তিনিও সেইরূপ আপনার অক্ষমতার জন্য হেঁট হয়েছিলেন। মন হায় হায় করে উঠল, উচিত ছিল, 'জুতিয়ে চামড়া তুলে নেব' 'অথবা চাব্‌কে গতর ট্যারা করে দেব' বলা। সুতরাং কি যেন মনস্থও করেছিলেন।

সাড়া নেই, অনেক উপরে থামের ক্যাপিটাল আশ্রিত দুয়েকটা গোলা পায়রা উড়ে গেল, চামচিকে কড়িকাঠে স্থির। প্রকাণ্ড লাল নীল কাঁচের আলোটার দণ্ড লেগেছে গাড়িবারান্দার ছত্রিতে, এইটুকু দেখে পুনর্বার চোখ নামিয়ে হুজুর বললেন, 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, সব হিসেব দিয়ে যাবে—শিক্ষা-সেস রাস্তা-সেস সব দিতে হবে...'

রব্বানি লাঠির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, 'হুজুর বাবুমশায়, আপনি রাজা বটে, আপনার লাম লিলে দিন ভাল যায় পেট ভরে গো'...এরপর আরও সরল মনে বললে, 'পতিত গুম্‌টো জমির খাজনা আবার কি হবে গো, আপনার এত আছে, ওটা পতিত লিস্কর থাক...'

রব্বানির কথার মধ্যে হুজুর সাপের মত মাথা আন্দোলিত করছিলেন, কোথায় তাঁর স্বরটা সুর ধরতে পারবেন, এই জন্যই বটে। গলা ফেলে পড়ল, 'ফের...মজাদা...জুতিয়ে মুখ...চাবকে চামড়া তু-তুলে নেব...' অবশেষে স্বরে বাষ্পীয় ফোঁস ছিল। এবং আপনার

গলার স্বরে নিজেরই জলতেষ্টা পেয়ে গেল। নিজেই অত্যাধিক ভীত, অন্ধকার ঘরে যেন বা তিনি একাকী। কখন যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা তাঁর স্মরণ ছিল না। চেয়ারে বসে চিৎকার করা বেচারির এখনও হাতসই হয়নি।

সমবেত সকলে প্রজাখাতকে রূপান্তরিত। কেউ, মানে খেলারাম ভেবেছিল এত সুন্দর মুখ এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে কি করে!

ইংরাজ যেমন দুঃখী ভিখারিকে বুটের লাথি মেরে 'গড সেভ দি কিং' গান করে—তেমনি তারও চোরা মানসিক ভাব হয়েছে। আর কিছু পরে এখন ফুলের ইঙ্গিত না থাকলে ভ্রমরের গুঞ্জন ছিল, সেই কারণে আর কিছু পরে বাবরের সহ্য ক্ষমতা পাবে, মাজুন খাবে আর মানুষের মাথা গড়িয়ে পড়ছে দেখবে, রক্তস্রোতে মাছ ছেড়ে দেবে, তাঁবু সরে সরে যাবে। এইরূপে ভগবান থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

তাঁর গলার স্বর এখন প্রতিধ্বনিত হল, রুনুখগাঁয়ের বউ-ঝিরাও যেন শুনতে পেল। ছোট বড় সকলেই অধৈর্য হয়েছিল, গা অনেকেরই শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েদখানা দর্শনে ক্ষিপ্ত শাজাদ ত্বরিতে দৌড়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ফেলেই ধীর হল, তার দেহ দুলেছিল। শিবাই বামুন, তার জটায় বাঘনখ দ্বারা খামচালে। তার নখগুলি কি বড় বড়! ইয়াসিন পিছন থেকে দেখল, সেই নখ আর হুজুরের মুখমণ্ডল, নখগুলি যেন বাবুর মুখ ছিঁড়তে উদ্যত। আবার বড় পাখা এসে মুখ ঢাকল।

এমত সময় ছোট একটি রুপার পাত্রে একটি টিকলো গেলাস খানিক ঈগলের পিঙ্গল দৃষ্টি! আর এক রেকাবে স্ফটিকের মত কোতিলা। হুজুর সত্বর এক চামচ কোতিলা মুখে দিয়েই, গেলাসে একটি গোদা চুমুক দিলেন, মুখ নিঙড়ে উঠল, সাহস ঝনঝন শরীরে। মুখ দিয়ে ইশারা করতেই নায়েব কান বাড়িয়ে মুখটা ছুঁচোর মত করলে, কারণ সদ্য মদের গন্ধ! হুজুর বললেন, 'দাদার আমরা বড় ছাতি...(দুয়ারে বান্দিবেন হাতি, দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি) এ গান এরাই বেঁধেছিল।

জিব কেটে না না বলে নায়েব বললে, 'এরা সে ঝুমুর বান্দে নাই, তারিণী ঘাটওয়ালের পরজারা—'

'ও', খুব একটা রাগ করা গেল না তবু রুক্ষস্বরে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ নাম দখল না দিচ্ছ কেউ এখান থেকে নড়তে পারবে না', বলেই তিনি উঠলেন, পেটেন্ট লেদারে আলো হেলদোল হয়, হুজুর নলটা হাতে নিয়ে দু-এক পা গেছেন এমত সময় ভব হন্তদন্ত হয়ে এসে নলটা নিল, চাকররাও অবশ্য শশব্যস্ত হয়েছিল। তারপর ভবই অত্যন্ত যত্ন সহকারে কোঁচাটা তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে।

বন্দুকওয়ালা পাইক তো ছিলই, এ ছাড়া সড়কিওয়ালারাও ছিল। নায়েব বললে, 'দুৎ তোরা বাপু কোনও কম্মের নোস—তোদের মানুষ করতে লারব...ভাল করে ধরতে হয় রাজা মানুষ...'

কারও উত্তর দেবার মত মন ছিল না। শুধু শিবাই বলেছিল, 'লায়েববাবু, চ্যাঁড়াগুলা ঘরকে যাক গোচগাছালি আছে।'

নায়েব বললে...'তোরা যা খড়াকালি মাটির মানুষটাকে, যাই দেখি' বলে সে অন্তর্ধান হল।

সকলেই একের পর একজনা বসে পড়তে বাধ্য হল।

উপরে দোতলার ছোট বারান্দার লোহার কেয়ারি-করা রেলিঙের ভিতর দিয়ে দেখা যায় খোলা দরজা। হাসির শব্দ গমক খেয়ে উঠছে, এখন গানের আঁচলা শোনা যায়। বাগানদার নিখুঁত জংলা অধৈর্য স্তব্ধতায় চক্‌চকে হয়ে উঠে। তবলার তাড়নায় কোথায় যে সে গান থই পাবে তা যেন ভেবেই পায় না। আবার হো হো শব্দ এবার কাহারবা, 'না পাকড় হাত মনমোহন কালাই চুড়িয়া টুক্ যায়েগি' তৎসহ বুঙুরে ফুলকো কদম র‍্যালা! এবং বুকফাটা ওয় হোয় ওয় হোয় 'আয় কবুতর কি চুবুতর!' বাইরের ভেড়ুয়ার গলা, তারপর বা 'বোট চমকি ঘটি।' এটা ভবর উক্তি।

সকলেই অনেকবার মুখ উঁচু করে উপর দিকে তাকিয়েছে, যাদের গাম্ভীর্য কম তারা নোংরা প্রশংসায় হিক করে হেসেছে। ছোট ছেলের ঘুমিয়ে কাতর কেননা অনেক সময় হয়েছে। সকলেই অস্থির; এ মনোভাবের প্রকাশ ছিল, কেউ মাটিতে চাপড় মেরেছে, কোনওজন অদ্ভুত সুর করে, ভগবানের নাম করে আলস্য ভেঙেছে। কে একজন দেহ হাতের উপর ভর করে বসেছিল, তার কনুই ভেঙেছে। কারা দুজন বাঘবন্দি খেলছিল। ইতিমধ্যে ঘোতাই বলে উঠল, 'খেমটাওলি শালীরা—হে হে'

পতিতপাবন আড়মোড়া দিয়ে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে খেমটাওয়ালিদের উদ্দেশ্যে বললে, 'দুটি খেতে দিও, পায়ে পড়ে থাকব গো'। একথা অন্যত্র হলে, যদি হাটেমাঠে, যদি ঝুমুরের আসরে, তখন নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এঁড়ে বেচে হাসত। এখানে সবাই হাসি থেকে মুখ সরিয়ে নিলে।

এমতকালে হুজুরকে দোতলার বারান্দায় দেখা গেল। এক হাতে গেলাস অন্য হাতে পিঙ্গল টুকরো। তিনি দেখলেন, গাড়িবারান্দার আলোর প্যাঁচানো দণ্ডের শেষে বিচিত্র কাঁচের আধার, তার পাশ দিয়ে দেখা যায় একটি বাচ্চা ছেলের, এখনও সে জাগ্রত, তার বিবশ শুকনো মুখখানি, আর তার বড় বড় দুটি চোখ—একারণে যে সে উপর দিকে চেয়েছিল। এবং একই আশেপাশে অনেকে। বড় ইস্টিশানের তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম চাতালে যেমনটি দেখা যায়। হুজুর ভারি খুশি হয়েছিলেন, হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে তার হাত থেকে পিঙ্গল টুকরো খসে, এখানে ভূঁয়ে পড়ল। এটি একটি অল্প-খাওয়া মাছভাজার টুকরো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের মুখখানি একটু হাঁ হয়েছিল। তবু নিম্নের এই দুঃখীদের দেখে তাঁর ভারি আমোদ হয়, তিনি নাচের ভঙ্গি করতে করতে এখান থেকে চলে গেলেন।

মাছভাজা টুকরোর দিকে অনেকেরই নজর পড়েছিল। চোখ ভারী হয়ে উঠেছে অনেকের। কেউ বা ঢোক গিলেছে, ঠোঁটে চিব বুলাতে গিয়ে কেউ থেমে গেছে। এদের কুকুরটা অবাক হয়ে দেখে, নাক কুঁচকে, উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেই সেই টুকরোটায় মুখ দিতে গেছে, সেই মুহূর্তে ঘোতাই তার ন্যাজ ধরে টান মেরেছিল, কেঁউ কেঁউ করে পিছু হাঁটতেই একটা লাঠির ঘা মাটিতে পড়ল, ভাগ্যে লাগেনি। রববানি লাঠিটা সরিয়ে নিলে! তাহলেও কুকুরটা

আর্তনাদ করে উঠল। মার শালাকে—শাল্ল্লা...কাঙাল। বিভিন্ন গলার আওয়াজ হয়েছিল। এইটুকু অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারার জন্য সকলে সরলভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারল।

হুজুর যেন দেখতে আরও সুন্দর হয়েছেন, রং যেন অভ্রের গৌর। রাত্রে দেখা পাঁশ পৃথিবী যেমন বা বর্ষার ধোয়ানি গেয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এ কথা ব্যতীত, আরও যে নিরালম্ব অশরীরী ফোয়ারা যা এতাবৎ আকাশে আকাশে ঘুরেছে ক্ষণেকেই যেন বা মাটি পেলে, ক্রমাগতই উৎসারিত জলের নৃত্যময়ী ঝঙ্কার। এ বাড়ির স্থাপত্য পদ্ধতির সঙ্গে তার চেহারারও একটা রহস্যময় মিল সৃষ্টি হল। তিনি অনেকবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, অথবা সেই সূত্রে তিনি নিজেকে ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন, 'বুঝলি ভব, বেটারা খুব টিট হয়েছে—ভেবেছিল কোথাকার অগা এসেছে—ওরে বা রক্তে আমার জমিদারি খেলছে', বলে নিজের হাতে টুক করে একটা চিমটি কেটে হিহি করে হাসলেন। 'আও পেয়ারে পঞ্জা লড় জমিদার' বলে হাসলেন।

'বাঃ হবে না, তুমি তো তবু কিছুই করলে না অন্য কেউ হলে মেরে দবনা ভেঙে দিত!'

ভবর কথাটা শুনেই হুজুর স্থির হলেন। পরক্ষণেই তার না নাচতে লাগল গলার হার একটু ঘুরিয়ে নিয়েই বললেন, 'আরে লা ভৈরবী ছোড়, দুসরা উড়াও।'

বাইজি মৃদু হেসে তার কড়ে আঙুল কামড়ে অন্য সুর ধরলে। গারা ঠুংরি 'না মার কাটার নয়না বাণ' বলেই মহা আবেগ অনুরোধ ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলে, রতনচূড়টি দেখা গেল, পরে হাতের আঙুল দিয়ে আপনার বড় চোখের কাছে নিয়ে আকারইঙ্গিত ভাঁও করে বুঝাতে লাগল। বাইজির মাথার ঝাপটা ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়েছিল। হুজুর মোহনগোপাল গানে স্থির হতে পারলেন না।

আকাশ থেকে আমরা বহুদূরে থাকি এ কথা সত্য, কিন্তু আকাশ থেকে বহুদূরে যখন সরে যাই সে কথা ভয়ঙ্কর। এতক্ষণ বাইজিকে ডানহাতে আলিঙ্গন করেছিলেন, আধ-শোয়া রমণীর কণ্ঠে পিলু কিয়ৎপরিমাণে ফাঁকি পড়ছিল। বাধা সৃষ্টি করে বসে আছি নিজেই এ কথা মনে হতেই, তিনি হাত সরিয়ে নিলেন, রমণী পড়ে গিয়ে হাসতে লাগল। আলুলায়িত কোঁচায় পা পড়ে হুজুর কিঞ্চিৎ দুলে উঠেছিলেন; ভব মহা তৎপরতার সঙ্গে কোঁচটা তুলে, ঝেড়ে, তার হাতে তুলে দিয়েছিল। অসহিষ্ণুভাবে কোঁচাটা ফেলে দিয়ে হুজুর সোজা বারান্দার রেলিঙের নিকটে।

তাঁর দৃষ্টি বিরাট দুই থামের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে, একটি ওরকেরিয়ার তার পাশে রেলিঙ, সেখানে একটি স্থির, নিরীহ সুন্দর পিঙ্গল ঘোড়া। এখান থেকে বড় বাচ্চা দেখায়, এই সরল স্বভাব দেখতে তাঁর কিছু সময় নষ্ট হয়েছিল। পূর্বের এ দৃশ্যটি চোখে পড়লেও, তাঁর মন যেন ফিরিঙ্গি হয়ে উঠল, সুন্দর মুখখানি ডাকিনীতন্ত্রের উপকরণ এরূপ। চোখ ছোট ছোট করে বলতে গিয়ে, থেমে গেলেন বিড়বিড় করে উঠল ঠোঁট দুটি। একটু আওয়াজ 'নায়েবকে ডাক'।

নায়েব চটি ফট্‌ফট্ করে উপরে এল, হুকুম নিলে, চলে গেল। হুজুর সিঁড়ির চাতালে রক্ষিত 'হিবনাস আক্রুপি' মূর্তির সাদরে গালটি টিপতে গেলেন, আঙুল ফস্‌কে গিয়েছিল।

তার মুখ খানিকটা অর্ধভুক্ত (?) মদ্য ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে গেলেন।

গাড়িবারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে, এবং গোল মাঠের শুরু ঠিক তারই উলটো দিকেই একটি বেশ বড় জানলা। সেখানে হুজুর দণ্ডায়মান, হাতে তার সোনার কাজকরা বন্দুক। গুলি পুরে 'খাল্ক' করে একটি শব্দ হল, কি জানি কেন তিনি তারস্বরে বলেছিলেন, 'ব্রাণ্ডি'।

ভব থতমত খেয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল। ব্রাণ্ডি ঢালার শব্দর পর আর এক শব্দ হুজুরের চটি ফট্ফট্ শব্দ, এরপর পানীয় খাওয়ার শব্দ তারপর মৃদু খুরের শব্দ আর ক্বচিৎ হ্রেষাধ্বনি। ভব সোজা হতে পারল। ঘোড়াটাকে এনে নিকটের আলোর খাম্বার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

রুনুখগাঁয়ের লোকেরা ঘোড়ার আওয়াজ শুনেছিল। একজন হ্রেষাধ্বনি শুনে, উঠি উঠি করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। থামের তালে খাড়া বেদী, হাত তিনেক চওড়া। শাজাদ তার ঘোড়া দেখতে পেলে না। একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে খানিক এগিয়েই, চোখ বড় করে বললে, 'চাচা আলম।'

এ কথার সঙ্গেই মদের সোরাই মুখে ঢেলে এগিয়ে পিছিয়ে, তাক করলেন। ভবও তাড়াতাড়ি একটু মদ্যপান করেই কানে আঙুল দিয়ে রইল। খুট করে আওয়াজ হল। দিক প্রকম্পিত করে মেঘগর্জন হল, শার্সির আলগা কাঁচে চিড় খেয়ে গেল। চামচিকে পায়রা ছত্রভঙ্গ হয়। এদের কুকুরটা ন্যাজ তুলে কাঁই কাঁই করে ছুটল। আর শাজাদ পাঁচিলের উপর যেন বা সাঁতার দিচ্ছে কোন দিকে যায়।

গুলি ঘায় বেচারি নিরীহ জানোয়ার লাফ দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল, খাম্বা লগ্ন দড়ি ছিঁড়ে সাপ যেমত খেলে উঠে। মানুষের যন্ত্রণার মত আওয়াজ শোনা গেল। পুনর্বার খুট করে শব্দ, এবার সুন্দর পিঙ্গল করুণ চোখ দুটির মাঝখানে নাসারন্ধ্র ভয়ঙ্করভাবে স্ফীত, অযুত রেখা স্পষ্ট হয়ে, রোমকূপ গভীর, একটি ভ্রমর এ ভয়াবহ রূপ দেখে হাওয়া। দাঁতের উপরে রেশমী রং যে এত হতশ্রী বিসদৃশ সে কথা লেখা নেই। সবুজ ঘাসের উপর বিশাল দেহটি লুটিয়ে পড়ল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়ো হল, এবার শ্লথ হয়ে গেল। শুধু বাতাসে তার কেশর নড়ে।

ভব কানে আঙুল দিয়েই 'হুররে' বলে লাভ দিয়ে উঠেছিল। এখন দাঁড়কাকের আর সেই কুকুরটার বিকট চিৎকার শোনা যায়। কিছু ঘুঙুরের আওয়াজ উপরের বারান্দায় স্তব্ধ হল। হুজুর নিবিষ্টতায় নিশ্বাস বন্ধ করেছিলেন, এখন বন্দুকের নল ভাঙতেই তিলিক্ করে টোটার খোল খুলে পড়ল। ভব ভয় পেয়েছিল, পরক্ষণেই টোটার খোল তুলে চুমু খেয়ে মাথায় নিয়ে খেমটা নাচ নাচতে লাগল।

বাইরে বন্দুকের ধোঁয়া স্তর ভেঙে গড়ে উঠে; অনেকেই এখন বসে, বন্দুকের আওয়াজে অনেকেই চোখ বুজিয়ে বসে, ভয়ে জবুথবু! শাজাদা এখনও সেই অবস্থায় শেষ গুলির শব্দে কাটা ছাগলের মত তার দেহ চমকে উঠেছিল। এখন সে আলমের কাছে যাবার জন্যে হাঁকপাঁক করছে। কারা তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিলে। সে দৌড়ে যেতে গিয়ে কার গায়ে পা লেগে লাট খেয়ে পড়ে ধরাশায়ী। সে যেন ইচ্ছে করেই চিৎ হয়ে পড়ল। মুখে মুখে আল্লা

নাম, ঠাকুর ঠাকুর জপ! শাজাদ চক্ষুদ্বয় বড় করে কি যেন দেখতে চেয়েছিল। এমত সময় নিমাই হেলের ছেলে তার বাপকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে তখন শাজাদ 'হা আল্লা কোন পাপে আলম গেল হে' আর বুকে চাপড় পড়তে লাগল।

হুজুর বন্দুক হাতে এখানে দেখা দিলেন, কঠোর স্বরে বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'এটা গোকর্ণ নয় যে কে কার মেশো, এখানে আমি আছি...' আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার এখানে ঘোড়া কেউ চড়তে পাবে না...ঘোড়া মাল বইবে...।'

শাজাদ উঠে বসে ডুকরে কাঁদবার চেষ্টা করলে, অনেকেরই চোখে দীঘিজলের মায়া ছিল। শাজাদ হাত দিয়ে সর্দি অপসরণ করে একবার মাটি চাপড়ে, কাঁদবার চীৎকার করেছিল। হুজুর এতাবৎ আকাশের শান্ত মূর্তির দিকে চেয়েছিলেন, চোখ ফেরাতেই রব্বানির দিকে দৃষ্টি পড়ল, কোথায় যেন ঠাকুরদাদার সঙ্গে মিল ছিল, বৃদ্ধরা প্রায় একই রূপ দেখতে হয় হয়তো। সহসা নিজেকে জাগ্রত করে বললেন, 'এটা কাঁদবার জায়গা নয়' বলেই হুড় হুড় করে বললেন, 'কাল সকালেই যেন দখল হিসাব সবাই দিয়ে যায়—না হলে কয়েধে পচতে হবে।'

গরিব যারা, তারা ভারি মজার হয়, তারা মেয়েমানুষের মত হুট বলতেই কাঁদতে পারে। কিন্তু এদের দারিদ্র্যের খেসারত দিতে-করতে চোখের জল ফুরিয়েছে। একমাত্র 'ও হো হো' শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু বড় একটা ছিল না। বারুদের গন্ধ শাজাদের স্মৃতিকে আটকে ছিল। নায়েবের গলা উঠল, আড়ষ্টতা কাটল, 'ওরে ওর মুখে কেউ হাত দে না, নিয়ে যা ওকে বাড়িতে' বললেন।

সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ইয়াসিন শাজাদের মুখে হাত দিতে গেল।

একমাত্র রব্বানি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'লায়েব আসমান আজজিও লীল গো।' সে 'বাবু' যোগ করেনি।

নায়েব এ-হেন সাঁইমুরশেদী কথায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে, হুজুরের দিকে চাইল, হুজুরের মুখখানি কেঁপে উঠেছিল।

সকলেই উঠল, শাজাদ ঘোতাইয়ের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে দিয়েছে, ঘোতাই আর ইয়াসিন তাতে ধরে, এগিয়ে চলেছে; কে একজন ত্বরিত পায়ে এসে একটা পড়ে-থাকা গামছা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। শাজাদ ঘাড় কাত অবস্থাতেই আলমকে দেখে তার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল। সকলে তাকে ধরে ফেললে। 'হায় বাজান হায় বাজান' উক্তিতে অন্যান্য সকলে ম্রিয়মাণ। হঠাৎ সে মাঠে পড়ে চাপড় দিতে লাগল, আর মুখে ঘাস ছিঁড়তে লাগল, এখন সত্যিই তার চোখে জল এল।

এ সময়ও গোলাপ প্রস্ফুটিত। ঘোড়াটির চোখ কেন যে খোলা ভগবানই জানেন। রুনুখগাঁয়ের লোকেদের হাল্কা ছায়া ঘোড়াটির উপর দিয়ে বহমান রক্তধারার উপর দিয়ে রয়ে রয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল।

জটপাকানো ভিড় হুজুর দেখলেন গেট পার হল। হুজুরের যে কি এক বিকৃতি হল, হঠাৎ ঘুরেই দৌড়! হলঘরের ঐশ্বর্যের মধ্যে আপনকার ধুতির কোঁচা জড়িয়ে পড়ে গেলেন, সঙ্গে

সঙ্গে পাথরের টেবিলে লেগে গুলির আওয়াজ হল, ও দেওয়ালের সেজের বাতি ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। হুজুর যেন সাহস ফিরে পেলেন, পরক্ষণেই সেই জার্দিনিয়ে-তে অঙ্কিত সুন্দর দৃশ্যে গুলি ছুঁড়লেন। দৃশ্যটি অদ্ভুত শব্দে রূপান্তরিত হল।

তিনি ভয়ঙ্করভাবে হাসতে গেলেন কিন্তু শব্দ হল না, শুধুমাত্র একটি ভৌতিক হাঁ-ই মুখে স্থির হয়ে রইল, কোনও শব্দ নেই দেখে ভব দরজার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। হুজুর ঘোড়া তুলছেন, আর টিপছেন। ভব কাছে এসে তাঁকে তুলে ধরতেই তিনি বললেন, 'ভব আমি ঘুমাব' স্বর অতীব রুগ্‌ণ। এইটুকু সময়ের মধ্যে রং যেন কালো হয়ে গেছে।

ভব খানিক মদ দিল, হুজুর মুখে দিতে গিয়ে গেলাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'ব্রান্ডি এত লাল কেন।'

এখানটা বাথান মত, মহুয়া আর নিমে ঘেরা। সময়ের কিছু আগে মহুয়া ফুটেছে, তারই ভাতুই গন্ধ। হাওয়ায় কিছু কিছু খসে পড়ে। শাজান এখানে শুয়ে ঘুমায়। মাঝে মাঝে তার শরীর চমকে চমকে উঠেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা।

শিবাই বামুন এবং অন্যান্যরা মৃদুস্বরে একটি দেহেলো গান গায়, শবদাহের পোড়ার শব্দ এই গীতে বর্তমান। শ্মশানে এ গান তারা গায় 'যবে এ দেহ তরণী ডুবে যাবে, ও তোর ডোবা খোপে নোনা লেগে রং খসে পড়িবে।' দেহেলো গানের সুরে মন বড় কেমন-কেমন করে। শাজাদের চোখে জল গড়াচ্ছিল, বুঝা গেল তার ঘুম ভেঙেছে। দু-একবার চোখ জোর করে চেপে ধরেছিল।

ঘোতাই কলসি থেকে কি যেন একটি খাবরিতে গড়িয়ে শিবাইকে দিল, শিবাই বললে, ' কোম্পানিকে দাও!'

চোখ বুজিয়ে শাজাদ বলেছিল, 'বামুন বারুদের গন্ধ পাও?'

'পাই।'

কোতি এতেক শিয়াল ছিনাছিনি গো।'

'মনে লয় গোবেন্দপুর।'

গোবিন্দপুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। মাথাও ঝাঁকানি দিলে, এ কারণে যে তার একটি দৃশ্য কল্পনায় এসেছিল। যথা—গোবিন্দপুরের আধা ভাগাড়, সেখানে নিশ্চয়ই আলমকে ফেলে দিয়েছে, নিশ্চয়ই মুচিরা তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে (কেন কে জানে) বালমচির নিয়েছে। অনেক সাদা হাড়ের মধ্যে সবুজ ড্যাঙায় গোলাপি আলম পড়ে আছে, খুরগুলি কালো, নাক মুখ কালো। শাজাদ আর স্থির থাকতে পারল না, ভিতরটা যেন বাহিরে বার হয়ে আসতে চায়। চিক করে থুতু ফেলে, হাপরের মত কাঁপতে লাগল। ক্ষোভে রাগে অধীর। শুধু বলেছিল, 'আমার বুকে লাথি মেরে মেরে ফেল গো!'

ইয়াসিন বললে, 'ই হো, ই হো চেঁচাও কেনে, ক্ষ্যাপা হইছ হে? টান খাবে, না পাউরা...।'

'ক্ষ্যাপাই বটে রে মিয়া,' বলে উঠেই খুব নিচু একটা ডালে বসে বললে, 'আমি মানুষ নই মিয়া ভাই।'

ঘোতাইয়ের একটু খুকি নেশা হয়েছিল, সে চিক করে মদে-তিক্ত থুতু ফেলে বললে, 'আরে হে হে পরাণ তুমি আবার মানুষ কবে হে? প্রথা বুকে চাপড় মেরে হেঁতেল শাণ দিবে না, আঁচলে বাদ ডাকাচ্ছ।'

পাউরা মুখে ঢালতে ঢালতে হাত নাড়িয়ে বললে, 'আমার বহুত পাপে আলম গেছে...আমি'...

'আহে ডরে ডুকরাইছ বল...বিবাগী হবে বটে...' ইয়াসিন বললে, 'তুমি শালা লিজ্‌জেই জাহান্নাম, তুমি জন্মাও নাই, তুমি শালা তরমুজি রাঁড়ীর পরনের তেনারও অধম।'

'কি বললি?' বলেই শাজাদ লাফ দিয়ে এল, খানি পেটে সদ্য পড়তেই পেট মোচড় দিয়ে উঠেছিল, ঝপ্ করে ঘোতাইয়ের ঘাড় আর ইয়াসিনের গামছা মত কাপড়টা ধরে ফেলেছিল। ঘোতাই এ ব্যাপারে বিশ-পঞ্চাশটি ছোটছেলের মত কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

শিবাই উঠে ত্বরিতে শাজাদকে ছাড়িয়ে বললে, 'যে শালাকে মারার কথা তাকে মার গা' বলে ঠেলা দিল। শাজাদ পুনর্বার ডালে বসে স্থির হয়েছিল। তার দুটি হাতের উপর মাথাটি ন্যস্ত।

এখন চাঁদের আলো এখানে সেলাইয়ের ফোঁড় কাটা। মদ খাওয়ার আরামের শব্দ, আর মহুয়া পড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ শাজাদ বলে উঠল,'একটা যদি বন্দুক পেতাম...'

নিমাই এবং ইয়াসিন তাকে ভেংচে, কান্নার সুরে, 'ও হু হু হু' করে উঠেছিল। ইয়াসিন বলেছিল, 'মরি কি পাট্‌ঠা মরদ, গায়ের দরদ...সাবাস!' তারপর খুব লাগসই আবদারে গলায় বলেছিল, 'কেনে হে ঘোড়া মারবে কি হে?'

শাজাদ পুনর্বার চোট পেলে। তার অস্থিরতা শোনা গেল, হে হে করে লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, মাটিতে পড়েই উঠেই কার সঙ্গে যেন লড়তে লাগল, মাঝে মাঝে তারই হাপিস্-হাপিস্ শব্দ। কে একজনা মদের কলসি নিয়ে সরে গেল, যেখানে যেখানে সে আস্ফালন করে এগিয়ে যায় সেখান থেকেই লোক পাশ কাটায়। অবশেষে শোনা গেল দরদালান কাঁপানো চিৎকার, 'দে শালা আমার হেঁতেল।'

'খাড়াও হে, যেতে যেতে ঘুমাই পড়বে বটে,' শিবাই বলেছিল।

শাজাদ তৎক্ষণাৎ একটি ঘুষিতে তার প্রত্যুত্তর করেছিল, শিবাই মুখ সরিয়ে নিলেও অল্প লেগেছিল। যেখানে লেগেছিল, সেখানে একবার হাত বুলিয়ে বললে, 'আর একটু পাউরা খাও হে, জোর আসে নাই, ঘুঁষিতে ডর আছে, খোঁপা খোঁপা লাগে।

'মস্করা লয়, আমি যাব', শাজাদ বললে।

'রাত বাড়ুক বটে, এখন তো ঘোড়া মারার মোচ্ছব শুরু হবে,' ইয়াসিন বুদ্ধির কথা বললে।

সত্যই মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। হুজুর গান শুনেছিলেন। সমস্ত শৌখিনতার উপর দিয়ে কে যেন লাফ দিয়ে উঠেছিল। যে বুকখানি অনেক অযুত রং দিয়ে তৈরি এখন ঘোড়াটি সেখানে নাল ঠোকে। ঠুকে ঠুকে অভ্যন্তরের শিকড়লাগা ফোয়ারাটিকে ক্রমে ভেঙে ফেলতে চায়। এ দৃশ্য মদে স্থির, অসভ্য আলিঙ্গনেও মাথা তুলে উঠে। হুজুর অন্যমনস্কভাবে বন্দুকটা স্পর্শ করত চেপে ধরেছিলেন।

অন্য হাতে হুজুর বাইজিকে আর্কষণ করে নিজের হাতের উপরেই রাখলেন, বাইজির হাত থেকে একটি মেওয়া খেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। কোথাকার এক অনন্ত রাস্তা তার মধ্যে সমস্ত কিছু বীভৎসতা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে, কক্ষের পর কক্ষে এখানেও প্রতি ইঙ্গিতে প্রতিবিম্ব, বিচ্ছুরণ অমোঘ নিত্যতা সৃষ্টি করেছে, পূর্বপুরুষদের প্রকাণ্ড সোনা-কেয়ারি ফ্রেমে, যেন বড় অন্ধকার।

বাইজির গীতের মধ্যে কাঁধে ভাঙন দিয়ে তাল সমতা রাখতেই, হুজুরও চমকে উঠেই বললেন, 'কি মেহের, ডরতা...ডর কেয়া' বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি আছি, হাম হ্যায়।'

আয়না আর ঝাড় কলসে ঠিকরানো আলোর মধ্যে এরা অটুট। এখানে একটি মুহূর্ত নেই যেখানে প্রকৃতি বর্তমান, গোলাপ সত্যিই তো আর মানুষের হাতের খেলনা নয়। এখানে কোথায় হুজুর দাঁড়াতে পারেন। মনে হয়, ওই শাদা মৃদু পুতুলটাকে গিলে ফেলি। মনে হয় গান তার স্মৃতিকে ছাপিয়ে উঠুক। হঠাৎ বাহবা দেবার নামে অসম্ভব চিৎকার করে উঠলেন। গীত চমকে থেমে গিয়েছিল।

'ভব'।

ভব তাঁর কাছে এল।

'রতি পাইক!'

'কেন?'

'ডাকাত...সে শালাকে আমি খুন করব।'

'সে কি!' বলে ঈষৎ হাসির ধমক দিল।

হুজুর বললেন, 'দুঃ শালা' বলে হেসে নিয়ে খুব মেয়েলি স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ট্রেন কখন বা' বলেই একটু বেশি সাহসী হয়ে বললেন, 'আজ ঘরটা কেমন যেন ম্যাদাটে ম্যাদাটে লাগছে না রে... জংলি চাকর-বাকর নিয়ে কোনও কাজ হবে না, এই কদিন দেখিনি প্রত্যেকটা জিনিসে যেন সাজ লেগেছে।'

'তা বটে... তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে আর—'

'আচ্ছা ভব ঘোড়া ভূত হয়?'

এ কথায় ভব কোনও উত্তর দিতে পারল না, অথবা সে ইচ্ছা করেই উত্তর দেয়নি। গানের প্রশংসায় 'আহা' দিলে এবং চমক গানের কলিও সে ধরেছিল যথা—'আ কদর পিয়া রে'।

হুজুর একটি শ্বাস ত্যাগ করে পায়ের তেলোতে হাত বুলোতে লাগলেন। তিনি বোধ হয় কিছু ভাবছিলেন।

এখন অনেক রাত। সারেঙ্গিওয়ালা সারেঙ্গি জড়িয়ে শুয়ে, তার রুপার বোতামের ঝলর তাঁতে লেগে আওয়াজ তুলছিল। বাইজি তাকিয়ায় হাত রেখে, বাঙালি স্ত্রী লোকটি তাকিয়া গোট করে কালীঘাটের পটের মত। ভব শব আছে; একমাত্র হুজুরই জাগ্রত, তিনি তার হাতের হীরার আংটি ঘোরাচ্ছিলেন। বুনো হাওয়ায় কলসের দুবলি (ধকধকি) নড়ছিল। তারই কোমল নিখাদ, খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

হুজুরকে কে যেন জোর উঠিয়ে নিল। ও বোধ হয় কক্ষে রক্ষিত শৌখিনতার আত্মা। যা চির স্থিরতার মধ্যে এক একবার অধৈর্য হয়ে পড়ে। হুজুর নিজে কিন্তু বন্দুকটা তুলে নিলেন। একবার মাত্র থমকে ছিলেন, রঙিন ভাস উদ্‌ধৃত উড়োন-গোলাপ তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

চাঁদের আলোতে বুড়ো মানুষেরা কি অসম্ভব ভৌতিক হয়, উপরন্তু যদি তার চোখ অর্ধ উন্মীলিত থাকে। রতি পাইক বুকে হাত রেখে এখানে হুজুরকে ঘরের সামনে ঘুমায়। হুজুর এসেই পা দিয়ে তাকে ঠেলা মারলেন।

রতি উঠেই দেখল, সামনে বন্দুকের নল। রতি পিছনের লোকের গাত্র-সুবাসে বুঝেছিল, ইনি কে।

'হুজুর' বলে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলে।

'রতি, কোথায় তোকে মারব বল?'

রতি উঠে সহবত দেখিয়ে মুখ তুলে চাইল, ঘরে আলোয় ঝোপঝাড়ের মত মুখ। শুধু ভ্রূদ্বয় উঠে নামেট।

রতি পাইক তবু হাতজোড় করে বলেছিল, 'হুজুর এমন ভাগ্য কি আমার হবে।' কিন্তু বলে রতি আর দেরি করল না, কোমরের কষিটা একটু আঁট করেই দৌড়াল।

মাতৃস্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী অযুত ঐশ্বর্য; জিহ্বাহীন অন্ধকারের সম্মুখীন অজর ঝরনার মনোহারিত্বের পাশ দিয়ে কখনও ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে রেখে; বৃদ্ধ রতিকান্ত পাইক পলায়মান, পিছনে টাল-খাওয়া মদ্যপ নূতন হুজুর।

হুজুর বলেছিলেন, 'তুই আমার সর্বনাশ করেছিস, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন...'

তাই রতি ছুটতে ছুটতে বলে চলেছে, 'আমি কি বলেছি। তাঁরা কেমন ছিলেন, তাঁদের দাপট, তাই বলে...এখন বলব—তাঁদের দাবে ভূত পালাত হাত বুনেদি খেতাবি' বলতে বলতে সে এখন সিঁড়ি দিয়ে নামল। গাড়ি-বারান্দা...তারপর রাস্তা, পিছনে বাবু। কে যেন তাঁকে দৌড় করাচ্ছিল, না হলে এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। রতির পক্ষেও নয়।

রতি দাঁড়াল, বললে, 'একটা ঘোড়া মেরে এত ভয়, হা কপাল' এই সময় হুজুর যেই বন্দুক উঠিয়েছেন রতি আবার দৌড়, মুখে তার এক কথা,'একটা ঘোড়া মেরে...জমিদারি করা,' এ সময় গুমটি ঘরের পাশ নিয়ে যাচ্ছিল বললে, 'এইখানে যত বেটা মরেছে কেঁদেছে, সে শুনলে তো আঁতুড়ে মারা যেতেন, তারা ছিল মানুষ... কয়েদে যাও এখনও কান্না শুনতে পাবে—তাদের মুখে তো ভাত উঠত না, কত গাঁ জ্বালালে, কত ঠগ মেরে সাধু করলেক আর বংশে এমন!' রতি আর দৌড়তে পারছিল না তাই সে আর বলেছিল, 'না আমার মরাহ ভাল বটে হুজুর তোমার গুলিতে আমায় মের না আমি গাছে ঝুলব.. তোমার গুলিতে মরলে আমায় আবার জন্মাতে হবে...' হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

কয়েদখানার মধ্যে চাঁদের আলো ছিল। ফলে দরজার গরাদ মিলে, কোথায় যেন মড়ার খুলির মত। পরপর গরাদগুলি ভয়ঙ্কর দাঁত। হুজুর একবার রতির দিকে অন্যবার গরাদের দিকে চাইল। রতি কাপড় দিয়ে ঘাম মুছছে, হুজুর কয়েদখানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ফার্নের পাতা নড়ছে। ভয়ে চিৎকার করতে গিয়েই ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—দু-একজন পাইক। বললেন, 'রতি ওদের লণ্ঠন আনতে বল আমি নিজে কলি ফিরাব।'

একজন কলসি উপুড় করে মুখে ঢালবার চেষ্টা করলে দুয়েক ফোঁটা পড়ল। এখন রাত্রি গভীর। দূরাগত চৌকিদারের 'হৈ' আসে, এবং মাদলের টিম টিম আওয়াজ। আর শুকনো পাতার কঙ্কালিক শব্দ। জন্মের আবেগ অসংখ্য বিচিত্রতায় টোপ গিলে আছে।

কীটের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কমেছে, নিঃশ্বাসের উষ্ণতার মধ্যে সমস্ত চরাচর।

আর একজনের উষ্ণ নিঃশ্বাসে অন্যে ভীত, এ কারণে যে আসন্ন দাঙ্গার উৎসাহে সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্বল। এ ওকে ধাক্কা দেয়, অথচ পাতা খসার শব্দে, অথবা মহুয়া যখন বিচ্যুত তখন, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিম্নে এবং গাছে যেখানে চন্দ্রালোক পুষ্পিত সেখানে চকিত হয়। এ দৃষ্টি সন্দেহবাচক। কেহ আরও ভীত, মহুয়া গায়ে যদি পড়ে তবেই ন্যাজ তুলে। কেউ এই সুযোগে কিছু সাহস দেখায়, দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। শাজাদ আর এক ভূমিকায়, বাঘেলা দাপটে একবার এদিক অন্যবার আর একদিক পদচারণা করে, সে কখনও বা আলো-আঁধারের মধ্যবর্তী, দুই হাত উপরে তুলে হো হো করে উঠে। এরূপ যে সে কাউকে আহ্বান করছিল। এর সঙ্গে শিবাইয়ের, আর এক তান্ত্রিক স্বরে, 'ওঁ হৈ লম্বোদর...মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলংদণ্ডঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকারং, বন্দে—হৈ—শৈলসুতাসুতঃ গণপতিং সিদ্ধিপ্রদ কামদম। হৈ লম্বোদর।'

শিবাইয়ের চিৎকার সকলেরই গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। শাজাদ চুপ, ঊর্ধ্বে হাত দুটি জোড়া করে ঝাঁকি দিয়ে বললে 'বা জান বা জান' এমত সময় কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে এল। নেমেই খবর দিলে, সঙ্গে সঙ্গে হো হো, লম্বোদর ইত্যাদি নানা ডাকে আক্রমণের খেদানি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। এখান থেকে রাঘবপুর অনেকদূর, তবু কেন যে তারা ছুটছে তারাই জানে। এখনও তাদের ছত্রাকার দৌড় দেখা যায়, ধূলা উড়ে।

আর কিছু দূরে গ্রীক মন্দির যেমত। এখানে সকলেই থেমেছে, হেঁতেল শক্ত করে ধরে। অনেকেই টুকটুক মাটিকে নমস্কার করে নিয়েছিল, শাজাদ, 'মা মাগো' বলে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকাল...মাথা যেন উঠতে চায় না, একটু চোখ ফিরিয়ে দেখলে ইয়াসিন। তার সম্মুখে হাত দুটি গ্রন্থের মত খোলা। সে নিত্যকর্ম আচার জানে না, তবু সে জানে ওরই মধ্যে মন থৈ পায়। আর এক কথা যে, সে যে অন্যায় তছরূপ করতে যাচ্ছে না, তার কৈফিয়ত তাকে দিতে হবে। শাজাদ ভীত হল, হাঁকলে, 'হৈ লুতফর বাপ্!' কোথায় যেন সে নালিশ পাঠাচ্ছে অর্থাৎ ইয়াসিন তাই সে ধমক দিয়েছিল।

শাজাদ, খেলারাম, শিবাই এবং সঙ্গে ইয়াসিনও ছিল এরা পিছনের দিক দিয়ে উঠে এসেছে। এ ঘরে সকলেই নিদ্রিত, ঘুম মানুষকে কি অসভ্য করে তুলে, খেলারাম হাঁ করে চেয়েছিল। এমন সময় রতির পিছনে হুজুর বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

শাজাদের চোখ বড় করে ইশারায় সকলেই সর্তক হয়েছিল। শিবাই 'যাঃ' বলেই নিজের মুখ নিজে চেপে ধরল।

শাজাদ শুধু অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওরা কোথায় নিচে চারজন তো?'

শিবাই শুধুমাত্র জোরে নিশ্বাস ফেলে সায় দিয়েছিল। এখানে তারা চুপ করে রইল। সামনের খোলা ছাদ, দেখলে একটি লণ্ঠন নিয়ে দুজন কারা যায়।

লণ্ঠনে দেখা গেল, হুজুরের সাদা পাগড়ি। যারা লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিল, তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আলোটা গুমটি ঘরে উঠে গেল। খিলানের একটি স্তিমিত ছায়া। সেখানে একটি লোক।

তারা নিচে নামল, এসেই দেখে দুটি লোককে কারা যেন ঘায়েল করছে। তারা আর দাঁড়াল না, সোজা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে যখন যায় তখন গুমটি থেকে কে একজন হাঁকল— 'কে-হো।'

তারা প্রস্তুত হবার পূর্বে এরা বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়ে গিয়েছিল, মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ে দিল, রতিকে খেলারাম কব্জা করলে। আর আর যারা রুনুখগাঁয়ের লোক এখানে ওত পেতে ছিল তারা এসে পড়ল।

হুজুর পিঁপে থেকে চুন নিয়ে কয়েদখানার কলি ফেরাতে অধৈর্য। তাঁর নিজের নামে গান তিনি গাইছিলেন, 'দাদার আমার বড় ছাতি দুয়ারে বান্দিবেন হাতি। দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি' বলেই না ফিরেই বললেন, 'আমি ভয় পাইনি'...বলে ফিরে দেখেন কে একটা লোক। 'ওরে একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়'...

'মুখ মাথায় চোট দিও না' ইয়াসিন একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদের হেঁতেল লাগল।

অস্ফুট চিৎকার শোনা গেল, হুজুর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পড়লেন। পা মাটিতে সরে সরে যেতে লাগল, রক্তাক্ত মাথাটা দেওয়ালের আগাছায় লেগে হাতের ছাপের উপর দিয়ে নামতে লাগল।

শাজাদ নিজের মুখ থেকে, চোখ থেকে, ছুটে-আসা রক্তটা মুছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

ফার্ন গাছে যে রক্ত লেগেছিল তা টুপ টুপ করে পড়তে লাগল। হাতের ছাপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

খেলারাম একটু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। বললে, 'হুজুর তোমার রেণ্ডীগুলো রাঁড় হল গো।'

শাজাদ বুকের কাছে কান পেতে দেখলে শ্বাস নেই। সে গম্ভীরভাবে উঠে গরাদ একটু ঠেলা দিলে। চোখ তুলে দেখলে, ইয়াসিন ঠোঁট পরিহিত খিলানের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে, হাত তার গ্রন্থের মত খোলা, কার কাছে যেন বা ক্ষমা চাইছে। যেন বলছে মানুষের বিশ্বাস হোক তিনি আছেন। ফলে মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যবধান প্রান্তর প্রান্তর হোক।

রানু যদি না হ'তো

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ডিসপেনসারিটি যে অনেক দিনের পুরনো তা ঘরখানির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। লম্বা লম্বা কয়েকটা ওষুধের আলমারি, তার সামনে ছোট্ট একটা টেবিল, খানকয়েক হাতলওয়ালা পুরনো ধরনের চেয়ার। কোনও ফার্নিচারেই পালিশের বালাই নেই। রং একেবারে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু পালিশ না থাক না-ই থাকল, ছারপোকা যে অগুনতি আছে তাতেই রানুর আপত্তি। এই পনের বিশ মিনিটের মধ্যেই দু'দুবার চেয়ার বদলেছে রানু, কিন্তু কোনওটিই সুখাসন হয়ে ওঠেনি। আচ্ছা, ডাক্তারবাবু এত রোজগার করেন, এই চেয়ারগুলি বদলে ফেলতে পারেন না? গদি আঁটা তাঁর নিজের বসবার চেয়ারটির দশাই বা কি। বুড়ো ডাক্তারের বোধ হয় এই ফার্নিচারগুলির ওপর মায়া জন্মে গেছে। কিছুটা তিনি বদলাবেন না। শুধু ফার্নিচার না, এই ডিসপেনসারিটির সবই পুরনো। ডাক্তার পুরনো, কম্পাউন্ডার পুরনো, চাকর পুরনো। দাইটি পর্যন্ত বুড়ি থুড়থুড়ি। ওর বয়সও ষাট-পঁয়ষট্টির কম হবে না। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট্ট কেবিনটির মধ্যে সারদা দাই একটি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই থেকে বক বক করছে। ডাক্তারবাবু এই বিকেলবেলায় থাকেন না তা রানু জানে, কিন্তু কম্পাউন্ডারটিও যে কোথায় উধাও হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ কলেজে যাওয়ার সময় রানু এতবার করে বলে 'মা'র মিকশ্চারটা তৈরি করে রাখবেন আমি বিকেলে ফেরার পথে নিয়ে যাব' তা তাঁর গ্রাহ্যই হল না। এই ডিসপেনসারির ব্যবস্থাই এইরকম। এতদিনের পুরনো কাস্টমার রানুরা, কিন্তু তাদের সঙ্গে মোটেই ভদ্র ব্যবহার করেন না ডাক্তার কম্পাউন্ডার। কোনওবারই এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা বসে না থেকে এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতে পারেনি রানু। অথচ বাবা-মা'র ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় এই ডাক্তার এই ডিসপেনসারি ছাড়া শহরে আর কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। বাড়ির যে-কারও অসুখে, যে-কোনও অসুখে, তাঁরা বুড়ো ডাক্তার শ্রীপতি দত্তের শরণ নেবেন। কোথায় এই শ্যামপুকুর আর রানুদের বাসা রামকান্ত বোস স্ট্রিট। এতখানি রাস্তা পার হয়ে এই ডিসপেনসারিতে রানুর বাবা-মা চিকিৎসা করাতে আসবেন তবু কাছাকাছি কোনও ডাক্তারকে দেখাবেন না। মা ক'দিন যাবৎ জ্বরে ভুগছেন। ডাক্তারবাবু একবার দেখে ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছেন। কলেজে যাওয়ার পথে তাঁকে রিপোর্ট দিয়ে গেছে রানু। তিনি বলেছেন, আগের ওষুধটাই চলবে। তাই ফেরার পথে রানু মিকশ্চারটা নিয়ে যাবে বলে এসেছে। কিন্তু কোথায় কম্পাউন্ডার, কোথায়ই

বা ওষুধ। শিশিটা ফটিকবাবুর টেবিলে ঠিক আগের মতই খালি পড়ে আছে। দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রানুর। কেন, তারা কি পয়সা দিয়ে ওষুদ কেনে না? কিছু টাকা মাঝে মাঝে বাকি পড়লেও দু'এক মাসের মধ্যেই তারা শোধ দেয়। এত অবজ্ঞা অবহেলা কেন তাদের ওপর। বাবাকে এবার সে পরিষ্কার বলে দেবে, 'ও-ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে হয় তুমি আনো গিয়ে, আমি আর পারব না।'

সত্যি কলেজ থেকে ফিরে এসে এমন বিকেলটা নষ্ট করতে কার ইচ্ছা হয়? বিশেষকরে এই ফাল্গুনের বিকেল? কথা ছিল গোঁসাইপাড়া লেনে আজ রানু তার বন্ধু হেনাদের বাড়ি হয়ে যাবে। হেনার মাসতুতো ভাই সুনীলদা আসবে সেখানে। নামটা মনে পড়তেই মুখে একটু হাসি ফুটল রানুর। সুনীলকে আজকাল আর সে সুনীলদা বলে ডাকে না। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে নাম ধরে ডাকে। অন্য সকলের সমানে এখনও অবশ্য আপনিই বলে, কিন্তু আড়ালে তারা দু'জনে দু'জনের তুমি। যদিও সুনীলের বয়স তেইশ, আর রানুর সতের, যদিও সুনীল একবছর আগে এম.এ.পাস করে চাকরিতে ঢুকেছে, আর রানু এখনও মাত্র সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী, তবু বিদ্যা আর বয়সের সব ব্যবধান তারা মাত্র বছর দেড়কের আলাপ-পরিচয়ের পরই পার হয়ে এসেছে।

ঢং করে দেয়ালের ঘড়িটায় একটা শব্দ হল। সাড়ে পাঁচটা। ইস, পাঁচটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। অবশ্য যতক্ষণ রানু না যাবে, সুনীল তার জন্যে অপেক্ষা করেই থাকবে, তবু ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। যে ছেলে ভালবাসে তার সঙ্গেও সময়টা ঠিকই রাখতে হয়। আজকে অবশ্য বেশি দেরি করত না রানু। মা'র অসুখ, সংসারের কাজকর্ম গুছোতে হবে, ভাই-বোনগুলিকে দেখতে হবে, দেরি করবে কি করে। কিন্তু দেরি না করলেও দু'-চার মিনিটের জন্যে দেখা তো হতো, দু'একটা কথা তো হতো। কিন্তু বুড়ো ফটিক কম্পাউন্ডার সব মাটি করে দিল।

'সারদাদি!' রানু এবার অধীর হয়ে বুড়ি দাইকে ডেকে উঠল।

'কি বলছ।' পার্টিশনের আড়াল থেকে জবাব দিল সারদা।

'আচ্ছা, ফটিকবাবু কি আজ আর ফিরবেন না?'

সারদা বলল, 'একটু সবুর কর দিদি, এই এল বলে।'

রানু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি তো সেই কখন থেকে বলছ এল বলে, এল বলে। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব।'

সারদা হেসে বলল, 'যা বলেছ। তোমার বয়সে একা একা বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। এস, ভিতরে এস।'

রানু রাগ করে উঠে গিয়ে কামরার দোরটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'কোথায় গেছে সত্যি করে বল।'

সারদা বলল, 'বলে তো গেছে, ক'টা ইন্‌জেকশন আনতে চললুম। আসবার পথে বোধ হয় বাসায় যাবে। চা-টা খেয়ে আসবে। বউয়ের কথা মনে পড়েছে।'

বিরক্ত হয়ে রানু ফিরে যাচ্ছিল, সারদা উঠে এসে হাত ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে টুলের ওপর বসিয়ে দিল।

একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল রানু। ডিসপেনসারির দাইয়ের এতটা ঘনিষ্ঠতা সে পছন্দ করে না। কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। সারদা দাই শুধু তাকে হতে দেখেনি হওয়ার সময় সাহায্য করেছে। ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা। ঘাড়ের কাছে বড় একটা খোঁপা কের জড়িয়ে রেখেছে। বেশ মোটাসোটা মাংসল চেহারা। গায়ে সাদা একটা জামা। তাকে ব্লাউজ বললেও চলে, আবার পুরুষের ফতুয়াও বলা যায়। পরনে কালো ফিতে পেড়ে শাড়ি। সারদা বালবিধবা। ছেলেপুলে কিছুনেই। নিকট অত্মীয়স্বজনও না।

রানু টুলের ওপর বসতেই, তার পাশের স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বছর চল্লিশেক হবে বয়স। নিম্ন শ্রেণীর গরিবের ঘরের বউ। আধ ময়লা শাড়িখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু মাগো, কি বিশ্রীই না হয়েছে। এই অবস্থায় বেরিয়েছে কি করে। লজ্জা-টজ্জাও নেই।

স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি তাহলে যাই দিদি।'

সারদা বলল, 'হ্যাঁ, এস। এখনও দেরি আছে। ও ব্যথা সে ব্যথা নয়। পুরনো পোয়াতি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন।'

স্ত্রীলোকটি এবার হাসল, 'ঘাবড়ে আর কি করব দিদি।' পিছনের ছোট দরজা দিয়ে সে এবার বেরিয়ে গেল।

সারদা বলল, 'অমন করে কি দেখছ। এ অবস্থা তোমারও একদিন হবে।'

রানু আরক্ত মুখে বলল, 'যাও, ও-সব বাজে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।'

সারদা হেসে বলল, 'বাজে নয় দিদি বাজে নয়। আর বড়জোর দু একটি বছর, তারপর তোমাকেও অমনি সুখের বোঝা নিয়ে আসতে হবে এখানে।'

রানু রাগ করে উঠে যাচ্ছিল, সারদা তাকে ফের টেনে বসাল। তরপর হেসে বলল, 'অবশ্য এখানে না এসেও পারবে। বুড়ি দাইয়ের কাছে আর আসবে কেন, বড় বড় হাসপাতালেই যেতে পারবে। তোমার মা তো এখন খালাস হতে হাসপাতালেই যায়। তোমার বারে কিন্তু যা করবার আমরাই করেছিলাম।'

রানু বলল, 'তা তো অনেকদিন শুনেছি।'

সারদা রানুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ঘোড়ার ডিম শুনেছ! আসল কথার কিছুই শোননি। সে কি কম কেলেঙ্কারি। বাপরে বাপক। মনে হলে এখনও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

এতক্ষণে রানুর কৌতূহল হল। সারদার দিকে আর একটু সরে এসে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো? কী হয়েছিল?'

সারদা বলল, 'শুনবে? আচ্ছা শোন। এখন আর শুনতে বাধা কি। এখন তো সবই বুঝতে শিখেছ।'

রানু বলল, 'আঃ অত ভূমিকা করছ কেন সারদাদি। যা বলবার বলে ফেল। সত্যি সত্যি হয়েছিল কি।'

সারদা পরম কৌতুকের স্বরে বলল, 'কি হয়েছিল? কিছুই আর হওয়ার জো ছিল না দিদি। যা একখানা কাণ্ড বাঁধিয়েছিল তোমার বাপ-মা, তাতে তোমাকে আর এ পৃথিবীতে আসতে হতো না।'

রানু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তার মানে?'

সারদা বলল, 'মানে আবার কি। মানে বুঝি কিছুই বোঝনি? খুব ভাল করেই বুঝেছ। কে কতটুকু বোঝে না বোঝে মুখ দেখলেই আমরা টের পাই।'

রানু ব্যাকুল হয়ে বলল, 'না-না, গোড়া থেকে সব খুলে বলো দিদি। সত্যি বলছি, আমার কাছে সব হেঁয়ালির মত লাগছে।'

সারদা হাসল, 'হেঁয়ালি তো বটেই। মানুষের জন্মে হেঁয়ালি, মানুষ নিজে একটা হেঁয়ালি, দুনিয়াসুদ্ধ তো হেঁয়ালিই মেলা।'

একটু থেমে সারদা বলল, 'তোমার বাপের নাম তো হেমাঙ্গ বোস আর মা'র নাম কমলা, তাই না? দেখ কি রকম মনে রেখেছি।'

রানু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'নাম দুটো মনে রাখা এমন কি আর শক্ত। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ হলে ওঁরা তো তোমাদের এখানেই আসেন।'

সারদা তেমনি তরল স্বরে বলল, 'কেবল নাম কেন, কীর্তি-কাহিনী সব কথাই মনে আছে! তোমার কত বয়স হল, সতের-আঠার, তাই না?'

'আঠার এখনও হয়নি।'

সারদা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সতেরই হবে। প্রথম দিনটির কথা বেশ মনে আছে আমার। ঠিক এইরকম সময়। কি এর চেয়ে আর একটু বেশি বেলা গেছে। তখন তোমাদের বাসা ছিল শ্যামবাজার স্ট্রিটে। তোমাদের মানে তোমার ঠাকুরদার। ষাটের কাছাকাছি বয়স। তবু বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা। ভদ্রলোক প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এই ডিসপেনসারিতে ঢুকলেন। ঘরভরা রোগী। তবু ডাক্তারবাবু সব ফেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার। কি হয়েছে আপনার?' তিনি বললেন 'সর্বনাশ হতে বসেছে। আমার বউমার খুব অসুখ, আপনি এখুনি চলুন।'

সারদা একটু থেমে রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

রানু অসহিষ্ণু হয়ে বলল 'হাসছ কেন?'

সারদা বলল, 'এখন হাসছি। তখন কি আর হাসবার জো ছিল? ডাক্তারবাবু তোমার ঠাকুরদাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে ব্যাপারটা বলুন আগে।' তখন তোমার ঠাকুরদা বললেন, তোমার মা তিন মাসের পোয়াতি। কিন্তু হঠাৎ ব্লিডিং হচ্ছে, আর পেটে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, 'চল সারদা দেখে আসি, তুমি তো এসব ব্যাপারে আমার চেয়েও ওস্তাদ।' এই তো এখান থেকে ওখানে। হেঁটেই গেলাম আমরা। গিয়ে দেখি তোমার মা যন্ত্রণায় মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তোমার ঠাকুরমা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তোমার মাকে দেখে আমার ভারি মায়া হল। আহা বাচ্চা মেয়ে, ঠিক তোমার এই বয়েস, কি একটু কম হতে পারে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখেই আমার যেন কেমন সন্দেহ হল। ডাক্তারবাবুকে বললাম 'ব্যাপার সহজ নয়।' ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুঁ।'

পানের কৌটো থেকে একটা পান বার করে মুখে পুরল সারদা, খানিকটা তামাকপাতা

সেই সঙ্গে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চিবুতে লাগল। রানু অধীর হয়ে বলল, 'তারপর?'

সারদা বলল, 'তারপর আর বেশি কিছু শুনে তোমার কাজ নেই দিদি। ডাক্তারবাবু প্রায় ধমকে উঠলেন, 'এমন হল কেন? এমন হওয়ার তো কথা নয়।' তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বললেন, 'আমরা তো কিছুই জানিনে ডাক্তারবাবু।' তিনি বললেন, 'আপনার ছেলে নিশ্চয়ই সব জানে, ডাকুন তাকে।' কিন্তু তোমার বাবাকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখনই ডিসপেনসারি থেকে ঔষুধ আনিয়ে দেওয়া হল। তোমার মাকে খানিকটা সুস্থ করে আমরা বেরিয়ে এলাম। পরদিন ফের রোগী দেখতে গিয়ে ডাক্তারবাবু তোমার বাপকে পাকড়ে ধরলেন। 'কি করেছ সত্যি করে বলো।'

রানু রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'তারপর?'

সারদা মৃদু হেসে বলল, 'তেইশ-চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ধমকে ভয়ে একেবারে কেঁচো। ডাক্তারবাবু সহজ পাত্র নন। সব কথা তার কাছ থেকে বের করে নিয়েছিলেন। আমাদের কাছে আসবার আগে তোমার বাবা আর এক গুণধর ডাক্তারের ওষুধ খাইয়েছিল তোমার মাকে। তাও কি একবার? তিন তিনবার। একদিন এই ডিসপেনসারির মধ্যেই ডাক্তারবাবু আর আমি দুজনে মিলে তোমার বাবাকে ফের ধরে বসলাম, 'কেন এমন কর্ম করতে গিয়েছিলে বাপু বলো। এই তোমাদের প্রথম সন্তান।' ছোকরা আমতা আমতা করে কত কথাই না বলল। সবে বি এ পাস করে বেরিয়েছে। চাকরি-বাকরি হয়নি, ছেলেপুলে হলে খাওয়াবে কি। তাছাড়া এত অল্প বয়সে ওসব ঝামেলা বাড়ুক সে আর তার স্ত্রী কেউ তা চায়নি। তাদের জীবনের আরও অনেক সাধ আহ্লাদ আছে। বউকে সে পড়াবে পাস পরীক্ষা দেওয়াবে—', রানু উঠে দাঁড়াল।

সারদা বলল, 'চললে? তা দিদি বড় প্রাণের জোর তোমার। যা দশা হয়েছিল তাতে কেউ আশা করিনি তুমি তাজা অবস্থায় পেট থেকে পড়বে। মেয়েমানুষের জান, তাই বেঁচেছ। ছেলে হলে বোধ হয় আর রক্ষে পেতে না।'

রানু কোনও কথা না বলে দোর ঠেলে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, সারদা বলল, 'এসব কথা তোমাকে যে বললাম, তা যেন আবার তোমার বাপ-মাকে বলে দিয়ো না। লজ্জা পাবে। আপদ-বিপদ সব চুকে গেছে তাই আজ গল্পটা বললাম। বেঁচে থাক, সুখে থাক। আহাহা সন্তান যে কি জিনিস—'

কথা শেষ না করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সারদা।

রানু কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দেখে কম্পাউণ্ডার ফটিকবাবু তাঁর ছোট্ট ডেস্কটির ধারে গিয়ে বসেছেন, রানুকে দেখে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, 'এই নাও দিদি তোমার মার ওষুধ। দেরি দেখে খুব রেগে গিয়েছিল বুঝি?'

দাগকাটা মিকশ্চারের শিশিটা রানুর হাতে তুলে দিয়ে ফটিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছে তোমার মা?'

রানু সংক্ষেপে জবাব ছিল, 'ভাল।'

তারপর ডাক্তরবাবুর টেবিলের ওপর থেকে বইখাতাগুলি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি

ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে প্রথমেই তার মনে হল, এই পৃথিবীতে সে জোর করে এসেছে। তার আসবার কোনও কথা ছিল না। তাকে কেউ চায়নি। সে যাতে না আসে তার জন্যেই সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কি হতো যদি সে না হতো, যদি সে না আসত।

ট্রাম-বাসে অফিস ফেরত কেরানিদের ভিড়। তার বাবাও কেরানি। ট্রাম-বাসে উঠল না রানু। হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে চলল। ভারি অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত কথা। পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব একান্ত আকস্মিক। সে না হতেও পারত, সে না আসতেও পারত।

গোঁসাইপাড়া লেন কখন ছাড়িয়ে এল রানু। সুনীলের খোঁজে আজ আর হেনাদের বাড়িতে তার যেতে ইচ্ছে করল না। গেলে অবশ্য এখনও দেখা হয়। সুনীল তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে বসে থাকবে। থাকুক, কি হবে দেখা ক'রে। রানু যদি না হতো, তাহলে কেই বা দেখা করতে যেত। এ পৃথিবীতে তার না আসবার, না থাকবার কথাই তো সবচেয়ে বেশি ছিল। এই যে সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এই চলবার কোনও কথা ছিল না।

ঠিক ইচ্ছে করে নয়, নেহাতই অভ্যাসের বসে নিজেদের গলিতে ঢুকে পড়ল, ঠিক অন্যদিনের মতই বাড়ির সামনে এসে রুদ্ধ দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু আজকের রানু আর অন্যদিনের রানু সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের রানু আর পুরোপুরি এ পৃথিবীর মেয়ে নয়, এমন এক জগতের যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই।

কড়া নাড়ার শব্দে একটি কিশোরী মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। রানুর বোন বুলু। বছর চোদ্দ বয়স, দেখে অতটা মনে হয় না। রানুর মত অমন স্বাস্থ্যবতী নয়, সুন্দরীও নয়। দেখতে যেমন কালো তেমনই রোগা।

বুলু সাগ্রহে বলল, 'দিদি এলি? এত দেরি করলি যে?' রানু রুক্ষ স্বরে বলল, 'দেখছিস না হাতে ওষুধ। দেরি করেছি কি সাধে! ডিসপেনসারিতে গিয়েছিলাম।'

বুলু বলল, 'ও। মার জ্বর অনেক কমেছে দিদি, কিন্তু ভারি দুর্বল। মাথা তুলতে পারছে না।'

রানু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, নে ওষুধটা এবার খাইয়ে দে গিয়ে।'

বুলু একটুকাল অবাক হয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোর? একেবারে ঝগড়া মুখে করে মিলিটারি মেজাজ নিয়ে এসেছিস।'

রানু বলল, 'তোকে আর বকবক করতে হবে না। যা বললুম তাই কর গিয়ে।'

বুলু আর কোনও কথা না বলে সামনে থেকে সরে গেল। ভিতরের দিকে আর একটু যেতেই রানুর ছোট দুটি ভাই বন্ধু রন্ধু এগিয়ে এল। দুজনের খোলা গা। পরনে হাফপ্যান্ট। রোগাটে চেহারা একজনের বয়স বছর দশ, আর একজনের সাত।

বন্ধু বলল, 'দিদি আমার খাতা-পেনসিল এনেছ?'

রানু ঝাঁঝালো ধমকের সুরে বলল, 'খাতা-পেনসিল আনবার কর্তা কি আমি? বাবাকে বলতে পারিসনে?

রন্টুর লোভ ছিল লজেন্সের ওপর। নিজের হাতখরচের পয়সা থেকে দিদি এক একদিন দু-এক আনার লজেন্স কি বিস্কুট তাদের জন্যে কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু আজ দিদির মেজাজ দেখে রন্টু আর তার দিকে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

একতলা পুরনো বাড়ি। গুনতিতে তিনখানা ঘর। কলেজে-পড়া বড় মেয়ে বলে রানুর ভাগ্যে পুরোপুরি একখানা ঘরই জুটেছে। অন্যদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে না গিয়ে রানু মা'র কাছে এসে বসে। তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জোর করে ধমক দিয়ে ওষুধপথ্য খাওয়ায়। কিন্তু আজ আর এসব করবার তার প্রবৃত্তি হল না। কেন করবে। এ সংসারে রানুকে তো এরা কেউ চায়নি। সে জোর করে এসেছে। সে অনাহূতা, অবাঞ্ছিতা।

অন্য কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরটিতে ঢুকল রানু। তক্তপোশের শিয়রে ছোট একখানি টেবিল। তার ওপর বইখাতাগুলিকে সশব্দে নামিয়ে রাখল। একপাশে সস্তা দামের একটা র‍্যাক। কলেজের বই-খাতা সাজানো। সুনীলের দেওয়া কয়েকখানি গল্প কবিতার বইও আছে।

অন্যদিন ঘরে এসে রানু টেবিল আর র‍্যাকটা একটু গুছিয়ে রাখে, রঙিন চাদরে ঢাকা বিছানাটা ঝাড়ে। কিন্তু আজ আর সেসব কিছুই করল না। ঘরে আলো জ্বালল না। অন্ধকার ঘরে আঝাড়া বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল। এ ঘরে সে নাও আসতে পারত, একান্ত নিজস্ব এই বিছানাটুকুতে শুয়ে সে নাও থাকতে পারত। সত্যি তার থাকাটাই আশ্চর্য, তার থাকবার কোনও কথা ছিল না।

একটু বাদে বুলু এসে ঘরে ঢুকল। সুইচ টিপে লাইট জ্বেলে দিয়ে বলল, 'দিদি, অমন ক'রে শুয়ে পড়লি যে, মা তোকে কতবার ডাকল।'

রানু বলল, 'ডাকুক গিয়ে। বল গিয়ে আমার শরীর খারাপ করেছে।'

তাড়া খেয়ে বুলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে এক হাতে চায়ের কাপ, আর এক হাতে মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে বুলু ফের এসে দাঁড়াল রানুর কাছে। বলল, 'নে দিদি, খা।'

রানু বলল, 'মুড়ি নিয়ে যা। মুড়ি আর খাব না। চায়ের কাপটা রাখ ওখানে।'

তারপর বোনের হাত থেকে কাপটা নিয়ে রানু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বুলু, আমি যদি না হতাম তা হলে কি হতো রে?'

বুলু বলল, 'কি বলছিস দিদি, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।'

সত্যি ও কি ক'রে বুঝবে। ওর তো কিছু বোঝবা কথা নয়। রানু আর একটু পরিষ্কার করে বলল, 'মানে আমি যদি এ পৃথিবীতে না আসতাম, না জন্মাতাম—'

বুলু বলল, 'কি মাথা খারাপের মত যা তা বলছিস। আমি যাই এবার। অনেক কাজ আছে। রান্নাবান্না সারতে হবে। তুই খেয়ে নে।' মায়ের মত গিন্নিপনার ভঙ্গি করে বুলু বেরিয়ে গেল।

রানু মনে মনে ভাবল, সত্যি ওকে বোঝানো যাবে না। নিজের দুঃখ, শুধু ওকে কেন, কাউকেই বোঝাতে পারবে না রানু।

পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মা কয়েকবার ডাকলেন, 'রানু এখানে আয়, আয় আমার কাছে।'

রানু প্রত্যেকবারই সে ডাক শুনল, কিন্তু একবারও সাড়া দিল না। কি করে যাবে? যেতে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে। কি করে তাকাবে মায়ের মুখের দিকে, চোখের দিকে? তাকালে নিজের মাকে কি আর সে দেখতে পাবে? পাবে না, কিছুতেই পাবে না। যে রানুকে চায়নি, হওয়ার আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছে, তাকে কি করে মা বলে ভাবতে পারবে রানু। পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

খানিক বাদে রানুর বাবা হেমাঙ্গ অফিস থেকে বাসায় ফিরল। শুয়ে শুয়েই সব টের পেল রানু। শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল বাবা তার কথা জিজ্ঞাসা করছে, 'শরীর খারাপ হয়েছে? কেন কি হয়েছে রানুর?' মা বলেছে, 'কি আবার হবে? সব কথাই তোমার শোনা চাই, না?'

অন্যদিন পড়া রেখে রানু বাবার হাতমুখ ধোয়ার জন্যে জল, গামছা, স্যাণ্ডাল এগিয়ে দেয়। চা করে। কিন্তু আজ আর উঠে সে বাবার সামনে গেল না। কেমন একটা যেন বীতস্পৃহা আর বিদ্বেষ বোধ করছে রানু। কার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কি ক'রে তাকাবে আজ সে বাবার মুখের দিকে? সে মুখে কি রানু আজ একজন খুনির হিংস্র মুখই দেখতে পাবে না? নিজের স্বার্থের জন্যে, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সতের বছর আগে তাকে যে লোকটি একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, যাতে সে না আসতে পারে তার জন্যে প্রাণপণে যে বাধা দিয়েছে, তার ওপর কোনও মমতাই আজ আর বোধ করল না রানু। বরং তীব্র এক ধরনের দ্বেষ আর জিঘাংসায় তার মন ভরে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে চা-টা খেয়ে হেমাঙ্গ রানুর ঘরে ঢুকল। আলোটা জ্বেলে দিয়ে মেয়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল হেমাঙ্গ। পাশ ফিরে শুয়ে আছে রানু। সেদিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কি রে তোর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে?'

রানু বাবার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, 'হুঁ'।

হেমাঙ্গ বলল, 'তাহলে আজ আর পড়াশুনো করে কাজ নেই। রাত জাগিস নে। সকাল সকাল দুটি খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

একটু বাদে হেমাঙ্গ নিজের মনেই বলল, 'যাই দেখি একটু হাতিবাগানে দিকে। হরেন দত্ত বলেছিল আজ গোটা দশেক টাকা দেবে। দেখি পাই নাকি। মাসের শেষ ক'টা দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসুখ-বিসুখে অস্থির হয়ে গেলাম। আর পারিনে বাপু। ডালভাত আর বড়া ভাজা হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিগে যা রানু। খেলেই শরীর একটু ভাল লাগবে দেখিস।'

হেমাঙ্গের জুতোর শব্দ বাড়ির সদর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেল। ঠিক মা'র মতই বাবার গলা মাঝে মাঝে স্নেহকোমল হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ আর এই স্নেহে রানুর মন ভিজল না। তার মনে হল সব ভান, সব মিথ্যে। সে আকস্মিকভাবে বেঁচে গেছে বলেই তার ওপর বাবা-মা'র স্নেহ, এই দয়া-মায়া। কিন্তু সতের বছর আগে তো ওঁদের মনে একটুও দয়া-মায়া ছিল না। ওঁরা তো চাননি রানু হয়, রানু বেঁচে থাকে। ওঁরা তো তাকে সাধ ক'রে আদর ক'রে ডেকে আনেননি, বরং বারবার বাধা দিয়েছেন। এখনকার এই স্নেহ মমতার কোনও মানে হয় না। রানুদের বাসায় একটা নেড়ি কুকুর আছে। কে যেন জব্দ করবার জন্যে তাদের বাসায়

বাচ্চাটাকে ফেলে গিয়েছিল। বাবা তাকে অনেকবার দূর দূর করেছেন, নিজে হাতে করে বড় রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, তবু বাচ্চাটা আবার ফিরে এসেছে। এখন বাবা নিজের হাতেই তাকে ভাত তরকারি আর মাছের কাঁটা দেন। এ বাড়িতে রানুর আদরও সেই অভ্যাসের আদর, সেই নেড়ি কুকুরের কেড়ে নেওয়া আদর। এ আদর সে চায় না, চায় না।

'আমি খাব না, কিছুতেই খাব না। রোজ রোজ ডাল দিয়ে খাব কেন? বাঃ রে!'

হঠাৎ চমক ভাঙল রানুর। রান্নাঘর থেকে বঙ্কুর নাকে কান্না শোনা গেল। সাত আট বছর বয়স হয়েছে। কিন্তু খাওয়া নিয়ে আজও কোঁদল গেল না। রানু মনে মনে ভাবল।

বুলু ভায়ের গলার অনুকরণ করে বলল, 'না খাবি তো উঠে যা। রাজপুত্তুর এসেছেন। ডাল ভাত রোচে না মুখ দিয়ে।'

রানুর মা পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হয়েছে রে বুলু? হয়েছে কি তোদের? ডাকাত পড়েছে নাকি? বাবারে বাবা, চেঁচিয়ে মেচিয়ে একেবারে অস্থির করে তুলেছে।'

বুলু বলল, 'আমাকে রাগ দেখাচ্ছ কেন মা। বঙ্কু রঙ্কু কেউ শুধু ডাল দিয়ে খেতে চাইছে না।'

বঙ্কু প্রতিবাদ করে উঠল,'এই ছোড়দি আমার নামে নালিশ করছিস যে। আমি কি করলাম।'

বুলু তাকেও রেহাই দিল না, বলল, 'না উনি বিষ্টুদেবের গোড়া এসেছেন। নালিশ করবে না। তুইও তো ভাত খাচ্ছিস নে। কেবল ঠেলে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখছিস।'

রানুর মার আর সহ্য হল না। আরও জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাস ঠাস করে গোটা কয়েক চড় মারত বুলু, চড় মার। তারপরে কান ধরে দু'টোকে ঘর থেকে বের ক'রে দে। দরকার নেই ওদের খাওয়ার। ডাল দিয়ে খেতে পারবিনে, তোদের জন্যে পোলাও মাংস কোত্থেকে আসবে শুনি? আর একজনকেও বলি। কি আক্কেল খানা তোমার। শিয়াল কুকুরের মত শুধু জন্ম দিয়েই খালাস। ওরা কি খাবে কি পরবে, তার একটুও যদি খোঁজ খবর নেয়। আমি শুয়ে শুয়ে আর ক'দিক সামলাব।'

রানু এবার তক্তপোশের ওপর ব'সে আঁচলটা ঠিক করে নিতে নিতে বলল, 'মা আর চেঁচিও না। অত চেঁচালে তোমার অসুখ আরও বাড়বে।'

রানুর মা বলল, 'বাড়ে বাড়ুক। এখন মরলেই আমার হাড় জুড়োয়। যতদিন থাকব, সবগুলি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যন্ত্রণা আর সয় না। এর চেয়ে সাতজন্ম বাঁজা হয়ে থাকাও ভাল বাপু।'

রানু ডাকল, 'মা'।

'কিরে।'

'আচ্ছা তুমি যে ও কথাগুলো বললে তা কি সত্যি?'

'কোন্ কথাগুলি?'

'আমি যদি না হতুম, আমরা যদি না হতুম তাহলে তোমাদের কি সত্যিই ভাল লাগত?'

'ও সে কথা বুঝি তোমার কানে গেছে। লাগতই তো, খুব ভাল লাগত।' বলে রানুর মা ফিক করে হেসে ফেলল।

শীর্ণ মুখ, শুকনো ঠোঁট। তবু মা'র মুখের হাসিটুকু কি মিষ্টি। রানু অপলকে একটু বসে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। না এই সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে সতের বছর আগেকার কোনও অপরাধের স্মৃতিচিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রানু এবার উঠে দাঁড়াল।

মা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

রানু হেসে বলল, 'যাই দেখি রান্নাঘরে। শোনো না এখনও কিরকম চাপা ঝগড়া চলছে তিনজনের মধ্যে।'

মা বলল, 'তা হলে যা। দেখ গিয়ে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াতে পারিস নাকি। আর তুইও দুটো খেয়ে নিস রানু।

রানু মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কেন বাবা-মা তখন তাকে চাননি, কেন তাঁরা এখনও রানুদের সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছেন না। আশ্চর্য, এই সোজা কথাটা বুঝতে তার এত সময় লাগল।

নিজের শোবার ঘর থেকে পাশের বড় ঘরখানায় চলে এল রানু। সারা মেঝেয় ঢালা বিছানা পাতা। মা অসুস্থ বলে তার বিছানা একটু আলাদা করে কোণের দিকে সরানো। আস্তে আস্তে রানু এবার সেই আধময়লা রোগশয্যার পাশে এসে বসে পড়ল।

রানুর মা বলল, 'ওকি তুই আবার এখানে এলি কেন? তোর না শরীর খারাপ হয়েছে।'

রানু বলল, 'এখন আর তত খারাপ লাগছে না মা।'

তারপর মায়ের আরও কাছ ঘেঁষে বসল রানু। রোগা হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে রানু বলল, 'বাবা আসুক মা, এলে একসঙ্গে খাব।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল রানু। কিন্তু মা আবার পিছু ডাকল, 'ওরে শোন। কথাটা তোকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। কি যে পোড়াছাই মন হয়েছে আমার। সুনীল এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেছিল আমার কাছে। কত কথা আর কত গল্প। চমৎকার স্বভাব ছেলেটির।'

শুনব না শুনব না ক'রে রানু এবার বাইরে চলে এল। তাদের শোয়া ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে ছোট্ট একটু উঠোন। সেই উঠোনের বরাবর মাথার ওপরে একফালি আকাশ। রানু তাকিয়ে দেখল সেই আকাশটুকু কখন যেন তারায় ভরতি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য আকাশ, আর আরও সুন্দর এই পৃথিবী। রানু মনে মনে ভাবল, সে যদি না হ'ত তাহলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়তো কিছুই এসে যেত না। কিন্তু কোনও না কোনও ভাবে রানু যখন একবার এসে পড়েছে তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।

গিলটি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গলির মুখ থেকেই হিমাংশু ঘোষালের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি ফ্যান গালতে গালতে সব কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল গৌরী। ওই একটা গুণ আছে হিমাংশুর, কখনও আস্তে কথা বলতে পারে না। অত্যন্ত খুশি হয়ে যখন সে ঘরোয়া আলাপ শুরু করে, তখন এ-পাড়ার কোনও নতুন লোক তা শুনলে সন্দেহ করে, একটা নরহত্যার জন্যেই বুঝি তৈরি হচ্ছে হিমাংশু।

রান্নাঘর থেকেও গৌরী বুঝতে পারল, গলির মুখে কানা চোখের মত ঘষা আলোর গ্যাসপোস্টটার নিচে দাঁড়িয়ে পড়েছে হিমাংশু। চিৎকার করে আলাপ করছে কারও সঙ্গে।

'আমার টাকা মেরে দেবে? হক্কের পাওনা ঠকিয়ে নেবে আমার? গলায় গামছা দিয়ে সব টাকা আদায় করে ছাড়ব, তবে আমার নাম হিমাংশু ঘোষাল!'

গৌরী ভ্রূকুটি করল। রান্নাঘরের মেজেয় ছোটবড় অসংখ্য গর্ত। হাঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়া ফ্যান জমা হচ্ছে তাদের মধ্যে। এই দিন-দুপুরেই প্রায়ান্ধকার ঘরের এখান-ওখান থেকে কয়েকটা আরশোলা উঁকি মারছিল। অর্থহীন বিদ্বেষে একটা খুন্তির ডগায় খানিক গরম ফ্যান তুলে নিয়ে গৌরী ছিটিয়ে দিলে তাদের দিকে। একটা আরশোলা চিত হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, অন্তিম যন্ত্রণায় পা ছুঁড়তে লাগল।

'হাজার টাকা মাইনে পান! মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ান! ওঃ— ওরকম বড় সায়েব বিস্তর দেখা আছে আমার! আজ বারো বছর লোক চরিয়ে খাচ্ছি এই কলকাতা শহরে, ঘাড় ধরে যদি-ও-টাকা আদায় করতে না পারি, তা হলে—'

তা হলে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে হিমাংশু। কিন্তু কী করবে? গৌরী জানে হিমাংশুর দৌড় কতখানি। দাওয়ায় বসে বিড়ি টানতে টানতে গজগজ করবে, গালাগাল করবে, অশ্লীলতম ভাষা ব্যবহার করবে, তারপর একদিন সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। ছাতাটা বগলে নিয়ে বেরুবার সময় গৌরীকে আশ্বাস দিয়ে বলবে, 'আড়াইশো টাকার ফ্ল্যাট, এক মাসের ভাড়া আমার কমিশন। যদি বাগাতে পারি, একটা মাস পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে চলে যাবে—কী বলিস?'

স্ত্রীকে তুই বলেই সম্ভাষণ করে হিমাংশু। ওরা দুজন একই গ্রামের। দশ বছরের গৌরীর সঙ্গে সতেরো বছরের হিমাংশুর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের আগেকার সম্ভাষণটাই চলছে এই চৌদ্দ বছর ধরে।

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে গৌরী উনুনে কড়াই চাপিয়ে দিলে। হিমাংশুর চিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। হয়তো চাপা গলায় আলোচনা করছে, কী প্ল্যানে টাকাটা আদায় করা যায়। কিংবা হয়তো সঙ্গীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়ে গিয়েছেথ বড় রাস্তার দিকে।

কড়াই থেকে কয়েক বিন্দু গরম তেল হঠাৎ ছিটকে এসে হাতে লাগল। মুখ বিকৃত করে গৌরী নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। রান্নার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া ইলেকট্রিক বাল্‌বটার লালচে ম্লান আলোতেও নিজের বাহুর দিকে তাকিয়ে পোড়ার যন্ত্রণা ভুলে গেল গৌরী—মুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ থমকে রইল সেখানে। নিয়মিত সাবান পড়ে না, তিরতিরে কলের জলে স্নান পর্যন্ত হয় না ভাল করে। তবু পুষ্ট নিটোল হাতখানার দুধ-আলতা রঙে এতটুকু মলিনতার ছায়া পড়েনি। একগাছা লাল কাচের চুড়ি আর একটি শাঁখাতেই সেই হাতখানা রাজরানির হাতের মত দেখাচ্ছে।

শুধু গৌরীর চোখেই যে তা ধরা পড়েছে তা নয়, হিমাংশু নিজেই বলেছে কতবার।

'ভাগ্যিস দশ বছর বয়সেই তোকে বিয়ে করে ফেলেছিলুম! নইলে এই রূপ নিয়ে তুই কি ফিরে তাকাতিস আমার দিকে? কপালে লাথি মেরে দিয়ে কোন জমিদারের ঘরে গিয়ে উঠতিস।'

ঠিক কথা। সত্যিই কি দশ বছর বয়েসের গৌরীকে দেখে কেউ ভুলেও ভাবতে পারত যে, এই মেয়ের ভিতরে এত রূপ লুকিয়ে আছে? কেউ কি কল্পনাও করতে পারত লক্ষ্মীছাড়া চেহারার একটা ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে মেয়ের ভিতর থেকে একদিন বেরিয়ে আসবে ইন্দ্রাণী? এ যেন রূপকথার গল্পের ব্যাঙের হঠাৎ রাজকন্যা হয়ে যাওয়া : সেই রাজকন্যা যে হাসলে মানিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তো।

তখন গৌরী নিয়মিত বছরে চার মাস ম্যালেরিয়ার ভুগত। কাঠির মত হাত-পা, লালচে একরাশ জংলা চুল, মড়ার মাথার মত মাংসহীন মুখ, কোটরে ডুবে থাকা দুটো অন্ধকার চোখ, গায়ে ক্যাটকেটে সাদা রং দৃষ্টিকে যেন আঘাত করত। কুশ্রীতাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে গলায় দুলত ঘামের সবুজ কলঙ্ক মাখানো দুটো তামার মাদুলি।

আর ইস্কুল থেকে তাড়া খাওয়া হিমাংশু তখন বাপের সঙ্গে যজমানির অ্যাপ্রেন্টিস খাটত। একটু কুঁজো, সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা পাখির ঠোঁটের মত লম্বা। মাথায় বেয়াড়া ধরনের টেরি, তার সঙ্গে আরও বিসদৃশ টিকি একটা। এমন বিকট বেসুরো গলায় গান গাইত যে, হরির-লুটের কীর্তন থেকে পর্যন্ত তাকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছিল।

এই দুজনের যখন বিয়ে হল, তখন গ্রামে রসিকেরা মন্তব্য করেছিল : একেই বলে রাজযোটক! বাসরঘরে গৌরীর দূর-সম্পর্কের এক বউদি গান গেয়েছিলেন, 'আহা, কিবা মানিয়েছে রে, যেন শ্যামের বামে রাইকিশোরী, আহা কিবা মানিয়েছে রে!'

কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই গৌরী একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগল। তখন দু-একজনের মনে হল, মেয়েটা একেবারে ধূমাবতী নয়—একটু ছিরি-ছাঁদও আছে ওর ভিতরে। আর এর মধ্যে একদিন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করল হিমাংশু; মাথার টিকিটাকে গোড়া থেকে ক্যাঁচ করে কেটে দিয়ে পৈতৃক উত্তরাধিকারের মূলোচ্ছেদ করল, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে রওনা

হল কলকাতায়। দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ির সমস্ত বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার মধ্যেও জোর করে মাত্র আট মাস কাটিয়ে দিলে, তারপর আত্মীয়টির দৃষ্টান্তে ব্যবসায়ে নেমে পড়ল।

ব্যাবসা আর কিছু নয়, বিনা মূলধনে যা করা যায় তাই—দালালি। বাড়ি আর জমির দালালি।

খাটতে হয় বইকি। সকালেই বেরুতে হয় ছাতাটাকে বগলদাবা করে। তারপর মেটেবুরুজ থেকে বরানগর, বালি থেকে ব্যারাকপুর। কোথায় বাড়ি বিক্রি হচ্ছে, কোথায় তিন কাঠা দক্ষিণমুখো জমি সস্তায় পাওয়া যাবে, কোথায় তিনখানা নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, সব কিছু খবর রাখতে হয় হিমাংশুকে।

বলতে গেলে, কলকাতা আর আশপাশের কুড়ি মাইলের মধ্যে যত জমি আর ঘরবাড়ি আছে, হিমাংশু তার জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।

'কী বললেন স্যার? হাজরা রোডের জমি? ওই যে ব্যারিস্টার ঘোষের লালরঙের বাড়িটার লাগোয়া? নেবেন না স্যার— কখনও নেবেন না। আপনি ভালমানুষ বলেই বলছি, ও জমিতে বিস্তর ফ্যাঁকড়া আছে, গাঁটের কড়ি দিয়ে কিনে শেষে বিশ্রী লিটিগেশনে পড়ে যাবেন। কী বললেন, সার্চ করাবেন? অনর্থক আবার অ্যাটর্নিকে এককাঁড়ি পয়সা দেবেন তো? আমি বলছি শুনুন, উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে জেঠামল্ ভোজমল মারোয়াড়ি—'

কিংবা;

'জানি—জানি স্যার, ছাতু চক্কোত্তি লেনের নতুন ফ্ল্যাট দুটোর কথা বলছেন তো? ওর আদত মালিক হচ্ছে হরেরাম গায়েন, ক্যানিঙে মাছের আড়ত আছে। বাড়ির চার্জে আছে ওদের ম্যানেজার কিষ্টপদ সাউ। সে স্যার সাংঘাতিক লোক, একটি রাঘব বোয়াল, তাকে বাগানো আপনার কাজ নয়। দেখাই করবে না হয়তো। তবে আমাকে ভার দিন, দেখবেন সব ম্যানেজ করে দেব। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলব, কিষ্টদা— ও বাড়ি আমার চাই-ই; ব্যস, আর বলতে হবে না। আপনাদের আশীর্বাদে স্যার এই হিমাংশু ঘোষালের—'

সকলের এই আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেড়ানো সহজ কাজ নয়। পার্টির বাড়িতে বাড়িতে ঘোরা আছে, অ্যাটর্নি আর উকিলের অফিসে দৌড়োদৌড়ি আছে। যে পার্টির মন দ্বিধা-সন্দেহে দুলছে, দু-ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে তার মন ভেজানোর দায়িত্ব আছে। একটা ট্রানজাক্শনের সময় দুটো পার্টিকে অ্যাটর্নির অফিসে হাজির করা কিংবা সময়মত কোর্টে এনে জড়ো করা— এ সবও যেন হিমাংশুর পিতৃদায়ের মধ্যে পড়ে। এমনকি ঠিকমত কোর্ট-ফি কেনা হয়েছে কিনা অথবা কেউ ভুল জায়গায় সই করে ফেলল কিনা, সেদিকেও তার লক্ষ রাখতে হয়। কাজ তাতেও ফুরোয় না, তারপর সর্বশেষে আছে কমিশনের টাকা আদায় করা।

কেউ কেউ পুরোটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়, কেউ ছ'মাস ঘোরায়, কেউ কেউ একেবারেই ফাঁকি দেবার মতলব করে। তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাজা ভাঙা সাপের মত ব্যর্থ আক্রোশে গর্জন করে হিমাংশু :

'দেখে নেব, দেখে নেব। গলায় পা দিয়ে আমার পাওনা টাকা আদায় করে ছাড়ব, তবে আমার নাম—'

পাওনা টাকা অনেকের কাছ থেকেই আদায় হয়নি—কিন্তু সেজন্যে নিজের নাম বদল করতে পারেনি হিমাংশু ঘোষাল। দিনকয়েক গালমন্দ করেছে, নিরুপায় অন্তর্জ্বালায় বিড়ি পুড়িয়েছে একটার পর একটা, ব্যবহার করেছে অশ্লীলতম ভাষা, তারপর নিজেরই বিষ-যন্ত্রণায় নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই গৌরীর গায়ে হাত তুলতে গিয়ে তার আশ্চর্য রূপের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই ছাতাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। বেলেঘাটায় একটা নতুন পার্টির সন্ধান মিলেছে, নষ্ট করবার মত সময় তার নেই।

সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে কখনও বেলা বারোটা-একটায় এসে এক মুঠো খেয়ে যাওয়া। কোনও কোনও দিন তাও নয়, একেবারে সেই রাত সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফেরা। দিনের খাওয়াটা সস্তার হোটেলে কিংবা ডালপুরীর দোকানে।

শনি-রবিবার নেই, ছুটিছাটা নেই, পুজো-পার্বণ নেই। এক-আধদিন অসুখ-বিসুখে না পড়লে বাঁধা-নিয়মে কোথাও ছেদ পড়ে না। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কুঁকড়ে কদাকার চেহারা আরও কদাকার হয়েছে হিমাংশুর। নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মত বাঁক নিয়েছে, উঁচু উঁচু দাঁতে পানের ছোপ কালো হয়ে বসেছে, বসন্ত-চিহ্নিত মুখটার দিকে তাকালে যে কেউ সন্দেহ করে—এই লোকটা যখন খুশি খুন করতে পারে। নুয়ে-পড়া ঘাড়টাকে এখন নির্ভুল একটা কুঁজের মত দেখায়।

এত খাটে, তবু সংসার চলে না।

মাঝে মাঝে হিমাংশু সামান্য নেশা করে আসে, কিন্তু তাকে মাতাল বলা যায় না। সেটা বড় খরচ নয়, হিমাংশুকে আর একটা রোগে ধরেছে—সেটা রেসের।

মাঠের ভিতরে যায় না, বাইরেই জুয়ো খেলে। তবু সামান্য আয়ের একটা বড় অংশ ওইখানেই নিবেদন করে আসে হিমাংশু। যেদিন বেশি হারে সেদিন ওর মুখের গন্ধেই টের পায় গৌরী। আর অনেক রাত পর্যন্ত হিমাংশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে : কতদিন মামাবাড়ি যাইনি—দাদুকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে:

গৌরী সরে যায় সামনে থেকে। একতলা জীর্ণ বাড়িটার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছোট ছাতটায় উঠে আসে। খানতিনেক নিচু ছাতের পরেই সাদা রঙের বড় তেতলা বাড়ি একখানা—মল্লিকদের বাড়ি। দোতলায় জানলায় আলো জ্বলছে। জানলার সামনে যে দাঁড়িয়ে, তাকে এখান থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার সোনার চশমা চিকচিক করছে, সিগারেটের আগুনটা দীপিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিমাংশু কথা ভাবে গৌরী। দিনের পর দিন আরও স্থূল, আরও কর্কশ হয়ে উঠছে হিমাংশু। মধ্যে মধ্যে যখন সোহাগ করবার চেষ্টা করে, তখন ওর হাতের ছোঁয়ায় শরীর জ্বালা করতে থাকে। হিমাংশুর আঙুলগুলোকে একটা বিরাট মাকড়সার কতগুলো ক্লেদাক্ত পায়ের মত মনে হয়। অন্ধকারেও নিজের নিটোল শুভ্র হাত দু'খানি সে দেখতে পায়, সেই হাত দিয়ে তার নিজের গলাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। কাঠের রেলিঙে ভর দিয়ে গৌরী দাঁড়িয়ে থাকে, বুকের ভেতর নিজের রক্তের কলধ্বনি শুনতে পায়।

দোতলার জানলায় আগুনের একটা ঝলক ফুটে ওঠে কয়েক মুহূর্তের জন্য। আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে লোকটা। হঠাৎ গৌরীর মনে হয় : আলোর বিন্দু ছড়ানো এই অন্ধকারটা একটা বিরাট জালের মত তাকে জড়িয়ে ধরছে। অসহ্য গরম লাগতে থাকে— হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়—গৌরীর নিঃশ্বাস আটকে আসে। চঞ্চল হয়ে ফিরে আসে সিঁড়ির দিকে। নামতে নামতে মনে হয়, শ্যাওলায় শ্যাওলায় সিঁড়িটা ভরে গেছে, যে-কোনও সময় পা পিছলে যেতে পারে।

ঘরের মেঝেতে তখন কুণ্ডলি পাকানো একটা কুকুরের মত পড়ে আছে হিমাংশু। কোটরে বসা চোখের কোণায় জলের দাগ। যে দাদুকে সাত বছর বয়েসে শেষবার দেখেছিল, তারই জন্যে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেশ আছি, গৌরী ভাবে। তক্তপোশের কোণায় বসে কিছুক্ষণ বিস্বাদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হিমাংশুর দিকে। পুরু কালো ঠোঁটের ফাঁকে পানের রং ধরা দাঁতগুলো ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে। বেশ আছি। বার বার কথাটা মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে গৌরীর। নিজের হাতের মুঠো চোখের সামনে মেলে ধরে যেন ভাগ্যরেখাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই সব গোলমাল হয়ে যায়। নরম গোল হাতখানিকে একটা ফুটন্ত পদ্মের মত মনে হয়। দু'চোখ ভরে মুগ্ধতা নেমে আসে।

হিমাংশুর নাক ডাকতে থাকে। মুখটা আরও খানিক ফাঁক হয়ে গেছে।

গৌরী চমকে উঠল। তারকারিটা প্রায় ধরে আসবার জো হয়েছে। আর দরজার কড়ায় পাগলের মত ঝাঁকুনি দিচ্ছে হিমাংশু। আধমরা আরশোলাটা চিত হয়ে পা নাড়তে নাড়তে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে।

উঠে গিয়ে গৌরী দরজা খুলে দিল।

ভিতরে পা দিয়েই খিঁচিয়ে উঠল হিমাংশু:

'ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি এই সন্ধেবেলায়? সেই কখন থেকে কড়া নাড়ছি—শুনতে পাসনি?'

'ঘুমিয়ে পড়ব কী করে? রাস্তা থেকেই তো চ্যাচানি শুনছি!'

হাতে ছাতাটা ধপাস করে ছুঁড়ে দিয়ে হিমাংশু দাওয়ার উপরে বসে পড়ল। বিড়ি ধরাল। তারপর :

'বড়লোক! ওঃ—অমন বড়লোক ঢের দেখেছে এই হিমাংশু ঘোষাল! নিজের মুখে বললে, টু পার্সেন্ট—এখন কাজ মিটে গেলে বলছে, এই একশ টাকা বকশিশ দিচ্ছি—মিষ্টি কিনে খাও। বকশিশ! আমি চাকর না দারোয়ান যে বকশিশ নেব? ওঃ—বড়লোক!'

বিড়িতে একটা হিংস্র টান দিয়ে পর পর কয়েকটা কদর্য কথা আউড়ে গেল হিমাংশু।

রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিল গৌরী, কী মনে করে ফিরে এল।

'একটা কথা বলব?'

স্বগতোক্তিতে ছেদ পড়ায় হিমাংশু বিরক্ত হল। ভুরু কুঁচকে বললে, 'তোর আবার কী হলো?'

'পরকে তো এত বাড়ি আর জমির ব্যবস্থা করে দিচ্ছো, নিজের জন্যে কিছু করতে পার না?'

হিমাংশু হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে দিলে। সেটা চৌবাচ্চার জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। কর্কশ স্বরে বললে, 'আরে, চেষ্টা কি আর করছি না? ঝোপ বুঝে একখানা কোপ যখন মারব, তখন বুঝতে পারবি। নিউ আলিপুরে কিংবা পার্ক সার্কাসে—'

ছুরির ধারের মত খানিকটা তীক্ষ্ণ বঙ্কিম হাসি গৌরীর ঠোঁটের ওপর দিয়ে খেলে গেল।

'রাজপ্রাসাদের কথা এখন থাক, একটা ভাল বাসার ব্যবস্থাও কি করতে পার না?'

'কেন, এ-বাসাটাই বা এমন মন্দ কী? তোর বুঝি দোতলার ঘর নইলে ঘুম হচ্ছে না? বাড়িটা একতলা, পুরনোও বটে, কিন্তু সুবিধেটা দেখছিস না।' একেবারে সব আলাদা—মায় ছাত পর্যন্ত। কোথাও কোনও ঝক্কি-ঝামেলা নেই, অন্য ভাড়াটের সঙ্গে জল-চানের ঘর নিয়ে ঝগড়া করতে হয় না। এ-সব বুঝি তোর পছন্দ নয়?' সাময়িকভাবে মনের তিক্ত যন্ত্রণাটাকে ভুলে গিয়ে রসিকতার চেষ্টা করল হিমাংশু, 'মেয়েমানুষ তো—স্বভাব যাবে কোথায়? ব্যাঙের মত গলা ফুলিয়ে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারলে ভাত হজম হবে কেন?'

'সেজন্যে নয়।' গৌরী আস্তে আস্তে বললে, 'ছাতগুলো সব গায়ে লাগা— যে-কোনও সময় চোর আসতে পারে—'

'চোর!' হিমাংশু আরও সরস হয়ে উঠল, 'আরে আমার বাসায় একাদশী করতে আসবে এমন বেকুব চোর কলকাতা শহরে নেই। তোর গায়ে তো কয়েকগাছা গালার চুড়ি আছে—বোধ হয় পয়সা চারেক দাম হবে। তবে হ্যাঁ—'হিমাংশু হা-হা করে হেসে উঠল, 'তোকে যদি কেউ চুরি করতে আসে সেটা আলাদা কথা। লাখ টাকাতেও তোর দাম হয় না। দালালির কাজে কলকাতা শহরে কত বড়লোকের বাড়িতেই তো যাই—' লুব্ধ চোখ মেলে স্ত্রীকে লেহন করতে লাগল হিমাংশু, 'সত্যি বলছি, তোর মত রূপসী বউ কারুর ঘরে দেখিনে!'

অকারণে একরাশ রক্ত জমা হলো গৌরীর মুখে, খানিকটা তপ্ত বাষ্পের মত কী যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল মাথার ভেতরে। নিজের হৃৎপিণ্ডে ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পেল গৌরী।

মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল রান্নাঘরের দিকে, হিমাংশু তাকে ডাকল:

'শোন!'

গৌরী ফিরে দাঁড়াল। বারান্দার মিটমিটে আলোটা নয়, গৌরীর চোখমুখে, তার সর্বাঙ্গে আরও কিছু ছড়িয়ে পড়ছে। এই কানা গলির ভেতরেও এক টুকরো আকাশ আছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে। তারই জ্যোৎস্নায় গৌরী স্নান করছে। ডুরে শাড়ির আবরণে ঢাকা রুপোর মূর্তির মত দেখাল গৌরীকে, তার নিখুঁত সুন্দর কপালের উপর যেন মণির মত কী একটা জ্বলছে বলে মনে হলো। কিছুক্ষণ হিমাংশুর চোখে আর পলক পড়ল না।

'গা-ভর্তি গয়না নইলে তোকে মানায় না গৌরী—একেবারে মানায় না!' অভিভূত বিহ্বল গলায় হিমাংশু বললে, 'গয়না পরবার জন্যেই যেন জন্মেছিলি তুই। সামনের ট্রানজাকশনের টাকাটা যদি পাই, সত্যি বলছি—'

জ্যোৎস্নার আলোয় হিমাংশু গৌরীকে এক চোখ দিয়ে দেখছিল, হিমাংশুকে গৌরী দেখছিল আর এক চোখে। পিঠে কুঁজ নিয়ে বসে থাকা হিমাংশুকে অদ্ভুত জান্তব দেখাচ্ছে এখন। আরও কুৎসিত, আরও কদাকার মনে হচ্ছে।

হিমাংশুর কথার শেষটুকু শোনবার জন্যে গৌরী আর অপেক্ষা করল না। এগিয়ে গেল রান্নাঘরে।

সেদিন অনেক রাত্রে, সারাদিনের অসহ্য ক্লান্তির পরে হিমাংশু মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়লে গৌরী দরজা খুলে ছাদে উঠে এল। তখন চাঁদ আরও আশ্চর্য রূপ নিয়েছে, জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল হয়ে রেণুরেণু সোনা বৃষ্টি করে চলেছে। গৌরীর শরীরে সেই সোনা ঝরে পড়তে লাগল। গালার চুড়ি পরা নিরাভরণ হাত দুটির উপর বার বার গৌরীর চোখ পড়তে লাগল, না দেখেও সে অনুভব করতে লাগল—তার দীর্ঘ শুভ্র গ্রীবাকে এই আলোয় কী করুণ আর নিরাভরণ মনে হচ্ছে!

দোতলা বাড়ির জানলায় আবার সিগারেটের আগুন জ্বলল। জ্যোৎস্নার ভিতরে অস্বাভাবিক লাল দেখাল সেটাকে, আলোর শরীরে দপদপ করতে লাগল রক্তবিন্দুর মত।

আর হিমাংশু স্বপ্ন দেখতে লাগল, রেসকোর্সের মাঠে একটা কালো ঘোড়া সকলকে পিছনে ফেলে তীরের মত ছুটে চলেছে, তার পিঠে জকি হয়ে বসে আছে সেই নতুন পার্টিটা, যে তাকে তিন পার্সেন্ট কমিশন দিতে রাজি হয়েছে।

ইদানীং ফিরতে প্রায়ই বেশি রাত হয়। তার উপরে আজ শনিবার ছিল। বিকেলে রেসের মাঠে গিয়েছিল হিমাংশু। গোটা চল্লিশেক টাকা ছিল সঙ্গে, তার প্রায় সবটাই গেছে। বিস্বাদ-বিরক্ত মনটাকে সামান্য একটু রাঙা করে, অল্প অল্প টলতে টলতে হিমাংশু যখন বাড়ি ফিরল, রাত তখন একটার কাছাকাছি।

গৌরী জেগেই ছিল। দরজা খুলে দিলে কড়ায় হাত পড়তেই।

হিমাংশু হাতের ছাতাটা উঠোনেই ছুঁড়ে দিয়ে রকের ওপর বসে পড়ল।

'দুত্তোর, দিনটাই খারাপ! রাস্তায় বেরিয়ে যে কার মুখ দেখেছিলাম প্রথমে!'

গৌরী বললে, 'ওঠো—হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।'

'খেতে ইচ্ছে করছে না—একরাশ তেলেভাজা এখনও যেন আটকে আছে গলায়।' হিমাংশু হেঁচকি তুলল একটা : তাছাড়া সমস্ত মনমেজাজই খিঁচড়ে রয়েছে। কী যে বাজে 'টিপস্' দিলে—টাকাগুলো একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। 'সব জোচ্চোর—বুঝলি, সব জোচ্চোর! দুনিয়ায় ভাল লোকের জায়গা নেই!'

নেশা-জড়ানো চোখ তুলে সমর্থনের আশায় গৌরীর দিকে তাকাল হিমাংশু। আর দেখতে পেল এতক্ষণ পরে—

শুক্লপক্ষ ঘুরে এসেছে আবার। সেদিনের মত উঁকি দিয়েছে এই জীর্ণ বিবর্ণ বাড়ির কয়েক ইঞ্চি আকাশে—ত্রয়োদশীর চাঁদ। আর গৌরীর শঙ্খগ্রীবায় কী যেন ঝিকমিক করে জ্বলছে, চাঁদমালার মত জ্বলছে।

'গলায় ওটা কী পরেছিস তুই? হার পেলি কোথায়?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইল গৌরী, মুহূর্তের জন্যে তাকে পাথরের একটা মূর্তির মত দেখাল। তারপর একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি— পাঁচ সিকে দিয়ে।'

'ওঃ, নকল সোনার গয়না? গিলটির?' হিমাংশু উঠে দাঁড়াল : 'দেখি?'

গৌরী স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হিমাংশুর কদাকার হাতের আঙুলগুলো তার গলা স্পর্শ করল, ভয়ে শিউরে উঠল গৌরী, একবারের জন্যে মনে হল ওই আঙুলগুলো এখুনি তার গলায় নরম মাংসের মধ্যে সাঁড়াশির মত চেপে বসবে। চোখের পাতাদুটো তার বন্ধ হয়ে এল।

হিমাংশু বললে, 'বেড়ে মানিয়েছে হারছড়া! দূর থেকে বোঝাই যায় না, তবে হাত দিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায় বই কি। খাঁটি সোনা এতটা লালচে হয় না—আর একটু সাদাটে হয়।'

গৌরী প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, 'খাঁটি সোনা বুঝি তুমি হাত দিয়ে দেখলেই টের পাও?'

গৌরীর মুখের ওপর একরাশ অম্ল গন্ধ ছড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল হিমাংশু, 'পাই বই কি! না হয় তোকে সোনা-দানা কিনেই দিতে পারি না—তাই বলে খাঁটি-নকল চিনতে পারব না? আজ বারো বছর ধরে কলকাতা শহর চরিয়ে খাচ্ছি রে, হিমাংশু ঘোষালের অত সহজে ভুল হয় না।'

গৌরী বললে, 'থাক ওসব, খাবে এস।'

গৌরী ঘুমিয়ে পড়লেও আজ রাত্রে হিমাংশুর ঘুম এল না। নেশাটা যতই ফিকে হয়ে আসতে লাগল, ততই তার প্রতিক্রিয়াটা তীব্র তীক্ষ্ণ বেদনার মত তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। ওই গিলটির নকল হারছড়াই কী আশ্চর্য মানিয়েছে গৌরীর গলায়! বালিশের পাশে একখানা হাত এলিয়ে আছে, একগাছা লাল চুড়িতে কী দীনতা ফুটে উঠেছে তাতে! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—হিমাংশু ভাবল। যে-করেই হোক কয়েকখানা গয়না গৌরীকে তার গড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সোনা ছাড়া এমন সোনার প্রতিমাকে কি মানায়!

চমৎকার দেখাচ্ছে হারছড়া। তবু ও গিলটির হার। দুদিন পরেই ময়লা হয়ে যাবে— বিবর্ণ পিতলের রং ধরবে। ও শুধু গৌরীর আত্মবঞ্চনাই নয়, ওর মধ্যে কেবল গৌরীর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার বেদনাই মিশে নেই, ও হিমাংশুরও চরম লজ্জা, তার অক্ষম পৌরুষের অবমাননা।

হারটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হিমাংশুর রক্তে সাপের বিষয়ে জ্বালা ধরল। একে একে মনে পড়তে লাগল, কারা তাকে ঠকিয়েছে তার দালালির পাওনায়, কার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত নিজের পুরো টাকাটা সে আদায় করতে পারেনি। হিংস্র চিত্তে হিমাংশু ভাবতে লাগল, এবার তারও সময় এসেছে। তাকেও বাঁকা রাস্তাই ধরতে হবে। সোজা পথে চলবার চেষ্টা করে সবাই ফাঁকি দিয়েছে, এবার সে-ও অন্য উপায় দেখবে।

বারো বছর কলকাতা শহরে দালালি করছে হিমাংশু ঘোষাল। কিছুই তার অজানা নয়।

গৌরীর গলার হারছড়া ঝিকমিক করে জ্বলছে, একরাশ আলোর কাঁটা এসে তার চোখকে

বিদ্ধ করতে লাগল। হিমাংশু উঠে পড়ল, নিবিয়ে দিলে ঘরের আলোটা।

আর একরাশ স্তব্ধ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে হিমাংশুর উত্তপ্ত উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে কতগুলো সরীসৃপ কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওই গিলটির হারটা যেন এক মুহূর্তে তার মনের ভেতরে একটা সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুলে দিয়েছে।

কিন্তু সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুললে কী হয়, সবাই ওস্তাদ সাপুড়ে নয়। অন্তত হিমাংশু ঘোষাল তো নয়ই। সাপ খেলাতে গিয়ে প্রথম চোটে তার নিজের হাতেই ছোবল লাগল।

টাকা পেয়েছিল বই কি হিমাংশু—একশ টাকা। কিন্তু একশ টাকাতেই কি আর একছড়া হার হয়? আর হলেও সরু সুতোর মত হার গৌরীকে কি মানাতে পারে? হাতেও কিছু চাই—অন্তত চারগাছা চুড়ি।

তার উপরে দিনটা শনিবার ছিল। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয় দুরাশা হিমাংশুকে আকর্ষণ করতে লাগল। জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায় যেখানে একশ টাকা কয়েক মিনিটে তিনশ টাকায় পরিণত হয়ে যায়—হিমাংশু সেই ঐন্দ্রজালিক জগতের দিকেই পা বাড়াল।

কিন্তু একশ টাকা তিনশ হল না। বনমানুষের হাড়ের উলটো ভেলকিতে পকেটে সাত আনা পয়সা নিয়ে রাত বারোটায় গলিতে পা দিল হিমাংশু।

ওরা ওত পেতেই ছিল। তিনজন লোক—তাদের দুজন গুণ্ডা গোছের।

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল হিমাংশুর ওপরে। নিঃশ্বাস একেবারে আটকে না দিয়ে যতখানি গলা টিপে ধরা যায়, সেই নিপুণ কৌশলে হিমাংশুকে তারা আয়ত্ত করল। তারপর আত্মীয়তার সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, 'ফোরটুয়েন্টির আর জায়গা পাসনি? টাকা বার কর—'

চোখের তারা কপালে তুলে হিমাংশু গোঁ গোঁ করতে লাগল।

ওই অবস্থাতেই হিমাংশুর গালে আর একজন প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলে।

'জাল মালিক সাজিয়ে ভুয়ো ফ্ল্যাটের টাকা আগাম নেবে? আমার টাকাটা হজম করা এত সোজা?'

যে গলা টিপে ধরেছিল—সে গোটাকয়েক ঝাঁকুনি দিলে হিমাংশুকে—যেমন করে বেড়াল মুখের ইঁদুরকে ঝাঁকুনি দেয়।—'টাকা বের কর বলছি, খুন করে ফেলব নইলে!'

তৃতীয় জন ততক্ষণে পকেট হাতড়ে যা কিছু সব বের করে ফেলেছে। খুচরো পয়সা কটা, ময়লা রুমাল, পুরনো নোটবই আর ক্লিপ লাগানো পেনসিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। হিমাংশুর কুঁজের ওপর কিল বসিয়ে দিয়ে তিক্ত ক্রোধে সে গর্জন করে উঠল, 'কিচ্ছু নেই—সব গিলে খেয়েছে!'

'গলা টিপে বের করব—' আর একবার ঝাঁকুনি পড়ল।

হিমাংশু সমানে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

তার আগেই বেরিয়ে এসেছিল গৌরী। এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। গলা থেকে একটানে হারছড়া খুলে নিয়ে এগিয়ে এল এবারে।

'আমার স্বামী কত টাকা ঠকিয়েছেন আপনাদের?'

লোক তিনটে চমকে উঠল। ফিরে তাকাল একসঙ্গে। গ্যাসের মরা আলোয়, এই মাঝরাতের নির্জন গলিতে এমন আশ্চর্য একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মত মনে হল তাদের।

যে গলা চেপে ধরেছিল, তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। ধুপ করে গলির স্যাঁতসেঁতে কালো মাটির উপরে বসে পড়ল হিমাংশু।

তিনজোড়া চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল গৌরীর দিকে।

'কত টাকা নিয়েছেন উনি?'

যে চড় বসিয়েছিল, সে একটা ঢোঁক গিলে বললে, 'একশ—একশ টাকা।'

হারসুদ্ধ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে গৌরী বললে, 'এটা নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দিন। এর দাম একশ টাকার বেশিই হবে।'

গৌরীর দিকে চোখ রেখেই হারছড়া নিলে লোকটা। তারপর আচ্ছন্নের মতই তিনজন নিঃশব্দে গলি পার হয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলে গেল। একটা কথাও বলতে পারল না। হয়তো তখনও সমস্ত জিনিসটা ওরা বিশ্বাস করতে পারছিল না, এমন অপূর্ব এমন অবিশ্বাস্য স্বপ্নের জালটাকে ছিঁড়তে চাইছিল না কথার আঘাত দিয়ে।

হিমাংশুকে মাটি থেকে টেনে তুলল গৌরী, একরকম বয়েই নিয়ে এলো বাড়ির মধ্যে। হিমাংশুর গোঙানি থেমে গেছে তখন, চাপা গলায় কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

হিমাংশুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গৌরী তার মাথাটা টেনে নিলে কোলের মধ্যে।

'ভয় নেই তোমার, ওরা চলে গেছে।'

হিমাংশু অবরুদ্ধ গলায় বললে, 'আমার জন্যে তো তোর সব গেল গৌরী, গিলটির হারছড়াও গেল! কিন্তু ওরা তো অত কাঁচা নয়, একটু পরেই টের পাবে, তখন তো ফিরে আসবে আবার!'

দাঁতে দঁত চেপে গৌরী আবার বললে, 'আসে তো দেখা যাবে। তোমার ভয় নেই, আমি আছি।'

হিমাংশু ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পিঠের কুঁজটা ওঠাপড়া করতে লাগল ঢেউয়ের মত।

'তুই আমাকে এত ভালবাসিস গৌরী, আমি তোকে কিছুই দিতে পারলুম না, কিছুই না!'

গৌরীর দাঁতের চাপ ঠোঁটে এসে পড়ল, রক্ত গড়িয়ে পড়তে চাইল ঠোঁট দিয়ে। হারটা গিলটির নয়, কিন্তু যে ভালবাসার ভিতরে নিজেকে অসহায় শিশুর মত ছেড়ে দিয়ে হিমাংশু এমন করে কাঁদছে, তার গিলটি করা নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে গৌরীর চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল।

দুলারহিন্‌দের উপকথা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এই একটা দেশ। সব চাইতে কাছের রেলপথ পঁচিশ ক্রোশ দূর দিয়ে গেছে। বহু বহু ক্রোশ চললেও কৃষকের দেশ শেষ হয় না। মকাই-জোয়ারের দেশ। বৃত্তের পরিধির মত পাহাড় এবং শাল-মহুয়ার বন। সেই পাহাড় এবং অরণ্য যদি পায়ে হেঁটে পার হও তবে সভ্যতার প্রান্তগুলি চোখে পড়তে পারে।

সেই দেশে ভুখন কৃষকের জমিতে মজুরের কাজ করে, ভইসা টহলায়।

ভুখন একা নয়, তার সঙ্গে দুলারহিন্‌ও থাকে। ভুখন আর দুলারহিন্‌ নিজেদের ভাইবোন ব'লে ভাবতে শিখেছে। ওরা সহোদর নয়। ভুখনের মায়ের মৃত্যুর পর ভুখনের বাবা সর্বস্বান্ত হ'য়ে যাকে ঘরে এনেছিল তারই ওপক্ষের মেয়ে কিংবা বেটা-বউ দুলারহিন্‌।

দুলারহিন্‌ যখন এই কুঁড়েটিতে প্রথম আসে তখন ভুখনের বয়স ছ'বছর, দুলারহিন্‌ের নিজের আট/ দশ হবে। দুলারহিন্‌ ভুখনের বাবা ও তার সৎমাকে ভুখনের মতই বাবা-মা বলত। ভুখনের যখন আট বছর এবং দুলারহিনের বছর বারো প্রায় একদিনেই এই কুঁড়ের বাপ-মা প্রাণী দুটি বিদায় নিল। এখন এমন কেউ নেই যে ওদের সম্বন্ধের জট খুলে দিতে পারে।

ভুখনের বয়স এখন একুশ-বাইশ হ'লো, দুলারহিনের আরও দু'বছর বেশি। প্রায় পনেরো বছর গড়িয়ে গেছে ওদের জীবনের। যাদের সম্বন্ধ নিয়ে এত খুঁটিনাটি তাদের জীবনের পনেরোটা বছর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কি যুক্তি? বিশ্বাস কর, এ সময়ের মধ্যে কিছু ঘটেনি।

ভুখনের চেহারা নিম্ন প্রকারের : তামা ও ছাই রঙে মিশানো একটা রঙের ত্বক। স্ফীতপেশী দেহ, মস্ত বড় মুখে ছোট একটা নাক। মাথার চুলগুলি ধুলোয় কটা, আর সেই খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট চুলের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গোছা কড়কড়ে টিকি। পরনে দেড়হাত চওড়া কাপড়ের ফালি কতকটা পালোয়ানী ঢঙে পরা।

দুলারহিনের স্বাস্থ্য ভাল। বয়সের চাপে ত্বক যেন ফেটে যাবে। তার মুখাবয়বেও শাস্ত্রোক্ত সৌন্দর্য আছে বলা যায় না। গত পনেরো বছরের একটা মাত্র ঘটনা— তার বসন্ত হয়েছিল। দাগ রেখে গেছে। তার ফলে ফুটকিতে আচ্ছন্ন তার মুখ বেলে পাথরের বহু পুরাতন প্রতিমূর্তির মত।

ওদের সংসার মন্দ চলছিল না। সংসারে লোক বাড়বে এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। ভুখন বিয়ে করতে পারছে না, অন্তত তিন কুড়ি টাকা লাগবে যে কোনওরকম একটা বিয়ে করতে, তার কমে কে মেয়ে ছাড়ে কিংবা বোন। সদ্ভাবেই দিন যাচ্ছিল।

এমন নয় যে ঝগড়া হয় না, হয়, ইতিমধ্যেই একদিন হ'য়ে গেল। একই কুঁড়ের মেঝেতে খেজুর পাতার দু'খানা চাটাই পেতে শোওয়া। বাপ-মা চ'লে যাওয়ার পরে ভুখন বহুকাল দুলারহিনের বক্ষলগ্ন হ'য়ে ঘুমিয়েছে, ইদানীং ছোট জায়গায় শুতে ভুখনের অসুবিধা হতো, অতবড় হাত পাগুলোকে দুমড়ে ছোট করে সে এখন ঘুমোতে পারে না। কিন্তু এক রাত্রিতে সে খুব বেকায়দায় পড়ে গেল। চাল ফুটো করা, বর্ষায় তার অংশের মেঝেটুকু কাদা হ'য়ে আছে। সে ভাবল দু'একরাত তার মস্ত শরীরটাকে গুটিয়ে কোনও প্রকারে দুলারহিনের পাশেই কাটিয়ে দেবে, কিন্তু আপত্তি তুলল দুলারহিন্, নেহিন্।—দেখ, দুলারী, দুলারি কর না। এমন অবস্থা নয় আমার একদিনে চালটা সারিয়ে নেব। দু'একদিনই তো অসুবিধা হবে আমার, সে কিছু নয়।

দুলারহিন্ ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কুঁড়ের শুকনো জায়গাটায় ভুখনের চাটাই পেতে দিয়ে ঘরের ঝাঁপ তুলে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। রাগে ভুখনের ঘাড়ের শিরাগুলি অবধি ফুলে উঠল। লাফিয়ে গিয়ে দুলারহিনের কাঁধ দুটো তার দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরল। দুলারহিন্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, ছোড়্দে, বহিনকো ছোড়্দে। কি আশ্চর্য! বহিন বলেই না ভুখনের এত রাগ—অভিমান। এই বাদলা রাতে বাইরে থাকা কত কষ্টের তা বোঝে ব'লেই না এত পীড়াপীড়ি করা। বেটাছেলে বাড়ির মালিক ভুখনের দায়িত্বজ্ঞানকে অপমান করা দুলারহিনের উচিত নয় অন্য বিষয়ে সে যত ছেলেমানুষি করতে চায় করুক।

—যা ইচ্ছা হয় কর, শুধু কাঁদিস না।

হাল ছেড়ে ভুখন শুয়ে পড়ল।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলে না বেটাছেলের। কাঁচা কাঁচাই হোক, আহারের সংস্থান না করেও কাঁচা কাশ কেটে বোঝা বোঝা মাথায় ব'য়ে এনে স্তূপাকার ক'রে ফেলল ভুখন কুঁড়ের সামনে। তারপর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, অনেক রাত অবধি অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ব'সে নতুন করে চাল ছাইল ভুখন।

দুলারহিন্ একদিন বলল, ঘর ছেয়েছিস, এবার শাদি কর।

—তাহ'লে তুইও একটা কাস্তে নিয়ে চল।

—কাস্তে দিয়ে আবার কি হবে?

—কেন দু'জনে মেলা মেলা ঘাস কাটব।

—ঘাস কাটবি কেন? আমি তো তোকে শাদি করতে বললাম।

—আমি ভাবলাম ও দুটো একই কাজ।

কিন্তু সহজে ভলবার মেয়ে নয় দুলারহিন্। যখন তখন একই কথা বলতে লাগল। অবশেষে একদিন বলল, পৃথিবীতে চাঁদ আর সূরয ছাড়া আর কে আছে তাদের?

বাপ-মা কোথায় গেল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বেলায় ভুখন যদি বিয়ে করে, কম দামে মেয়ে পাবে, বুড়ো হ'লে বুড়ি ছাড়া আর যা পাবে তার জন্য চড়া দাম দিতে হবে না? আর সব কথার উপরে বড় কথা : একজনের মৃত্যুর পরে আর একজনের কি উপায় হবে যদি ইতিমধ্যে তৃতীয় একজন এসে আপন না হয়ে যায়?

মুখ গম্ভীর ক'রে বুড়োদের মত চিন্তাক্লিষ্ট মুখ করে ভুখন শুনল সব যুক্তি, তারপরে বলল, টাকা যদি জোগাড় হয় শাদি করব, কিন্তু বউ যদি তোর সঙ্গে মারামারি করে তবে আমি কিন্তু দু'জনকেই পিটব।

টাকা জমানোর চেষ্টায় মানুষ কি না করে? এমনকি হঠাৎ মানুষ নিজের একটা বিশেষ গুণও আবিষ্কার করতে পারে। এইরকমভাবে ভুখন কাঠের পুতুল গড়ায় মন দিল।

ওস্তাদের বাড়িটা ছিল ভুখনের ঘরের কাছেই। ভুখন মাঝে মাঝে শীতকালে আগুনের কাছে বসতে তার বাড়িতে যেত। বসে বসে দেখতে দেখতে ভুখন একটা পুতুল একদিন বানিয়ে ফেলেছিল। কাঠের এক চিড়িয়া। টাকা জমানোর কথায় ভুখনের মনে হ'ল পুতুল তৈরির কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে সে মনস্থির ক'রে ফেলল। ওস্তাদ যে সব বড় বড় পুতুল তৈরি করে সেইসব চিড়িয়া, জানোয়ার, আদমি-জনানা সে ছোট ছোট ক'রে তৈরি করবে। বিক্রির ভার ওস্তাদের।

—আর শোন, দুলারহিন্, এ পয়সা দিয়ে খাওয়া চলবে না। খাওয়ার জন্য সকাল-সাঁঝ ক্ষেতির কাজে যা হয় তাই।

পুতুল বিক্রির খুচরা পয়সাগুলি রোজ সন্ধ্যায় গুনতে বসে দুজনে। একদিন থাক থাক ক'রে সাজিয়ে রেখে ভুখন চিৎকার ক'রে উঠল যে দুলারহিন্ ভয়ে বাঁচে না। ছুটে কাছে এসে ভুখন বলল, ষোড় ভৌ, কুড়িসে চার কম, স্রিপ চার।

ওদের জীবনে ঠিক এরকম সময়ে একটা মোড় নিল। সন্ধ্যায় ব'সে কথা হচ্ছিল। ভুখন বলল, যব্ তক্ শশুরা লোহার বাক্সা একটা না দেবে, ততক্ষণ কোনও শশুরাকে পুতই খিঁচুড়ি খাবে না। অর্থাৎ বিবাহ-ব্যাপরটা সমাধা হ'তে সে দেবে না।

অযুক্তির কথা নয়, ভাবল দুলারহিন্ হয়তো সেই রূপকথার কনোয়ারের মত ভুখনের ভাগ্য নয়, হয়তো কোনও মেয়ের বাপ মেয়ে আর টাকা নিয়ে সাধাসাধি করবে না, যেমন সেই রূপকথার নায়কের বেলায় ঘটেছিল, তা হ'লেও ভুখনের পক্ষে একটা লোহার রংদার বাক্স চাওয়া অন্যায় নয়। তবু বিয়ের ব্যাপারে একটু হাসি-ঠাট্টা করতে হয়, দুলারহিন্ বলল, তুইতো ভেরুয়া হ'য়ে যাবি, টাকা দিয়ে বউ আনবি, আর ফির হুঁ, হুঁ, সে দেখা যাবে। তারই খিদ্‌মত করবি। সেই রাত্রিতেই কিংবা তার দু'এক দিন বাদে জ্বর হল দুলারহিনের। অল্প অল্প জ্বর প্রথমে, সেই জ্বর দিনকে দিন বাড়তে লাগল। একদিন সারারাত দুলারহিন্ বেহুঁশ। সেদিন সকালে ওস্তাদের কাছে ভুখন শুনে এসেছে তাদের গ্রাম থেকে চার-পাঁচখানা গ্রাম পার হ'য়ে গেলে যে বড় গ্রাম সেখানে এক ওস্তাদ-ডাংদার আছে সে নাকি সব জ্বার ভাল

করতে পারে। তার মনে হ'ল কি অন্যায়ই সে করেছে এতদিনেও ডাংদার না এনে। ডাংদার কথাটাই সে জানতো না—নিজেকে প্রবোধ দেবার মত এ যুক্তিও তার মনে এল না। দুলারহিনের পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে তার বার বার মনে হ'তে লাগল বিশঠো রূপয়া যার ঘরে তার দুলারহিন্‌ নাকি এমনি ক'রে মরে।

ভোর ভোর রাতে ভুখন উঠে দাঁড়াল, দুলারহিনের অজ্ঞান দেহের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, দেখ, দুলারী, দুলারি করিস না। ডাংদার আনতে চলল তোর ভুখনোয়া; যদি ফাঁকি দিয়ে ম'রে যাস—

চোখের জল মুছতে মুছতে ডাংদারের গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল ভুখন। ডাংদার এসেছিল। বিশঠো রূপয়াতো গেছেই আর বিশঠো তার কাছে ধার হয়েছে। সে ধার আবার বছরে পান রূপয়া ক'রে বাড়বে; অর্থাৎ ভুখন সেই পুরনো জালে জড়িয়ে প'ড়ল। তা হোক দুলারহিন্‌ তো বেঁচে আছে।

আগের মতই তারা সংসার করতে শুরু করল। মাঝের কয়েকটা দিন যেন স্বপ্ন একটা নতুন আশার উত্তুঙ্গতা থেকে আছড়ে পড়ার ব্যাপারই যেন কতকটা।

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে দুলারহিন্‌। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার একদিন সে বলল, তুই তো আর পুতুল বানাস না?

—কি হবে?

—শাদি করবি না?

—ডাংদারের সঙ্গে শাদি করলাম যে।

দুলারহিন্‌ লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

আবার চেষ্টা করার কথা ভাবতে গিয়ে ভুখনের যে অনুভবটা হ'লো সেটা এই: ছ'মাসের যত্নে যে বিশ টাকা জমে সেটা বিশ টাকা নয়, ছ'মাসের ঘর্মাক্ত শ্রমও বটে।

আর সেই ঘর্মাক্ত শ্রমকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোনও বুদ্ধিমানই করে না।

তার উপরে এল সেই ডাংদার যাকে রোগী দেখতে আনতে গিয়ে ভুখনকে পায়ে লুটিয়ে পড়ে সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিল। সে এল না ডাকতে।

—ভুখন আছো, ভুখন?

—হ্যাঁ, সব ভাল আছি আমরা, দুলারহিন্‌ তো দিনকে দিন মোটা হ'চ্ছে?

একটি নিটোল হাসি ফুটল ভুখনের মুখে।

—বেশ, তা হলে সুদের টাকা ক'টা দাও। কোথায় পাবে? সে কি আমি ব'লে দেব? টাকা যতক্ষণ না দিচ্ছ আমি নড়ছি না। শহর চেন, শহর? সেখানে থাকে পুলিশ, তাদের ডেকে পাঠাব। ঘরে দু'চার পয়সা ছিল এনে দিল ভুখন। সব শুনে দুলারহিন্‌ চুপ ক'রে রইল।

ছ'মাস পরে আবার ডাংদার এল। আড়াই টাকা পাওনা হয়েছে, দিতে হবে।

—আড়াই পয়সা নেই।

—দেখ ভুখন, ধার বাড়িও না, বাড়তে বাড়তে শেষে এমন হয় যে কোনও দিনই

ও আর শোধ দেয়া যায় না। বেশ, আড়াই টাকা যখন দেবে না তখন আমার বিশ টাকা দিয়ে দাও, আর তার সঙ্গে ওই আড়াই টাকা।

—কি হবে যদি আমি না দি?

—যদি তুমি না দাও? (ডাংদার কথাটা উচ্চারণ করল যেন আর একবার কানে শুনে অর্থটা পরিষ্কার করার জন্য।) বেশ যদি তুমি না দাও, ভগবান আছে মাথার উপরে। টাকা দেবে ব'লেই, ওষুধের দাম তো, তোমার দুলারহিন্‌কে ভাল করেছে ভগবান, টাকা যদি না দাও তা হ'লে।...

—হেই ডাক্তার, খারাপ বোল না। টাকা আমি দেব, তুমি কিছু বোল না।

ঝাঁপের আড়াল থেকে সব শুনছিল দুলারহিন্‌।

ভুখন ঘরে ঢুকতেই সে বলল, ডাংদারকে তুই আর টাকা দিবি না।

—টাকা দেব না তো তোর যদি আবার অসুখ হয়।

—টাকা তুই খরচা করতে পারবি না।

—টাকা আমার, যা ইচ্ছা আমি করব।

—কেন করবি? আমি তোর কে? তোর আপনার বহিন যে আমার জন্য টাকা বরবাদ করবি?

—কি বললি?

—না, একশ'বার না। তোর সৎমায়ের বেটা-বউ আমি।

—আমার কেউ না?

—না, না।

ভুখন কথা বলল না, ঘর ছেড়ে চ'লে গেল।

কিন্তু ঝগড়া করার জন্য হ'লেও মুখোমুখি হতে হ'ল তাদের। অবশেষে পুরুষালি প্রীতির চোখ-রাঙানির কাছে দুলারহিনের মেয়েলি স্নেহ হার মেনে স্বীকার করল, আর সে নিজের অসুখের কথা বলবে না, আর কখনও আত্মীয়তা অস্বীকার করবে না, তবে সে রাত্রিতে ভুখন রোটি খেল।

খুব ভাল জোড়া লাগলেও কখনও কখনও অস্পষ্ট দাগ থেকে যায়—দুলারহিনের কথাটাও সেই দাগ।

দুলারহিনের স্নেহ বাইরে হার মেনে গভীর হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। সেই গভীর স্নেহ তার মাথায় বুদ্ধি এনে দিল। সে স্থির করল নিজে আগে শাদি করে সেই টাকা দিয়ে ভুখনের শাদি দেবে। নিজে শাদি ক'রে টাকা পাওয়া সহজ নয় যদি এপক্ষ থেকে কোনও জোয়ান বেটাছেলে দাম না চড়ায়। এদিকে ভুখনের বুদ্ধি যদি না খেলে দুলারহিন্‌ নিজেই তাকে বুদ্ধি দেবে। অবশ্য জোয়ান কোনও বর হবে না তার, মুখে যে রকম দাগ; আর তাদের কেউ রাজি হলেও গরজ দেখাবে না টাকা দিয়ে। কয়েকদিন নিজের মনে কথাটা তোলপাড় করে একদিন দুলারহিন্‌ সেটাকে প্রকাশ করল।

ভুখন শুনে হো হো করে হেসে উঠল, তোর শাদির ইচ্ছা তাই বল।

—না হয় তাই হ'ল। তুই তা হলে আগে আমার ইচ্ছা মিটিয়ে দে। ডাংদারের টাকা, তুই সেই টাকা শোধ কর। তারপরও যে ট'কা থাকবে সেগুলো গেঁথে আমারই না হয় হার বানিয়ে দিস।

দিন যেমন যায় তেমনি যায়। ভুখনের চাড় নেই। তার উপরে নতুন একটা উপসর্গ জুটেছে। পয়সা পেলেই দুলারহিনের জমাতে ইচ্ছা করে, আর ভুখনের খরচ করতে। এরই মধ্যে একদিন ওস্তাদকে দিয়ে একজোড়া কাপড় আনিয়ে নিয়েছে ভুখন। শুধু কি তাই, নিজের খানা ছুপিয়েছে হলুদ রঙে আর দুলারহিনের খানা পাতলা লাগে। সারাদিন সে ক্ষেতির কাজ ক'রে মাঝ রাত অবধি ব'সে ব'সে কেরোসিনের কুপির আলোয় পুতুল খোদাই করে, তার শখকে কিছু বলা যায় না। দুলারহিন্‌কে তাই চুপ ক'রে থাকতে হয়।

কিন্তু চুপ করে কতই বা থাকা যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভুখন ঘরে ঢুকে বলল, দেখি, এদিকে আয় তো, আরও কাছে আয়।

দুলারহিন্ ভেবে অন্ত পায় না। হাত জোড় করে সে, প্রায় যেন আড়ষ্ট হ'য়ে যায়।

ভুখনই এগিয়ে এল।

—আরে ছাড় ছাড়, হাত জোড় ক'রে মিনতি করতে লাগল দুলারহিন্, ততক্ষণে কাঁসার মল্‌জোড়া দুলারহিনের পায়ে পরিয়ে দিয়েছে ভুখন।

—এ তুই করলি কেন?

—হামার হিচ্ছা।

প্রতিদান না দিয়ে কি ক'রে থাকা যায় বলো। একদিন সকালে দুলারহিন্ একটা অচিন্তনীয় কাজ ক'রে ফেলল। লাল শাড়িখানা পরে পায়ে কাঁসার মল দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল সে ভুখন যখন ভইসা টহলাতে গেছে। আর ফিরবে না দুলারহিন্, যতদিন না টাকা আনতে পারে সে। যেখানে যত স্বজাতীয় আছে ডেকে ডেকে সকলকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা কেউ বিয়ে করতে চায় কিনা তাকে। যদি কেউ বলে : বিয়ে করব, অমনি সে বললে, কত টাকা দেবে? যদি বলে পাঁচশ', অমনি সে বলবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো, অত কমে হবে না।

নিজের গ্রাম ছাড়তে ছাড়তে সূর্য প্রখর হ'য়ে উঠেছিল, তবু দুলারহিন্ তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলেছে, এখনও ভিন্‌গ্রামের স্বজাতীয়দের সঙ্গে দেখা হয়নি। সাহস খানিকটা যেন ইতিমধ্যে কমে এসেছে। দুপুর নাগাদ ভিন্‌গ্রামের স্বজাতীয় বস্তিতে পৌঁছাল সে। এইবার তাকে বিক্রি শুরু করতে হবে। প্রথম দেখা হ'লো একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে, জল তুলছিল সে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। দুলারহিন্ কুয়োর পাশে গিয়ে আঁজলা পেতে দাঁড়াতেই সে জল খেতে দিল। তারপরে প্রশ্ন করল, কোন জাত কোথায় ঘর। দুলারহিন্ পরিচয় দিল।

—একা একা কোথায় যাচ্ছো?

দুলারহিন্ এদিক-ওদিক চেয়ে নিচু গলায় নিজের উদ্দেশ্য বলে বলল, সাহায্য করতে পার বহিন?

বউটি হেসে বাঁচে না। একা একা কত আর হাসা যায়, একসময়ে থামতে হল তাকে। তখন সে বলল, তুমি খুব বোকা বহিন, আমি হ'লে ঘরের বাইরে যেতাম না; দুজনেরই শাদি দরকার, কি করতাম বলো তো?

দুলারহিন্ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল ভাল ফিকিরটা শোনার জন্যে, বউটি হেসে হেসে চোখ ছোট-বড় ক'রে বলল।

দুলারহিন্ কাঁদো কাঁদো মুখে তার দিকে একবার চেয়ে হাঁটতে শুরু করল। মনে মনে সে স্থির করল, কোনও মেয়ের কাছে সে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না। ছিঃ ছিঃ। মেয়েছেলের জিভে হুল আছে।

গ্রাম ছাড়তে দুপুর শেষ হ'ল। শরীরের সঙ্গে মনও ক্লান্ত হয়েছে। ক্লান্ত মনে সে ভাবল : এত যে সে করছে, সব কি মিছে নয়? ভুখন তো একবারও জোর ক'রে বলেনি সে শাদি করতে চায়। কিন্তু আর একখানা গ্রাম এসে পড়েছে সামনে, এমন সময়ে আবার সাহস ফিরে এল। না হয় নাই বলেছে সে, তাই ব'লে কি তার ইচ্ছা পূরণ করতে হবে না? আর না বলার কথা বলছ? বলে না ব'লেই তার সাধ মেটাতে আরও সাধ যায়।

*সামনের বড় বড় কাশের ঝোপে ভরা মাঠখানি পার হ'লে আর একখানি ভিন্-*গ্রাম। আলো মুছে যাওয়ার আগেই এই গ্রামে পৌঁছে একটা নিষ্পত্তি করতে হবে। এখনই আলোর রং প্রায় বাদামী হ'য়ে উঠেছে। এই ভাবতে ভাবতে জোরে জোরে কয়েক পা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে বলল, কে যায়? দুলারহিন্ ফিরে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছ একা?

লোকটি এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়াল।

—বাড়ি থেকে রাগ ক'রে এসেছ নাকি, বাপ-ভাই বিয়ে দেয় না ব'লে?

—না, নিজেই আমি বিয়ে করতে বেরিয়েছি।

—সাবাস্! আমার সঙ্গে করবে?

—আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুড়ি তো বটেই। ভাইকে টাকা দেব আমি।

—চার কুড়ি? বেশ তাই হবে। আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও ভাইকে টাকা দিতে ইচ্ছে হয়, দেখা যাবে।

—না, টাকাটাই আগে দিতে হবে।

—ও, খুব দাম বাড়াতে পার যা হোক। আগে দেখি কত দাম হ'তে পারে। এই বলে দুলারহিন্'র আঁচলের একপ্রান্তে চেপে ধরল লোকটি।

কিছুক্ষণ থেকেই দুলারহিনের মাথায় একটা কষ্ট হচ্ছিল। একটা গোটা দিনের রোদ গেছে মাথার উপর দিয়ে। তবু জেদ করে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার চোখের পিছনে ক্লান্ত মস্তিষ্কের যে ধোঁয়াটে ছাপটা পড়েছিল তার চাহনিতে

সেটাই বিবশ তন্ময়তায় মিথ্যারূপ নিয়েছিল। বোধহয়, সেটাই লোকটির এত আকর্ষণ। কিন্তু কাঁধের কাছে আঁচলটায় টান পড়তেই দুলারহিনের পা দু'খানাও বিবশ হ'লো। সে লোকটির গায়ের উপরে প'ড়ে গেল, আর সেখান থেকে মাটিতে। তখন তার কষ বেয়ে ফেনাও গড়াতে লাগল।

যখন ঘুম ভাঙল দুলারহিনের, সম্বিত ফেরার সময়ে তাই মনে হ'ল তার, তখন মাঝরাত। চারিদিকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। লোকটির কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে স'রে বসল। কিন্তু লোকজন দূরের কথা, ধারে কাছে বোধহয় পোকামাকড়ও নেই, নতুবা ঝিঁঝিটা অন্তত ডাকত। আর বহুদূর থেকে কিসের একটা অদ্ভুত অর্থহীন, শব্দহীন শব্দ আসছে। ভয়ে দুলারহিনের নিঃশ্বাস বড় বড় হ'য়ে পড়তে পড়তে সেটা অবশেষে চাপা কান্নায় পরিণত হলো। কাঁদতে কাঁদতে মনে হলো যেদিন বাপ-মা চলে যায় সেদিনও এমনি কেঁদেছিল সে, কিন্তু তখন শক্ত পৃথিবীর বদলে বুকের কাছে সে দৃঢ়তা অনুভব করেছিল সেটা প্রায় শিশু ভুখনের ধূলিমলিন মুখখানা। নিঃশেষে শূন্য বুকে বোধহয় বেশিক্ষণ কাঁদাও যায় না। সেই ভুখনের মঙ্গলের জন্যই আজ সে পথে বেরিয়েছে।

চাঁদ উঠল। সেই আলোতে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মেলে দুলারহিন্‌ দেখল সে কাশবনের মধ্যেই প'ড়ে আছে। লম্বা-লম্বা ছায়া সজীব হ'য়ে দুলছে চারিদিকে। রাত্রির শব্দহীন ভাষা এবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে হেসে উঠল যেন।

হুরার?

কিন্তু দুলারহিন্‌ ভয় পাবে না। ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে তবু চোখের জল মুছে সে সোজাসুজি দেখতে চেষ্টা করল। যদি হুরারই হয় হোক। বাধা দেবে না, পালাবে না, সর্বাঙ্গ আঁচল দিয়ে ঢেকে গলাটা বাড়িয়ে দেবে। হুরারদের তো আঁচলের উপরে লোভ নেই। যদি খুবলে খুবলে খায়ও ততক্ষণ দেহের দুর্গতি দেখার জন্য প্রাণ থাকবে না। গলাটা সব প্রাণীরই সব চাইতে দুর্বল অংশ শরীরের। হঠাৎ ভুখনোয়ার কথাটা যেন মনে পড়ছে। আর একবার তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হ'তো। আর রান্না করে রেখে আসেনি সে। খেতির কাজ ক'রে ফিরলে বড় ক্ষুধা পায় বেটাছেলেদের। তখন মুখের সামনে খাবার না পেলে রাগই হয় পুরুষদের। কিন্তু তারপর সে হয়তো দুলারহিন্‌কে খুঁজতে এ পথেই আসবে। হয়তো এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। আর যেমন লোক, হয়তো সঙ্গে একটা লাঠি পর্যন্ত আনেনি। আর দেখ তেমনি ভয় এদিকে হুরারের। এই দুশমনের ব্যূহে নিরস্ত্র ভুখন। চোখের জলে মজ্জিত হ'য়ে আবার সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হা ভগবান, হা ভগবান, সে নিজেই তো ভুখনের মৃত্যুর কারণ।

ভুখন ঘরে ফিরে প্রথমে ভাবল দুলারহিন্‌ অবেলায় জল আনতে গিয়েছে। রাগ হ'তে লাগল তার প্রতীক্ষার সময় যত দীর্ঘ হ'ল। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে গেল তখন সে কুঁড়ের ভিতরে দুম দুম করে পা ফেলে বেড়াতে লাগল।

রাত যখন প্রথম প্রহর, তখন সে ভাবল : ঠিক তাই হয়েছে, ও গিয়েছে নিজের

শাদি ঠিক করতে। কোন বাপু, আমি কি বলেছিলাম ডাংদারের টাকা আমি শোধ করতে পারব না। তুমি শোধ কর শাদি ক'রে? না খেয়ে আছি তা যদি দেখতে না এলে, তবে তোমার টাকা নিয়ে এস দেখব মাথা কোথায় রাখো।

কিছুক্ষণ পরে নিজের মাদুরখানা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে নিয়ে শুতে গিয়ে সে ভাবল : আসলে ওসব কিছুই নয়, তোমার নিজেরই শাদি করার ইচ্ছা, একা-একা ভাল লাগছিল না আর। আমি তোমাকে কখনও বলেছি, দুলারহিন্ আমি বউ চাই। মনে হবে না কেন, সব পুরুষের মনেই হয়। তাকে জলের ধারে দেখে আমিও এগিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। সেও হেসে, রাগ ক'রে কথা বলেছিল। কিন্তু আমি তো জানি বাপ-ভাইয়ে মিলে তার ছ'জন আছে, দু'কুড়ি টাকার কমে তারা রাজি হবে না। আমি হাতজোড় করে বলেছিলাম—মাপ কিজিয়ে। কিন্তু তার কথা তোমাকে বলেছি? বেশ তো গিয়েছ, তোমার ভাল হোক। প্রায় মাঝরাতে অনিদ্রিত ভুখন ঝিঁঝির ডাক শুনতে শুনে চমকে উঠল। সেই নীরব রাত্রির রহস্যময়ী ভাষা। চকিতে সে উঠে দাঁড়াল। দুলারহিন্ যদি অন্ধকারে আশ্রয় না পেয়ে থাকে।

আর কিছু ভাববার সময় পেল না ভুখন। দরজার ঝাঁপ ভেঙে কোনওক্রমে রাস্তায় প'ড়ে অন্ধকারে ছুটতে লাগল সে, দু-লা-র-হি-ন্।

দুজনের দেখা হ'ল সংযোগ হারানোর দ্বিতীয় দিনের দুপুরবেলায়। দুলারহিন্ তখন ক্লান্ত দেহে তার চাইতেও ক্লান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথ ধরেছে। চোখমুখ বসে গেছে, তামাটে চুলগুলি উড়ছে বাতাসে।

দুলারহিন্ বললে, তুই এলি কেন আবার, আমিই তো ঘরে যাচ্ছিলাম।

ভুখনের মুখে দু'হাজার দাঁত হো হো করে হেসে উঠল, এলাম এমনি।

সামনে একটা খাল, নদীর মত তাতে স্রোত। সেটাকে পাশে করে কিছুদূর গেলে একটা গ্রাম। যখন ধুলো উড়ছে না তখন সেখানে একটা গোয়ালার দোকান চোখে পড়ছে। ওখানে যা হোক কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে।

ভুখন বলল, তুই স্নান করে নে, চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। দুলারহিনেরও খুব ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু ইতস্তত করতে হ'ল তাকে।

ভুখন বলল, এক ক্রোশের মধ্যে কোনও লোক নেই।

তীরে শাড়ি রেখে তখন দুলারহিন্ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানকৌড়ির মত।

—বাস্। আর গেলে ডুবে যাবি।

ডুবে যাওয়ার ভঙ্গিতেই তবু আর একটু সাঁতার কেটে, ভুখনকে ভয় দেখিয়ে তারপর দুলারহিন্ উঠল। তীরে দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়ো ক'রে চুলের জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে ভুখনকে স্নান করতে পাঠাল। স্নান শেষে তীরে উঠে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুলারহিন্ বলল, যদি ডুবে যেতাম।

—আমিও ডুবে মরতাম।

দুলারহিন্ হাত বাড়িয়ে ভুখনের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। গাঁয়ের দোকানে তারা ভইসা দহি পেল আর মকাইয়ের খই।

একটি গাছতলায় ব'সে যত না খাওয়া তার চাইতে বেশি কোলাহল ক'রে তারা আহারপর্ব সমাধা করল।

গাছতলায় হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে ভুখন প্রশ্ন করল—দুলারী, আর কখনও আমাকে ছেড়ে যাবি না, বল।

—না।

রোদের ঝাঁজ ক'মে এল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পথ চলতে শুরু করল তারা। এত হাল্কা মন তারা বহুদিন অনুভব করেনি। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, যেন শখ ক'রে দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছে। কয়েক পা গিয়ে ভুখন বলল, দুলারী, এখন যদি কোনও মহুয়াই-এর দোকান পেতাম—

—তুই তো নেশা করিস না, তবে ও কথা বলছিস কেন?

—কিছুতেই যেন ঠিক ফুর্তিটা হচ্ছে না।

নিজেদের গ্রামে পৌঁছানোর আগে সন্ধ্যার আগেকার বাদামি আলোয় কাশের বড় বড় ঝোপে ভরা মাঠটিতে তারা এসে পৌঁছালো। দিনের বেলায় ভইসা থাকে, ভইসা নিয়ে রাখালরা এখন ফিরে গেছে। ছোটবেলায় যখন দুলারহিন্ ভইসা তাড়ানো ছাড়া আর কোনও কাজ পারত না, তখন এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হ'তো। ভুখন যখন ডাকত তাকে, সে লুকিয়ে বেড়াত এক ঝোপের আড়াল থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে। আর মাঝে মাঝে কুই করে সাড়া দিত।

মাঠটা পার হ'তে হ'তে ঝিক্‌মিকিয়ে হেসে দুলারহিন্ বলল, আমি যদি এখানে লুকিয়ে থাকি খুঁজে বার করতে পারিস?

—না, পারি না। এখনও তেমনি ছোট আছি, হাঁটতে হোঁচট খাব।

দুলারহিন্ কয়েক পা আগে চলছিল, হঠাৎ ধাঁ ক'রে লুকিয়ে পড়ল। ভুখন মনে মনে হাসল ছোটবেলায় খেলতাম, এই মনে করলেই কি আর তেমন খেলা হয়। এখন সে হাত বাড়ালেই ঝোপের এপার থেকে ওপারের ঘাস সরিয়ে দুলারহিন্‌কে দেখতে পাবে। কিন্তু দুলারহিন্ ভারি সুন্দর লুকাতে পারে। আর তার পায়ের গোড়ালি যেন ধনুকের ছিলায় তৈরি। একটি ঝোপের আড়ালে তার সাড়া পেয়ে তার কাছে গিয়ে দেখল ভুখন সে ততক্ষণে অন্য আর একটির কাছে স'রে গেছে। তার শাড়ির একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেখানে যেতে দুলারহিন্ উধাও। দু'তিন বারের চেষ্টায় একবার ভুখন দুলারহিন্‌কে ছুঁতে পারল।

—নে এবার চল।

ভুখন ভেবেছিল খেলা শেষ হয়েছে, কিন্তু দুলারহিন্ আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল হাসতে হাসতে।

খেলাটা বাল্যের মত দুর্দম হ'য়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে একবার দুলারহিন্‌কে সে দু'হাতে চেপে ধরেছিল বুকের উপরে, কিন্তু হাতের ফাঁক গলিয়ে দুলারহিন্ আবার লুকিয়ে পড়ল। খেলার উত্তেজনায় ভুখনও ছুটতে শুরু করল। কি একরকম ঘাস পায়ের তলায় দ'লে দ'লে যাচ্ছে, একটা সুঘ্রাণ উঠছে। কি একটা উত্তাপ বিচ্ছুরিত

হচ্ছে সেই শুকনো খটখটে ঘাসের বাদামি আলোর পৃথিবী থেকে। এইমাত্র ভুখন ছোটবেলার পাকড়ানোর কায়দায় পাকড়ে ধরেছিল দুলারহিন্‌কে। কিন্তু এবারও রাখতে পারল না। দুলারহিন্ হাত ছাড়িয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ে পালাল, তারপর হাসতে হাসতে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে আতপ্ত ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ল। দুলারহিন্ ছোটবেলাকার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে—যেমন করে ছোটবেলায় বলত, আমি ম'রে গেছি। উরু দুটি প্রসারিত, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি, ঈষৎ মুক্ত ঠোঁট দুটি, বুক কাঁপছে থর থর ক'রে।

কিন্তু দুলারহীন্ ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল। বল নিয়ে লুফতে লুফতে যদি হঠাৎ সেটা কুয়োয় পড়ে যায়, তাহলে সেই কুয়োর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কুয়োর অন্ধকার মনে নিয়ে যেমন করে ফিরে যায় খেলুড়েরা—তেমনি মন নিয়ে ফিরে চলল ভুখন আর দুলারহিন্।

দুলারহিন্ একবার বলল, ভুখন পিছিয়ে পড়ছিস। কিন্তু সেটা যেন ভাষা নয়, ভাষার খোলস শুধু।

ভুখন মুখ নিচু ক'রে থাকে, কথা বলে না। দুলারহিন্ ভাবে, কখনও কপালে হাত রেখে।

একদিন খুব সাহস ক'রে দুলারহিন্ ভাবল, ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলবে ভুখনোয়ার কোনও দোষ নেই, বয়সে সে-ই বড়। আর এই কথা বলে যদি ভুখনকে মুখ দেখাতে না পারে, মরবে সে। মরা যত সহজ, বলা তত হয়। ভগবানকে যদি বলা যায়, মানুষকে নয়।

দুলারহিন্ রান্না করতে করতে ভুখনের পিঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, আহা সঙ্কোচে যেন ভেঙে পড়েছে। সে ভাবে, তোর জন্য আমি কি না করেছি। ছোটবেলায় একবার আগুনের মধ্যে গুলি ফেলে দিয়ে তুই কেঁদে উঠেছিলি। আর তোর সেই গুলি খুঁজে দিতে হাত দিয়ে জ্বলন্ত আঙরা সরিয়েছিলাম, দাগটা ছিল কিছুদিন। তাও কি তোর মনে নেই।

এক সময়ে দুলারহিনের চিন্তার পথ কিছু বদলাল। চিন্তায় সাহস আগে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু স্নেহের করুণরকে মজ্জিত হ'য়ে সে সাহসও হ'য়ে উঠত করুণ। সমস্যাগুলোকে একদিন জীর্ণ বাসের মত তুচ্ছ মনে হ'ল। নিজেকে অসীম ক্ষমতার উৎস বলে অনুভব করল সে। সাহসে এত প্রাণ, এত পূর্ণতা এ কে জানত? এতদিন পথে-পথে ঘুরে আজ তবে পথ দেখা গেল। আবার সেই স্নেহগুলো ফিরে আসতে লাগল। অনাস্বাদিত এক আস্বাদে বর্ণাঢ্য হ'য়ে হ'য়ে। দুঃসাহসী হওয়ার জন্য নিজের ভিতরে প্রেরণা এল তার।

সন্ধ্যার পর ভুখন ফিরে এল তেমনি গম্ভীর মুখে। পায়ের শব্দে দুলারহিনের স্নায়ুগুলি রিন্‌রিন্ ক'রে উঠল। নাগরদোলায় কয়েক পাক ঘুরে হঠাৎ মাটিতে দাঁড়াতে গেলে যেমন পরিচিত পৃথিবী অপরিচিতের মত টলমল করতে থাকে তেমনি হ'ল দুলারহিনের।

দুলারহিন্‌ ভুখনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল,—ভুখ্‌নোয়া।

তখন অবাক হ'য়ে গেল। রুক্ষ চুলগুলি ভিজে-ভিজে পাট-পাট করা, বোধ হয় তেলজাতীয় কিছু দিয়ে বাঁধা। পরনে লাল সেই শাড়ি। কপালে কালির টিপ। আর চোখ! সে চোখ কোনওদিনই দেখেনি ভুখন। অনুচ্চারিত হাসির মত তেমনি আভাযুক্ত কিছু দুলারহিনের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল মুখের বসন্তের দাগগুলিকে অস্পষ্ট ক'রে। ভুখনের মনে হল প্রবল একটা আক্ষেপ বোধহয় আসছে তার সারা দেহে। ভুখন নিরুদ্ধ গলায় মৃদু গর্জ ক'রে উঠল।

দুলারহিন্‌ একটা হাত রাখল ভুখনের কাঁধে।

ভুখন দু'হাতের সবটুকু জোর দিয়ে দুলারহিনের হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল। যা কোনওদিন সে কল্পনাও করেনি, তেমনি করে দুলারহিনের আধখোলা ঠোঁটের উপরে প্রচণ্ড একটা চড় মারল সে। আঘাত একটা দেয়ার জন্যই মন যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। একটা কিছুর প্রাবল্য দরকার—এই সে অনুভব করেছে এ কয়েকটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল—আহা এ কি করল সে। দুলারহিন্‌, বহিন্‌। পৃথিবীতে কে আছে তার দুলারহিন্‌ ছাড়া। আর যে দুলারহিন্‌ নাকি তার মুখ চেয়ে তারই আশ্রয়ে থাকে, এত কোমলা, এত দয়াবতী। ছোটবেলায় দুজনের একজনকে বাবা মারলে অন্যজন তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠত, তেমনি হ'ল।

ভুখন কেঁদে কেঁদে হেঁচকি তোলার মত করে বলল, আর কখনও তোকে মারব না। এই প্রথম, এই শেষ। দুলারহিন্‌ দুলারহিন্‌ বহিন্‌।

দুলারহিন্‌ ফুঁপেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মেরে লাল মেরে ভুখ্‌নোয়া, ভাইয়া।

অনেকক্ষণ কেঁদে মনের নিরুদ্ধ পীড়াগুলিকে ধুয়ে মুছে দু'জনে নিজের নিজের চাটাইয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙল ভুখনের। ঠিক যা মনে করেছিল তাই—এই ভাবল সে। বাবা মারলে তারপর কয়েকদিন খুব কাজে মন হ'তো দুলারহিনের; ভোর থাকতে উঠে কাজে লেগে যেত। আজ বোধ হয় তাই করছে, জল আনতে গেছে।

ভুখন ভাবল : কি বোকা মেয়ে রে বাবা। অনেক বেলা হ'লেও যখন দুলারহিন্‌ ফিরল না তখন ভয় হল ভুখনের, সে খুঁজতে বার হ'ল।

কিন্তু সব সময়ে খুঁজে বার করা সহজ নয়। কয়েকদিন স্নানাহার ত্যাগ করে খুঁজেও দুলারহিন্‌কে সে পেল না। ভুখন বরং বুঝতে পারল ওগুলোকে বর্জন করলে খোঁজার পরিশ্রমকেও বাদ দিতে হবে। তখন সে স্নানাহারের দিকে নজর দিল। হাতের পয়সা কয়েকটি একসময়ে ফুরিয়ে গেল। ততদিনে সে বহুদূরে এসে পড়েছে। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে খেতির কাজ করে আবার হাতে পয়সা করে বেরুতে গেলে দুলারহিন্‌কে বোধহয় আর কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। তখন সে পথ চলতে চলতে কাজ করতে শুরু করল। যখন যে-গ্রামে গিয়ে পৌঁছায় সে-গ্রামেই খেতির যে কাজ পারে জুটিয়ে নেয়। কাজ ফুরিয়ে গেলে চলতে শুরু করে। একবার খুব বিপদে পড়েছিল। এক চায়ের বাগানে কাজ করতে গিয়ে তিন বছর এক নাগাড়ে

খাটতে হয়েছিল, পথ চলবার উপায় ছিল না। ভুখনের ধারণা সেই সময়েই দুলারহিন্ সব চাইতে দূরে গিয়ে পড়েছে। তাকে একজন মুরুব্বি বলেছে দুলারহিন্ যে বছর হারিয়ে যায় সেবার প্রায় দু'তিন হাজার মেয়েপুরুষ নাকি মরিশাস দ্বীপে কাজ করতে গিয়েছে। ভুখনের ইচ্ছা সে একবার মরিশাস দ্বীপটিও খুঁজে আসবে।

আসল ব্যাপার ঠিক এরকম নয়।

দুলারহিন্ পথে বেরিয়ে এক বুড়োর দেখা পেল। বুড়ো তাকে প্রশ্ন করতেই দুলারহিন্ কেঁদে ফেলে তাকে বলল, সে ভাইকে সুখী করার জন্য পথে বেরিয়েছে।

—কি করলে সে সুখী হয়, বিটিয়া?

—যদি অন্ততঃ ষাট-সত্তর টাকা দিতে পারি তাকে।

—আচ্ছা, তুই আমার গোরুবাছুরের তদ্বির কর, দুধ দো, দুধ বেচ, আমি টাকা দেব ধীরে ধীরে।

সেই বুড়োর কাছে থাকতে থাকতে বুড়োর ছেলে একদিন কেড়ে নিল দুলারহিন্‌কে। বুড়ো খুব হুঁশিয়ার, সে ছেলে ব'লে রেয়াত করল না। টাকা নিল চার কুড়ি ছেলের কাছে বুঝে। সেই টাকা আঁচলে বেঁধে বুড়োর ছেলের ঘর করছে দুলারহিন্। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আঁচলে-বাঁধা টাকা নিয়ে দুলারহিন্ অপেক্ষা করতে লাগল। এ-লোক সে-লোকের মুখে সংবাদ দিয়েছে সে ভুখনকে ঘরে ফেরার জন্য। ভুখন ফিরলেই সে যাবে। লোকগুলো খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।

এখন দুলারহিন্ আর চট ক'রে যেতে পারে না কোথাও। মাটিতে শিকড় বসিয়ে দিয়েছে সে। তিন চারিটি ছেলেমেয়ে তার। তারা সবাই তার দেহকে এবং অধিকাংশ মনকে নিজেদের পরিবারে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন বড়জোর মনের একটা উন্মুক্ত অংশ তার ছোটবেলাকার গাঁয়ের দিকে বাতাসে বাতাসে আগ্রহের পল্লব মেলে ডাকতে পারে। প্রথম শীতের মাটির রসে কোনও কোনও গাছ যেমন শিউরে ওঠে— তেমনি কখনও অনুভব হয় তার; শূন্যতা যেন শীত অন্ধকার একটা প্রবাহের মত মাটি থেকে উঠে তার হৃদয়মূলকে শিথিল ক'রে দেয় কখনও কখনও।

আর ভুখন। বলো দেখি যে ব্যবধান এসে গেছে তাদের জীবনে সে কি মরিশাস দ্বীপের সাগরের চাইতে কম দুস্তর? আর একটি পরিবারের দেহগুলোর ক্রমায়াত শৃঙ্খলরে একটি বৃত্ত যার দেহ, তাকে কখনও ফিরিয়ে আনা যায়—পারত তাই ভুখন, যদি জানত সে? তার চাইতে মরিশাসের দূরত্ব-কল্পনাও ভাল।

কিন্তু ভুখন এখন আর দুলারহিন্‌কে খুঁজে বেড়ায় না। তবু কি খোঁজে একটা। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশায় দাঁড়িয়েছে। মরিশাসের কথাও বলে না। দু-এক বছর পর পর শহর বদলে কাজ ক'রে বেড়ায় সে। ভাল লাগে না অনেকদিন এক জায়গায় থাকতে। কিছুদিন সে বাংলাদেশের গ্রামে মাটিকাটার কাজ ক'রে বেড়াল পথের ধারে ধারে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জ্বেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোনও কোনওদিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে। তারপর শুধু গল্পটাই থাকবে।

কানাকড়ি

সন্তোষকুমার ঘোষ

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধান গলায় সাড়া এল, কে।

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চুপচাপ তক্তপোশে পা তুলে বসে আছি। জিনিসপত্তর কিছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্মথ বললে কী করি, দু'দুটো টিউশানি ছিল যে। একটু পাখা করবে?

খালি-গা হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্মথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সির হর্ন বেজেছিল। মিনিট খানেক পরে একজোড়া মশমশ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তারপর দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠ শরীর সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিয়েছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস সুরে একজন ব'ল্ল, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখের মাথা খেয়েছ?

মশমশ জুতো বললে, তাই নাকি মাইরি ভুল হয়ে যায়।

তুমি তৈরি?

রেডি।

তাহলে স্টেডি—গো।

মশমশ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয় হাই-হিল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এল।

মন্মথ শুনল সব, বলল, নতুন জায়গা, তাই সব তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনাজানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবে না।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। না বাসা, না গলি, আলাদা বাসার জন্যে মন্মথকে পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমনি। বাপের বাড়ি বেহালায়, সেখানে

তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেল গাছের হাতধরা ছোট্ট একটু ছাদ ছিল। কিন্তু আহিরিটোলার এই গলিতে আছে শুধু পিচ আর পাথর।

অবাড়ন্ত শরীর মেয়েদের বয়সের মত, এ বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক'মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তার সাড়া জাগে, গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ঢঙঢঙ ট্রাম বেরুল। চৌবাচ্চার ঝিরঝির শব্দ, জলের কলটা যাট নম্বর আলেকজান্ডার সুতোর একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভরতি করে ফিরছেন; আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাছুঁইপানি স্নান : সাড়ে আট। নমো নমো খাওয়া : ন'টা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তার দড়ি থেকে ধরানো আয়েশি একটা কাঁচি—সারাদিনের বরাদ্দ দুটির মধ্যে একটি—সাড়ে ন'টা, দৌড়—দৌড়—দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে। কোনও সাড়া নেই, ক্বচিৎ একটি কাকের কা-কা, ক্বচিৎ সারা দুপুর রোদে টোটো-হয়রান ফিরিওয়ালা এ গলিতে খদ্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্নে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ইশারা, মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাই-হিল। আলাপ হতে হতে ছ'দিন কাটল।

জানলায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘরে থাকেন?

চৌকাঠের ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দুটি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতো পায়ে ঢুকব না ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা নতুন এসেছেন। তা ফুরসতই পাই না যে এসে পরিচয় করব। দরজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবার বলল, জুতো খোলার দরকার নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

তক্তপোশে বসে মেয়েটি বলল, বাঃ দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছেন। দু'জনের সংসার।

দু'জনের না। সাবিত্রী কুণ্ঠিত হেসে বলল, তিনজন।

ওমা তাই তো। খুকিকে তো দেখতেই পাইনি। কেমন চুপচাপ ঘুমচ্ছে। কার মত হয়েছে,—বাপের মত?

কী জানি। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বলল, আপনারা ক'জন দিদি।

হেসে লুটিয়ে পড়ার ভঙ্গি করে মেয়েটি বলল, দিদি আবার কী! মল্লিকা। আমাকে মল্লিকাদি বলে ডাকবেন। বয়সে তো আমি বড়ই হব আপনার চেয়ে মনে হচ্ছে।

মল্লিকাদি, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, আপনারা ক'জন—তিনজন না চার?

একজন ভাই। মল্লিকা বলল, এক এবং অদ্বিতীয়। দু'জন হতে পারলাম কই যে তিনজন হব।

ওমা, আপনার বিয়ে হয়নি? করেননি কেন।

করিনি কি আর সাধ করে। হল না মল্লিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল। কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ বসব না ভাই। বেরুতে হবে। শ্যামের বাঁশি বাজল বলে।

শ্যামের বাঁশি? একটু অবাক তাকিয়ে সাবিত্রী বলল, ও, ট্যাক্সির কথা বলছেন। আপনি বুঝি খুব ট্যাক্সি চড়েন?

তা চড়ি, মল্লিকা বলল, আপনি চড়েন না?

আমি? বলতে গিয়ে চোখ দুটো যেন নিবে গেল সাবিত্রীর। আমি? আপনিও যেমন মল্লিকাদি। গরিবের ঘরের মেয়ে, পড়েছি গরিবের হাতে—আমি ট্যাক্সি চড়েছি মোটে দু'বার। একবার সেই বিয়ের সময়, আরেকবার এই এবারে, মিনু হতে হাসপাতালে যেতে। সাবিত্রী ইঙ্গিতে ওর মেয়েকে দেখিয়ে দিলে।

নিজের কথাটা বলেই সাবিত্রী কৌতূহল সামলাতে পারল না, বলল, আপনাকে নিতে রোজ রোজ কে আসেন, মল্লিকাদি। ওই যে মশমশ জুতো, কোট-প্যান্ট—

ও মা, তাও দেখেছ। মল্লিকা অল্প হেসে বলল, ও হল আমার এক মামাতো ভাই। আমার হার্টের ব্যামো কিনা, তাই রোজ হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারা হলে সাবিত্রী নিজেই গেল মল্লিকার ঘরে। মল্লিকা বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, এস ভাই কাজকর্ম চুকল?

ঢুকবে কি, সাবিত্রীর পা সরছিল না। ছোট্ট কিন্তু এমন সাজানো-গোছানো ঘর তার কখনও চোখে পড়েনি।

ঝকঝকে পালিশ, খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, ফুলতোলা বালিশের ওয়ার। ড্রেসিং আয়না, টি-পয়, গ্রামোফোন একটা। আলমারিতে কাঁচের, চিনেমাটির খেলনা, কতরকম।

এগুলো? সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল।

এগুলো পুতুল। মল্লিকা বলল, আমি খেলি যে, আমার কি পুতুল খেলার বয়স গিয়েছে ভাই।

খাটের একপাশে সাবিত্রী বসল সন্তর্পণে, নোংরা কাপড়, কী জানি। মল্লিকার হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, কী পড়ছেন।

পৃষ্ঠা মুড়ে রেখে মল্লিকা বলল, গল্পের বই। কাল সিনেমায় যে বইটা দেখতে গেছলুম, সেটাই লিখেছে। ভারি চমৎকার। তোমাকে কী বলব ভাই, কাল দু'জায়গায় আমার চোখে জল এসেছিল।

কাল সিনেমায় গিয়েছিলেন বুঝি?

যেতে হয়েছিল, সাধ করে কি আর গিয়েছি। আমার সারা বিকেল মাথা ধরে আছে, তবু ছাড়ল না।

কে ছাড়ল না দিদি?

আবার দিদি? বলবে মল্লিকাদি। ছাড়ল না আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

আপনার জ্যাঠতুতো ভাই, মল্লিকাদি? আপনার ছোট?

আঙুলের বয়সের হিসে করে মল্লিকা বলল, অনেক ছোট। প্রায় দু'বছর হবে।

কেন তুমি দেখনি? সেই যে, রোজ গাড়ি নিয়ে বিকেলে আসে? ও আবার সিনেমায় কাজ করে কিনা। ডিরেক্টর।

সাবিত্রী তখন কিছু বলল না, বলল অনেক পরে মন্মথকে, গরম ভাতের থালায় হাওয়া দিতে দিতে।

না জেনেশুনে আমাকে কী একটা বাসায় এনে তুলেছ, শুনি?

খাওয়া বন্ধ করে মন্মথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। ফিসফিস করে সাবিত্রী বলল, তোমাকে সেদিন বলিনি? ও-পাশের ঘরে থাকে একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ। আমি এখানে থাকব কী করে বলত। তুমি তো বেরিয়ে যাও সারাদিনের মত! একটু থেমে বলল, সেদিন বলছিল মামাতো দাদা, আজ বলছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েরা রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্য হলেও সেটুকু বুঝতে পারি।

মন্মথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশি মেশামেশি কর না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

ওর চরিত্র ও তেজের ওপর স্বামীর অটুট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্মথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছা।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, পেলে খোঁজ।

কিসের?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হুকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিল না।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবে না তুমি!

ডালের বাটিতে সুড়ুৎ চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, খুঁজব, খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে?

হাতটা ঠং করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিক্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিল না?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি?

মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না কর, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাব।

ভাতের থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমার জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলে-বউয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইয়ের ছেলের কাঁথা বদলানো থেকে ভাজের কাপড় কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি। সেখানে? দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, আর ঠেস দেওয়া কথা শোনা। দু'খানা শোবার ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবার শনিবার আমি যেতাম, শুতে দিত চিলে কুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চল। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ। ও—কথাগুলো কি থিয়েটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে।

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবে না তুমি?

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপা কান্না ভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকুও ছোঁব না।

ছোঁবে না?

না।

থাক তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল। পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথা ব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ দুটি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সমুখে রেখে চলে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোনো।

ভিজে চুল খোলা, তখনও সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাক্-সকাল আকাশের মত স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভ, শুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাত কাঁদা চোখ দু'টিতে করুণ ক্লান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোনও কথা বলতে পারল না। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকাল। পাতা দুটি কেঁপে উঠল একবার, একটু ভিজল, ঠোঁট দু'টি থরথর হল, উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল। সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও পারল না, আরও বেশি করে ধরা পড়ল, ঢলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্মথের বুকে।

পরক্ষণেই হাসি-কান্না মুখখানা তুলে বলল, একি, তোমার গা এত গরম!

মন্মথ সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পাবে না তুমি।

মন্মথ বলল, ও কিছুই না। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসা বাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে গেল সাবিত্রী। সশঙ্ক স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি!

যেতে তো পারেই। আমদানি-রপ্তানির ওপর আমাদের অফিস। মাল আসছে না নিয়মিত বিদেশ থেকে। পাকিস্তানেও চালান যাচ্ছে না।

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাক। চাকরির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুন বাসার হাঙ্গামা করে কাজ নেই। একটু নিচু গাঢ় গলায় মন্মথ বলল, আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেরা সন্দেহ করে যেন ছোট না করি। আমাকে তুমি চেনো, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের দাম থাকলেই হ'ল।

বাজারের থলি হাতে মন্মথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল এই, শোনো।

মন্মথ ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইরে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুরে চোখের জল বুকের কাছটাতে মাখামাখি। মন্মথ একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দরজায়। মিটিমিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিরে বুঝি কত্তাগিন্নিতে ঝগড়া হয়েছিল?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কই, নাতো।

ইস, আবার লুকানো হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম, না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়! সাবিত্রী তবু বিশ্বাস করছে না দেখে, মল্লিকা বলল, কাল তোমার কর্তাকে রকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা, তাই। শেষ শো'তে থিয়েটার দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখদুটো ফোলাফোলা, ভাল ঘুম হয়নি কিনা, তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোওনি। চোর এলে কিন্তু মুশকিলে পড়ত ভাই, বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায় না; এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চারবার মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়। বিশেষ, মল্লিকা যেদিন একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারল না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকাদি বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভারি চমৎকার স্বাদ না?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিংবা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই। কী মাছ, দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবে না। বলল, দেরিতে বাজার এসেছে, এ বেলা বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি। অল্প চারটি খেয়েই অফিসে গেছেন। ও বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলই প্রার্থনা করেছে, হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্মথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্মথ জামাটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলো না, তোমাকে এখুনি বাজার যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল সাবিত্রী। সন্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধাকপি আনবে, আর একটা মাছের মুড়ো।

মন্মথ বিদ্রূপ করে বলল, হঠাৎ এত শখ যে। এত খাবার সাধ—পোয়াতি হলে নাকি আবার?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ আস্তে। সাধ নয়গো মান। আমার মান বাঁচাতে পার একমাত্র তুমি। তারপর সাবিত্রী ফিসফিস করে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্মথর মুখ। কী ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে আছ বলো তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেব কিনা ভাবছি,—তার ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বারবার বলিনি, আমরা দু'জনকে নিয়ে দু'জন কারুর কাছে ছোট হব না, তাই বলে ছোট কাজও করব না কখনও, কেন কেন, তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যের সঙ্গে?

মন্মথর হাত দু'খানা চেপে ধরল সাবিত্রী। ধরা গলায় বলল, আর করব না। কিন্তু আজকের মত আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোনও হোটেল থেকে এক বাটি কিনে নিয়ে এস। কম খরচে হবে।

হাত ছাড়িয়ে মন্মথ তীক্ষ্নস্বরে বলল, পাগলামি কর না। আমি এখন যাই হোটেলে, হোটেলে খোঁজ নিইগে কোথায় বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মুড়ো রাঁধা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, মন্মথ কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঘণ্ট জোগাড় করে আনল। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল, হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিছু টের পায়নি কিন্তু, খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর সাজানোর ঘটা দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরের মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে এক কোণে। ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেছে আয়নার কাঁচ। ফুলদানিতে টাটকা তাজা ফুল, জাজিমের ওপর ধবধবে চাদর।

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে, মুখে, মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি হাসল। বলল, জানো না? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন, আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারে না? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই? দেখত কেমন টানটান চামড়া, ধবধবে রং, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না মল্লিকাদি, কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমন্তন্ন করেছি আজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে প্রসাধন করল, সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রং, একটু পাউডার ক্রিম মিশিয়ে তৈরি করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ, ভ্রূ রেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়মের নিখুঁত সাজানো রিডের মত দাঁতের পাটি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই মল্লিকাদি।

মল্লিকাদি বলল, আহা, বস না।

তখনও ঘর সাজানো একটু বাকি ছিল, মল্লিকা এটা-ওটা, এখানে-সেখানে সরাতে লাগল; টুলের ওপর বসে মেয়েকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে লাগল নির্নিমেষে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশমশ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আজ একসঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে গায়ের কাপড় আলগা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে ব্লাউজের বোতামগুলো পটপট করে বন্ধ করল কোনওক্রমে। খুকিকে কোলে নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, আর রুমালে শশাঙ্ক উজাড় করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমি বমি অনুভূতি এল। চৌকাঠ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হল ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত গিলে আস্তিন আদ্দির জামাটা বুঝি সেঁটেই রইল আঁচলে, হীরে ঠিকরানো আঙুলের শর বিঁধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।

তাছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কর চাউনি। কী আতুর, আচ্ছান্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি সাবিত্রী সারা শরীর ভয়ে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্মথ সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে পা দিয়েই এক রকম চেঁচিয়ে উঠল কী হচ্ছে, কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পার না? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জানো।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মন্মথর মুখ। জানালা-দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুঙুরও বাজছে, না?

মন্মথ তখন ভেন্টিলেটর দুটোও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙল। কিন্তু ভাঙে না। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পরক্ষণেই হারমোনিয়ামটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কেলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্যে কত ছোট কাজই না করে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নিচু করিনি, কালই বাড়িওয়ালাকে বলব আমি। একটা বিহিত করতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পরদিন মুখ দেখাতে পারবে না ওর কাছে। আশ্চর্য, পরদিন কলতলায় মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেয়ে, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোনও জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আরেকটার ফরমাশ করে।

সাবিত্রী বাঁকা গলায় বলল, কাল যারা দেখতে এসেছিল, তাদের আপনাকে পছন্দ হয়েছে মল্লিকাদি?

কুলকুচির জল সশব্দে দূরে ছিটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনও ঠাট্টার কথাটা মনে রেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শিগ্‌গিরই আমরা একটা গীতিনাট্য অভিনয় করব কিনা, কাল আমার ঘরে তার মহড়া হল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাট্যপীঠ থিয়েটারও ভাড়া নেওয়া হয়েছে, জানো?

সাবিত্রী নীরবে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁষে এল। সাবিত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেক ভাই। কাল শশাঙ্ক

তোমাকে একেবারে স্পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে। ওরা এবারে যে ফিল্মটা তুলছে তাতে নাকি ছোট্ট একটি মায়ের পার্ট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না—ঠিক অমনি একটা পোজ ওদের চাই।

সাহস পেয়ে আরও কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, তুমি মর মল্লিকাদি।

রবিবার বাড়িওয়ালার কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারাদিন বাসায় কাটিয়ে দিল। সোমবার অফিস ফেরত যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়েই সটান চলে এল বাড়ি। কোনওদিকে না চেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে তক্তপোশে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়েছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, এ কি, এত শিগ্‌গির ফিরলে আজ। তাহলে আজ সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে। সিনেমা দেখারই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরও কাছে ঘেঁষে এল সাবিত্রী। মন্মথর কপালে উদ্বিগ্ন করতাল রাখল; ভিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেল না, তখন গাল কাত করে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণ ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই সাবিত্রী, জামার বুক পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

অফিসের ছাপমারা লেপাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কি ছাঁটাই?

মন্মথ এ-প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ, ভাই? বয়স কত ওর—দাঁত উঠেছে?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপর-নিচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল, কলকাতার দুধ তো সিকিটাই জলমেশানো, পাথর ভরতি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হত সাবিত্রী।

মুখ টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা, হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তর মুসাবিদা করছিল মন্মথ, আপন মনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোনও আশা পেয়েছ।

মন্মথ বলল, না। আজ আলফ্রেড অ্যান্ড জ্যাক্‌সন কোম্পানির বড়বাবুকে কেমন জব্দ করেছি সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল : আরে না-কামানো গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে চায় না। বলে বেয়ারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম বেয়ারার কাজ চাইনে স্যার, ক্ল্যারিকাল। আমি সাত বছর সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করেছি। আমার চেহারা আগাগোড়া দেখে নিয়ে—চোখ নয় তো শালার, যেন বুরুশ—বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যার, দস্তুরমত আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মারা গেছেন স্যার তাই...। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল বেটার। বললে, অশৌচ কেটে যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোট সাহেবকে বলে কিছু করতে পারি কিনা। মন্মথ হো-হো করে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত? সাবিত্রী বলল।

আরে সেইখানেই তো মুশকিল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি না। হয় দু'আনা খরচ করে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল স্যার। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কী দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিয়ের আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথর হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায় না, না ঘেঁষতে, না মিশতে, তবু কি কম্‌লি মল্লিকা ছাড়ে? মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে বসবে। বিব্রত, বে-আব্রু করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গায়ে যে বড় একটাও জামা রাখনি সাবিত্রী?

কুণ্ঠিত সাবিত্রী আরও জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম মল্লিকাদি?

গরম? হাসালে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হওয়া, আমরা রাত্তিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেল না। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলাটা টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ যেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না। গোপন ঘায়ের মত লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ, এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পুঁজরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাখামাখি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কী?

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুব। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখ। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী বলেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

রেসে যাব ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয়! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিয়ে দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচ টাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধুলোমুঠো সোনা হয়ে যায়? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশো, মল্লিকাদি?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বইকি। আর তিন টোটের খেল মেলাতে পারলে কথাই নেই,—রাতারাতি বড়মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দুটো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে।

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালের হাঁড়িতে হাত দিল! বেরুল টিনের একটা কৌটো, সেই কৌটোর মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিঁট খুলতে ছড়িয়ে পড়ল পয়সা, সবসুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরি হলে কালীঘাটে পুজো দেবে বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকার তখনও সাজগোছ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কণ্ঠায়, ঘাড়ে, কনুই অবধি পাউডার মাখছে। ফিরে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। তারপর সংকোচ জয় করে নিচু গলায় বলল, কম পয়সায় রেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকার চোখে-মুখে কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল, কত কম পয়সা, ভাই?

এই ধর,—স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন,—পাঁচ আনাতেই চলবে। আমার চেনা বুকি আছে কত; তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দিল।

মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমার যা ভাল মনে হয় কর, মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে-আসলে ফিরে এল কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমার ভাগ্য ভাল সাবিত্রী, আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমার নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেন্ট ভাল হয়নি, নামি ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছ আট আনা।

আমার এই ভাল মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে। চায়ের সঙ্গে ফুলুরি, বেগুনি দেখে মন্মথ অবাক হল! পয়সা পেলে কোথায় তুমি?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকরির দরখাস্ত লিখে লিখে আর জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিরিক্ষি মন্মথর, স্ত্রীর কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগার করেছ নাকি?

তবু হাসল সাবিত্রী।—যদি বলি তাই।

ঠাট্টা-কটু গলায় মন্মথ বলল, আশ্চর্য হব না, জলজ্যান্ত আদর্শ যখন পাশেই রয়েছে।

কথার ধরনে সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ। গম্ভীর স্বরে বলল, এও তো এক হিসেবে তোমার রোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেয়ে থাকব সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিল না, শুধু মন্মথর পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বার বার বলেছে, আমার কিছু ক্ষতি হবে না দেখ। তাছাড়া, আমাদের এখন এই দুঃসময় চলেছে। কার কাছে তোমাকে রেখে যাব।

মন্মথ বলেছে, সে ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে। এ অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবে না, তার ওপর পেটে ভরে দু'বেলা খেতেও পাও না। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাঁধাবে? আর, ক'দিনের জন্যই বা। তোমার হিসেব মত তো আর সাড়ে পাঁচ মাস?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এল, ফ্যাকাশে, সাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিঠ।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে ভাই?

সাবিত্রী বলল, ও-শত্তুর না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে খাওয়াতাম কী?

কী হয়েছিল রে।

কিচ্ছু না। শরীরটা এখান থেকেই খারাপ নিয়ে নিয়েছিলাম তো। রোজই ঘুসঘুসে জ্বর হত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন,—ব্যস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিন কতক ঘোরাঘুরি করছে। ব্যাবসা করছে বলে। বাপের বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল, এক বন্ধুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রি করে আরও দেড়। একটা ট্রামের মাস্থলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবে না?

মন্মথ হাই তুলে বলল, দুর, দুর। শুধু ঘোরাঘুরি, শরীরটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তোমার বন্ধুর প্রেসে?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটের নিচে রাখা লেটার হেডের স্তূপ দেখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি? চক্রবর্তী অ্যান্ড দত্ত,—অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কোন কোম্পানি?

কোম্পানি আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দলে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেকদূর এগিয়েও হল না। কোনও একটা ফার্মের ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ। কলকাতার বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, রাহা খরচা, উপরন্তু বিক্রির ওপর দু'পারশেন্ট কমিশন। সে অফিসের মাঝারি একজন

কেরানিকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেল মন্মথ। ফিরে আসতে সাবিত্রী বলল, হল?

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে! আর মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শিগ্‌গির আজ খেতে বসেছ ভাই?

পাতে শুধু কলমিশাক সেদ্ধ, আর কয়েক দানা মাত্র ভাত। অন্যদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিংবা বলত, আজ তোমার ভগ্নীপতির তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজারটাও করে দিয়ে যেতে পারেনি; তা আমারও শরীর ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজের ঘরে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে এল মল্লিকা। একটু চেখে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

অত্যন্ত সহজ ছল, অন্যদিন হলে অপমান বোধ করত, মল্লিকাকে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হল সাবিত্রীর চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। কত ভুল না করে মানুষ, কত অকারণে একে অপরকে ঠেলে রাখতে চায় দূরে। পাশের ঘরের এই মেয়েটিকে কেন বরাবর অপছন্দ করে এসেছে সাবিত্রী? ওর কাছে আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বলে? অকস্মাৎ সাবিত্রীর মনে হল সেও তো মল্লিকার কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসি। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবণাক্ত কান্না ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীর চোখে। সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ করল।

তেমন কিছু রোদ নেই তবু চোখ দু'টো গরম, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। অনভ্যস্ত পায়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধার করা স্যান্ডালটার স্ট্র্যাপ যেন চামড়া কষে ধরেছে।

একা পথ চলার অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পারবে কিনা। মল্লিকা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ অসুবিধা হল না।

ঘড়িতে দেখল তখনও সিনেমা শুরু হতে মিনিট পনেরো দেরি। ধপ করে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ রুমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকার কাছে। মন্মথর চাকরি না থাকার কথা; অভাবের কথা; উপোস দেওয়ার কথা। সব অহংকার, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্যে ভাবি না। কিন্তু চোখের ওপর মেয়েটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী কাজ করবে তুমি?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চোর শালা জোচ্চার—পাঁচশো টাকা জমা রাখতে চায়। আরে তোদের মাল নিয়ে কি সরে পড়তাম আমি? এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস না?

মন্মথ বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলি। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ দিয়েছিল ছ'হাজার বলা মাত্তর পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোনও কারণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নিচু করল। ওর বাবা শুধুমাত্র শাঁখা-সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, সেই আপশোসই মন্মথ করছে নাতো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পরে, এমন কি আরও একটা নষ্ট হয়ে যাবার পরে।

তাই তো, কী কাজ। না জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টিচার হতে পারব না, নার্স না, দরজি না। কথাবার্তায় তুখোড় নয় যে টেলিফোনে কাজ নেব। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখ না মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি? হাসতে গিয়েও চোখ দু'টো ভারী হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখিরির আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোনও কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছি না তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই আছে। আমি জোর করে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুন ফল হবে। নিজের কাজ নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সন্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্থল অবধি কেঁপে উঠল। কুয়োর গবীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল : বেশ আমি রাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বায়োস্কোপে। মন্মথ বেরিয়ে গেছে। তার অনুমতি দেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি।

আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি?

মল্লিকাদির শরীর খারাপ। আসতে পারলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে—

অন্ধকার ঘরে পরদার ওপরে ততক্ষণ ছবির নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওরা, প্রেক্ষাগৃহে কখনও তুমুল হাসি, কখনও স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীর, সেদিকে কানও নেই। গলা শুকনো, দেহ আড়ষ্ট, চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিরালোকতার সুযোগে এগিয়ে এল একখানি রোমশ হাতের ছোবল। এই বুঝি ওর কোমর জড়িয়ে ধরল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নড়েচড়ে বসল, ততবার ভয়ে অন্যদিকে সরে গেল সাবিত্রী; কতবার যে পাশের হাতলে অন্যমনস্ক হাত রাখল, কতবার যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবার খস খস করে উঠল, মনে হল শশাঙ্কর বাঁ-হাত কী যেন খুঁজছেন এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীরটাকে শক্ত করল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত করল, এমন সময় ফশ করে আলো জ্বলে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজছিল।

বুকের ভেতর থেকে রুমাল বার করে সাবিত্রী সন্তর্পণে কপালের ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পরে দু'টো আইসক্রিম নিয়ে ফিরে এল। একটা সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড় কাত করে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেল না।

বুঝতে পারছেন? প্রোগ্রাম কিনে দেব একটা?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার?

থতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই—এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিভল। আবার সেই ছাই ছাই ফিকে অন্ধকার, পরদায় মুখর ছবির অবিরাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝল না সাবিত্রী, বুঝতে চাইল না, পালা করে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসর পুরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ শুনল।

শেষবারের মত আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মত সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচ মিনিটেরবেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন?

না—বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পরদা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দুজনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব।

অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনওমতে বলল, এক গ্লাস জল।

শুধু জল? তা কি হয়? শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাশ করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে; এবারে খাবারের টেবিলের তলার দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কোঁচাটা শুঁড়ের মত লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশমশ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হল না, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুজে অনুভব করল আরেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটি গুটি এগিয়ে এসেছে; নতুন স্যান্ডেলের ফিতেয় পায়ের পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বারবার কঠিন একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখার বিশেষ অভ্যাস নেই?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা—আপনি তো খুব দেখেন, না?

আমি? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ করি, জানেন না?

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। চায়ের পেয়ালায় শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলবার আছে সাবিত্রীর, এই বেলা।

তবু কি সোজাসুজি বলতে পারল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর। কেমন করে তোলা হয় ছবি, কথা গাঁথা হয় কী করে। তারপর শুনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে, তাও কাজ এগোচ্ছে না। বাজার খারাপ। বারবার মার খেয়ে এ-ব্যাবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিল চুকিয়ে দিতে শশাঙ্ক পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়েছে, খুচরো পয়সা এখুনি ফেরত নিয়ে আসবে বয়। আর সময় নেই।

মরিয়া হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বলছিলেন,—আপনাদের ছবিতে নাকি—নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনারা।

স্মিতচোখ দুটির ওপরে শশাঙ্কর ভ্রূ জোড়া সন্নিহিত হয়ে এল : মল্লিকা বলেছে আপনাকে? কবে?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নিচু করে বলে যেতে লাগল আমাদের বড় অভাব শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম আমি যদি...আমাকে যদি—

সিগারেট বার করে দেশলাইয়ের বাক্সে সজোরে বারবার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম, তখন

স্বাভাবিকভাবে মায়ের পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজ চালানো গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে বই তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধরার মত সুরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোনও পার্ট খালি নেই?

আছে। কিন্তু মায়ের পার্ট তো নেই। একটি হিরোইন খুঁজছি আমরা। কিন্তু,—সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কর চোখে নিজের চেহারার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোয়ারে সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবার সব শুকিয়ে কাগজসাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালো রেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরা-বেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকের কবরে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ; এ-চেহারা হিরোইনের সাজে না, এ কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এবার কিছু করতে পারলাম না। তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেব।

একটা গাড়িও করে দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পায়ে ফিরে আসতে আসতে দোকানের ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকি হয়তো উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। মন্মথ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আর রক্ষা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে মন্মথ ঘরময় পায়চারি করছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী করবে মন্মথ? মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে? বার করে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে? ওর হুকুম না নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানোর অপরাধের জন্যে চেঁচামেচি, কেলেঙ্কারি করবে?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যখন, তখন এ সব সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি। সর্বনাশ হতে হলে মেয়েমানুষের কত মতিচ্ছন্নই না হয়।

দরজা খোলাই ছিল। খুকিকে বুকের ওপর শুইয়ে মন্মথ ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সাবিত্রী কাপড় ছাড়ল, তখনও বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে।

সিনেমা ভাঙল?

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ হাসি মুখে বলল, আরে, জানি জানি। এসে দেখি তোমার মল্লিকাদি খুকিকে লেবেঞ্চুস, বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করছে। ওর কাছেই শুনলাম।

পরম প্রশান্ত মন্মথর মুখ, কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পায়ের নখ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এর চেয়ে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিল না কেন, এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের চেয়ে আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধরলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভাল ভাল। জুজু-বুড়ি হয়ে না থেকে নিজের পথ নিজে দেখছ খুব ভাল। নিচু সুরে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল?

কী বলবে?

এই ধর কাজের কথা। কতরকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিয়ে দিতে পারত? তা তুমিও কিছু বললে না?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, তবে গিয়েছিলে কেন। নিজের দরকারের কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন?

অত ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।—অভ্যাস নেই! নেকি! কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে, না? কিসে নিজের ভাল হয়, তাও বোঝো না?

শান্তস্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে?

সে কথার জবাব না দিয়ে মন্মথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইল না?

চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। রা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীর কথাটারই প্রতিধ্বনি করে মন্মথ মুখ ভেংচে উঠল; রাজি হওনি কেন?

হলেই কি মান থাকত তোমার?

মান ধুয়ে জল খাও, পেট ভরবে। তীব্রস্বরে মন্মথ বলল, কী ক্ষতি হতে তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিত?

পলক পড়ছে না, মণি দুটো জ্বলছে মন্মথর। সেই অগ্নিদৃষ্টির সঙ্গে চোখ মেলাতে গিয়ে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মন্মথ ঠাট্টা করছে না, সত্যিই বুঝি সে চেয়েছিল সাবিত্রী শশাঙ্কর সঙ্গে এক মোটরে আসুক। একটু ছোঁয়াছুঁয়ির ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল হোক।

মন্মথ বলে যেতে লাগল, ওরা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকরাও করে। শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে?

ছুটে গিয়ে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্মথর মুখে, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর।

বলে আর অপেক্ষা করল না, টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার

বিছানার উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি। কী হয়েছে সাবিত্রী, অমন করছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না রোধের প্রাণপণ প্রয়াসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেছে। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায় না জানিয়ে গিয়েছিলে বলে খুব বুঝি বকেছেন মন্মথবাবু?

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল না।

তবে? কানের কাছে মুখ নামিয়ে মল্লিকা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তবে বুঝি সিনেমার হলে শশাঙ্ক বেশ বাড়াবাড়ি কিছু করেছে?

বালিশে মুখ ডুবিয়ে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে?

এ তবেরও জবাব পেল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনওদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

সোপান

বিমল কর

প্রথম টাঙায় বাবা, মা; পরেরটায় দিদি আর পুষ্প। শেষের গাড়িটায় আমরা দু'জন—হেমদা আর আমি। টাঙায় ওঠার সময় হেমদাকে আমরা দিদির গাড়িতে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলাম একবার; পুষ্প রগড় করে বলেছিল, "যান না, জোড় বেঁধে বসুন গে যান, এখানে কেন?" পালটা রসিকতা করে হেমদা বলল, "দেখ ভাই, প্রত্যাশার জন্যে মানুষ সামনের দিকে চায়, আমি ও-গাড়িতে বসলে আমায় যে পিছু দিকে চাইতে হবে;" বলে হেমদা পুষ্পর চোখে চোখ রেখে হাসল। পুষ্প কথাটার মানে বুঝতে মুহূর্ত সময় নিল, তারপর হেমদার হাতে চিমটি কেটে দিল জোরে, বলল—"আ—হা!"

আমাদের টাঙা তিনটে প্রায় ঘণ্টা খানেক হল ছুটছে। বাবা-মা'র গাড়িটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে ভাল গাড়িটায় ওঁদের বসানো হয়েছে; ভাল ঘোড়া, ভাল গদি না হলে বাবা-মা'র কষ্ট হ'তো। প্রথমত ওঁদের বয়স হয়েছে, দ্বিতীয়ত, বাবা আজ সাত-আট বছর নিজের বাড়ির আস্টিন গাড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত নন। আজকের এই হুজুগে আমরা ওঁদের জোর করে টেনে এনেছি।

দিদি আর পুষ্পর গাড়িটা মন্দের ভাল। টাঙার ঝাঁকুনি দিদির সয় না; ভারী শরীরে টাল সামলাতে কষ্ট হয়, কখনও কখনও আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে। দিদিদের গাড়িটাকে তাই ধীরেসুস্থে চালাতে বলে দেওয়া হয়েছিল। ওরা আমাদের খানিকটা আগে আগে যাচ্ছে।

শেষের গাড়িটা একবারে লঝ্‌ঝড়। যেমন গাড়ি, তেমনি ঘোড়া। নড়বড়ে শরীরে শব্দ করতে করতে, আমাদের দু'জনকে কখনও ডাইনে টলিয়ে দিয়ে, কখনও বাঁয়ে হুমড়ি খাইয়ে গাড়িটা চলেছে। হেমদা মাঝে মাঝে বলছে, "অন্তু, নার্ভাস হয়ো না; মহাপ্রস্থানের পথের এটা প্রাইমারি প্রিপারেশন।"

আমরা পঞ্চপাণ্ডব নই, মহাপ্রস্থানেও যাচ্ছি না। আমরা মজুমদার ফ্যামিলি : সুরেশ্বর মজুমদার, তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র এবং জামাতা—এই মিলিয়ে আমরা ছ'জনে একটি গোটা পরিবার আপাতত চলেছি একটি স্তম্ভ দেখতে; প্রাচীনকালের স্তম্ভ।

শীতের রোদ খুব ঘন এবং হলুদ হয়ে এসেছে; যেন সকাল থেকে নীল অনন্ত আকাশে মাঘের রোদ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, ফুটে ফুটে এখন তা ঘন ও ঠাণ্ডা হয়ে

পুরু একটা সর পড়ে গেছে রোদের। দুপুর শেষ হতে চলল। পাহাড়ি বনপথের মেঠো রাস্তা ধরে আমাদের টাঙা তিনটে ছুটছে; ঘোড়ার গলায়-বাঁধা ঘন্টির মালা ঝুনঝুন শব্দে বাজছে সর্বক্ষণ; মনে হবে আমরা যেন কোনও প্রাচীন কালের তীর্থযাত্রী।

এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, তা যেন পাহাড়তলির মতন। নির্জন, নিস্তব্ধ। চোখ মেলে দেখছি, কোথাও ঢালু জমি নদীর চরের মতন আদিগন্ত ছড়ানো, ছোট বড় পাথরের বিক্ষিপ্ত স্তূপ, ঝোপঝাড়; কখনও চোখে পড়ছে অরণ্যের হরিৎ-শ্যাম পটচিত্র, আকাশ-মাটির মাঝখানে দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কখনও উত্তরে, দূরান্তে পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছি, রৌদ্রকিরণ এবং মেঘপুঞ্জের জন্য তার মাথায় ধোঁয়ার জটা। কদাচিৎ একটি গ্রাম, কাঠুরিয়ার বয়েলগাড়ি এবং ছোলার খেত চোখে পড়ছিল।

হেমদা বলল, "অন্তু, আমরা বেরাস্তায় চলে আসিনি তো? কোথায় সেই 'কেপ অফ গুড হোপ'! চোখে পড়ছে তোমার?"

হেমদা যেদিন তেকে এই স্তম্ভটার কথা শুনেছে সেদিন থেকে ওটাকে 'কেপ অফ গুড হোপ' বলে আসছে। আমি অনেকবার বলেছি, "তুমি কেপ পাচ্ছ কোথায়, হেমদা! ত্রিপাঠীবাবুর কথা মতন ওটা টাওয়ার; টাওয়ার অফ গুড হোপ বলতে পার।" দিদি বলেছে, "সোজাসুজি মিনার বলো না, বাপু! যা বুঝছি তাতে ওটা মনুমেন্ট কি মিনার-টিনার হবে।" দিদির কথায় পুষ্প আর হেসে বাঁচেনি, বলেছে, "শুনছ ওটা কোন আদ্যিকালের সৃষ্টি, লোকে তখন মিনার-টিনার বুঝত না। তার চেয়ে এরা যা বলে তাই বলো।"

এরা যা বলত তাতে আমরা কৌতুক বোধ করতাম। এরা বলত 'মন্‌দির'। সরল, দেহাতী মানুষগুলোর কাছ ইটের ঢিবি মাত্রেই মন্দির। ত্রিপাঠীবাবু অবশ্য বলেছিলেন, অনেকে একে 'নভস্‌তি' বলে। কথাটা আমরা বুঝিনি প্রথমে, পরে বুঝলাম; কোনও কালে কেউ সংস্কৃত ভাষায় বুঝি বলেছিল নভে অস্তি, তাই থেকে নভস্‌তি। অর্থাৎ মিনার চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে, শূন্যে ভাসছে।

ত্রিপাঠীবাবু আমাদের নভস্‌তির গল্পটা শুনিয়েছিলেন। তার আগে পুষ্প শুনেছিল মতিয়ার কাছে।

মতিয়া এ বাড়ির চাকর, এখানকারই লোক। আমরা আজ পক্ষকাল এখানে। সপরিবারে বেড়াতে এসেছি। ব্যাবসাসূত্রে বাবার পরিচিত কেউ তাঁকে এই স্বাস্থ্যকর নির্জন জায়গাটির কথা বলেছিলেন। বাড়িও তিনি জোগাড় করে দিয়েছেন। এসে পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। বাবা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, মা সংসার দেখছিলেন, আর আমরা চারজনে—হেমদা, দিদি, পুষ্প আর আমি এখানের প্রচণ্ড শীতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে, নদী ও ঝরনা দেখে, হাটমাঠ করে, খেয়ে ঘুমিয়ে, তাস খেলে দিন কাটাচ্ছিলাম। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সংলগ্ন এই মনোরম, নির্জন ও নির্বান্ধব জায়গাটি ভাল লাগলেও ক্রমশই আমরা উত্তেজনাহীন হয়ে উঠছিলাম। হেমদা না থাকলে হয়তো এত নির্জনতা সহ্য করা যেত না।

এমন সময় একদিন মতিয়ার কাছে এক গল্প শুনে পুষ্প বলল, "এখান থেকে

খানিকটা দূরে এক মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মাথায় চড়লে একেবারে স্বর্গ।...চল, একদিন স্বর্গ বেড়িয়ে আসি।"

হেমদা বলল, "স্বর্গের জন্যে বাইরে ছুটব কেন ভাই, আমার হাতের কাছে ডবল স্বর্গ রয়েছে।"

পুষ্প ছুটে এসে হেমদার মাথার চুল ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল; বলল, "ইস্—মানুষের একটা হয় না, আপনার আবার ডবল।"

হাসি-তামাশার মধ্যে পুষ্প আমাদের কাছে মতিয়ার শোনা গল্পটা বলল। শুনে আমরা হেসে বাঁচি না। কোনও এক রাজা নাকি রামজির বড় ভক্ত ছিল, বহুকাল সুখে শান্তিতে রাজত্ব ও প্রজাপালন করে শেষে বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করল। রামভক্ত সেই ধার্মিক রাজা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, সাধনভজন করে, তার সঙ্গে না আছে পাত্রমিত্র না সৈন্যসমান্ত। ঘুরতে ঘুরতে রাজা একদিন এল মহাদেও পর্বতমালার কাছে; চেয়ে দেখল বিরাট পর্বত, আকাশ ছাড়ানো মাথা; ভাবল, ওই পাহাড় বেয়ে সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতন এবার স্বর্গে চলে যাবে। পাহাড় চড়া শুরু হল তার। রাজা বড় ভুল করেছিল, পাহাড়ে চড়ার আগে পুজো দেয়নি পর্বতের, তাই পর্বত তাকে নিল না, ফেলে দিল। রাজার পা গেল ভেঙে, হাত ঠুটো হল। তখন সেই অক্ষম রাজা তার রামজিকে ডেকে বলল : আমি চিরকাল তোমার পুজো করে এসেছি, আর কারও পুজো করব না; তুমি আমায় স্বর্গে ওঠার পথ যদি করে দাও তবে যাব, নয়তো পড়ে থাকব এইখানে। রামজি তখন ওই মন্দির করে দিলেন—ভক্তের জন্যে; বললেন : তোমার ভাঙা পা ভাঙা হাতেই তুমি ধীরে-সুস্থে ওই সিঁড়ি ধরে উঠে আসবে, আমি তোমার জন্যে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু মন্দির বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মন্দিরে ঢুকলে আর ফিরতে পারবে না। রাজা তখন রামজির পুজো করে ওই মন্দিরে ঢুকল, তারপর আর মন্দিরের বাইরে আসেনি।

হেমদা হেসে বলল, "রামচন্দ্রের অপার মহিমা। সাগর বাঁধতে পারেন, আর রাবণের ওপর টেক্কা মেরে স্বর্গের সিঁড়ি করতে পারবেন না।...যাই বলো, এইসব সরল মানুষের ইমাজিনেশন বড় সাদামাটা, সুন্দর।"

তারপর আমরা একদিন ত্রিপাঠীবাবুকে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : রামজি-টামজি না ভাইয়া, কোই হিন্দু রাজা ওটা বানিয়েছিল। দুসরা এক কিস্‌সা আছে, শুনুন।

ত্রিপাঠীবাবুর গল্পে ইতিহাসের একটু গন্ধ ছিল, যদিও তা কাহিনী। এক হিন্দু রাজার তৈরি ওই নভস্‌তি; কি তাঁর নাম, কিবা তাঁর পরিচয়, আজ আর জানা যায় না। কিংবদন্তী বলে, তিনি ছিলেন শাহজাহান বাদশার সমসাময়িক। রাজা আবার স্বয়ং একজন দক্ষ স্থপতি। একবার তিনি তাঁর অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী যুবতী মহিষীকে সঙ্গে করে মহাদেব পর্বতমালার পুজো দিতে এসেছিলেন। ফেরার পথে রাজারানি বনাঞ্চলে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অপরাহ্ন বেলা, অদূরে তাঁর সৈন্যসামন্তরা ক্লান্তি বিনোদন করছে, বসন্তকাল, বনভূমি নব পত্রপল্লবে সজ্জিত, রাজার এই স্থানটি নয়নে ধরে গেল। রানিও বিমোহিত।

রাজা রানিকে বললেন, তোমার সৌন্দর্য্যের স্মৃতিতে এইখানে একটা কিছু গড়ে দিতে চাই, বলো কি ইমারত গড়ব? রানি বললেন, আমার দুটো শর্ত আছে, যদি শর্ত রাখেন, তবে প্রার্থনা জানাই। রাজা হেসে বললেন, রাখব শর্ত। তখন রানি দুই শর্ত দিলেন। রাজাকে স্বহস্তে একটি মিনার তৈরি করে দিতে হবে; আর দ্বিতীয় শর্ত—যতদিন না রানি সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, তিনি তৃপ্ত, ততদিন রাজাকে মিনারের উচ্চতা বাড়িয়ে যেতে হবে।...রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন, রানির ইচ্ছা মতনই কাজ হবে।...তারপর ওই নভস্তির কাজ শুরু হল, রাজা নিজে নকশা বানালেন মিনারের, তদারকি করতে লাগলেন কাজের, আর মিনার মাথা তুলতে লাগল। মিনারের একটি করে তল শেষ হয়, রাজা নিয়ে আসেন রানিকে, দু'জনে উঠে এসে দাঁড়ান শেষ চত্বরে, রাজা শুধোন, তুমি তৃপ্ত? রানি বলেন—না; তিনি তৃপ্ত নন। আবার মিনারের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়, রানি ফিরে যান রাজপুরীতে। এমনি করে সাত বছরে সাতটি চবুতর বা তলা তৈরি হল। রানি আসেন, শীর্ষে উঠে দেখেন চারপাশ, তারপর মাথা নেড়ে বলেন, তিনি একনও তৃপ্ত নন। আস্তে আস্তে বছর যায়, রাজা বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়েন, রানিও বিগতযৌবনা। অবশেষে রাজা শেষ তল তৈরি করে রানিকে ডেকে পাঠালেন। তারপর দু'জনে মিনারের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর ফিরে আসেননি। বা রাজা তাঁকে ফিরতে দেননি।

"আর রাজা?" আমি ত্রিপাঠীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ত্রিপাঠীবাবু বলেছিলেন, "ভাইয়াজি, রাজাভি নেহি লোওটা আয়া। মালুম মনোরথ পূরণ হো গ্যয়া, সুখ মিলা শান্তি মিলা।"

কাহিনী শুনিয়ে ত্রিপাঠীবাবু আমাদের বলেছিলেন, আমরা যখন বেড়াতেই এসেছি, তখন একবার ঘুরে যাই না কেন নভস্তি। গল্পকথায় কত কি তো বলে, তাতে কি যায় আসে! "আগর যাইয়ে গা তো বহুৎ আনন্দ্ মিলে গা, আসমান উঁচা ওহি নভস্তি; অন্দর ভি ভারি মনোরম।"

হেমদা জিজ্ঞেস করল, "লোকে বেড়াতে যায় না? মিনারে চড়ে না?"

ত্রিপাঠীবাবু বললেন, "কেউ যায় বটে, এখনাকার কথা ক'জন আর জানেন বলুন! তবে যারা বা মিনারে চড়তে যায় তারাও সামান্য উঠে ফিরে আসে, ভয় পায়, ঠকে যায়।"

ত্রিপাঠীবাবুর গল্প শোনা হয়ে গেলে আমরা অন্য কোথাও কিছু দেখতে যাবার মতন না পেয়ে ওই নভস্তি বা মিনারটি দেখতে যাওয়া স্থির করলাম।

হেমদা বলল, "কত আর উঁচু হবে—, গল্পের গরু গাছে ওঠে। আর যদি একটু উঁচুই হয়—ক্ষতি কি—ঘষড়ে-টষড়ে উঠে যাব, তারপর না হয় বিছানায় শুয়ে পায়ে তেল মালিশ চালাব। চল পুষ্প, মনস্কামনা পূর্ণ করে আসি। টপে চড়লে তো আর তোমায় আমায় ফিরতে হবে না।" হেমদা হাসতে লাগল।

দিদি হেসে বলল, "আমায় বাপু তা বলে ঠেলে ফেলে দিও না।" হাসি শেষে দিদির মুখে একটু বা লুকানো বিষাদ নামল।

আমরা আজ ছ'জনে—সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর পরিবারবর্গ—মাঘের দুপুরে টাঙায় চড়ে সেই মিনার দেখতে যাচ্ছি। বাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না যাবার, মা-ও নিমরাজি ছিলেন। আমরা একরকম জোর করেই তাঁদের দলে টেনেছি। এই ভ্রমণ অন্তত তাঁদের খারাপ লাগার কথা নয়।

হেমদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "অন্তু, ওই যে—ওই, নর্থের দিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ!"

উত্তরের দিকে তাকিয়ে আমি একটি ধূসর মিনার দেখতে পেলাম।

২

আমরা মিনারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। টাঙা তিনটে চড়াইয়ের নিচে। এতক্ষণে সূর্য হেলে পড়ছে; পশ্চিমের দিকে সামান্য একটি চালা। ওই চালার সামনে একটি গ্রাম্য কূপ। অল্প তফাতে বুঝি একটি গ্রাম আছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রাম। চালাবাড়িতে কেউ ছিল না, ঘরের মধ্যে একটি ধুলোভরা খাতা, কয়েকটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি পড়ে আছে। টাঙাঅলারা বসেছিল, আপনারা যান, আমরা দারোয়ানকে ডেকে আনছি।

মিনারের চারপাশে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাবা বললেন, "পুরনো টাওয়ার, তবে খুব পুরনো নয়। শ'দুই-আড়াই হতে পারে।"

মা বললেন, "জায়গাটি বড় নিরিবিলি। মন জুড়োয়।"

পুষ্প মাথা তুলে হাঁ করে মিনারের চূড়া দেখছিল, বলল, "দাদা দেখ, মনে হচ্ছে মিনারের মাথাটা হেলে পড়ছে, এক্ষুনি হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে পড়বে।"

হেমদা বলল, 'ইলিউসান অফ ভিস্যান।"

সুবিশাল মিনার, তলার দিকটা জরাজীর্ণ দেখায়, ফাটলে ফোকরে গুল্ম ও লতাপাতা, চাপড়া চাপড়া ঘাস। মাথা তুলে মিনারের উচ্চতা দেখে আমার মনে হল না, স্থানটি অনধিগম্য। শীতের আকাশ আরও নীল, আরও স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, একটি হালকা মেঘখণ্ড চূড়ার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। হু হু বাতাস বইছে। বনানীর গন্ধ সেই বাতাসে।

লোকটা এল; এখানকার তদারকি করে; প্রায়-বুড়ো। বোঝা গেল, পিছনের গ্রামটিতে থাকে, কদাচিৎ কোনও ভ্রমণকারী এসে পড়লে তার চালাঘরের খাতাটি দেখায়, মোমবাতি বেচে। আমরা মোমবাতি নিলাম না, হেমদা টর্চ এনেছিল সঙ্গে করে। মিনারে ঢোকবার সদর দরজাটির তালা সে খুলে দিল। বিশাল দরজা, বিরাট তালা।

হেমদা পরিহাস করে বলল, "ভেতরে ভয়ের কিছু নেই তো? সাপ-খোপ?"

মাথা নাড়ল বুড়ো, "অত উঁচুতে সাপ-খোপ যাবে কি করে! সাপ নেই, শের নেই, ভাল্লু নেই। মিনারের নিচুর দিকে পাখির বাসা, পাখি দু'চারটে থাকতে পারে, পতঙ্গ দু'পাঁচটা।"

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হেমদা হাসিমুখে আবার শুধালো, "ওপরে উঠতে কতক্ষণ লাগবে জি?"

বুড়ো হেমদাকে দেখল কয়েক পলক, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে মিনার দেখাল,

নাকি আকাশ, বলল, "রামজিকে মালুম।"

বাবা দরজা দিয়ে প্রথমে গেলেন, তারপর মা; দিদি গেল, পুষ্প গেল; হেমদা আমায় ঠেলা দিল, আমি হেমদাকে আগে এগুতে দিয়ে পরে একবার বাইরের দৃশ্যাবলি এবং সেই বৃদ্ধের মুখ চকিতে দেখে নিয়ে মিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।

বাইরের অফুরন্ত আলো এবং রোদ থেকে বদ্ধগৃহে আসায় সহসা মনে হল, সমস্ত আলো দপ করে নিবে গেছে। অন্ধকার যেন অভেদ্য। সামান্য সময় আমরা নাড়াচাড়া না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি যথাসাধ্য চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক করে যখন এই অন্ধকার সইয়ে নিচ্ছি তখন আমার মনে হল, আমার এবং হেমদার, হেমদা এবং দিদির, বাবা মা পুষ্প—আমাদের সকলের মধ্যে কেমন একটি ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে, আমরা প্রত্যেকেই পৃথক। অদ্ভুত কোনও অন্ধকার যেন আমাদের মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে।

বাবা সামান্য কাশলেন, তারপর পা বাড়ালেন; তাঁর হাতে ছড়ি ছিল, ছড়ির শব্দে বুঝলাম তাঁর চোখে এই আকস্মিক অন্ধকার সয়ে গেছে, তিনি এগুতে শুরু করেছেন।

মা, দিদি, পুষ্প একে একে এগিয়ে যেতে লাগল। আমার চোখে অন্ধকার সয়ে গেল; বাবা, মা, হেমদা—সকলকেই দেখতে পেলাম। যে অন্ধকার অভেদ্য মনে হয়েছিল, সে অন্ধকার যে কিছু না, নিতান্ত দৃষ্টিবিভ্রম, এখন তা অনুভব করে খুব সহজেই পা বাড়ালাম।

বাবা, মা, দিদি, পুষ্প—সকলেই কথা বলছিল। আমরা সামান্য এগিয়ে যেতেই আলো পেলাম, নিচের বৃহৎ গোল চত্বরটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হল।

হেমদা বলল, "অস্তু, কিভাবে ভিত তুলেছে, দেখেছ! কত বড় সারকামফারেন্স। মনে হচ্ছে যেন বিরাট একটা গোল পুকুর কেটে বেঁধেছে।"

বাবা সামান্য কাশছিলেন, দিদিও গলা পরিষ্কার করছিল। নিচের বাতাস বড় ভারী, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কতকালের বাতাস যেন এখানে চুপ করে বসে বসে নিজেকে ক্রমশ একরকম প্রাচীন গন্ধ দিয়েছে, যে গন্ধ আলোয় ও বাতাসে পরিশুদ্ধ নয়।

বাবা আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন, পাশে মা, মা'র প্রায় গা ঘেঁষে দিদি। আমরা পেছনে।

দিদি বলল, "বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

"হয়েছিল একটু, এখন সয়ে আসছে।"

"দেখতে পাচ্ছ? টর্চ দিতে বলব?"

"এখন পাচ্ছি। ওপর থেকে আলো আসছে।"

ওপর থেকে আলো আসছিল। আমরা প্রথম সোপানের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

"জামাইবাবু—" পুষ্প ডাকল।

"বল।" হেমদা জবাব দিল।

"সিঁড়ি গুনবেন নাকি?"

"ওঠার সময় নয়।"

"কেন!"

"ওপরে ওঠার সময় কখনও শেষ দেখতে নেই, উদ্যম নষ্ট হয়," হেমদা হালকা গলায় বলল। "সিঁড়িও গুনতে নেই ঠিক ওই কারণে।"

বাবা সোপানে পা দিয়েছেন, মা বললেন, "পারবে তো?"

"তোমার কি মনে হচ্ছে পারব না?" বাবা কেমন গলায় যেন বললেন।

মা বোধহয় একটু লজ্জা পেলেন। "অভ্যেস তো নেই। আস্তে ওঠ।"

"আমি ঠিক উঠব। তুমি সামলে এস।" বাবা যেন অনেকটা আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজের আরোহণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন। তারপর সামান্য বুঝি পরিহাস করে দিদিকে বললেন, 'রেণু, তোমার মা'র একটা হাত ধর।"

দিদি বোধ হয় মা'র হাত ধরতেই যাচ্ছিল, মা বললেন, "ছাড়, এত চওড়া সিঁড়ি, সবাই উঠছে আমি পারব না!"

বাবা মা দিদি সোপানে উঠছে, আমরা পিছু পিছু। আশ্চর্য, প্রথমে যখন ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন এই কূপসদৃশ বদ্ধ ইমারতের কোনও দিশে পাইনি। এখন আমাদের সামান্যই অসুবিধে হচ্ছে। সোপানের ধাপগুলি মিনারের গা বেয়ে বুঝি চক্রাকারে উপরে উঠে গেছে। ক্রমশই অনুভব করছিলাম, কয়েকটি চক্রাকার সিঁড়ির আবর্তের পর একটি করে তল; অনুমান করতে পারছিলাম, প্রতি তলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার পথ ও অলিন্দ আছে, কেননা আমরা বাইরে থেকে প্রাচীর দেওয়া অলিন্দ দেখেছি। গবাক্ষ, ঘুলঘুলি ও অলিন্দ-পথে আলো আসছিল।

"হেমদা"—আমি বললাম, "মনে হচ্ছে খানিকটা উঠে গেলে আলো বাতাসের কমতি হবে না।"

"হওয়া উচিত না," হেমদা বলল। "দেখে তো মনে হয় উলটো-উলটি জানলা মাথা বরাবরই আছে।"

আমাদের গলার স্বর সামান্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। হয়তো এই শূন্য এবং বিশাল ইমারতের মধ্যে ঢোকার পর আমরা ক্রমশই নিজেদের অজ্ঞাতে আমাদের গলার স্বর উচ্চ করছিলাম। বদ্ধ এবং জনশূন্য বড় ঘরে যেমন শব্দ সামান্য প্রতিধ্বনিত হয়, আমাদের কথাগুলিও আপাততত সেই রকম প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছিল।

পুষ্প বলল, "আমি সেই রাজার কথা ভাবছি, বেচারি রাজ্যের পাথর গাঁথতে গাঁথতে বুড়ো হয়ে গেল!"

"রাজপ্রাসাদে বসে থাকলেও বুড়ো হত," হেমদা জবাব দিল।

"হলেও বা, কিন্তু এই পাথর গেঁথে সময় নষ্ট কেন!"

"আমাদের কাছে পাথর, যে করেছিল তার চোখে হয়তো পাথর ছিল না।"

হেমদার কথায় খুব আচমকা আমার কেমন যেন এক বুদ্ধিভ্রম হল। মনে হল, আমরা বাস্তবিক একটি প্রাচীন জরাগ্রস্ত স্তূপ অতিক্রম করছি না। রানির কথা আমার মনে পড়ল : আশ্চর্য সেই রাজমহিষী। রাজার সঙ্গে তিনি কি শুধু কথার খেলা খেলেছিলেন? কি অভিপ্রায় ছিল তাঁর? কেন তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি? মনে মনে আমি শেই উপকথার একটি ছবি তৈরি করে নেবার চেষ্টা করছিলাম।

বাবার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁর গলার স্বর গম্ভীর শোনাচ্ছিল। বাবা মাকে বলছিলেন, "ছেলেবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম। আমাদের ওখানে একটা চাঁদমারি ছিল, বড় টিলার মতন, আমরা নিচের মাঠ থেকে ছুটেএসে এক দমে সেই চাঁদমারি উঠতাম। যে আগে উঠত সেদিনকার মতন চাঁদমারিটা তার দখলে যেত। চাঁদমারি ছিল আমাদের কেল্লা আর কি!" বাবা হাসলেন।

মা'র মাথার কাপড় পড়ে গিয়েছিল, কাপড়টা তুলতে তুলতে মা হাসির গলায় বললেন, "তুমি ক'দিন কেল্লা পেতে?"

"প্রায়ই পেতাম। আমার খুব দম ছিল।" বলে বাবা থামলেন; তারপর আমাদের সকলের সামনে রহস্য করে মাকে বললেন, "আমার দমটা বড় বুকের, তুমি তো জানোই।

দিদি বাবার একটু বেশিরকম প্রিয়। বাবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে দিদির বাধে না। বাবার কথা শুনে দিদি হেসে বলল, "তুমি এমন করে বলছ-না বাবা, যেন এখনও আমরা সবাই মিলে ছুটলে সবার আগে ওপরে উঠে যাবে!"

বাবা এবার জোরে হাসলেন। তাঁর হাসি যখন প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, তখন তিনি হঠাৎ বুঝি নিজের কানে সেই শব্দ শুনতে শুনতে থেমে গেলেন। তারপর ডান দিকে ফিরে চওড়া মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, "এস তবে, দেখ—। এ-পর্যন্ত আমি পৌঁছেচি, তোমাদের আগে আগেই।"

সিঁড়ি ঘুরে আমরা একে একে মিনারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাঁধানো চত্বর, বুক সমান পাঁচিল তোলা। শীতের মধ্যাহ্ন ফুরিয়ে এল। রোদ অনেকটা যেন দোপাটি ফুলের রং নিয়েছে, তার তাত মরে এসেছে। এতটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে চারপাশ স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন ছবির মতন দেখাচ্ছিল। দূরে আমাদের সেই তিনটে টাঙা, ঘোড়াগুলো মাঠে চরছে, প্রান্তর এবং তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে রোদ আলস্যভরে শুয়ে আছে, শীতের বাতাস বইছিল; দূরে পাহাড়, একটি মেঘ আপন মনে ভেসে চলেছে। কয়েকটি বুনো বক শুন্যে বিচরণ করছিল।

হেমদা ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে তিনটে। পুষ্পর কাঁধে জলের বোতল। আমার হাতে চায়ের গোল ফ্লাস্ক। হেমদার ঘাড়ে মস্ত একটা থলি ঝুলছে, তার মধ্যে পুরনো খবরের কাগজ, টর্চ, কমলালেবু, বিস্কিট, আরও কত টুকটাক।

পুষ্প জল খেল কয়েক ঢোক। দিদির হাতে মা'র পানের কৌটো, মা পান খেলেন। হেমদা আমাদের কমলালেবু দিল। লেবুর খোসা ছাড়িয়ে আমরা নিচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

দিদি বলল, "আরও খানিকটা ওপরে উঠে চা খাব।"

আমরা ঊর্ধ্বমুখে মিনারের চূড়া দেখলাম। মাথার ওপরকার তলাগুলি ঠিক বোঝা যায় না, বাইরের বাঁধানো গোল অলিন্দে আড়াল পড়ে যায়। দিদি বললে—আরও চার; পুষ্প বলল, পাঁচ; আমার মনে হল আরও বেশি।

বিশ্রাম শেষ হলে বাবা বললেন, "নাও, চল। শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।"

আমার মনে হল, বাবার পক্ষে এই সিঁড়ি ওঠার পরিশ্রম হয়তো বেশি হচ্ছে। শরীর খারাপ হতে পারে। বললাম, "তুমি আরও উঠবে?"

বাবা আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এক এক সময় আমি অত্যন্ত প্রখর এক সঙ্কল্প অনুভব করি। মনে হল, বাবা সেই রকম দৃষ্টিতে আমায় দেখলেন। তারপর বললেন, "চল, দেখি।"

আমরা আবার মিনার অভ্যন্তরে একে একে প্রবেশ করলাম।

আলো এবং ছায়ার মধ্য দিয়ে সোপান অতিক্রম করে আরও খানিকটা উঠে এলাম। ধুলো, মাটি, পাখির গায়ের বাসি গন্ধ, জীর্ণতার ঘ্রাণ প্রায় আর ছিল না। সিঁড়িগুলি এখনও চওড়া, তবে মনে হল ক্রমশই তার দৈর্ঘ্য কমে আসছে। বাবা সামান্য দেরি করে পা ফেলছিলেন। মা একবার দিদির হাত ধরে ফেলেছিলেন, ভেবেছিলেন সিঁড়িতে হোঁচট লেগেছে, আসলে মা'র পায়ে শাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্য ক্রমশই হেলে যাচ্ছে বলে রোদের কেমন গোল ও চৌকোনো কিরণ মিনারের ঘুলঘুলি ও ঝরোকা পথে সোজাসুজি দেওয়ালে গিয়ে পড়ছিল। আর আমাদের কণ্ঠস্বর এখন প্রতিধ্বনিত হতে হতে নিচে এবং ওপরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পুষ্প খেলাচ্ছলে কয়েকবার আ—আ ডেকেছে, এবং তার ডাক অধঃ এবং ঊর্ধ্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বাবা এক সময় বললেন, "তোমাদের উচিত ছিল আরও একটু বেলাবেলি আসা।"

দিদি বলল, 'আর কত বেলাবেলি আসব। দুপুরেই তো এসেছি।"

"আলো পড়ে গেলে অসুবিধে হবে।"

"আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে।"

"তোমরা শেষ পর্যন্ত উঠবে ঠিক করেছ?"

"হ্যাঁ, নয়ত আসা কেন!"

"পারবে তো?"

দিদি কিছু বলার আগেই হেমদা বলল, "এমন কিছু উঁচু নয়, না পারার কিছু নেই।"

বাবা সামান্য চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, "ওপরের দিকের সিঁড়ি কেমন তা তো জানো না!"

হেমদা কোনও জবাব দিল না। যেন বাবার এই সন্দেহ সম্পর্কে কিছু বলা নিরর্থক। আমরা বুঝতে পারছিলাম, বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি আর বেশি উঠবেন না, ওঠা সম্ভব নয়। আরও সামান্য কিছুটা উঠতে পারলে বাবা বিশ্রামের স্থান পাবেন ভেবে আমরা কোনও উদ্বেগ বোধ করলাম না। তাঁকে বিব্রত বা ব্যস্ত না করার জন্যে আমরাও ধীর পায়ে সোপান উঠছিলাম। সকলেই নীরব তখন, আমাদের পায়ের শব্দ, বাবার ছড়ির শব্দ, স্থূল একটি আলোর বৃত্ত বাবার মাথার ওপর, বাবা সামান্য পরে সেই আলোর বাইরে চলে গেলেন, দিদি একবার ঘাড় ফিরিয়ে মাকে যেন দেখল।

এই স্তব্ধতা আমাকে কাতর করছিল। কেন জানি না, যেসব কথাগুলি এতক্ষণ আমাদের ছ'জনের মধ্যে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল, যেন সেই হাত আমরা ছাড়িয়ে নিয়েছি কিংবা শিথিল করেছি—এই রকম মনে হওয়ায় আমি অধৈর্য হয়ে কথা বললাম।

"হেমদা, তোমার গরম লাগছে?"

"সামান্য।"

"কোটটা খুলে ফেললে হয়।"

"চল, ওপরে গিয়ে দেখব।"

পুষ্প ডাকল, "জামাইবাবু—"

"বল।"

"সেই রানি এই সিঁড়ি কেমন করে উঠত?"

"তুমি যেমন করে উঠছ।"

"আমার তো হাঁটু ব্যথা করতে শুরু করে দিয়েছে।"

"তবে আর কি, থেকে যাও।"

"ইস্ রে, এত সহজে! চলুন না, শেষ পর্যন্ত কে থাকে কে যায় দেখব।"

"তাই ভাল—।" হেমদা গলার স্বর খুব নিচু করে বলল, "তুমি আগে আগে থাকলে আমি প্রেরণা পাব।"

পুষ্প যেন বলার কথা পেল না কিছুক্ষণ। তারপর মুখ ফসকে বলে ফেলল, "আর আমি কি পাব?"

ওরা কেউ এবার হাসল না।

এ-সোপান শেষ হল। বাবা প্রশস্ত স্থানটি দিয়ে বাইরে এলেন। মা, দিদি, হেমদা পুষ্প এবং আমিও। অনেকক্ষণ পরে আবার মুক্ত আলো-বাতাসে চোখ মেলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাবা হাঁপাচ্ছিলেন, মা'র কপালে ঘামের বিন্দু। দিদি মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছিল। বাইরে এখনও রোদ, মোলায়েম এবং নিষ্প্রভ সেই আভায় চতুর্দিক ঈষৎ আর্দ্র দেখাচ্ছে যেন; মাঠে আমাদের অলস ঘোড়াগুলি দাঁড়িয়ে, টাঙাঅলারা কুয়ার জল তুলছিল, অতি দূরে একটি বয়েলগাড়ি কাঠ-বোঝাই হয়ে চলেছে। শীতের হাওয়া খর হয়েছে।

হেমদা কাঁধের ঝোলা থেকে পুরনো কাগজ বের করে পুষ্পর হাতে দিল। পুষ্প কাগজ বিছিয়ে দিল নিচে। বাবা বসলেন, মা বসলেন; দিদি এবং পুষ্পও। আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। জল খাওয়া শেষ হলে চায়ের কাপ বেরুল। বাবা শুধুই চা খেলেন, মা চা এবং পান। আমরা কিছু খাবার ও চা খেলাম।

বাবাকে পরিশ্রান্ত দেখালেও বিরক্ত দেখাচ্ছিল না। তিনি যেন নিরুদ্বেগে এই বিশ্রাম উপভোগ করছেন। তাঁর মুখে একটি অবসাদ মোচনের আলস্য ভাব। মিনে করা সিগারেটকেস থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে মৃদু মৃদু ধোঁয়া টানছিলেন, কখনও আকাশ দেখছিলেন, কখনও মাকে, কখনও আমাদের।

আকাশে একটি মনোহর অলক্ত মেঘ ভেসে এসেছে, বিহঙ্গহীন শূন্যের কোথাও বুঝি অপরাহ্ণের মায়া জন্মেছিল। আমরা একে একে পুনর্যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম।

দিদি বলল, "বাবা, তুমি তাহলে এখানে বসছ!"

"হ্যাঁ, আমি আর পারব না। দিস ইজ্ মাই লিমিট্।"

পুষ্প হেসে বলল, "তুমি কিন্তু খুব একটা উঁচুতে ওঠনি, বাবা। ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়েছে বলে এতটা লাগছে।"

বাবা পুষ্পর দিকে তাকালেন, তাকিয়ে থাকলেন স্থির চোখে, ওঁর দৃষ্টি সহসা আহত, ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট মানুষের মতন দেখাল। বললেন, "হ্যাঁ, আমি অনেক ঘুরে ঘুরে উঠেছি।...আর ওঠার সাধ্য আমার নেই, সাধও নেই।"

বাবার গলার স্বর সম্পূর্ণ অন্যরকম শোনাচ্ছিল, আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, বাবার চোখের তলায় অভিমানের সামান্য কালি পড়ল যেন। তিনি মা'র দিকে আস্তে করে মুখ ফেরালেন, মুখ ফিরিয়ে টেনে টেনে অন্যমনস্কভাবে পুষ্পকে বললেন, "....তোমার মা জানেন আমি কতটা ঘুরে কোথায় উঠেছি।...তা সে যাই হোক, আমি এতেই সন্তুষ্ট।"

আমরা, বাবার পুত্র কন্যা ও জামাতা, সকলেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বাবা আমাদের কাউকেই দেখছিলেন না, তিনি মা'র মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলেন।

৩

আমরা চারজনে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে সোপান উঠেছিলাম আবার। বাবা নিচে থেকে গেছেন, মা-ও আর আসতে পারেননি। বাবা ও মা'র কাছ থেকে চলে আসার পর আমরা আগের মতন হালকা ও স্বাভাবিক মন ফিরে পাচ্ছিলাম না। কেউই কারুর কাছে প্রকাশ করছিলাম না যে, আমরা কোথায় যেন একটি অন্যতমনস্কতা নিয়ে আপাতত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছি, অথচ বুঝতে পারছিলাম, আমরা বাবা এবং মা'র কথা ভাবছি।

বাবার বিষয়ে দিদির দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। দিদি বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "আমার জ্ঞান হওয়া থেকে এখন পর্যন্ত বাবাকে দেখছি। আমি জানি, বাবার সবটাই নিজের করা।"

আমরা কোনও সাড়া দিলাম না। দিদি কি বলতে চাইছে, আমরা জানি। আমি আমার ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবাকে দেখেছি, দিদির আরও প্রায় সাত-আট বছর বেশি দেখার কথা। হয়তো দিদি বলতে চাইছে, বাবার সেই প্রায়-নিঃসম্বল অসহায় দরিদ্র অবস্থাটিও দিদি দেখেছে। আমিও জ্ঞান উন্মেষের বয়সে বাবার রাজকীয় রূপ দেখিনি। সংসারে বাবা অনেক পুড়েছেন, অনেকবার মার খেয়েছেন, হয়তো পা রেখেছেন কোথাও, পরমুহূর্তে দেখেছেন অবলম্বন সরে গেছে। এ-সব আমরা কিছু জানি, কিছু বা শুনেছি। শোক, তাপ, সন্তাপের পর তবে তাঁর সাফল্য।

দিদি আবার বলল, "যে-মানুষ এক সময় টিনের ছাউনির তলায় একটা ভাঙা মেশিন আর একজন মাত্র লোক নিয়ে সারাদিনে পাঁচটা টাকার বেশি রোজগার করতে পারেনি, আজ তার লক্ষ টাকার কারখানা, নিজের বাড়ি-গাড়ি। এতটা করা মুখের কথা নয়।"

পুষ্প কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, "অত বলার কি আছে! বাবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছেন জীবনে, তা পেয়েছেনও, এ আমরা জানি।"

পুষ্পর কথায় দিদি যেন অপমান বোধ করল, আহত হল, বলল, "হ্যাঁ, আমরাও

সেটা না পাচ্ছি এমন নয়। বাবা চেষ্টা করে পেয়েছিলেন, আমরা সবাই বসে বসে পাচ্ছি।...আর আমরা পেয়েছি বলেই তার দাম দেবার কথা ভাবছি না।"

দিদি এবং পুষ্পর কথা-কাটাকাটি হেমদা আর বাড়তে দিল না। বলল, "সকলেই একরকম জিনিস চায় না। যার যা আশা। তোমাদের বাবা তো বলেই দিলেন, তিনি আর কিছু চান না, ওই পর্যন্ত তাঁর লিমিট।" বলে হেমদা হেসে বলল, "রেণু ঠিকই বলেছে, তোমাদের উনি এ পর্যন্ত এনে দিয়েছেন, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তোমাদের আর ভাবতে হবে না।...এখন যা ভাবার তাই ভাব, এখনও অনেকটা উঠতে হবে—দম নষ্ট কর না।"

পুষ্প আর কিছু বলল না, দিদিও চুপ করে গেল।

আমি আমার পায়ের তলার সিঁড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়, এখন আবার মনে হল। পা শক্ত করে এক সিঁড়ি থেকে অন্য সিঁড়িতে উঠে যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সকলকে শুনিয়ে বললাম, "বাবা আমাদের অনেকগুলো শক্ত সিঁড়ি তুলে দিয়েছেন; নাও এখন চল।"

হেমদা হাসল, "বেশ বলেছে অন্তু, মার্ভেলাস।...কিন্তু একটা জিনিস তুমি দেখলে না।"

"কি জিনিস?"

"মা কেমন বাবার পাশটিতে থেকে গেলেন।"

"মা কোনওকালেই বাবার বেশি যেতে চান না। বাবাকে ছেড়েও যেতে চান না।" আমি সরল গলায় বললাম।

হেমদা হাসল, তার হাসি দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে কেঁপে যেন অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে নিচে তলিয়ে শেষে ডুবে গেল।

আমরা চারজনে আরও দুটি তল উঠে এলাম। দিদি হাঁপিয়ে পড়েছিল। দিদির চেহারাটা একটু ভারী। মাথায় কিছু লম্বা বলে দিদিকে ওই ভারী চেহারায় বেমানান দেখাত না। অনেক সময় দিদিকে লোকে অবাঙালি বলে ভুল করেছে। দিদির মুখেও তেমন তেলতেল ভাব ছিল না, একটু বোধ হয় রুক্ষ ও শক্ত দেখাত।

দিদি পুষ্পর কাছ থেকে জল চেয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। পুষ্পও মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। আমরা যেন যথেষ্ট উচ্চে উঠে এসেছি তা বোঝা যাচ্ছিল। নিচের যাবতীয় বস্তু ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল; আমরা দুরান্তের গ্রামটি এবং বৃক্ষলতা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, সব যেন একই পটে আঁকা; উচ্চতার জন্য এখানে বাতাস অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ, শীত করে উঠল, আমরা মা ও বাবাকে দেখলাম, নিতান্ত শিশুর মতন দেখাচ্ছিল, পুষ্প ডাক দিয়ে ওঁদের ডাকল, হাত নাড়ল, বাবা-মা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

মাঘের এই অপরাহ্ন-বেলা ক্রমশই বিষণ্ণ হয়ে এসেছে, অদ্ভুত নিঃশব্দতা চতুর্দিকে, সেই অলক্ত মেঘটি কোন দূরান্তে চলে গেছে। একটি পাখির দল বনপ্রান্তর থেকে উড়ে উড়ে আসছিল। নীল আকাশতলায় মিনারের মাথাটি যেন মহিমার মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে।

হেমদা বলল, "নাও, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, বিকেল হয়ে আসছে, আলো থাকতেই স্বর্গে উঠতে হবে।"

আমরা প্রস্তুত, দিদিই মাটিতে বসে। দিদির চোখ দুটিতে অবসাদ; মুখে ক্লান্তি ফুটে আছে। হাতের রুমালে দিদি কপাল মুছল। শীতের এই প্রচণ্ড বাতাসে তার কপালে ঘাম থাকার কথা নয়, হয়তো যে গ্লানিটুকু তার কপালে জমে আছে, অভ্যাস-বশে সে সেটুকু মোছার চেষ্টা করল। দিদি অনেকদিন হল এইভাবে তার কপাল মোছার চেষ্টা করল। দিদি অনেকদিন হল এইভাবে তার কপাল মোছার চেষ্টা করছে, আমি জানি।

দিদির জন্যে আমার মায়া হল, দুঃখ হল। বললাম, "কি দিদি, ওঠ।"

ওঠার কথায় দিদি তেমন উৎসাহ পেল না আর, তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

হেমদা শুধলো, "পারবে কি?"

দিদি ক্লান্তস্বরে বলল, "দেখি। এই মাঝ-পথে একলা বসে থাকব কি করে!" দিদির বিষণ্ণ চোখ দুটি আমায় অপরাহ্নের ছায়ার কথা মনে পড়াল।

আমরা চারজনে আবার সেই বদ্ধ এবং ধূসরলোক মিনারের মধ্যে এলাম। সোপানগুলি এখন বেশ ছোট এবং খাড়া হয়ে উঠেছে। হেমদা আগে; পুষ্প, দিদি—পর পর; সবার শেষে আমি। আমরা সকলেই কম-বেশি পরিশ্রান্ত থাকায় আগের মতন দ্রুত সিঁড়ি উঠতে পারছিলাম না; এই সিঁড়ির ধাপগুলিও আরোহণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দিদির কথাও আমরা ভাবছিলাম, তাকে ধীরে সুস্থে উঠতে দেওয়াই ভাল। কনকনে ঠাণ্ডার একটি ভাব জমছিল এতক্ষণে।

হেমদা বলল, "অন্তু, মহাপ্রস্থানে যাবার সময় কার কি দোষে পতন হয়েছিল জানো তো?"

"জানি বলে মনে হচ্ছে।"

"আমার মনে নেই, ভুলে গেছি।"

হেমদা কথাটা কেন বলল জানি না। আমার দিদির কথা মনে পড়ল। হেমদা কি দিদিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলতে চাইল। এবার কি দিদির পতন হবে.

পুষ্প অকস্মাৎ কেমন ভীতরবে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা চমকে গেলাম। পুষ্পর আতঙ্কিত স্বর আরও ভয়ানক হয়ে ফাঁপা ফাঁপা সুবিশাল এই মিনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। হেমদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছু ফিরে পুষ্পকে ধরে ফেলল।

"কি হল?" হেমদা উদ্বিগ্ন গলায় শুধোলে।

পুষ্প কোনও কথা বলতে পারল না সামান্য সময়, তারপর ভীতস্বরে বলল, "কি একটা আমরা মুখের পাশ দিয়ে ছুঁয়ে গেল।"

"দূর...কি ছুঁয়ে যাবে আবার!"

"আমি বলছি গেছে, আমার গলার পাশ দিয়ে চলে গেল। হাতের মতন।"

"বাদুড় হয়তো।" আমি বললাম।

হেমদা ঝোলা থেকে টর্চ বের করে আলো ফেলল। "কই! কিছু নেই তো!"

"অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে..." পুষ্প বলল।

"যাক, নাও চল।"

আরও খানিকটা উঠে আসতেই আমরা আচমকা একটি ঘরের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। মনে হল সিঁড়ির বাঁকে একটি ছোট ঘর, তার দু'দিকেই উন্মুক্ত পথ। তৃতীয় পথে আমরা এসেছি। আমরা ডান দিকের পথে এলাম, সামনে নিকষ কালো অন্ধকার, বাঁ দিকের পথে গেলাম—অটুট আঁধার, যেন অন্ধকারের প্রাচীর গাঁথা আছে। হেমদা টর্চ জ্বালাল। আলোয় অল্প অল্প বোঝা গেল : উভয় পাশেই ক্ষুদ্রাকার ঘর, ঘরগুলির দু-পাশেই দু'টি দরজার মতন পথ। ডান দিকের ঘর ধরে এগিয়ে যেতে আবার একটি সমান আকারের একই রকম পথ-অলা ঘর চোখে পড়ল। আমরা আর বাইরের আলো পাচ্ছিলাম না।

হেমদা বলল, "অন্তু, আমার মনে হচ্ছে, একটা বড় গোল ঘরকে যেন চার-পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ঘরে দুটো করে দরজা করা হয়েছে।"

"কেন?"

দিদি যেন কি বলতে যাচ্ছিল, পুষ্প হঠাৎ বলল, "আমার কেমন লাগছে। আমরা যেন পাতালে নেমে গিয়েছি। কী অন্ধকার!...আমার ভয় করছে। জামাইবাবু, বাইরে চলুন।"

হেমদা কোনও জবাব দিল না, কি যেন ভাবছিল চুপ করে দাঁড়িয়ে। শেষে বলল, "আমার বিশ্বাস এই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে কোনও একটা পথ চূড়ায় উঠে গেছে। হয়তো সামান্য আর-একটু পথ বাকি আছে আমাদের।"

"কিন্তু হঠাৎ এখানে এ-রকম বেয়াড়া ঘর করবার কারণ কি?" আমি শুধোলাম।

"কে জানে! হয়তো ওপরের কনস্ট্রাকশনের জন্যে।...আসলে অন্তু, এগুলো ঠিক ঘর নয়, পথও নয়; খিলান। খিলান বড় বেশি, তাই ধাঁধার মতন দেখাচ্ছে।"

দিদি বলল, "আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাইরে চল।"

"তাহলে—" হেমদা হাসল; "এই পর্যন্ত; এত কাছাকাছি এসেও ফিরে যেতে হবে!"

আমার ফেরার ইচ্ছা ছিল না। যদি এমনই হয়, প্রায় আমরা চূড়ার কাছে পৌঁছে গেছি—তবে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমার বরাবর আফশোস থাকবে। আমি বললাম, "হেমদা, দিদিরা বাইরে অপেক্ষা করুক, চল আমরা যাই।"

হেমদা বলল, "তাই ভাল!...তার আগে তো বাইরে যাই..."

আমরা বাইরে আসার জন্যে একটি একটি করে দরজা পেরোলাম, কিংবা সেই বিসদৃশ খিলানগুলি অতিক্রম করছিলাম। হেমদার হাতে টর্চ। আমরা চারজনে গায়ে গায়ে পিছু পিছু চলেছি। চলেছি, চলেছি—অথচ কী আশ্চর্য, বাইরের আলো পাচ্ছি না, পথ পাচ্ছি না। ক্রমশই দিদি ভীত হচ্ছিল, পুষ্প অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আমারও কেমন উদ্বেগ জমছিল ক্রমশ।

দিদি বিড়বিড় করে বলল, "ছি ছি, কী ভুল করেছি।...এখানে কেন এসেছি!"

পুষ্প কাতর হয়ে বলল, "জামাইবাবু, বাইরে চলুন—আর পারছি না।"

আমরা বাইরের পথ পাচ্ছিলাম না। প্রতিবার ভাবছি, ওই খিলানের পেরোলে বাইরের

আলো আমাদের পথ দেখিয়ে ডেকে নেবে; প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, আমরা আমাদের পথটুকু পেয়ে যাব, অথচ আমরা এই রহস্যময় গোল ঘরটির কয়েকটি অংশের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যত সময় বয়ে যাচ্ছিল আমরা পথ হারানো পথিকের মতন, গুহা মধ্যে নিক্ষিপ্ত পশুর মত ততই অধৈর্য ও হতাশ হয়ে কেমন অদ্ভুত এক শঙ্কা অনুভব করছিলাম। দিদি চিৎকার করে কি যেন বলল, তারপর নিজের সেই অদ্ভুত চিৎকারের বিচিত্র প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হবার আগেই পাশের দরজার দিকে ছুটে গেল। দিদি ওখানে আলোর আভাস দেখে ভেবেছিল, বাইরের পথ পেয়েছে। দিদি ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গই আমরা তার পিছু পিছু ছুটে গেলাম। বাইরের আলো দেখা দিল, অতি সামান্য; আমরা দিদির জন্যে—আলোর জন্যে মরিয়া হয়ে আলোর দিকে এগিয়ে যাবার সময় সহসা পরস্পরের কথা ভুলে গেলাম! আমরা প্রত্যেকেই পাগলের মতন আলোয় আসতে গিয়ে হুড়োহুড়ি এবং ছুটোছুটি করে কোথায় এসে পৌঁছলাম জানি না—অথচ আমি আমার পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে সঙ্গীচ্যুত ও একাকী হয়ে গেছি অনুভব করে পাথরের মত নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমার ভীত হৃৎপিণ্ড অতি দ্রুত হয়ে উঠেছিল, ধক ধক শব্দটা আমার কানে বাজছিল, যেন হৃৎপিণ্ডটি বুকের মধ্য থেকে লাফিয়ে আমার কানের কাছে চলে এসেছে। সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেই অবর্ণনীয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আমি হেমদাকে ডাকলাম।

আমার ডাকের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে আসার আগেই পুষ্পর ডাক শুনতে পেলাম, "অন্তুদা—"

হেমদা ডাকল, দিদি ডাকল। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ডাকছি। গলার স্বর মাত্র আমাদের সম্বল। আমরা কেউ আর পরস্পরের পাশে নেই। আমরা সকলেই আতঙ্কিত ও আর্ত। আমরা পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলাম।

হেমদা চেঁচিয়ে বলছিল যে, অন্ধকারে আমরা যেন পথের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, হেমদা আলো হাতে একে একে আমাদের কাছে আসবার চেষ্টা করছে।

প্রায়-মৃত, বেহুঁশ মানুষের মতন আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। অজ্ঞাত, বীভৎস একটি দানবের মতন যেন নিঃশব্দে মৃত্যু আমার কাছে এগিয়ে আসছিল।

দিদি পাগলের মতন কাঁদছে, পুষ্প ডেকে ডেকে গলা দিয়ে বুঝি রক্ত বের করে ফেলল, হেমদা সাহস দিচ্ছে; বার বার বলছে, সে আসছে, সে আসছে। অথচ হেমদা আসছিল না।

হয়তো মানুষের কোনও আদি অনুভূতি তাকে শেষ সময়ে পশুর মতন বেপরোয়া করে তোলে; আমি সেই পাশব ও অদম্য আত্মরক্ষার প্রেরণায় মসীকৃষ্ণ অন্ধকার ও অজ্ঞাত পথ অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালাম। পা টেনে টেনে দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটছি হাঁটছি; দিদি বমি করছে যেন, পুষ্প বাচ্চা মেয়ের মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনও মনে হয়, তারা আমার কাছে চলে এসেছে, হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারব; কখনও মনে হচ্ছিল ওরা অন্য কোথাও চলে গেছে,

আমি এখানে একা। সম্ভবত আমারই মতন দিদি এবং পুষ্প মরিয়া হয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছিল, হেমদা সেই অদ্ভুত গোলকধাঁধার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে যথাসাধ্য করছিল। ক্রমশই আমাদের গলার স্বর বসে এল, আমরা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে নীরব হয়ে নিস্তব্ধতা বিরাজ করলে এই স্থানটি যেন তার পরিত্যক্ত মহিমা ফিরে পেল।

কতক্ষণ পরে জানি না, সহসা আলো দেখতে পেয়ে আমি হেমদাকে ডাকলাম। হেমদা আমায় ডাকল। পুষ্প সাড়া দিল, দিদির কথা ভেসে এল। আমরা কে যে কোথা থেকে বেরিয়ে ছুটে আলোর সামনে আসছিলাম জানি না, পাগলের মতন ছুটে আসতে গিয়ে পুষ্প হেমদার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঠক্ করে শব্দ হল; মেহদার হাতের টর্চ মাটিতে পড়ে গেছে। আবার অন্ধকার। হেমদার মুখ থেকে আর্ত শব্দ হল; যাঃ—!

মাটিতে বসে হাতড়ে হাতড়ে হেমদা টর্চ কুড়িয়ে ঝাঁকাল, হাতের তালুতে ঠুকল, নাড়ল-চাড়ল, তারপর আতঙ্কের স্বরে বলল, "বালব্ ভেঙে গেছে।"

টর্চের আলোটুকুতে আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছিল; আমি অনুভব করলাম—আমার এই হাত পা মাথা মুখ দৃষ্টি—এমনকি আমার হৃৎপিণ্ডও—আমার যা আছে—কিছু না, কিছুই নয়, ওই বাইরের আলোটুকুই আমার জীবন। সেই আলো নিবে গেলে আমি মৃত্যুভয়ে শিহরিত হলাম।

তারপর কি ঘটছিল আমি সুস্থ চেতনায় কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। কখনও হারিয়ে যাচ্ছিলাম, কখনও আমার পাশে কাউকে অনুভব করছিলাম। পুনরায় সেই নিষ্ফল চেষ্টা, ব্যর্থ উদ্যম, বারংবার পরস্পরকে আহ্বান। অন্ধকারের মধ্যে আমি একটি নাগরদোলায় চড়ে আছি যেন, নাগরদোলাটি ঘুরছে, কখনও আমায় ওপরে তুলছে, কখনও আবার নিচে ফেলে দিচ্ছে। অবশেষে আমার মনে হল, আমি যেন একটি ঘুমন্ত খোপকাটা জালি ঘরের মধ্যে একটি খোপে বন্দি, সমস্ত কক্ষটি—প্রতিটি খোপ ঘুরছে ক্রমাগত এবং আমি পাশের খোপে যেতে গিয়েও পারছি না, কখনও দিদি আমার কাছে এসে পড়ছে, তাকে হাতে ধরে টেনে নেবার আগেই সে চলে যাচ্ছে; কখনও হেমদা, কখনও পুষ্পকে আমি ছুঁতে গিয়েও ছুঁতে পারছি না।

এক সময় হেমদা আর দিদিকে আমার কাছাকাছি কোথাও অনুভব করলাম। দিদি প্রলাপের মতন কথা বলছে।—"আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করে আমার দিকে আসছ না; আমি তোমার হাত ধরতে পেয়ে যদি বেঁচে যাই, তুমি হাত গুটিয়ে আছে।"

"আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না, রেণু।"

"ও তো পুরনো কথা!...তুমি কি খোঁজ, কাকে খোঁজ, আমি জানি।"

"তুমিও তো খুঁজছিলে।"

"পাইনি। আমার কপাল।"

"তবে আর কি! যার যা কপাল..."

দিদির গলা আর উঠল না, হয়তো সে মুখ বুজে কাঁদছিল।

দিদিকে এ-সময় আমি কিছু বলতে চাইছিলাম। তাকে খোঁজার জন্যে হাতড়ে হাতড়ে কোথায় এলাম জানি না। "দিদি—"

দিদি সাড়া নেই। কয়েকবার ডাকলাম, "দিদি—দিদি।" দিদি সেখানে ছিল না। সে কোথায় গেল জানি না।

দীর্ঘসময় পরে আমি আবার দু'টি মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমার হাত ধরার চেষ্টা কর—চেষ্টা কর।"

"যাব কোথায়?" পুষ্পর গলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

"কোথাও যাব," হেমদা বলল।

"কোথায় আর যেতে পারছি!"

"পারব।...আমরা বেরোবার পথ খুঁজছি, একবার যদি পথ পাই..."

"আমি আর স্বর্গে যেতে চাই না।"

"পুষ্প, তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ; অত ভয় কেন!...আর একটু কাছে এস, আমি তোমায় কোথাও নিয়ে যাব, কোথাও..."

আমি হেমদাকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলাম না, আমার গলা বন্ধ হয়ে এল।

৪

রাত্রে ঘুমের মধ্যে পথ হাঁটলে যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির কোনও অনুভব থাকে না, আমারও কোনও চেতনা ছিল না, আমি অচেতনায় হাঁটতে হাঁটতে হাতড়াতে হাতড়াতে, পা ফেলে ফেলে কোথায় এসে পৌঁছলাম জানি না, অকস্মাৎ আমার চোখে শেষ অপরাহ্নের আলো লাগল। বিশ্বাস হল না, আমি আলোয় এসেছি; মনে হল; এ আমার মতিভ্রম। চোখ পরিষ্কার করে তাকালাম, আলো নিবল না। আমি আমার গা হাত পা লক্ষ করলাম, পোশাক নজর করে দেখলাম। অবশেষে আমি বাইরে আসতে পেরেছি। সহসা জীবনের বাসনাগুলি আমায় আন্দোলিত করল, সাহস এল, স্বস্তি ফিরে পেলাম। চারপাশের ঘেরা ঘুলঘুলি দিকে তাকিয়ে গোধূলির ম্রিয়মাণ আলো, ছায়াময় দূরান্ত বনানীর একটি অংশ যেন আমার চোখে পড়ল। সন্ধ্যাসমাগমে শীতের বাতাস অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কিছু সময় আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আমায় বলছিল, আমার মাথার ওপরে মিনারের শেষ চূড়ার মাথায় গোধূলির স্বর্ণচ্ছটা এখনও মুছে যায়নি। ওখানে কায়ক্লেশে ওঠার এখনও সময় আছে। আরও কয়েকটি দণ্ড।

কোনও এক দুর্বোধ আবেগ এবং আশঙ্কা আমায় অস্থির করে তুলছিল। এ সুযোগ কে হারায়! অনেক কষ্টের পর, অনেক ভ্রম এবং বহু অনিশ্চিত সোপান পেরিয়ে আমি এখানে এসেছি। নিতান্ত সৌভাগ্যবশে। এখান থেকে ফিরে যাওয়া মূর্খতা।

বাবার কথা আমার মনে পড়ল, তিনি এক জায়গায় উঠে এসে বসে আছেন। মা'র মুখ আমার চোখের সামনে ভাসল, মা বাবার পাশে পাশেই আছেন, যেন জীবনে মা সঙ্গদান ভিন্ন অন্য কিছুর আশা করেননি। দিদি অনেক আগে থেকেই ক্লান্ত, তবু

সে মাঝপথে থাকতে ভয় পেয়ে হেমদার কাছাকাছি উঠে আসতে চেয়েছিল, পারেনি। দিদি তার কপাল মুছতে পারল না। প্রথম যৌবনের গ্লানি তার কপালে লেগে আছে। দিদি মর্যাদার মোহে এবং আত্মরক্ষার্থে যেখান পর্যন্ত এসেছিল, সেখানে এসে থেমে গেছে, হেমদা তাকে খুঁজে পায় না। পুষ্প স্বর্গ চায় না, সে কি চায় জানে না, সে নিজের শঙ্কিত বাসনার অবসান চায় হয়তো, হয়তো সে চতুর প্রতিদ্বন্দ্বীর মতন চরম জয় চায়। আমি জানি না সে কি চায়। হেমদা অতি গোপনে তার জীবনের কোনও নিষ্ফল বাসনা পূর্ণ করতে চায় বুঝি, সে শুধু পথ খুঁজছে।

নিজেকে নিঃসঙ্গতম মানুষ অনুভব করার পর যে বেদনা হওয়া সম্ভব, আমি এখন সেই বেদনা অনুভব করছিলাম। আমি সকলকে পরিত্যাগ করেছি, সকলের সহযাত্রী হয়ে যাত্রা শুরু করে অবশেষে একাকী এখানে এসেছি। আমি চেষ্টা করব শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যেতে!

খুব সন্তর্পণে আমি গোধূলির আলোকটুকুতে একটি পথের আশায় চতুর্দিক লক্ষ করতে লাগলাম। সুউচ্চ প্রাচীর এবং সামান্য মাত্র ঘুলঘুলির জন্যে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। অনুমানে আমি পথ হাতড়াচ্ছিলাম।

সেই রাজ্যত্যাগী বৃদ্ধ রাজার কাহিনী আমার মনে পড়ল, যিনি খঞ্জ এবং অক্ষম হয়েও চেষ্টা করেছিলেন স্বর্গারোহণ করার। তিনি কি পেরেছিলেন শীর্ষে পৌঁছতে? আমার ত্রিপাঠীবাবুর কাহিনীও মনে পড়ল। সেই রানি প্রকৃতই কী চেয়েছিলেন। কোন অসামান্য তৃপ্তি? কতটা উচ্চতায় এসে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন? নাকি রাজা দেখেছিলেন, রানিকে তৃপ্ত করা অসাধ্য, তাই সাধ্যমত চেষ্টার পর রানিকে আর ফিরতে দেননি?

গোধূলির আলো ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছিল। আমার বুক অবসিত আলোর দিকে তাকিয়ে ক্রমশই দ্রুত ও ভয়ানক হয়ে উঠছিল। আর সামান্য পরে আলো মুছে যাবে, আমি শীর্ষদেশে উঠতে পারব না।

কে যেন আমায় বলছিল : তাড়াতাড়ি কর, সময় ফুরিয়ে এল। আশ্চর্য এক আবেগ আমায় উত্তেজিত ও আকুল করছিল। আমি পাগলের মতন সামান্য মাত্র পথ খুঁজছিলাম, কোনও রকমে যেখান দিয়ে চলে যেতে পারব। আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আর কয়েকটি সোপান শেষেই শীর্ষ চূড়া। সেখানে পৌঁছতে পারলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হবে। যে গোধূলিটুকু এখনও পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সেই শেষ আলোয় আমি জ্ঞানে-অজ্ঞানে, বেদনায় ব্যাকুলতায়, দুঃখে হতাশায় ও আঘাতে যা খুঁজেছি হয়তো তা দেখতে পাব।

অব্যক্ত কোনও যন্ত্রণায় এবং ভয়-তাড়িত ব্যাকুলতায় বার বার উন্মত্তের মতন, ভিক্ষুকের মতন, শিশুর মিনতির মতন, যুবকের প্রেমকামনার মতন এবং বৃদ্ধের ভগবত প্রার্থনার মতন আমার পথটুকু আমি খুঁজে ফিরলাম।

হয়তো আমি কোনও প্রচণ্ড আক্রোশে এবং বিক্ষত যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, সহসা গোধূলির অন্তিম আলোটুকু আমার চোখে মরে গেল।

অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না, আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

পোস্টমর্টেম

রমাপদ চৌধুরী

সকালবেলাতেই সতীশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। আসলে ভোরের দিকে ইদানীং ঘুমটা পাতলা হয়, কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে পড়ে থাকেন। জানলার দিকে মাথা, বেশ ফুরফুরে বাতাস আসে ভোরের দিকে। এই না-ঘুম না-জাগা বাতাস মাথা সময়টুকু বিছানায় পড়ে থাকা সতীশবাবুর কাছে এক উপাদেয় বিলাস। ঠুং-ঠাং বাসনের আওয়াজ, দরজা খোলা, কোথাও গয়লার ডাক, সবই কানে আসে। কিন্তু তেমন স্পষ্ট নয়। তাই ঘুম-জড়ানো চোখ বুজেই থাকেন।

আজকের দিনটা ব্যতিক্রম।

বিস্ময়ে চোখ মেললেন। কান পেতে একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করে বললেন, কি ব্যাপার বলো তো?

বেশ জোরে জোরে কাছেই কোথাও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কেউ। কোন বাড়ি কে জানে। সতীশবাবু একটু বিরক্তই হচ্ছিলেন। মানুষগুলো আজব। কেউ কারও সুখ-সুবিধে দেখে না, কেউ অন্যের কথা ভাবে না।

ঘরে তখন আলো ফুটেছে, সতীশবাবু তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রী কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে। কাকে প্রশ্ন করছিলেন তবে? নিজেরই হাসি পেল।

আর ঠিক তখনই একটা মেয়েলি গলায় চিৎকার, ডুকরে কেঁদে ওঠা।

স্ত্রী অনেক ভোরে ওঠে। সংসারের কাজকর্ম।

সতীশবাবু দেখলেন স্ত্রী ছুটে এসে মাথার কাছের জানলায় উঁকি দিতে যাচ্ছে।

—কি ব্যাপার বলো তো।

স্ত্রী চিন্তিত মুখে বললে, কি জানি।

ব্যস, তারপর অনেকক্ষণ আর কিছু জানাও যায়নি। কৌতূহল চাপা পড়ে গিয়েছিল।

বাসন মাজার ঝি এসে খবর দিল।—শুনেছেন বউদি! লালবাড়ির একতলার বাবু গলায় দড়ি দিয়েছে।

সতীশবাবু চমকে উঠলেন, গলায় দড়ি দিয়েছে?

স্ত্রী বলে উঠল, সে কি! ইস, অবিশ্বাসের সুরে বললে, ঠিক শুনেছিস?

তারপর মেয়েটাকেই প্রশ্ন করে বসল, কেন?.

—কি জানি বাপু। কত লোক, পুলিশ এয়েছে।

সতীশবাবু জামায় মাথা গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে চিন্তিত মুখে বললেন, শেষে ধনঞ্জয়বাবু!

অবাক করার মতই ঘটনা। লোকটা, মধ্যবয়সী লোকটা, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

যতক্ষণ না একটা মানুষ মরছে, সে মৃতপ্রায় হয়ে আছে কিনা কেউ জানতে চায় না। গলায় দড়ি দিয়ে মরলেই হাজারটা প্রশ্ন। কেন? কেন? কেন?

সতীশবাবু সঙ্কোচের পায়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোলেন। দোতলার বারান্দা থেকে ব্যানার্জিবাবু হাঁকলেন, এই যে!

সতীশবাবু ঘাড় তুলে তাকাতেই হাত দেখিয়ে থামতে বললেন। অর্থাৎ আমিও আসছি।

সতীশবাবু তখনই দেখতে পেয়েছেন গলির মোড়ে ছোট্ট একটা জটলা। পাড়ার দু'চারজন, কয়েকটা ট্রাউজার পরা অল্পবয়সী ছেলে, বাজারের থলি হাতে ঝি-চাকর, একজনের হাতে একটা কেরোসিন আনার টিন।

ব্যানার্জিবাবু নেমে এলেন। চাপা গলায় বললেন, শুনলেন কিছু? কি ব্যাপার বুঝতেই পারছি না।

সতীশবাবু উত্তরের বদলে প্রশ্ন করলেন, মারা গেছেন, না কি...

—না, না, ইনস্ট্যান্ট ডেথ। গলায় দড়ি, বুঝলেন না। এ-সব কেস...স্লিপিং পিল হলে তবু অনেক সময়...

সতীশবাবু মুখে একটা দুঃখের আওয়াজ করলেন, চ্। তারপর সমবেদনার গলায় বললেন, এত খারাপ লাগছে! এই গতকাল আমার সঙ্গে দেখা হল, ওষুধ আনতে যাচ্ছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করলাম।

ব্যানার্জিবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।—সত্যি দু'বেলা দেখছি, কথা বলছি, কোনওদিন মনেও হয়নি সেই লোক এমন একটা কাণ্ড করে বসবে।

সতীশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—কার যে কখন কি হয়! দিব্যি সুস্থ মানুষ। হাসছেন, গল্প করছেন, অফিস যাচ্ছেন...

ব্যানার্জিবাবু বলে বসলেন, এই সুইসাইড জিনিসটা আজকাল এত বেড়ে গেছে। আসলে তো এক ধরনের লুনেসি, পাগলামি ছাড়া কি বলবেন।

সতীশবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, আমি তা অবশ্য মনে করি না। আসলে কার যে কখন কোথায় লাগে, কোন ব্যাপারটা কত অসহ্য হয়ে ওঠে...

—আমাদের কারও তো অভিজ্ঞতা নেই।

চমকে দু'জনেই ফিরে তাকালেন। পাড়ারই একটি ছেলে, বেশ ঢ্যাঙা, ফুলপ্যান্টের জন্যে আরও, সে পিছন পিছন আসছিল, লক্ষ করেননি। সতীশবাবু আর ব্যানার্জিবাবুর কাছে এরা এখনও ছোকরা। কারণ ওঁরা এখনও ফুলপ্যান্ট বলেন। ট্রাউজার্স মুখ দিয়ে বেরোয় না।

এই বয়সের ছেলেগুলোর সঙ্গে কেমন একটা লুকানো রেষারেষি আছে যেন, পছন্দ করতে পারেন না। ওই হাঁটার ভঙ্গি, শার্টের ডিজাইন, আচমকা পাশ থেকে বা পিছন থেকে কথা বলা, কোনওটাই ওঁদের ধাতে নেই। ছিল না। অভব্যতা মনে করতেন।

ছেলেটার নাম সঞ্জয়। চেনেন। রাহাদের বাড়ির ছেলে।

ফিরে তাকাতেই সঞ্জয় আবার বললে, লোকে বলে বোকামি। কেউ বলে পাগল। লোকটার পজিশনে গিয়ে কেউ তো বিচার করে না। কি বলেন?

ওঁরা দু'জনই কথা যাতে না বাড়ে সেজন্যেই বললেন, তা ঠিক।

বলেই স্পিড বাড়ালেন।

এসে পৌঁছলেন জটলার কাছে।

সুমন্তবাবু একটা নামি প্রাইভেট ফার্মে বড় অফিসার। ফুটফুটে সাদা পায়জামা, রিন্-এর বিজ্ঞাপনের মত সাদা পাঞ্জাবি, পায়ে দামি নকশা-প্যাঁচ কোলাপুরি চটি। হাতে সিগার।

ওঁদের দেখে বললেন, পুলিশ এসেছে শুনলাম।

ব্যানার্জিবাবুর সঙ্গে ওঁর আলাপ আছে, সতীশবাবু একটু এড়িয়ে চলেন, বোধহয় সুমন্তবাবুর পদমর্যাদার জন্যেই। বাড়িতে ইনভার্টার আছে সুমন্তবাবু, লোডশেডিং হলে দু'খানা ঘরের জানলা থেকে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ে। সতীশবাবু সাধারণ।

সুমন্তবাবু আলগা আঙুলে ধরা চুরুটের ছাই সামলাতে সামলাতে, অর্থাৎ যাতে ঝরে না পড়ে সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে ফিসফিস স্বরে বললেন, কি হতে পারে, ক্যান ইউ গেস্।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, দেখে তো মনে হ'ত খুব সুখী পরিবার।

সুমন্তবাবুর উপস্থিতিতে সতীশবাবু একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, একটু বাধো বাধো ঠেকছিল, ভাল আলাপ নেই বলে।

তবু বললেন, না না, সে-সব কিছু মনে হয় না। আমি তো কালও গল্প করেছি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আগে ওঁর বাড়িতেও গিয়েছি।

ব্যানার্জিবাবু বলে বসলেন, আঃ, সে যদি বলেন, নো ওয়ান ইজ হ্যাপি। তা বলে কি সবাই সুইসাইড করে বসবে?

সেই সঞ্জয় ছোকরা যে এখানেই এসে জুটেছে, কেউ লক্ষ করেননি।

পিছন থেকে সে বলে বসল, কে কতখানি আনহ্যাপি তার থার্মোমিটার তো আমাদের হাতে নেই।

সুমন্তবাবু হেসে ফেললেন, বেশ শব্দ করেই। তারপর সবাই সচকিত হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়েছে দেখে ব্রেক টেনে হাসিটা বন্ধ করলেন। আর ভিতরে ভিতরে সঞ্জয়ের ওপর রেগে গেলেন। এ-সময় এই থমথম পরিবেশে ও-রকম একটা হাসির কথা বলেছে বলে।

ব্যানার্জিবাবুই কথা ঘোরালেন।—ও-সব কিছু নয়। সুইসাইড করলেই ঘর-সংসারের কথা ভাবতে যাওয়া বোকামি।

সতীশবাবু সায় দিলেন।—ঠিক বলেছেন। আরে মশাই, আত্মহত্যা করার হাজারটা কারণ থাকে।

সতীশবাবু ভিড়ের মধ্যে ততক্ষণে দত্তকে দেখতে পেয়েছেন। একসঙ্গে তাস খেলতেন, এখন আর ও-সব পাঠ উঠে গেছে লোডশেডিংয়ের উৎপাতে।

দত্তকে দেখতে পেয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন।

গিয়ে বললেন, কিছু শুনলেন?

—নাঃ, বোঝা যাচ্ছে না। ওসি বেরোলে যদি জানা যায়। চিঠিফিটি যদি কিছু লিখে রেখে গিয়ে থাকেন। ওঁদের চাকরটা নাকি বলেছে সকালে উঠে ওঁর স্ত্রী...

পাশ থেকে একজন বললে, সে-রকম কিছু কান্নাকাটি কিন্তু শুনছি না।

সতীশবাবুর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বেশ ক্রুদ্ধ ভুরু তুলে তাকালেন তার দিকে। কোনও কথা বললেন না।

দত্তকে ফিসফিস করে বললেন, একটা লোককে জাজ করা এতই সহজ? কান্নাকাটি শুনছি না। এখন ওঁদের কত রকম ভয়, কত রকম ঝামেলা, এখন ওঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বউটাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে হবে। নুইসেন্স।

বলে ফেলেই নুইসেন্স বলতে চেয়েছেন না ননসেন্স, ভেবে দেখলেন।

দত্ত হাসল। তারপর বললে, তাছাড়া স্ত্রী তো কান্নাকাটির পার্টি নয়। স্লিভলেস ব্লাউজ পরেন, একটা ফ্যাশনদুরস্ত...

দত্ত বন্ধু লোক। তার মুখেও এ-ধরনের কথা সতীশবাবুর ভাল লাগল না। মনে মনে ভাবলেন, শালা কি পৃথিবী। একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, বউটার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, কোথায় সহানুভূতি পাবে, তা নয়, বউটাকেই প্রথমে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে।

সতীশবাবু অবার ব্যানার্জির কাছেই ফিরে গেলেন। সুমন্তবাবু তখনও দাঁড়িয়ে আছেন, তবু। ইতিমধ্যে আরও দু-একজন জুটেছে।

কে একজন, সতীশবাবু চেনেন না, হাত-পা নেড়ে বলছে, আমার যদ্দুর মনে হয়, অফিসের ব্যাপার। ওঁর অফিসের এক ভদ্রলোক আমার চেনা, বলেছিলেন, ওঁর ওপরওয়ালা কি একটা ইনসালট করেছিলেন। সে অবশ্য অনেক আগের কথা...

সুমন্তবাবু চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলে বসলেন, ইনসালটেড হলেই সুইসাইড করতে হবে? তাছাড়া এতদিন বাদে তো আর...

ব্যানার্জিবাবু বললেন, তা অবশ্য ঠিক, তখনই তো সুইসাইড করতে পারতেন।

আরেকজন ফোড়ন কাটল, স্লিপিং পিল থাকতে গলায় দড়ি...আজকালকার দিনে একটা শিক্ষিত মানুষ...

সুমন্তবাবু বললেন, না, সে-কথা বলতে পারেন না। গলায় দড়ি জিনিসটার মধ্যে একটা ফিগারেটিভ জিনিস আছে। আবার অভিমান থেকে, লিটারেলি গলায় দড়ি দেওয়ার টেন্ডেন্সি হতে পারে। টু মেক ইট সামথিং ড্রামাটিক।

সতীশবাবু বললেন, যে-কোনও সুইসাইড কিন্তু যে-কোনও একজনকে অথবা একাধিক ব্যক্তিকে অ্যাকিউজ করা।

ব্যানার্জিবাবু বলে উঠলেন, বাঃ তা কেন হবে? চিঠি লিখে সে-কথা বলে গেলে অবশ্য অস্বীকার করা যাবে না। তবে, জীবনে বীতস্পৃহ হয়েও কেউ কেউ আত্মহত্যা করে।

—সেটাই বেশি। সুমন্তবাবু বললেন।

দত্ত কখন এ-দলে এসে হাজির হয়েছে সতীশবাবু লক্ষ করেননি। লক্ষ করলেন তার কথা শুনে।

দত্ত বলে উঠল, কিছু লিখে না রেখে গেলেই যে কাউকে অ্যাকিউজ করা হয় না, তা নয় কিন্তু। যেখানে লিখে রাখা মানে নিজেরই লজ্জা বা অপমান...

সুমন্তবাবু চুরুটে টান দিয়ে বললেন, মরেই যখন যাচ্ছে তখন আবার লজ্জা বা অপমানের কথা কি কেউ ভাবে নাকি!

ব্যানার্জিবাবু আপত্তি করলেন।—সে কি কথা বলছেন! মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কি শেষ হয়ে যায়? তার পরের কথাও মানুষ ভাবে।

কে সায় দিয়ে বললে, পরের কথাই বেশি ভাবে! অভাবে দারিদ্র্যে কত লোক তো সুইসাইড করে। এমন কি প্ল্যান করে বউ-ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়ে। তা হ'লে চুরি-ডাকাতি করে তাদের টাকা এনে দিয়েও তো সুইসাইড করতে পারত।

—আসলে সে সময় কি আর অত ভাবনাচিন্তা করার মত অবস্থা থাকে। কে একজন বললে।

সতীশবাবু তাকালেন তার দিকে, সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর হঠাৎ বলে বসলেন, আমার কিন্তু মনে হয় সুইসাইডও এক ধরনের প্রতিবাদ।

—প্রতিবাদ? প্রোটেস্ট? সুমন্তবাবু হেসে উঠলেন।

এই চুরুটখেকো লোকটা ভাল চাকরি করে, ভাল মাইনে পায়, গাড়ি আছে, সে-জন্যেই যেন মাটি না ছুঁয়ে দু' ইঞ্চি ওপরে ভেসে ভেসে হেঁটে বেড়ায়। ভাবখানা এমন, যেন হাঁটা অভ্যাস নেই। আর কথা বলার সময় ধরে নেয় শেষ কথাটা ওর কাছেই শোনবার জন্যে সবাই যেন উন্মুখ হয়ে আছে। অথচ লোকটার সাধারণ বুদ্ধি কত কম। একটা সহজ কথা ঠিক ধরতেও পারে না, বুঝতেও পারে না।

সতীশবাবুর তাই জিদ চেপে গেল। বললেন, হ্যাঁ তাই, প্রোটেস্ট। যে-কোনও লোকের বিরুদ্ধে হতে পারে, যে-কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ব্যানার্জিবাবু দু'পক্ষ রাখার মত করে বললেন, হ্যাঁ, হতেও পারে। যেমন অভিমান বা রাগ। ইনসালটেড হলেও অনেক সময়...

সতীশবাবু বললেন, সেগুলোও প্রতিবাদ। আইনের বিরুদ্ধে হতে পারে, আবার ভগবানের বিরুদ্ধেও।

সকলেই হেসে উঠল, যেন হাসিরই কথা।

সতীশবাবু দমে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, এই সহজ কথাটা এরা বুঝল না কেন!

দত্ত কৌতুকের স্বরে বলল, তা হ'লে পাড়া-প্রতিবেশীর বিরুদ্ধেও হতে পারে, কি বলো। বলে হাসল।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, দেখবেন মশাই, শেষে আমাদেরও জড়াবেন না যেন।

এই সময়েই ওসি ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে একজন কনেস্টবল।

সবাই হুমড়ি খেড়ে পড়ল।

ওসি বললেন, এই যে আপনারা রয়েছেন। দু'জন কেউ আসুন তো।

অমনি সুমন্তবাবু বলে বসলেন, আমার তো আবার ট্রাঙ্ককল আসার কথা, বুক করে রেখেছি, দিল্লিতে...

ব্যানার্জিবাবু বললেন, বাজার যেতে হবে...

দত্ত বললে, আমার আবার আটটায় মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হয়...

আসলে এই সব কারণেই তো কেউ ভিতরে ঢোকেনি। যদিও সবারই চাপা কৌতূহল ভিতর সম্পর্কে! ধনঞ্জয়বাবুর লাশ কি নামানো হয়েছে, নাকি এখনও ঝুলছে। ওঁর স্ত্রীর মুখখানা এখন কি রকম! সত্যি কি খুব দুঃখ পেয়েছে? কিসের দুঃখ। স্বামী আত্মহত্যা করেছে বলে, নাকি ওর ওপর অভিমান বশেই সুইসাইড করেছে বলে! হাজারো প্রশ্ন।

সবাই অরাজি, ওসি সতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি চলুন।

সতীশবাবু সকলের মুখের দিকে তাকালেন, একটু বিভ্রান্ত বোধ করলেন, আবার কি ঝামেলায় পড়লাম গোছের মুখের ভাব করে অসহায়ের মত বললেন, চলুন।

আসলে কোনও একটা অজুহাত চট্ করে ওঁর মাথায় এল না।

সুমন্তবাবু, ব্যানার্জিবাব, দত্ত—সকলেই দু'পা দু'পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিল। যেন চলেই যাচ্ছে। সতীশবাবু রাজি হয়েছেন দেখেই সকলে থেমে পড়ল।

সুমন্তবাবু এক-পা এগিয়ে এলেন। ওসি-কে প্রশ্ন করলেন, কোনও চিঠি-ফিটি রেখে গেছেন?

ব্যানার্জিবাবু বললেন, কিছু জানতে পারলেন?

দত্ত বললে, আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক, কেউ সন্দেহই করেনি, ভেতরে ভেতরে ধার-দেনায় ডুবে গিয়েছিল, শেষে বারোতলা থেকে লাফিয়ে...

ব্যানার্জিবাবু বলে উঠলেন, ইস।

যেন বারোতলা থেকে লাফিয়ে পড়া লোকটার থেঁতলানো চেহারার রক্তমাংস চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

সুমন্তবাবু হাসলেন।—ওঁর মতে এটা বোধহয় কাবুলিওলার বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট।

সতীশবাবু একবার ফিরে তাকালেন, উত্তর দিলেন না।

দত্ত বললে, সুইসাইড-এর কোনও নিয়ম আছে নাকি। পরীক্ষায় ফেলে করেও তো সুইসাইড করে।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, সে-জন্যেই তো বলে টেম্পোরারি ইনস্যানিটি।

—আপনার কি মনে হচ্ছে? ওসি-কে সুমন্তবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

আর ওসি বিরক্তমুখে ফিরে তাকিয়ে সুমন্তবাবুর সাদা ফুটফুটে পাঞ্জাবি-পাজামা, আঙুলের ডগায় চুরুট এবং ভারিক্কি চেহারা দেখেই মুখে হাসি আনলেন।

বললেন, কি জানি। কিছুই তো পেলাম না। বাড়ির লোকও কিছু বলতে পারছে না।

একটি লোক এগিয়ে এল।—মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার নয় তো? আমি কিন্তু

ওঁকে একদিন আলিপুর কোর্টে দেখলাম, উকিলের পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন...

ওসি তার দিকে তাকালেন, কিছু বললেন না। কোনও কৌতূহলও দেখালেন না। শুধু সতীশবাবুকে বললেন, চলুন।

ওসি আর সতীশবাবু ভিতরে ঢুকে গেলেন।

তা দেখে আরও দু'জন তাঁদের পিছনে পিছনে গেল। বোধহয় নিজের চোখে লাশটা দেখার লোভে। কিংবা ধনঞ্জয়বাবুর স্ত্রীর যথেষ্ট শোক হয়েছে কিনা দেখে আসার জন্যে।

পাড়ার কে একজন ফিসফিস করে পাশের লোককে বললে, একদিন কিন্তু দেখেছি, খুব বৃষ্টি, ট্যাক্সিতে আসছিলেন।

পাশের লোকটি বললে, তাতে কি হয়েছে।

—না মানে, এক মহিলাও ছিলেন। স্ত্রী নয়।

তখন একটি মেয়ে, নোংরা শাড়ি, পায়ে কাদা, ধনঞ্জয়বাবুদের কাজের লোক, বেরিয়ে বিভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজল।

কে একজন বললে, ওই তো, ওঁদের বাড়িতেই কাজ করে। ঠিকে ঝি। জিগ্যেস করুন না।

ব্যানার্জিবাবু ডাকলেন মেয়েটিকে।

মেয়েটি এগিয়ে এলো।—আমায়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সেই ফুলপ্যান্ট ছোপছোট শার্ট রাহাদের ছেলেটা এগিয়ে এল। বললে, কি হয়েছিল বাবুর?

—তা কি করে জানবো :গো বাবু। কাঁদো কাঁদো মুখে মেয়েটি বললে।—আমি তো এয়েছি একটুন আগে। এসে দেখি হুলুস্ থুলুস চলছে।

সুমন্তবাবু রাশভারি গলায় বললেন, কিছু ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

—তা কি করে জানব গো! আমি কি রেতে ওঁদের ঘরে শুই।

একটু থেমে বললে, দুটো বাসন গায়ে গায়ে থাকলে ঠুংঠাং করে, আর পতিপতিন থাকলে হবেনি? তা বলে গলায় দড়ি দেয় কেউ?

ব্যানার্জিবাবু আবার কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মেয়েটা বলে বসল, পথ ছাড়েন দেখি, কি বলতে কি বলব, পুলিশ আছে। গিয়ে পুলিশকেই জিজ্ঞেস করেন না।

বলে ভিড়ের ভেতর দিয়ে দপ দপ করে পা ফেলে এগিয়ে গেল, একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়েই তার হাতখানা ধরে পিঠে একটা বেদম চড় কষিয়ে দিল। পর পর আরও দুটো। তারপর ঠেলে দিলে তাকে, বললে, কেন এয়েছিস? যা ঘরে যা।

কাছে বস্তিটায় মেয়েটা থাকে, ভিড় দেখে পাঁচ বছরের ছেলেটাও ঘর থেকে চলে এসেছে।

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে তাকাতে তাকাতে চোখে হাতের মুঠো ঘষতে ঘষতে

চলে যাচ্ছিল, মেয়েটা, মানে ছেলেটার মা চেঁচিয়ে বললে, বাবুদের মতন হুজুগ দেখতে এয়েছেন। মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেব তোর।

সুমন্তবাবু পিঠে হাত দিলেন, পিঠ চুলকোলেন বোধহয়।

কথাটা সবারই গায়ে লাগল। সবাই ভাব দেখাল যেন শুনতে পায়নি। কিংবা বুঝতে পারেনি।

সুমন্তবাবু বোধহয় অস্বস্তি কাটাবার জন্যেই বললেন, এ এক ধরনের এসকেপিস্ট মেন্টালিটি। এই সুইসাইড।

পাশ থেকে কে একজন বললে, আসলে এ-সব লোক একটু কাপুরুষ হয়। জীবনকে ফেস করতে ভয় পায়। পারে জীবনে সবই তো আছে, ভাল মন্দ, বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ, গুড ফেস ইট, ফাইট ইট।

কে একজন রসিকতা করলে, জীবনযুদ্ধ!

রাহা ছেলেটি ঠাট্টার ঢঙে বললে, হ্যাঁ, বিপ্লবী হতে হয়। আমরা সকলেই তো বিপ্লব করছি, অথচ এই কাপুরুষগুলো...

সুমন্তবাবু আর ব্যানার্জিবাবু সরে যাচ্ছিলেন। এইসব ছেলে-ছোকরাগুলো সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে জানে না। আনকালচার্ড হলে যা হয়। আসলে এসকেপিস্ট ব্যাপারটা জানেই না।

—চলুন, চলুন। সুমন্তবাবু ব্যানার্জিবাবুকে বললেন।

কে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যার বাজে সে বোঝে। কার কোথায় কষ্ট, কতখানি কষ্ট, তা কি আমরা বুঝি!

ঠিক তখনই ওসি আবার বেরিয়ে এল। পিছনে পিছনে সতীশবাবু আর দত্ত।

ওঁরা সতীশবাবু আর দত্তকে ঘিরে ধরলেন।

ওসি বললে, ভ্যানটা এখনও এল না? পোস্টমর্টেম হবে, দেরি করলে আজ আর ডেডবডি দেওয়াই যাবে না।

এই সময়েই একজন সাব-ইন্সপেক্টর এসে হাজির হল। খাকি পোশাক দেখেই ভিড় দু'ফাঁক হয়ে রাস্তা দিল।

—লাহিড়ি তুমি থাক, আমি চললাম। ও-সি বললে।

চলে গেল।

লাহিড়ি গট গট করে বাড়িটার ভেতর ঢুকল।

ব্যানার্জিবাবু সতীশবাবুকে প্রশ্ন করলেন, কিছু শুনলেন?

সুমন্তবাবু দত্তকে বললেন, সুইসাইড তো?

কে একজন বললে, তা হলে পোস্টমর্টেম কেন?

সুমন্তবাবু তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেললেন।—ওটাই নিয়ম।

সতীশবাবুকে খুব বিষণ্ণ দেখাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, উঃ, ধনঞ্জয়বাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। পাথর, পাথর হয়ে গেছেন।

দত্ত কার সঙ্গে যেন চোখাচোখি করে চোখ টিপল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, হ্যাঁ, খুব শোক পেয়েছে! পাবারই কথা।

সতীশবাবুর দিকে ফিরে তাকাল দত্ত। বললে, কিন্তু দেখলেন, চাকরটা চায়ের কাপ নামাল ওঁর স্ত্রী কেমন কাপটা নিয়ে চায়ে চুমুক দিল।

সতীশবাবু বললেন, উনি কি আর জেনেশুনে খেলেন? ও তো যন্ত্রের মত, দেখে বোঝাই যাচ্ছিল উনি যেন ওঁর মধ্যে নেই।

দত্ত বললে, শাড়িটা লক্ষ করেছেন?

—না তো। কেন? সতীশবাবু অবাক হলেন।

দত্ত বললে, রাতে পরে শুলে তো কুঁচকে থাকার কথা...

সতীশবাবু বিরক্ত হলেন।—তোমার কি দেখে মনে হল পাটভাঙা শাড়ি পরেছেন?

—না, তা নয় অবশ্য। তবু...

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, আপনি যে বলছিলেন, দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনেছেন!

রাহা ছেলেটা বললে, আমি কিন্তু শুনলাম, পাড়ার লোকদের বিরুদ্ধে কি-সব লিখে রেখে গেছেন...

—কে, কে বললে? সুমন্তবাবু বলে উঠলেন।

ছেলেটা বললে, ওসি যাবার সময় নাকি কাকে বলেছে।

বলেই সেখান থেকে চলে যেতে যেতে শব্দ করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

সকলেই বুঝল আসলে রসিকতা। রেগে গেল। সুমন্তবাবু বললেন, যত সব রকবাজ!

ব্যানার্জিবাবু বললেন, এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপার, রসিকতা আসে কি করে, বুঝি না।

এই সময়েই হর্ন শোনা গেল।

কে বলে উঠল, ভ্যান এসে গেছে।

দু'জন কনেস্টবল, দুজন মুদ্দোফরাশ।

এস-আই ভদ্রলোক ভিতের চলে গেলেন। তাঁর পিছনে পিছনে ওরাও।

বাইরে সকলেই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল ধনঞ্জয়বাবুর বাড়িটার দিকে। কেউ কোনও কথা বলল না। চুপচাপ।

এখনই তো ডেডবডি বের করে আনবে। সব্বাই উৎসুক চোখে অপেক্ষা করল।

আর তখনই তীব্র কান্নার শব্দ ভেসে এল। দু-তিনটি কান্না।

সতীশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ধনঞ্জয়বাবুর মেয়েটার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না! ওই টুকু একটা মেয়ে।

দত্ত বললে, ওঁর মা, বুড়ি মা তো পাথর।

সুমন্তবাবু বললেন, ওরাই কাঁদছে।

মুদ্দোফরাশ দু'জন প্রথম বেরিয়ে এল। একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে। স্ট্রেচারে ধনঞ্জয়বাবুর ডেডবডি, চাদর ঢাকা।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, ছেলেটা? রমেন?

সতীশবাবু বললেন, সে ছোটাছুটি করছে। পোস্টমর্টেম যাতে না হয়।

—কেন? কেন? দু-তিনজন বলে উঠল।

দত্ত বললে, আবার কাটাছেঁড়া! কে চায় বলুন।

—ও তাই বলুন।

সতীশবাবু বললেন, ইনফ্লুয়েন্স থাকলে হয়।

ব্যানার্জিবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।—কি ঝামেলা, দুঃখ করারও সময় নেই ছেলেটার। শোক করার উপায় নেই। বাপ মারা গেছে, এইভাবে মারা গেছে, এখন ঝামেলা সামলাও।

ডেডবডির মুখ ঢাকা। চাদরে।

তবু সবাই ঘাড় উঁচিয়ে এমনভাবে তাকাল, যেন মুখটা দেখা যাচ্ছে।

কনেস্টবল আর এস-আই বেরিয়ে এল বেশ খানিকটা পরে।

ওদের পিছনে পিছনে শুধু ধনঞ্জয়বাবুর বাচ্চা মেয়েটা। কে একজন, ওদেরই আত্মীয় বোধহয়, মেয়েটাকে দু'হাতে জোর করে আটকাল। ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

এখন আর বুড়ি মা'র কান্না শোনা যাচ্ছে না।

সব চুপচাপ।

পুলিশ চলে গেল। ভ্যানে গিয়ে উঠল। স্টার্ট দেবার আওয়াজ। হর্ন। শব্দ করে চলে গেল।

—ব্যাপারটা কি, ঠিক বোঝা গেল না। সুমন্তবাবু বললেন।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, হুঁ।

সতীশবাবু বললেন, চলি, বাজার যেতে হবে।

দত্ত বললে, আপিস আছে।

একে একে সকলেই যে যার পথ নিল।

কারও মনে যেন শান্তি নেই।

রাহাদের সেই ছোকরাটি হঠাৎ বলে উঠল, লোকটা মশাই নিজেকে এক্সপ্লেন করে গেল না।

দু'জন হেসে উঠল।

কে একজন প্রশ্ন করল, পোস্টমর্টেম ঠেকাতে পারবে তো ছেলেটা? তা হলে এখনই সৎকার করতে পারবে।

ব্যানার্জিবাবু প্রতিধ্বনি তুললেন যেন।—পোস্টমর্টেম।

দত্ত বললে, ঠেকাতে পারবে না। গলায় দড়ি বলে ব্যাপার।

সবাই চুপ করে রইল।

সকলেই যেন মনে মনে বলল, ঠেকাতে পারবে না।

পুলিশের মর্গের ডাক্তারের কাটাছেঁড়া বন্ধ করা যেতেও পারে। কিন্তু....

রাহা ছোকরা হাসতে হাসতে বললে, আমরা ছাড়ব কেন? অ্যাঁ? পোস্টমর্টেমের কথা বলছি। ব'লে আবার হেসে উঠল। শব্দ করে।

ছবি

ননী ভৌমিক

হাতে একটা ক্যামেরা এসেছে। তাই পকেটে পয়সা থাকলেই ছুটি ফটোর দোকানে। কয়টা একস্‌পোজার টিকল তা পরখ করি উৎসাহের সঙ্গে। তর্ক করি বন্ধুদের সঙ্গে। অপেক্ষা করি অনুরোধের জন্য। কেউ অনুরোধ করলেই হল। অমনি তাকে দাঁড় করিয়ে একবার এদিক তাকাতে বলি, একবার অন্যদিকে। নিজে চলে যাই কখনও দূরে, কখনও কাছে। ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে কোণ নিই কখনও নিচু থেকে, কখনও উঁচু থেকে, কখনও কোনাচে-ভাবে।

কিছুদিন বাদেই দেখা গেল পরিচিত সকলের কাছেই দাম আমার বেড়ে গেছে। পিসিমা তাঁর অনূঢ়া মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দেন, ছবি চাই বিয়ের জন্য। দিদি তার চার বছরের বাচ্চার চুল আঁচড়িয়ে, পাউডার ছিটিয়ে, বাবু সাজিয়ে এগিয়ে দেন। বন্ধু-বান্ধব, ভাইয়ের বন্ধু, পাড়ার ছেলে প্রভৃতি তরুণ দলের তো কথাই নেই। নতুন নতুন আইডিয়া আসছে দমকে দমকে। নতুন নতুন পোজ উদ্ভাবনের চেষ্টায় ভয়ানক কায়দা করে তাকিয়ে, না তাকিয়ে, দাড়িয়ে; হেলান দিয়ে, বসে, আধা বসে, আধা শুয়ে অপেক্ষা করে ক্লিকের জন্যে।

তাতে অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই। সাধ্যমত সকলের শখই পুরোই আর সবচেয়ে বেশি করে পুরোই আমার নিজের শখ। বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের, প্রত্যেকটি পরিচিতের, এমনকি টিয়া বেড়াল প্রমুখ প্রত্যেকটি প্রাণীর এবং কার্নিশ, রেলিঙ, তুলসীগাছ প্রমুখ প্রত্যেকটি আকৃতির একাধিক ছবি তোলা হয়ে গেলেও অনুরোধ কিংবা খেয়াল হওয়া মাত্র আরও একটি ছবি তোলার সুযোগ ছাড়তাম না।

মা বললে, হয়েছে! পরিচিত কিছুই তো আর বাদ রইল না দেখছি। এরপর কি করবি?

কিন্তু বাদ ছিল। এবং বাড়ির নিতান্ত পরিচিতদেরই মধ্যে। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল যখন শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ির জমাদার নিজে থেকেই এগিয়ে এল—

'নমস্কার বাবু!'

জমাদারের ওই একটা অভ্যেস। কেমন একটা নেশাচ্ছন্ন নির্বাক ভঙ্গিতে ও দৈনিক ঝাড়ু দিয়ে যায় বাড়িতে। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে কথা বিশেষ বলে না। কখনও কিছু বলার প্রয়োজন হলে নেশাগ্রস্তের মতই একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘ একটা নমস্কার করে আগে।

হেসে বললাম, 'নমস্কার। কি জমাদার খবর কি?'

'আর আমাদের খবর বাবু! না কি বলছেন! তবে ওই জমাদারনী বলছিল...'

জমাদারনী মানে জমাদারের বউ।

'কি বলছিল?'

'আর বাবু উ জমাদারনীর কথা। তবে হাঁ, বলছিল কি কোনওদিন মরে ধরে যাব একটা ফোটোক থাকলে আমনার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা কি চলবে। বেটা বিটিরা বলবে কি হাঁ এইটা আমাদের বাপ ছিল...খানিক মনে হবে, নাকি বলছেন বাবু? কোনদিন মরে ধরে যাব...'

সত্যিই লজ্জা হল। এত লোকের ছবি তুলছি অথচ চোখের সামনে রোজ জমাদারকে দেখি, কোনওদিন তা একটা ছবি তোলার কথা মনে হল না। কোনওদিন চোখেই পড়ল না। লোকটা নিজে থেকে যেচে না বললে হয়তো...।

বললাম 'বেশ তো। দাঁড়াও উঠোনে, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি—!'

জমাদার লুব্ধ ও কৃতার্থের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ক্যামেরার দিকে। চোখ মিটমিট করলে বোকার মত, তারপর হঠাৎ সরে এল, লজ্জিতভাবে, 'এখনই তুলবেন বাবু?'

'হ্যাঁ এখনি। ফিল্ম যখন আছে তখন হয়ে যাক। নয়ত আবার পরে ভুলে যাব—'

'আজ্ঞে হাঁ তা তুলবেন বই কি। আপনি বলেছেন একটা কথা। সে আপনাদের...তবে বলছিলাম কি আজই-ই তুলবেন?'

'হ্যাঁ আজই যেমন আছ যেমনি—'

'এ সব উঠে যাবে বিলকুল। নাকি বলছেন? ই ঝাড়ু, টিন সব উঠে যাবে?'

'হাঁ—'

কিন্তু হঠাৎ খানিকটা হকচকিয়ে গেল জমাদার।

'বলছিলাম কি, জমাদারনীকে একটা কথা বলি। আপনি যে কালে বলেছে কি হাঁ জমাদারের ফটোক তুলে দিব, তখন...আজ থাক। নাকি বলছেন? সে না হয় আর একদিন আপনাকে...'

যে শখটা গোপন লজ্জিত হঠাৎ সে শখটার বাস্তব চেহারার সামনে দাঁড়াতে হলে হয়তো অমনি বিব্রত হয়ে উঠতে হয় সবাইকে। জমাদার নিজে থেকে পেছিয়ে গেল ক্যামেরাটার সামনে থেকে। আপন মনে ঝাড়ু দিতে শুরু করলে। ঝাড়ু দিতে দিতেই আপন মনেই বিড়বিড় করলে 'সে আর একদিন হবে নাকি বলছেন বাবু...'

ক্যামেরা গুটিয়ে রেখে দিলাম। অবাক লেগেছিল খানিকটা। জমাদার লোকটা অমনি খাপছাড়াই বটে। অথবা কে জানে, যারা চোখে পড়ার মত নয়, তাদের ওপর দৈবাৎ চোখ পড়লে বোধ হয় খাপছাড়াই লাগে কিংবা যারা খাপছাড়া হলেও চোখে পড়ার মত নয়, আমাদের বাড়ির জমাদার তাদেরই একজন। প্রৌঢ় রোগা নির্বিকার নেশাচ্ছন্ন একটা লোক। কলকাতার জমাদার হলেও জাতে সে বাঙালি। বাড়ি ছিল হুগলির কোন একটা গ্রামে, দু-তিন পুরুষ আগে। কিন্তু কথা না বললে বাঙালি বলে তাকে চেনা

বেশ কঠিন। খালিগায়ে খালিপায়ে একটা টিন আর ঝাড়ু নিয়ে সে দেখা দেয় প্রত্যহ। কখন আসে কখন যায় কেউ বিশেষ নজর করে না। নজর করার প্রয়োজন হয় না। লোকটা নেশাই করুক আর যাই করুক ঝাড়ু দেয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নোংরা জিনিস সম্পর্কে মনে একটা ঘৃণা থাকলে কেউ অত খুঁতখুঁতানি নিয়ে নিবিষ্ট মনে ড্রেনের মুখ আর পায়খানার চাতাল পরিষ্কার করতে পারে না। তাই কেউ লক্ষ করে না ওকে। শুধু নজর পড়ে যখন ও নিজেই চেঁচিয়ে ডাকে—'হা হা হা—খোঁকাটো মাটি হতে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমনারা নিজেদের ছেলেকেও নজর নেন না মা—এ্যাই খোকা, খেয়ো না রোগ হবে। ই কলকাতা বড় খারাপ জায়গা আছে—খায় না অমন। রোগ ভোগ হয়ে যাবে মা..'

কখনও কখনও থমকে দাঁড়াত, 'কাপড় মেলে দিয়েছেন মা। তুলে লিন। ঘুরতে ফিরতে ছোঁয়া লাগবে কি ঝাড়ু ময়লা লাগবে। আপনারা....কি বলা যাবে...'

তখন জমাদারের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হত বাড়ির লোকে। তারপর ময়লা থেকে বাড়ির ছোট ছেলেটাকে তুলে এনে, কিংবা মেলে দেওয়া কাপড় গুটিয়ে রেখে পর মুহূর্তেই ভুলে যেত অনায়াসে।

স্বভাবতই জমাদারের কথা, আর জমাদারের ফটো তোলার কথা আমিও ভুলে গিয়েছিলাম আবার। বড় বড় ঘটনা যা অনবরত ঘটে যাচ্ছে, তার ঘূর্ণিতে জমাদারের কথাটা মনে করে রাখাই হয়তো কঠিন।

জমাদারই নিজে থেকে মনে করিয়ে দিলে আবার, নমস্কার বাবু।

নমস্কার করাটা জমাদারেব বাঙালিত্বের একটা লক্ষণ। সে যে নিতান্ত অবাঙালি মেথর ঝাড়ুদার ক্লাসের একটা লোক নয় তার চিহ্ন।

'নমস্কার জমাদার। কি মনে করে?'

'আর বাবু জমাদারের আবার খবর। তবে ওই আমার খোকাটা—ভগবানের দয়ায় তো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, নাকি বলছেন বাবু। তাই, আপনি সেদিন বলেছিলেন—

জমাদারের নেশাচ্ছন্ন টলটলে-অথচ লাজুক লাজুক চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও ঠাহর হল না, কি বলেছিলাম। হঠাৎ মনে হল, 'ও হো সেঃই ফটো?'

'আর বলেন কেন। জমাদারনী বলছে, কি বাবু যখন বলেছে ওই একটা শখ আর কি বাবু। নাকি বলছেন?'

যারা আশেপাশে ছিল, তাদের কেউ কেউ হেসে উঠল সহানুভূতিতে অথবা মজায়। কেননা জমাদারের আবার এক জমাদারনী আছে, আর তাদের আবার ফটো তোলার মত একটা খাপছাড়া শখ হতে পারে, আর সে শখ তারা এত মাস পরেও ভোলেনি, এটা সহানুভূতি এবং মজার কথা বই কি।

খানিকটা অপরাধীর মত স্বীকার করতে হল, 'সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ, কখন তুলবে? এখন?'

জমাদার সেই প্রথম দিনকার মতই বিব্রত হয়ে উঠল আবার, 'এখন? আচ্ছা সে হবে নাকি বলছেন' বলে হকচকিয়ে ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁট দিতে শুরু করল দৈনন্দিনের মত।

ক্যামেরাটা নিয়ে জমাদারকে বললাম, 'দাঁড়াও আজই হয়ে যাক, নইলে আবার ভুলে যাব—'

জমাদার কিন্তু কিছুতেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল না। কেন তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল বোধ হয়, জেরার চোটে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললে, 'বলছি কি, শুধু আমার ফটোকটা লিবেন বাবু, কিন্তু জমাদারনী বলছিল তবে মেয়ে মানুষের কথা নাকি বলছেন বাবু।...কিন্তুক ওই যে কাল বলছিল...'

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তবে বুঝতে পারা গেল যে জমাদারের মানসিক ইচ্ছেটা হল শুধু তার ছবি নয়, একই সঙ্গে জমাদারণী আর খোকা আর বড় খোকা সবারই ছবি তোলা।

'নাকি বলছেন বাবু, খোঁকা কি বলবে কি হাঁ এইটা আমার বাপ ছিল। এইটা মা ছিল, উরা কত দুখ তকলিফ করে মানুষ করেছে। আমরা বি দেখব—কি হাঁ ছুটুতে খোঁকাটা কি রকম ছিল এই আর কি বাবু। জমাদারনীর...'

বললাম, 'বেশ তো তোমাদের সকলেরই না হয় তোলা যাবে। কিন্তু কি করে তুলবে? নিয়ে আসবে সবাইকে এখানে?'

জমাদার কৃতার্থ হয়ে বললে, 'আজ্ঞে হাঁ বাবু। আপনি বললে সে আর...সে লিয়ে আসব একদিন—'

বললাম, 'আচ্ছা থাক, নিয়ে আসতে হবে না। আমিই যাব। বিকেলে? তখন কাজ থাকবে না? বেশ...'

ঠিকানাটা নিয়ে রেখে দিলাম। এবার শখটা আমার। ওদের বাড়িতে গিয়েই ছবি তুলব। করতে পারলে নতুন ধরনের একটা শট হিসেবে জিনিসটা মন্দ হবে না। মনে মনে আঁচ করে রাখলাম কিভাবে তুলতে হবে। নামকরা এক বিদেশি আলোকচিত্রের একটা ছবি মনে মনে ফিরছিল। অন্ধকার এক পৃষ্ঠপটে ততোধিক অন্ধকার সিলুয়েট মূর্তি কয়েকটা টাল খেয়ে খেয়ে পড়া কয়েকটা স্তব্ধ আকৃতির মাঝখান দিয়ে দেখা নির্বিকার নিস্তব্ধ কষ্টি পাথরের মত শক্ত কয়েকটা মনুষ্যমূর্তি। নীচুতলার সেই সব প্রাণী যারা একদিন মানুষ ছিল।

শখটা এবার আমারই। তাই ভুললাম না। যে রহস্যময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এক ঝাড়ু টিন হাতে জমাদার নিত্য দেখা যায় আমাদের এঁটোকাঁটা নোংরার পাশে সক্রিয় এক অলক্ষ যন্ত্রের মত, ঠিক বিকেলবেলা, ক্যামেরা ঝুলিয়ে যাত্রা করলাম সেই ডেরার দিকে।

হোঁচট খেতে খেতে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেটা কলকাতার সাধারণ যে কোনও বস্তি থেকে একটুও তফাত নয়। ছ্যাতলাপড়া খোলার চাল। এবড়ো-খেবড়ো এলোমেলো পথ। খোলা ড্রেনের ওপর থকথকে সবুজ সর পড়া ময়লা। কাদা, মুরগি, কুকুর। নির্বিকার ঔদাসীন্যে কয়েকটা ন্যাংটা ন্যাংটা ছেলেমেয়ে খেলছে, চেঁচাচ্ছে। অদূরের একটা হাইড্রেনের জলে বসে কাপড় কাচা সাবান দিয়ে অখণ্ড মনোযোগে গা ঘষে ঘষে চান করছে জনকয়েক ডিউটি ফেরত পুরুষ—তাদের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই

কি কাজ তারা করে। স্ক্যাভেঞ্জারের, না রিকশা টানার না মোটর গ্যারেজের না শিশি-কারখানার না স্রেফ কুলিগিরি—কিছুই বোঝা সম্ভব নয়।

নতুনত্ব শুধু একটি জায়গায়। খুদে আঙিনাটার এক পাশে কয়েকটা কদর্য দর্শন শুয়োর ঘোঁৎঘোৎ করছে আপন মনে।

আলোছায়ার খেলায় ফুটে ওঠা বিদেশি ছবিটার মত, রহস্যময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও তীব্র হল না পৃষ্ঠপটটা। কেমন মামুলি ও সাধারণ। দৈন্যের চেহারাটাও কেমন তীক্ষ্ণ নয়, মাত্র বিবর্ণ। তবু একেবারে হতাশ হবার মত নয়। বিশেষ করে ওই শুয়োরগুলো। ওদের সামনে রেখে বস্তির ঝুঁকে-পড়া চালের একটা কোণাকে কভার করে তার মধ্যে দিয়ে দেখা দূরের কয়েকটা প্রায় নগ্ন, কৃষ্ণকায় সিলুয়েটি মূর্তিকে, শুট করতে পারলেও মন্দ হবে না।

ডাকলাম, 'জমাদার জমাদার—'

আশেপাশে অনেক কটা খুপরি। এক-একটা খুপরি কমপক্ষে এক-একটা পরিবারের ডেরা। ওদেরই একটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল জমাদার—'নমস্কার বাবু...'

'নমস্কার, কিন্তু—'

কিন্তু বলে থামলাম। কারণ জমাদারকে ঝট করে চেনা একটু মুশকিল হয়েছিল। একটা অপরিবর্তিত চেহারাতেই শুধু জমাদারকে দেখা অভ্যেস। খড়ি-ওঠা নগ্ন শুকনো দেহ। কোমরে উরুর ওপরে তোলা ময়লা এক ঠুটো ধুতি। রুক্ষ চুল, নির্বিকার চাউনি, এক হাতে ঝাঁটা অন্য হাতে টিন।

কিন্তু কোথায় সে জমাদার? আমার সামনে এসে যে দাঁড়াল, বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগে তার চান খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। মাথায় বেশ চকচকে কোঁকড়া চুল, কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে সযতনে আঁচড়ানো। ধুতির ঝুল হাঁটুর নিচু পর্যন্ত নেমেছে। সদ্য খেয়ে ওঠা ফোলা ফোলা পেটের মাঝখান থেকে কোঁচা ঝুলছে বাবুর মত। মুখে পান, কাঁধে ভেজা গামছা, কোলে একটা ছেলে। কোথায় আমার কল্পিত সিলুয়েটি নির্বাক মূর্তি, এ একেবারে নেহাত মামুলি, বাঙালি গেরস্ত। কোমল নির্বোধ, স্নেহময় এক পিতা।

'নমস্কার বাবু কোথায় বা বসবেন—আমাদের সব...ছোঁয়া জিনিস...'।

বলে একটি মাদুর পেতে দিল দাওয়ায়। বেশ পরিষ্কার দাওয়া। বস্তিরই ঘর, তবু তার দরজায় রীতিমত সিঁদুরের শুভ চিহ্ন। মাটির দাওয়াটুকুর মধ্যেই খানিকটা পুরনো আলপনার দাগ। বললাম, না বসার দরকার নেই। আলো চলে যাবে। ছবিটা তুলে নাও আগে—

'আজ্ঞা হাঁ—' বলে জমাদার ঘরের দিকে তাকাল কয়েকবার। ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলে মাটির ওপর। 'এইটা আমার ছুটু খোঁকা...একটা শখ নাকি বলছেন বাবু...।' বলে আধা লজ্জা আধা কৃতার্থতার সঙ্গে জমাদার হাসলে স্বপ্নাতুরভাবে; এক সাধারণ মামুলি বাঙালি বাপের মত। হাতে লোহার বালা পরা; পাঁশুটে পাঁশুটে চুলে-ভরা মাথা, সদ্য ওঠা শাদা শাধা দাঁত কয়েকটা, কচি কচি কালো মুখের মধ্যে

হাসছে নির্বোধ খুশিতে—জমাদারের ছোটো খোকা বাপের কোল থেকে ছাড়া পেয়ে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল সারা দাওয়ায়।

আমার কল্পিত কম্পোজিশনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে। তবু তাড়া দিলাম। সিলুয়েট চলবে না। তবু অন্তত এই নগ্ন সরলতাটুকু যদি তুলতে পারি মন্দ হয় না। ন্যাংটা কালো-কলো ছেলেটাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলাম উঠোনের মধ্যে। ক্যামেরায় চোখ রেখে পেছুতে লাগলাম ঠিকমত ভিউটার জন্যে।

'বাবু!' জমাদারের গলা।

চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

'বলছি কি, ওইভাবেই ছবি লিবেন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'না তা লিবেন বই কি। কিন্তুক জমাদারনী বলছিল কি, ওই তো ছুটু খোঁকা—খানিক সাজ-পোশাক করে দিলে—লইলে লুকে বলবে কি বাপটো খোকাটাকে একটা জামা বি কিনে দ্যায় নাই। উ ছবিটাই তো থেকে যাবে। নাকি বলছেন বাবু—। বললাম, 'না না। জামা লাগবে না। এই ভাল—এতেই ছবির আর্ট ফুটবে, বুঝেছ?'

'বাবু!'

ফোকাস শেষ করেই এসেছিলাম, তবু তোলা হল না। জমাদারের গলার স্বর শুনে চমকে উঠতে হল। ভীত বিনীত চোখে জমাদার চেয়ে আছে ক্যামেরাটার দিকে। যেন ভয়ানক একটা সর্বনাশ হতে চলেছে তার।

'কি হ'ল?'

'ওই ছবি তো থাকবে। তো খোঁকাটো বড় হ'য়ে দেখবে, কি, না বাপ আমার একটো জামা কি কিনে দ্যায় নাই...'

হতাশ হয়ে ক্যামেরা নামিয়ে নিলাম। না আমার কিছুই করবার নেই। কিছু করবার নেই ক্যামেরার।

'তুমি কেন আপত্তি করছ...বেশ যাও সাজিয়ে নিয়ে এস ছেলেকে। আর তোমরাও এস—'

জমাদারের দুই চোখ ভরে উঠল খুশিতে 'আজ্ঞা বাবু—ই...একটা...নাকি বলছেন...

সুতরাং বসে বসে অপেক্ষা করতে হল ওরা কখন সাজ-পোশাক করে বেরিয়ে আসে তার জন্যে। ক্যামেরা দেখে ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে একটা। বস্তির মামুলি ছেলেপুলে, বুড়ি বুড়ো আর ভারিক্কি চেহারার জোয়ান মেহনতকারীর ভিড়। তারা ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে, কখনও এগিয়ে আসছে ক্যামেরাটার কাছে, কখনও চ্যাচাতে চ্যাচাতে আবার শুরু করছে খেলা। সবটাই কেমন বিবর্ণ, গতানুগতিক।

বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত ধরে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে অস্ফুট একটা শব্দ আসছিল একঘেয়ে। জমাদার, জমাদারনী আর তার খোকার কণ্ঠস্বর। বোঝা যায় খুব চাপা আলোচনা চলছে ওদের মধ্যে—হয়তো বা ঝগড়াও হচ্ছে।

'কি জমাদার, হল?'

ঘরের ভেতরকার শব্দটা থেমে গেল একেবারে, আবার শুরু হল। আবার থেমে গেল। তারপর শুকনো মুখে বেরিয়ে এল জমাদার একা।

'কই?'

জমাদার আমার চোখচোখি তাকালে না। অন্যদিকে চেয়ে বললে, 'বলছি কি, ওই জমাদারনী আর খোকার ছবিটা নেন। আমারটা থাক ক্যানে। না হয় সে আর একদিন—

'কেন? কি হল আবার?' কেন, তা জমাদার বললে না।

তবে ব্যাপারটা বোঝা গেল জমাদারনীর মুখঝামটায় 'জামা নেইক, শখ আছে। উ ফটোক তুলবে না। না, তেমন সাজ-পোশাক চাই তো। আর ই জমাদারনী তুলুক ওই ছেঁড়া কানি পরে? ক্যানে? আমি বি তুলব না...'

বিব্রত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর স্থির হল আজ শুধু খোকার ছবি তুললেই হবে। জমাদার জমাদারনীর ছবি না হয় পরে তুলে দেওয়া যাবে একদিন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল খোকাকে নিয়েও। খোকার জন্মের সময় এক রথের বাজার থেকে জমাদার খোকার জন্যে পয়সা খরচ করে ফ্রকের মত একটা রঙিন জামা কিনেছিল। সেটা অক্ষত আছে। কিন্তু খোকার গায়ে ঢোকে না। টেনে-টুনে ঢোকালেও তার ঝুলটা বড়োজোর কোমর পর্যন্ত নামে। বাকি অংশটা অনাবৃতই থেকে যায়। গায়ে ঢোকার মত আর-একটা জামা আছে, সেটা খোকার ছেলেবেলায় কেনা। তাই পুরনো, নোংরা, ছেঁড়া। সেটা পরাতে জমাদার রাজি নয়।

বললাম, 'ওটুকু নোংরা ছেঁড়ায় কিছু হবে না। ক্যামেরায় উঠবে না।'

কিন্তু কে কাকে বোঝায়। জমাদার জমাদারনীর কথা কাটাকাটি বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে জমাদার আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, 'আজ হল না বাবু, আমাদের...কি করা যাবে! তবে ফির আর একদিন লিয়ে আসা যাবে আমনাকে। নাকি বলছেন...একটু লতুন জামা কাপড় লইলে—নাকি বলছেন বাবু?'

বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললম, 'একটা জামা দ্যাখোতো। জমাদারের ছেলেকে দিতে হবে। নইলে ওর ছবি তোলা হচ্ছে না।'

পুরনো বাক্সের স্তূপ ঘেঁটে মোটামুটি অক্ষত একটা জামা পাওয়াও গেল। জটের মত পাঁশুটে চুলে ভরতি কালো-কুলো কচি ছেলেটার গায়েও হবে মনে হল। পরের দিন জমাদারকে দিতে সে একেবারে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল, 'লিয়ে যাব মা। এখন তো ঝাড়ু-মাড়ু দিতে হবে। অমন সোন্দর জিনিসটা নাকি বলছেন, নোংরা হয়ে যাবে। তবে লিয়ে যাব। জমাদারনী খুব খুশি হবে মা—'

জামাটা জমাদার নিয়ে গিয়েছিল কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে। কিন্তু তবু কোনও সাড়া শব্দ পওয়া গেল না। তাই নিজে থেকেই তাড়া দিতে হল, 'কি জমাদার, জামা তো হয়েছে। এবার তোমার খোকার ফোটো তুলে নেওয়া যাক একটা?'

জমাদার বললে, 'হ্যাঁ বাবু, সোন্দর জামা, ধম্মকথা। ফটোক ইবার তুলবেন বই কি, নাকি বলছেন...'

বলে আপন মনে গভীর মনোযোগে ড্রেনের ঝারিটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে শুরু করলে। তারপর তার বাড়িতে পালা সেই শুয়োর ক'টার জন্যে হেঁশেল থেকে ফেলে দেওয়া এঁটোকাঁটা আর বাসি রুটি ভাত তরকারির পিণ্ডগুলো গামছায় বাঁধতে লাগল পরিপাটি করে।

'তা হলে কবে?'

জমাদার তারিখও দিলে কয়েকবার কিন্তু ছবি তোলা হল না। জমাদার নিজেই আবার সে সব তারিখ পালটে জানিয়ে দিয়ে গেল—'সে আর একদিন...'

এ আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে। চেপে ধরলাম, 'কি ব্যাপারটা কি খুলে বলো—'

গাইগুঁই করে জমাদার শেষ পর্যন্ত জানালে, হাঁ বাবু, জামা তো দিলেন, ধম্মকথা। না কি বলছেন বাবু? সোন্দর জামা, ছেঁড়া-খোঁড়া কি সেলাই কিছু বি নাই। না কি বলছেন বাবু? তবেই তো আমনাদের দেওয়া,—তো খোকা বড় হয়ে উ ফটোক তো দেখবে? তো বলবে কি ই পরের জামা দিয়ে ছবি তুলেছিল বাপটা—এই কথা বাবু। আমাদের জমাদারদের...কি বলব আমনাকে...'

জমাদারের প্রৌঢ় রহস্যময় নেশাচ্ছন্ন চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ভীত লজ্জায়।

তবু বলালম, 'এ ছবি দেখে কেউ কখনও বুঝতে পারে, এ নিজের জামা না পরের জামা?'

জমাদার বিনীতভাবে মাথা নাড়ল 'হাঁ বাবু, উতো ঠিক কথা। তবে একটা নিজের রোজগারে...নাকি বলছেন বাবু! খোকাটা বড় হয়ে বলবে কি হাঁ আমার একটা বাপ ছিল, উ এ পিরানটা খরিদ করে দিয়েছিল আমার লেগে।...নাকি বলছেন বাবু? এই আর কি...'?

ক্ষয়গ্রস্ত, প্রৌঢ় দুই নেশাচ্ছন্ন চোখ আমার দিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে শূন্যে—এক আকাঙক্ষার আকাশ নিয়ে।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় আকাঙক্ষা আছে। তাদের মূর্তি অসাধারণ। জমাদারের আকাঙক্ষাটা তেমন অসাধারণ নয়, একান্ত গতানুগতিক। তবু ইচ্ছে হয়েছিল, বলি 'তাই হোক জমাদার। নিজের মেহনতের রোজগারে নিজের পুত্র পরিবারকে সজ্জিত করার নিতান্ত মামুলি এই একটা স্বপ্ন তোমার সার্থক হোক। মনে হয়েছিল, এমন ক্যামেরা কি পাওয়া যাবে যাতে ছবি তোলা সম্ভব এই সাধারণ নিতান্ত সাধারণ একটা প্রৌঢ় স্বপ্নের?

দীর্ঘদিন তারপর ছবির কথাটা ওঠেনি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। জমাদারও ভুলে গিয়েছিল কি না কে জানে। দিন চলেছে খবরের কাগজের শিরোনামায় হোঁচট খেতে খেতে। নির্বাচন, মন্ত্রী, পরিকল্পনা, নতুন পরিকল্পনা, সংশোধিত পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা—চাকা ঘুরছে উর্ধ্বশ্বাসে।

এর মধ্যে জমাদার দৈনিক আসে ঠিক আগের মত। নোংরা পরিষ্কার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাড়ির ছেলেপুলেরা কেউ মাটি থেকে কোনও জিনিস খুঁটে খেলে বকবক করে অভিভাবকের মত। ছোঁয়া লাগার ভয়ে থমকে দাঁড়ায় উঠোনে কাপড় মেলা

থাকলে। ঘড়াংঘড়াং শব্দ করে ঝাঁটা ফেলে তার নোংরা-বওয়া টিনটার মধ্যে। তারপর বাড়িটার নানা ভাড়াটের নানা হেঁশেল থেকে যে উদ্বৃত্ত বাসি রুটি, পাতের ভাত আর এঁটোকাঁটা পড়ে থাকে তা পিণ্ড পাকিয়ে বেঁধে নেয় তার ছেঁড়া গামছাটায়।

মোটামুটি নিস্তরঙ্গ মামুলি জীবনযাত্রাটার মধ্যে ঠিক আগের মতই জমাদারকে কেউ লক্ষ করে না। লক্ষ করার প্রয়োজন হয় না। জমাদারও পারতপক্ষে পড়তে চায় না কারও লক্ষের মধ্যে।

একদিন জমাদারই মনে করিয়ে দিলে, 'নমস্কার বাবু—'

'নমস্কার, কি খবর জমাদার?'

'না তাই বলছিলাম। সেই খোকাটা, ছুট্টু খোকা—উ তো ভগবানের দয়ায় বড় হয়ে উঠল বেশ। আমনি আর দেখেননি। তাই জমাদারনী বলছিল, এবার বাবুকে—'

অর্থাৎ সেই ফটো। চমকে উঠলাম, জমাদার এতদিনেও ভোলেনি।

'কিন্তু তোমার খোকার পোশাক কি কেনা হয়েছে...? সরকারি পরিকল্পনার ফল ফলছে তাহলে বল—'

অভ্যস্ত আধা রহস্য অনুকম্পায় জিজ্ঞেস করলাম। কারণ যারা জমাদার নয়, তারা জমাদার নয়, তারা জমাদার শ্রেণীর সঙ্গে কথা কইলে অমনি অনুকম্পা ও অমনি রহস্য ছাড়া কি করে কথা কইবে?

'আর বাবু তামাশা করছেন...' বলে জমাদার হাসল অনুগৃহীতের মত, তারপর জানাল 'ওই যে শুয়োরটা পালছিলাম। উ বাচ্চাগুলাও বড় হয়ে গেল। তা এতদিন বেচি নাইক, না বড় হলে দুটো টাকা আসবে, নাকি বলছেন। তা ইবার বেচে দিব—আজ্ঞা হাঁ উতে একটা পিরান হয়ে যাবে নাকি বলছেন?'

বললাম, 'বেশ, যাব পরশু বিকেলে—'

ফটো তোলার শখটা ইতিমধ্যে কবে যে উবে গিয়েছিল তা খেয়াল ছিল না। ক্যামেরাটা আর নতুন একটা ফিল্ম নিয়ে রওনা দিলাম। নিজের ঝঞ্ঝাট ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে অনেক। সংসারে নিত্য অনুযোগ—কারু পড়া হচ্ছে না, কেউ চাকরি পাচ্ছে না, কারও বা চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম অর্থও সংগ্রহ করা হয়ে উঠল না। জমাদারের ছেলেটার ছবি তুলে এবার দায়মুক্ত হতে পারলেই ক্যামেরা শখটাকে আরও অনেক শখের মতই বিক্রি করে দেওয়া যাবে।

হোঁচট খেতে খেতে আবার গিয়ে পৌঁছলাম। সেই বস্তিটায় চারিদিকে মামুলি কোলাহল কর্মব্যস্ততা। মাটির ওপর থেবড়ে বসে কাঁপা কাঁপা হাতে প্যাঁটপেটে ফোঁড় দিয়ে আপন মনে সেলাই করছে এক থুড়থুড়ে বুড়ো। পাঁশুটে চুলের জট দুলিয়ে ন্যাংটা ন্যাংটা কয়েকটা ছেলেমেয়ে আপন মনে খেলছে, চ্যাঁচাচ্ছে। হাউড্রেনের ঘোলা জলে থুবড়ে থুবড়ে কাপড় কাচছে এক কিশোরী গিন্নী আর কাদার মধ্যে কোঁৎকোঁৎ করছে কয়েকটা কদর্য শুয়োর।

শুয়োর কদর্য হয় জানি কিন্তু এমন প্যাঁকাটির মত দেখতেও যে হতে পারে ভাবিনি কখনও।

ডাকলাম, 'জমাদার, জমাদার!'

কিছুক্ষণ কোনও সাড়া এল না। তারপর ওই বস্তিরই কোনও একটা কামরা থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল জমাদার, 'নমস্কার বাবু...'

'কই, কি ব্যাপার, ছবি?'

জমাদার প্রৌঢ়, অপেক্ষমাণ, রাঙা রাঙা চোখ দুটো কাঁপল একটু। তারপর কোনও উত্তর না দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। শুধু ঘরের ভেতর থেকে একটা বিদঘুটে চাপা মেয়েলি কান্না আচমকা বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠে তেমনি আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল আবার।

ক্যামেরা আর ভদ্রলোক দেখে সেই আগের মতই ছোটো একটা ভিড় জমেছিল আশেপাশে। খবরটা জানা গেল তাদের কাছ থেকে। জমাদারের ছোটো খোকা মারা গেছে আজ সকালে হাসপাতালে কলেরায়। কি করা যাবে, খেতে হবে তো। জমাদার সাতবাড়ির কাজ করে যে এঁটোকাঁটার পিণ্ড নিয়ে আসত শুয়োরের জন্যে তা থেকে বেছে বেছে জমাদারনী খাওয়াত ছেলেটাকে। হাঁ, জমাদার রোজ বারণ করেছে। কিন্তু কি করবে। বারণ করেছে কি, খাওয়াস না। তাহলে শুয়োরগুলো কি খাবে? শুয়োরগুলোর গতরে মাংস লাগছে না। কিন্তু কি করা যাবে। বুড়ো মানুষ খেলে হয়তো কিছু হত না। কিন্তু ও বাচ্চা—কি বাসি না পচা না কি খেয়েছে, বাস এক বেলাতেই...'

মামুলি কাহিনী। ১৯৫৪ সালে কলকাতার এ মামুলি কাহিনীটা খবরের কাগজে পর্যন্ত ওঠার মত নয়। শুধু—ঘরের ভেতর থেকে বিকৃত বিদঘুটে কান্নাটা মাঝে মাঝে গুমরে উঠতে লাগল। আবার থেমে যাবে আচমকা। একটা কালো-কুলো বাচ্চা ছিল এই বস্তিতে। সে নেই।

'ছবি লিবেন না বাবু?' ফিরে যাচ্ছিলাম। যে ভিড়টা জমেছিল তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বললে। চমকে ফিরে তাকালাম। মামুলি কলকাতার বস্তি। মামুলি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, ছেলেপুলে, হাউড্রেন, শুয়োর। শিশু, নারী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অপেক্ষমান কয়েক জোড়া স্তব্ধ চোখ! জমাদারও এর মধ্যে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় সে আছে খুঁজে পাচ্ছি না।

ছবি? হাঁ, হাঁ, একটা ছবি তুলতে চাই। জ্বালা জ্বালা করছে চোখ দুটো। নিঃশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে। আমার হাতে ক্যামেরাটা কাঁপছে থরথর করে—একটা ছবি তুলতেই হবে। কি ছবি জানি না, কার ছবি জানি না। কিন্তু একটা ছবি চাই! সে ছবি সাধারণ, আর কে জানে তাই বুঝি এত ভাস্বর। নৈমিত্তিক, আর কে জানে তাই বুঝি এত অসহ্য।

একটা ছবি যদি তুলতে পারতাম।

শরৎদা

গৌরকিশোর ঘোষ

প্রায় ছ'বছর বাদে, কলকাতার এক বাসে, গত বছর করবীদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন ইস্ট রেঞ্জে ওরা বাসা করেছে।

সে বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। করবীদির ঘরকন্নাও দেখলাম। আর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দিন্দাকে কেন বিয়ে করলে না।

করবীদি বলেছিল, 'দিন্দা ভাই মানুষ নয়, রোবট। একটা রাজনৈতিক দলের প্রত্যঙ্গ। আমি মানুষ চেয়েছিলাম, যান্ত্রিক নয়, রক্ত মাংসের। আমি জীবন চেয়েছিলাম। পার্টি নয়। তোরা হয়তো হাসবি। একদিনকার বিপ্লবী মেয়ের মুখে আজকের এই কথা শুনে বিদ্রূপ করবি। কিন্তু পার্টিতে আমি ছিলাম বঁড়শি বেঁধা মাছ। পরিত্রাণের জন্য লেজের ঘাই মারতাম। তোরা ভাবতি আমার কি তেজ। রাজনীতি তো জীবন নয় ভাই, জীবনের একটা অংশ।'

করবীদি একটু মোটা হয়েছে। আগের চাইতে যেন রংটাও খুলেছে। সিঁথিতে সিঁদুরও উঠেছে। চুপ করে আছি দেখে খোঁচা মারলেন।

'কি, এখনও সেই পুরনো দলেই আছিস?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেশে যাস?'

বললাম 'না।'

'কতদিন?'

জবাব দিলাম, 'বছর খানেক।'

'তাহলে তো তুই শরৎদার খবর জানিস না?'

বললাম, 'না।'

করবীদি গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, 'ওঁর মেয়েটি মারা গেছে।'

করবীদি হাত ব্যাগ খুলে এক চিঠি বের করে দিল। পড়লুম। দিন্দা লিখেছে। 'করবী, শুনে দুঃখিত হবে, শরৎদার মেয়েটি মারা গেছে। যদিও ওঁর যাবতীয়

যোগাযোগ হারিয়েছিলুম, কিন্তু এই ব্যাপারের পর দেখা করতে গিয়েছিলুম। গিয়ে আরও দুঃখ পেলাম। শরৎদা নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে। সেখানেই মারা গেছে। মেয়েটি জন্ম থেকেই রুগ্ণ ছিল। পাছে অহিত হয়, তাই শরৎদা বন্ধ ঘরে তাকে রেখেছিলেন। চার বছরের মেয়েটি আলো দেখিনি হাওয়া লাগেনি তার গায়ে। এ অবস্থায় সুস্থ লোকই টিকতে পারে না, তো রুগ্ণ শিশু। শরৎদাও সেই ঘরে বসে থাকেন। তেমনি অন্ধকারে। কখনও বের হন না। বললুম, তো অসহায়ের মত বললেন, বাইরে যাব? কোথায়? আমার মুখে জবাব জোগাল না। যদি কখনও আস, একবার দেখা কর।'

করবীদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কাজ আছে নাকি ভাই হাতে? যাবি আমার বাসায়, এই তো কাছেই, কন্ডাক্টর রোক্কে।'

ইস্ট রেঞ্জের একটা দোতলা ফ্ল্যাটে থাকে করবীদি আর তার স্বামী ভূপতি দত্ত। স্বামীটি এ. জি. বেঙ্গলে কাজ করেন, করবীদি টেলিফোনে। অথচ করবীদি বড় গোঁসাই বাড়ির মেয়ে। ঠাকুরবাড়ির কল্যাণে বেশ দু'পয়সা আছে। করবীদি বিয়ে করেছে বাড়ির অমতে। তাই পরিবার থেকে ত্যাজ্য হয়েছে। বেশ সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। কোথাও একটু ময়লা পড়ে নেই। মনে হল করবীদি সুখেই আছে।

বললে, 'ভাই আজ আর আমার কোনও পলিটিকস নেই। আমার চোখে তোরা সবাই সমান। দিন্দাও আসে মাঝে মাঝে। ঘোর পলিটিকস করছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েছে। বস ভাই, কিছু খাবার করে আনি।'

করবীদি ভেতরে চলে গেল। আমার শুধু শরৎদা। কথা মনে পড়ছিল। শরৎদার ছাত্রী ছিল করবীদি। ওকে পলিটিকসে নামিয়েছিল শরৎদা। একদিন করবীদি পলিটিকস ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। আজ বলে গেল, আমার কোনও পলিটিকস নেই। আহা এটা যদি করবীদি কয়েক বছর আগেও বুঝত! তবে বোধ হয় শরৎদার জীবনে এত বড় ট্র্যাজেডি ঘটত না। একটা অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তি এমনি করে নিজেকে কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলত না। সরৎদা আমারও মন্ত্রদাতা। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পলিটিকস্ না করে, আমরা অন্য বৃত্তে ঘুরেছিলুম, পলিটিকস্কেই জীবনের সব করে তুলেছিলুম। হয়তো সেই ভুলেই এত বড় প্রতিভার এমন শোচনীয় আত্মাহুতি হল।

শরৎদাকে তিন অবস্থায় আমি দেখেছি। এক, যখন ইস্কুলে আমাদের পড়াতেন, দুই, যখন ওঁর সঙ্গে পার্টি করেছি আর তিন, তাঁর শেষের দিকের অবস্থায়।

শরৎদা আমাদের ইস্কুলে খুব নামকরা মাস্টার ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে খুবই ভালবাসত। আমরা ওঁর কাছে নিচের দিকের ক্লাসে, মাত্র ক'মাস পড়েছিলুম। আমাদের ক্লাস থেকেই ওঁকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর বছর চার-পাঁচ বাদে যখন তাঁকে দেখি তখন আমার ইস্কুল ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

পুলিশ যেদিন তাকে গ্রেপ্তার করে, আমাদেরই চোখের সামনে, সেদিনটা মনে আছে। আমাদের তখন মর্নিং ইস্কুল চলছে, সেইদিনই ইস্কুল বন্ধ হবে। বোধ হয় থার্ড পিরিয়ডে, ঠিক মনে পড়ছে না, শরৎদা ক্লাসে ঢুকলেন। আমরা উসখুস করছি, কথাটা বলি বলি করে। ইস্কুল বন্ধের আগের দিনটা পড়াশুনা হয় না। আমরা মাস্টারদের খাওয়াই। শরৎদা কিছুতেই খেতে চাইতেন না। বলতেন এসব ঘটা এদেশের লোক হয়ে করা শোভা পায় না। যে দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক নিরন্ন, সে দেশে এই ধরনের অপব্যয় মহাপাপ। তোমরা ছাত্ররা, দেশের ভবিষ্যৎ। এ দায়িত্বহীনা তোমাদের সাজে না। আরও অনেক শক্ত শক্ত কথা বলতেন, আমরা যার মানে বুঝতুম না। কতক কানে ঢুকত, কতক নয়। এবার আমরা ঠিক করেছিলুম, ওঁকে কিছু খাওয়াবোই।

সতীশকে দিয়ে বলাতেই এবারে রাজি হয়ে গেলেন। সতীশ ওঁর খুব প্রিয় ছিল।

শুধু বললেন, 'খাওয়াবে? দাও। আবার দেখা হয় কি না হয়, ঠিক কি, একটা আক্ষেপ থেকে যাবে।'

ওঁর সম্পর্কে এইটুকুই শুধু মনে আছে। হ্যাঁ, আরও একটা ব্যাপার সেদিন ঘটেছিল। হঠাৎ দলে দলে পুলিশ এসে ইস্কুল বাড়িটা ঘিরে ফেলেছিল। হেড্‌মাস্টার ছিলেন রায়সাহেব। তাঁর সেকি বিপর্যস্ত অবস্থা সেদিন। হন্তদন্ত ছুটোছুটি করছিলেন। আর বারে বারে পুলিশ সুপারের কাছে গিয়ে হাত কচলাচ্ছিলেন।

'স্যার বলুন, কি করতে পারি।'

কিন্তু হেড্‌মাস্টার মশায়ের অনুনয় বিনয়ে কোনওই ফল ফলেনি। পুলিশ শরৎদাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। শরৎদা সে সময়ে খাচ্ছিলেন। সতীশ ক্লাসের বাইরে কি করতে যেন গিয়েছিল।

হুড়মুড় করে ঢুকে বললে, 'ওরে বাপরে, কত পুলিশ।'

মনে আছে, শরৎদা খেতে খেতে একবার মুখ তুলেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত পুলিশ, সতীশ?'

সতীশ জবাব দিয়েছিলেন, 'অনেক স্যার, অনেক।'

'অ' বলে শরৎদা খাওয়া শেষ করলেন। জল খেলেন ধীরে সুস্থে।

ক্লাসে ক্লাসে তখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা। কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করেছে।

শরৎদা বললেন, 'ছি, কে কাঁদে? কেঁদো না। আজ তোমরা ছোট আছ, কাল বড় হবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব পড়বে দেশকে স্বাধীন করবার। কত লড়াই করতে হবে, ঠিক কি। ভয় পেলে লড়াই করবে কি করে?'

লেকচারে কি ভয় কাটে? ধপাস ধপাস শব্দ করতে করতে কতকগুলো বুটের শব্দ আমাদের ক্লাসের দিকেই এগিয়ে আসছিল। হেড্‌মাস্টার মশাইকে দরজার কাছে

দেখলুম। পেছনে বেল্ট আঁটা বুট পরা, খাকির প্যান্ট শার্ট পরনে আর সোলার হ্যাট মাথায় এক সাহেব। তারপরেই সাত আটজন পুলিশের লোক।

হেড্‌মাস্টার মশাই ঢুকলেন। ভয়ে, বিরক্তিতে রাগে সে এক অদ্ভুত অবস্থা হয়েছে তাঁর।

বললেন, 'শরৎবাবু আপনাকে ডিসমিস করলাম। পলিটিক্যাল ক্রিমিন্যালদের স্থান আমার ইস্কুলে নেই। ওঃ ডেঞ্জারেস্।'

তারপর বাইরের সাহেবটির দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি আসুন, গ্রেপ্তার করুন।'

সাহেবটি আমাদের ক্লাসে ঢুকবে শুনেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম করল।

সাহেব ক্লাসে ঢোকবার উদ্যোগ করতেই শরৎদা বলেন, 'বাইরে থাকুন, ক্লাসের পবিত্রতা নষ্ট করতে দিতে চাইনে।'

তারপর শরৎদা প্ল্যাটফরমের উপর উঠে গোটা ক্লাসের উপর চোখ একবার বুলিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়লেন। ভারী ভারী বুটগুলো নিচে নেমে গেল। ইস্কুলময় উত্তেজনা। ক্লাস ভেঙে ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে গেল। দেখলুম, শরৎদাকে হাতকড়ি পরিয়ে গাড়িতে তুলছে।

হঠাৎ দিন্দাকে দেখলুম, ফার্স্ট ক্লাসের লম্বা-চওড়া জোয়ান মর্দ ছেলে। দিন্দা ইস্কুলের পাঁচিলে উঠে দাঁড়িয়ে 'শরৎদা কি জয়' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কেউ সাড়া দিলে না।

হেড্‌মাস্টার মশাই চমকে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, ধমক লাগালেন, 'এই উল্লুক, নেমে আয়।'

দিন্দার ভয় নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার আওয়াজ তুলল, 'বন্দেমাতরম।' সে ধ্বনি আমাদের পরিচিত। নিষিদ্ধ ধ্বনিটাতে এবার আমাদের বুকে ঢেউ উঠল, মুখে প্রতিধ্বনি ফুটল।

'বন্দেমাতরম্।'

কয়েক শত কণ্ঠ একই সঙ্গে সাড়া জাগালে। পাড়া জাগালে। পুলিশের ভয়, হেড্‌মাস্টারের ভ্রূকুটি কোথায় ভেসে গেল! সেদিন দিন্দার নেতৃত্বে ইস্কুলসুদ্ধ ছেলেরা সারা শহর ঘুরেছিলুম।

শরৎদা সম্পর্কে অনেক কথা দিন্দার মুখ থেকে শুনেছি।

দিন্দা বলতেন, 'জানিস, এমন লোক হয় না। শরৎদার বাড়ি তো দেখিসনি, সে এক বিরাট পুরী। চার-পাঁচ পুরুষের ডাকসাইটে জমিদার বংশ। এখন অবিশ্যি প্রায় কিছুই নেই। তাও, নেই নেই করেও যা আছে না, দেখলে অনেকেই ভিরমি খেয়ে পড়বে। কিন্তু শরৎদা জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া ইস্তক সেসব পয়সা হাতে ছোঁননি।

বি-এ, এম-এ পাস করেছেন টিউশনি করে। বলতেন, ওসব পয়সা অন্যায়ের কড়ি, কত লোককে শোষণ করে ও টাকা আমাদের গুষ্ঠি জমিয়েছে, আমাকে তো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই জন্যে শরৎদার বাবাও ওকে দেখতে পারতেন না। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কি মহৎ প্রাণ, বল দিকিনি।'

শুনেছিলুম, রাজদ্রোহিতার চার্জে তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়েছে। হেডমাস্টার মশাই শরৎদাকে বড্ড ঘৃণা করতেন। ওকে মাস্টারি দেওয়ায় তাঁর ইস্কুলের গ্র্যান্ট কাটা গিয়েছিল। রায়বাহাদুর হবার সম্ভাবনাও দূরে সরে গেল। পাঁচ বছর জেল হয়েছে শুনে তিনি নাকি দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মহামান্য সম্রাট দয়া দেখান বলেই এই ধরনের ক্রিমিন্যালরা বড্ড প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। যেখানে লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত, সেখানে তার সাজা হল কিনা মাত্র পাঁচ বছর জেল।

তবে শরৎদা পাঁচ বছরের আগেই খালাস পেয়েছিলেন। আমি তখন ম্যাট্রিক দিয়ে প্রেমসে পলিটিকস্ করছি। আমাদের এলোমেলো কাজে শরৎদা শৃঙ্খলা আনলেন। আর আনলেন এই করবীদিকে। করবীদি নিজেই এসেছিল। জেলে যাবার আগে শরৎদা করবীদিকে পড়াতেন। ওদের বাড়িতে গোঁড়ামি খুব। করবীদিই বোধ হয় বাড়ির প্রথম মেয়ে, যে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। কলেজে পড়ারও ইচ্ছে ছিল, বাড়ির অনুমতি না পাওয়ায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি। শরৎদা ফেরার পর বোধ হয় করবীদির সে ইচ্ছেটা আবার জেগে উঠেছিল। বাড়িতে বললে, প্রাইভেটে আই-এ দেবে। শরৎদা যদি এখন পড়ান। শরৎদারও একটা সংস্থান হয়ে গেল। শরৎদাকে ওরা বাড়িতে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু শরৎদা বাপ-ঠাকুরদার অর্থটাই ছাড়তে পেরেছিলেন, আভিজাত্যটুকু নয়। তাই করবীদিদের বাড়িতে থাকতে রাজি হননি।

করবীদি আই-এর পড়া কতটুকু পড়ল কে জানে, তবে পলিটিকসে দড় হয়ে উঠল। আর শেষ পর্যন্ত রেশারেশি যেটা শুরু হয়েছিল শরৎদা আর দিন্দার মধ্যে, তাও বোধ হয় করবীদিকে নিয়েই। সেটা অবিশ্যি আমার অনেক পরে মনে হয়েছে।

সূত্রপাতটা হয়েছিল থিওরি নিয়ে। দিন্দা ফিল্ড ওয়ার্কার। খুবই কাজের লোক। পার্টিকে দেখতে দেখতে কেমন সুন্দরভাবে গড়ে তুললে। যে কোনও কাজের সমর্থনে মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন থেকে উদ্ধৃতি ঝড়াঝ্ঝড় তুলে দিতেন। শরৎদা অতি ধীর স্বভাবের লোক। চিন্তাশীল। জেলে বসে বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। বহুক্ষেত্রে দিন্দার কাজ সমর্থন করতে পারতেন না। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলত।

শরৎদা বলতেন, 'দিনু একখানা বই না পড়েও কেমন করে মার্কসিস্ট হল, বুঝিনে। ও যা বলে, তার সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক কোথায় খুঁজে পাইনে সস্তা কতকগুলো প্যাম্ফ্লেট পড়েই ভেবেছে বুঝি মার্কসিস্ট হলাম।'

দিন্দা বলতেন, 'গুচ্চের বই পড়লেই মার্কসিস্ট হওয়া যায় না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ আপনিই উপলব্ধি করা যায়।'

আসলে দিন্দা শরৎদার থেকে ঢের বেশি পলিটিসিয়ান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ধীরে ধীরে পার্টিকে নিজের হাতের মুঠোয় করে ফেললে। শরৎদার প্রভাব যে পার্টি থেকে প্রায় মুছে যাবার মত হয়েছে, তা শেষ দিন পর্যন্তও তিনি বুঝতে পারেননি। রাতদিন পড়াশুনা নিয়ে থাকলে চোখ খোলা রাখবেন কি করে?

দিন্দার একমাত্র ভাবনা এখন করবীদিকে নিয়ে। করবীদি বিপক্ষে থাকলে মুশকিলের সম্ভাবনা থেকে যায়। শরৎদাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। রাজনীতিতে যে স্বল্প পরিমাণ জ্ঞানও আমি পেয়েছি, সে সবই শরৎদার কাছ থেকে।

করবীদির সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই আমার সঙ্গে ওর ভাবও ছিল একটু বেশি। আমি জানতুম করবীদি যত আগ্রহে পলিটিকস করছে, তার সবটাই পলিটিকসের জন্য নয়। ও শরৎদাকে ভালবাসত। কিন্তু শরৎদা বোধহয় সেটাকে আমল দেননি। তাঁর চোখে তখন শুধু পলিটিকস আর পলিটিকস।

আমার মনে হয় করবীদি বোধ হয় খানিকদূর এগিয়েও গিয়েছিল। কি করে সে কথা মনে হল বলছি। একদিন শরৎদার বাসায় গিয়েছি। কিছুদিন আগেই শরৎদা অসুখ থেকে ভুগে উঠেছেন। ঘরে ঢুকতে যাব, দেখি শরৎদা করবীদিকে বকছেন, আর করবীদি কাঁদছে।

শরৎদা বলছেন, 'এই মতলবে তুমি পার্টি করতে এসেছিলে! ছিঃ, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। দ্যাখ করবী, রাজনীতি করবে তো তাই কর, বিয়ে করে সংসার পাতবে তো তাই পাতো, কিন্তু দুটো এক সঙ্গে করতে যেও না। দুটো মনিবকে একসঙ্গে সেবা করা যায় না।'

আমি ঘরে ঢুকতেই সে প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে অস্বাস্তির ভাবও দেখেছিলুম। দিন্দাকে রিপোর্ট দিয়েছিলুম বিস্তারিত। আর তাতেই কাজ হয়েছিল। বাকিটা দিন্দাই করেছিল।

সত্যি, ছয় মাসের মধ্যে করবীদির এতটা পরিবর্তন হবে, ভাবতে পারিনি। করবীদি যে এতটা পারবে তাও আমার কল্পনার অতীত ছিল।

সেবার ওদিকে ভীষণ বন্যা হয়েছিল। সমস্ত পার্টি মিলে এক সংযুক্ত বন্যাত্রাণ তহবিল খোলা হয়েছিল, শরৎদা ছিলেন তার সেক্রেটারি। সেই তহবিল থেকে রহস্যজনকভাবে দেড় হাজার টাকা উধাও হয়ে গেল। শরৎদা পাগলের মত হয়ে গেলেন, হদিশ বের করতে পারলেন না। শুধু শরৎদা কেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের পার্টির ঘাড়েও বদনাম পড়তে লাগল। দিন্দা আর করবীদি পার্টির সুনাম বজায় রাখতে যে কাণ্ড করলেন, তা আমি কখনও পারতুম না। সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলুম, পলিটিকস করবার মত স্নায়ুর জোর দিন্দার আছে, আমার নেই।

স্পষ্ট মনে পড়ে কুণ্ডুদের বাড়ির দরদালানটা। হ্যাজাগ লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার

সরে গিয়ে দেওয়ালের পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন মওকা পেলেই লাফিয়ে আসবে। সারা ঘর ভর্তি লোক।

তহবিল তছরূপের সভা।

শরৎদার চোখেমুখে কেমন যেন অসহায় ছাপ। চশমাটা ঝুলে ঝুলে নাকের ডগায় নেমে আসছে। ওই কালো আঁচিলটায় বাধা না পেলে হয়তো পড়েই যেত। আর কি প্রচণ্ডভাবে ঘামছেন। একজনের পর একজন উঠে বক্তৃতা দিচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে শরৎদাকে। চোর বললে। আমাদের পার্টিও বাদ যাচ্ছে না। আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠচে। শরৎদার জন্য আমরাও গাল খাচ্ছি, তাঁর উপরও রাগ হচ্ছে জোর। শরৎদাকে কেউ কিছু বলতেই দিচ্ছে না। বলতে চেষ্টা করলেই 'চোর চোর' বলে তাঁকে বসিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ করবীদি উঠে দাঁড়ালেন। হইচই একটু কমে গেল।

বললেন, 'শরৎবাবু যদি টাকা চুরি করে থাকেন'—তাঁর কথা বেরুতে না বেরুতেই শরৎদা যেন বৈদ্যুতিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

'কি কি বললে, আমি টাকা চুরি করেছি। আমি—'

'চোর চোর' 'বস বস' বলে সভাশুদ্ধ লোক তাঁকে বসিয়ে দিলে।

শরৎদা ধপ করে সেই যে বসে পড়লেন, আর ওঠেননি। চেয়ে দেখলুম তাঁর মুখ থেকে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে।

করবীদি অকম্পিত কণ্ঠে বলে গেলেন 'শরৎবাবু যদি টাকা চুরি করে থাকেন তো তার যাবতীয় ঝক্কি তিনিই সামলাবেন, আমাদের পার্টিকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন? আমরা পার্টি মিটিং-এ শরৎবাবুকে হিসাব দাখিল করতে বলেছিলাম, কিন্তু দুঃখের কথা তিনি সন্তোষজনক হিসাব দেখাতে পারেননি। সে কারণে পার্টির স্পেশাল মিটিং-এ ওঁর সভ্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।'

করবীদি আর কিছু না বলে বসে পড়ল। করবীদির বক্তৃতা এতই আকস্মিক যে, আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কিছুতেই মনে করতে পারছিলুম না কোন মিটিং-এ আমরা শরৎদাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পিছন থেকে দিন্দার ফিসফিস আওয়াজ শুনলুম, 'বেশ বলেছ।'

দেখলুম করবীদি আর দিন্দা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

করবীদি এতক্ষণ পরে যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল। তবু মুখে জোর দেখিয়ে বলল, 'পার্টির থেকে শরৎদা বড় নন।'

দিন্দা তার পিঠ চাপড়ে দিলেন 'সাবাস।'

কিন্তু আমি। আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলুম, শরৎদা চোর। উত্তরকালে ঘটনাটা কতবার মনে হয়েছে। কতবার মনকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরৎদা কি চোর? স্পষ্ট করে মনের কাছ থেকে হাঁ জবাব পাইনি। তবে টাকাটা কি হল? শরৎদা কেন

হিসেব দিতে পারলেন না? এটা এক রহস্য থেকে গেল আমার কাছে।

সেদিন সেই সভায় শরৎদার প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছিল। তাও কখনও ভুলব না। কেউ বললে, পুলিশে দাও, কেউ বললে, মার। চোরের শাস্তি হওয়া দরকার। মাথা ভুরু কামিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে শহরে ঘুরাও। একজন নাপিত ডাকতে গেল। এই সময়ে পিঠে ধাক্কা খেয়ে পেছনে ফিরলুম। দেখি আমাদের পার্টির সব উঠে যাচ্ছে।

করবীদি বলছে, 'উঠে এস।'

সত্যি বলছি, উঠে যাবার অনেক চেষ্টা করলম, পারলুম না। ওই যে রক্তহীন ফ্যাকাশে মর্মর মূর্তির মত শরৎদা বসে আছেন তাঁর আকর্ষণ আমাকে জোর করে বসিয়ে রাখলে।

নাপিত এল। শরৎদার মাথা কামিয়ে ফেললে। তিনি একটুও বাধা দিলেন না। আমার কেমন ভুল হয়ে যায়। তারপরের ঘটনা আর কিছুতেই মনে করতে পারিনে। ভুরু কি কামিয়েছিল? আমার একবার মনে হয়, আমি বাধা দিয়েছিলুম, ভুরু কামাতে দিইনি। কিন্তু আমার মত ভীতু লোকের পক্ষে অতটা সাহস দেখানো সম্ভব কী?

তারপর তাঁকে শহর ঘোরানো হল। পোড়ামাতলা, যুগনাথতলা, বুড়ো-শিবতলা, বাজার, চারচারা পাড়া ঘুরে ঘুরে প্রোসেশন চলল। 'চোর চোর' চিৎকার। মন্ত্রমুগ্ধের মত শরৎদা জুতোর মালা গলায় পরে চলেছেন। প্রায় চল্লিশ জনের একটা দল তাঁকে ঘিরে চলেছে। আমাদের ইস্কুলের কাছে এসে প্রোসেশনটা দাঁড়াল। 'চোর চোর' চিৎকার উঠতেই ক্লাসসুদ্ধ ছেলে ভেঙে পড়ল মজা দেখতে। তারাও চেঁচিয়ে উঠলে 'চোর চোর'। মনে পড়ল আরেকদিন সকাল বেলার কথা। শরৎদাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছিল, এই ইস্কুল থেকে। ওই তো সেই পাঁচিল, দিন্দা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়েছিল, 'শরৎদা কি জয়।'

বকুলতলা থেকে কে একজন বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে আর না। এবার ওকে ছেড়ে দাও, বাড়ি যাক।'

কে আরেকজন বললে, 'কেউ একজন সঙ্গে যাক'।

কে যাবে, কে যাবে? একজন আমাকে দেখিয়ে দিলে, 'ও তো ওরই দলে। ওই যাক না।'

আমার উপর ভার দিয়ে সবাই সরে পড়লেন। গনগনে রোদ্দুর। লোকজন সব চলে গেছে। শুধু আমি আর শরৎদা। চুপচাপ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ ফ্যাকাশে। চোখ বোজা। আমি গলা থেকে জুতোর মালাটা খুলে দিলুম। চশমাটা ঝুলে প্রায় পড়ে যাবার মত হয়েছিল, ঠিক করে দিলুম। শরৎদার নড়ন-চড়ন নেই। পথের পাশে বারান্দায় বসিয়ে দিলুম। বসে পড়লেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় যাবেন, শরৎদা।'

চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় যাবেন?'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

বললুম, 'বাসায় যাবেন?'

ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে জানালেন, না।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে? বাবার কাছে যাবেন?'

ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ।

দিন্দা ভুল লিখেছে। মেয়ে নিয়ে নয়, বিয়ে হবার আগেই শরৎদা নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। আমিই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলুম। পার্টির আর কেউ শরৎদার খোঁজ তো করত না। জানবে কি করে?

সেদিন করবীদি যখন বললে, আজ আমার কোনও পলিটিক্স নেই, তখন ইচ্ছে হয়েছিল একবার, জিজ্ঞাসা করি শরৎদা টাকা চুরি করেছে, এটা ও বিশ্বাস করে কি না। কিন্তু পুরনো কথা তুলে লাভ কি? রহস্যটা আমার কাছে রহস্যই থাক। আরও একটা রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি। পরের কয়েক বছর পার্টির কাজ অত ভালভাবে চলেছিল কি করে? আমরা অনেক পুস্তিকা ছাপিয়েছিলুম, তিনজন হোলটাইম ওয়ার্কার রেখেছিলুম, তিনটে মহকুমায় বছর দুই ধরে অফিস রেখেছিলুম। কোথা থেকে এই খরচ মেটাতুম, তাও বলতে পারিনে। করবীদি হয়তো পারতে পারে, কিন্তু সে কথাও আর জিজ্ঞাসা করলুম না। প্রয়োজন কি?

করবীদি সামনে বসে আমাকে খাওয়ালে। শরৎদার কথা জিজ্ঞাসা করলে। ওর কথাবার্তায় কোথাও তো অন্তারিকতার অভাব দেখলুম না। অথচ এই করবীদিই না একদিন শরৎদাকে প্রকাশ্যে চোর বলতেও বাদ রাখেনি। শরৎদাকে যখন পার্টি থেকে খেদিয়ে দেওয়া হল, সেইদিনও এই করবীদিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরে অবশ্য জেনেছিলুম, করবীদি পুতুল মাত্র, অদৃশ্য থেকে যেমন ইঙ্গিত পাচ্ছিল, অভিনয়টা তার সেই মতই চলছিল। এই মেয়ে আর সে মেয়ে, ব্যক্তি তো একই। কিন্তু তবু কেমন দুটো আলাদা ব্যক্তিত্ব হয়ে গিয়েছিল। কেন, পার্টি পলিটিক্সের মধ্যে কি এমন রহস্য আছে, যা মানুষকে মানুষ রাখে না, আজ্ঞাবহ পুতুল করে তোলে? এ প্রশ্নের হদিশ আজও আমার মেলেনি।

আজ শরৎদার দুর্ভাগ্যে করবীদি আমার সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেললে, এর মধ্যে একটুও ফাঁকি নেই। আমি চলে গেলে হয়তো চোখের জল ফেলবে। কিন্তু এই করবীদিই আর এক দিন, পার্টি মিটিং-এ শরৎদার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তুলে দেবার প্রস্তাব অকম্পিত কণ্ঠে সমর্থন করেছিল, আমি সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারিনি বলে আমাকে কী তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছিল। শুধু কি তাই, সেই প্রস্তাবের একটা

কপিও শরৎদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাজনীতি কি মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে?

শরৎদা বাড়ি ছেড়ে বেরুতেন না। করবীদি তার কারণ খুঁজে পায়নি। বলত, মুখ দেখাবার জো নেই, তাই। হয়তো তাই। আমার সঙ্গে যে কয়েকবার শরৎদার দেখা হয়েছে, হয়েছেও বার দুই-তিন, শরৎদাকে শুধু বাড়ির মধ্যে নয়, একেবারে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছি। বন্ধ ঘরে বসে থাকতেন। দরজা-জানলা তো বন্ধই থাকত, ফাঁক ফোকরগুলোও কালো পরদা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সে ঘর ছেড়ে বেরুতে চাইতেন না। বলতেন, বাইরেটা বড় নোংরা, ওখানে বড় নোংরামি। শুনেছি বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ঢাকা গাড়ি করে। দুর্ভাগ্যত বউ বেশিদিন বাঁচেনি। একটি মেয়ে প্রসব করে হাসপাতালেই মারা যায়।

শরৎদার বউকে আমি দেখিনি, মেয়েকে দেখেছি। বছর চারেক বেঁচেছিল। আমি যখন দেখি, তখন মেয়েটিও ভুগছে, বছর আড়াই বয়েস হবে। আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু চিকিৎসা করত। বলত, মেয়েটা ভাই বাঁচবে না, আলো নেই, হাওয়া নেই, এর মধ্যে এতদিন বেঁচে আছে সেই যথেষ্ট।

বলতুম, 'তুই বলতে পারিস নে সে কথা?'

ডাক্তারবন্ধু বলত, 'কাকে বলব? শরৎদাকে বললেই শরৎদা শিউরে উঠেন। বলেন, না না, দরজা-জানালা বন্ধ থাকবে। আমি দেখেছি বাইরের হাওয়ায় বড় নোংরামি। আমি চাইনে আমার মেয়ের গায়ে সে হাওয়া লাগুক। নিজেই মেরে ফেলবে মেয়েটাকে।'

আর ফেললেনও।

আমি নিজেও একবার বলেছিলুম শরৎদাকে, কিন্তু শরৎদার এক কথা। নোংরা, নোংরা বাইরে বড় নোংরামি। প্রথম যখন ওঁর ঘরে ঢুকতেই যাই, বলেছিলেন, ওই দরজার কোণে লাইজল আছে, হাত ধুয়ে ঢোকো। তোমরা তো রাজনীতি কর তোমাদের হাত বড় নোংরা থাকে।

আইন নেই

সমরেশ বসু

বাসকের ঝাড়টা যেখানে সুনিবিড় হয়ে ঘন অরণ্যের রূপ ধরেছে, যেখানে বড়-বড় গাম্বিল আর মুচকুন্দ চাঁপাগাছ কয়েকটার কোমর-ধরা ধুতুরার বন বিস্তৃত, সেখানেই ঝোপের একটা ফাঁকে লক্ষ করলে, খুব ভাল করে লক্ষ করলে, সেই অপলক চোখ দুটি দেখা যায়। সেই রক্তাভ ছোট গো-সাপের মত পলকহীন তীব্র চোখ দুটি। আর ঠিক তার একটু নিচেই প্রায় এক ইঞ্চি গোল লোহার নলটাও দেখা যেতে পারে। যে নলটার সরু গর্তের দূর অন্ধকারে যেন ভয়ংকর একটা কিছু লুকিয়ে আছে মনে হয়। যার লেলিহান জিহ্বা কয়েকবার নলের মুখটা লেহন করে করে পোড়া পাঁশুটে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

আর হাল্কা হলেও বাবুদের ঝাঁঝাল গন্ধ যেন লেগে রয়েছে বাসক ও ধুতুরার লেপটালেপটি ঝাড়ে।

জায়গাটা একটি গ্রামের প্রায় শেষ, আর মাঠের প্রায় শুরু। পশ্চিমে আশেপাশে আম-জাম-নারকেল ছাড়াও নানান গাছের ভিড় আসসেওড়া-কালকাসুন্দি-বাসক-ধুতরার জঙ্গল। কাছেই একটা পুকুর দক্ষিণ ঘেঁষে। আর পূর্বদিকে দিগ্‌বিসারি শস্যের খেত।

মাঘ মাস। বেলা এগারোটার রোদে এখনও সোনার আভাস। চকচকে নীল আকাশের তলায়, সুদূর দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকেছে রবিশস্যের সবুজ মাঠ। মুক্ত অবাধ একটি মাঠ যেন ঠিক স্বপ্নের মত দিগন্ত ছুঁয়ে পড়ে আছে। তবু কি একটা আশঙ্কায় যেন তার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, শিউরে সচকিত হয়ে উঠেছে।

সূর্য ক্রমেই মাঝ-আকাশে উঠতে লাগল। ছায়া ক্রমেই ছোট হতে লাগল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড়ে সেই গো-সাপের মত অপলক চোখের পলক পড়ল না। তীক্ষ্ণ হল আরও। আরও সতর্কভাবে চারিদিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এল। পোড়া পাঁশুটে অন্ধকার নলটা নিঃশব্দে রইল প্রতীক্ষা করে।

পুকুরে এসে মেয়েরা জল নিয়ে গেল। হেসে হেসে অনেক কথা বলে চান করে গেল। দুজন কিষাণ এসে দাঁড়াল বাসক-ঝাড়ের সেই নলটার মুখ বরাবর। কি যেন বলাবলি করল, তারপর চলে গেল মাঠের দিকে। একটু পরে সেখানে

এসে দাঁড়াল একটি আদিবাসী যুবতী মেয়ে, কৃষিমজুরণী। তার পিছন পিছন একটি লোক। গলায় কণ্ঠি, গায়ে ফতুয়া। দোকানদার কিংবা মহাজন হবে।

মেয়েটার চোখে ভয়। ভয় চাপার হাসিটাও আছে ঠোঁটে। মেয়েটা সরে দাঁড়াল পথ ছেড়ে, বাসকের ঝাড়ে প্রায় নলটা ঘেঁষে। লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার মাথা নিচু। লোকটা চোখ দিয়ে যেন চাটছে ওর পুষ্ট শরীরটা। লোকটা বলল, কি হল্য, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

মেয়েটা ভীরু চোখে গ্রামের পথের দিকে দেখল তাকিয়ে। কেউ নেই। তবু সরোষেই বলল, তু যা না।

লোকটা লাল দাঁত বের করে হেসে বলল, আমি তো যাবই। তুই যে বাজারে যাচ্ছিলি? চল?

মেয়েটা তবু বলল, তু যা না কেনে?

—আমি তোর সঙ্গেই যাব! বলে পকেট থেকে দুটি টাকা বের করল। বলল, নে, তেল কিনিস সাবান কিনিস। লাগলে আরও দেব'খনি...

ততক্ষণে মেয়েটা হনহন করে গ্রামে ঢোকার পথ ধরেছে।

লোকটাও পিছন নিতে গিয়ে থমকে গেল। চিৎকার করে ডাকল, এই এই রে, অই ছুঁড়ি, শোন্ না লো!

মেয়েটা প্রায় ছুটতে ছুটতে গ্রামে ঢুকে গেল। লোকটা দাঁতে দাঁত ঘষে টাকা দুটি পকেটে রাখল। বলল, উঁহুঁ! ছুঁড়ির দেমাক দেখ্যে বাঁচি না। বলে, তোর মত কত এল, কত গেল। বলে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড় অনড়। রক্তাভ পলকহীন চোখ দুটি, চলে-যাওয়া লোকটার দিক থেকে মাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটি আমগাছের পাতা নড়ে উঠতেই চোখ দুটি সেদিক গেল। দুটো ডাকপাখি উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক উড়ে এসে বসল বাসক-ঝাড়টার কাছে। বসতে না বসতেই হঠাৎ যেন কি টের পেয়ে থমকে গেল সবাই। বোধ হয় বারুদের গন্ধটা টের পেল। কিংবা আগুনের ঝাপটা-খাওয়া মারণ-নলটা পেল দেখতে। চোখের নিমিষে উড়ে গেল সব। মুচকুন্দ চাঁপার মাথায় মরশুমের অগ্রিম কোকিল একটা সবে ডাক ছেড়েছিল। সেও পালিয়ে গেল। আবার নিস্তব্ধ ঝিঁঝির ডাক।

সূর্যটা টাল খেয়েছে পশ্চিমে। হঠাৎ অনেকগুলি ছোটবয়সী ছেলের চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা গ্রামের ভিতর থেকে ছুটে আসছে এই দিকেই।

বাসকের ঝাড় এবার দুলে উঠল। সে চোখ দুটি নিয়ে একটা মুণ্ডু উঠে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে! আর নলের পিছনে লোহার বাঁকা আংটায় মোটা তর্জনী বসেছে চেপে। নজর ওঠানামা করছে মাটিতে ও গাছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একটা বক্‌নার পিছনে ছুটেছে একদল ছেলে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল বাসকের ঝাড় ঘেঁষে।

ঝোপের ভিতর থেকে অপলক রক্তাভ চোখ আর নল দুই-ই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। একটি লোক, হাতে গাদা-বন্দুক। চেহারা দেখে লোকটির বয়সের হিসাব পাওয়া দুরূহ। সেই সঙ্গে বন্দুকটারও।

এক রকমের লোক আছে, কখনও মোটা হয় না কিন্তু সুস্থ এবং শক্ত, লোকটিও সেইরকম। রোগা, লম্বা কিন্তু শক্ত। শুধু হাড়ের উপর চামড়া মনে হলেও, সে হাড় চওড়া। এবড়ো-খেবড়ো একটি লম্বা কালো রঙের পাথরের মত শরীরের গা বেয়ে মোটা মোটা স্ফীত শিরাগুলি হাত-পায়ে-কপালে যেন শিকড় ছড়িয়েছে। চেহারাটি তাতে রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর মনে হয়। মাথার চুল শক্ত খোঁচা-খোঁচা, উস্কো-খুস্কো, তেল পড়েনি বোধ হয় অনেক দিন। চোখ দুটি প্রায় গোল, ছোট। হয়তো রাত জাগতে হয়েছে, তাই লাল। লাল আর সাপের মত অপলক শুধু নয়! একটি তীক্ষ্ম শ্বাপদ অনুসন্ধিৎসায় যেন সব সময় চক্চক্ করছে। তার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে তার চ্যাপ্টা নাক আর স্ফীত পাটা। যেন পাটা ফুসিয়ে সবসময়েই কিছু শুঁকে বেড়াচ্ছে।

এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ির সঙ্গে হাত-ছেঁড়া হাফশার্ট। সেইটি যেমন তেলচিটে, তার ওপরে মান্ধাতার আমলের বগল-কাটা সোয়েটারও তেমনি। তেলচিটে তো বটেই, রঙটা যে কিসের বোঝবার সাধ্য নেই। ময়লা কাপড়টা হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। কোমরে অন্তত গুটি দুয়েক মাঝারি পুঁটলি ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে একখানি শুকনো গামছা জড়ানো।

বন্দুকের বাঁটের কাঠের একটি কোণ ভাঙা। ব্যারেল অর্থাৎ নলটিতে মরচে-পড়া দাগ দেখা যায়। একটি পাটের দড়ি কাঁধে ঝোলাবার বেল্টের অভাব মেটানো হয়েছে।

ঝোপের বাইরে এসে প্রথমে তার লক্ষ পড়ল, গামছায় পিঁপড়ে ধরেছে। লাল লাল বিষাক্ত পিঁপড়ে। বোধ হয় কামড়েছেও কয়েকটা মুখের বিরক্তি ও যন্ত্রণা দেখে তাই মনে হয়। তাড়াতাড়ি গামছা খুলে, কোমর থেকে একটি ছোট পুঁটলি বার করলে। বলল, উরে শালা।

ওই পুঁটলিতেই পিঁপড়ে ধরে আছে। পুঁটলি ঝাড়া দিল। একটা উৎকট পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

আবার বলল মোটা ঠোঁট কুঁচকে, বড় নোলা না?

হবারই কথা। কারণ, ওরকম গন্ধজাত কোনও দ্রব্যে পিঁপড়েদের একটা একচেটিয়া অধিকার মানবজাতি মেনেই এসেছে। অবশ্য অনধিকার চর্চাটাই ধরা পড়েছে, নইলে এরকম টিপে টিপে পিঁপড়েগুলিকে মারবে কেন লোকটি?

পিঁপড়েগুলি মেরে পুঁটলিটা আবার সযত্নে কোমরে গুঁজল সে। দেখা গেল পুঁটলি দুটি নয়, তিনটি। একটি বেশ বড়। সেটি কোমরে ঝুলছে। আসলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে কাঁধে, যে কাঁধে দড়িতে ঝোলানো আছে বন্দুকটা।

আর একটি ছোট পুঁটলিতে হাত ঢুকিয়ে, একমুঠো চিঁড়ে বার করে মুখে ফেলল লোকটা। আবার পুঁটলি হাতড়ে হাতড়ে ছোট এক টুকরো পাটালি গুড় তুলে কামড়ে নিল একটুখানি।

তারপর চিঁড়ে চিবোতে চিবোতে চারপাশে সে বারকয়েক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। মাঠের দিকে গিয়ে, এইভাবে চারদিক দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ চিঁড়ে চিবিয়ে নিল পাটালির টাক্না দিয়ে। আপন মনেই বলল, গেল কই?

তারপর এগিয়ে গেল সোজা দক্ষিণদিকে। ওই রকম সতর্ক তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে দেখতে, লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলল।

পথে লোক প্রায় নেই। এই সময়টাই পাড়াগাঁয়ের ঠিক দুপুর। সূর্য বেশ খানিকটা হেলে পশ্চিমে। অচেনা দু' একজন যারা দেখল, তারা তাকিয়ে রইল হাঁ করে। আধাচেনারা বলল, সেই লোকটা না?

একজন চাষী গোরু নিয়ে ফেরবার পথে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, পাওয়া গেল?

জবাব দিল বন্দুকওয়ালা, উঁহুঁ।

চাষী বলল, শুনলাম আমোদগঞ্জের দিকে বড় দল নিকি এট্টা দেখা গেছে।

—গেছে?

—শুনলাম।

বন্দুকধারী মাঠের উপর দিয়ে এবার ফিরে তাকাল পূর্বদিকে। যেন তিন ক্রোশ দূরের আমোদগঞ্জকে দেখে নিল। তারপর একটা হুঁ দিয়ে এগুলো আবার।

চাষীটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে, যেন পাগল দেখছে। দেড় মাইল পথ হেঁটে লোকটি মোটরবাসের পথের ধারে হাটের পিছনে একটা মান্ধাতার আমলের একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার সামনে অশোকস্তম্ভ আঁকা সাইনবোর্ড ঝুলছে। লেখা আছে, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগ, মহকুমা অফিস।' ছোট ছোট হরফে আরও যা লেখা রয়েছে, তার মূল কথা হল, সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-বিষয়ের সাহায্য এখানে পাওয়া যাবে।

লোকটা উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই, অফিস ফাঁকা। টেবিল চেয়ার আলমারি সবই আছে। পলেস্তারা-খসা দেয়ালে নানা চারা আর বীজের ছবি টাঙানো। কৃষি-উপদেশাবলি লেকা ছাপানো পোস্টার।

বন্দুকধারী ডাকল, ছোটবাবু?

পাশের ঘর থেকে জবাব এল, কে?

বলতে বলতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এলেন। পরনে কোটপ্যান্ট। ময়লা হলেও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে ওতেই অনেকখানি সাহেবিয়ানা হয়েছে। এসেই মুখটা বিকৃত করলেন। বললেন, এই যে, এসেছ বাবা কুতুবলাল?

এতক্ষণে বোঝা গেল, লোকটার গলার স্বর অসম্ভব মোটা। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নেই, কিন্তু পলক কখনই পড়ে না। শুকনো গালে যে কয়টি ভাঁজ পড়ল আর বড় বড়

কয়েকটি খোঁচা দাঁত দেখা গেল, তাকে বোধ হয় হাসিই বলা যায়। বলল, এঁজ্ঞে, কুতুবনাল নয়, কুঁচনাল। মানে, কুঁচফল আছে না? কুঁচ? নাল কুঁচ—

ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, আর থাক, ওই হল। কিন্তু কোন্ নিশ্চিন্দিপুরে ছিলে সারাদিন?

তেমনি মোটা স্বরে, প্রায় যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলল কুঁচলাল, এঁজ্ঞে, নিশ্চিন্দিপুরে নয়। রন্দাগাঁয়ে শুনলাম একদল এয়েছিল কাল। তাই সাঁইপাড়ার জঙ্গলে—বুঝেছি।

ছোটবাবুর খিঁচুনি আর বন্ধ হয় না, বললেন, ওদিকে ওমরাহ্পুর থেকে সংবাদ এসেছে—বিশ বিঘা জমির যাবৎ ছোলা আর মটরের চিহ্নও নেই। ওখানকার লোকেরা বলে গেল, বিরাট একদল গোটা ওম্রাহপুর, আমোদগঞ্জ, শেরপাড়া সুদ্ধু এদিকে উত্তরে রন্দাগাঁ, দক্ষিণে নাজ্না পর্যন্ত পাক দিয়ে ঘিরেছে। যে কোনও সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সবাই লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—

ছোটবাবুর কথার মাঝেই কুঁচলালের লাল চোখ দুটি আরও গোল হয়ে উঠল। তার মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় ঝরে পড়ল, নাজ্না?

হ্যাঁ, নাজ্না। সব লাঠিসোটা দা কুড়ুল নিয়ে—বলতে বলতে থেমে গেলেন ছোটবাবু, আর সহসা একটা কুটিল সন্দেহে তার চোখ দুটি কুঁচকে উঠল। কুঁচলালকে একবার খুঁটিয়ে দেখে বললেন, নাজ্না তোমার গ্রাম, না?

—এঁজ্ঞে।

—সেইজন্য টনক নড়েছে, না।

—এঁজ্ঞে?

—তোমার মুণ্ডু।

ছোটবাবু খ্যাঁকখ্যাঁক করেই বললেন, নিজের গাঁয়ের নাম শুনেছ, অমনি টনক নড়েছে। এতগুলো গাঁয়ের যে নাম করলাম, তা কিছু নয়! ভাবলাম কোথায় লোকটার যা হোক তবু একটা বন্দুক আছে, চালাতেও জানে, তাগ-বাগও আছে। লাঠিসোটার সঙ্গে একটা বন্দুক থাকলে জানোয়ারগুলো ভয়ও পায়, মরেও দু-চারটে। আর মারলে যা হোক কিছু পয়সাও পায়। তা নয়—যাক গে, আমার কি? মরবে, নিজেরাও মরবে।

কুঁচলালের এত কথা শোনবার অবসরই ছিল না। সে ততক্ষণে পুঁটলি খুলতে আরম্ভ করেছে। পুঁটলি খুলে সে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু ডাকাত পড়ার মত চিৎকার করে, নাকে রুমাল দিয়ে তখন পেছিয়ে গেছেন কয়েক হাত।—এই, এই ব্যাটা পিশাচ, মাটিতে রাখ্, মাটিতে রাখ্।

পুঁটলিটা খুলে মাটিতেই রাখল কুঁচলাল। আর ভীষণ পচা দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল।

ছোটবাবু উঁকি মারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কটি?

—পাঁচখানা বাবু।

ছোটবাবুর মুখে তেমনি বিরক্তি। বললেন, ক'দিন ধরে সেই পাঁচটিই? তা এই লক্ষ্মণের ফল কি অঙ্গে অঙ্গেই ছিল ক'দিন?

কুঁচলালের অপলক রক্তাভ চোখে বিস্ময় দেখা গেল। বলল, তা বাবু, কোথাও কি রাখবার যো আছে? বেড়ালে খাবে কি পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাবে, সেই ভয়। শত হলেও হাতের নক্কী।

ছোটবাবু প্রায় ভেঙচে বললেন, হাতের নক্কী? দেখি, তুলে তুলে গোন্।

কুঁচলাল প্রত্যেকটি বাঁদরের কাটা-ল্যাজ তুলে তুলে দেখাল ছোটবাবুকে। এক, দুই, তিন...

ছোটবাবু বললেন, হুঁ বেড়ালে কিংবা অন্য কোনও জানোয়ারের ল্যাজ-ট্যাজ মিশেল নেই তো?

কুঁচলালের গালে ভাঁজ পড়ল, দাঁত দেখা গেল। এবার চোখের কোলেও ভাঁজ পড়ে তার চোখ দুটি বুজে এল প্রায়। খুবই হাসল কুঁচলাল। বলল, কি যে বলেন বাবু। কিসে আর কিসে? দেখেন না একবার?

চেয়ে দেখলেন না ছোটবাবু। ভাউচারের প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন কুঁচলাল দাস, পাঁচটি বাঁদর মারার পারিশ্রমিক দশ টাকা।

এইটি কৃষিবিভাগের ঘোষিত নিয়ম। পুরস্কার ঘোষণাও বলা যেতে পারে। প্রতি বাঁদর হত্যা পিছু দু'টাকা দেওয়া। চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই জমা দিতে হবে প্রত্যেকটি ল্যাজ, প্রমাণের জন্য।

সম্প্রতি এ অঞ্চলে বানর-নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। এসব অঞ্চলে বাঁদর চিরকালই শস্য নষ্ট করে। কোনও কোনও বছর একেবারেই সর্বনাশ করে দেয়। বিশেষ করে, এই যাযাবর শাখামৃগবাহিনী যে-বছর দলবদ্ধ সৈনিকের মত রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, সে বছর তো কথাই নেই। বন্যা কিংবা পঙ্গপালের আক্রমণের চেয়ে সর্বনাশটা কোনও অংশে কম মারাত্মক নয়। সুদূর অঞ্চল ঘিরে, কোনখান দিয়ে যে তারা সেতুবন্ধ রচনা করে অগ্রসর হচ্ছে কিংবা আলোকজাভারের বাহিনীর মত কোনও ঝিলমের তীরে এসে ভিড়েছে, টের পাওয়া যায় না। সজাগ এবং সতর্ক তাদের আক্রমণ। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে দলে। শস্য খায়, খাওয়ার চেয়ে তছনছ করে, নষ্ট করে বেশি।

এ বছর তো বটেই, কয়েকবছর ধরেই এ আক্রমণ চরমে পৌঁচেছে।

বিশেষ করে রবিশস্য। ছোলা, মটর, কলাই। তা ছাড়া বেগুন, মুলো, সীম তো আছেই। কলা আর পেঁপের চিহ্ন পর্যন্ত রাখে না। পেঁপে গাছের মুণ্ডুটি ভেঙে তার নরম শাঁসটি খেয়ে, গোটা গাছটিতে ধ্বংস না করে রেহাই নেই।

তাই দিকচক্রবাল-ছোঁয়া সুদূর প্রান্তরে সবুজের স্বপ্ন-গুঞ্জন মাঝে মাঝে এক গভীর শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। শিউরে শিউরে ওঠে। কখন, কখন সেই বর্গীরা আসবে। তাই, সরকারি এগ্রিকালচার বিভাগের এই ঘোষণা। আর এ অঞ্চলে তার প্রধান

পুরোহিত বলা হয় কুঁচলালকে। কেননা, লাঠি-সোটা, দা-কুডুল, আগুন নয়। তার একটি গাদা বন্দুক আছে।

ছোটবাবু বললেন, নাও, পুঁটলিটা বেঁধে বাগানের ঘরটায় রেখে এস।

কুঁচলাল যাকে ছোটবাবু বলে, তিনি হলেন আসলে এগ্রিকালচার ইনস্ট্রাক্টর। তার ওপরে আছেন, কৃষিবিভাগের এস-ডি-ও। কুঁচলালের ভাষায় যে বড়বাবু। এস-ডি-ওকে ল্যাজগুলি চাক্ষুষ দেখাবার জন্যই বাগানের ঘরে রাখতে বলেন ছোটবাবু।

কুঁচলাল সেটা হিসেব করেই বলল, বড়বাবুকে দেখাবেন তো? কিন্তু ছোটবাবু, বাগানের ঘরে ভামে টামে কেয়ে পেলে যদি?

—খেয়ে ফেলবে। তা বলে তোমার ও হাতের লক্ষ্মী আমি অফিস ঘরে রাখতে পারব না!

যদিও খুবই অনিচ্ছা, তবু কুঁচলালকে পুঁটলিটি বেঁধে সেইখানেই রেখে আসতে হল। তারপর ছোটবাবু যখন স্ট্যাম্প প্যাডটি এগিয়ে দিলেন টিপ সইয়ের জন্য তখন বড় দোয়াতের মধ্যে কলমের অর্ধেক প্রায় ডুবিয়ে তুলেছে কুঁচলাল। আর নিবের ডগা দিয়ে টপটপ করে কালি পড়তে আরম্ভ করেছে।

ছোটবাবু ভ্রূকুটি করে সবই দেখলেন চুপচাপ। কিন্তু কুঁচলালের সেদিকে খেয়াল নেই। যখন কালিভরা হাণ্ডেলে নিবের চড়চড় শব্দে কোয়ার্টার ইঞ্চি হরফে নাম সই শেষ করল, তখন গোটা হাতটি তার কালিতে ভরে গেছে। ভাউচারেও পড়েছে কয়েক ফোঁটা। মোট হাড়সার থ্যাবড়া আঙুলগুলি সে মাথার চুলে ঘষে নিল।

ইতিপূর্বে যতবার সে টাকা নিয়েছে, ততবারই এরকম অঢেল কালি মেখে সই করে নিয়েছে। কথাটা ছোটবাবুর মনে থাকে না। বিনা বাক্যব্যয়ে দুটি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন ছোটবাবু!

টাকা দশটি নিল কুঁচলাল।

কিন্তু কাঁধে বন্দুক, বারুদের গন্ধ, শক্ত কালো মূর্তি আর গো-সাপের মত অপলক চোখে এতক্ষণ যে কঁচলালকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল, সেই কুঁচলালকে হঠাৎ যেন বড় অসহায় মনে হল। কিংবা তার উদ্দীপ্ত লাল চোখে, তাগ কষা বানর হত্যার বাসনাই দপদপ করে উঠল বা। টাকা দশটির ওপর থেকে অনেকক্ষণ তার নজর সরল না। তারপর পাঁচ ছয় ভাঁজে নোট দুটিকে একেবারে একটুখানি করে সোয়েটারের মধ্যে ছেঁড়া কামিজের পকেটে রাখল।

কি ভেবে ছোটবাবু বললেন—মার, মার, বাঁদরের গুষ্টিকে যত পার মার, বুঝলে হে কুতুবলাল।

কুঁচলাল বলল, এঁজ্ঞে। এবার ছোটবাবুকে নাম শুধরে দিল না সে। বলল, পনেরদিন আগে মেরেছিলাম ছটা, এই পাঁচটা।

ছোটবাবু বললেন, পাঁচটা-ছটাতে কি হবে। শয়ে শয়ে মারো, শয়ে শয়ে।

কুঁচলালের গলার স্বর কেমন বসে গেল, শয়ে শয়ে বাবু?

—হ্যাঁ।

মোটা কালো ঠোঁট দুটি জিভ দিয়ে চেটে বলল কুঁচলাল, একশো মারলে, দুশো টাকা হয় ছোটবাবু!

—তাই হয়। একশোতে দুশো, দুশোতে চারশো, হাজারে দু-হাজার। এক হাজার মারো না তুমি—বারণ করেছে কে?

ভাবশূন্য অপলক চোখে কুঁচলাল ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আর বন্দুকে ভাঙা বাঁটের ওপর তার কালো মোটা থাবাটা যেন নিসপিস করতে লাগল। বলল, এক হাজার?

ঢোঁক গিলে বলল আবার, একশো একাশি টাকা তিন আনা পাওয়া যায় কত গুলান মারলে ছোটবাবু?

ছোটবাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, একাশি টাকা তিন আনা বাঁদর মারার হিসেব হয় না বাবা! ওটাকে বিরাশি করতে হবে। করলে পঞ্চাশ আর একচল্লিশ, একানব্বইটা বাঁদর মারতে হবে।

মোটা ঠোঁট নেড়ে বোধহয় মনে মনে হিসেব করল কুঁচলাল একানব্বই কাকে বলে। তারপর বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বলল, কি করব বাবু, গাদা বন্দুকে সুবিধে করা যায় না। বাপ রেখে গেছল।

ছোটবাবু বললেন, জানি।

কুঁচলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, পঞ্চাশ বছরের কথা, বাবা ডাকাত মেরেছিল, তাই পেয়েছিল। তখন মহকুমা হাকিম নিজে—

ছোটবাবু এবার চেঁচিয়ে বললেন, অনেকবার শুনেছি।

কুঁচলাল বলল, অ!

তারপর গামছাখানি কোমরে জড়িয়ে কাঁচলাল বেরিয়ে গেল। গিয়ে হাটের সীমানা পেরিয়ে আগে পড়ল মাঠের সীমানায়। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় আবার তার অপলক চোখ আবার দপদপ করে উঠল। বাতাসের বুকে নাকের পাটা ফুঁলিয়ে শুঁকল গন্ধ।

গতি তার দক্ষিণে। কিন্তু বন্দুকের কথাটা সে ভুলতে পারেনি। বাপ তার ডাকাত মেরেই খালাস হয়েছিল। মহকুমা হাকিম তাই এই গাদা বন্দুকটি দিয়েছিল তার বাপকে। কিন্তু বন্দুক কোনওদিন কাজে লাগেনি আর। অ-কাজে লেগেছিল কুঁচলালের। বয়সের একটা গরম নাকি আছে। সেই গরমে সে ওম্‌রাহ্‌পুরের বিলে যেত পাখি মারতে। পাখি মেরে মেরে হাত পাকাবার পর, ডাক এসেছিল বাঘ মারার। আমোদগঞ্জে একটা চিতাবাঘ দৌরাত্ম্য করছিল। মিছে বলবে না কুঁচলাল, বেজায় দমে গিয়েছিল প্রাণটা। মনে শুধু একটি কথাই গেঁথেছিল, বয়সটা জোয়ান, বিয়েটাও হয়নি। মরে গেলে আর একদিন হবেও না। লোকে বোঝে না, পাখি মারলেই বাঘ মারা যায় না।

কিন্তু বন্দুকের একটা মান আছে। যেতে হয়েছিল কুঁচলালকে। আর সাতদিন পরে, বাঘটাকে সে সত্যি মেরেছিল। তবে পুরোপুরি বন্দুকে নয়। অর্ধেক বন্দুকের গুলিতে, অর্ধেক পিটিয়ে।

তবে, এও মিথ্যে বলবে না কুঁচলাল, বাবু-সাহেবদের মত শিকার করে বাঘ মারেনি সে। ভয়ে মেরেছিল? প্রাণের ভয়ে যেমন মানুষ সবকিছু করতে পারে, সেইরকম। আমোদগঞ্জের বিল-ঘেঁষা জঙ্গলে, এমন নিঃসাড়ে এসে বাঘটা তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, মনে করলে এখনও থমকে যেতে হয়। তবে, কুঁচলালের মনে হয়, তারা দুজনেই সমান ভয় পেয়েছিল। হাতে যে বন্দুক আছে, সেটাও ভুলে গিয়েছিল সে। লাঠি মনে করে, সেইটি দিয়েই প্রথম আঘাত করেছিল। একবার নয় তিনবার। বাঘটা তার উরুতে থাবা বসিয়েছিল। তারপর গুলি মেরেছিল কুঁচলাল। সেই সময় বন্দুকের বাঁটটা ভেঙেছিল, আর মহকুমা হাসপাতালে তাকে থাকতে হয়েছিল একমাস। মহকুমা-হাকিম শুধু দেখতে আসেননি, পঁচিশটা টাকা তাকে বখশিস্‌ও দিয়েছিলেন।

উরুর এক খাবলা মাংস গিয়েছিল বটে, তেমনি আমোদগঞ্জের কুসুমকে পাওয়া গিয়েছিল। কুসুমের বাপ এসে তার বাপকে ধরেছিল—ওই কুঁচলাল বাঘের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। ছেলের জমিজমা তেমন নেই সত্যি, তবে বীর, হ্যাঁ বীরপুরুষ।

হ্যাঁ, বীরপুরুষ। গোটা মহকুমার লোক তখন কুঁচলালকে কুঁচবাঘ বলত।

কুসুমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কুঁচলালের। তারপর যুদ্ধ লেগেছিল। সরকার বন্দুকটি নিয়েছিল। তাদের নাজনা থানাতে নাকি ছিল।

যুদ্ধ শেষের চার বছর বাদে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল বন্দুকটি। কিন্তু বন্দুক হাতে করার সাধ ঘুচে গিয়েছিল তখন।

লাঙল ধরার জন্যে জন্মেছিল কুঁচলাল। বলদের অভাবে জোয়াল কাঁধে করার ভাগ্য নিয়ে বাঁচবার কথা ছিল তার। সেইভাবে বাঁচছিল।

কিন্তু বাঁচা বড় দয়। দেখে শুনে কুঁচলালের মনে হয়, সব মানুষও কোনওদিন বাঁদর বনে যাবে। লুটেপুটে খেয়ে তছনছ করবে।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। তা ছোটবাবু নাকি শুনেছেন সে-কথা। হবে হয়তো, কুঁচলাল বলেছে সে-কথা ছোটাবাবুকে।

সেই থেকে বন্দুক বেড়াতেই ঝুলছিল। নলের মধ্যে আরশোলায় ডিম পাড়ছিল, মাকড়সা জাল ফাঁদছিল, টিকটিকি তার গা বেয়ে বেয়ে শিকার ধরছিল।

মিছে কেন বলবে কুঁচলাল, বন্দুকটার কথা মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে। সেই যেবারে তার পশ্চিমের মাঠের সাতবিঘা জমি চরণ ঘোষ দলিলের অভাবে নিজের বগলদাবা করলে বিলধারের সাড়ে তেরো বিঘা জমি নিয়ে নিলে মহাজন সাঁপুই তার বাপের হাতের টিপসই দেওয়া ঋণের মুচলেখা দেখিয়ে, আর গত সনের আগের

সনে যখন সরকারি বীজধানের ঋণ পাওয়া নিয়ে সরকারিবাবু তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল। গত সনের ভাদ্রে সরকারের খয়রাতি ধান দিলে না তাকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেই বামুনটা, বললে, 'বউ ছেলে খেগে যা', তখন বন্দুকটার কথা তার মনে হয়েছে। রক্তে তার আগুন লেগেছে, বুক জ্বলেছে, বড় ঘেন্নায় তখন বন্দুকটা ঠেসে ঠেসে বারুদ গেদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করেছে।

কিন্তু আইন নেই। তাই পারেনি।

আইনের মার প্যাঁচটা কোনওদিন বুঝল না কুঁচলাল। কিন্তু সেই মারপ্যাঁচের বাঁধন তার গলা অবধি বেঁধে ঝুলিয়েছে। বাকি আছে, নিদেনের ঘাড় মটকানোটুকু।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। গত বছর এমন সময়ে যখন সরকারি চাষের দপ্তর থেকে বাঁদর পিছু দু'টাকা মজুরি ঢ্যাঁট্‌রা দিলে, সে সময় সে বেড়া থেকে বন্দুকটা পেড়ে নিয়েছিল আবার। পরিষ্কার করে, ধুয়ে-মুছে তেল মাখিয়ে আবার সে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে খোরাক যোগাবার একটা প্রেরণা। পাঁচ মাসের চেয়ে বেশি খোরাকি পাবার জমি তার নেই।

কিন্তু আশ্বিন মাসে কোর্ট থেকে সমন এসেছে, জমিদারি প্রথা নাকি উঠে গেছে, কিন্তু খস আছে। পাঁচ বিঘার মালিক কুঁচলাল খাসের প্রজা। জমিদার নয়, 'খাসদারের' পাওনা নাকি একশো একাশি টাকা তিন আনা, আইন-করা হিসেব। হুজুরে নালিশ হয়েছে। অনাদায়ে জমি নিলাম হবে। নিলাম রদের দরখাস্ত করে প্রজা মামলা লড়তে পারে। কিংবা টাকা মিটিয়ে সুখে ঘর করতে পারে। এখন প্রজার মর্জি, কোনও জোর-জবরদস্তি নেই।

কেন? না, আইন তৈরি হয় প্রজার মুখ চেয়ে। এই টাকাটা শোধ হলে, কিংবা মামলা লড়ে জিততে পারলে কুঁচলাল সরাসরি সরকারের প্রজা হয়ে যাবে। জমিদারকে পাঁচ বিঘের জন্য তেরো টাকা খাজনা দিতে হত। সরকারকে দিতে হবে তেরো টাকা সাড়ে পনেরো আনা। কেন? না জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কুঁচলাল বন্দুকটা টেনে নামাল কাঁধ থেকে। ওগুলি কি দেখা যায় ক্ষেতের মধ্যে? ছোট ছোট জীবগুলি পিলপিল করে ঘুরছে মাঠের মধ্যে? বন্দুক তুলে নিয়ে অপলক চোখে সে নজর করল।

তারপর বোকা-বোকা মুখে হাঁ করে রইল। বাঁদর নয়, গাঁয়েরই কিছু কুচো ছেলেপুলে। আলে খেলে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে গুটি তিনেক হাত তুলে দৌড়ে এল কুঁচলালের দিকেই। ওই তিনটি তার নিজের। এসে ঘিরে ধরল। প্রশ্ন তাদের একটিই, অই গো বাবা, বাবাগো, কটা মারলে এবারে?

কুঁচলাল বলল, হিসেব পরে হবে, এখন বাড়ি চল্‌ গো-সাপ নয়, ক্ষুধার্ত বাঘের মত অপলক রক্ত-চোখে শিকার খুঁজছে কুঁচলাল। নাকের পাটা ফুলিয়ে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। কোথায়, কোথায় তারা?—যারা দেবে তাকে একশো একাশি টাকা তিন আনা? নিলাম-রদের দরখাস্ত করেছে কুঁচলাল। সময় চেয়েছে। আর মরণপণ করে,

নিরুপায় হয়ে এই পাঁচ বিঘেতেই কড়াইশুটি আর আলু করেছে। সংসারের যেমন কতগুল অমোঘ নিয়ম আছে যে, মানুষ মরে, ফতুর হয়, ঝড় ভূমিকম্প হয়, তবু দিন যায়, রাত্রি আসে, তেমনি করেই কুঁচলাল ওই পাঁচ বিঘেতে লাঙল দিয়েছে, বীজ ছড়িয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষা এই দেশের মাটিতে রবি-শস্যের অনেক আশা। ফসল বাঁচিয়ে তুলতে পারলে, আবার আউস ও আমনের জন্যে বেঁচে থাকা যায়।

কুঁচলালের যত কলকাটি সব মাটি। ঐ বস্তুটি থাকলে সে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তার কাচারি নেই, কর্মচারী নেই, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে আইনের সুলুক সন্ধান করে টাকা তৈরি করতে পারে না। আর খাসের মালিক তৈরি করে উশুল চাইলে, তাকে হাতে পায়ে ধরতে হয়।

নিলাম রদ হয়েছে তার মাঘ পর্যন্ত। মাঘ মাসের আর তিনদিন বাকি। সামনে ফাল্গুন। ইতিমধ্যেই মাঠের কোথাও কোথাও পাঁশুটে ছোপ দেখা যায়।

কিন্তু একশো একাশি টাকা তিন আনা। কুঁচলালের সর্পচক্ষু দপদপিয়ে ওঠে। মাঠের আনাচে-কানাচে গাছগাছলির ঝুপসিঝাড়ে ও তীক্ষ্ণ চোখে দেখে। খোঁজে যেন শ্বাপদ বুভুক্ষু লালসায়। আর শক্ত করে চেপে ধরে বন্দুকটাকে।

আর একমাস সময় চাইলে পাওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একানব্বইয়ের এগারো বাদে এখনও চার কুড়ির হিসেব-নিকেশ করতে হবে।

খেয়াল নেই, ছেলেদের সঙ্গে কখন বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্বিৎ পেল কুসুমের ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত গলায়, ও কি, অমন করে কি দেখছ তাকিয়ে তাকিয়ে?

কুসুমের দিকে ফিরল কুঁচলাল। চোখের নজর যেন ঠাণ্ডা হল একটু। গালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল। হাসল কুঁচলাল।

কুসুম জানে, কি দেখে আর কি ভাবে অমন করে কুঁচলাল। তাই কুসুমের দুটি ডাগর চোখ ভরে ঘনিয়ে ওঠে অভিমান। বন্দুক কাঁধে কুঁচলালের এই মূর্তি দেখলে তার নাকি বুক কাঁপে, মনটা নানারকম কু গায়। কুসুম এসে ইস্তক কোনওদিন পাখি মারতে দেয়নি তাকে।

কিন্তু আজ আর কুসুম আটকাতে পারে না। পাখি নয়, আজ যাকে মারে কুঁচলাল, তাতেও খুনেরই নেশা। কিন্তু খুন না করলে নাকি বাঁচা দায়। তাই কুসুমের বুকের কাঁপুনি, নীরব বকুনি, ঘরের কোণে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে। কুঁচলাল চলে যায়।

তবে কি না, মিছে বলবে না কুঁচলাল, কুসুমের মন বুঝে তারও মনটা একটু খারাপ হয়। আমোদগঞ্জের সেই ছেউটি কুসুমের এখন বয়স হয়েছে, পাঁচটি ছেলেপুলের মা হয়েছে। শরীরে পড়েছে বয়সের ছাপ কিন্তু মুখখানি এখনও যেন টস্‌টসে। চোখ দু'টি একরকম, তার আর বয়স বাড়েনি। ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে কুসুমের কাছে বসে এখনও কুঁচলাল গান গাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় তাই হেঁড়ে গলার চিৎকার থামাতে পারে না।

কুসুমের কথার জবাব না দিয়ে কুঁচলাল বলল, ঠাণ্ডা পড়ছে, খালি গায়ে বাঁদরগুলান ও পাড়ার মাঠে —

কথা শেষ করতে পারল না কুঁচলাল। কুসুম শিউরে উঠে বলল, কি? কি বললে তুমি?

কুঁচলাল থতিয়ে গিয়ে বলল, কি বললাম আবার?

কুসুমের চোখে তখন জল এসেছে। ছেলেমেয়ে কটিকে বুকের কাছে টেনে রুদ্ধ গলায় বলল, যাদের তুমি নিষ্টেপিষ্টে গুলি বিঁধে মার, তা-ই বলে তুমি গাল দিলে ছেলেমেয়েগুলানকে?

কুঁচলাল বলল, এই দ্যাখ—

কুসুম তেমনি কান্না-ভয়ার্ত স্বরেই বলল, আজও এসে ফটকের মা বলে গেল, দ্যাক অমুকে যে প্রাণীগুলানকে মারছে, শত হলেও তানারা ভগমানের বাহন বাপু। মারলে পরে ভগমানের প্রাণে দুঃখু নাগে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর, বড় যে পাপ হবে।

কুঁচলাল যেন শুনতেই পায়নি কোনও কথা। কোমরের পুঁটলিটা খুলে একবার দেখল। তারপর আবার কোমরে গুঁজে, পকেট থেকে টাকা দশটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল ধর।

টাকা নিল কুসুম। কুঁচলাল বলল, যত্ন করে রাখিস। নসু খুড়িকে রাতে শুতে বলিস। বলে, হনহন করে মাঠের পথ ধরল কুঁচলাল।

কুসুম বলল, কি হল?

কুঁচলাল তখন অনেক দূর। বলল, কিছু না।

কুসুমও বুঝল, কি হয়েছে। কুঁচলালও বুঝল। বুঝল, মেয়েমানুষের খালি ওই এক কথা। দিন বোঝে না, ক্ষণ বোঝে না, মন বোঝে না। সংসার বোঝে না। খানি আন্‌কথা, যে কথায় চিঁড়ে ভেজে না। এদিকে ভগবানের সুপুত্তুরের গোটা চাকলা ঘিরে বসে আছে। তখন আর 'ভগবানের প্রাণে দুঃখু লাগে না।'

শক্ত চোয়ালে, ছুঁচলো ঠোঁটে কালো এবড়ো-থেবড়ো মুখটা কুঁচলালের ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। একশো একাশি টাকা তিন আনার কথা কুসুমের কেন মনে থাকে না?

অনেকখানি এসে থমকে দাঁড়ায় কুঁচলাল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় দক্ষিণে ও পুবে। কোন দিকে যাবে। নাজ্‌নার দক্ষিণে জুড়ান গাঁ। কিন্তু ওদিকটার কোন খবর নেই। পুবে—ওমরাহ্‌পুর আমোদগঞ্জ দিয়ে উত্তর বাঁকে শেরপুর ধরে রন্দাগাঁ—এইভাবে নাকি ছড়িয়ে আছে বড় দলটা।

দূর আকাশের কোল দিয়ে নজরটাকে ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে কুঁচলাল যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে হয় তার চারদিক ঘিরে ছোট ছোট পিটপিটে গোল চোখ পাঁশুটে জানোয়ারগুলি ঘাপটি মেরে আছে। সতর্ক চতুর চোখে দেখছে তাকেই, আর দূরে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে—পালাচ্ছে।

দক্ষিণ-পুব ঘেঁষে এগুল কুঁচলাল। নাজ্‌নার সীমানা দিয়ে ওমরাহ্‌পুর হয়ে এগুবে সে। এগুতে গিয়ে আর-একবার থমকাল কুঁচলাল। ছায়াটা দেখে পশ্চিমে ফিরল সে। সূর্য ডুব ডুবু। আকাশ রাঙাবরণ হয়েছে। দিন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই।

না থাক, রাতটা ওমরাহ্‌পুরে কাটাতে হবে। খোঁজ নিতে হবে। সেখানকার লোকের কাছে থেকে।

জমিটা নাবালের দিকে। সামনে একটা খাল আছে। সাপুইদের সর্ষে ক্ষেত অনেকখানি। মুসুরির ফাঁকে ফাঁকে সর্ষে মাথা তুলেছে অনেকটা। হলুদের গোলা ছিটিয়ে দিয়েছে যেন কেউ—এত সর্ষে ফুল। মৌমাছিগুলি এখনও চাকে ফেরবার নাম করছে না। মধু খেয়ে কূল পাচ্ছে না তাই।

খালের সাঁকোর কাছে এসে দেখা হল দুজনের সঙ্গে। নাজ্‌নার লোক।

একজন বলল, আই গো কুঁচোদাদা, চললে কোথায়?

—ওমরাহ্‌পুর।

একজন বলল, গাঁ ছেড়ে চললে? ব্যাপার যা শুনছি, গতিক বড় সবিধার না। বন্দুকখান নিয়ে তুমি থাকলে তবু এ্যাট্টা বল থাকে।

বল পায়ে লোকে, কুঁচলাল বন্দুক থাকলে। কুঁচলালও বল পায় মনে। আশা হয়, কিন্তু দাঁড়ায় না কুঁচলাল। যেতে যেতেই বলে, ওমরাহ্‌পুর যাচ্ছি পটল। যদি দেখ সুমুন্দিরা এয়েছে, তবে ধাওয়া করবে পুব দিকে। ওদিক পানেই থাকব।

লোক দুটি যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বোকার মত চোখাচোখি করে চলে গেল। মানুষটিকে তাদের কেমন বেঢপ লাগল। যেন নিজের মধ্যে নিজে নেই।

তা নেই। ক্রমেই একটা হত্যার নেশাই যেন চড়ছে কুঁচলালের।

নাজ্‌নার সীমানা পেরিয়ে, ওমরাহ্‌পুরের মাঠে পড়ল সে। আকাশটা এখনও লাল। উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে সূর্যটা বোধ হয় এখনও দেখা যায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুঁচলাল। পায়ের কাছে একটা আধ-খাওয়া বেগুন। একটু দূরে আরও কয়েকটা। তারপরে আরও। আর সামনেই বেগুন ক্ষেত। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাদের আক্রমণ হয়েছিল। আর বেশিক্ষণ আগের ঘটনাও নয়। আততায়ীর ছায়া-দেখে সাপের ফণা তোলার মত মাথা তুলল কুঁচলাল। বন্দুক নিল ডানহাতে।

কিন্তু আশেপাশে সব নিথর। সামনে একটা বাঁশঝাড়। আশেপাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছ গায়ে গায়ে জড়াজাপটি করে আছে। কিন্তু একটি পাতাও নড়ছে না। এ সময়ে পাখিই বড় ডাকে না এমনিতেও। যেন রাত্রি আসার আগে কিভাবে চুপচাপ। পাখি ডাকছে না, দেখাও যাচ্ছে না বিশেষ।

তবু নিঃসাড়ে এগুল কুঁচলাল, সেই চিতাবাঘটার মত। কিন্তু তাদের ছায়াও নেই কোথাও। হয়তো এ তল্লাটেই নেই।

গাছগুলি পেরিয়ে খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের ওপারে রাস্তা। জঙ্গল চারপাশেই। সামনে একটা ডোবা। ডোবাটার ডানপাশে একটা উঁচু ঢিবি।

ঢিবিটাকে ডানদিকে রেখে, ডোবার পাশ দিয়ে ওমরাহ্‌পুরের গোরুর গাড়ি চলার সড়ক ধরে এগুল কুঁচলাল। হঠাৎ ছোট একটি শব্দে কান খাড়া করে থামল সে। সামনের তেঁতুল গাছটির দিকে দেখল। ফাঁকা গাছ।

কিন্তু দৃঢ় সন্দেহে নাকের পাটা ফুলে উঠল কুঁচলালের। সূর্য ডুবছে, এইটা একটা সময়। পা টিপে টিপে তেঁতুল গাছের আড়ালে গেল সে। আর যা ভেবেছিল তাই। ঢিবিটার পশ্চিম-ঢালুতে ধাড়ি আর বাচ্চায় প্রায় সাত-আটজনের একটি দল। ডোবার জল খেয়ে পশ্চিম তাকিয়ে আছে। আর চুপচাপ মাথা চুলকোচ্ছে, গায়ের উকুন খাচ্ছে।

ওদের মত অস্থির প্রাণী, কেন এ সময়ে শান্ত হয়ে যায়? কেন হয়ে যায়? কেন তাকায় সূর্যের দিকে, নাম জপ করে নাকি?

মিছে বলবে না কুঁচলাল, তার মনটা একবার যেন কেমন করে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকটা তুলে ধরে সে। আঙুলটা চেপে ধরে ট্রিগারের ওপর। পাঁচ বিঘা জমিতে কুঁচলালের কড়াইশুটি আর আলু আছে। খেয়ে তছনছ করবে যেদিন, সেদিন ও জানোয়ারগুলি এমনি করেই সূর্য-ডোবা দেখবে। কিন্তু তাড়া খেয়ে কোনদিকে যাবে বাঁদরগুলি? সামনে বা অন্য দিকে? কুঁচলালকে টের না পেলে, এদিকেও আসতে পারে। আর একটা সুযোগ নিতে হবে।

কুঁচলাল দেখল, জানোয়ারগুলো হঠাৎ যেন অস্বস্থিতে কেমন করছে। মরণের গন্ধ পাওয়া যায় বোধ হয়।

কুঁচলাল তাগ কষে গুলি ছুঁড়ল। লহমায় একবার মাত্র দেখল, একটা বাঁদর প্রায় পাঁচ-ছ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে, পড়ে গেল। ততক্ষণে কুঁচলাল পুঁটলি থেকে বারুদকাঠি দিয়ে, বারুদ আর গুলি পুরতে পুরতেই ঘন গাছগুলোর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এত দ্রুত এবং ক্ষিপ্র যেন একটা কালো বেড়াল।

গাছগুলির জটলার দিকেই কয়েকটা বাঁদর দৌড়েছিল চিৎকার করতে করতে, একটু ঘুরে হঠাৎ গাছের ভিড়ের মধ্যে ঢুকতেই, আর একটা গুলি করল সে।

কাক-শালিকের দল চিৎকার জুড়ে উড়তে লাগল। কিন্তু আর একবার গুলি পুরে প্রস্তুত হতে না হতেই বাঁদরের চিহ্ন পর্যন্ত আশেপাশে আর নেই, এটা অনুভব করল কুঁচলাল। তাছাড়া গাছের কোলগুলিতে ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে, সহজে টের পাওয়া যাবে না।

পুঁটলি হাতড়ে একটা পুরনো ক্ষুর বার করল সে। তারপর গাছের ওপরের মরা বাঁদরটাকে আগে খুঁজে বার করল। পাশ ফিরে শুয়ে ছিল বাঁদরটা, হাত-পা ছড়িয়ে। আর বাঁদর মরে গেলেই কেমন যেন নরম হয়ে নেতিয়ে যায়।

গোড়ার কাছ থেকে ল্যাজটা কেটে নিয়ে, রক্তটা মাটিতে ঘষে নতুন পুঁটলি করে তাতে রাখল। ঢিবির মরাটার ল্যাজও কেটে নিয়ে পুরল পুঁটলিতে। হয়তো মরা বাঁদর দুটিকে রাত্রে শেয়ালে খাবে। আদিবাসীরা পেলে হয়তো নিয়ে যেত।

কুঁচলালের হাতে রক্ত লেগে গেছে। সে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাল। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল, সূর্য ডুবে গেছে। কাল্‌চে হয়ে গেছে আকাশ।

টিবিটার ঢালুতে দাঁড়িয়ে কুঁচলালও যেন সূর্যডোবা দেখছে। পাখিগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করেছে এবার। কুঁচলালও মনে মনে বলল, চার কুড়ির মধ্যে মাত্র দুই হল?

জুড়নগাঁয়ের দিক থেকে একটা গোরুর গাড়ি এল। জিজ্ঞেস করল কুঁচলাল, কোথা যাবে গো?

—ওমরাহ্‌পুর।

—নিয়ে যাবে?

গাড়োয়ানটা কেমন ভয়-ভয় চোখে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে দেখল কুঁচলালকে।যেন ডাকাত দেখছে সামনে। প্রায় নিরুপায় হয়েই বলল, চল।

গাড়িতে উঠল কুঁচলাল। খানিক পরে গাড়োয়ান বলল, কোথা যাওয়া হবে?

ওমরাহ্‌পুর।

নিবাস?

নাজ্‌না।

গাড়োয়ান এতক্ষণে ফিরল। বলল, তাইতো, বলি কুঁচনাল না?

হুঁ?

হাতে রক্ত কিসের?

বাঁদরের।

তাই তো বলি, ব্যাপারখানা কি?

নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটা এবার রামসেনানির কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল। কোথায় কি কি ফসল নষ্ট হয়েছে। গাড়োয়ান নিজে একজন চাষী। কুঁচলালদেরই জাতের লোক। রাতের থাকা-খাওয়াটা আজ তার ওখানেই সারুক কুঁচলাল। কেননা শত হলেও কাজটা তো সকলেরই।

রাত্রি কাটিয়ে বেরুল কুঁচলাল! গ্রামের পুবে আর পশ্চিমে শস্যের মাঠ। আগে পশ্চিম দিকটা ঘুরে, পুর্বদিকে গেল সে। পুর্বদিকে বিলটা দক্ষিণে জুড়নগাঁয়ের দিকে চলে গেছে। ওদিকটায় লোকজনের চলাফেরা কম।

কিন্তু রাগে মাথায় আগুন জ্বলে গেল কুঁচলালের। একগাদা কুচো লেগে গেছে পিছনে। আর চিৎকার করছে, বাঁদরমারা, বাঁদরমারা!

বারণ করলেও শোনে না। যেন পাগল পেয়েছে। বাচ্ছাদের এই দলবাঁধা চেঁচামেচিতে বাঁদর দূরের কথা, কুঁচলালকেই ভেগে পড়তে হবে যে। গাঁয়ের বড়রা বলেও ছানাগুলি শুনতে চায় না! ক্ষেপে গিয়ে ভাবে, দেবে নাকি একটাকে দুড়ুম করে?

কিন্তু কুঁচলালের গালে ভাঁজ পড়ল। মিছে বলবে না সে; নিজের রাগ দেখে তার নিজেরই লজ্জা হল আর নিজের ছেলেমেয়েগুলির কথা তার মনে পড়ল। ছানাপোনাদের এটিই নিয়ম। তাদের মন মানে না।

তাই কুঁচলাল হঠাৎ দৌড়াতে আরম্ভ করল।এ-পথে সে-পথে দৌড়ে দৌড়ে পথ ভুলিয়ে দিল বাচ্চাগুলিকে। কিন্তু বিপদ হল অন্য দিক থেকে। গাঁয়ের যত কুকুর লেগে গেল তার পিছনে।

শালারা পাগল করে মারবে।

একটি বাড়িতে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে রইল সে। কুকুরগুলি ফিরে গেলে আবার বেরুল। বেরিয়ে সোজা চলে আগে পুব, তারপর দক্ষিণে। জুড়নগাঁয়ের সীমানা থেকে আবার উত্তরে। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর আমোদগঞ্জে এসে শুনল, কিছুক্ষণ আগেও একটা দলকে দেখা গেছে।

একটি মুদি-দোকানে বসে কিছু চিঁড়ে আর জল খেয়ে নিল কুঁচলাল। আবার বেরুল। বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে, পুবের বাইরের সড়ক ধরবে বলে এগুল। তার আগেই দাঁড়াতে হল তাকে। বাঁদর।

বাঁদর নয়, বাঁদরী। তিনটে বাঁদরী—তিনটেই মা, তিনটেরই পেটে বাচ্চা ঝুলছে। সারাদিনের ক্ষুব্ধ হতাশা এবার রুদ্র হয়ে উঠল কুঁচলালের। গো-সাপ-চোখ যেন শিকারকে নজরবদ্ধ করল গাছের ডালে।

মিছে বলবে না কুঁচলাল, ছেলেমেয়েগুলিকে বুকে আগলানো কুসুমের কথাটা তার একবার মনে পড়ল। তবুও সে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে বন্দুক তুলল আর ঠিক সেই সময়ই কয়েকটা লোকের কথাবার্তার স্বরে বাঁদরীগুলি এদিক ফিরতেই উদ্যত শমনকে দেখতে পেল। দেখে, অন্য গাছে লাফিয়ে উদ্যোগ করতেই গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল।

কেউ পড়ল কিনা, না দেখেই, গাছের দোলানি কোনদিকে সেটা লক্ষ করে তাড়াতাড়ি বারুদ গেদে ছুটে গেল। একটা বাঁদরী একটি বটগাছে উঠে পড়েছে, যেখানে অন্য কোন গাছ কাছে নেই লাফিয়ে পড়ার। নামলে মাটিতেই নামতে হয়। বাঁদরীটা তাই ত্রাহি চিৎকার করে পেটে বাচ্চা নিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল ডালে ডালে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুঁচলাল। বাঁদরীটার কোথাও যাবার উপায় নেই। বাচ্চাটা তীক্ষ্ণ গলায় চিঁ চিঁ করছে। লোক জড়ো হয়ে গেছে কুঁচলালকে ঘিরে। সবাই হাসছে, চিৎকার করছে, গলা দেখাচ্ছে বাঁদরীটাকে।

বাঁদরীটা কাঁদছে আর আশেপাশে দেখছে। আরা আগের চেয়ে স্থির হয়ে এসেছে। কিন্তু যেদিন খাবার থাকে না সেদিন কিরকম কাঁদে কুসুম ছেলেমেয়ে নিয়ে, সেটা কুঁচলালের মনে আছে। তাই বাঁদরীর কান্না সে শুনবে না।

কে একজন বলল, নীলপুরে একজন একটা ফাঁদ পেতে বারোখানি বাঁদর মেরেছে।

কুঁচলাল শুনল, নীলপুরের একটা লোক চব্বিশ টাকা পেয়েছে। সে গুলি ছুঁড়ল। বাঁদরীটার সঙ্গে বাচ্চাটাও পড়ল। সেটা মরল শুধু আছাড় খেয়ে। দুটো ল্যাজই খুর দিয়ে কাটল সে। ধাড়ি আর বাচ্চারা গড় পড়তা দু'কাটাই হিসেব। এর আগের বাঁদরীটাও পড়েছে। ভেগেছে বাচ্চাটা।

লোকেরা বাঁদরকে মারতে চায়। তবু যেন কুঁচলালকে তাদের নিষ্ঠুর বলে মনে হল। তাই খানিকটা যেন ভয় ও ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল সবাই তার দিকে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, আমোদগঞ্জের বাঘমারা জামাই শেষে বাঁদরমারা হল?

কুঁচলাল শুধু নির্বিকার নয়, নীরবও। কাছেই কুসুমের বাপের বাড়ি। সবাই তার চেনা। কিন্তু সেখানে যাবে না কুঁচলাল। কুসুমের ভাইয়েরা তাকে ভাত খাওয়াতে চাইবে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। এদেরই মত ভাববে, সে কসাই। কেননা কুঁচলালের মনটা তারা বুঝবে না!

উত্তর দিকে এগুল সে। গুলির শব্দে ও ছুটকে-যাওয়া বাঁদরীটার কাছে সংবাদ পেয়ে, এতক্ষণে জানোয়ারগুলি এ-তল্লাটে ছেড়ে সরে পড়েছে।

শেরপুরে এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল হয়েছে। শুনল, আছে। তার চিহ্নও রয়েছে। প্রায় সাত আট বিঘা ছোলা-মটর-মূলো ধ্বংসেছে শেরপুরে। গোটা পঞ্চাশ নাকি দল বেঁধে আছে।

কিন্তু তিনদিন ঘুরেও দলটার সন্ধান করতে পারল না কুঁচলাল। তবু তিনদিনে পাঁচটা ছুটকো বাঁদর মারা পড়েছে।

চারদিনের দিন মনে হল, এ তল্লাটে আর একটা ভাঁদরও নেই, যেন এ পৃথিবীতে নেই। চারদিনে দু'বার ভাত খেয়েছে কুঁচলাল। বাদবাকি চিঁড়ে-মুড়িতেই কেটেছে। পুকুর আর ডোবার অভাব হয়নি। জলে নেমে ডুব দেওয়া গেছে। কিন্তু তেলহীন রুক্ষ চেহারাটা আরও ভয়ংকর হয়েছে। আজ নিয়ে সে সাতদিন বাড়ির ভাত খায়নি, বাড়িতে থাকেনি।

সে যেখান দিয়ে যায়, সেখানে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তার গায়ে পচা গন্ধ, ল্যাজের মাংসগুলি পচছে তার পুঁটলির মধ্যে। এখন তাকে দেখলে ভবঘুরে পাগল বলে দিব্যি মনে করা যেত। কিন্তু কাঁধের বন্দুক আর অপলক রক্তাভ চোখ দেখে, সবাই যেন সভয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দিনের হিসেব ভুলে গেছে বুঝি কঁচলাল। ল্যাজের হিসেব ঠিক আছে। তবু বাতাস যেন একটা অশুভ বার্তা নিয়ে তার কানের কাছে গুঞ্জন করে ফেরে, ফাল্গুন পড়ে গেছে, ফাল্গুন পড়ে গেছে। তখন মহকুমা-হাকিমের মুখখানি মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে, যে মুখটাতে কি এক মস্ত ধাঁধাঁ যেন ঝিকমিক করে। মনে হয় লোকটার ছায়া পড়ে না মাটিতে, আর সেই দূর নাজনাতে দাঁড়িয়েও তাকে দেখতে পাচ্ছে সব সময়।

মানুষ ভয় পেলে যেমন ভক্তিতে হঠাৎ নমস্কার করে, কুঁচলাল তেমনি হঠাৎ মনে মনে নমস্কার করে বসে সেই মুখটিকে।—হেই দেবতা, হেই দেবতা গো।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে যেন বাঁদরের দল পিলপিল করে। চটের বস্তা-বাঁধা একটা মোটা ল্যাজের গাঁটারি সে দেখতে পায় যেন ছোটবাবুর অফিসে।

তারপর আরও পুবে নীলপুর ছাড়িয়ে, গাদিগড়, কুঁদপাড়া, মেয়াপুরের দিকে যেন কোনও এক অদৃশ্য ইশারায় পা চলে তার। পর পর কয়েকদিন বন্দুকের শব্দে, মরণের বিভীষিকা দেখে, বেশ একটা ভেবেচিন্তে যোগসাজস করেই যেন জানোয়ারগুলি পালিয়েছে।

কিন্তু আদিগন্ত ফসলের ক্ষেতের এই নিশ্চিত ফাঁদ ছেড়ে যাবে কোথায়। সংসারে এই তো সবচেয়ে বড় ফাঁদ সকলের,—জীবেরা খেতে চায়, বাঁচতে চায়।

কাঁদপাড়ার এক কলাবাগানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে, দৃশ্যটা দেখতে পেল কুঁচলাল। মিছে বলবে না সে, কুসুমকে বুকে, ধারে সোহাগ করার কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল, কুসুম রাত জাগে নসু খুড়ির পাশে শুয়ে শুয়ে। বাচ্চাগুলি থাকে তার পাশে, পুরুষ ধাড়িটার জন্য মন পোড়ে কুসুমের।

তবু জোড়-খাওয়া জোড়াটার দিকে গুলি ছোঁড়ে কুঁচলাল। আর মুহূর্তে গোটা কলাবাগানটা আন্দোলিত হতে থাকে। বোঝা গেল বড় একটি দল বাগানের মধ্যে ছিল। পালাচ্ছে খোলা মাঠের দিকে। কিন্তু কলাবাগান যেন একটি দুর্ভেদ্য বেড়ার মত, আরও তিনবার বারুদ গেদে গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল। শেষ পর্যন্ত মারা গেল দুটো।

ফ্যাসাদ করল সে মেয়াপুরে এসে। একটি পাকা বাড়ির ছাদের কোণে-বসা বাঁদরকে গুলি করার পরেই ভীষণ একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। দিনদুপুরে ডাকাত ধরার লাঠিসোটা নিয়ে সেই বাড়ির লোকেরা বেরিয়ে এল।

ব্যাপার এমন কিছু নয়। ছাদের নিচেই, জানলার কাছে নাকি একটি মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, গুলির শব্দে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাঁদরটা মরেছিল ছাদেই। তার ল্যাজ তো পাওয়াই গেল না, এক গুরুতর অপরাধের দণ্ড হিসেবে তাকে গ্রাম থেকেই তাড়িয়ে দিল লোকগুলি। কেননা, বাঁদর মারার অছিলা করে বেড়ানো এরকম অনেক শয়তান নাকি তারা দেখেছে। কেননা, অছিলা করলেও, চেহারাটা তো গোপন নেই।

তা বটে, মিছে বলবে না কুঁচলাল, চেহারাটি তার রাজপুত্তুরের মত নয়। মেয়াপুরের ভদ্রলোকদের চেহারাও তো রাজপুত্তুরের মত নয়। কিন্তু সে শয়তান হল কেন?

মেয়াপুরের মাঠে নেমে পিছন ফিরে সে গ্রামটাকে দেখল একবার। জিভটা তার শুকনো লাগছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি তার আজকে। কেমন একটি অসহায় বোবা জীবের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মাঠে। ছাদের ওপর পড়ে থাকা বাঁদরটার কথা মনে পড়ল তার। পেলে উনিশটা হতো। কিন্তু আর মেয়াপুরে ঢোকা যায় না।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে শামলা মাথায় একটি লোককে সাইকেলে চেপে যেতে দেখে, চমকে উঠল কুঁচলালের মনটা। ইনি হয়তো ডাক্তারবাবু, কিন্তু মহকুমা হাকিমের মুখখানি মনে পড়েছে তার। আর মনে পড়ছে আমলার মুখখানি—যে-

লোকটি শুধু দলিল দস্তাবেজ দেখে টাকা তৈরি করতে পারে।

ফাল্গুনের কদিন আজকে! মনে নেই, একেবারই স্মরণ হচ্ছে না কুঁচলালের। তার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল যেন। একটা ভয়ংকর দুর্যোগ যেন তার বুকে এসে ধাক্কা মারছে, বন্দুকটা শক্ত হাতে ধরে তাড়াতাড়ি উঠল কুঁচলাল। একুশ মাইল পাক দিয়ে আবার দক্ষিণে-পশ্চিমে পিছুতে লাগল সে। উঠবে গিয়ে জুড়নগাঁয়ের বিলের কাছে। মাঝে পড়বে আগনগাছি, নৈরা, ঝিঙেদল, মনসাতলি। রাত্রিটা কাটাতে হবে বোধ হয় নৈরাতেই। ইতিমধ্যে সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে। পা চালিয়ে যাবার যো নেই। নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে ওত পাততে পাততে যেতে হবে তাকে।

আগনগাছি পার হয়ে, নৈরার কোমর-জল যমুনার উঁচু পাড়ের কাছে জঙ্গলের পথে থামতে হল কুঁচলালকে। সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল চারদিকে। কিছু নেই, তবু একটা তীক্ষ্ণ খ্যাঁকানি শুনতে পেয়েছে। সে। মানুষের? কিন্তু গন্ধ পাচ্ছে কিসের?

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কুঁচলালের। আবার একটা তীব্র হুংকার শুনতে পেল সে। তাদেরই হুংকার।

গাছের আড়ালে আড়ালে খানিকটা উত্তরে যেতেই, চোখে পড়ল তার।

উঁচু পাড়ের ওপর প্রায় বারো-তেরটি বাঁদরী, সারি সারি বসে আছে নির্বিকার হয়ে। আর তাদের সামনেই, দুটি বড় বড় হুলো, পরস্পরের চোখে চোখ রেখে পাক খাচ্ছে আর আক্রমণের ছল খুঁজছে।

যেন দুই বাদশা লড়ছেন, আর বেগমেরা গা চুলকে আরাম করে উকুন চিবোচ্ছেন। যিনি জিতবেন, তার হাত ধরে সব বেগমেরা হারেমে গিয়ে উঠবেন। রাজ্য নয়, বাদশারা প্রেমের লড়াই করছেন।

এইভাবেই বাঁদরের বিয়ে হয় আর খাঁটি কুলীনের মত একাধিক পত্নী নিয়েই তাদের সংসার। শক্ত হাতে বন্দুকটা ধরেও, লড়াইটা দেখতে লাগল কুঁচলাল। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বীরদের এমন লড়াই আর বীর্যশুল্কাদের এমন খাঁটি দেখতে (মিছে বলবে না কুঁচলাল) ভালই লাগল তার।

কিন্তু কোনটাকে মারবে সে? যে জিতবে? না, তাকে নয়, যে হারবে।

কারণ, হেরে যাওয়াটা সবচেয়ে বেশি বদমাইশি করবে, ক্ষতি করবে। কারণ, বন্ধু আর বউ থাকবে না, ওর মেজাজ সবসময় খিঁচড়ে থাকবে, ক্ষেপে থাকবে।

লড়াই নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে চলেছে, কারণ দুজনেরই চোখেমুখে গায়ে রক্তের দাগ। গায়ের জায়গায় জায়াগায় লোম উপ্‌ড়ে ফেলা হয়েছে।

হঠাৎ দুটিতে ঝাঁপিয়ে ঝুটোপুটি লাগল। বন্দুক তুলে ধরল কুঁচলাল। কিন্তু ওরা ফারাক হয়ে পাক দিতে লাগল।

কুঁচলাল গুনল। তেরটা বাঁদরী দুটো মদ্দা। তিরিশটা টাকা তার চোখের উপর। কিন্তু একটাকেও মারতে পারবে না হয়তো কুঁচলাল, থোক্ তিরিশ টাকা তো অনেক, অনেক দূর।

আবার ঝুটোপুটি লাগল, আর তীক্ষ্ণ চিৎকারে আকাশটা যেন ফেটে গেল। ট্রিগারে হাত দিল কুঁচলাল, আর মুহূর্তে মতের পরিবর্তন হল তার।সে দেখল, একটা হুলোর বুকের চামড়া চিরে দিয়েছে, লাল মাংস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তখনও ছাড়ান পায়নি। ওটা মরবেই জিতে যাওয়াটাকেই তাগ করলে সে। গুলি ছুঁড়ল।

দিশেহারা বাঁদারীগুলি পাড়ের দিকে নেমে প্রথমে নদীর দিকে গেল। ক্ষিপ্রবেগে বারুদ আর গুলি গেদে প্রায় পাগলের মত জলের দিকে ছুঁটে গেল কুঁচলাল। গুলি ছুঁড়ল।

জলের কাছে গিয়ে ওরা ছত্রভঙ্গ হল। কুঁচলাল পিছন ছাড়ল না। ছুটতে ছুটতে আরও তিনবার গুলি করল। তখন সে প্রায় আধ-মাইল দূরে চলে এসেছে।

পথ থেকে দুটিকে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে ছুটে এল আবার সেখানে। জলের ধারে একটা বাঁদরী আর পাড়ের ওপর দুটো মদ্দা।

ল্যাজগুলি কেটে, মাথায় পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে কোমর-জল যমুনা পার হল কুঁচলাল। নৈরা-তে রাতটা কাটল একজনের বাড়িতে। দুটি ভাত পেল খেতে। কিন্তু ভাতগুলি বমি হয়ে যাবার দাখিল। ফাল্গুন মাসের নাকি সাতদিন আজ? ভোর-ভোর উঠে জুড়নগাঁয়ের দিকে চলল সে। কিন্তু টিপে টিপে ঝিঙেদল আসতেই দুপুর হয়ে গেল। কিছু পাওয়া গেল না।

কিন্তু শীত লাগছে কেন কুঁচলালের? গায়ে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে না। তবে বাতাস হঠাৎ বেড়েছে। লোকে বলে, এটা 'সমুদ্দুরের বাতাস' শুকনো মিঠে বাতাস, তাপ আছে বেশ। কদিনের মধ্যেই সমস্ত মাঠগুলি যেন পাঁশুটে রং ধরে গেছে। কুঁচলালের পাঁচ বিঘেও পেকেছে নিশ্চয়। মন বড় আনচান করে। নাজ্‌নায় যাবে কুঁচলাল, নাজ্‌নায় যাবে।

কিন্তু বাতাসটা গায়ে লাগলে এমন কেন হয়? শীত নয়, কেমন যেন ভয় ধরা কাঁটা লাগা ভাব।

বাতাসটা যেন একটা পাগল ঠাকুরের মত, কিসের ভয় দেখায় কুঁচলালকে।

মনসাতলিতে এসে তিনটিকে মেরে, জুড়নগাঁয়ে আসতে রাত হল তার।

সকালে তার ঘুম ভাঙল লোকের চেঁচামেচিতে। যার বাড়িতে শুয়েছিল সে চেঁচিয়ে ডাকল, আই গো বন্দুকওয়ালা, এস, তাড়াতাড়ি এস, খেতে বাঁদর পড়েছে।

পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে উঠল কুঁচলাল। জিজ্ঞাসা করল, কোন্ মাঠে?

পুবের মাঠে।

বেরিয়ে এসেই আগে মাঠের দিকে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল সবাইকে, গোল হয়ে ঘেরো। ঘিরে জোড়াপুকুরের দিকে তাড়া দাও।

সারা গ্রামের জোয়ানরাই প্রায় লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত। একদলকে নিয়ে জোড়াপুকুরের দুই ধারে ছড়িয়ে দিল কুঁচলাল। পাগলের মত চিৎকার করে বলল, খবরদার, এক

শালাও যেন পালাতে না পারে। ওরা পাছ্ দিয়ে আসছে, তোমরা দুপাশে, আমি একলা এখানে।

তার চিৎকারে সবাই যেন তটস্ত! যেন সৈনিকদের হুকুম করছে সেনাপতি।

আর ব্যাপারটা ঘটলও তাই। লুভিষ্টির দল তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়েছে! যদিও কাছেপিঠে গাছগুলিই একমাত্র পালাবার রাস্তা, তবে সেগুলি ছাড়া ছাড়া।

পিছনের তাড়া খেয়ে বাঁদরগুলি সামনে আসতেই পুকুর পড়ল, আর দুদিকে সবাই চিৎকার করতে লাগল।

পিছনের লোকগুলি পুকুরের ওপারে না এসে পড়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তে গুলি চালিয়েছে কুঁচলাল। এবার তাকে সাবধান হতে হল।

কিন্তু গুলির ভয়ে পিছনের লোকেরা আবার ফিরল, কিন্তু প্রত্যেকটি গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হতে লাগল তারা। সেই ফাঁকেই জানোয়ারগুলি মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল।

শেষে সব স্তব্ধ হল। তখন গোটা গ্রামটা ভেঙে পড়েছে জোড়াপুকুরের ধারে। শত্রুর মরণোৎসব দেখছে সবাই।

কুঁচলাল ক্ষিপ্র হাতে ল্যাজ কাটতে লাগল। এক দুই, তিন...বারো। বারোটা। দুই হাত তার রক্তাক্ত। পুঁটলি তার ভরতি, কিন্তু এখনও অনেক বাকি!

তবু আগে যেতে হবে ছোটবাবুর কাছে! জমা দিতে হবে। উনচল্লিশটা ল্যাজ! টাকা নিতে হবে, আমলার কাছে যেতে হবে। টাকা দিয়ে, বাকি টাকার সময় নিতে হবে, হাতে-পায়ে ধরতে হবে।

কিন্তু মিছে বলবে না কুঁচলাল, মানুষ দেখে তার বড় অবাক লাগে।

খুনী। যেন সে একটা সর্বনেশে ভয়ংকর।

তাড়াতাড়ি পথ ধরল সে উত্তর-পশ্চিম কোণ নিয়ে। রন্দাগাঁয়ের হাটের ধারে, ছোটবাবুর দপ্তরে যাবে সে। কিন্তু সবাই হেসে, চিৎকার করে, বিদ্রূপ করতে লাগল তাকে।

করুক। মুখ খুলবে না কুঁচলাল। সে একটা পাখি, ঠোঁটে তার খাবার। মুখ খুললেই যেন পড়ে যাবে।

দূর থেকে নাজ্‌নাকে দেখলে পেল সে। নাজ্‌নার মাঠের ওপর দিয়েই তার পথ। নাজ্‌নার দিক থেকে কারা যেন আসছে এদিকে। হাত তুলছে, ডাকছে বোধহয় কাউকে।

কুঁচলালকেই! ছুটতে ছুটতে যে তার কাছে এল, সে গাঁয়ের বুড়ো ভবখুড়ো।

ভবখুড়োর গলায় ত্রাস, কিন্তু বড় রাগ, বলল, এই আরে এই বদ, শোন।

কুঁচলাল দাঁড়াল না। মিছে বলবে না, এ সময় ভবখুড়োর গাল তার ভাল লাগছে না। মন্দ কিছু করে থাকলে পরে বলতে পারে। কুঁচলাল বলল, সময় নাই ভবখুড়ো, পরে শুনবখানি।

ভবখুড়ো এবার চেঁচিয়ে উঠল, থামরে ম্যাড়া থাম্, থাম কোর্টের লুটিশ এয়েছে, প্যায়দা এয়েছে, আমলা এয়েছে।

থতিয়ে গিয়ে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, কুঁচলাল, কিন্তু গুন্‌তি পোরে নাই যে? পরমুহূর্তেই চমকে উঠে বলল, তারা এসে পড়েছে? কি বলছে তারা?

ভবখুড়ো ঢোক গিলে বলল, সেটা গিয়ে দেখবি চল।

ভবখুড়োর মুখ থেকে, বাতাসটা যেন জোর ধাক্কা দিল তার গায়ে। কাঁটা দিল যেন। চোখে তার পলক পড়ল একবারের জন্য। ভবখুড়োর পিছন ধরল সে।

তার পাঁচ বিঘার কাছে এসে, অরা একবার পলক পড়ল তার। তারপরে, অপলক চোখ দুটিতে, ভয়ংকর আক্রোশের আগুন উঠল দপদপিয়ে! বন্দুকের উপর থাবাটা শক্ত হয়ে উঠল। দেখল, তার জমিতে নিলামি নিশান উড়ছে, ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঢাক বাজছে, আমলা আর কোর্টের পেয়াদা খাড়া। চারটে অচেনা লোক তার কড়াইশুঁটি উপড়াচ্ছে, আলু তুলছে।

ছেলেমেয়েগুলি কোত্থেকে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল তার। এই দুঃসময়ে বাপের জন্যে হাহাকার করছিল ওদের প্রাণগুলি। ঘোমটা টেনে তার কুসুম এসেছে, পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কুঁচলালকে দেখতে পেল না। সে যেন বন্দুক-ধরা হাতটাকে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, পারছে না। একটা পচা দুর্গন্ধ তার গা থেকে সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছে।

কুসুম পায়ে হাত দিয়ে বলল, অগো এই, অমন করে কি দেখছ?

কুঁচলাল বলল, 'বাঁদর'।

কুসুম চমকে বলল, অ্যাঁ?

হ্যাঁ, মিছে বলবে না কুঁচলাল, সে দেখছে, বাঁদরে তার ফসল খাচ্ছে, তছ্‌নছ করছে। কিন্তু বাঁদরগুলির লুটিশ আছে, ঢ্যাট্‌রা আছে, আইন আছে।

কুসুম দু'হাত দিতে কুঁচলালেব হাত ধরে টান দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডাকল, অই গো, অমন করছ কেন?

কুঁচলালের গলার শিরাগুলি যে, ছিঁড়ে গেল। আর গো-সাপের মত অপলক চোখ দুটিতে অকূলের বান। ভাঙা ভাঙা দাঁত-পেষা গলায় বলল, বাঁদর দেখল বউ। কিন্তু বাঁদরগুলানরে মারবার আইন নাই।

কঠিন-প্রাণ কুঁচলালের চোখে জল দেখে কুসুমের 'হায়া' গেল। লোকজনের সামনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হেই গো ভগমান, তুমি কেমন কর?

কিছু না বউ, ছোটবাবুর কাছ যাই। কামটা পাকা করতে হবে।

মৃত্যুর কারণ

মহাশ্বেতা দেবী

কৈতবখালি থানার গোপীজনপদ পঞ্চায়েতাধীন বেণুগ্রামের নরেন মণ্ডল থানার ও-সি-কে বড়ই ফাঁপরে ফেলে রেখে যায় ঝরঝর বারি ঝরা ভরা ভাদরে, বৈষ্ণব পঞ্জিকা মতে জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে। 'মণ্ডল' বলতে কী মণ্ডল? জাত কী?

পঞ্চায়েতের সদস্য বিষ্ণুবাবু বলেন, ডোম।

দারোগাবাবুর উচ্চবর্ণ মন বলে, ছি! খগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের লেখা 'পদবির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস' বইটি কিনেছিলেন স্বীয় 'পূজারি' পদবির ব্যাপারটা জানতে। আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন। জীবনে পয়সা দিয়ে বই কিনেছেন তিনটি, 'ভ্রমণসঙ্গী', 'সবতীর্থ বিবরণ' ও উল্লেখিত বইটি। বছর বছর পঞ্জিকাটি অবশ্য কেনেনই। পয়সা দিয়ে বই কিনলে তা আদ্যোপান্ত পড়া দরকার। নইলে মনে হয় পয়সা জলে গেল।

তিনি নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'মণ্ডল' পদবি চুয়াল্লিশটা জাতের হয়। বেটা ডোম! পাঁজির কথা, বছর কয়েক নিম্নবর্ণ খুব মরবে। তা মরল কী করে?

—রসগোল্লার সঙ্গে নাবাক্রম মাখিয়ে খেয়েছিল।

—বটে। আত্মহত্যা! সব কটা।

—সব কটা মানে?

—নরেন তো একা নয়, তিনটে মেয়েকে খাইয়েছে, নিজেও খেয়েছে।

—ডেনজারাস ক্রিমিনাল? আমার থানায়?

—কে, স্যার?

—নরেন মণ্ডল?

—না না, আমি খুব জানতাম ওদের। ক্রিমিনাল ও কোনওদিন নয়।

—সব বুঝলে তো আপনি দারোগা হতেন।

—বুঝলাম না।

—শুনুন! ও যখন মেয়েদের বিষ মাখানো রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে, তখন তো খুন করছে। ক্রিমিনাল। নিজে খাচ্ছে যখন, তখন আত্মহত্যা করছে। ওঃ, আত্মহত্যা করতে গিয়ে ফেল করলে আমি ওকে...কেসটা কী? মানে, মরল কেন? সেটাই কথা।

বিষ্ণুবাবু কপাল মোছে।

—আমি একটু আপসেট। নরেনের সঙ্গে ফোর অব্দি পড়েছি। ওর বাপকে 'কাকা' বলেছি। গ্রামে যেমন চলে।

—মরার কারণ কী, কেউ জানে না?

—না। গভীর রহস্য।

বিষ্ণুবাবু যা জানে তা বলে যায়।

—সবাস্তু তিন কাঠা জমির মালিক নরেন মণ্ডলের জমিজমা বিঘা তিনেক, গত সেটেলমেন্টের সময়েই...

—নিল কে?

—তন্ময় পাল।

—ও, তনুবাবু! খুব জেন্টেলম্যান লোক।

—নরেনের পেটে একটা ব্যথা ছিলই। খাটাখাটনি করতে পারত না। বউটা খুব শক্ত খাটিয়ে ছিল।

—তাকেও কেলিয়ে দিয়েছে?

—বউ কলেরায় মারা যায় বছর চারেক আগে।

—এটা মানতে পারলাম না। কৈতবখালি থানায় কলেরা কেস একটাও হয়নি পাঁচ বছরে।

—ডাক্তার-হাসপাতাল কলেরাই বলেছিল।

—হয়তো...হে হে হে! নাবাক্রম ঠুকে দিয়েছিল।

বিষ্ণুবাবু এখনও জীর্ণ চাল, টালিখসা, মাটির মেঝেতে তিন মেয়েকে দুহাতে জড়িয়ে থাকা নরেন মণ্ডলের বিবর্ণ, শক্ত মৃতদেহের ছবিতে আচ্ছন্ন।

—নরেন বর্ধমানে নামালে খাটছিল, ঘরে ছিল না।

—অ! তা লাশগুলো কি...

—দেখুন, যা করবার করুন।

—তাই যাই, জন্মাষ্টমীর দিনটা ঠাকুরকে অষ্টভোগ দেব, বাড়িতে সন্ধেবেলা 'কংস নিধন' পিকচার দেখাব ভি-সি-আর-এ। ধর্মের ছবি কত কষ্টে জোগাড় করা! দেশে তো ধর্ম বলতে কিছু নেই। তার মধ্যে ডোম বেটা...

—চলুন।

—জিপ তো যাবে না।

—সাইকেলে চলুন।

—ওঃ ভদ্দরমত একটা থানাতে যে কবে যাব! জিপ চলবে, সিনেমা আছে, ইংরিজি স্কুল!

—ফ্যামিলি তো কলকাতায়।

—শ্বশুরবাড়ি।

কৈতবখালির 'ভৈরব' সংবাদপত্রের (সাপ্তাহিক, বছরে গোটা তিরিশ বেরোয়)

সাংবাদিক + সম্পাদক + কম্পোজিটার + দপ্তরি + পিওন কুমারকে দেখে খেপে যান তিনি। ছোঁড়া আছে ভাল। বাপের স্যালো-টিউবওয়েল ইত্যাদির ব্যবসা। ছেলে দারোগার পেছনে লেগে আছে, জ্যাঠা তন্ময় পাল। নইলে ওসি কুমারকে দেখিয়ে দিতেন। বর্ডার এলাকায় থানা। বর্ডারে কোটি কোটি টাকার কারবার হবে, ওসি কি বসে দেখবে?

তাদের পেছনেই বা কাঠি কেন? তারা দিয়ে থুয়ে খায়, একলা খায় না। বর্ডার রেখেছে কেন সরকার? দুই বাংলা ফারাক থাকবে বলে? ফলসো, মিথ্যে কথা। বর্ডারটি আছে বলে ওরা আসছে, এরা যাচ্ছে, বিজনেস চলছে। দিচ্ছে আর নিচ্ছে, মেলাচ্ছে আর মিলছে, তার নাম বর্ডার।

কাজের মধ্যে কাজ থানার কেচ্ছা লেখা।

—সীমান্তের চোরাকারবারে থানার অবাধ প্রশ্রয়!

লেখ লেখ। থানা আঁটি চুষুক, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী আমের শাঁস খাক। একেকটা বর্ডারে বি এস এফ জওয়ানরাই মাসে তিরিশ হাজার কামায়।

—বধূ হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালাল থানা...

তুমিও চালাতে চাঁদু। বধূ যদি উদয়ন ছাবড়ার পুত্রবধূ হত, তুমিও চালাতে। লোক বটে ছাবড়া! সব পার্টিকে নির্বাচনকালে টাকা দেয়, সবাই ওর আপনজন।

—থানা লকাপে সৌরভ সাহা আত্মহত্যা করে, না তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে?

সৌরভকে জিজ্ঞেস করগা যা। থানার পেছনে লেগে লাভ নেই কুমার পাল। থানার ভিত খোঁড়ার সময়টি জন্মলগ্ন ধরে নিয়ে কুষ্ঠী করার সে সময়ে। জাতক দীর্ঘায়ু, (বারো বছর হল। বয়স পড়ে আছে) সুদর্শন (খুবই, দেখলে হোম! সুইট হোম! গাইতে সাধ যায়), অমিত বলশালী (সন্দেহ কী? বিশ ইঞ্চি গাঁথনি), নির্ভীক হইবে ও যশোলাভ করিবে। সবই তো ফলে যাচ্ছে। থানাকে খোঁচাও কেন?

নরেনের ঘরের কোনও আব্রু নেই। দরজার জায়গায় জীর্ণ চট, দু'পাশে দুটি গাছে কাঁঠাল, কলা গাছে কলা, পেঁপে গাছে পেঁপে।

একটি জনতা। কান্নার শব্দ নেই। শুধু এক শীর্ণ বৃদ্ধ মাথায় হাত রেখে বসে আছে।

—সরে যান, সরে যান, দেখতে দিন।

কুমার বলে, দেখুন, দেখার মত দৃশ্য বটে।

—এর মধ্যে কী চক্রান্ত আবিষ্কার করলেন?

কুমার লাফিয়ে ওঠে, অনশনে মরেছে।

—হিসেব করে কথা বলুন কুমরবাবু। এ রাজ্যে কেউ অনশনে মরে না।

—বেশ তো, বের করুন ওরা মরল কেন?

—যা শুনলাম, মেয়েদের বিষ দিয়ে মেরেছে, মানে খুন করেছে, তারপর নিজেও...ক্রিমিনাল সব কাজকর্ম করে বসে এরা...দেখি!

শীর্ণ বৃদ্ধটি হঠাৎ বলে ওঠে, নারু খুন করেছে? কাকে খুন করল বাবু?

—আপনি কে?

এও এক জবর ঝামেলা। সকলকে 'আপনি কপনি' করতে হয়। বলা যায় না, 'তুমি তুই মুই করার কে' বলে কে রুখে উঠবে! কার পেছনে কোন দল পার্টি-ঝাণ্ডা-ব্যক্তি স্মাগলার মস্তান আছে।

—নারু...আমার...দাদার ছেলে।

—নাম?

কুমার বলে, গণেশ মণ্ডল।

—আপনি কথা বলেছেন কেন?

—আমি ছাড়া কে...

বৃদ্ধের গলায় ভেঙে যায়—

—আমি ছাড়া কে ছিল ওর বাবু? আমারো ওর দশা, ছেলেরা রিকশা টানে, সংসারে আননেওয়ালাই কর্তা হয় এখন। আমার কথা খাটলে নারু অনাহারে...

কুমার বলে, থামো তো গণেশজ্যাঠা। দারোগার সামনে, বলি কাদের সামনে কাঁদছ? বাইরে থেকে কে বলে, তা তুমি কেন নারুকে দেখোনি বাপু? বাকোয়ানি করছ?

—খোমা পালটে দেব সুধন্য। আমি দশদিন মালদায় ছিলাম, সবাই জানে।

ও. সি. তন্ময়ের ছেলে সুধন্য ও তন্ময়ের ভাইপো কুমারের সংলাপ শুনে মনে মনে বিশেষ আনন্দ পান। আছে, খবর আছে। মিলমিশ নেই।

—দেখি, দেখতে দিন।

—কী দেখবে বাবু গো...

—লোকটি লম্বা ছিল তো! দেখুন বিষ্ণুবাবু। তিনটে মেয়েকেই জাপটাতে চেষ্টা করেছে হাত দিয়ে।

বিষ্ণুবাবু মুখ ফেরায় অন্যদিকে।

—হুঁ, নাম নরেন মণ্ডল। মেয়েদের নাম? বয়স? নরেন মণ্ডলের বয়স বা কত?

—আমার বয়সী। একচল্লিশ।

—চেহারা তো একাশির মত।

—বড় মেয়ে চাঁদি, বয়স তেরো। মেজটা রানি, বয়স এগারো, ছোটটা শম্ভু, বয়স সাত।

যেন আক্রোশ ভরে বিষ্ণুবাবু বলে, সবাই তো একরকম নয় চাঁদির নামটা জি আর রেকর্ড করাব, তাতেও বাগড়া। সবে নামটা রেকর্ড হয়েছে!

—জি আর তুলেছিল?

—না।

গণেশ মণ্ডল বলে, বিষ বিক্রি বন্ধ করে দাও বাবু।

দারোগা এখন দারোগা হল।

—বিষ, বিষ! কোনও কথা নয়। বডি টাউনে যাবে। কাটাছেঁড়া হবে। ডাক্তার বলবে,

তবে বলো বিষ খেয়েছে। তার আগে কোনও কথাই গ্রাহ্য নয়।

—অনাহারের চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না?

—না, কুমারবাবু। সরি। অনাহারের জন্যে মরেছে, তা হতে পারে না কেননা এ রাজ্যে অনাহারে কেউ মরে না। করল আত্মহত্যা, বলব অনাহার?

—খেতে পায়নি বলেই তো আত্মঘাতী হল গো বাবু।

মেয়েরে চেহারা দেখছ না?

দারোগা জবাব দেন না। অপ্রত্যক্ষ কারণ অনাহার হতে পারে, প্রত্যক্ষ কারণ 'নবাক্রম'।

নরেন মণ্ডল ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটাই গ্রহণীয়।

আবার তন্ময় পালের ছেলে সুধন্যর বউয়ের বেলা মৃত্যুর অপ্রত্যক্ষ কারণ পণযৌতুক কারণে নির্যাতন, প্রত্যক্ষ কারণ কাপড়ে আগুন ধরানো, কিন্তু মৃত্যুর কারণ হয়ে যায় 'দুর্ঘটনা।'

স্বর্গতা সুমনা পাল ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাই কারণ।

আবার সুপ্রকাশ ডাক্তারের ক্ষেত্রে মৃত্যুর অপ্রত্যক্ষ কারণ ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে তাণ্ডব, প্রত্যক্ষ কারণ প্রেসার বেড়ে স্ট্রোক। কিন্তু বড় ছেলের সুতো টানাটানিতে 'মেজ ও সেজ ছেলে বাবাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে বলে বুড়ো মরেছে' ব্যাখ্যাটি বহাল থাকে।

দারোগা বলেন, সিম্পল কেস। কাটাছেঁড়া হবে যে...

কুমার বলে, করতে হলে সব আপনারা করবেন। নরেনের হয়ে খরচা করে লাশ টানবে টাউনে, লাশ আনবে গ্রামে, সৎকার করবে, এমন কেউ নেই।

—অবশ্য ডাক্তার সার্টিফাই করলে...

—পাওনাথোওনা নেই বলে ডিউটি করবেন না?

—কুমারবাবু!

—ডিউটি করুন?

—তারপর সৎকার?

—আপনারাই ব্যবস্থা করবেন। নিঃস্ব ক্ষেত্রে সরকারেরই করার কথা।

কথাটি সত্যি বলেই দারোগা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। ব্যবস্থা কর, গরুর গাড়ি বা ভ্যান-রিকশায় লাশ পাঠাও কুমেদপুরে। সঙ্গে যে সেপাই যাবে, তার চা-ভাত ইত্যাদির খরচ দাও। লাশ বের কর, জ্বালাও। পাঠান, দারোগা অনেক লাশ পাঠান। কিন্তু খরচখরচা তো লাশের পার্টি দেয়।

—সরকারের কর্তব্য আপনাকে বলতে হবে না।

বাইরের পাবলিকও বলে, থানাই ব্যবস্থা করবে।

গণেশ বলে, অ কুমার! চাঁদা তুলে...

—নরেনদা জ্যান্ত থাকতে চাঁদা তুললে লোকটা মরত না হয়তো। এখন চাঁদা তুলে...

এ সময়ে সময়-মাস-বছর দ্যোতক ডায়াল-শোভিত বিদেশি ঘড়ি, ক্রু-কাট চুল, দেহ সুগন্ধি, ঘাড়ে পাউডার, টেরি-পাঞ্জাবি ও বউ-পেড়ে-ধুতি-শোভিত তন্ময় পাল মঞ্চে ঢোকান। রাজনীতিক লোক, পাবলিকের মন বুঝে কথা বলেন। নরেনের জমি, বাঁশঝাড়, সবই যদিও তিনি ঘাপ করেছেন, উঠোনের গাছগুলোও কিনেছেন, এবং ক্ষুধার্ত মেয়েগুলির কান্নাকাটি, ইদানীং নরেন যে মেয়েরা কাঁদলে মারত, সবই তাঁর জানা। কালও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শাস্তুর 'আর মের না বাবা, আর খেতে চাইব না' শুনে উনি দাঁত খুঁটতে খুঁটতে স্ত্রীকে বলেছেন, নরেন উচ্ছন্নে গেছে। খেতে দিতে পারে না, মেয়ে কাঁদলে পেটায়?

কৈতবখালিতে চোর-ডাকাতের ভয়ে অ্যালসেশিয়ান রাখেন তিনি ও ছাবড়া। তন্ময়বাবুর কুকুর রোজ দই-মাংস-ভাত খায়। বাড়িতে দাগা দাগা রুই, ঘরপালা মুরগি ও কচি পাঁঠা ওঁর নিত্য সেবার অঙ্গ। কোনওদিন নরেনের মেয়েদের চারটি চাল ধার দেবার কথাও তাঁরমনে হয়নি। দেননি বলে এখনও তাঁর বিবেকে সূঁচ ফোটে না।

নরেন অনাহারে মরছিল, সত্য।

তিনি ওকে সাহায্য করতে পারতেন সত্য।

কিন্তু তাঁরও যে কিছু করার আছে সে তো তিনি জানেনই না। মধ্যবিত্ত মন, নিরাপদ দূরত্বে বসে শুধু বিচার করে ও রায় দেয় এবং কে কী করল না, সেই সমালোচনা করে।

তন্ময় পাল বলেন, এরা ঠিকই বলছে, মৃত নরেন আর তার মেয়েদের পোস্টমর্টেম, সৎকার আপনারাই করুন। আমি নিজে খবর নেব মৃত্যুর কারণ কী?

দারোগা বোঝেন, এখন তিনি ফাঁদে পড়েছেন।

বলেন, স—ব হয়ে যাবে। ঘরটা দেখে নিই। তালা মেরে রাখা নিয়ম।

কুমার বলে, চট ঝুলছে, তার গায়ে তালা মারুন।

—ঘরের দায়িত্ব তো...ঘরে আছে কী?

বিষ্ণুবাবু বলে, দুটো ছেঁড়া গামছা একটা মেটে কলসি। সবই বেচে দিচ্ছিল। ছিল তক্তোপোশটা। সেটাও কাল বেচে দিল।

গণেশ বলে, আমাকে বলল নারু, কাকা! চৌকিটা বেচে দিলাম! দেখি, এতবড় হাঁড়িতে রসগোল্লা কিনে নে যাচ্ছে। বলি, কৎ টাকায় বেচলি?

একটু থামে গণেশ।

সুদাম কয়াল বলে, পঁচিশ টাকায়। আমি তো কিনলাম।

—কাঁঠাল কাঠের চৌকি, তার দাম পঁচিশ হয় না সুদাম! যদি একশো দিতে, ঠিক হত, দিতে পার তুমি।

—ধুর বাবু, চৌকির দর করছে।

—না সুদাম! নারু...একশো পেলে হয়তো চাল কিনত, ভাত রাঁধত, কদিন খেয়ে মেখে কোনও কাজ ধরত। পাতকী আমারও, পাতকী তোমারও! নারু বলল, মারি

মেয়েদেরকে, আজ চাঁদি বলল, খেতে দিতে পার না, মারতে পার, বাবা হয়েছ! আমরা অমন বাপ চাই না। তাতেই কাকা! মিষ্টি কিনেছি, ওদের একটা করে ইজের, চাঁদির একটা জামা!

হ্যাঁ, সকলেরই চোখে পড়ে। মেয়েদের পরনে নতুন ইজের, চাঁদির গায়ের জামাটাও নতুন বটে, গেঞ্জি।

সেপাই ভ্যান-রিকশার খোঁজে যায়।

দারোগা কর্মব্যস্ত হন।

—এ ঘরদোর কার ওপর বর্তাবে?

তন্ময় পাল উদাস গলায় বলেন, আমার কাছে বাঁধা রেখেছিল...বলত উঠে যাব...আমি কোনও চাপ দিইনি।

সুদাম কয়াল তন্ময়বাবুর বিরোধী দলে, সাইকেল রিকশা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, একুশটি রিকশা ও আটটি রিকশাভ্যানের মালিক এবং 'তন্ময় পাল বেটার বউকে খুন করেছে' গজবালিটি ওই তুলেছিল।

নরেনের মৃত্যুর পাতকী সেও?

একশো টাকা দিলে নরেন বাঁচত?

এ পাতকের দায় তার একার?

সে বলে, বউ মরল, নরেন পেটে রক্তামেশা ধরিয়ে ফিরে এল, খাটাখাটনি পারত না। আগে যা বা পারত, পরে তো জল খেলেও রক্ত হাগত। ঢেঁকি বেচল। বললাম মুড়ি খা, আমি খাচ্ছি। ও বলল, মুড়ি খাব না গো দাদা, মেয়েরা খায়নি। ভিটেও বন্ধক। নরেন মরা গরু, লাথ কি আমি একা মেরেছি? তনুবাবু বাস্তু সমেত তিনকাঠা বন্ধকী নিয়ে তিনশো টাকা দাওনি? কৈতবখালিতে রোডের ওপর বাস্তু জমির কাটা এখন দু'হাজার!

তন্ময় পাল বিষাক্ত চোখে তাকাল এবং একই সঙ্গে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলেন, ক্রমে ক্রমে আরও কিছু দিতাম। তা সেই টাকা নিয়েও তো নয়ছয় করল।

গণেশ বলে, নয়ছয়? ছোট মেয়েটার আন্ত্রিক ধরল, ডাক্তার দেখাল, ওষুধপাথ্যি...চাল কিনল দশ কিলো...

সুদাম বলে, গাছগুলোও ওর মধ্যে ধরে নিলে। খিদেয় ধুঁকেছে, কিন্তু তোমার কড়া নজর, গাছের কাঁঠাল একটা খায়, সে সাহস পায়নি পাতকী কম করেছ? নরেনকে বাগে পেয়ে ন্যাংটো করে ছেড়েছ।

তন্ময়ের ছেলে সুধন্য সবে নতুন বউ এনেছে এবং শ্বশুর প্রদত্ত রাজদূত ছাড়া ও বাজারেও যায় না।

সুধন্য তেতে বলে, যত পাতকী আমার বাবার? হ্যাঁ বড় কষ্টে ছিল। মেয়েগুলো শাকপালা, কচু ঘেঁচু আনতে পারলে এক কিলো চাল কিনত, নয় আটা। তা বিষ্ণুবাবু তো পঞ্চায়েত সদস্য। সে কেন নরেনকে কাজ দিত না জি-আর-এ নাম ওঠালে ওরা তো এক মুঠো পেত!

নরেনের মৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে তাকেও ফেলা হল। তবু বিষ্ণুবাবু আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা বলে না। কুমারের দিকে তাকায়।

সবাই বিষ্ণুবাবুর দিকে তাকিয়ে।

—হ্যাঁ...খুব দোষ হয়ে গেছে...কাজ করার শক্তি তো ছিল না...জি-আর-এ নাম! রিলিফ! নাম আমি কয়েক মাস ধরে চেষ্টা করেছি সুধন্য! পঞ্চায়েতে আমার কথার মূল্য কী? সরকারি দলে নেই, ক্ষমতা নেই কোনও! ইস্কুলে, দয়াবশেও যদি তোমরা ওকে স্টাফ বেয়ারার কাজটা দিতে! অবশেষে কুমার সঙ্গে যেয়ে জোর করল বলে চাঁদির নামটা...তবু, আমারও পাতকী হল। কাল কিন্তু ও কুমারকে খুব খুঁজেছিল, সেটা জানি।

কুমার অন্যদিকে তাকায়।

—এখন বলে কী লাভ বিষ্ণুদা?

—তোমাকে পেল না, আমাকেই বলে গেল।

দারোগা সজাগ হল।

—ভালো ভ্যানতাড়াই জুড়লেন তো? কী বলল?

—বলল...খেতে দিতে পারি না পারি, মেয়েগুলো তো আমার? আমি বললাম, সে তো বটেই। ও বলল, কুমার কী ব্যবস্থা করে আসবে...মালদার কাছে কোথায় যেন গরিব মেয়েদের রাখে...সে তো আজও এল না। এখন আমি কী করি? চাঁদি বলেছে বাপ হয়েছ কেন?—এই বলে চলে গেল।

সুদাম বলে, কখন?

—বেলা চারটে হবে।

—তার কিছু বাদেই তো চৈকি বেচতে গেল।

বিষ্ণুবাবু বলে, ব্যবস্থা হয়েছিল কুমার?

—হ্যাঁ...হয়েছিল...

—কবে?

—গত মঙ্গলবার...

—মঙ্গলে মঙ্গলে আটদিন! অলিম্পিয়া বাসের গোপালের হাতেও যদি চিঠি দিতে...

—ভেবেছিলাম....এসে পড়ব....

সবাই চুপ হয়ে যায়।

গণেশ বলে, এই কঙ্কাল হেন মানুষটা...কত জনের কত কারণে যে গেল!

মৃতদেহের নিয়ম প্রথমে নরম থাকে, তারপর শক্ত হয়, তারপর নরম হয়। এখন নরেনদের দেহ থেকে একটা মৃদু দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়াতে থাকে। নরেনের বিস্তারিত চোখ কী বলে, তোমরা সবাই আমাকে নাবাক্রম কেনার পথটা খোলা রেখে চাল কেনার পথ, আলু কেনার পথ, বুথে পাঁপরভাজা কেনার পথ সব পথ বন্ধ করে দিয়েছিলে?

যেন হতাশায় মরিয়া হয়ে কুমার বলে, অনাহারে তিলে তিলে মরে গেল নরেনদা...

তন্ময় পাল বলেন, তুমি তো তাই বলবে। সরকারের যত বদনাম হয়, ততই খুশি তুমি!

—নিজের ছেলেকে শাসন করবেন কাকা! আমাকে নয়। আমাকে শাসাবেন, আমি শুনব, সেদিন চলে গেছে।

—বটে!

ভাগের পুকুরকেন্দ্রিক পালবাড়ির প্রাচীন কলহের কারণেই পরিবারে দীর্ঘকাল শত্রুতা এবং নিমেষে ঠোকাঠুকি লাগে।

—ভারি মালদা চিনেছ!

কুমার বিষাক্ত হাসে, আপনার মত চিনব কী করে? হপ্তায় দুবার তো দৌড়ইনি।

দারোগা তনুবাবুর উপকার করছেন জ্ঞানে বলেন, কুমারবাবু! ওনার বেটার বউয়ের কেসটা দুর্ঘটনার কেস।

পাবলিকে গুঞ্জন ওঠে।

তনুবাবু দারোগাকে থতমত করে খেঁকিয়ে বলেন, ডিউটি করতে এসেছেন, ডিউটি করুন। একেবারে ফালতু কথা বলবেন না। মড়া পচছে, কোনও ইয়ে নেই!

ভ্যানরিকশা চলে আসে। পলিথিনের ডবল চাদর তনুবাবুর আসে বাড়ি থেকে।

সেপাই মুরদা ছোঁবে না। কুমার, বিষ্ণুবাবু, সুদাম, গণেশের ছেলেরা একে একে ওদের ভ্যানে রাখে গাদাগাদি করে। পলিথিনের সিটে শয়ন, পলিথিনে মোড়ন, নারকেল দড়িতে বাঁধা ছাঁদা। বাইরে প্রচণ্ড ভিড়। আহা রে!...বাচ্চাগুলো!..কেউ দেখেনি? ইত্যাদি মন্তব্য ঠেলে ভ্যানরিকশা চলতে থাকে।

নরেনের ঘর খালি হয়ে যায়। গণেশ মেটে কলসিটি উঠোনে আছড়ে রেখে যায়।

'অনশনজনিত মৃত্যু' কুমার একাই লিখেছিল 'ভৈরব' কাগজে। তজ্জনিত খার এখনও লেগে আছে কৈতবখালিতে।

ময়নারিপোর্টে 'বিষ পানে স-সন্তান আত্মহত্যা' লেখা হয়। সেটিই কলকাতার কাগজে বেরোয় খুব ছোট করে। দারোগা তন্ময়কে বলেন, 'ভৈরব' ক-জনা পড়ে? অনশন! এ রাজ্যে না খেয়ে মানুষ মরে না। যদি বিষ খেয়ে মরে, বিষ খাওয়া তো কিছু একটা খাওয়া। কুমারকে টেকনিকালিটি বোঝায় কে!

—বোঝার পাত্র নয়। ছাড়ুন তো নরেনের কথা?

শেষ চারিটি শব্দই নরেন মণ্ডলের বিষয়ে শেষ সংবাদ হয়ে থাকে। পূর্ণচ্ছেদ।

শৈলেনবাবু সমাচার

অসীম রায়

ঠিক এমনি সন্ধে ছিল পঞ্চাশ বছর আগে, ঠিক এমনি সামনে লছমনিয়া টাঁড় গ্রামখানি গাঢ় কমলায় ডুবন্ত এবং সেই কমলা সমুদ্রে জেগে থাকা একটা বিশাল অন্ধকার মহুয়ার মাথায় সন্ধ্যাতারা। আর এখন যেমন হাঁক ওঠে, 'রে মোতিয়া' তেমনি দীর্ঘ আকারান্ত হাঁক তখন বাতাসে পৌনঃপুনিক। ঠিক এইরকম শেষ পৌষের সন্ধেবেলা মন্দিরা গরুর গাড়ি থেকে নেমে মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ আমাকে কোথায় এনে ফেললে? এখানে মানুষ থাকে?

'এখানেই তো থাকে মন্দিরা, একটুক্ষণ পরেই ইউক্যালিপটাসের মাথায় কালপুরুষ জাগবে আর দূর থেকে চিড়ে কোটার জন্যে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার আওয়াজ নৈস্তব্ধ্য আরও ঘনিয়ে তুলবে। দেখছ না, এখনও আবছা আলোয় আমলকির সারি? আমলকির সারি মানে আশার সারি। বাগানের পশ্চিম পারে পাঁচটা আমলকি বসিয়েছি আর সেগুলো আমাকে আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করে। প্রত্যেকটা গাছই একটা ভাবের গাছ। ইউক্যালিপটাসের বীথি দিয়েছি আকাশের তারা ধরবার জন্যে, ওটা ধ্যানের গাছ। কিন্তু এপ্রিল-মে-র দুপুরে তুমি যদি বাগানের পশ্চিমদিকে তাকাও তাহলে জাকারাণ্ডার নীল, ল্যাবার্নামের জ্বলন্ত হলুদ তোমার মনে রং ধরাবে। আর এই কাঠচাঁপা বসায় মন্দিরের উঠোনে কিন্তু নিষ্পত্র কাঠচাঁপার ভাস্কর্যে এমন একটা মায়াটে ভাব নেই যাতে গেরস্থালির কথা মনে আসে সর্বাগ্রে? কাল সকালে নিষ্পত্র কাঠচাঁপার নিচে টেবিল পাততে বলব মালিকে, সেখানে মুড়ির সঙ্গে চা আর বেগুনি, কেমন?'

পঞ্চাশ বছর আগে শৈলেনবাবুর পরনে ছিল খাকি হাফ প্যান্ট, হাঁটু পর্যন্ত গরম ফুল মোজা, ভারী কোট, বগলে সোলার টুপি। কিন্তু স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মনের মধ্যে যে সম্ভাব্য জবাব ভেসে উঠল তার সামান্য অংশও শব্দায়িত করতে তিনি অপারগ। 'এ যে জঙ্গল! এখানে কোথায় মানুষ থাকে?' স্ত্রী নিজের মনেই আবার আর্তনাদ করলে।

'চল, ভেতরে চল,' গরুর গাড়ি থেকে বাক্সপেঁটরা নামাতে নামাতে শৈলেনবাবু বললেন।

'আমরা চল ফিরে যাই। রাত্তিতে যদি ফেরার ট্রেন না থাকে স্টেশনে গিয়েই রাতটা কাটাব।'

'কী যে বল, কী যে বল,' শৈলেনবাবু মেয়ের হাত ধরলেন। যেন অনুনয়-বিনয়

করা ছাড়া তাঁর স্বপক্ষে সামান্য যুক্তি নেই। 'রামুয়া রামুয়া' বলে তারস্বরে মালিকে লক্ষ করে হাঁক পাড়েন।

সবেমাত্র চায়ের জল ফুটে উঠেছে এবং সারাদিনের ক্লান্তিকর হাই উঠেছে মন্দিরার মুখে, উত্তোলিত বাহুতে এমন সময় হায়নার ডাক আসে। মেয়ে মাকে জড়িয়ে ডুকরিয়ে কেঁদে ওঠে। এবং মন্দিরার মুখে আতঙ্কের বদলে বিলক্ষণ বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয় তার বে-আক্কেলে স্বামীর কাণ্ডে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বলে, 'আমাকে একটা জংলি ভূতের সঙ্গে বাবা বিয়ে দিলেন।'

সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী মানুষ এবং সে সব প্রাণীর আবাসস্থল শহর। কলকাতার ভবানীপুর শ্যামবাজার অঞ্চল যেখানে মন্দিরার বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সেখানে সর্বত্র দিনরাত্তির এই সব হিংস্র প্রাণি ঘুরে বেড়ায়, তাদের রক্তলোলুপতা অসামান্য, কাপট্য গগনচুম্বী। কিন্তু হায়না আসে নেহাত খাবারের সন্ধানে, ছোটখাটো ভেড়া-ছাগলের আশায়। পেট ভর্তি থাকলে তারা আসে না। কিন্তু বড়বাজারে পেটভর্তি প্রাণীরা দিনরাত ব্যস্ত মানুষ শিকারের উৎসবে। মাঝে মাঝে এখানে লাকড় বা ছোট নেকড়েও আসে, গত বছর চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে শৈলেনবাবুর বাগানেই ঢুকেছিল। টর্চের আলোর সামনে সেই প্রস্তরীভূত কমবয়সী জানোয়ারটিকে দেখে শৈলেনবাবুর মায়া হয়। পাথর ছুঁড়ে বাগানের গেট দিয়ে গ্রামবাসীদের চোখের আড়ালে পার করে দেন।

এসব কথাও মন্দিরাকে বোঝানো যাবে না যেমন বোঝানো যাবে না সাঁওতাল পরগনার সৌন্দর্য, এখানকার টিলায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রং, যে রঙে একটা নিঃসঙ্গ ছাগল কিংবা রাখাল বালকও অপরূপ। তারপর এখানকার দারুণ খরা, ফোস্কাপড়া গরম কিন্তু শরীরের ভেতর থেকে চনমনে রক্তের লাল আভা। তাছাড়া তাঁর কুয়োর ক্যালসিয়ম, আহা! এরই জন্যে তিনি ইয়োরোপ আমেরিকা সব কিছু ভুলে যেতে পারেন। কলকাতার ভবানীপুরের বুকচাপা গলিতে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ড্রাফট্‌সম্যানের টিংটিং-এ জীবন। তার পাশে এই জলে রোদে গাছে তারায় পাথরে তাঁর এই আটবিঘার সাম্রাজ্য। কী করে বোঝাবেন মন্দিরাকে? ভালবাসা বোঝানো যায়? স্ত্রীর কথায় ভ্যাবলার মত তাকিয়ে থাকেন শৈলেনবাবু।

খাওয়ার পর মা-মেয়ের কথোপকথন শোনেন পাশের ঘর থেকে।

'আমরা কাল ফিরে যাব তো মা?' মেয়ের কাতর প্রশ্ন।

'ভগবানকে ডাক যাতে ফিরে যেতে পারি। এই কালরাতটা কাটলে হয়।'

শৈলেনবাবু পঁচাশি বছর বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, বিশেষ করে টাকা পয়সার অভাবটা এমন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাজির হয়েছে যে সাময়িক বিভ্রান্তি প্রায় অবশ্যম্ভাবী। সত্তর টাকা পেনশনে এই মাগ্‌গী বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়েছে; আধ সের করেও যদি দুধ খেতে পেতাম তাহলে আরও কয়েক বছর পার করে দেওয়া যেত, এ চিন্তা জুড়ায় না। কিন্তু এ সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে সেই পরদিনের অবিস্মরণীয় সকালের দুঃখ যখন খুব ভোরে মুখে তোলা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ না মুছেই মন্দিরা চেঁচিয়ে বলে, 'মালি, গরুর গাড়ি ডাকো।'

না-খোলা ট্রাঙ্ক বেডিং প্যাঁটরা গাড়িতে ওঠে। শৈলেনবাবু কোনও কথা বলেননি। সচরাচর মজলিশী এবং যুক্তিবিদ্যাতেও তুখোড় বলে পরিচিত এই তরুণটির সামনে কোনও যুক্তি দেখানোর প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সপরিবারে সেদিনই কলকাতা ফিরে গেলেন। এবং তারপর কোনওদিন মন্দিরা শৈলেনবাবুর এই ভালবাসার স্থানে পা মাড়াননি।

মন্দিরার জীবনে তার অলক্ষ্যেই এই ভালবাসার স্থান তার সতীন। হাসি ঠাট্টা গল্পে সেও কম দড় নয় কিন্তু বোধহয় এক আকাশে দুই সূর্যের স্থান নেই এইরকম কোনও পুরনো যুক্তি তাকে পেয়ে বসেছিল। শৈলেনবাবুর মন পড়ে থাকত তাঁর এই খোলা আকাশের নিচে কুলকাঁটা আর রক্তকরবীর বেড়াছাওয়া আটবিঘার জন্যে। ছুটিতে, এমনকি দু-তিন দিনের জন্যেও তিনি পালিয়ে আসতেন এবং সচরাচর সত্যবাদী হলেও স্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে মিথ্যাভাষণে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। ফিরতেন চোরের মত, লোকে যেমন প্রচণ্ড মদ খেয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি ফেরে, পান চিবিয়ে মুখের গন্ধ দূর করার চেষ্টা করে তেমনিভাবে কাঁচুমাচু মুখে বলতেন দিনাজপুরে অথবা গড়বেতায় সার্ভের কাজ পড়েছিল। 'দিনকে দিন কাজ বেড়েই যাচ্ছে, জানো মন্দিরা।' 'কাজ বেড়ে তা কোনও লাভ হচ্ছে না। যা দু-চার পয়সা পাচ্ছ ওভারটাইম করে তা তো ফুঁকে দিচ্ছ নার্সারি থেকে হাবিজাবি কিনে। তোমাকে ছাড়া কি দিনাজপুরে পাঠাবার লোক ছিল না অফিসে?'

শৈলেনবাবু এমনিতে খুব সাবধানী; তিনি সমান্তরাল তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। যেমন কোনও আর্টিস্ট নিজের কাজের জগতে সম্রাট কিন্তু অফিসে আর পাঁচটা মানুষের মত অবিকল, শৈলেনবাবুর বাগান ও পরিবারও এইরকম সমান্তরাল ধারায় চালিত। বলতে কি, অফিসের কাজ করে যেমন আনন্দ পেতেন তেমনি পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটিও ছিল তাঁর কাছে প্রাণ। বরঞ্চ সবকিছু দায়িত্ব পালন করেও তলে তলে তাঁর একটা ভালবাসার জগৎ বয়ে নিয়ে চলেছেন, অন্য অনেক মানুষের মত রোজকার ওঠানামায় বিরক্তি অবসাদে তিতো হয়ে যাননি, এই বোধ তাঁর চালচলনে কথাবার্তায় এনেছিল এক আশ্চর্য সজীবতা।

সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ড্রাফট্সম্যান সত্যিই আঁকতে ভালবাসতেন। কাজেই সার্ভের কাজও তাঁর ভালবাসার জগতের সঙ্গে ছিল অবিচ্ছিন্ন। স্কেচ বই আর কোডাক ব্রাউনি ক্যামেরা নিত্যসঙ্গী। দুমকা রোডের দু'ধারে জঙ্গল, গিরিখাত, নেড়া মাঠে গুটি কয়েক মহুয়া, ঝরনার ধারে পলাশ এবং নানারকম নানা ঢংয়ের সম্ভব অসম্ভব বাড়ির স্কেচ, খাপরার দোতলা বাড়ির পাশে যমজ খেজুর, ছাগল ভেড়া গরুর মুখ, সাঁওতাল পাহাড়ি তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পোর্ট্রেট ছিল শৈলেবাবুর বিষয়। আরও কতগুলো ব্যাপারের সঙ্গে তিনি অসম্ভব একাত্মবোধ করতেন কিন্তু তিনি রং ব্যবহার করতে জানতেন না এবং কোডাক ব্রাউনির নাগালের বাইরে সেগুলো। একবার সাতদিন বাগানে এসে মাঠ ভর্তি বর্ষায় লাল জলের উচ্ছ্বাস দেখেছেন তাঁর বারান্দা থেকে। তেমনি দেখতেন পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্যোদয়, সূর্যাস্তে রাঙানো টিলা। সাঁওতাল পরগনায় শরৎকালও

ছিল শৈলেনবাবুর চোখের আরাম। সমস্ত অপরাহ্ন জুড়ে মেঘের রং বদলানো দেখতেন কুকারে ভাত ডাল চাপিয়ে। জঙ্গলে একলা মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। পশু শিকারে যে বাবুবিলাস তা শৈলেনবাবুর মেজাজের বিরোধী। চোখের আরাম কানের আরামের জন্যে হাঁটতেন জঙ্গলে।

তবে মন্দিরাকে তিনি ম্যানেজ করতে পারলেন না। মন্দিরার মৃত্যু তাঁর পঁচাশি বছরের জীবনে সবচেয়ে বেসুরো সুর। সেবার হঠাৎ লোহার দাম চড়ে যাওয়ায় বাগানের তারকাঁটা বেমালুম চুরি হতে লাগল। এবং ভগওয়ান ও পাপবোধ ক্রমশ এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে যেতে থাকায় চৌর্যবৃত্তির গ্লানিও কমতে থাকে। শৈলেনবাবুর বাগানের একদিকের তারকাঁটা চুরি হয়ে বিক্রি হয়ে গেল সে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলকাতা ত্যাগ করলেন। কারণ বেড়া না থাকলেই বাড়ি ধর্মশালা, দরজা জানলা লোপাট অনিবার্য। মন্দিরা কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ কিন্তু ডাক্তারদের মতে অসুখ তেমন মারাত্মক নয়। তার হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা আগে ধরা পড়েনি। আচমকা মৃত্যু ঘটল শৈলেনবাবুর অবর্তমানে। ফিরে এসে স্ত্রীর শ্রাদ্ধের সময় বাগান বিক্রির সংকল্প করলেন। কিন্তু বিক্রি করতে এসে আবার নতুন করে গাছ পুঁতলেন, বেড়া দিলেন। আবার তাঁর ভালবাসর জগতে গেলেন তলিয়ে।

ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে পায়খানা যান শৈলেনবাবু। কুয়ো পদ্ধতিতে তৈরি পায়খানার চারপাশে আগাছার জঙ্গল। পঞ্চাশ বছর ধরে নিজের হাতে বাগান সাফ করেছেন। এখন বছর দুই হল বাতের আক্রমণে মাজা ভেঙেছে, একটা চোখে দেখতে পান না। ছানি কাটিয়েও সুবিধে হয়নি। ঘন বাদামগাছটার নিচে পাথরের কুয়ো। কুয়োতলা পেরুতে না পেরুতেই শৈলেনবাবু উৎকর্ণ। একেবারে পশ্চিম প্রান্তে গাম্ভার গাছটা না? সেখান থেকেই আওয়াজ আসছে। বৃদ্ধ মাজা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন বোধ করেন। কুড়োলের আওয়াজ ঠিকই পেয়েছেন, তাঁর কান এখনও মরেনি। 'কে রে? কে গাছে হাত দেয়?' একটা হাঁক ওঠে গলা দিয়ে। কিন্তু শব্দের বিশ্রাম নেই। গাছটার মাখনের মত গা তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ গাছে টেবিল-চেয়ার হয়। আরও দুটো গাছ ছিল, গত বছর কাটা পড়েছে।

চারদিকেই বৃক্ষহত্যার উৎসব চলেছে। খুব ভোরে চানন নদীর দিতে হু হু করে বেরিয়ে যায় বনবিভাগের ট্রাক। সন্ধের সময় গাছের গুঁড়িভর্তি ট্রাকের ইঞ্জিনের গম্ভীর গর্জন ও মন্থর গতি চোখ বুজেও টের পান। চোখ বুজেই টের পাওয়া যায় নদীর ওপারে গ্রানাইটের মাথায় ছাতির মত যে গাছের ছায়া বহুদূর পর্যন্ত ছিল প্রলম্বিত তার দৈর্ঘ্য ক্রমশ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর। সাঁওতাল পরগনা এখন ক্রমশ ন্যাড়া, দারুণ রোদে জলে পুড়ে মাটি খাক তারপর গাছের শিকড় যা নিবিড়ভাবে ধরে রেখেছিল মাটি, বৃক্ষহত্যার শেষে তা বর্ষার প্রবল জলের আঘাতে ভাঙে। সামনের ন্যাড়া মাঠটায় এখন খালি কয়েকটা মহুয়া ও খেজুর বোধহয় তাদের প্রয়োজনীয়তার দরুন এখনও টিকে আছে। তবে যে প্রকাণ্ড মহুয়া সূর্যাস্তের শোভ আরও বাড়াত গত বছর তা অপসারিত।

যদি আরও আধ সের দুধ খেতে পারতেন দৈনিক তাহলে নব্বই পার করা যেত।

এ অঞ্চলে নব্বই মিনিমাম। তাদের বাগানের মালি পুলশিয়ার বাবা একশো তেরো, এখানে এক মাস্টারমশাই স্কুল বসিয়ে ছিলেন, তিনি আটানব্বইয়ে দেহ রেখেছেন। এক গুচ্ছের পরিচিত স্থানীয় বাসিন্দেও নব্বই-তে দেহ রেখেছেন। দু'বছর আগে নিজেকে কল্পনা করেন, শুকনো ধান খেতের আলের উপর কেড্‌স্ জুতো পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন। কিন্তু আর বোধহয় পারবেন না; মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাসিক পেনশনে বোধহয় আর বেশি পারা যায় না এ অঞ্চলের প্রাণময় জলহাওয়া সত্ত্বেও।

অবশ্য এখানকার বাঙালি বাবুদের মত জীবনযাত্রা তাঁর কোনওদিন ছিল না বলে তাঁর প্রচণ্ড অভাবেও পরিতাপ নেই। মানিকবাবুর লালকুঠিতে দু'মণ দুধ জ্বাল দেওয়া হতো দৈনিক; দু'মণ চাল ও দু'মণ দুধ। স্থানীয় অভাবী লোক এলেও পাত পড়ত। মানিকবাবুর লালকুঠির গায়ে এখন বটগাছ উঠেছে, ছাতের একটা দিক ধসেছে। যে চত্বরে বসে কলকাতা থেকে আর্টিস্ট এনে গানের জলসা বসত সে চত্বরে উনুন পেতে বছরের পর বছর সপরিবারে মালির রান্না হওয়ায় চারদিক কালিঝুল। এখন মালি মালিক এবং বার্মাটিকের কারুকার্য করা রেলিং চেলা করে উনুন ধরাতে সে কসুর করেনি। নানারকম বাবুবিলাস ছিল এ অঞ্চলে। যেমন এর রাত বারোটায় 'চোর চোর, ডাকাত ডাকাত! পাকড়ো পাকড়ো!' ইত্যাদি প্রবল নাদে শৈলেনবাবুর ঘুম ভাঙে। সে বাড়িতে চাকর-দরোয়ান-আত্মীয় সমেত অনেক লোকজন, কাজেই তাঁর মত একলা মানুষের সাহায্য না হলেও চলবে ভেবে সে রাত্তিরে আর সামনের মাঠ ভাঙেননি। পরদিন জানলেন কলকাতা থেকে বারো-চোদ্দজন ইয়ংম্যান এসেছিল এবং তাদের ভীষণ 'বোরড' লাগছিল। 'বেশ চমকে দিয়েছিলাম চারদিক, তাই না?' পরদিন তাদের একজন প্রশ্ন করেছিল শৈলেনবাবুকে। তা ছাড়া আর একটা বিলাসও ছিল মানিকবাবুর, কুলকুচোবিলাস। রোজ রাত এগারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খাবার পর টানা একঘণ্টা তিনি কুলকুচো করতেন। মুখ গলা পেট থেকে উদ্‌গত রকমারি বিকট ধ্বনিতে চারদিকে নৈঃশব্দ্যে মুখর। কোনও বিলাস নয়, কলকাতার দামের অর্ধেক দামে প্রত্যহ আধ সের দুধ যদি পেতেন, এই ক্ষোভটাই তাঁর জীবনের এখন অন্যতম ক্ষোভ।

বস্তুত সত্তর পেরোনোর পর থেকেই শরীরের চাহিদা সম্পর্কে শৈলেনবাবুর চৈতন্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে আমলকি গাছ ছিল আশার প্রতীক। এখন আমলকি গাছ মানে ভিটামিন সি। ভাতে সামান্য নুন তেল দিয়ে আমলকি সেদ্ধ চমৎকার খাদ্য। একলা আটার রুটি করে উঠতে পারেন না তাই আটাভাজা ও আমলকি সেদ্ধ দিনের পর দিন তাঁর প্রধান খাদ্য। একটু দুধ পেলে মাজাটা বোধ হয় দাঁড় করানো যেত; মাজা বাঁকাতে পারলেই তিনি আবার বাগানের পরিচর্যায় যেতে পারতেন, গরু ছাগল চোর তাড়াতে পারতেন। এখন গলার আওয়াজ ছাড়া তাঁর কোনও অস্ত্র নেই। এবং চোরেরা এই অস্ত্রের বৈকল্য সম্পর্কে সজাগ। গলার হাঁক শুনেও তাই কুড়োলের আওয়াজে ছেদ পড়েনি। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে কুয়োতলা পর্যন্ত যাওয়া যায় কিন্তু আটবিঘা জমির একপ্রান্ত বহুদূর।

কুয়োতলা থেকে তক্তাপোষে পৌঁছবার আগেই ব্যথাটা উঠে একেবারে গ্রাস করে

ফেলে সমস্ত শরীর। অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকার পর হঠাৎ চমকান মহীরুহ পতনের মড়মড় আওয়াজে। বোধহয় তাঁরই বাগানের কিংবা বাগানের বাহিরেই দেবীচক গাঁয়ের যে বিস্তীর্ণ টিলা তাঁর একপ্রান্তে বিশাল মহুয়াটা গেল। খাপরার বাড়ির খুঁটি বানাবার জন্যে এখনই গরুর গাড়ি বোঝাই হবে। হঠাৎ টের পান কেউ গলাখাঁকারি দিচ্ছে। চোর নাকি?

'কে রে?' গলাটাই একমাত্র আছে শৈলেনবাবুর।

'আমি ফকিরা', মাথায় শাদা চাদর মুড়ি দেওয়া মূর্তিটা অগ্রসর হয়। 'দুধ বেশি আছে। আপনি লিবেন?'

'আজ কী বার?'

'মঙ্গল।'

'আমাকে তো বুধবার দিস্। আচ্ছা দে।'

ফকিরাই ছোট সেটাভটা ধরিয়ে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়াম বাটিতে দুধ চড়িয়ে দেয়। আড়চোখে শৈলেনবাবু নজর করেন এক পোর অনেক বেশি দুধ।

'কত এনেছিস?'

'এই এক পো হবে।'

ফকিরা তাঁকে তাঁর বরাদ্দ এক পোর বেশি দুধ খাওয়াতে চায়, যেমন সে বরাবর তাঁকে খাইয়েছে তাই এটা তার ছল। কিছু বলেন না। সেই আগে যেমন বলতেন তেমনি বলেন, 'আজকাল দুধে জলটল দিচ্ছিস।'

'আমরা হই গোয়ালা মানুষ, দুধে জল দিলে গরু মরে যাবে,' সেই বহু প্রাচীন জবাব যা ফকিরার পূর্বপুরুষেরা দিয়েছে।

ফকিরা বাহিঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা, সে এমনি একজন মানুষ যাদের সংখ্যা ক্রমশ অবলুপ্ত। ফকিরার ছেলে রাম প্রথমে এখানে বাঙালিবাবুদের বাড়িতে কাজ করত, তারপর সেখান থেকে আর এক বাবুর সঙ্গে দিল্লি। সেখানে একটার পর একটা প্রভু বদলে এখন এক আর্মি ক্যান্টিনের চাকরিতে। তার ফটো এনে দেখিয়েছিল ফকিরা। চোঙাপ্যান্ট কোট টাই পরা উত্তর ভারতীয় তরুণের চেহারা।

'ছেলের চিঠি পেয়েছিস?'

'অনেকদিন পেয়েছি না।'

শৈলেনবাবু ইতস্তত করেন। দুদিন থেকেই শিবশঙ্করের কথা ভাবছিলেন। চারপাশে বিশ মাইলের মধ্যে ডাক্তার নেই। একমাত্র মিড্‌ল্ প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার শিবশঙ্করই ভরসা। শিবশঙ্করের মাস্টারিটা ফালতু। আসল কাজ ডাক্তারি। প্রথমে শৈলেনবাবুর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি শিখে গ্রামাঞ্চলে ওষুধ দিত। কিন্তু সুঁই যে দেয় না এমন ডাক্তারকে সম্মান করতে নারাজ গাঁয়ের লোক। সুঁই সম্পর্কে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অসীম ভরসা। কাজেই শিবশঙ্কর শহরের এক বাঙালি ডাক্তারের পরামর্শে ডাক্তার বনে গেছে। ক্রমাগত পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন চালায়। প্রতি সুঁইতে দু টাকা। পয়সার টানাটানি থাকলে চার পাঁচটা সুঁই দিতেও কসুর করে না, অনেক সময় জল ভরেও।

তবে শৈলেনবাবু তার আপনার লোক এবং আপনার লোককে সে ভাল দামি ওষুধ ইঞ্জেকশন করে। গত বছর শৈলেনবাবুর বেদনার প্রকোপ বাড়লে তার সুঁই বিশেষ কাজ দিয়েছিল।

ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বলেন, 'একটা কাজ করবি ফকিরা?'

প্রস্থানোদ্যত ফকিরা থমকে দাঁড়ায়।

'আপনার দুধটা ফুটেছে।'

'একটু নামিয়ে দে।শিবশঙ্করকে ডেকে দে।'

'আমি তো মাঠ যাব।'

মাঠে মানে বাহিঙ্গার পশ্চাতে যে বিশাল টিলা যা এখন সূর্যাস্তের রঙে রাঙা সেখানে সারা দুপুর শুকনো রোদ জ্বলা ঘাস আঁচড়ে আঁটড়ে তুলে স্তূপ করা হয়েছে। মহিষের খাদ্যের জন্যে তাই সংগ্রহ করতে সে চলেছে।

'তুমি পারবে না?' কখনও কোনও কাজ চাপাননি শৈলেনবাবু দু'বছর আগে পর্যন্ত। বলতে গেলে তিনি নিজেও দেহাতি লোক। নিজেই তিরাশি বছর পর্যন্ত দুই থলিতে সপ্তাহান্তে হাট থেকে প্রয়োজনীয় যা কিছু বয়ে নিয়ে এসেছেন। শারীরিক এত কষ্টেও তাঁর প্রশ্নে যে আত্মসচেতনতা ছিল তা ফকিরা গোয়ালাকে স্পর্শ করে।

'আচ্ছা দেখি', ফকিরা বললে।

দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে টের পান এক পো-র ঢের বেশি পান করেছেন এবং দুধের সঞ্জীবনী তাঁর বৃদ্ধ শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। এখানকার জলহাওয়ায় যে আহ্লাদ এত বছর তাঁকে ধরে রেখেছে এবং গত দু-তিন বছর আর্থিক তাড়নায় বার্ধক্যে যা প্রায় অপসারিত তা যেন সমস্ত শরীর জুড়ে তার স্বস্থানে ফিরে আসছে। শতায়ু হবার প্ল্যানটা আবার মাথার মধ্যে নড়ে। একটা গরু রাখবেন, ফকিরার কাছ থেকে ধারে বকনা বাছুর নিয়ে আসবেন, বাগানেই চরবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না। বাহিরে ধবধবে চাঁদনিতে তাঁর বাগান অপার্থিব। এটা তিনি বরাবর লক্ষ করেছেন। দিনে চারদিকে প্রচণ্ড খরা এবং তার সঙ্গে মানুষের প্রবল সংগ্রামে সর্বত্র একটা কেজো চেহারা, সারা দুপুর দড়াম দড়াম শব্দে গাছ পড়ে, ভোর থেকে লছমনিয়া টাঁড়, আগিয়া দেবীচক, গ্রামগুলো থেকে লোকজনের যাতায়াত, গরুর গাড়িতে কাঠ, হাট থেকে ছাগল গরু। আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ আকারান্ত হাঁক। কিন্তু এখন চাঁদনিতে হাওয়া দিয়েছে। ইউক্যালিপটাসে সমুদ্রের স্বর। একবার যদি হাঁটতে পারতেন তাঁর বাগানে। বরাবর মনে হয়েছে, সামনে মহুয়া গাছের ফোকর থেকে এই সময় পরীরা নেমে আসে, সেই গল্প যা তিনি মেয়েকে লিখেছিলেন চিঠিতে তাঁকে প্রলোভিত করার উদ্দেশ্যে। বস্তুত তাঁর মেয়ের শৈশবেও কোনও পরীর বোধ ছিল না, এখন তো সে অণ্ডালের রেল কলোনির কাঠগিন্নি।

অবসর নেবার মুখোমুখি জামাই এসেছিল কয়েক দিনের জন্যে শ্বশুরকে দেখতে। এসেই পরদিন সকালে সাইকেল রিকশা করে শহর ঘুরে এল। 'ভেবেছিলাম রিটায়ার করে আপনার কাছে এসে থাকব। অসম্ভব! আমার রেল কলোনিই ভাল। রাস্তায় বেরিয়ে

মানুষের সঙ্গে গা না ঘষলে কি প্রাণ বাঁচে। বাপ্‌স্! এখানে মানুষ থাকে! রাত্তিরে কিছু করার নাই।'

'কী করবে? সারাজীবন তো অনেক কাজ করলে। অনেক ট্রেন পাস করালে।'

রেলের গার্ড জামাই বললে, 'কিন্তু মানুষের সঙ্গে তো দুটো কথা বলতে হবে।'

'কেন, ছেলের চাকরি? মেয়ের বিয়ে? কংগ্রেস-কমিউনিস্ট? কী দরকার?'

'না না, নিজের স্বার্থের কথাই বলছি না। কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে।'

'ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ক্রিকেট বম্বেতে হচ্ছে না মাদ্রাজে হচ্ছে তা জেনে কিছু লাভ আছে আমাদের? তার চেয়ে...'

'তার চেয়ে কী?'

'তার চেয়ে আমার গাছতলায় একটু বসে থাকলে তোমার পরমায়ু বাড়বে।'

'কিছু না করে শুধু বসে থাকা। বুড়ো তো হয়েই গেছি, শুধু বসে বসে বুড়ো হয়ে যেতে চাই না।'

'তুমি এক কাজ কর। আমার জুঁই, মেরি পামার দেখেছ? আর গোল্ডেন শাওয়ার? ওই গোড়াগুলো একটু সাফ কর, অনেকদিন নিড়োনো হয়নি। মাটি জমে ইট হয়ে যাচ্ছে। অন্তত দু-চার বালতি জল তুলে গাছে দাও না। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।'

'এই গাছ গাছ করেই জীবনটা অপানার মাটি হয়ে গেল। আপনার মেয়ে ভুল বলে না। আপনি বরং অণ্ডালে চলুন। ফুনুর বিয়ে সামনের মাসে। মাসখানেক কাটিয়ে আসবেন মেয়ের কাছে।'

শৈলেনবাবু গিয়েছিলেন নাতির বিয়েতে। এবং বিয়ে শেষ হতে না হতেই পালিয়ে এসেছেন। তাঁর মেয়ে তাঁর মতে অশিক্ষিত আধুনিকা। প্রবল কাঠগিন্নি। যে কদিন ছিলেন সে কদিন কন্যাপক্ষ তাকে কিরকম ঠকিয়েছে, দাওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি ঠিকমত রাখেনি সেই ক্রমাগত অনুযোগে মেজাজ একেবারে খারাপ করে তুলেছিল। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

শৈলেনবাবু হাঁটি হাঁটি করে এগোতে থাকেন এবং নিজের কৃতিত্বে তিনি নিজেই স্তম্ভিত। অবাক হয়ে চেয়ে দেখেন সেই চন্দ্রালোকিত ইউক্যালিপটাসের বীথির গায়ে পাথরের বেদিতে বসে আছেন। অদূরে খেজুরও অল্প অল্প নড়ছে হাওয়ায়। সত্যিই একটা অবস্থার পর অন্যের উত্তেজনায় উত্তেজনাই জীবনের একমাত্র লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়; ছেলের উত্তেজনা মেয়ের উত্তেজনা, নাতি-নাতনির উত্তেজনা, এর সঙ্গে মিলে আছে কংগ্রেসের উত্তেজনা কমিউনিস্টের উত্তেজনা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেটের উত্তেজনা। আঃ! এখনই নামবে পরীরা অদূরে মহুয়া গাছটার ফোকর দিয়ে। তাঁর মেয়ে জামাই বিশ্বাস না করুক। তিনি বিশ্বাস করেন, পরী আছে, হয়তো ভগবানও আছে। অন্তত ভগবানের মত একটা কিছু খাড়া করা দরকার। প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাস করত না, গাছপালার ভগবান?

খেয়াল করেননি, ইউক্যালিপটাস বীথি নিস্পন্দ। ভালবাসার জগৎটা বড্ড একলা বয়েছেন মাঝে মাঝে তাঁর এই পীড়াবোধ এখন আর নেই। আগে মনে হতো, এ

জগৎটাকে আরও যদি কেউ ভালবাসত, স্ত্রী পুত্রকন্যা, নাতি-নাতনি। এমনকি কলকাতার বন্ধুবান্ধবদেরও বিশেষ উৎসাহিত করতে পারেননি। তাদের মধ্যে যাদের ভালও লেগেছে তাদের কাছেও এ অঞ্চল বড়জোর বেড়াবার জায়গা, বসবাসের জায়গা নয়। আর কিছু ছোকরারা এসেছিল বন্দুক গ্রামাফোন ও রাম সঙ্গে নিয়ে। সেই সব হল্লাপার্টির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নৈঃশব্দ্য আরও বেড়েছে।

বাগানটা বোধহয় শিবশঙ্করকে দিয়ে গেলেই ভাল। এবার এলে বলবেন। শিবশঙ্কর নিশ্চয় গাছ কেটে খেত বানাবে। জুঁই আর মেরি পামারের জায়গায় মকাই, ক্যাশিয়া আর ল্যাবার্নামের বদলে আলুগম, স্থানীয় সম্পন্ন জোতদারের ঘরে তাঁর তারা-ধরা ইউক্যালিপটাস বীথি বনবে চেয়ার-টেবিল। চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের অপার্থিব শোভার মধ্যে হঠাৎ থর থর কেঁপে ওঠেন। সমস্ত পিঠ ঘাড় কোমর জুড়ে ব্যথার কামড়ে শৈলেনবাবু ছটফট করেন। দাঁত নেই, তাই মাড়ির সঙ্গে মাড়ি ঠেকিয়ে প্রতীক্ষা করেন। শিবশঙ্করের সাইকেলের বেলের জন্যে কান পাতেন, তারপর ব্যথার শ্রবণশক্তিরহিত। টের পান, এবার বোধহয় তিনি যাচ্ছেন। কারণ গত বছর ব্যথার যে চোট ছিল তার চেয়ে এ চোট আরও সর্বাত্মক। এখন খেয়াল হয়, এ-ছেলেমানুষি না করলেই পারতেন। এই পৌষের কনকনে ঠাণ্ডায় ইউক্যালিপটাস বীথি যতই মনোহর হোক পঁচাশি বছরের পঙ্গু বৃদ্ধের পক্ষে মরণ ফাঁদ। শৈলেনবাবু উঠবার চেষ্টা করেন, পারেন না। এবং ঠিক এই সময় সাইকেলের বেল বাজে।

'কাকাবাবু', শিবশঙ্করের গলা নাকি? কোলে করে সে শৈলেনবাবুকে তুলে আনে ঘরে। বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, কারণ গত দু'বছরে বেঁটেখাটো শরীরটা আরও শুকনো।

'আমি এখন যাচ্ছি শিবশঙ্কর, বাগানটা দেখ।'

'কোথায় যাবেন কাকাবাবু? আমি ইঞ্জেকশান দিচ্ছি।'

'কেন মিছিমিছি পয়সা খরচা করছ? যে বাঁচবে তাকে দিও।'

শিবশঙ্কর নিজের মনে বকে, 'সব শালা এক। আমাদের পাশের গাঁয় এক ব্যাটা সুঁই দেয়। লোক মরে গেছে, তাও সুঁই দিচ্ছে। নইলে পয়সা আসবে কি করে?'

শিবশঙ্করের যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শৈলেনবাবুর মৃত্যু। এ সময় খেতের কাজে লোক পাওয়া মুশকিল। চার মাইল দূরে শ্মশান। এই সব বিচারে শৈলেনবাবুর শেষ কাজ হয় ইউক্যালিপটাস বীথির নিচেই। পরের বর্ষায় বাদামি জলের প্রবল উচ্ছ্বাসে ছাই মেশে পাথরে কাঁকরে ধুলোয়।

শিবশঙ্কর কেজো ছেলে। ছোট বাড়িটা সে ভাড়া দিয়েছে সরকারি হেলথ্ ডিপার্টমেন্টকে। যেখান গোল্ডেন মাচায় গাঢ় কমলা জ্বলন্ত হয়ে থাকত সেখানে পারিবারিক পরিকল্পনার সাইনবোর্ড, লাল ত্রিভুজের পাশে সাবধান বাণী : দো ইয়া তিন বাচ্চে, ব্যস্। অনেক গাছই কাটা পড়েছে কিন্তু কেন জানা যায় না ইউক্যালিপটাস বীথি এখনও অটুট। এখনও গাছগুলো সারা রাত্তির গমের খেতের পাশে দাঁড়িয়ে তারা ধরে।

উড়োচিঠি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এই গল্পটা আমাকে বলেছিল কালুডিহির বদরুবুড়ো।

উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের এসব গ্রামকেই বলা হয় 'গৈ-গাঁ'। কিন্তু বুড়ো-মানুষ দেখেছি গৈ-গাঁয়ে, যারা একেকজন ব্যাসমুনি। এপিকের পুঁথির ভারে কুঁজো হয়ে ঠুকঠুক করে পা ফেলছে শ্মশান বা কবরের দিকে। এবং সমঝদার শ্রোতা পেলে সেই পুঁথি খুলে আওড়ে যাচ্ছে একটি করে এপিসোড, লৌকিক-অলৌকিকে ওতপ্রোত ঠাসা। সত্যি-মিথ্যে জিগ্যেস করলেই ধূসর চোখে তাকিয়ে শুধু বলে—সে দিনকাল আর নেই।

নেই, তা তো দেখাই যাচ্ছে। কালুডিহির উত্তর-মাঠ চিরে সোজা বেরিয়ে গেছে জাতীয় মহাসড়ক। পশ্চিমের নদীর ওপর ঝলমলে রুপোলি সাঁকো হয়েছে। পুবের বিলে বাঁধ। পাটুলি-কেষ্টপুরের ধনবাবুদের ট্রাক্টর সেকালের বুনো মোষের মত গর্জে বেড়াচ্ছে ট্রা...রা...রা...রা। দক্ষিণ থেকে উড়ে-আসা ছুটকো-ছাটকা মরশুমি জলহাঁসের ঝাঁক ভয় পেয়ে দিক বদলায়।

এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত বিশাল আকাশে মাকড়সার জালের মত ছড়ানো বিদ্যুতের তার। রাবণের সিঁড়ির মত উঁচু অতিকায় মঞ্চের শীর্ষে আটকে পড়ার ভয়ে শেষ রাতে হলুদ ক্ষয়াখর্বুটে চাঁদটা আড়চোখে চাইতে-চাইতে পিছু হটে।

আর বাঘ নেই। ভোঁদড় নেই। শেয়াল নেই। খরগোশ নেই। পাখ-পাখালিও উজাড়। রাতভর আর পোকামাকড়ের সেই গভীরতর অর্কেস্ট্রা বাজে না। অনন্তকালের জন্য 'হাইবারনেশনে' মগ্ন প্রকৃতির কুশীলব। ততক্ষণে আসরের দখল নিয়েছে ডিপ টিউবেল, পাম্প যন্ত্র। সারারাত কালুডিহির মাঠে সেই ঘরঘর গরগর তুলকালাম। আর আলো। সেকালের রাতে জিন বাদশাহের অলৌকিক আলোর মিছিলের মত। বুঝি দু-চারটে লণ্ঠন কোনও বেআদপ নফর নেশার ঘোরে ফেলে গিয়েছিল।

কালুডিহির অভিমানী মেয়েরা আর আগের মত মরতে ভয় পায় না। ঘরে অঢেল বিষের বস্তা, বিষের শিশি। মন চাইলেই গিলে খায়। তারপর চোখ উলটে হিম হয়ে পড়ে থাকে। মৃত্যুকে আদরের কুকুর করেছে—ঘাটে যায়, মাঠে যায়, পেছনে সেই কুকুর লেজ নেড়ে ঘোরে।

বদরুবুড়োই বলেছিল এসব কথা। বলেছিল—তা মশাই, ফি বচ্ছর দুটো-তিনটে করে খসছে।

—কেন?

—কেনো? বুড়ো ঘোলাটে চোখে দৃষ্টিহীন তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তখন ফের বললাম—পেটের জ্বালায় বুঝি?

বদরু ঘড় ঘড় করে হাসল। জোরে সাদা মাথাটা দুপাশে নাড়ল। বলল—ও জ্বালায় কেউ আত্মহত্যে করে না বাবা। বরঞ্চ চেয়েচিন্তে খেতে চায়, চুরিচামারি করে, কত ফিকির আর ধান্দাবাজি করে। নাঃ, ইটা একটা গুহ্য কথা।

—আহা, খুলেই বলো না বাবা!

বুড়ো গোমড়ামুখে একটু চুপ করে থাকল। হাতের শনের দড়ি-কাটা ঢ্যারা কোলে রেখে তারপর বলল—খাল কেটে কুমির আনার মতন হল আর কী। এই কালুডিহির চারদিকে ছিল বড় বড় মাঠ, খালবিল, আর ওই নদী। না সড়ক, না কিছু। আলপথে গাঁয়ে আসা-যাওয়া। শীতে মাঠের ধান উঠলে তখন আল কেটে-কেটে গরুমোষের গাড়ি চলার 'লিক' বানাত। বর্ষা অবদি সেই রাস্তা সম্বল। আর এখন দেখছেন কী হয়েছে।

বলতেই হল—বুঝলাম না কিচ্ছু।

—বুঝলেন না? বদরু ভুরু কুঁচকে তাকাল। ওই যে বললাম, খাল কেটে কুমির আনার কথা। তেমনি মরণকে মানুষ সেধে ডেকে এনেছে গো! ইবারে বুঝলেন?

বদরুর ভাই সদরুও বুড়ো। সে আপনমনে জাল বুনছিল একপাশে। এতক্ষণে কথা কেড়ে বলল—উটা ঠিক কথা লয়।

অমনি বদরু ঘাড় বেঁকিয়ে ভাইকে চার্জ করল—ক্যানে লয়?

সদরুর তোবড়ানো মুখ আরও তুবড়ে গেল। বলল—মরণ আমরা ডেকে আনিইনি।

—নাবালকের কথা শুনেছ? বড় ভাই ঘড় ঘড় করে হাসতে লাগল।

সদরু তেতোমুখে বলল—বাবুরা আর গরমেন্টোরা শহর-লগর থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। চক্কান্ত করে পাঠিয়েছে, বুঝলে? চাষার সব্বোনাশ করতে পাঠিয়েছে।

—ইটাও ভাববার কথা বটে! বদরু ভাইকে একবার সমর্থন না করে পারল না।

গাঁয়ের মধ্যিখানি বটতলায় দশের থান। সেখানে একটা বাঁশের মাচা। মাচায় বসে কথা বলছিলাম আমরা। আমার পাশে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বদরুর নাতি হামিদ। সে খালি ফিকফিক করে হাসছিল। এবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—এরা বড্ড রিঅ্যাকশনারি। সাবধান। বেফাঁস কিছু বলবেন না।

বদরু একটা কিছু আঁচ করে বলল—কী বলছিস রে, হামু? অত নুকোছাপা

কিসের? বুঝলেন বাবা? এখনকার এই ছোঁড়াগুলোকে দেখছেন, সব একেকজনা 'ধেষ্টবুদ্দি' মুন্ত্রী। সব সময় চক্কান্ত করে বেড়াচ্ছে।

'ধেষ্টবুদ্দি'টা নিশ্চয় যাত্রাপালার ভিলেন চরিত্র ধৃষ্টবুদ্ধি। কিন্তু হঠাৎ সদরুর কেন আক্ষেপ জাগল, বুঝলাম না। সে বলল—এজন্যেই তো মানা করতাম, ন্যাকাপড়া শিখতে দিও না। স্বরে অ স্বরে আ শিখলেই আর রক্ষে নাই। আফতাব মৌলুবি বলতেন না? বেশি পড়লেই মানুষ বিদ্যের চোটে 'গোমরা' হয়ে যায়।

হামিদ তেড়েমেড়ে বলল—গোমরা মানে?

জবাবটা আমিই দিলাম।—বাইবেল কোরানে সডোম-গোমবা টুইন-সিটির কথা শোননি হামু?

হামিদ বলল—ও! দানিকেন বলেছেন, নিউক্লিয়ার বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল গ্রহান্তরের কমান্ডার-ইন-চিফ! বলে হামিদ হো হো করে হাসতে লাগল। সদরু আরও খাপ্পা হয়ে বলল—তত্ত্বকথা-গ্রাহ্য কথা তো আজকালকার ছোঁড়ারা বোঝে না। খালি ফ্যা ফ্যা হাসি। বাবা আদমের গল্পটা জানিস?

হামিদ ভালমানুষ সেজে বলল—না তো। কী ব্যাপার?

সদরু বলল—বাবা আদম গন্দমবিরিফের ফল খেয়েছিল। তারপর খোদা তাকে ডাকলেন, তো আদম জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। কারণ কী? না—লজ্জা। ফল খেয়ে জ্ঞান জন্মেছে, নিজেকে ন্যাংটো দেখছে। আঞ্জির গাছের পাতায় লেঙ্গখানা ঢেকেছে। আরে! ঢাকলেও কি ঢাকা যায়? যায় না। শরীল থেকে লেঙ্গখানা ওপড়াতে পারবি?

বদরু তো প্রাজ্ঞ ব্যাসমুনি। ভাইয়ের কথা এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল—আর হামা, তোর গায়ে তিন কুড়ি টাকার জামা, পরনে পেন্টুল। জেবে কলম। হাতে ঘড়ি। পায়ে জুতো। সাবান মাখিস। পাওটার মাখিস।

হামিদ বলল—আহা, হলটা কী?

বদরু আস্তে বলল—এই যে আমাকে দেখছিস, একফালি বস্তুর সার করে থেকেছি। তাকে কি আমার ক্ষেতি হয়েছে কিছু? ওরে ছোঁড়া, কালুডিহির সে সব মানুষজন এখন গোড়ে। তারা কি তোদের চেয়ে কম সুখে ছিল, না তোদের চেয়ে বেশি দুখে ছিল? ওরে, সুখ কী, দুখই বা কী? সব তো মোনের ভরোম। তোর সুখ বেশি, না আমার সুখ বেশি ছিল, ই বড় কঠিন বিচার, বাপ! কান দিকি দাঁড়িপাল্লাখান, কোথায় পাবি? যা—লয়ে আয়! বলে সে থ্যাবড়া হাতের হাজামজা কঠিন আঙুল তুলল।

প্রকৃতিবাদ বনাম প্রযুক্তিবাদ নিয়ে এই তুমুল তর্কাতর্কির মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ল এক ডাকপিওন। হামিদের চিঠি আছে। দুই বুড়ো তখন চুপচাপ গোলগোল চোখে ডাকপিওন দেখতে থাকল।

একটু পরে হামিদ বলল—বসবেন, না আসবেন আমার সঙ্গে?

বললাম—তুমি চল। আমি একটু বসি। বড্ড গরম পড়েছে। ছায়াটা ভালই লাগছে।

হামিদ সাইকেলে চেপে চলে গেল। সদরুও জালের গোছা নিয়ে পা বাড়াল। বদরুবুড়োর দিকে ঘুরে অবাক হয়ে গেলাম। কবরের লাশের মত চেহারা। খড়িপড়া, ধূসর, প্রাচীন। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিটা ভাসা-ভাসা। একটু ভয়ে-ভয়ে বললাম—কী হল তোমার? ও বুড়ো!

বদরু আমাকে আশ্বস্ত করে একটু হাসল। তারপর আপন মনে বলল—ডাকের পিওন এসেছিল?

হ্যাঁ।

বদরুর গলার স্বরে কী এক আচ্ছন্নতা। সে বলল—আজকাল ডাকের পিওন পেরায় আসে। কেউ গেরাহ্যি করে না। একটা কুকুরও ডাকে না। আর ওই চিঠি! হুঁ, কত চিঠি আসে কালুডিহিতে। খামোকা!

—খামোকা কেন?

বুড়ো সেই ঘোরলাগা অবস্থায় বলতে থাকল—লয় তো কী? আজকাল তুচ্ছ কথাতেই চিঠি লেখে। চিঠি আসে। ডাকের পিওন আসে তাই লিয়ে। যেন, কী গুহ্যকথা বয়ে এনেছে। নাতিকে বলি, ভাই, পড় তো শুনি কী লেখেছে! হুঃ, খাল্লি যতসব ফালতু কথা! আমি তো ভেবেই পাই না, ক্যানে ফালতু কথা লোকে লেখে! ক্যানেই বা পয়সা খরচ করে পাঠায়? বাবা, চিঠি কি সহজ জিনিস? এর মূল্যটা তোরা কী বুঝবি আজকাল?

ভঙ্গি দেখে টের পাচ্ছিলুম, এবার বুড়ো তার জীর্ণ এপিকের পাতা খুলছে সাবধানে। তৈরি হয়ে বসলাম। এই সময় মাঠ থেকে একটা ঘূর্ণি হাওয়া গাঁয়ে ঢুকল এবং সোজা রাস্তায় এগিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখ বুজলাম। ধুলো, শুকনো পাতা, খড়কুটো ঘুরতে ঘুরতে নির্জন রাস্তার বাঁক ঘুরে অন্য মাঠে চলে গেল। তবু কতক্ষণ ধরে বটগাছটা শব্দ করতে থাকল। তারপর ফের স্তব্ধতার মসৃণ ব্যাপকতার ঝুরো ঝুরো নিমফুলের মিঠে গন্ধ জমতে থাকল। আবিষ্ট চোখে তাকালাম বদরুবুড়োর দিকে। সে কি নাক উঁচু করে নিমফুলের গন্ধ শুঁকছে? মুখটা উঠে আছে সামান্য। ঠোঁট ফাঁক। দৃষ্টি তেমনি ভাসা-ভাসা। আর খসখসে ফাটা তেবাড়ানো শরীর ঘিরে স্মৃতির ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা। বড় দূরে সরে গেছে বদরুবুড়ো। প্রাচীন বৃক্ষের ছড়ানো শেকড় বাকড়ের মত তার দুটো পা। আস্তে বললাম—তারপর?

বুড়ো বলল—সেই যেবার কালুডিহিতে পেত্থম ডাকের পিওন এল...

সে অনেক বছর আগের কথা।

বিলাঞ্চলের নাবাগ মাটির গাঁ কালুডিহিতে ঘরবিশেক বসতি বড় জোর। সবাই

সবার 'আপ্ত-কুটুম্ব' কোনও না কোনও সুত্রে। সুখে-দুঃখে এককাট্টা হয়ে বেঁচে থাকে। মোটা ভাত-কাপড়ে তুষ্ট লোকজন, শৌখিনতা সয় না। এমন এক গাঁ।

সেই গাঁয়ে এমনি এক নিমফুলফোটা চৈত্র মাসের অবেলায় হঠাৎ এসে পড়ল একজন ডাকপিওন।

নিরক্ষর চাষা-গাঁয়ে এতকাল পেয়দা এসেছে 'লুটিশ' নিয়ে। ঢেঁড়াদার এসেছে কাছারি থেকে। গোমস্তা এসেছে আদায়ে। কিন্তু ডাকপিওন কখনও আসেনি।

কেনই বা আসবে? এ গাঁয়ে ভিন গাঁয়ের মেয়ে বা বউঝিও খুব কম। যারা আছে তাদের বাবা-কাকারাও চাষাভুষো মানুষ। দরকার হলে মাঠ-খাল-বিল-নদী ডিঙিয়ে চলে আসবে খবর দিতে-নিতে। কে এখানে চিঠি লিখবে, কাকেই বা লিখবে? আর তা পড়ারও তো লোক নেই। কাজেই ডাকপিওন আসাটা অভাবিত ঘটনা।

বদরুর তখন ন্যাংটো বয়েস। আর সদরু তো মাই টানে। তাদের বাপ গাঁয়ের মোড়লের ব্যাটা। মোড়লের নাম আব্বাস। তখন সে বেজায় বুড়োমানুষ। কিন্তু কাঠামোটি খুব শক্ত। সরষের খেতে সরষে কাটছিল। এমন সময় ন্যাংটো বদরু খেঁকশেয়ালের মত ছুটে গিয়ে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—ডাকের পিওন এসেছে! ডাকের পিওন এসেছে!

অমনি মোড়ল সরষের পাঁজা ধপাস করে ফেলে নাতির পেছন-পেছন গাঁয়ের দিকে দৌড়ুল।

সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। লোকটা যে ডাকের পিওন, তা প্রথম কে চিনেছিল এই নিয়ে পরে অনেক তক্কাতক্কি হয়েছিল। তবে জোর গলায় দাবি করেছিল আসমা নামে মেয়েটা। সে বলেছিল—গাঁয়ের মাথায় কুকুর লাগল। তখন ভাবলাম ভালুকঅলা। গিয়ে দেখি, ও মা! এ আবার কে? মাথায় লাল পাগড়ি দেখেই পালিয়ে এসে খবর দিলাম এতোয়ারিভাইকে। এতোয়ারি মুখ চুন করে বলল—পুলিশ! পুলিশ! হায়, হায় কার পাপে গাঁয়ে পুলিশ ঢুকল? সে তক্ষুনি মাঠে পালিয়ে গেল। উঁচু আলের কোলে শেয়ালের মত লুকিয়ে রইল সন্ধ্যা অবদি।

আসমা বলেছিল—ফের সাহস করে পুকুরপাড়ে গেলাম। দেখি লাল পাগড়িপরা মিনসে কুকুরগুলোকে ঢিল ছুড়ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল—ও মেয়ে! কুকুর তাড়াও তো বাপু। গাঁয়ে ঢুকব।

সাহসী মেয়ে আসমা বলল—গাঁয়ে তো ঢুকবে। তবে তুমি কে, সেটা বলো আগে।

তখন লোকটা বলল—আমি ডাকের পিওন। চিঠি এনেছি।

আসমা আকাশ থেকে পড়ে যেন কলজেয় সুখের চোট খেল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। এই তা হলে ডাকের পিওন? তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে না বলা কথা—তুমিই ডাকের পিওন? ডাকের পিওন তুমি? আহা, দাঁড়াও, দাঁড়াও

না বাপু একটুখানি। চোখ ভরে দেখি তোমার চেহারাখানা, গড়নপেটন সমুদায়!

হুঁ, এসব কথা আসমার মত মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। তখনও ভরা যৌবন তার। বড় নির্লাজ ও মুখরা। একাদোকা সকাল-সন্ধ্যা মাঠেঘাটে ঘোরে। দিনভর এবাড়ি-ওবাড়ি খালি আড্ডা আর আকথা-কুকথা। এই পাড়াবেড়ানি স্বৈরিণী ওই গাঁয়েই ততদিনে চারটে পুরুষের হাতফেরতা হয়ে গেছে। বাঁজা বলে টের পেয়েও বটে, আবার পেটের খোরাকও নাকি রাক্ষসীর মত, তার ওপর ওই মুখ—দু-চার বছরের বেশি কোনও পুরুষের কাছে টেকেনি। আর এই পুরুষগুলো সবাই ছিল তার খুড়তুতো-পিসতুতো-মামাতো দাদা কেউ না কেউ। শেষ অবদি তার বাবা রাগ করে বলেছিল—বাস বাস! আর আপ্তকুটুমে লয়, মেয়েটাকে ভিন গাঁয়ে ভিনপুরুষেই দোব।

ভিনপুরুষে যাবার আগে আসমার মনে তখন জ্বরের ঘোর লেগেছে, নানারকম স্বপ্ন দেখছে এবং কচি মেয়েটি হয়ে গেছে. ঠিক তখনই সেই অবেলায় এসেছেন রহস্যময় ডাকের পিওনপুরুষ। এনেছেন চিঠি।

আসমা এই বিস্ময়কর আকাশ ও পৃথিবীর অনেক অজানা জিনিসের সঙ্গে 'ডাকের পিওন' এবং 'চিঠি'র কথাও শুনেছে। সে নাকি চিঠি নিয়ে আসে অচিন মুল্লুক থেকে। আর চিঠিতে থাকে খবর। খবর কথাটা কিন্তু সোজা নয়। খবর মানেই সাংঘাতিক কিছু—যা তুমি জানো না, ভাবনি, টেরও পাওনি। যা তোমার ওপর হঠাৎ এসে হামলা করে। ঝড়ের মত। গাছের ওপর বাজপড়ার মত। বন্যার মত। কালুডিহির সেই আদিম পৃথিবীতে চৈত্রের অবেলায় আসমা তারপর শিউরে উঠেছিল। আর তার দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে ডাকপিওন গাঁয়ে ঢুকেছিল। কালুডিহিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

গাঁয়ের মধ্যিখানে দশের থান এই বিশাল বটের তখন জৈবনকাল। সেই চৈত্রে এমনি চিকন কচি পাতার সাজ। ডালপালায় নিটোল মসৃণতা। তার তলায় মোড়ল পেতে দিল যত্ন করে তেঠেঙ্গে টুল। আর ডাকের পিওনপুরুষটি বসলেন।

বুড়ো-আধবুড়োরা দরবারে বসার মত বসেছে। দম আটকানো মুখে তাকিয়ে আছে। জোয়ানরা জ্বল-জ্বলে চোখে শব্দহীন হাসছে। যেন যা হবার হবে, তাতে পরোয়া নেই। একটু তফাতে ভিড় করেছে মেয়েরা। বেশবাস অসম্বৃত। বুকে কী আছে গোপন সুখবৃক্ষের স্বাদ ফল, কার চোকে চোরা লোভ জাগল—সে নিয়ে এখন মাথাব্যথা নেই। তারা এতকাল বলাবলি করেছে, কে সে ডাকের পিওন—কেমন তার চেহারা? খায় কী, পরে কী, থাকেই বা কোথায়? সে কি মানুষ, না অন-মানুষ? আর কেউ বা দেয় তাকে চিঠি? পায় কোথায়? এখন চোখের সামনে সেই ডাকের পিওন দেখে তাদের স্ত্রী-চেতনা জর্জরিত, আত্মা আক্রান্ত এবং তারা বোধহীন। আর সেই গুরুতর সময়ে হঠাৎ হাওয়া বন্ধ। গাছের পাতাটিও নড়ে না। পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের লালচে রোদ এসে পড়েছে ডাকপিওনের ওপর।

আগুনজ্বালা চেহারা নিয়ে রহস্যময় মানুষটি বসে আছে। তার পায়ের জুতোয় ধুলো। তার হাঁটুর নিচের লোমে ধুলো। কপালে ঘাম। নাকের ডগায় ঘাম। চিবুকে ঘাম। মোড়ল ধরা গলায় বলল—পাখা।

কে পাখা নিয়ে এল দৌড়ে। ডাকপিওনের ওপর হাওয়া করতে থাকল। ডাকপিওন তখন একটু হেসে মিঠে গলায় বলল—আহা, থাক থাক!

আব্বাস মোড়ল বলল—আগে, একটুকুন গুড়-পানি খান। সোস্থ হোন।

ডাকপিওন মিঠে হাসল ফের। তার ছোট ছোট চুলে বেজায় পাক ধরেছে। নাকটাও লম্বা আর মোটাসোটা। ফুটোয় পাকা লোম বেরিয়ে আছে। কানদুটোও বেশ বড়সড় এবং বেড়ে কাঁচাপাকা লোম। তার চোখের তলায় কালি, কিন্তু বড় শান্ত আর দিঘল ওই চোখ। গরুর চোখের মত অমায়িক চাহনি। আর তার প্রকাণ্ড মোচ দেখে বেহুলার পালার চাঁদসদাগরকেই মনে পড়ে যায়। আহা, হাতে যদি থাকত একখানা হেঁতালের লাঠি।

একবাটি টাটকা গুড় সে তারিয়ে-তারিয়ে খেল। আঙুল তো চুষলই, বাটিতেও জিভ ঢুকিয়ে চাটল এবং সেই বাটিতেই ঘড়ার জল ঢেলে দিতে বলল। তখন পুকুরের জলই কালুডিহিতে অমৃত। সেই অমৃত ঢক ঢক করে খেয়ে ডাকপিওন বলল—আঃ! আর সেই তৃপ্তির স্বাদ ছড়িয়ে গেল প্রতিটি মুখে। হাসি ফুটল একপুকুর শালুকফুলের মত। তারপর ডাকপিওন কাঁধের ঝোলানো অর্ধবৃত্তাকার প্রকাণ্ড চামড়ার ব্যাগটা কোলে তুলে নিল। তার ভেতর হাত ভরে শুধু বলল—চিঠিটা।

অমনি ভিড় নড়ে উঠল। জোয়ানরা বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিঠি! বাচ্চারা কী এক খুশিতে কলকলিয়ে উঠল—চিঠঠি! চিঠঠি! তাদের হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল, ডাকের পিওন চলে গেলে এবার কিছুদিন তারা চিঠঠির খেলাই খেলবে।

একটা হলদে রঙের শক্ত টানটান চৌকো কাগজ বের করে ডাকপিওন ফের বলল—চিঠিটা!

চিঠি? ওটাই চিঠি? ওই কাগজটুকুন? চৈত্রের ঝরা বটপাতার মত হলদে ওই জিনিসটা। অনেকে নিরাশই হল। আর ডাকপিওন চিঠিটা পড়ার জন্য খাকি শার্টের পকেট থেকে চশমা বের করল। একদিকে দড়িটা কানে জড়াতে থাকল। বিস্ময়-উৎকণ্ঠা-আশা-নিরাশায় স্তব্ধ লোকগুলো এবার চশমা দেখতে থাকল।

চশমায় ডাকপিওনকে সোনাতলার গোমস্তাবাবুর মত সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ খোলস বদলে ফেলেছে যেন ডাকের পিওন। তার মুখে রাজপুরুষের গাম্ভীর্য। চিঠিটা একটু তফাতে ধরে সে বলল—এটাই কালুডিহি বটে তো?

ভিড় এককথায় সাড়া দিল। হাঁ, হ্যাঁ। তখন আব্বাস মোড়ল সবাইকে চুপ করাতে বাজের মত হাঁকরাল—হেই! ভিড় চুপ করিয়ে সে মোড়লি ভঙ্গিতে বলল—আজ্ঞে—কালুডিহিই বটে। মৌজা পীরতলা, পরগনা পাটেশ্বা।

ডাকপিওন তাকে থামিয়ে ঘোষণা করল—হুঁ, আমোদ আলি। আমোদ আলি কে? তার চিঠি।

আব্বাস মোড়ল ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল—কী নাম বললেন?

—আমোদ আলি!

—আমোদ আলির নাম লেখা আছে, পিওনমশাই?

—হুঁ। আমোদ আলি। সাকিন কালুডিহি, পোস্টাপিস সোনাতলা।

আব্বাসবুড়ো গুম হয়ে দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে পায়ের কাছে মাটি দেখতে দেখতে ঘড়ঘড় করে বলল—আমোদ আলি? সে কে গো? কালুডিহিতে আমোদ আলিটা কে? সমিস্যের কথা।....

সেই চৈত্রের অবেলায় সোনাতলা পোস্টাপিসের ডাকপিওন এসে কালুডিহিকে সত্যি এক জটিল সমস্যায় ফেলেছিল। নদীর দহের শান্ত জলের তলায় স্রোতের টানে চলে আসা কুমিরের মত কোনও এক আমোদ আলি বুজকুড়ি তুলছিল। আমোদ আলি, কে তুমি? কে লিখল তোমাকে বছর শেষের এ অবেলায় হলুদ রঙের চিঠি? মোড়ল মুখ তোলে। আর সবাই বড় প্রত্যাশায় তার দিকে তাকায়। মোড়ল আস্তে ডাকে—পিওনমশাই!

ডাকের পিওন অন্যমনস্ক। বলে—উঁ?

—কে লেখেছে চিঠি দেকুন দিকিনি!

ডাকের পিওন চোখ বুলিয়ে বলে—হুঁ মামোদ আলি লিখেছে।

মামোদ আলি! দহের জলটা প্রচণ্ড নড়ল। আগন্তুক দুর্জ্ঞেয় কুমির ছটফট করে উঠল। মোড়ল হাসবার চেষ্টা করে বলে—এ তো বড় গুহ্যকথা, পিওনমশাই! ও নাম জম্মেও শুনিনি!

প্রাজ্ঞ ডাকপিওন বলে—তা না শুনতেই পার। বাইরের লোক বটে তো। তবে আমোদ আলির চেনা। চেনা না থাকলে পোস্টোকাড লিখবেই বা কেন? লিখেছে...

ভিড়ের বুড়োরা এবার একগলায় বলে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়েন। পড়েন। শুনি। বিত্তেন্তটা শুনি আগে। আর মোড়ল দেখে, তার মোড়লি যায়যায় অবস্থা। হ্যাঁ, এ কথাটা তারই বলা উচিত ছিল এতক্ষণ। সে রাশ সামলাতে আচমকা হাঁকরায়—হেই! চুপো, চুপ থাক সব। পড়েন পিওনমশাই, পড়েন। জোরে জোরে পড়েন।

ডাকপিওন একটু কেসে গলা সাফ করে নেয়। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে চিঠি পড়তে শুরু করে :

'...মোং খড্ডা, তাং ১১চৈত্র, সন ১৩২২। এলাহিভরসা।...পরম করুণাময়ের কৃপা আপনাদিগের প্রতি পঁহুছায়। আর লিখি যে আমি আপনাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মামোদ আলি। বহুকালাবধি সংবাদাদি কুশল হয় নাই। সাক্ষাতে সব কহিব। আমি কয়েক

দিবস শয্যাগত। কালরোগে ভুগিতেছি। পত্রপাঠ শীঘ্র আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। নতুবা বাঁচিব না। আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি মামোদ আলি।...' পড়া শেষ হলে ডাকপিওন চিঠির ভাষার জট ছাড়ায়। প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বলে—এই হল খবর।

তারপর ডাকপিওন পায়ের কাছ থেকে শুকনো খড় কুড়িয়ে কানে ঢোকায় এবং আরামে চোখ বোজে। ভিড় স্পন্দহীন। শুধু গাছ থেকে বকেয়া দু-একটা হলুদ পাতা খসে পড়ার শব্দ হয়। আব্বাস মোড়ল ফের দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বলে—বড় সমিস্যে বটে!

কে সেই মামোদ আলি, কালরোগে শুয়ে আছে বিছানায় এবং উদ্ধারের দিন গুনছে? কালুডিহির মানুষের মনে এখন বড় যন্ত্রণা। প্রতিটি মুখে অসহায়তার ছাপ। প্রতিটি চাহনিতে বিষাদ। কোথায় খড্ডা নামে গ্রামে? গ্রাম না শহর? সেখানে এক মুমূর্ষু মানুষ বড় আশা করে কালুডিহিতে খবর পাঠিয়েছে। সে কালুডিহির আত্মজ। কালুডিহির কোনও এক মানুষের সে ছোট ভাই!

মোড়ল বলে ওঠে ধরা গলায়—হুঁ, ভাই বড় আদরের ধন। বিপদে পড়লে ভাই ডাকে ভাইকেই। এবং সে জিভ চুক চুক করে। মাথা নাড়ে। আর মেয়েদের ভিড়ে প্রতিটি চোখ ভিজে যায় একথায়। মমতায় বেদনায় আপ্লুত কোনও জননী অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে—আহা রে! বাছার তাইলে খুব কষ্ট। বিদ্যাশ বিভুঁই জায়গায়!

মোড়ল ফের মুখ তোলে এবং আফশোসে বলতে থাকে—যদি আমোদ আলি বলে কেউ থাকত এ গাঁয়ে, এক্ষুনি হুকুম দিতাম—গাঁয়ের সেরা তেজি মোষের গাড়ি সাজাও। উড়িয়ে লিয়ে যাও পংখিরাজের মতন। তার সঙ্গে কোদাল হাতে ছুটত আরও দশটা জোয়ান। আল কেটে রাস্তা বানাত।...

ডাকপিওন রোদে বিশাল মাঠ ভেঙে ক্লান্ত। চোখ বুজে ঝিমোয়। একটুখানি জিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে। তবে বেলা পড়ে এল। সাত মাইল কুপথ ভাঙতে হবে ফের। সামনে কৃষ্ণপক্ষের রাত। নদীর ওপারে মাইল দেড়েক কাশকুশের জঙ্গল আছে। গুলবাঘা আর নেকড়ের উৎপাত আছে। সে আনমনে বলে—পেলে না আমোদ আলিকে?

আব্বাস ভাঙা গলায় বলে—নাঃ।

তখন ডাকপিওন চোখ খুলে হঠাৎ একটু বিষণ্ণ হাসে। বলে—দেখ বাবাসকল, মানুষ তো চিরকাল বাঁচে না। এমন হতে পারে, লোকটা তোমাদের মধ্যে ছিল। এখন গোরে শুয়ে আছে।

প্রাজ্ঞ দার্শনিক সেই পিওনপুরুষ কালুডিহির লোকগুলোকে যেন অলৌকিক কী এক চাবুক মারলেন। চকিতে মৃত্যুর ঠাণ্ডা স্পর্শ পড়ল শরীরে। সবাই শিউরে উঠে মুখ ফেরাল কবরখানার দিকে। দৃষ্টি গেল কবরের গভীর আঁধারে। একদল জীবিত,

সতেজ, চঞ্চল মানুষ আরেক দল মৃত, খড়িপড়া শরীর, ধূসর, বিশীর্ণ, স্থির মানুষের দিকে তাকাল। এরা সবাই এ কালুডিহির মানুষ। জীবিত ও মৃতে পরস্পর এমন অবলোকনের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি এ গাঁয়ে। সেই পড়ন্ত বেলায় শিশুরাও বড় ভয় পেয়েছিল গোরে আমোদ আলির শুয়ে থাকার সম্ভাবনায়। তারা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিষ্পলক চোখে। আমোদ আলি নামে এক হঠকারী ভূত তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল।

সেই সময় হঠাৎ...

—হেই বাবা আমোদ আলি! তুমি কি কবরের লোক? তাই যদি হও, এবার গা তোল। সাড়া দাও। খবর আছে।...যেন ঠিক এই বাক্য ঠোঁটের ফাঁকে রেখে হঠাৎ নড়বড় করে এগিয়ে আসে বুড়ি সালমা। পুরুষদের অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহের সীমানায় দাঁড়িয়ে ডাকের পিওনকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তার দুই কানের ডগা জুড়ে ওপর থেকে নিচে অবধি সারবদ্ধ রুপোর আংটা। এ বয়সেও তার কণ্ঠার হাড় ঢেকে গৌরবে জ্বলজ্বল করছে রুপোর প্রকাণ্ড হাঁসুলি। আর তার কবজিতে রুপোর 'চুর'— ঐতিহাসিক তলোয়ারধারী যোদ্ধাদের কবজিতে পরা বর্মের মত। তার দু-পায়ে রুপোর 'বাঁক'। বুড়ির বুড় এখনও গোরে যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ এক গুহ্যকথা। বউঝিয়ের ভয়ে রুপোর সম্বল গায়েগতরেই বয়ে বেড়ায়। এই সালংকারা বুড়ি সালমা এমনি করে ছিটকে এসে দাঁড়ালে তাবৎ পুরুষ তার দিকে ঘোরে। বুড়ি চেরা গলায় ডাকে—বাবা ডাকের পিওন।

ডাকের পিওন অমায়িক হাসে।—বলো বুড়িমা।

—আমোদ আলি বললে?

—হুঁ, হুঁ।

—তার ভাই মামোদ আলি বললে?

—হুঁ, হুঁ।

সালমাবুড়ি এবার আব্বাস মোড়লের দিকে ঘুরল।—হেই মোড়লের ব্যাটা। চেঁচিয়ে উঠল সে। গলা আরও চিরে গেল। তো এ বুড়ির পাড়াকুঁদুলী বলে বদনামও আছে। মোড়ল উদ্বেগে কেঁচো। সালমা তার মুখের সামনে চুরপরা একটা হাত ঝকমকিয়ে নেড়ে বলে—গাবতলায় ভিটেখানা পড়ে আছে। দুকোরবেলায় ঘুঘু-ঘুঘুনী জোর বেঁধে কাঁদতে আসে। হেই মোড়লের ব্যাটা! ভিটেখানা কার, ইটা ঠাওর আছে?

বিরক্ত গম্ভীর মোড়ল বলে—আছে, আছে। বুধনী বহরীর।

সালমা কপালে সেই হাত চাপড়ায়।—হা মোড়ল। বহরীকে মোনে পড়ে না? ই কি দুক্ষের কথা গো!

—পড়ে, পড়ে। মোড়ল রাগ করে বলে। কানে ঠসা ছিল বলে বহরী বলত। তখন আমাদের যৌবনকাল।

ছোঁ মেরে কথা কেড়ে বুড়ি বলে—ও মোড়ল, তার দুই যাঁওয়া (যমজ) ব্যাটাকে মোনে পড়ে না?

আব্বাস অমনি এপাশ-ওপাশ করে। তার বাঁকা কাঠামো ছটফট করে ওঠে। সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ প্রায় হ্যাঁচকা টানে ডাকপিওনের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর মোড়লি হাঁক মেরে মেঘের মত গর্জে আদেশ ঘোষণা করে হেই, বাবাসকল! বড় খারাপ খবর। গাড়ি সাজাও! খড্ডা যাও। বুধনী বহরীর ব্যাটা মামোদ আলি বাঁচে কি বাঁচে না।

কালুডিহির মোড়লের কথায় নদীর হড়কা বানের মত অশরীরী তোড় বয়ে আসে দমকে-দমকে। কালুডিহির মানুষগুলো কোলাহল করতে থাকে। খড্ডা চল খড্ডা! যাত্রার আসর ভাঙা বিশৃঙ্খল ভিড়ে চেঁচিয়ে ডাকাডাকির মত কে কাকে ওহিদ, ওহিদ হে।...মনিরুদ্দি! হেই এতোয়ারি-ই-ই-ই! এতোয়ারিঃ! এইভাবে অসংখ্য ডাক অবেলার আলো-ছায়ায় ছত্রখান হতে থাকে।

আর সেই ভিড় ছত্রভঙ্গ এবং টুকরো-টুকরো হতে হতে ডাকের পিওন দেখে সে বড় একা। অসহায় মুখে উঠে দাঁড়ায়। তাকে আর কেউ তাকিয়েও দেখে না। বেলা পড়ে এসেছে। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে পা বাড়ায়। মনে বখশিশের আশা ছিল। কিছু ডিম অন্তত। অগত্যা একটা কুমড়ো। কালুডিহির কুমড়ো অতি-সুস্বাদু। তার সবজিফলমূলশস্যে এ মাঠের মাটির হৃদয় দিয়েছে উজাড়-করা স্নেহ।

বেচারা অনাথ ডাকপিওন এবার রাগ করে হাঁটে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অবাকও হয়। কী ঘটল আচম্বিতে, কিছু বোঝা গেল না। কেন ওই চাষা-ভুষো-লোকগুলো হঠাৎ অমন তোলপাড় হয়ে গেল? কেন ওরা অমন করে সাজো-সাজো রব তুলল? আর কেই বা বুধনী বহরী—যার ভিটেয় দুপুরবেলা ঘুঘু-ঘুঘুনী কাঁদতে আসে? শুধু বোঝা গেল, কানে কালা—হয়তো মুখেও বোবা একটা মেয়ে কবে কোন্ যুগে যমজ খোকা বিইয়েছিল। আকাশ-পাতাল হাতড়াতে হাতড়াতে ডাকপিওন খোলা মাঠে একবার বলে—শালা আমোদ আলি! তারপর ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়েই আঁতকে ওঠে। পা থেকে জুতো খোলে। তারপর তার চলার বেগ বাড়তে থাকে। ঊর্ধ্বমুখে ঘোড়ার মত ছোটে।

গাঁয়ের সেরা মোষজোড়ার মালিক ওহিদ। তার মোষ তখন আছে বিলের ফাঁড়িঘাসের বনে। ফিরতে মুখ-আঁধারি সন্ধেবেলা, আকাশে যখন ঝিকমিক তারার উদয়। সেই মোষ দুটোকে খেদিয়ে আনতে ছুটে গেছে জনাচার আঁকাড়া জোয়ান। কারণ মোষ দুটোও দুর্দান্ত আঁকাড়া।

ওহিদের বাড়ির সামনে গাড়ি বাঁধা হচ্ছে। বাঁশের চোঙায় রেড়ির তেল এনে চাকা খুলে ধুরিতে মাখানো হচ্ছে। টাপর রাখা আছে পাশে। 'আউড়' খড় বড়

মোলাম। সেই খড়ের গদি বানাচ্ছে কেউ। তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া হবে পুরু কাঁথা। কাঁথা আসছে মোড়ল বাড়ি থেকে। তার ওপর বাড়তি একটা সুজনি যেচে দিয়ে গেল আসমা খাতুন। নকশাকাটা লাল-নীল সুতোর পাখি, পদ্মফুল আঁকা সুদৃশ্য সেই সুজনি আসমা খাতুনের 'ভাতার-চরাণী' বদনামটা এবেলার জন্যে মুছে দিল। পরম আদরে এই স্বৈরিণী যুবতীকে কেউ সম্ভাষণ করল মা, কেউ বলল বহিন! আর সেই গরবে গরবিনী মেয়েটা চোখে জল নিয়ে ঘোষণা করল—মামোদ আলি এলে পথ্যির দিন আমার টুকটুকিকে আন্না করে খাওয়াব। শরীলে অক্ত হবে। টুকটুকি তার প্রিয় মুরগির নাম।

এইসব ব্যস্ততার মধ্যে কখন সূর্য ডুবেছে। নীল কুয়াশা ও নরম আঁধার ওতপ্রোত হতে হতে হাতের রেখা ঢেকেছে। মসজিদে শোনা গেছে ইশপ আলির চেরা গলার আজান। আজ এই আজানে করুণ ব্যাকুলতা ছিল। ভিড় বেড়েছে ঠাসাঠাসি। মামোদ আলির খবর ছেলেপুলেদেরও ঈশ্বরের দিকে নিয়ে গেল। অন্যদিন সন্ধ্যার প্রার্থনায় দু-চারজন বুড়ো ছাড়া কেউ বিশেষ জোটে না। খাঁ খাঁ করে খোদার ঘর। ইশপ অন্তত আজ পাশে জিনদের নিয়ে নমাজ পড়ার গল্পটা করতে পারবে না। অগ্নিবর্ণ জ্যোতির্ময় জিনেরা নাকি তার পাশে দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ে।

প্রতিটি বাড়িতে মেয়েরাও আজ ঈশ্বরমুখী। তাদের ভুল আরবি শব্দ শুনলে গদাইপুরের খোঁড়া মৌলবি পয়জার ছুঁড়ে মারতেন।

আর তখন মসজিদে মোড়ল ঘোষণা করেছে—ভাইসকল, বাবাসকল! ইবারে মামোদ আলির 'ভালাই' চেয়ে খোদাতালার কাছে কাঁদি-কাটি ভাইসকল, বাবাসকল! ওনার জন্যে 'হায়াত' (আয়ু) মেঙে লিই।

কালুডিহির পুরুষরা হাঁটু মুড়ে বসে দু'হাত সামনে তুলে মামোদ আলির আরোগ্য ও আয়ু কামনা করল। আবেগাপ্লুত কেউ-কেউ হেঁড়ে গলায় কেঁদেও ফেলল। এই বাড়তি নমাজ ও ক্রন্দন খরার বছরে বৃষ্টির জন্যে দেখা গেছে কালুডিহিতে। খড্ডায় রুগ্‌ণ মামোদ আলি যেন তেমনি এক খরাকে ডেকে এনেছে। কণ্ঠতালু শুকনো। মুখগুলো পাণ্ডুর। রেড়ির তেলের মিটমিটে পিদিমের আলোয় খোদার ঘরে সারবন্ধ সেইসব মুখ দেখে মনে হবে, এই আদমপুত্ররা যথার্থই নির্বাসিত— খোঁড়ামৌলবি অকাট্য শপথ করে বলেছিলেন বটে!

মসজিদ থেকে বেরিয়ে অনেকে মাঠের ধারে দাঁড়াল। ওহিদের মোষ ডাকিয়ে আনার শব্দ শুনতে কান পাতল। কিন্তু হাওয়া বেড়েছে। বিস্তীর্ণ অন্ধকার মাঠে শনশন হাওয়ার শব্দ।

বটতলায় এখন মোড়লবাড়ির 'লালটিন' বা চারকোণা কাচে ঢাকা লণ্ঠন জ্বলছে। গাঁয়ের একমাত্র 'বিলাত্তি' আলো ওটা। পালায়-পরবে জ্বলে। গন্ধতেল এক শিশি কবে এনেছিল মোড়ল সোনাতলা থেকে। আলোটা তার মোড়লি গর্ব। সেই আলোয়

টাপর চালিয়ে বাঁধা হতে-হতে মাঠের দিকে কোলাহল শোনা গেল। মোষের খবর হয়েছে! মোড়ল ফের ঘোষণা করে—যারা-যারা যবে বাবাসকল, খেয়েদেয়ে লাও! এক বস্তা মুড়ি লাও সঙ্গে। এক টিন গুড়ও লিও। ডোলচি লিও। সরা লিও। আর...

আর কী নিতে হবে বা নেওয়া উচিত, বিব্রত মুখে হাতড়ায় বুড়ো আব্বাস। দাড়ি চুলকোয়। জোয়ানরা বলে—ভেব না মোড়ল। তুমি শুধু বসে দেখ, আমরা কী করি!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একদঙ্গল ডাকাবুকো জোয়ান এসে গাড়ির পাশে দাঁড়াল। ওহিদের মোষকে অল্পস্বল্প খোলভুসি খাওয়ানো হল। খাওয়ার গরজ তাদের কম। দিনমান বিলের জলেকাদায় ঘুরে পেট ডাগর করেছে। তাদেরও পথের খোরাক আর বাঁশপাতায় তৈরি প্রকাণ্ড ঝুড়ি গাড়ির পেছনে চাপানো হল। ওই ঝুড়িতে জল ঝরার সাধ্যি নেই, বড় কৌশলে তৈরি। ওতে জাবনা খাবে মোষদুটো। ওহিদ বলল—পোঁহাতকালে জায়গামত গাড়ি বেঁধে একবার খাওয়াবে। অভ্যেস আছে বাছাদের।

আর সেই বিলাত্তি লণ্ঠন ঝোলানো হল গাড়ির তলায় ধুরিতে মুরুব্বি জনাদুই যাচ্ছে সঙ্গে। পাকা মাথা চাই-ই এসব অভিযানে গাড়োয়ানিতে বসল ওহিদের ছেলে নখাই। গলায় রুপোর তাবিজ, বাহুতে লোহার তাগা। মাথায় ঝাঁকড়া বাবরি চুল। তামাটে গায়ের রং। মিষ্টি হেসে বলে—তাইলে যাই মোড়ল।

সস্নেহে ছেলেকে দেখছিল ওহিদ। দ্রুত জিভ কেটে বলে—যাই বলতে নাই, বলো আসি।

লাজুক হেসে নখাই বলে—আসি!

মোড়ল বলে—এস! আর হঠাৎ রাতের বটতলা দশের থানে ঘোর নীরবতা নামে। প্রতিটি চোখ নিষ্পলক হয়ে ওঠে। যুবতীরা নখাইকে প্রাণভরে দেখে। আর লোভাতুরা স্বৈরিণী আসমা খাতুন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করে—এই যুবক ফিরে এলে তাকে একবার ভালবাসা ডাক না ডেকে ছাড়বে না।

এবং সেই বিহ্বলতায় বিরাট মৌনে চিড় ধরিয়ে নিলাজ মেয়েটা প্রেমিকার স্বরে আচম্বিতে বলে ওঠে—হেই নখাই, সোনাতলার বাজার থেকে আমার জন্যে একখান টিকুরি আনবে?

নখাই বলে—ইস্‌স্! আর বটতলায় শব্দহীন ছিছিক্কার ছড়ায়। মোড়ল ঘড়ঘড় করে বলে—তামাশার সময় লয়। তামাশার সময় লয়। ই বড় দুঃখুর সময়। বাপ নখাই! রওনা দাও খোদার নামে।

নখাই পাচন তোলে এবং দুদিকে হাঁটুর গুঁতো মারে মোষের পেটে এবং গর্জে বলে—ধোঃ ধোঃ! বলবান দুই পশু নড়ে ওঠে। তারপর পা বাড়ায়। নখাই বলে—হা হা হা হা! অন্ধকারের দিকে ধুড়মুড় করে এগিযে চলে টাপর-ঢাকা গাড়ি। টাপরের

ভেতরে জোয়ানরা কোলাহল করতে থাকে উত্তেজনায়। বড় রোমাঞ্চকর আজ রাতের এই অভিযান! তাদের ওপর ন্যস্ত এক বিরাট আর পবিত্র দায়িত্ব। কালুডিহির এক আত্মজকে রুগ্‌ণতা থেকে আরোগ্য পৌঁছে দিতে এই আয়োজন। কালুডিহির মাটি আকাশ জল হাওয়া আর শস্যরাজিতে থরে থরে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে স্বাস্থ্য, যৌবন ও পরমায়ু। এ হাওয়ায় শ্বাস নিলে অমরতা। তাই চল! খড্ডা চল! রোগা ছেলেটাকে নিয়ে আসি।

মাঠে নেমে আলকাটা 'লিকে'র পথে ধুলো উড়িয়ে অন্ধকারে ছুটে চলে মোষের গাড়ি। জোয়ানদের ইচ্ছে করে, চেঁচিয়ে বলে—হেই মামোদ আল্লি! ভয় নেই, আমরা আসছি!

বটের তলায় তখন বিড়বিড় করে দোওয়া উচ্চারণ করছিল বুড়ো ধর্মভীরুরা। মেয়েরা মনে মনে বলছিল—ভালয়-ভালয় রোগা ছেলেটাকে ফিরিয়ে লিয়ে এস বাবারা!

আর তখন মাঠের মাঝামাঝি গিয়ে হঠাৎ নখাই চেঁচিয়ে উঠেছিল—ওই যাঃ!

—কী, কী রে নখাই?

—খড্ডা কোন্ পথে, তা তো শুনে এলাম না!

একজন বলল—খড্ডার নাম বাপের জন্মোতে শুনিনি! আর তাই শুনে একে একে সবাই বলে ওঠে—তাই তো! আম্মো তো শুনিনি। খড্ডা কোথায়?

দড়ির রাশ টেনে ধরতেই মোষ দুটো থমকায়। মুখ উঁচু করে বুঝি নক্ষত্র দেখে। অন্ধকার মাঠে উত্তাল হাওয়া শনশনায়। সবাই চুপ করে গেছে। কোথায় খড্ডা কেউ জানে না। উত্তেজনার ঝোঁকে কারুরই এই আসল প্রশ্নটা মনে জাগেনি।

একটু পরে নিঃশ্বাস ফেলে নখাই বলে—বেরিয়ে যখন পড়েছি, কথা নাই। আগে সোনাতলা তো যাই। তারপরে...

আপদের কালের উপদেষ্টা মুরুব্বিদ্বয়ের একজন বলে—হুঁ, সোনাতলার গোমস্তামশাইকে ঘুম থেকে জাগাব। জিগ্যেস করে লিব। ভেব না।

অন্যজন সায় দিয়ে বলে—হুঁ, হুঁ। জ্ঞানী মানুষ গোমস্তামশাই। কত জায়গা ঘোরেন। খড্ডা কি চেনেন না? চল বাবাসকল!

মোষের গাড়ি আবার অন্ধকারে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলতে থাকে দিগন্তের দিকে।

একে বলে 'ফোম' হওয়া। অর্থাৎ বোধের উদয়। কালুডিহির বটতলায় এখন কুপির আলো। দশের থান ঘিরে ফের আসর বসেছে। একথা-ওকথার ফাঁকে হঠাৎ 'ফোম' ভেসেছে মোড়লের মাথায়—হেই গো! খড্ডা কোন পথে যাবে ওরা? আর দেখ, খড্ডার নাম তো শোনা লাই! তোমরা কেউ শুনেছ ভাইসকল?

সবাই মুখ তাকাতাকি করে। তাই তো! কেউ শোনেনি এ নাম। তখন ওহিদ ককিয়ে ওঠে—ওই যাঃ! আমার ছেলেটাকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে মোড়ল? লিব্বাসনে পাঠিয়ে দিলে মোড়ল হে! ইটা তুমি কী করলে?

তাকে সান্ত্বনা দেয় অনেকে। আর মোড়ল গলা ঝেড়ে ডাকে—সালমা বহিন! তুমি আছ?

অন্ধকার থেকে সাড়া আসে—আছি মোড়লভাই।

—তোমার সব মোনে থাকে। মোনে আছে। খড্ডার কথা শুনেছ কি না, তাই শুধোই বহিন!

মোড়লের কণ্ঠে উদ্বেগের আর্দ্রতা। এই অন্ধকার রাতে অতগুলো লোককে বেঘোরে ভাসিয়ে দিয়েছে ভ্রমে। ডাকের পিওনমশাই নিশ্চয় জানত। হায় হায়, কী ভুল না হয়ে গেছে!

সালমা অন্ধকার থেকে এগিয়ে এসে বলে—কথাটা আমি সারাক্ষণ ভাবছি। তোমরা তো 'হুপের' মাথায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছ। কিন্তু খড্ডা কোন ঠাঁই কারুর মাথায় আসে না? এতগুলান মরদমানুষ! ধিক তোমাদের। আর মোড়ল, তোমাকেও ধিক দিই।

মোড়ল মাথা পেতে বলে—দাও, দাও।

সালমা আরও কয়েক পা এগিয়ে আসে। তার গলার ডিমটা শকুনের গলার ডিমের মত ধক ধক করে নড়ে। লোলচর্ম সালংকারা বুড়ি—প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তির জন্য যার এবেলা নতুন করে সুনাম চাগিয়ে উঠেছে, এবার একটু বদলে যায়। তাকে বিষাদময়ী দেখায়। সে ধীরে ধীরে বলতে থাকে—বুধনী বহরী আর আমার জন্মো একই সালে। সেবার বড় বানের বছর। তেমন বান আর এ বয়সে দেখিনি। বুধনী হয়েছিল ঘরের চালে, আমি তালডোঙায়। বুধনী নাকি বানের পানিতে পড়ে গিয়েছিল। কচি কানে পানির ঘা বেজেছিল। বহরী হল। তাইতে বোবাও হল। তোমাদের মোনে পড়ে না?

সবাই বলে—পড়ে, পড়ে। বলো!

সালমা ধরা গলায় বলতে থাকে—কিন্তু যত দিন যায়, মেয়ের উপ বাড়ে। কী গড়ন, ছাঁদছিরি! সেই দেখে হামদুমোড়ল বললে, এ মেয়ে গাঁছাড়া করব না। বহরী কি মানুষ না? বিয়ে দিলে গোলাপের সঙ্গে। গোলাপকে মনে পড়ে না?

—পড়ে, পড়ে। তুমি বলো!

—গোলাপকে সাপে খেলে। তখন বুধনীর কোলে দুই যাঁওয়া (যমজ) ব্যাটা। উপে ফেটে পড়ছে। মোড়ল বললে, নিকে দাও মেয়ের। বুধনীর বাপ পাত্তর খুঁজতে গেল ভিন গাঁয়ে। তো বুধনী সব টের পেয়ে বললে, না। আর নিকে করবে না।

বহরীর গোঁ। মানায় সাধ্যি কার? সেই বুধনীর দুই ব্যাটার নাম ছিল আমোদ আলি আর মামোদ আলি।

আব্বাস মোড়ল হাত তুলে বলে—আহা, সে-বিত্তেন্ত কে না জানে। তুমি বাছা রামকাহিনী জুড়লে দেখছি। খড্ডা লিয়ে কথা। সেটা জানা থাকলে বল দিকিনি।

সালমা বুড়ি একটু দমে যায়। ঘোলাটে চোখে আলোআঁধারে অব্যক্ত মুখভাবগুলো নিরীক্ষণ করার পর বলে—হুঁ। দুই ভাইয়ে বড় ভাব। সুখে দুখে জোড় বেঁধে ঘোরে। তা'পরে একদিন হল কী, কালুডিহিতে লবাববাহাদুরের হাতি এল। এ গাঁয়ে তখনও কেউ হাতি দেখেনি। সেই পেখম হাতি।...

তবে ডাকের পিওন আসার সঙ্গে হাতি আসার তুলনা চলে না। সেদিন হাতি কোনও খবর নিয়ে আসেনি। বরং খবর নিতেই এসেছিল। নবাব বাহাদুরের প্রজাদের ভালমন্দের খোঁজ নিতে এসেছিলেন দেওয়ানবাবু। বাঁধের আরজি হল। দেওয়ানবাবু বললে—নবাব বাহাদুরকে পৌঁছে দেব আরজি। ভেব না। আর হাতির মাহুত রহমত খাঁ ছিল খুব আলাপী মানুষ। সারাক্ষণ ছেলেপুলেদের হাতির পিঠে চাপায়। ওরা রহমতের ছায়া হয়ে ঘোরে। হুকুম খাটে। ক'দিন পরে দেওয়ানবাবু ফিরে গেলেন হাতি নিয়ে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছিল। মিছিল করে লোকেরা মাঠ অবদি গিয়েছিল হাতির পেছনে পেছনে। তারা ফিরে এল। কিন্তু ছেলেপুলেরা চলতে থাকল। তারা সুর ধরে ছড়া গাইছিল :

'হাতি তোর গোদা গোদা পা
হাতি তুই নেদে দিয়ে যা॥
তোর মুলোর মতন দাঁত হাতি!
কুলোর মতন কান
হাতি তুই যাবি গঙ্গাস্তান॥'

নদী অবদি গিয়ে ছেলের দল ফিরে এসেছিল। তখন সন্ধ্যা। খরার মাস। ছেলেরা ছড়া গাইতে গাইতে ফিরে এল গাঁয়ে। শুধু একটি ছেলে ফিরল না। সে মামোদ আলি। আমোদ আলি জীবনে ওই একবার ভাইকে ভোলামন হয়ে সঙ্গছাড়া করেছিল। তাই কাল হল। একটা বিশাল কালো হাতি তার ভাইকে নিয়ে চলে গেল।

সে রাতে লম্ফ জ্বেলে আঁচলের আড়াল করে বুধনী বহরী আর তার ছেলে আমোদ আমি মাঠ খুঁজেছে। গাঁয়ের লোকের খোঁজাখুঁজিতে মন মানেনি। কাঁপা কাঁপা গলায় আমোদ আলি ভাইয়ের নাম ধরে ডেকেছে। বিশাল মাঠে অন্ধকারে উত্তাল হাওয়ায় সে-ডাক ছেঁড়া পাতার মত বৃথা উড়ে গেছে।

পরে খোঁজখবর নিতে কসুর করেনি কালুডিহিওলা। নবাববাহাদুর বাড়ি গেছে। দেওয়ানবাবু আর রহমত খাঁকে জিগ্যেস করেছে। কেউ বলতে পারেনি খবর। আর এমনি করে দিন গেছে। রাত গেছে। বুধনী বহরী নিঃশব্দে কেঁদেছে। আমোদ আলি

ভাইয়ের শোকে বিষণ্ণ হয়ে ঘুরেছে।

গেল কোথায় ছেলেটা? শেষ অবদি লোকে সাব্যস্ত করেছিল—ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছিল। আর তার আশা নেই।

আর বিষণ্ণ আমোদ আলির বয়স বাড়ে দিনে-দিনে। বিয়ে দিতে চায় গাঁয়ের মোড়ল। ছেলেটা বুক ফেটে কেঁদে বলে—না, না। তার গায়ের রং মলিন হয়। চোখ বসে কোটরে। পেটপুরে খায় না। আনমনে ঘোরে। মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে কম। আস্তে উদাসীন পথ হাঁটে। তারপর তাকে কালরোগে ধরে।

সেই রোগের ঘোরে একদিন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—খড্ডা! আমি খড্ডা যাব! সে ছটফট করতে থাকল। আমাকে খড্ডা নিয়ে চল!

খড্ডা! লোকেরা অবাক। কিন্তু সেই রাতেই ছেলেটা মারা গিয়েছিল। এ এক গুহ্যতত্ত্ব।—

সালমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—খড্ডার নাম সেই পেত্থম শুনলাম আমরা। ও মোড়ল! এবারো বলো তোমরা, খড্ডার কথা শুনেছিলে, না শোননি? হলফ করে বলো দশের থানে—মোনে পড়ে কী পড়ে না কারুর?

কয়েকটি কণ্ঠ সাড়া দেয়—হুঁ। মোনে পড়ছে বটে। খড্ডা।

সালমা বলে—ছেলেপুলেদের মুখে তখন জানা গেল, হাতির মাউত অহমত খাঁয়ের কাছে খড্ডার গল্প শুনেছে। সে নাকি আজব জায়গা। বড় এক শহর-নগর জায়গা। হীরের গাছে মোতির ফুল। পঞ্চমাণিক জ্বলে শহরের মাথায়। আলোয় আলোবন্ন সব। পশুপক্ষীরা কাড়ে মানুষকে। অহমত খাঁ বলেছিল খড্ডায় কে যাবে তো এস! তাই না জুলুভাই?

জুলু বুড়ো বলে—হায় ভুলো মন! আমি, অতন, আর হাসু মিলে তিনজনাতে তখন ফের গেলাম লবাবের বাড়ি। গিয়ে শুনি, মাউত নাই। ক্যানে নাই, কী বিত্তেন্ত—কেউ বললে না। তখন ফিরে এলাম।

সালমা চেঁচিয়ে ওঠে—সেই খড্ডা!

চিন্তিত আব্বাস মোড়ল ঘড়ঘড় করে বলে—ছেলেগুলোনকে পাঠালাম বড় মুখ করে। যদি খড্ডার হদেশ পায়, কালুডিহির গৈরব।

উদ্বিগ্ন ওহিদ বলে—কিন্তু তেমন জায়গা কি ভূভারতে আছে গো?

প্রশ্নটা সালমার দিকে। কিন্তু বুড়ি চুপ। জবাব দেয় অন্যরা—আছে, আছে। থাকবে বইকি। খোদার পিথিমিটা তো ছোট জায়গা লয়। কত আজব জিনিস আছে। মোন বলছে, খড্ডা আছে।

তখন মোড়ল সাহস পেয়ে বলে—হুঁ, আমরা চাষী মুরুক্ষু মানুষ। কতটুকু বা চিনি জানি। খড্ডা আছে।...

বদরুবুড়ো চুপ করলে বললাম—তারপর!

সে একটু হাসল।—তাপরে আর কী?

—মোষের গাড়ি নিয়ে গেল ওরা...

—গেল তো কী হল? বুড়ো আমার অজ্ঞতা দেখে হাসল আবার। খড্ডার খবর পেলে তো? সোনাতলার গোমস্তামশাই খড্ডার নাম শোনেনি। তার বাড়িতে গাড়ি রেখে তিনদিন ধরে বড়-বড় জায়গায় ওরা ছোটাছুটি করে বেড়ালো। কেউ বাপের জন্মে খড্ডা শোনেনি। অগত্যা ওরা ফিরে এল। সেই শোক সামলাতে অনেকদিন লেগেছিল, বাবা। বুঝলে? মহাশোক। অত শোক কালুডিহিতে আর দেখিনে? সবাই দুঃখ করে ডাকের পিওনকে গাল দিত শত্তুর বলে। জোয়ানরা শাসাত—এবার ডাকের পিওন এলে পুঁতে ফেলব।

এইসময় হঠাৎ কালুডিহির সেকালের লোকের মতই আমার মাথায় 'ফোম' জাগল। বললাম—আচ্ছা বুড়ো, কথাটা খড্ডা, না খড়দা?

বদরু আমার দিকে নিষ্পলক তাকাল। তারপর জোরে মাথা নাড়ল।—নাঃ, খড্ডা!

—তোমরা ভুল শুনেছিলে হয়তো!

—আমি তখন ছোট। তাহলেও পষ্ট মনে আছে। ডাকের পিওন বললে খড্ডা!

—উঁহু, খড়দা বলেছিল। নিশ্চয় ওটা খড়দা!

বুড়ো অবাক হয়ে বলল—খড়দা! সে আবার কোথা?

—দেখ, কলকাতার কাছে খড়দা বলে একটা জায়গা আছে। মামোদ আলি...

বদরু হাসবার চেষ্টা করে বলল—বাবা, সে আজ থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর আগের কথা। আর তুমি যে বলছ ওই জায়গাটা খড্ডা। বেশ, তাহলে বলো—সেখানে হীরের গাছে মানিক ফলে? লগব-শহরের মাথায় পঞ্চমানিক জ্বলে? পশুপক্ষী মানুষকে রা কাড়ে? খড্ডা জিনের দেশ। মামোদ আলিকে জিনে লিয়ে গিয়েছিল। আসলে ডাকের পিওন ভুল করে একটা উড়োচিঠি এনেছিল। বুঝলে না?

এতক্ষণে বুঝলাম। কিংবদন্তীর দেশ খড্ডা কখনও খড়দা হবে না কালুডিহির মিথে। এই মিথ বয়ে নিয়ে গোরের দিকে ঠুক ঠুক করে পা ফেলছে কালুডিহির ব্যাসমুনিরা। তাদের মৃত্যুর পর খড্ডা চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর থেকে যৌথ আবেগ, মমতা ও বিষাদে আর কেউ অন্বেষণ করবে না কোনও নিরুদ্দিষ্ট মামোদ আলিকে। কেউ রাতভর এই দশের থানে পিদীম জ্বেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে না—আহা ছেলেটা! কালুডিহির অত সুন্দর ছেলেটা আর ফিরে এল না। অথচ কত ছেলে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে কোনও পঞ্চমানিকজ্বলা শহর-নগরের টানে।...

কালবেলা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

একটি লোক একজোড়া হাঁস, একটা কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। হাঁস দু'টো সারাদিন জলার ধারে কাদা খুঁচত, কোঁত কোঁত করে কেঁচো খেত, কখনও-সখনও ডাঙায় উঠে তালশাঁসের মত ঠোঁট দিয়ে কুরকুর করে নিজের গায়ে বিলি কাটত। সন্ধ্যা হলে লোকটা যখন লাঠি হাতে এদিক-ওদিক লক্ষ করে ডাকত, আঃ আঃ আঃ— তখন ওরা খুট খুট করে হেঁটে এসে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত হতো। আর, কুকুরটা সারাদিন গা-গড়িমসি করে আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করত। কখনও আবার দাওয়ার পাশে বহুকালের পুরনো যে বস্তাটা পাতা আছে তার ওপর বসে হাই কাটত। হাই কাটত, ঝিমোত, ঘুমোত। রাত্রি হলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানান দিত, ও আছে। লোকটা কুকুরটাকে বলত, শালা শুয়রের বাচ্চা থাকিস কোথায়, এ্যাঁ? কুকুরটা তখন ঘড়ঘড় করে সোহাগ-সোহাগ ভাব দেখাত। তবে মেয়েমানুষটার কথা একটু আলাদা। মেয়েমানুষটা ভাত রাঁধত চুল বাঁধত, গা ধুত, আবার কদাচিৎ আদুরে আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কইত। লোকটা ওকে আদুরি নামে ডাকত। বলত, আদুরি, তামাক সাজ।

তা, সেই হাঁস দুটো কুকুরটা আর মেয়েমানুষটা এদের নিয়েই এ গল্প, তবে লোকটার কথা দিয়েই শুরু করি। লোকটা একটা উঁচু মতন মাচা বানিয়ে নিয়েছিল। তিন মানুষ উঁচু। এত উঁচু যে পুরো একটা মাঠ ছুটোছুটি না করেই ও মাঠের আনাচ-কানাচ নজরে-নজরে রাখতে পারত। প্রত্যেক দিন রাত্রে মাচায় বসে ও হঠাৎ-হঠাৎ টিন পেটাত। জানান দিত, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ওই চোয়াড়ে লম্বা চেহারাটা, ওর ওই ঘোলা-ঘোলা মরা মাছের মত চোখ জোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরির রঙের মত কাটা দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম চাষাড়ে-চাষাড়ে গন্ধটা।

লোকটা একটা ঝুড়ো-বুড়ো একচালায় বাস করত। চালার কোণে হামেশাই চড়ুই এসে ঘর বেঁধে ডিম পাড়ত। লোকটা এমন নিষ্ঠুর ছিল যে, ডিম ফুটে কচি-কচি কুশি-কুশি ছানা হলেই তুলে নিয়ে ও কুকুরটাকে দিয়ে খাওয়াত। মেয়েমানুষটা অর্থাৎ ওই আদুরি একবার ভীষণ দাপাদাপি করেছিল তাই নিয়ে। লোকটা তখন রামদা নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল

ওর দিকে, শালী, ফের যদি বকবক করবি, তো তোকেও কুকুর দিয়ে খাওয়াব। লোকটা এভাবে নিষ্ঠুর হতে পেরে মনে মনে খুব খুশি হতো। কিন্তু কুকুরটা যদি হাঁস দু'টোকে তেড়ে যেত তা হলেও ও সইতে পারত না। একবার, সে মাস ছয়েক আগের কথা, কুকুরটা ওর অগোচরে একটা হাঁসের বাচ্চা চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল, তাইতে ও দু'হাতে ওটাকে তুলে ধরে এমনভাবে আছড়িয়েছিল যে সেই থেকে কুকুরটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একবার, সে মাসখানেক আগের কথা, হাট থেকে একটা মুরগি এনে জবাই করবার সময় ও পেট চিরে আদুরিকে দেখিয়েছিল। দেখিয়েছিল ঠিক কোন জায়গাটায় কেমন ভাবে ডিম থাকে। সেই রাত্রে আদুরি ওকে বলেছিল, তোমার প্রাণটা যেন পাথরের। লোকটা বলেছিল, আমার ইচ্ছে হয় জ্যান্ত মেয়েমানুষের পেট চিরে দেখতে কেমনভাবে ওখানে রক্তে চর্বিতে বাচ্চাটা লুকিয়ে থাকে।

লোকটার একচালা ঘরটার চাল বেয়ে বর্ষায় জল গড়াত। তাইতে, খানকয়েক ক্যানেস্তারা টিন গুঁজে তাপ্পি দিয়ে রেখেছিল ও। জলপড়া বন্ধ হলে, চালার পেছন দিকে যে ছাইগাদা সেই ছাইগাদায় ও বাঁশ পুঁতে ঘরটাকে ঠেকা দিয়ে রাখত। একটা দু'টো তিনটে, তিনটে পাঁচটা সাতটা, ঠেকা খেয়ে খেয়ে ঘরটা কেমন জর্জর হয়ে থাকত। যেন সারা গায়ে বিষ-ব্যথা নিয়ে কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। আদুরি বলত, যেমন তুমি শ্যামসুন্দর তেমন তোমার ললিতে। লোকটা বলত, দালান ধুয়ে জল খাব নাকি? আমার মত লোকদের এই বেশ।

সর্বোপরি লোকটার একটা মনিব ছিল। মনিববাবু থাকত আড়াই ক্রোশ দূরে একটা বামন-কায়েতের গ্রামে। গ্রামের বড় সড়কের পাশে মস্ত একটা পাকা বাহারে ধরনের বাড়িতে। মনিববাবু ওকে বলত, হারামজাদা ছোট জাতের কম্ম তো, কত আর হবে। বেটা জাত চাড়াল।

অথচ লোকটা তাতে দুঃখ পেত না, কারণ ও জানত ওর বাপ চাড়াল, মা চাড়াল, ও নিজেও তাই। কিন্তু আদুরি একদিন যেই না ওকে চাড়ালের গুষ্ঠি বলে গালি পাড়ল অমনি ও লাফিয়ে উঠে এমনভাবে মুখ চেপে ধরেছিল যে, মেয়েমানুষটার চোয়াল যেন হাতের মুঠোয় চিপসে গিয়েছিল। তখন রাত্রি ছিল, তাই ও বুঝতে পারেনি ওর হাতটা যে চটচট করে ভিজে যাচ্ছিল তা লালায় না রক্তে। ভেজা হাতটা মাটিতে মুছে নিতে নিতে গজগজ করে ও শুনিয়ে দিয়েছিল, আমি চাড়াল, তাই তুই বর্তে গেলি। আমি চাড়াল বলেই তোর মত ঢ্যামনা মাগী পালতে পারি। বুঝলি?

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি কয়েক জোড়া হাঁস আছে?

লোকটা বলল, একজোড়া। একটা এবার ডিম পাড়বে।

ডিম পাড়বে। বেশ বেশ। সেলামিটা ভুলিস না যেন, বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, সেই

রাত্রে মেয়েমানুষটাকে আদর করতে করতে ও এক সময় সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁসের গল্প শোনাতে লাগল। একটা রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ত। বুঝলি আদুরি, একটা রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ত। তাই দেখে লোভে পড়ে হাঁসটার পেট চিরে ডিম বার করতে গিয়েছিল এক আহাম্মক, বুঝলি আদুরি, ডিম বার করতে গিয়েছিল এক আহাম্মক। কুকুরটা তখন উঠানে পড়ে পরিত্রাণে চেঁচাচ্ছিল, আর হাঁস দু'টো তখন গায়ে গায়ে এক হয়ে কাঠের বাক্সটার মধ্যে বসেছিল। খানিক বাদে লোকটা টিন পিটিয়ে নিজেকে জানান দেবার জন্য ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি কুকুর আছে?

লোকটা বলল, একটা।

একটা। বেশ বেশ। মাংস-টাংস খেতে দিস, তেজিয়ান হবে। বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, দাওয়ার ওপর কুকুরটাকে ঝিমোতে দেখে আপাদ অঙ্গ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। এই শুয়রের বাচ্চা, তোকে না বলেছি ঘর-দোর পাহারা দিবি? ঝিমচ্ছিস যে বড়? তোকে না বলেছি সজাগ থাকবি, ঘুমুচ্ছিস যে বড়? তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, লোকটা তাই হাঁস দু'টোর খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল।

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, আবার আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি একটা মেয়েমানুষ আছে? বলিসনি তো কখনও?

লোকটা বলল, আছে। ভাত রেঁধে দেয়, তামাক সেজে দেয়।

দেয় বুঝি? বেশ বেশ। তবে মেয়েমানুষের কথায় বেশি ওঠবস করিস না, বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথানিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, লোকটা ডাকল, আদুরি? আদুরি এসে সামনে দাঁড়াতেই, তামাক সাজ। তামাক সাজতেই, জল দে। জলের ঘটি এগিয়ে ধরতেই, এখানে বস। বসতেই, উঠে দাঁড়া। দাঁড়াতেই ফ্যাল ফ্যাল করে আদুরির দিকে তাকিয়ে ও যাচাই করে নিল সত্যি সত্যি ও মেয়েমানুষের কথায় ওঠবস করে, না ঠিক উলটোটা।

তখন খা খা রোদ চড়েছিল। লোকটা বেরিয়ে পড়ল মাঠময় একবার টহল দেবার জন্য। মাঠের গোটাটাই এক বুক উঁচু পুষ্টু-পুষ্টু ধান চারা। ডগা কচি-কচি ধানপাতা গায়ে পায়ে বুক হাতে পরশ কাটছিল। ভেজা ভেজা সবুজ পাতার গন্ধ আসছিল। নরম নরম আলের মাটি পায়ের নিচে পিছলে পড়ছিল। লোকটা এমন ধানক্ষেতের মধ্যি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে কেমন বোকা ভাবতে লাগল। কারণ, পুবে তখন

ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও অথচ লোকটা ধান-গাছের কথা না ভেবে ওর হাঁসজোড়া, কুকুরটা আর মেয়েমানুষটার কথাই ভাবছিল।

এই যেমন, লোকটার কিছুদিন আগেও কয়েক জোড়া হাঁস ছিল। সব হাঁস খুইয়ে গিয়ে এখন কেবল দু'টোয় এসে দাঁড়িয়েছে। এ হাঁস দু'টো আগের দু'টোর ডিম থেকে ফুটিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা করে পেতে হয়েছে ওকে। আগের একটা শেয়ালে খেয়েছে, আর একটা রোগে ভুগে মারা গেছে। এ-দু'টো যে এখনও আছে তা ওর নেহাতই কপাল ফেরে। মাদীটা এবার থেকে ডিম পাড়বে। হপ্তায় যদি দু'-জোড়া করেডিম দিতে থাকে, তবে, তার থেকে একজোড়া মনিববাবুকে দিয়ে আসতে হবে। আর বাকি একজোড়ার একটা বিক্রি করে পয়সা আনতে হবে। বাকি থাকে একটা। এই একটাকে যদি খাওয়া যায়? খেলে তো ফুরিয়েই গেল। তারপর খেই হারিয়ে লোকটা কুকুরটার কথা ভাবতে লাগল।

কুকুরটা বড় লোভী। কুকুরটাকে ও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের দাওয়ায় ঠাঁই দিয়েছিল। ভেবেছিল, বাড়িতে একটা কুকুর থাকলে চোর-বদমাশ তফাৎ থাকবে। কুকুরটা ওর পাহারাদারের মত, যেমন ও নিজেই মনিববাবুর ধানক্ষেতের পাহারাদার। তা, হারামজাদার নজর যেন সবসময়, ওই হাঁস দু'টোরই দিকে। বেটা হাড়ে হাড়ে শয়তান হয়ে উঠেছে। পথে কুড়নো কুকুর, বেশি তেড়িবেড়ি করলে পথেই আবার তাড়িয়ে দিতে হবে। কুকুরটার একটা সুরাহা হতে ও মেয়েমানুষটার কথা ভাবতে লাগল।

মেয়েমানুষটাকে ও পঞ্চাশ টাকা নগদ ঢেলে কিনে এনেছিল এক বাপ-মায়ের কাছ থেকে। লোকে যেমন পয়সা দিয়ে বাঁশি কেনে, কি বেহালা কেনে, কি কলের গান কেনে তেমনি ও পয়সা দিয়ে, পয়সা দেবার আগে বাপ মায়ের সঙ্গে অনেক দর কষাকষি করে, মেয়েমানুষটাকে কিনে এনেছে। লোকে যেমন বাঁশি বাজিয়ে, কি বেহালা বাজিয়ে, কি কলের গান বাজিয়ে সুখ পায়, ও তেমনি সুখ চেয়েছিল। সুখ সাধ আহ্লাদ পুরোপুরি মেটাবার জন্য মেয়েমানুষটার নাম রেখেছিল ও আদুরি। আদুরিকে কাছে পেয়ে ও বুঝল, যতদিন কাছে না পেয়েছিল ততদিনই সুখ ছিল। মেয়েমানুষ ঘরে এসে লোকটার সব সুখ নিজের করে নিয়েছে, ফলে ও অসুখী হয়ে গেছে। কিন্তু এমন হল কেন? লোকটা আবার ভাবতে লাগল। পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও অথচ লোকটা ধান-গাছের কথা না ভেবে নিজের জীবনের গণ্ডগোলগুলির কথা ভাবতে লাগল।

যদি ও হাঁস দুটো না পালত? না পাললে ডিম বিক্রি করার কথা ওকে হয়তো ভাবতেই হত না। ফলে কিন্তু ওর দু'চার পয়সা আয়ের পথ বন্ধ হতো। হাঁস দুটো ওর না থাকলে পাহারাদার কুকুরটারও দরকার হতো না। কুকুরটা ওর না থাকলে কুকুরটাকে আদর-আত্তি কিংবা খেতে দেওয়ার কথাও ভাবতে হতো না। তখন ওর কেবল ওই মনিবের দয়ায় বাঁচতে হতো। কেবল ওই মনিবের দয়ায় বাঁচতে হলে তখন ও কাউকে আর দয়া দেখাতে পারত না। ফলে ও আদুরিকে নিজের ঘরেও

ঠাঁই দিতে পারত না। আদুরিকে না পুষতে হলে; ও নিজের মত, নিজের ঘরে, নিজের হয়ে থাকতে পারত।

অর্থাৎ, ও লক্ষ করল, কান টানলে যেমন মাথা আসে, ঠিক তেমনিভাবে, হাঁস দু'টো কুকুরটা, মেয়েমানুষটা ও নিজে, ওর মনিববাবু সব কেমন একটার সঙ্গে একটা জড়ানো। একটাকে টানলে আর একটা আসে। ভারি মজার ব্যাপার। খানিকটা গোলকধাঁধার মত। গোলকধাঁধা বলেই ও অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। ভাবল, আর বোকার মত চারপাশে তাকাল। কারণ, পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও। অথচ লোকটা ধানগাছের কথা না ভেবে গোলকধাঁধার জটে আটকা পড়ে গিয়ে একসময় খাপ্পা হয়ে গেল। লোকটা তখন বিষ ব্যথায় জর্জর ঘরটার কাছে ফিরে আসে। এসে প্রথমেই ওর নজর পড়ে হাঁস দু'টোর দিকে। একটা আর একটার গা ঠোকড়াচ্ছে। অন্য সময় হলে তাকিয়ে দেখত লোকটা। এখন সব কেমন যেন গুলিয়ে আছে, ডাকল, আদুরি? আদুরি?

আদুরি তখন আঙুলের নখে রং মাখছিল, ছুটতে ছুটতে এল, কি?

রামদা দে।

কেন? রামদা কেন? রামদা কি হবে?

হাঁস দু'টোকে জবাই করব। বাঞ্চোতরা কেবল ফষ্টিনষ্টিই জানে, ডিম পাড়ছে না কেন? এ্যাঁ?

সত্যি সত্যি হাঁস দু'টোকে জবাই করে ফেলত লোকটা, নেহাৎ আদুরি কেমন কৌশল করে জলার ধারে ও দু'টোকে তাড়িয়ে দিল। ফলে, লোকটা আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

ভাল কথা, হাঁস দুটো, কুকুরটা, মেয়েমানুষটা আর মনিববাবু ছাড়া লোকটার জনাকয়েক বন্ধু ছিল। বন্ধুরা সব যেমন হয়, নেহাৎ-নেহাৎ বন্ধু। অর্থাৎ লোকটা যখন মেজাজে থাকে তখন ওদের বলতে শোনা যায় মেজাজ-মেজাজ কথা। লোকটা যখন বেজারে থাকে তখন ওদের বলতে শোনা যায় বেজার-বেজার কথা।

একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে, এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার?

কার আবার, মনিবের, অর্থাৎ জমি যার তার।

উঁহু, ভেবে বল ভেবে বল।

লোকটা তখন অনেকক্ষণ চিবুকের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে ভাবল। কার হবে? কার হতে পারে? ওঃ হো, মনে পড়ল, বলল, যে চাষ করেছে তার, অর্থাৎ চাষীর।

উঁহু, চাষীরও না, ভেবে বল ভেবে বল।

লোকটা এবার অনেকক্ষণ হিসেব কষে ভাবল। কার হবে? কার হতে পারে? ওঃ হো, মনে পড়ল, বলল, যে খাবে তার, অর্থাৎ খরিদ্দারের, অর্থাৎ যার ঘরে চাল থাকবে না তার।

উঁহু, তারও না, ভেবে বল ভেবে বল।

লোকটা বলল, তুমিই বল।

বলব? বলল, সবই হচ্ছে তার, অর্থাৎ আমাদের খোদার, তোমাদের ভগবানের।

আর একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার?

লোকটা অমনি টপ করে বলে ফেলল, ভগবানের অর্থাৎ খোদার।

উঁহু, অমনি সে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। এসব হল শেখানো কথা। আসলে কাগজ পত্রে এ হচ্ছে তোমার মনিবের, কিন্তু বেআইনিভাবে তোমার।

আমার? লোকটা কেমন হকচকিয়ে গেল।

হ্যাঁ তোমার, যা পার হাতিয়ে নাও, বুঝলে হে? হাতিয়ে নাও।

আর একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার?

লোকটা অমনি টপ করে বলে ফেলল, কাগজপত্রে মনিবের, বেআইনিভাবে আমার।

উঁহু, অমনি সে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। এসব হল শেখানো কথা। আসলে এ হচ্ছে ভাগ্যের। তোমার ভাগ্যে নেই, তাই তুমি পাচ্ছ না। মনিবের ভাগ্যে আছে তাই সে পাচ্ছে।

এমনি ধরন লোকটার অনেকজন বন্ধু ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কখনও-সখনও দেখা হত। কখনও হাটে, কখনও গাঁয়ে, কখনও পথে। হাট কিংবা গাঁ কিংবা তেমন-তেমন পথ সবই ওর বিষ জর্জর ঘর থেকে অনেক দূরে দূরে ছিল। কারণ, ওর মনিবের ইচ্ছে ছিল হাট থেকে, গাঁ থেকে কিংবা তেমন-তেমন পথ থেকে ও দূরে থাকে। তাই ও লোকালয় থেকে দূরে যেখানে চারদিকে ধানক্ষেত আর মাঝখানে এই টিলার মত উঁচু জায়গা, এই জায়গাটাতে ঘর বেঁধে নিয়েছিল। আর মনিববাবু ওকে সাবধান করে দিয়েছিল, শালিক কি চড়ুই যেন ঠোঁটে করে ধান নিয়ে না পালায়। শালিক কি চড়ুই কি মাছি কি পিঁপড়ে কিছুই ওর নজর এড়াত না। কারণ, রাত্রে ও মাচায় উঠে টিন পেটাত, দিনে ও লাঠি হাতে সারা মাঠে ঘুরে বেড়াত। একবার ও লক্ষ করল ঝাঁকে ঝাঁকে বানর আসছে। ও ঠিক করল একে একে সব বানর মেরে ফেলবে। প্রথমে একটাকে হাতের কাছে পেয়ে যাওয়ায় লাঠি পিটিয়ে মেরে ফেলল। হঠাৎ একটা বানর মারায় ওর কেমন মজা লাগল। মরা বানর পিঠে চাপিয়ে মনিববাড়ি দেখাতে গেল।

মনিব তখন গড়গড়া টানছিল। লোকটাকে দেখতে পেয়ে বিকটভাবে হেসে উঠল। বলল, হারামজাদা জাত চাড়ালের কম্ম দেখ, ভাগ ভাগ। রেঁধে খা গে যা।

লোকটা তাতে বুদ্ধু হয়ে পালিয়ে এল। এসে সড়ক ধরে হাঁটতে লাগল। তখন মরা বানরের আঙুলগুলি পিঠের ওপর আঁচড়াচ্ছিল। লোকটা, খানিকদূর এগিয়ে এসে লক্ষ করল, ওর কুকুরটা কিভাবে যেন টের পেয়ে পিছু নিয়েছে। কুকুরটা তখন ঘেউ ঘেউ করে ডাকছিল।

আরও খানিক এগিয়ে এসে লোকটা লক্ষ করল ওর মুখোমুখি একজন বন্ধু আসছে। বন্ধু বলল, সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানর কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! জানো না জীব হত্যায় পাপ হয়।

জানি, তবু মারলাম। লোকটা না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে পিছনেই আসছিল। পথটা যেখানে হারিয়ে গেল সেখানে হাট। হাট তখন গমগম করছিল। মেলাই লোক, মেলাই জন। তার মধ্যে ও আর একজন বন্ধুকে দেখল। বন্ধুটি একটি এসে শুধোল সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! বেশ বেশ। মানুষের ক্ষতি করে যারা তাদের মারলে পুণ্যি হয়।

লোকটা আবার না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। কুকুরটা তেমনি ঘেউ ঘেউ করে পিছনেই আসছিল। হাটটা ফুরুলে আবার একটা পথ, সেই পথে আরও খানিক এগিয়ে এসে একটা গ্রাম। সারা গ্রাম আম জাম জারুলে ঢাকা ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। লোকটা খানিক জিরোবে বলে একটু বসল। মরা বানরের আঙুলগুলি পিঠের ওপর আঁচড় কাটায় পিঠটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছিল। এমন সময় আবার আর এক বন্ধু। সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! ছি ছি, না মারলেই পারতে। মারতে হয় তো হাতি মারবে এসব মারা শোভা পায় না তোমার। তার চে এক কাজ কর না।

কি?

ফাঁদ পেতে যত খুশি ধরে ধরে চালান দাও।

দেব। লোকটা আবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। কুকুরটা অবার পেছন পেছন আসতে লাগল। আম জাম জারুলে ঢাকা ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গ্রামটা পেরুলে মাঠ। ধানবনের মাঠ। সরু-সরু পেছল-পেছল আল। আল ধরে সাপের মত এঁকেবেঁকে লোকটা একসময় অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে-হেঁটে নিজের ডেরায় এসে পৌছাল। তারপর কি খেয়াল হল লম্বা একটা বাঁশের মাথায় বানরটাকে বেঁধে বাঁশের গোড়া ধানবনের মধ্যে পুঁতে রাখল।

আদুরি বলল, কি করছ? গন্ধ হবে না? পচা গন্ধে টিকতে পারবে?

লোকটা বলল, তামাক সাজ। ভাবখানা যেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। যা ইচ্ছে তাই করতে পারার ক্ষমতা আছে।

কুকুরটা তখনও বাঁদর ঝোলানো বাঁশটার কাছে বসে। হাঁস দু'টো কোথায়? তামাকে দু'টো লম্বা-লম্বা টান দিয়ে লোকটা হাঁসের বাক্সের কাছে এসে থমকে পড়ল। একজোড়া

ধবধবে ডিম দেখা যাচ্ছে। আদুরি, আদুরি, লোকটা চেঁচিয়ে জানান দিল, একজোড়া ধবধবে ডিম দেখা যাচ্ছে।

লোকটা তখন খুশিতে আটখানা। এত খুশি যে কি করবে ভেবে না পেয়ে ডিম দু'টো গামছায় বেঁধে ছুটতে ছুটতে মনিববাড়ি দিয়ে এল।

এমনিভাবে দিন আসে দিন যায়। রাত আসে রাত যায়। আঁধার যায়, আলো যায়। তা মেজাজ যদি ভাল থাকে, সবাই ভাল। মেজাজ যদি খারাপ থাকে, সবাই খারাপ। তাই আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু, কাল যে শত্রু পরশু সে বন্ধু। বন্ধুরা সব এমন হয়। কিন্তু হাঁস দু'টো কুকুরটা মেয়েমানুষটা রোজই বন্ধু রোজই শত্রু। আর মনিববাবু বন্ধুও না শত্রুও না। মনিব ওর জীবন। জল যেমন জীবন, বায়ু যেমন জীবন মনিব তেমনি জীবন। এসব কথা সত্যি সত্যি ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে ভাবত। কিন্তু একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, লোকটার একদিন ব্যামো হল। ভীষণ ব্যামো। এমন ব্যামো যে লোকটা যেন আজ যায় কাল যায়। যায়-যায়। তাই, একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় কুকুরটা দাওয়া ছেড়ে নড়তে চায় না। কেঁউ কেঁউ করে সারাক্ষণ কাঁদে। জানায় ওর বড় ভাবনা হয়েছে। লোকটা যদি মরে যায় ও তখন কি করবে!

মেয়েমানুষটা সারাক্ষণ বিছানার পাশে বসে থাকে। একদৃষ্টে বোবার মত তাকিয়ে থাকে, জানায় যে ওরও বড় ভাবনা হয়েছে। লোকাট যদি মরে যায় ওর তখন কি• হবে! হাঁস দু'টো গা ছেড়ে এদিক-ওদিক করে। কাঠের বাক্সটার কাছে এগিয়ে এসেও ঢুকতে চায় না; কোথায় যেন একটা বেচাল হয়েছে।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় মনিব একদিন পাইক পাঠাল। হ্যাঁ হে, পাইক বলল, আর যে বড় টিন পেটাও না রাত্রে?

লোকটা তখন প্রলাপ বকছিল, বলল, বাঁদরের চোখ দু'টো এখনও ওই বাঁশের ডগায় ঝুলছে। আদুরি, ও দু'টোকে নিয়ে এসে কুকুরটাকে খেতে দে। বাঁদরের চোখ দু'টো এখনও....

আদুরি বলল, শোন কথা? বাঁদরটাকে কবেই তো বাপু চিল শকুনে খেয়ে গেছে।

পাইক বলল, শোন কথা! আমি যে বলছি টিন পেটাও না কেন, তা, কথা বুঝি আর কানে যায় না! বলতে বলতে ঘর ছেড়ে দাপাতে দাপাতে বাইরে এল।

কুকুরটা তখন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছিল, হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল। দাপাতে-দাপাতে পাইক যখন চলে যাচ্ছিল তখন ওর নজরে পড়ল হাঁসের বাক্সটা। বাক্সটাও খোঁচা দিয়ে উল্টে দিয়ে গেল। আর অমনি তখন হাঁস দু'টো পড়িমরি ধানক্ষেতের দিকে পালিয়ে গেল।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায়, একদিন স্বয়ং মনিব এসেই হাজির। হ্যাঁ হে, মনিব বলল, আর যে বড় টিন পেটাস না রাত্রে।

লোকটা তখনও প্রলাপ বকছিল। বলল, একজোড়া হাঁস সোনার ডিম পারত।

চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ, লোকটা এমন আহাম্মক যে, চাকু দিয়ে হাঁসটার পেট চিরে ফেলেছে। চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ...

আদুরি বলল, শোন কথা সোনার হাঁস বুঝি ডিম পারে! মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

মনিব বলল শোন কথা। হারামজাদা জাত চাড়ালটাই ডুবিয়ে মারল। লোকটার দিকে মুখ করে থুতু ছেটাতে ছেটাতে বাইরের দিকে চলে এল।

কুকুরটা তেমনি কেঁউ কেঁউ করে দাওয়ায় বসে কাঁদছিল। হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল। হাঁস দু'টো যেন সাড়া পেয়েছে আগেই, ধানবনের দিকে গা লুকাল।

একদিন যায় দু'দিন যায়, তিনদিন যায় লোকটা একদিন সুস্থ হল। উঠে বসল, হাঁটাচলা করল। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে লোকটা দেখল আর সব ঠিকই আছে, কেবল ধানের শীষে পাক ধরেছে। সবুজ সবুজ দুধেধান হলুদ রঙে রাঙা হয়েছে। লোকটার ভারি হালকা হালকা লাগতে লাগল। ধানের শীষে যেমনভাবে উদাস-উদাস বাতাস বইছিল তেমনিভাবে উদাস উদাস, বুকটা যেন হালকা হালকা লাগছিল। আর সব ঠিকই আছে, হাঁসের বাক্স, হাঁস দু'টো, দাওয়ার ওপর বস্তাটা, কুকুরটা। আর সব ঠিকই আছে, এমনকি ওর মেয়েমানুষটাও। লোকটা তখন মেয়েমানুষটাকে শুধোল, আদুরি, হাঁস দু'টো কি ডিম দেয় না?

দেয়। যা দেয় মনিব বাড়ি দিয়ে আসি।

আবার খানিকক্ষণ বাদে লোকটা শুধোল, আদুরি কুকুরটা আর পাহারা দেয় না?

দেয়। যা দেয় তোমাকেই, তাই তো দেখি।

আবার খানিকক্ষণ বাদে লোকটার মনে একটা সন্দেহ এল। ইচ্ছে হল শুধোয়, আদুরি, মনিবটা তোকে লোভ দেখায় না। বলে না যে—ভাবতে গিয়ে লোকটার কেমন খারাপ খারাপ লাগতে লাগল।

সেই রাত্রে মেয়েমানুষটাই একসময় ফিসফিস করে বলল, জানো, গা কেমন বিষ বিষ লাগে, গুলোয়। আর বেশিদিন বাঁচব না আমি, জানো।

তাই শুনে লোকটা ভীষণ ভয় পেল। পাথরের মত শক্ত হয়ে মেয়েমানুষটাকে আঁকড়ে রইল। এমনভাবে আঁকড়ে রইল যেন বোঝাতে চাইল, মনিবটার অনেক টাকা, অনেক বল। ও যদি চায় গোটা পৃথিবীকেই কিনতে পারে। তখন, আমার কি হবে। আমার দেখ, অল্প টাকা অল্প বল। আমার কি হবে। ও যদি চায়, হাঁস দু'টো, কুকুরটা মেয়েমানুষটা সব, সবাইকে কিনতে পারে। বল, আদুরি তুই বল, তাই বলে ও তোকেও কিনে নেবে!

আদুরি বলল, আজ তুমি পাহারা দেবে না?

লোকটা বলল, দেব। বলতে বলতে উঠে গেল ধানক্ষেত পাহারা দিতে।

তখন শিরশির করে বাতাস বইছিল, ধানবনের গোড়ায় গোড়ায় ব্যাঙ ডাকছিল, ধানপাতায় দোল খেয়ে ঝিঁঝি জ্বলছিল। তখন কাঠের বাক্সটার মধ্যে গায়ে গায়ে এক

হয়ে হাঁস দু'টো ঝিম খেয়ে বসেছিল। ছায়া দেখে চমকে চমকে কুকুরটা এদিকে-ওদিকে তেড়ে যাচ্ছিল। তখন টাকড়ায় বিষম লাগা রাত্রিটা যেন ভীষণ একটা বোঝার মত ঘাড়ে গর্দানে চেপে বসেছিল। লোকটা একপরতা টিন পেটাল। একপরতা জোনাকিগুলোকে জ্বলতে দেখল, নিবতে দেখল। একপরতা কুকুরটাকে ছুটতে দেখল। তারপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে যখন খুব উত্তেজনা এল তখন আবার টিন পিটিয়ে ও জানান দিল, জানান দিল, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ওই রোগা লম্বা চেহারাটা, ওর ওই ঘোলা-ঘোলা মরামাছের মত চোখজোড়া, ওর গায়ের ওই খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরি রঙের মত কাটা একটুখানি দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম রোগা-রোগা গন্ধটা।

একদিন যায় দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, একদিন গায়ে পড়ে এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জানো হে, সন্দেহ করা পাপ। পাপ যেন আগুনের মত। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জানো?

লোকটা বলল, জানি।

জানো, তবু কেন সন্দেহ কর?

কেন করি? জানি না।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় আবার একদিন গায়ে পড়ে আর এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জানো হে, ঈর্ষা বড় পাপ। পাপ যেন আগুনের মত। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জানো?

লোকটা বলল, জানি।

জানো, তবু কেন ক্ষোভ কর?

কেন করি? জানি না।

লোকটা সত্যি সত্যি জানত সন্দেহ, ক্ষোভ, ঈর্ষাই ওকে পুড়িয়ে মারছে। সন্দেহ, ক্ষোভ, ঈর্ষার মত আরও অনেক, অনেক কিছু পুড়িয়ে মারছে। জানত বলে নিজের ওপর বড় ওর ঘেন্না হত। বড্ড ওর বিরক্তি হতো। ইচ্ছে হতো গলায় ফাঁস দিয়ে মরে যায়, কিংবা রামদা দিয়ে কুচিয়ে কুচিয়ে কলজেটা ও কেটে ফেলে। যেন, তা হলেই সব আপদ চোকে। কিন্তু হায়রে, আপদ কি আর গায়ের ময়লা। অত সহজে যায়? যেমনভাবে ব্যামো, না চাইলেও ব্যামো হয়, তেমনভাবে আপদ, না চাইলেও আপদ আসে, আসবেই। লোকটা তাই ঝিমিয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে দুধেধান হলুদ হল, ডাটো হল। ধানের ভারে সারা বন নুয়ে পড়ল, শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে কাস্তে হাতে চাষীরা সব মাঠময় ভেঙে পড়ল। ধানের গুছি জাপটে ধরে প্রাণের সুখে গান ধরল। এমন যখন মাঠের হাল, লোকটা তখন বুঝল এবার ওর প্রয়োজন মিটবে। কারণ এবার মাঠের ধান, গোলায় উঠবে। এবার হয়তো মনিব ওকে ডেকে নিয়ে বলবে, এবার বাপু বিদেয় হ, বিদেয় হ।

তাই, যদি যেতে হয়, হাঁস দুটোকে ও সঙ্গে নেবে, কুকুরটাকে সঙ্গে নেবে, আর

মেয়েমানুষটাকেও সঙ্গে নেবে। নিয়ে, অন্য কোথাও, অন্য কোনও মনিব খুঁজে, অন্যভাবে, আবার কিছুদিন বাসা বাঁধবে। যেন, যা কিছু হোক ও তৈরি আছে। কারণ, হাঁস দু'টো এখনও যে ডিম পাড়ছে, কুকুরটা এখনও যে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে, মেয়েমানুষটা এখনও যে ভাত রাঁধছে, চুল বাঁধছে, তামাক সাজছে। এককথায় ও যখন উঠতে বলে তখন ওরা ওঠে, ও যখন বসতে বলে তখন ওরা বসে। এবং নিজের এই ধারণাগুলো যাচাই করে নেওয়ার জন্য সন্ধেবেলায় ও মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাকল, আঃ আঃ আঃ—আর অমনি খুট খুট করে হেঁটে এসে হাঁস দু'টো কাঠের বাক্সের মধ্যে উঠে বসল। গভীর রাতে মাচায় উঠবার আগে ও কুকুরটাকে খিস্তি করে বলল, থাকিস কোথায়, শালা শুয়রের বাচ্চা, এ্যাঁ? কুকুরটা অমনি ঘড়ঘড় করে সোহাগ-সোহাগ ভাব দেখাল। আর, ভোর হলে মেয়েমানুষটাকে ও কাছে ডাকল, আদুরি, আদুরি? আদুরি এসে সামনে দাঁড়াতেই তামাক সাজ। তামাক সাজতেই জল দে। জল দিতেই, এখানে বস। বসতেই উঠে দাঁড়া। দাঁড়াতেই লোকটা একগাল তৃপ্তির হাসি হাসল। কারণ, যেমনটি ও চায় তেমনটিই আছে।

সবুজ বরণ ধানের মাঠ হলুদে-সবুজে বাহার খুলে বসেছিল। দিনের আলোয় আকাশের নিচে যেন জাজিম পেতে বসেছিল। চাঁদের আলোয় রাতদুপুরে যেন তাল-তাল সোনা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে এমন মাঠ তছনছ হয়ে গেল। কাস্তে নিয়ে চাষারা যেন যুদ্ধ করে ধান কাটছে। লোকটা কেবল দেখল। এমন দিনে একজন এসে কু-মন্ত্র দিল, ওহে শুনছ, যা পার হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

পাপ হবে যে?

পাপ না করলে বাঁচে না কেউ, হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

পাপ হবে যে?

পাপ না করলে বাঁচে না কেউ, হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

এমন দিনে একজন এসে সু-মন্ত্র দিল, ওহে শুনছ, পরের ধন ওসব। মনে রেখ, মনে রেখ।

লোভ হয় যে?

লোভে পাপ, পাপে মরণ। মনে রেখ, মনে রেখ।

সেদিন রাতে আদুরি বলল, জানো, মনিব-বাড়ি গিয়েছিলাম।

কেন?

মনিব আমায় জোনাকি-রঙ নাকের ফুল দেবে বলেছিল।

কেন?

কেন কি, বকশিশ গো বকশিশ। বকশিশ জান না। হ্যাঁ গো, তুমি আমায় বকশিশ দেবে? দাও তো, একটা চাই।

কেমনবাবে বুকটা যেন চলকে উঠল। চোয়াল দু'টো চটচট করে চাক বাঁধল। হাতের সামনে কিছু একটা পেলে যেন এক্ষুনি তা মুঠো করে চেপে ধরে মেয়েমানুষটার চোখ

দু'টো গেলে দেয়। জাহান্নামের জীব, জাহান্নামেই পাঠিয়ে দেয়। কে একজন ভেতরে বসে কু-মন্ত্র দিচ্ছে, পাপ না করলে বাঁচে না কেউ। কে একজন ভেতর থেকে সু-মন্ত্র দিচ্ছে, সাবধান, সাবধান, পাপ করলে মরতে হয়।

আদুরি বলল, দেবে?

লোকটা বলল, কি?

তোমার ওই হাঁস দু'টো। মনিববাবু খেতে চায়।

এমন সময় লোকটা হঠাৎ মেয়েমানুষটার মুখ এমনভাবে চেপে ধরল যে হাতের মুঠোয় চোয়ালটা যেন চিপসে গেল। এখন রাত্রি, তাই ও বুঝতে পারল না হাতটা যে চটচট করে ভিজে যাচ্ছে তা লালায় না রক্তে। ভেজা হাতটা ও মাটিতে মুছে গজগজ করে শুনিয়ে দিল, আমার ইচ্ছা হয় জ্যান্ত মেয়েমানুষের পেট চিরে দেখতে, কেমনভাবে ওখানে রক্তে চর্বিতে বাচ্চাটা লুকিয়ে থাকে। আর দু'দিন যাক, তোর পেটটাই চিরব। বলতে বলতে টিন পিটিয়ে নিজেকে জানান দেবার জন্য উঠে গেল লোকটা মাচার দিকে।

সারাটা রাত মাচায় বসে লোকটা কেমন যেন নিথর হয়ে গিয়েছিল। বারকয়েক মুখের মধ্যে থুতু জমিয়ে বিজবিজ করে ফেনা কাটল, বার কয়েক সেই থুতু আকাশের দিকে তাক করে ছুঁড়ে মারল। ঝড়ো কাকলাল ধানক্ষেতের চেহারাটা এমন হল কবে! হায়রে, সারা মাঠ খা খা করছে। এত বাতাস কার জন্য গো, কার জন্যে। আহা, এই যে চাঁদের আলো, কার জন্যে গো কার জন্যে। ছিঁটে-ফোঁটা ধানের কণাটাও রেখে যায়নি ওরা। খা খা করছে, ধু ধু করছে। আহা গো, এমন সব পুষ্টু পুষ্টু ধানের চারা কবে ওসব বুড়িয়ে গেল কবে ওসব ফুরিয়ে গেল! লোকটা একবার পাগলের মত হাসল। কারণ, এখন তো আর ওর মাচায় বসে রাত্রি জেগে টিন পেটাবার মানেই হয় না। তবু ও জানান দিচ্ছে, হায়রে, তবুও জানান দিল, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ওই চোয়াড়ে লম্বা চেহারাটা, ওর ওই ঘোলা-ঘোলা মরামাছের মত চোখ জোড়া, ওর গায়ের ওই খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরির রঙের মত কাটা দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম চাষাড়ে-চাষাড়ে গন্ধটা।

লোকটা তারপর বসে বসে নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়ল। আকাশের চাঁদটাকে সাক্ষী মেনে অনেক কথা বলতে চাইল। হাতের পাঞ্জা দু'টো বারে বারে মুঠ করল, খুলে ধরল। ঘোলাটে চোখে সারা মাঠ দেখতে দেখতে একসময় ওর মনে হল ও যেন একটা কুশ পুতুল। যে পুতুলটার মুখ, পুরনো হাঁড়ির মত তুম্বো, ভীষণ কালো, কালো আর ঠনকো। যে পুতুলটার কালো মুখে চুন বুলিয়ে চোখ মুখ দগদগে করে এঁকে নেওয়া। যে পুতুলটার গায়ে একটা আলখাল্লা চড়ানো। আলখাল্লার হাত দুটো লম্বা ভাবে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকে, নড়েও না চড়েও না। বাতাস পেলে কাঁপে, না পেলে কাঁপেও না। আলখাল্লার নিচে একটা মেরুদণ্ড। শুধু দণ্ড, মেদ নেই, মাংস নেই, ফুসফুস নেই, হৃদয় নেই, যে পুতুলটাকে কাক চড়ুই তাড়াবার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা

হয়েছিল। সোনার ফসল ফুরিয়ে যেতেও পুতুলটা অমনি দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটার তখন চোখের ডিম দুটো ঝাপসা হয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসছিল। এমন সময় ও লক্ষ করল, কুকুরটা কেবল পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছে। হাঁসের বাক্সটা নিথর। বাক্সের ওপর গুটিকয় জোনাকি বসেছে। জোনাকিগুলো জ্বলছে, নীল বর্ণ কুচি কুচি মুক্তোর মত, জ্বলছে। একটানা ঝিনঝিন করে ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা শিরশির করে বাতাস বইছে। একটানা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভেজা-ভেজা বরফ-চাঁদের আলো ঝরছে। ঝরতে ঝরতে একসময়, সব আলোই ফুরিয়ে গেল। তখন ভোর হল। সারা আকাশে আগুন লাগলে যেমন হয়, তেমনি ধারা রাঙা হল, ফরসা হল। লোকটা তখন মাচা থেকে নেমে এল। নেমে এসে প্রথমেই সে হাঁসের বাক্সটার দিকে এগোল। বাক্সের মধ্যে হাঁস দু'টো নড়াচড়া করছিল। বাক্সের গায়ে হাত না দিয়েও কেমন যেন অনুভব করল লোকটা। এক পলক কি যেন ও ভাবল, তারপর হাঁস দুটোর টুঁটি ধরে হাঁটতে লাগল।

আদুরির চোখে ঘুম ঘুম ঢল, ও কি? যাচ্ছ কোথায়?

মনিব-বাড়ি।

কেন?

হাঁস দুটোকে বিদেয় করতে।

বিদেয় করে ফিরে এসে লোকটা আবার ভাবতে লাগল, এবার থেকে আর কখনও এমনভাবে হাঁস পালবে না ও। হাঁস দুটোকে না পাললে ঝরতি পড়তি আয়ের পথও বন্ধ হবে আজ থেকে। হাঁস দুটোকে না পাললে দিন চালাতে কষ্ট হবে এখন থেকে। তা হোক, ও দুটোকে না পাললে কুকুরটাকেও দরকার নেই। ঠিক যেমনভাবে মাঠের ধান গোলায় ওঠায় লোকটারও আর দরকার নেই। ফলে, রাগটা ওর কুকুরটার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ডাকল, আদুরি? আদুরি?

আদুরি তখন নাড়ার আগুনে ভাত রাঁধছিল, ছুটতে ছুটতে এল, কী।

রামদা দে।

কেন? রামদা কেন, কি হবে?

কুকুরটাকে জবাই করব। বাঞ্চোৎটা অত চেঁচায় কেন, এ্যাঁ?

সত্যিই হয়তো কুকুরটাকে জবাই করে ফেলত লোকটা। আদুরি কেমন কৌশল করে জন্তুটাকে অনেক দূরে তাড়িয়ে এল। ফলে লোকটা অবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

ভাল কথা, হাঁস দু'টোকে বিদেয় করায়, লোকটার এখন কেবল মাত্র কুকুরটা আর মেয়েমানুষটাই রইল। কুকুরটা কেমন মনমরা। লোকটার যখন ব্যামো ছিল, তখন যেমন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদত এখনও তেমন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে। কিন্তু মেয়েমানুষটার কথা আলাদা। তখন যেমন চুল বাঁধত, ভাত রাঁধত, গা ধুত, আবার কদাচিৎ আদুরে-আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কইত, এখনও তেমনি চুল বাঁধে, গা ধোয়, ভাত রাঁধে, আবার কদাচিৎ আদুরে আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কয়। বলে,

জানো, গা কেমন গুলায়, বিষ বিষ লাগে।

লোকটা বলে, তাহলে চল অন্য কোথাও পালিয়ে যাই।

গিয়ে।

নতুন করে ঘর বাঁধি।

বেঁধে।

নতুনভাবে সুখ খুঁজি।

খুঁজে।

তুই বাঁচবি, আমি বাঁচব। তুই আমি দু'জনেই শুধু ভোগ করব। তুই আমি দু'জনেই, শুধু দু'জনেই। তখন সব দুঃখ ঘুচবে। তখন সব জ্বালা মিটবে।

এসব কথা ভাবতে ভাবেত একদিন গেল, দু'দিন গেল তিনদিন গেল। তৃতীয়দিন লোকটা চেঁচিয়ে উঠল। আদুরি। আদুরি। আয় আয় দেখে যা, কুকুরটা কেমন ফাঁদে পড়েছে।

আদুরি দেখল বানর ধারার ফাঁদের মধ্যে কুকুরটা কেমন আটকা পড়ে চিতিয়ে আছে।

লোকটা বলল, দেখত, ওটা মরেছে না বেঁচে আছে?

মরেছে।

মরেছে? যাক, আপদ গেল।

একদিন গেল দু'দিন গেল তিনদিন গেল। এমন সময় লোকটার সেই মনিববাবু, একদিন ওকে ডেকে পাঠাল। লোকটা এল।

মনিব বলল, শুনলাম, কুকুরটাকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছিস?

লোকটা বলল, দিয়েছি।

দিয়েছিস। বেশ বেশ। কুকুর-টুকুর পোষা তোর শোভা পায় না। বেশ করেছিস।

লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। এসে, দাওয়ার ওপর তখনও সেই বস্তাটাকে পাতা দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তখন সন্ধে হয়ে আসছিল লোকটা তাই হুকুম করল, আদুরি, তামাক সাজ।

একদিন গেল দু'দিন গেল তিনদিন গেল। এমন সময় লোকটার সেই মনিববাবু আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, তা যাই বলিস, হাঁসের মাংস কিন্তু তোফা খেয়েছি। বেশ পুষেছিলি, বেশ।

লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। ঘরের কোণে কাঠের বাক্সটার কাছে এসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তখন ছিল ভর দুপুর, লোকটা তাই হুকুম করল আদুরি ভাত বাড়।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল। এমন সময় লোকটার সেই মনিববাবু, আবার একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিব বলল, মেয়েমানুষটাকে কি করবি? তার চে বরং আমায় দে। এখানে থাক। দিবি?

লোকটা বলল, দেব। বলতে বলতে মাথা নিচু করে খানিকটা দূর এগোল। এগিয়ে পড়িমরি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, আদুরি? আদুরি?

আদুরি তখন পায়ের নখে রঙ মাখছিল, কী? কেন?

লোকটা বলল, চল, এখনি আমরা পালিয়ে যাই।

কোথায়?

যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে।

সারা মাঠ তখন খা-খা করছে, ধু-ধু করছে। তপ্ত তপ্ত বাতাস বইছে। বইছে। এত বাসাত কার জন্যে গো, কার জন্যে। ছিঁটেফোঁটা ধানের কণাটাও রেখে যায়নি ওরা। খা খা করছে, ধু ধু করছে। আহা, কার জন্যে গো, কার জন্যে। লোকটা তখন আদুরির হাত শক্ত করে চেপে ধরল। বলল, চল চল। এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য কোথাও। চল, চল, থামিস না। এখানে নয় এখানে নয়, অন্য কোথাও। চল, চল।

আদুরি বলল, পারছি না যে।

লোকটা বলল, চল চল, এখানে নয় এখানে নয় অন্য কোথাও।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল। একমাস গেল দু'মাস গেল। শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল। একদিন, সারা আকাশ ডিমিডিমি, মেঘ নামল। বর্ষা এল। অঝোর ক্ষ্যাপা বাতাস বইল, বর্ষা এল। ঝিলিক দিয়ে বাজ পড়ল। বজ্রাঘাতে সুপুরি গাছ কুঁকড়ে এল। ভিজতে ভিজতে জাত চাষারা মাঠে নামল। এমন বর্ষা, এমন বর্ষা! মনের মধ্যে ময়ূর নাচছে। এমন বর্ষা, মেন বর্ষা! এ বর্ষায়, লোকালয় থেকে অনেক দূরে বহুকালের পুরনো ইট ঝুরো ঝুরো এক মন্দিরের মাঝে রাত গভীরে একদিন প্রদীপ জ্বলল। গা ছমছম দত্যি দানো পাশেই আছে। ফিসফিস করে তিনটে লোক তাই কথা বলছে।

দাই বলল, আহা আহা, দেখ দেখ, মুখখানা যেন বাপের মত।

আদুরি বলল, কিন্তু গায়ের রঙটা মনিবের চেয়েও ফরসা।

লোকটা বলল, তাই না ওকে চিনতে পারলাম। কে জানে আমার মতই ভাগ্য কিনা।

বাইরে তখন অঝোর হয়ে বৃষ্টি ঝরছে। গা ছমছম দত্যি দানো পাশেই আছে। কে জানে এসব ওরা শুনল কিনা! তাই বলছিলাম, একটা লোক কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। কিন্তু যে কথা বলিনি সে কথা কে না জানে, লোকটাকে পুষত অনেকে, কিছুতে।

অনুকল্প

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এই ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে ভিকির। নাম বিকাশ, স্কুলের বন্ধুরা ডাকে ভিকি। ওদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ওই রকমই রেওয়াজ। অবাঙালি বন্ধুরা কেউ সানি, কেউ বিনো, কেউ রাজ। দিল্লি বোর্ডের স্কুল লিভিং একজাম্ দিয়েছে। আর স্কুলে যাওয়া নেই, দেখা-সাক্ষাৎও নেই। কিছুদিন ঘন ঘন টেলিফোন এসেছে। রিসিভার তুললেই ভিকিকে চাইছে। সমীরণ একদিন পারমিতাকে বলেছিল, টেলিফোনটা তো তাহলে বিকাশের ঘরে দিলেই হয়।

পারমিতা স্বামীর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ ভ্রূকুটি করে বলেছে, আবার!

অর্থাৎ, তোমাকে না বিকাশ বলতে বারণ করেছি।

টেলিফোনের জন্যে কান খাড়া করে থাকত ভিকি। মা বা বাবা ডাকবার আগেই এসে হাজির। রিসিভার কানে লাগিয়েই ভিকি বলেছে, হাই রনি। পারমিতা ওদের ওই ডাকডোক পছন্দ করত। মুখে স্নিগ্ধ কৌতুকের প্রশ্রয়সূচক চাপা হাসি ঝিলিক দিয়ে যেত। ও প্রান্তের ছেলেটিও নিশ্চয়ই একই রকম স্মার্ট সম্ভাষণ ছুঁড়ে দিয়েছে, হাই ভিকি।

ওদের কথা আর ফুরোয় না। স্বচ্ছন্দ ইংরেজি, কাটা কাটা, মার্কিনি অ্যাকসেন্ট, অনর্গল বলে যায় ভিকি। কথা শেষ করে রিসিভার রাখবার সময় অবধারিত একটা মজা করবে। জোড়া ঠোঁটে জোড়া আঙুল ছুঁইয়ে একটু চুম্বন তুলে নেবে, বন্ধুর উদ্দেশে ভাসিয়ে দেবে শূন্যে, চুক করে একটা শব্দ হবে।

পারমিতা এগুলো উপভোগ করত।

শুধু মালা আন্টি একবার বলেছিল, এ কলোসাল ওয়েস্ট! আমি তো ভেবেছিলাম ভিকির গার্ল ফ্রেন্ড।

ব্লাশ করেছিল ভিকি। মায়ের সামনে মালা আন্টি এমন খোলাখুলি কথা বলে! ভালও লেগেছিল। এতটা মা সহ্য করতে পারত না প্রথম প্রথম। অস্বস্তি বোধ করত। অথচ আপত্তি করতেও পারত না। সার্ভিসের পদমর্যাদায় মালা গুপ্তা মায়ের অনেক ওপরে। বস্ বললেও সবটা বলা হয় না।

ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেশন, সংক্ষেপে হু, একটা প্রজেক্ট নিয়েছে সাউথ চব্বিশ

পরগনায়। মালা হু-র প্রতিনিধি। কর্মস্থল দিল্লি, সাময়িকভাবে বদলি হয়েছে কলকাতায়। মালার স্বামী বাণীব্রত গুপ্ত ইউ. পি. ক্যাডারের আই. এ. এস। এখন দিল্লিতে আছে শাস্ত্রীভবনে। সব দিক থেকেই মালা আন্টি হায়ার সোসাইটির মানুষ। ভিকির মা পারমিতা সে তুলনায় অনেক নিচে। ভিকি ভাবতেই পারে না মালা গুপ্তাকে কেউ মালাদি বলতে পারে অফিসে।

এই প্রজেক্টের সূত্রেই মালা আন্টির কাছাকাছি এসেছিল মা। অত বড় চাকুরে, বয়কাট চুল, ক্ষিপ্র হাঁটাচলা, হাস্‌কি গলা। শাড়িতেও দারুণ স্মার্ট লাগত। তাইতেই মা একটা সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব রেখে চলত। ভিকির মনে হত এও এক ধরনের হীনমন্যতা, এই যে, সুপিরিয়রের সামনে অহেতুক কুঁকড়ে থাকা।

ভিকির মনে পড়ল লাল মারুতি করে আসত মালা আন্টি। লম্বা করে হর্ন বাজাত ড্রাইভার। নাম জীবন সাঁতরা। মালার বাঁধা ড্রাইভার। রাজ্য সরকারের পুল-কার চালাত। কলকাতায় এলে ওই মারুতি আর জীবনকে ওর চাই-ই। রাইটার্সের বড় বড় আমলাদের সঙ্গে মালা গুপ্তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। জীবনকে না পেলে তুলকালাম করবে।

পারমিতা জীবনের কাছে গোপনে জিগ্যেস করেছিল, মিসেস গুপ্তা লোক কেমন? ভাল?

জীবন বলেছিল, ভাল মানে! মেমসাহেবের মত মানুষ পাবেন না দিদি। আমার বেহালার বাড়িতে পর্যন্ত গেছেন, শিশিরবাগানে।

তবু ভরসা পায়নি পারমিতা।

মহিলার স্পর্শকাতরতা থাকতেও পারে, সব সময় সেটা ধরাছোঁয়াও যায় না। হায়ার সোসাইটির ওটা একটা পরিশীলিত কৌশল। কোনও ঝুঁকি নেয়নি পারমিতা। কথাবার্তায় ম্যাডাম সম্বোধন করেছে।

ভিকি অবশ্য নিজে থেকেই আন্টি বলে। কোনও আড়ষ্টতা নেই। এসব ব্যাপারে একালের ছেলেমেয়েরা বেশ সপ্রতিভ। অল্প দিনেই প্রায় বন্ধুর মত হয়ে গেছে।

মারুতির হর্ন শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠত পারমিতা। মায়ের এই অহেতুক অস্থিরতা ভাল লাগত না ভিকির। প্রথম দিন বলেছিল, টেক ইওর ঔন টাইম, মাম্মি! বি কমফর্টেবল।

তারপর মালাকে ডেকে এনেছিল গাড়ি থেকে।

পরদিন থেকে আর ডাকতে হয়নি। গাড়ি আসবে, টানা টানা সুরে ইলেকট্রিক হর্ন বাজবে, এবং একটু পরেই আল্‌তো খুট খুট শব্দ তুলে বাড়ির মধ্যে চলে আসবে মালা গুপ্তা। এইটাই নিয়ম হয়ে গেছিল।

ডাইনিং-কাম-লিভিং রুমটায় এখন অনেক স্মৃতি।

ওই খানটায় বসত মালা আন্টি। বসেই সিগারেট আর লাইটার বের করত। প্রকাশ্যে ধূমপান করত খুব স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। সমীরণ একটু রক্ষণশীল ধরনের। ইংলিশ মিডিয়মে পড়ছে বলেই বিকাশ ভিকি হয়ে যাবে, এটাও ওর পছন্দ ছিল না। বাঙালি

বাড়িতে বাঙালি কালচার, হিন্দু ঘরের ছেলে হিন্দুর শালীনতাবোধ, এসব থাকবে না? স্বামী-স্ত্রীতে এই নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। আপসে লড়াই। জিত হয়েছে পারমিতারই। সমীরণের দেশের বাড়ির সাবেকিয়ানা কলকাতাতেও চালাতে চায় ও। পারমিতা বলেছে, তোমাদের তো ইচ্ছে ছেলে তোমাদের শনিপুজো করুক, কোশাকুশি নিয়ে বসে সন্ধে-আহ্নিক করুক।

কলকাতার বাসায় ঘরের এক কোণে একটু লক্ষ্মীর ঘটও বসায়নি পারমিতা। শাশুড়ি এখানে এসে থাকেন না। বলেন, ম্লেচ্ছ!

মায়ের প্রশ্রয়েই ভিকি নামটা বিকাশের ডাকনাম হিসেবে চালু হয়ে গেছে। মামাবাড়িতেও সবাই ডাকে ভিকি।

সমীরণ বলেছে, বিকাশ নামটা তাহলে তোলা রইল?

মা হেসে বলেছে, তোলা থাকাও তো থাকা।

সমীরণ প্রায়ই আফশোস করত, বাবা কত শখ করে নাতির নাম রেখেছিলেন! বলতেন, বিকাশ মানে হচ্ছে উন্মেষ অভিব্যক্তি প্রকাশ। কিসের বিকাশ? কুসুমের, সৌন্দর্যের, বুদ্ধির। নবজাতক দিনে দিনে বড় হচ্ছে, ফুলের মত সেও কি বিকশিত হচ্ছে না?

—হচ্ছে কিনা তা বোঝবার সময় হয়নি এখনও।

সেকথায় কান না দিয়ে সমীরণ বলেছে, বাবা কোনওদিন ভিকি বলে ডাকেননি তোমার ছেলেকে।

মৃদু ক্ষোভ, এর বেশি কিছু না। কোনও কিছু নিয়ে দিনকালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত মনোবল নেই সমীরণের। সংসারের শান্তি নষ্ট করে কী লাভ! ওতেই যদি পারমিতা খুশি থাকে তবে তাই থাক। ছেলে হিন্দু বাঙালি থাকলেই হল। সমীরণ যে রাজনীতি করে তার সঙ্গে পারমিতার আচার-আচরণ খুব মেলে। অফিসে গল্প করে, আমার বাড়িতে গৃহদেবতা-টেবতা নেই। কিন্তু একান্তে মনের মধ্যে খচখচ করে। ওদের দেশের বাড়ি হুগলিতে, গ্রামের নাম দ্বারবাসিনী। এখনও পালা করে দুর্গাপুজো হয়। শরিকি পুজো। যেবার সমীরণদের পালা পড়ে, বাবা চিঠি দেন। সে চিঠিতে বংশগৌরবের কথা থাকে। একটু কটাক্ষও থাকে। চাঁদা পাঠিয়ে দেয় সমীরণ। আর ভাইরাও পাঠায়। গ্রামের বাড়িতে যেতে চায় না পারমিতা। সমীরণও চাপাচাপি করে না। বিকাশটা ওর শিকড় চিনল না।

ভিকি বলে, নস্টালজিয়া।

দ্বারবাসিনীর শিরোমণি বাড়ি বললে এখনও এক ডাকে লোকে চেনে। সমীরণের তাই ইচ্ছে ওর বংশধর আদি পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। ভিকি বাঙালি থাকলেই হল। বাড়িতে ওকে যত্ন করে বাংলা শিখিয়েছে সমীরণ। জন্মদিনে ঠাকুরমার ঝুলি কিনে দিয়েছে। বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় পড়ে শুনিয়েছে। ক্রমে নেশাটা ধরিয়ে দিতে পেরেছে। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ার নেশা।

মিসেস মালা গুপ্তার ধূমপানের গল্প শুনে বিরক্ত হয়েছে সমীরণ। পারমিতাকে বলেছে, ওসব আলট্রা মডার্ন মহিলাদের থেকে সাবধান। কিচ্ছু বলা যায় না, হয়তো ড্রিঙ্কও করে। পারমিসিভ সোসাইটির ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।

ভিকি কিন্তু ক্রমশ আকৃষ্ট হয়েছে মালা আন্টির প্রতি। ধূমপায়ী মহিলা এই প্রথম দেখল না ও। পার্ক স্ট্রিটে, থিয়েটার রোডে মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। কলেজের ইয়ং মেয়েরা দল বেঁধে শখ করে ড্রিঙ্কও করে আজকাল। জাস্ট ফর আ ফান। মালা আন্টিও যদি করে দোষের কী! সব কিছুই ওকে মানাবে। উগ্র ফেমিনিস্ট মনে হয় না মালা আন্টিকে। ভিকি সামনে থাকলে ভাঙা-ভাঙা খসখসে গলায় অবধারিত জিগ্যেস করবে, উড ইউ মাইন্ড মাই স্মোকিং বিফোর ইউ, মাই বয়?

কণ্ঠস্বরে মাধুর্য নেই, তবু বলার ভঙ্গিতে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেবে।

পারমিতাকেও এমনি করে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে কাছে টানছিল মালা গুপ্তা। ভিকি দেখেছে মায়ের আগের সেই আড়ষ্টতা আর নেই। কতদিন মালা আন্টির সঙ্গে এইখানে এই ডাইনিং কাম লিভিং রুমে বসে গল্প করতে দেখেছে ভিকি।

সেই মালা আন্টি আজ কতদিন এই ফ্ল্যাটে আসছে না। মা তো আর আসবেই না। ছবি হয়ে গেছে পারমিতা চ্যাটার্জি। দুজনেই আজ এক রোমাঞ্চকর গল্পকাহিনীর বিপন্ন চরিত্র। সত্য-মিথ্যায় মাখামাখি।

একা ঘরের মধ্যে সেসব স্মৃতি যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে মারতে চায় ভিকিকে। বাবা অফিস যাচ্ছে না। দু-তিনদিন আগে পর্যন্ত বাড়িতে লোক গিসগিস করত। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী। সহানুভূতি জানাতে এসেছে। নানা কারণে পল্লবিত হয়েছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদটা। পত্রপত্রিকা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং চড়িয়ে নিউজ স্টোরি তৈরি করেছে। রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলো। গভর্নমেন্টকে কোণঠাসা করেছে বিরোধীরা। আর একটা ছোট পরিবার, সর্বার্থে সুখী পরিবার, উলটো-পালটা গুজব আর প্রতিবেদনের আঘাতে ক্রমশ আত্মগোপনের জন্যে বিবর অনুসন্ধান করেছে। সংবাদটা জানতে কারও বাকি ছিল না। কয়েকদিন অবিরাম প্রচার করেছে রেডিও-টিভি। দ্বারবাসিনী গ্রাম থেকেও অজস্র মানুষ এসেছে কলকাতায়, এই ফ্ল্যাটে। মুহুর্মুহু ডোরবেল বাজছে। দরজা খুলে দিলেই দেখা যাবে একজন বা কয়েকজন লোক। মুখে দুঃখ-দুঃখ ভাব, চোখে মমতার দৃষ্টি। একজন প্রতিবেশী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, একটু ইতস্তত করে, সমীরণের পাশে গিয়ে বসেছিল।

দৃশ্যটা মনে পড়লে আক্রোশে বুকের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে ভিকির।

বাবা তখন একটা ভাঙাচোরা মানুষের মত সোফার একধারে বসে আছে। চোখে ক্লান্ত শূন্য দৃষ্টি। আপনজনের মত বাবার পিঠে হাত রাখল লোকটা। তারপর বলল, খুব স্যাড।

একটা কৌতূহল চিকচিক করছে লোকটার চোখে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনার কী মনে হয়? রেপের কথাটা সত্যি?

চাপা গলায় বললেও শুনতে পেল ভিকি। নিরীহ শান্ত ছেলেটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। বলল, হ্যাঁ সত্যি। আ রেপ অন আওয়ার হাউসহোল্ড, আ রেপ অন আওয়ার প্রাইভেসি।

পরিবারে তখন শোকের সময়। নিকট আত্মীয়স্বজন আসছে যাচ্ছে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে থেকে গেছে কেউ কেউ। দ্বারবাসিনীর বাড়ি থেকে সমীরণের বাবা-মা এসে ছিলেন ক'দিন। ভিকিকে সামলেছিলেন তারা। ঠাকুরদা জনান্তিকে বলেছিলেন, অমন করে না ভাই। এর জন্যে তো কেউ দায়ী না। আমাদের ভাগ্য, বউমার কর্মফল।

উত্তেজনার অবসানে বৃদ্ধ পিতামহের বুকের ওপর মুখ রেখে আর একবার অঝোরে কেঁদেছে ভিকি। ওর যন্ত্রণা কেউ বুঝবে না। ও নিজের চোখে দেখেনি, কাগজে পড়েছে, মায়ের শাড়ি খুলে নিয়েছিল আক্রমণকারীরা। অন্তর্বাস টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল। বুকে গলায় নখের আঘাতের চিহ্ন ছিল। স্তনে ক্ষত। হাসপাতালে সর্বাঙ্গ চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল পারমিতার প্রায়-নগ্ন নারীদেহ। আতঙ্কে সে-চাদর সরিয়ে দেখেনি ওরা। সাদা চাদরের নিচে বিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত মাকে কল্পনা করে শিহরিত হয় ভিকি। সান্ত্বনার কোনও কথা ভাল লাগে না। প্রতিকারহীন এই লাঞ্ছনার জন্যে তা হলে কে দায়ী? কে? মায়ের অফিস থেকে কাতারে কাতারে লোক এসেছে হাসপাতালে, শ্মশানেও গেছে। বাবার অফিসের লোকেরাও। কাগজে উলটো-পালটা লেখালেখি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে একজন মিনিস্টারও ভিকিদের ফ্ল্যাটে এসেছেন। রাজ্য সরকারের সমবেদনা জানিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, ভিকির জন্যে মেডিকেল পড়ার একটা সিট সংরক্ষিত থাকবে।

ভিকি বলে দিয়েছে, চাই না। আমি ডাক্তারি পড়ব না।

ওর এই অবিনয় ভাল লাগেনি সমীরণের। একটু অসন্তুষ্ট স্বরেই বলছে, গুম মেরে বাড়ি বসে না থেকে একটু আধটু বেরুলেও তো পারিস! যা হবার তো হয়েই গেছে।

শেষের কথাটা খট করে কানে লেগেছে ভিকির। বাবা কেমন মানিয়ে নিচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুলেই তো লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী ওকে দেখিয়ে বলবে, ওই যে ছেলেটা, ওর মাকে রেপ করেছে। একটা সামাজিক কলঙ্কের গ্লানি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না ভিকি। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। যুক্তি দিয়ে তবু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এতে মার কী দোষ! অসহায়ভাবে অতর্কিতে ঘিরে ফেলে লাঠিসোটা লোহার রড সাইকেলের চেন নিয়ে দল বেঁধে উন্মত্ত আক্রোশে আক্রমণ করলে মা কী করবে। কিন্তু বাবা এর প্রতিকারের জন্যে কিছু করছে না কেন? কী করবে? তার আমি কী জানি। মনে মনে প্রশ্ন-উত্তর সাজিয়েছে ভিকি। সমীরণ বাইরে বেরিয়ে স্বাভাবিক হতে বলছে, সমাজ-জীবনের মূলস্রোতে ফিরে যেতে বলছে। কিন্তু ভিকির কেবল ভয়, কেউ যদি বলে, তোমার মায়ের ওই ব্যাপারটায় কিছু করতে পারলে না?—কী উত্তর দেবে ও!

কালও সমীরণ ভিকিকে পীড়াপীড়ি করেছে, এখন আর ওরকম বসে বসে থাকিস না, একটু বেরো। কোথাও একটু ঘুরে আয় কাছেপিঠে। মনটা ভাল লাগবে।

দুম করে বেরিয়ে পড়েছিল ভিকি। উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ও দেখল কেমন করে যেন যোধপুর পার্কে পৌঁছে গেছে। যোধপুর পার্কে দাদার বাড়িতে থাকে মালা আন্টি। স্বামী বাণীব্রত গুপ্ত বর্তমানে দিল্লিতে। ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেশনের চাকরি নেবার পর থেকে স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে বাস খুব কমই হয়েছে। এই নিয়ে একটু সাহস করে পারমিতা একদিন বলেছিল, ম্যাডাম, কষ্ট হয় না আপনার? এই যে মাসের পর মাস মিস্টার গুপ্তকে ছেড়ে থাকেন?

মালা বলেছিল, বাণীব্রতও আমাকে ছেড়ে আছে। ওরও কষ্ট হয়।

একটু থেমে হেসে বলেছিল, এই হচ্ছে আমাদের চাকরির ইনহেরেন্ট হ্যাজার্ড। ও-ও ঘুরছে, আমিও ঘুরছি; কিন্তু মিলছি না কোথাও। অল মানি, নো সেকস।

লজ্জা পেয়েছিল পারমিতা। অন্তরঙ্গ আলোচনায় ম্যাডামের মুখে কিছু আটকায় না।

এসব ভিকির জানার কথা নয়। কিন্তু ওদের ফ্ল্যাটে কয়েকদিন যাতায়াত করেই একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেছিল মালা আন্টি। একদিন যথারীতি ভিকির অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলল, মিসেস চ্যাটার্জি, আজ একটা জরুরি কথা সেরে নিতে চাই।

পারমিতা সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাল ম্যাডামের দিকে।

মালা বলল, আমি বিদেশেও অনেকদিন কাটিয়েছি, এই হু আর ইউনিসেফের কাজে। সেখানে দেখেছি, বিশেষত স্টেটসে, একই প্রজেকটে যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কের মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়ার মত এত ফর্মালিটি নেই।

কথাটা কোন দিকে মোড় নেবে অনুমান করতে পারেনি পারমিতা। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল ভিকি। চমৎকার ব্যক্তিত্ব আছে মালা আন্টির। স্পষ্ট কাটা কাটা কথা।

একটু থেমে বাঁ কানের ওপর দিককার বয়কাট চুলে আঙুল চালাতে চালাতে মালা আন্টি বলল, আমি বড় পোস্টে আছি, ফ্যাট স্যালারি, গভর্নমেন্ট গাড়ি ড্রাইভার দিয়েছে বা আপনি আমার বয়সে বড়, আমার চেয়ে কম মাইনে পান, এসব কোনও ফ্যাক্টর না। মিসেস গুপ্তা, ম্যাডাম, আপনি, এসব চলবে না। আমাকে মালা তুমি বলবে, তোমাকে পারমিতা বলব। এগ্রিড?

মালা আন্টির সামনে মায়ের সেই হাসিখুশি মুখটা ভিকির চোখে ভেসে উঠল।

মালার দাদার বাড়িতে ঢুকে পড়ল ভিকি।

দুই

এ বাড়ির সবাইকেই হাসপাতালে দেখেছে ভিকি। সহজেই তারা চিনতে পারল ওকে। সমাদর করে নিয়ে গেল মালার কাছে।

পিছনে বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে খাটে বসে আছে মালা আন্টি। কপালে একটা হালকা ব্যান্ডেজ। চেহারায় সে সপ্রতিভতা আর নেই। দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছায়া কাটেনি

এখনও। ভিকিকে দেখে বলল, এস। স্বরে দুর্বল বিষণ্ণতা। বস। খাটের গদির ওপর একটা জায়গায় মৃদু চাপড় মারল।

ভিকি নিঃশব্দে বসল সন্তর্পণে। সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখল মালা আন্টি। কান্না দলা পাকাচ্ছে কণ্ঠনালিতে। হঠাৎ প্রবল আকুলতায় বুকের কাছে ভিকির মুখটা চেপে ধরল মালা আন্টি। প্রবোধ দিয়ে বলল, আমার কনসেন্স ক্লিয়ার। ভিকি, মাই সন, আই ডিড মাই বেস্ট টু সেভ পারমিতা ফ্রম মলেস্টেশন। আমার কাছে রিভলভার ছিল। আই ফায়ার্ড এট দ্য গ্যাংস্টার্স।

ভিকি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। যেন খুন চড়ে গেছে ওর মাথায়। বলল, কিন্তু আমার তো ফায়ার আর্মস নেই আন্টি। আমি কী করব?

এ ক'দিনে কলকাতাকে চেনা হয়ে গেছে মালা গুপ্তার। ধর্ষণ ধর্ষণ করে চেঁচাচ্ছে সবাই। একটা মুখরোচক উত্তেজনা পেয়ে গেছে পাবলিক। রোষে ফুঁসে উঠছে না। অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে বাণীব্রত এসেছিল দিল্লি থেকে। ওকে মালা বলেছে, কোনও কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত। একটা অপরাধীও ধরা পড়ল না। ইটস আ রেপ অন জাস্টিস।

এসব কথা ভিকিকে বোঝানো যাবে না। তাই ওর কথার কোনও উত্তর দিল না মালা। ওর উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করতে লাগল মাথায় হাত বুলিয়ে। সশব্দ হাঁপের মত দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আত্মগতভাবে ভিকি বলল, কেন ওরা মাকে এমন করে মারল?

কোনও প্ররোচনা কাগজওলারাও সঠিক খুঁজে পায়নি।

সেদিনও পারমিতাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রজেক্ট দেখতে গেছিল মালা গুপ্তা। পিরতলা বলে একটা জায়গা পড়ে রাস্তায়। পারমিতার চেনা জায়গা। ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের কাজে অনেকবার এসেছে। হেলথ সেন্টারে গেছে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে হু থেকে পাওয়া ওষুধের একটা বিরাট স্টক আছে এখানকার স্টোরে। এই স্টোর থেকে বিস্তৃত অঞ্চলে ওষুধ যায়। কাগজওলারা লিখেছে ওই ওষুধের হিসেবে গরমিল ধরা পড়েছিল। পিরতলার অনেক প্রভাবশালী লোক ওষুধ চুরির চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। আবার কেউ বলেছে, ছেলে চুরির গুজব চাউর করে মহিলাদের গাড়ি ঘেরাও করা হয়েছিল। এটা কোনও আকস্মিক জনরোষ নয়, পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত। এর পিছনে গভীর রহস্য আছে।

মালা আন্টি বলেছে, আমি সেরে ওঠবার পর আমার কাছেও অনেক লোক এসেছে—হাসপাতালে, বাড়িতে। আমি কথা বলিনি। মনে হয়েছে এগুলোকেও গুলি করে উড়িয়ে দিই। শুধু গল্প শুনতে চায়। থ্রিল সাসপেন্স সেকস একসাইটমেন্ট। জোট বেঁধে ক্রিমিনালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুরোদ নেই কারও।

পিরতলায় সেদিন হাটবার। হাটের পাশ দিয়েই রাস্তা। মে মাসের বিকেল। ছ'টা বাজে। তখনও মরা রোদ, ঝকঝক করছে দিন। হাটের ভিড় উপচে পড়েছে রাস্তায়। অত লোকের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে। সাত-আটটা লোক আগে থেকে তৈরি ছিল।

হর্ন দিতে দিতে গাড়ি এগুচ্ছে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গাড়ির পথরোধ করল লোকগুলো। ড্রাইভার জীবন সাঁতরা অভিজ্ঞ লোক। লোকগুলোর হাতে লাঠিসোটা দেখে বিপদ বুঝে গাড়ি পাশ কাটিয়ে নিতে গেল। অমনি লোকগুলো রে রে করে লোহার রড দিয়ে গাড়ির বডি পেটাতে শুরু করল। গাড়ির কাচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। প্রথমে রাগটা গিয়ে পড়ল জীবনের ওপর। মারাত্মক জখম করল ওকে। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল জীবন। গাড়ি গড়িয়ে গেল পাশে একটা জলাজমিতে। রাস্তার ধারেই। গাড়ির দরজা খুলে নিচে ছিটকে পড়ল পারমিতা। উঠে প্রাণপণ আর্ত চিৎকার করে এলোমেলো দৌড়তে শুরু করল। ক্ষুধার্ত জন্তুর মত লোকগুলো গিয়ে ঝাপটে ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলল ওকে। মালার বিশ্বাস, যে কোনও কারণেই হোক পারমিতার ওপর ক্ষার ছিল ওদের। এলোপাথাড়ি দৈহিক নির্যাতন করেছে ওকে। যত রকমের যৌন বিকৃতি সম্ভব তার সবই চরিতার্থ করে নিয়েছে ওরা।

গাড়িতে বসেই দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে মালা। ওরা রিভলভারের পাল্লা থেকে দূরে ছিল। একটাও লাগেনি। তবু গুলির শব্দে কাজ হয়েছে। পারমিতাকে ছেড়ে পালিয়েছে লোকগুলো।

পিছন থেকে অতর্কিতে আর একদল এসে আঘাত করেছে মালাকে। গাড়ির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেছিল মালা। তারপর কেমন করে হাসপাতালে এসেছে, কারা এনেছে, কিছুই জানে না।

জীবন হাসপাতালে আসবার আগেই মারা গেছে। পারমিতা বারো ঘণ্টা বেঁচেছিল। একমাত্র বেঁচে ফিরেছে মালা গুপ্তা। ও বলেছে, প্রকাশ্য দিবালোকে অতগুলো চোখের সামনে জঘন্য ঘটনাটা ঘটল, অথচ আশ্চর্য, কেউ প্রতিবাদ করল না! মানুষের শুভবুদ্ধির, বিবেকের এমন ধর্ষণ আমি আগে কোনওদিন দেখিনি।

মালা আন্টির বাড়ির কথাটা মনে হতেই মনটা আবার কেমন অস্থির হয়ে উঠল ভিকির। মায়ের শেষ দিনের শেষ কথাগুলো বলছিল মালা আন্টি। পিরতলার হাটের কাছে আসবার আগে পর্যন্ত দিনটা ছিল আর দশটা দিনের মত। পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে আসছিল মা। বলেছিল, আমার বাড়ি ফেরার তাড়া ওই ভিকির জন্যে, ভাই! তুমি বললে বিশ্বাস করবে না মালা, অত বড় ছেলে, এখনও আমার ফিরতে একটু দেরি হলে মা মা করে অস্থির। এই জন্যে ট্যুরে গিয়ে আমি যে বাইরে কোথাও নাইট হল্ট করব, সে উপায় নেই। একটা দিন আমাকে ছাড়া ছেলের চলবে না।

এখন যে তোমাকে ছাড়া বাকি জীবনটা চালাতে হবে মা। ঘরে নতুন টাঙানো পারমিতার ফটোর দিকে চেয়ে মনে মনে বলল ভিকি। আর ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মনে হল বাবা যে সারাদিন বাড়ি থাকে না, কোথায় যায়? মায়ের এই মৃত্যু তো হত্যা। বাবা কি তার প্রতিকার করতে পারবে? অপরাধী শাস্তি পাবে? নামিয়ে রাখা রিসিভার হাতে নিয়ে লালবাজারের নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল ভিকি। হঠাৎ একটা রোখ চেপে গেল ওর। বাবা যা করছে করুক। আমার দিক থেকে আমার

যেটুকু সাধ্য আমি করব। যেমন মালা আন্টি করেছে। রিভলভারের গুলি চালিয়েছে। আমি থানা-পুলিশ রাইটার্স বিল্ডিং-হোম সেক্রেটারি-চিফ মিনিস্টার-হাইকোর্ট জাজ, নম্বর খুঁজেখুঁজে সব্বাইকে টেলিফোন করব। প্রশাসনের সবগুলো ডাল ধরে প্রাণপণ ঝাঁকি দেব।

সমস্ত আক্রোশ তর্জনীতে জড়ো করে একা ফ্ল্যাটবাড়িতে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে যাচ্ছে ভিকি।

কয়েকদিন পরে ইংরেজি দৈনিকে একটা চাঞ্চল্যকর চিঠি বেরুল ভিকির। স্বভাবতই কিছুটা আবেগতাড়িত। তবু কতকগুলো মৌল প্রশ্ন তুলে ধরেছে ও। বেছে বেছে এমন কতকগুলো মানুষকে ভিকি টেলিফোনে ধরতে পেরেছিল যারা প্রশাসনের শক্তিশালী স্তম্ভ কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ বা বুদ্ধিজীবী। বাঙালির অহঙ্কার, কলকাতার গৌরব। অধিকাংশই মনোযোগ দিয়ে শোনেনি ভিকির আবেদন। ঝপ করে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। দু'একজন শুনেছে, সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। তারপর অসহায়ভাবে বলেছে, কী করা যাবে। এ রকম তো আকছার হচ্ছে আজকাল।

চিঠিটা পড়েই মালা আন্টি চলে এল ভিকিদের ফ্ল্যাটে। অতটুকু একটা ছেলে এত বড় একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান চেয়েছে। কলকাতার মুখের ওপরকার অহঙ্কারের স্বচ্ছ অবারণ দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে। টেলিফোনে তারিফ করতে পারত মালা। ওর মনে হয়েছে, আরও অনেক বেশি প্রাপ্য ছেলেটার।

অনেকটা সেরে উঠেছে মালা। ফিরে এসেছে ওর পুরনো সপ্রতিভতা। তবু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে।

দরজা খোলাই ছিল। জুতোর শব্দ যথাসাধ্য পিষে মাড়িয়ে সেই জায়গাটাতে এসে বসল যেখানে শেষবার বসে গেছে দুর্ঘটনার দিন।

ইতস্তত তাকিয়ে দেখল পারমিতার ছবিতে টাটকা ফুলের মালা। তারই নিচে সোফার ওপর ডালা-খোলা স্যুটকেস, কাছে টুকটাক জিনিস। সমীরণ স্যুটকেস গোছাচ্ছে। কোথাও যাবার প্রস্তুতি।

মালাকে পারমিতার ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সমীরণ বলল, ওর কাজের দিন আপনাকে খুব আশা করেছিলাম।

মালা ছবি থেকে চোখ সরিয়ে বলল, ভিকিকে দেখছি না।

—বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছে?

—জানি না।

বিরক্তি প্রকাশ পেল সমীরণের গলায়। তারপরই স্বরে সৌজন্য ফুটিয়ে বলল, বসুন।

মালা দাঁড়িয়েই রইল। ভাবালুতা নেই ওর। তবু কেমন যেন আর ভাল লাগছে না এখানে থাকতে। এসেই চলে গেলে খারাপ দেখায়, তাই বলল, পেপারে ভিকির চিঠিটা পড়লাম। ওকে বলবেন, আমি অন্তত ওব কষ্টটা বুঝেছি।

হুঁ। গম্ভীর গলায় সমীরণ বলল, একটা ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরেছে। ওর আর কী!

সমীরণের অফিস-রাজনীতির অবস্থানটার ভিতেও ঘা পড়েছে, এ কথা বুঝতে পারল না মালা। ও অনুমান করে নিল বাপ-ছেলের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। সমীরণ হয়তো সেই জন্যেই বাইরে চলে যাচ্ছে—খুব সম্ভবত ওদের দেশের বাড়িতে।

মালা বলল, মিস্টার চ্যাটার্জি কি বাইরে যাচ্ছেন?

সমীরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, সমাজে থাকতে গেলে—আমরা মুখে যতই বলি না কেন সমাজ-টমাজ নেই, তবু—আপনি বোধ হয় জানেন আমার বাবা, নিয়ারলি এইট্টি, এখনও বেঁচে আছেন—

ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে না সমীরণ। হঠাৎ থেমে গেল। তারপর ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলো স্যুটকেসে গুঁজে দিতে দিতে বলল, যদিও আমি এসব ঠিক মানি না—তবু কিছুদিন তো কলকাতার বাইরে থাকতে পারব।

—কোথায় যাচ্ছেন? দেশে?

নাহ্, গয়া। সমীরণ কৈফিয়তের সুরে বলল, সবাই যখন বলছে, যাই, ঘুরে আসি।

বলতে বলতে স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে মৃদু একটা চাপ দিল। মালা স্থির দৃষ্টিতে সমীরণের স্যুটকেস গোছানো দেখছে। এখন সমীরণের পিঠ মালার দিকে ফেরানো। তবু ওর মনে হল মহিলার দৃষ্টি ওকে বিদ্ধ করছে।

সমীরণের মনে হল, ও নিজেকে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেনি। আসলে নিজের মধ্যেই ওর বিশ্বাসের জোর নেই। তা না হলে ভিকিকে কেন বলতে পারল না সব কথা?

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলছে না।

একজন বহিরাগত অনাত্মীয় মহিলা এ রকম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে। মনে জোর আনল সমীরণ। মালার দিকে ফিরল। বলল, আপনারা হয়তো বিশ্বাস করেন না এসব...অপঘাতে মৃত্যু। পিণ্ডদান করতে হয়। আত্মার শান্তিও তো একটা ব্যাপার।

তবু কথা বলল না মালা।

ভিকি যে ওর বাবার সঙ্গে যাচ্ছে না, অন্তত এটুকু বুঝতে পেরে স্বস্তি পেল মালা।

একটা উত্তর মুখে এসেছিল, ঠোঁট চেপে রইল মালা। ভিকিটার বুকের মধ্যে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে সে বুঝি কিছু না! বলতে পারত, মৃতেরই শুধু বুঝি আত্মা আছে মিস্টার চ্যাটার্জি? জীবিতের নেই?

গুণ্ডাদ্বয়

মতি নন্দী

ভোররাতে সুমিত্রার গর্ভপাত ঘটল।

পান-বসন্তে ছ'দিন ধরে ভুগছে। জ্বর উঠল একশো তিন। নিখিল শুয়ে ছিল মেঝেয়। সুমিত্রার চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখল বিছানায় বসে চাপা আতঙ্কে ও তখন চেঁচাচ্ছে, 'বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল।'

আলো জ্বেলে নিখিল দেখে সুমিত্রার দুই উরুর মাঝে কাপড়টা ফুলে রয়েছে। একটু নড়তেই দলমল করে উঠল সেই স্ফীতি। সুমিত্রা সাত মাসের পোয়াতি। ফ্যালফ্যাল করে নিখিলের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ সরিয়ে নিল নিখিল। বসন্তের ক্ষতে মুখটা খোদলানো। পাশের ঘরে মা ঘুমোচ্ছে, তাকে ডেকে তুলল।

বাড়িওলার বউ উপর থেকে নেমে এসে পরামর্শ দিল ডাক্তার ডাকতে। পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে আনল নিখিল। তিনি সুমিত্রার নাড়ি কেটে পঁচিশটি টাকা নিয়ে চলে গেলেন। নিখিল হিসেব করে দেখল আট দিন বাকি অফিসে মাইনে হতে। ওষুধ কেনার একটা খরচও আছে। ডাক্তার বলে গেছেন ভয়ের কিছু নেই অর্থাৎ আর টাকা খরচ হবে না। বিছানার চাদর-তোশক রক্তে জবজব করছে। সুমিত্রার সায়ার রং বদলে গেছে, শাড়ির কিছু অংশে রক্ত। এ সব ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওকে কাপড় বদলিয়ে মা সেই চাদর, সায়া ও শাড়ি ঘরের এক কোণে জড়ো করে রেখেছেন, সেই সঙ্গে সুমিত্রার পেট থেকে যে জিনিসটা বেরিয়েছে সেটাও।

বাড়িতে ধাঙর আসতেই বাড়িওলার বউ তাকে এই জিনিসগুলো ফেলে দিতে বলল। দেখেই সে মাথা নাড়ল। এ কাজ তার দ্বারা হবে না, পুলিশ ধরলে ফাটকে পুরে দেবে। দশ টাকা বখশিশ কবুল করেও তাকে রাজি করানো গেল না। তখন বাড়িওলার বউ বাড়িওলার সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বলল, 'ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনো। সেটা দেখালে পুলিশ কিছু বলবে না। উনি বললেন, এ তো আর আইবুড়ো বা রাঁড়ির পেট-খসানো মাল নয়। ভদ্দর ঘরের বউয়ের অ্যাকসিডেন্ট। তুমি বাপু ডাক্তারের কাছেই যাও।'

তাই শুনে নিখিল ডাক্তারের কাছে ছুটল। তখন ডাক্তার বাড়ি ছিল না, কখন

আসবে তারও ঠিক নেই। বাড়ি ফিরে সাত মাসের সন্তানটিকে বিছানার চাদর, শাড়ি ও সায়ার উপর রেখে নিখিল পরিপাটি করে ভাঁজ করল। শাড়ির পাড় ছিঁড়ে নিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধল যাতে জিনিসটার আকৃতি ছোট হয়। তার উপর খবরের কাগজ মুড়ল। তাতে হুবহু মনে হতে লাগল একটা কাপড়ের প্যাকেট। কিছুদিন আগেই হ্যান্ডলুম হাউস থেকে পরদার কাপড় ও ব্লাউজের ছিট কেনা হয়েছে। দোকানের নামলেখা ছাপা কাগজের থলিতে জিনিসটা রেখে দেওয়া আছে। তাইতে নিখিল প্যাকেটটা ভরে খাটের নিচে রেখে দিল। সুমিত্রা শুয়ে শুয়ে দেখছিল, কাতরস্বরে সে বলল, 'শাড়িটা তো কাচিয়ে নিয়ে পরা যায়। একটুখানি জায়গায় তো মোটে লেগেছে।'

নিখিল একথা গ্রাহ্য করল না। সুমিত্রার দিকে তাকালও না। ওর মুখে বসন্তের ঘা পেকে টস টস করছে। সাড়ে বারোটা নাগাদ আবার সে ডাক্তারের বাড়ি গেল। ডাক্তার খেতে বসেছে। সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দিল ছেলের হাত দিয়ে। ছেলেটি হেসে বলল, 'বাবা লিখেই রেখেছিল।'

বলার ধরনে মনে হল বলতে চায়, কি রকম বুদ্ধি দেখেছেন, বলার আগেই করে রেখেছে। কিন্তু পঁচিশ টাকা ফি দিয়েছি—এই কথা নিখিল ভোলেনি। কৃতজ্ঞতা না জানিয়েই চলে এল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙার অভ্যাস নেই, তাই চোখ জ্বালা করছে। ভাত খেয়েই সে শুয়ে পড়ল সুমিত্রার খাটের পাশে মেঝেয়। মা পুরুতমশায়ের বাড়ি গেছে সত্যনারায়ণের পুজোর ব্যবস্থা করতে। ক্যাজুয়াল লিভের হিসেব কষতে কষতে নিখিল ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে চা খেয়ে, নিখিল থলিটা হাতে ঝুলিয়ে বেরুল। বারবার পকেটে হাত দিয়ে দেখল ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা আছে কিনা।

গলি থেকে বড় রাস্তায় পা দিয়েই নিখিল ভাবলে এবার কী করার? চারিদিকেই ঝকঝকে আলো, লোক, গাড়ি। থলিটা এখানেই কোথাও ফেলে রেখে গেলে কেমন হয়! এই ভেবে পায়ের কাছে সেটি রাখল।

অমনি কোথা থেকে একটা লোক এসে বলল, 'পুজোর বাজার সেরে ফেললেন?' লোকটার লন্ড্রি আছ পাড়াতেই। থলিটা হাতে তুলে নিয়ে নিখিল মাথা নেড়ে হাঁটা শুরু করল।

সুদৃশ্য থলিটা রাস্তায় ফেলে রেখে গেলে অনেকেরই চোখে পড়বে। তার মধ্যে পাড়ার লোকও থাকতে পারে। তারপর কেউ হয়তো খুলবে। বস্তুটি দেখেই হাউমাউ করে পুলিশে খবর দেবে। সেই চেনা লোকটি তখন আগ বাড়িয়ে বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি লোকটাকে, আমাদের পাড়াতেই ছাব্বিশের-দুইয়ে থাকে, নাম নিখিল চাটুজ্যে, ব্যাঙ্কে কাজ করে। তখন পুলিশটা হাতে কাগজের থলিটা ঝুলিয়ে এবং তার পিছনে একপাল লোক মজা দেখা এবং কেচ্ছা রটাবার জন্য বাড়িতে সে হাজির হবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে নিখিলের দম বন্ধ হবার উপক্রম। সামনেই চিলড্রেন্স পার্ক, তারই একটা বেঞ্চে, কোলে থলিটা রেখে সে বসল। কিছুক্ষণ সে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চেনা মানুষ কেউ আছে কি না। কাউকেই সে চিনল না, তবে তাকে চেনে এমন অনেকেই হয়তো থাকতে পারে। চিনেবাদামওলা ডেকে এক আনার কিনল। বাদাম খেতে খেতে ভাঁজতে শুরু করল, কীভাবে থলিটার হাত থেকে বিনা ঝামেলার রেহাই পাওয়া যায়।

একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। আধ মাইলটাক দূরে নির্জন গলি বা মাঠ দেখে থলিটা টুক করে নামিয়ে রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। এই ভেবে নিখিল ভারি সুখবোধ করল। চিনেবাদামওলাকে আবার ডেকে এক আনার কিনল এবং ঝগড়া করে দুটো বেশি বাদামও আদায় করল।

একা চুপচাপ বসে থাকা যায় না, বিশেষত তার সামনের দৃশ্য—বাচ্চাদের ছুটোছুটি, কিশোরীদের পায়চারিতে নকল গাম্ভীর্য, অফিস-ফেরত বাসের জানলার সারি বাঁধা বিবর্ণ মুখশ্রী, বারান্দায় কনুই রাখা নতদেহে নিঃসঙ্গ যুবতী, রিকশাচালকের ঘামভেজা ঘাড়—যদি খুবই একঘেয়ে হয়। নিখিল ভাবল লন্ড্রিওলাটাকে। এমন কোনওবার যায়নি প্যান্টের একটা-না-একটা বোতাম ভেঙেছে। শেষবার ঝগড়া করতে হয়েছে শার্টে নম্বরি মার্কা দেওয়ার ব্যাপারে। লোকের চোখে পড়ে কালিটা। এই সময়ে হঠাৎ নিখিলের মনে পড়ল, খুব ছেলেবয়সে একটা ডিটেকটিভ বইয়ে সে পড়েছিল, ধোপাবাড়িতে কাচা কাপড়ের নম্বরি মার্কা ধরে তদন্ত করতে করতে গোয়েন্দা শেষকালে খুনিকে ধরে ফেলে। এই থলের মধ্যে সুমিত্রার কাপড় এবং বিছানার চাদরে নিশ্চয়ই লন্ড্রিওলাটা নম্বর দিয়েছে। সুতরাং যেখানেই ফেলা যাক না কেন, পুলিশ ঠিক বার করে ফেলবেই!

এইবার ঘামতে শুরু করল নিখিল। যদি বছরখানেকেরেও বাচ্চা হত, তাহলে সকলের চোখের সামনে দিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে পোড়ানো যেত। কিন্তু একতাল মাংসপিণ্ডকে তা করা সম্ভব নয়। আর হতে পারে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসা। কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে! হই-চই করে ভিড় জমাবে। কত কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। শেষে পুলিশে দেবে। কী ফেললুম সেটা প্রমাণ করা সোজা কথা নয়। সার্টিফিকেটটা দেখালেও বিশ্বাস করবে কেন? ঠিক ওই জিনিসটাই ফেলেছি কি অন্য কাউকে খুন করে কুচিকুচি করে প্যাকেটে বেঁধে ফেলিনি তার প্রমাণ কী!

নিখিলের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। আর হতে পারে এই থলিটার রং-চং দেখে যদি কেউ এটাকে চুরি করে। চোর নিশ্চয় পুলিশকে খবর দেবে না। নিখিল এধার-ওধার তাকিয়ে চোর খুঁজতে শুরু করল, এবং আশ্চর্য হল একটা লোককেও তার চোর-চোর মনে হচ্ছে না। অথচ প্রতিদিনই যত লোক দেখে তার মধ্যে প্রায় ডজনখানেককে তার চোর বলে মনে হয়। এমনকি ঘর থেকে ঘড়িটা

চুরি যাওয়ায় ঝিকে সবাই সন্দেহ করলেও তার প্রথমেই মনে পড়েছিল বাড়িওলার মুখ। কিন্তু এখন একটাও চোর সে দেখতে প'চ্ছে না।

চোর নিশ্চয়ই কলকাতায় আছে, হয়তো এখন এই জায়গাটায় একজনও নেই। নিখিল থলি হাতে উঠে পড়ল। থলিটা হাতে ঘুরে বেড়ালে নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও ছিন্তাইওলাকে আকর্ষণ করবে। তবে অন্ধকার রাস্তায় ছাড়া তাদের পাওয়া যাবে না। নিখিল আবার বসে পড়ল সন্ধ্যাটা পুরোপুরি নামার অপেক্ষায়।

যখন জাঁকিয়ে সন্ধ্যা নামল নিখিল হাঁটতে শুরু করল উদ্দেশ্যহীনভাবে। বহু ডাস্টবিন সে পেল যেখানে থলিটা ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু একটা ভয় ওর মনে গেঁথে আছে, বলা যায় না কোথা থেকে দেখে ফেলবে—হয়তো অন্ধকার গলিতে কোনও যুবক পাড়ার মেয়েকে চুমু খেতে খেতে কিংবা কোনও বুড়ি অন্ধকার বারান্দায় জপ করতে করতে বা রান্নাঘর থেকে কোনও গৃহিণী। একবার চেঁচিয়ে উঠলেই হল! তাও যদি না হয়, কাপড়ের নম্বরি মার্কা যাবে কোথায়? পুলিশের গোয়েন্দা তদন্ত করে ঠিক বার করে ফেলবে। তখন অবশ্য সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলা যাবে, মশাই অবৈধ কোনও ব্যাপার নয়। বাড়িওলাকে চোরের মত দেখতে হলেও বলেছে অ্যাকসিডেন্ট। স্বেচ্ছাকৃত ঘটনা নয়। যে কোনও পরিবারেই এমন ঘটতে পারে। কিন্তু এসব বলার আগেই, পুলিশ দেখে পাড়ায় ফিসফাস শুরু হবে। গুজব রটবে। মাস কয়েক আগেই তো একটা সার্জেন্ট এসেছিল পাড়ায়, অমনি শোনা গেল, দেবব্রতবাবু বাড়িতে জুয়া খেলত তাই ধরে নিয়ে গেল। শেষে জানা যায়, ভদ্রলোকের একটা রিক্‌শা আছে, সেটা অ্যাকসিডেন্ট করায় থানায় ডাক পড়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে নিখিল ক্লান্ত হয়ে পড়ল। থলিটা ছিনিয়ে নিতে কেউ তার সামনে ছোরা বার করল না। অথচ বস্তি দেখলেই সে ঢুকেছে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। প্রায় নির্জন গলি দিয়েও হাঁটল। একটা ঝি-শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ শুধু তেরছা চোখে তাকে দেখল মাত্র। এছাড়া কিছুই না হওয়ায় নিখিল ভাবতে বাধ্য হল, তাহলে?

এইবার সে ভয় পেতে শুরু করল। তাহলে এই সাত মাসের মৃত সন্তানটিকে নিয়ে সে এখন করবে কি? পনেরো-ষোলো ঘণ্টা হয়ে গেল। এবার পচ ধরবে, গন্ধ বেরোবে। অন্তত সুমিত্রার পেটে পুরো সময়টা কাটিয়েও যদি বেরুত! দোষটা অবশ্য কারুরই নয়। অথচ এইরকম একটা নির্দোষ ব্যাপার তাকে বিপাকে ফেলল। নিখিলের খুব রাগও হল। সেই সঙ্গে এটাও টের পেতে লাগল—আসলে সে ভয়ানক ভিতু। রীতিমত কাপুরুষ। এরকম ঘটনা নিশ্চয় কলকাতায় এই প্রথম ঘটছে না। সেসব ক্ষেত্রে কিছু একটা অবশ্যই করা হয়েছে। কিন্তু, নিখিল ভাবল, তারা তো আমার মত নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতিগত হুবহু মিল থাকতেই পারে না। তারা নিশ্চয়ই সাহসী ছিল অন্তত আমার থেকে।

হঠাৎ নিখিলের মনে হল, তার থেকেও ভিতু এমন কারুর ঘাড়ে যদি দায়িত্বটা চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে রেহাই মিলবে। ভিতুরা পুলিশে যাবে না। থলিটা নিয়ে এইভাবেই ঘুরে বেড়াবে আর ভাববে কি করে রেহাই পাওয়া যায়। অবশ্য গোপনে তার ঘাড়ে চাপাতে হবে, নয়তো জিনিসটা কার জানতে পারলে বাড়ি বয়ে ফেরত দিয়ে আসবে।

চেনাশুনা ভিতু কে আছে, নিখিল তাই ভাববার জন্য একটা ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে পড়ল। বহুজনের নাম তার মনে এল। তারা কি পরিমাণ ভিতু তার নানান উদাহরণ মনে করতে লাগল। অবশেষে শশাঙ্ককেই তার পছন্দ হল। প্রায় চার বছর সুমিত্রার গৃহশিক্ষক ছিল। সুমিত্রাদের তরফ থেকেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু শশাঙ্ক নানান অজুহাত দেখিয়ে বিয়েতে রাজি হয়নি। নিখিলের সঙ্গে সুমিত্রার আলাপ ওই করিয়ে দেয়! অবশ্য মাস-ছয়েক হল ও বিয়ে করেছে। এখন যদি শশাঙ্কের সামনে হাজির হওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় ওর মনের মধ্যে সুমিত্রা, প্রেম, বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য অর্থাৎ যাবতীয় ধাষ্টামো এবং অন্য আর-একজনকে বিবাহ সব মিলিয়ে অপরাধবোধ তৈরি করবে। প্রাক্তন প্রেমিকদের তুল্য ভিতু আর কে? এই থলিটা ওর হাতে কোনওরকমে গছাতে পারলে, তারপর শশাঙ্করই ঝামেলা। বস্তুত সুমিত্রার প্রতি ওব বিশ্বাসঘাতকতার এটা ভাল একাট শাস্তি হবে।

নিখিল এতসব ভেবে প্রফুল্লবোধ করল। তবে পুরোপুরি অস্বস্তি ঘুচল না। শশাঙ্ক থাকে একটা গলির মধ্যে একতলায়। কড়া নাড়তে ঝি দরজা খুলল। শশাঙ্ক বেরিয়ে এল, পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। নিখিলকে চিনতে পেরে উচ্চকণ্ঠে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে গেল।

'সন্ধ্যা, দ্যাখো দ্যাখো কে এসেছে।' এই বলে শশাঙ্ক ডাকতেই ভিতর থেকে ওর বউ এল। দেখতে মোটামুটি। রেডিওয় গান গায়, দু-একটা রেকর্ডও আছে। নিখিল দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করল।

'আপনার কথা ওর কাছে শুনেছি।' এতে নিখিল বিস্মিতই হল। সুমিত্রার স্বামীর প্রসঙ্গ বউয়ের কাছে ভিতু শশাঙ্ক কি তুলবে? না কি এটা আলাপ করার একটা কেতা!

'আমার সব বন্ধুর গল্পই করেছি সন্ধ্যার কাছে, সুতরাং পরিচয় করিয়ে গুণপনার ব্যাখ্যার দরকার আর হবে না।'

শশাঙ্ক নতুন কেনা একটা বেতের চেয়োরে হেলান দিয়ে পা নাচাতে লাগল। ঘরের সব আসবাবপত্রই যে ওদের বিয়ের পর কেনা তা রঙের ঔজ্জ্বল্যতেই বোঝা যায়।

'ওনার গুণপনার খবর অবশ্য না বললেও আমরা জানি।' নিখিল ইচ্ছে করেই 'আমরা' বলল। সন্ধ্যাও যথারীতি বিনয় জানাতে 'ভারি তো গুণপনা, আমার মত

গাইয়ে গণ্ডাগণ্ডা আছে' ইত্যাদি কথা পরম সুখে বলে গেল। এরই মধ্যে নিখিল শশাঙ্কর হাবভাব জরিপ করে একটা প্ল্যান তৈরিতে হাত দিল।

'আমি তো এলাম, এবার আপনারাও একদিন চলুন।'

'নিশ্চয়।' শশাঙ্ক যেন প্রস্তাবটার জন্য ওত পেতেই ছিল। 'কবে যাব বলো, সামনের রোববার? তাহলে, ইলিশ খাওয়াতে হবে। তেলাপিয়া খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, সুমিত্রা দারুণ ইলিশ-ভাতে করতে পারে।'

নিখিলকে হাসতেই হল। সন্ধ্যা কপট উদ্বিগ্নতা দেখিয়ে বলল, 'এখন ইলিশ পাওয়া যায় না আর তুমি ভদ্রলোককে বিব্রত করতে বায়না ধরলে ইলিশ খাব।'

'আরে ও আবার ভদ্রলোক কি। ও তো নিখিল। ওকে সব থেকে লেগপুল করতাম আমি আর সনৎ। সনৎ লিখেছে ছুটি পেলে জানুয়ারিতে কলকাতা আসবে। তোর ঠিকানাটা লিখে দিস ওকে পাঠাব।' শশাঙ্ক সবিস্তারে সনৎ-এর গল্প করে চলল আর নিখিল ভাবল, একি!

'পুজোর বাজার নাকি?' হঠাৎ সন্ধ্যা প্রশ্ন করল। নিখিল লাজুক হেসে ঘাড় নাড়ল। শশাঙ্ক ছোঁ মেরে থলিটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'দেখি বউয়ের জন্য কি শাড়ি কিনলি।' নিখিল তাড়াতাড়ি ওর হাতটা চেপে ধরল। 'আরে ধ্যেৎ, দেখার কি আছে আর। মার থান, ঝিয়ের কমদামি একটা মিলের আর সুমিত্রার একটা তাঁতের ষোলো টাকার শাড়ি। খুলিসনি প্লিজ। বেশ বাঁধাছাদা রয়েছে আবার কেন খাটুনি বাড়াবি।'

'সন্ধ্যা দেখেছ, বউয়ের শাড়ি আছে কিনা, অন্যের হাতের ছোঁয়াতেও আপত্তি। কি রঙের কিনলি? শ্লেট না ডিপ মেরুন? সুমিত্রা একটা রং একবার পরেছিল মেরুনের ওপর গ্রিন ফুটিফুটি, পাড়টা হোয়াইট, দারুণ দেখাচ্ছিল ওকে।'

'রং খুব ফরসা বুঝি'! সন্ধ্যাকে কৌতূহলী দেখাল।

'না, খুব নয় আপনার মতই।'

'ওমা, তাহলে তো বেশ কালো।'

'আপনি কালো হলে আমরা তো আলকাতরা।'

নিখিল হাস্যমুখে শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল। শশাঙ্ক বড় করে ঘাড় নাড়ল। রঙের প্রশংসায় পুলকিত সন্ধ্যা বলল, 'দেখেছেন চা দিতেই ভুলে গেছি।'

সন্ধ্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই নিখিল বলল, 'শশাঙ্ক, একটা খুব অসুবিধায় পড়ে গেছি।' জিজ্ঞাসু নেত্রে শশাঙ্ক তাকিয়ে রইল। তখন নিখিল আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বলে টেবিলের ওপর রাখা কাগজের থালিটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওর মধ্যেই সেটা রয়েছে।'

শশাঙ্ক চড়াং করে সিধে হয়ে বসল। 'তার মানে, তুমি ওই কুৎসিত জিনিসটা আমার টেবিলের উপর রেখেছ? নামাও নামাও বলছি।' দাঁত চেপে হিস্‌হিস্ করে

শশাঙ্ক আঙুল দিয়ে মেঝে দেখাল। নিখিল নামিয়ে রাখল।

'কি করতে এখানে এনেছ?' চাপা স্বরেই শশাঙ্ক বলল, ভিতরের দিকে চোখ রেখে।

'এটাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'ফেলে দেবে, আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'বলাটা খুবই সোজা, ফেলতে গেলেই লোকে দেখে ফেলবে। তখন চিৎকার হবে, একগাদা লোক জমবে, টানতে টানতে হাজার হাজার লোকের মধ্য দিয়ে থানায় নিয়ে যাবে। অশ্লীল কথা বলাবালি করবে।'

'তা আমায় কি করতে হবে?'

'এটার একটা বন্দোবস্ত করে দে, শশাঙ্ক প্লিজ। তোর কথাতেই বিয়ে করেছিলুম। এবার তুই আমার কথা রাখ।' নিখিল হাত বাড়াল শশাঙ্কর হাত চেপে ধরার জন্য। হাতদুটো তার আগেই শশাঙ্ক তুলে নিয়েছে। টেবিলে নিখিলের দুটো হাত পড়ে রইল।

'আমার কথাতেই শুধু বিয়ে করেছিলি? সুমিত্রাকে তোর পছন্দ হয়নি?'

'নিশ্চয়, ওকে নিশ্চয় ভালবেসেছিলুম, আজও বাসি। কিন্তু তোর সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ছিল তাও জানি।'

'তাই এক্স্চেঞ্জ করতে এসেছিস্ এই জিনিসটার বদলে।' শশাঙ্ক থলিটার দিকে আঙুল তুলেছে তখন চায়ের কাপ হাতে সন্ধ্যা ঢুকল।

'কিসের এক্স্চেঞ্জ?' হাসি মুখ করে সন্ধ্যা একটা চেয়ারে বসল।

'নিখিল বলছিল তুমি যদি গোটাকতক গান শোনাও। তাইতে বললুম বউয়ের শাড়িটা তার বদলে দিতে হবে।'

'আহা, পছন্দ করে উনি কিনেছেন। আর গান যা গাই সে এমন কিছু নয়।'

সন্ধ্যা মেয়েটি ভাল। এরপর খুব বেশি সাধাসাধি করতে হয়নি। খালি গলায় তিনটি গান করল। শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নিখিলকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পাঞ্জাবিটা দাও।'

ওরা দুজন চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। রাত হয়েছে। রাস্তায় লোকজন কম। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলোর পরিমাণ খুবই অল্প। নিখিলের মনে হল, রাস্তার যে-কোনও জায়গায় থলিটা রেখে নির্বিবাদে চলে যাওয়া যায়।

'ওটা দে', শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কেন!'

'ওই ডাস্টবিনটায় ফেলে দি।'

'সে তো আমিও পারতুম, তাহলে তোর কাছে এলুম কেন?'

'তবে কি মতলব তোর?' হঠাৎ শশাঙ্ক গলার স্বর ও দাঁড়াবার ভঙ্গি পালটে

ফেলল। নিখিল পা-পা করে পিছোল। দূরে পানের দোকানটা মাত্র খোলা। এখন থলি হাতে ছুটতে শুরু করলে চোর বলে ধার পড়তেই হবে। নিখিল দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এখন সুমিত্রার বিয়ে-করা স্বামী।' শশাঙ্ক ওর বুকের জামা মুঠো করে ধরল, 'তুমি এই জিনিসটার বৈধ অভিভাবক, তার সার্টিফিকেট পকেটে আছে। অতএব এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। আমার দায়িত্ব বহুদিন আগে শেষ হয়েছে। তবুও আমার কাছে কেন এসেছ?' নিখিলকে ঝাঁকাতে শুরু করল শশাঙ্ক।

'তুই আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিস। তুই কাওয়ার্ড, তুই ইরেসপনসিব্‌ল।' নিখিল মরিয়া হয়ে উঠল শূন্য প্রায়ান্ধকার রাজপথে। শশাঙ্কর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধাক্কা দিল। বদলে জোরে চড় মারল শশাঙ্ক। এইবার ক্রোধে দিশাহারা হয়ে মারবার জন্য নিখিল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হঠাৎ জানালা খুলে দোতলা থেকে এক পুরুষকণ্ঠ গর্জে উঠল, 'কি হচ্ছে, অ্যাঁ। গুণ্ডামি?' লোকটা চিৎকার করে উঠল। দুড়দাড় করে কিছু লোকের ছুটে আসার শব্দ এল অন্ধকারের মধ্য থেকে।

নিখিল আর চিন্তা করার সুযোগ নিজেকে দিল না। প্রাণপণে রাস্তার নির্জন দিকে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে যখন দম ফুরিয়ে এল, থামল। তখন পায়চারি করতে করতে এক কনস্টেবল তার কাছে এসে কেন সে এমন করে হাঁপাচ্ছে তার কারণ জানতে চাইল। নিখিল বলল, একটা গুণ্ডা তাকে তাড়া করেছিল। গুণ্ডাটা কোনদিকে কনস্টেবল জানতে চাইল। নিখিল আঙুল দিয়ে দেখাল। কনস্টেবলটি কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে 'আচ্ছা ঠিক হ্যায়' বলে পায়চারি করতে করতে চলে গেল।

নিখিল এইবার টের পেল কাগজের থলিটা তার কাছে নেই। ছোটার সময়ও হাতে ছিল না। সেটি শশাঙ্কর কাছেই রয়ে গেছে। শশাঙ্ককে লোকগুলো জিজ্ঞাসা করলে ও নিশ্চয় বলবে গুণ্ডা তাড়া করেছিল। গুণ্ডা নিশ্চয়ই সুদৃশ্য কাগজের থলিতে ভরা কাপড়ের প্যাকেট ফেলে যায়নি। লোকগুলো খুব খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, ভাগ্যিস আমরা এসে পড়লুম তাই ভদ্রলোকের এই জিনিসটা রক্ষে পেল। এই বলে তারা থলিটা শশাঙ্কর হাতে তুলে দেবে।

নিখল বুকপকেটে হাত দিয়ে সার্টিফিকেটটা অনুভব করে ভারি আরাম পেল। এবং সে মনশ্চক্ষে দেখল, শশাঙ্ক সেই থলিটা হাতে নিয়ে হেঁটে চলেছে।

রাখাল কড়াই

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

চাকবেড়ের মোড় থেকে বাস চন্দনেশ্বরের বাজারের দিকে ঘুরে গেল। ভাঙড় যাবে। চারদিকে ধানখেত। তার ভেতর রোগা পিচ-রাস্তা বেয়ে চাকার রাজহাঁস ছুটে যাচ্ছে। ক্ষীরোদ পাকড়াশি বাস-রাস্তা থেকে থেমে খাল পাড়ে উঠে হন হন করে হাঁটা ধরল। হাতে পাকানো বাসের টিকিট। এখন বিদ্যেধরীর বাদা মাড়িয়ে গরাণবেড়ে পৌঁছে দুপুরের আগেই লোকজন ডাকতে হবে।

খবর যতদূর, জিনিস নাকি সরেস—ঘরে রেখে রস মেরে নিলে পিঁড়ি চুই পিঁড়ি, জানলা দরজা কপাট সব হবে। বাদার গাছ, চার মানুষেও বেড় পায় না—হোক না তেঁতুল। শাল সেগুনের কারবারে কে দাঁড়াবে? বৌবাজার, শেয়ালদহর ক'খানা বাছাই ঘর বাদে সব দোকানই জাম-জামরুল-তেঁতুলে ছেয়ে গেছে। ভাল পালিশের চেকনাইয়ে কত মিটসেফ, আলনা, আলমারি,ইজিচেয়ার দিব্যি বাজারে চলে যাচ্ছে। এই ডামাডোলে ক্ষীরোদ এমন সরেস তেঁতুল কাঠের খোঁজ পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি। লোকজনের ভরসা না করে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে। শ্রীমানি মার্কেটের ধারে ধারে ক'ঘর কবিরাজের দোকান। নানান জায়গার লোক শেকড়বাকড়, লতা-পাতা বেচতে আসে। হরনাথ তর্কভূষণ বৃহৎ গুগ্‌গুল ও চ্যবনপ্রাশের বয়ম রাখবে বলে গত শ্রাবণে গাব্দা মত পাঁচ তাকের এক আলমারি নিয়েছিল। পরশু সেই টাকার তাগাদায় গিয়ে এই গাছের সন্ধান।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর বাপকেলে দোকান। তর্কভূষণ ইলেকট্রিকের ধার ধারে না। হ্যারিকেনের সামনে বাঁদুরি টুপি কম্ফর্টার বালাপোষ চাপিয়ে দশাসই লাশ একেবারে সাক্ষাৎ যম সেজে বসে। চার কিস্তিতে আলমারির দাম শেষ হওয়ার কথা—দশ বারেও অর্ধেক উঠিয়ে আনতে পারেনি ক্ষীরোদ। শিষ উঠে হ্যারিকেন কেবল কালি ওগরাচ্ছে। কম্ফর্টারের আলগা গেরোর ভেতর দিয়ে খাবলা পাকা দাড়ির সাদা ছোপ। আধ ঘণ্টা বসেও টাকার কথাটা পাড়তে পারেনি। পা নামাতেই মেঝের ড্যাম্প কোমর অবধি উঠে এসেছিল পরশু। ভাল জ্বালা! এই ড্যাম্পের হাত থেকে ভাল ভাল বটিকা, পাঁচ বাঁচানোর জন্যে হরনাথ হাত ধরে আলমারি

চেয়েছিল একটা। এখন টাকার কথা তুললেই বলে শীতটা ভাল করে পাকুক—শ্লেষ্মা ধাতের সব রুগী এই তর্কভূষণের দোরে এসে লাইন দেবে। তখন নাকি আলমারির দাম শুধে আগাম সুদ্ধ চার পেয়ার চেয়ারের অর্ডার দেবে হরনাথ।

আগের অবস্থা থাকলে ক্ষীরোদ দু'খানা চেয়ার অমনি করে দিত কবিরাজকে। বুড়ো আর বেশিদিন নেই। ঠিক তখনই ফুটপাত থেকে মুসকো মত একটা লোক সোজা হ্যারিকেনের সামনে উঠে এসেছিল। গায়ে জড়ানো কাপড়ের খুঁট টেবিলে আলগা করে দিল লোকটা। দেড়পো আধসের ট্যাংরার চেয়েও লম্বা লম্বা তেঁতুল, 'এনেছি—এ কটার বেশি হল না—'

হাত পাঁচেক লম্বা, মাথার চুল অনেকটাই সাদা, কুঁজো হয়ে দাঁড়ানোয় পেটের খোঁদলে দিব্যি একটা ধামা বসিয়ে দেওয়া যায়।

তর্কভূষণ টুপির ভেতর থেকেই বলল, 'এর চেয়ে বড় পেলে না?'

'থাকবে না কেন? পাবার যো আছে—গাছতলায় পড়তেই বেদেদের শোর এসে চেঁচেপুঁছে খেয়ে যাবে—'

একটা তেঁতুল হ্যারিকেনের সামনে তুলে ধরে কবিরাজ গন্ধ নিল নাকে, 'বাড়ন কমে গেছে বোধহয়—'

'তোমার বাপের আমল থেকে দে যাচ্ছি—কতকেলে গাছ, এবারে ছোট হয়ে আসছে।'

ক্ষীরোদ আর থাকতে পারেনি, 'কত কালের গাছ?'

'তা ধরুন আমাদের সাতপুরুষ ওর ডালে পুড়েছে—এখন জুড়ে দেখুন।'

মনে মনে হিসেব করতে যাচ্ছিল ক্ষীরোদ। লোকটা সব গুলিয়ে দিল, 'এ তেঁতুল তো খেতি পারিনে আমরা—বিষ! একবার খেলিই জ্বর—তারপর ভুল বকে কালঘুম—একদম ঢলে পড়তি হবেনে!'

হরনাথ একটা তেঁতুল ভেঙে তখনও গন্ধ শুঁকছে।

ক্ষীরোদের মুখ দেখে কী দয়া হল লোকটার। বলল, 'এ আপনার জঙ্গুলে তেঁতুল। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাপ জঙ্গল হাসিল করে গরাণবেড়ের মুলুক বসায়—সেই ইস্তক গাছটা আছে। কী শোভা ছিল আগে—ছোটবেলায় গা ভরে এমন ঝুলে থাকত—'

'না গায়েন, রস কষে গেছে—এ তেঁতুলে আমার হবে না। ও তুমি নিয়ে যাও—'

লোকটা হ্যারিকেন বরাবর সিধে দাঁড়িয়ে গেল, 'তা হবে না কবিরাজ। কত আজে-বাজে লতা-পাতা কিনছ দিনভর—আর গাছের এমন আদত ফলনে ফিরে যেতি হবে?'

'দরকার না থাকলে যেতে হবে।'

'এতটা পথ ভেঙে এলুম'—

'সে তুমি ফি বারই বল। দরকার না থাকলে কাহাতক কিনি বলত গায়েন? এমন নয় যে, ঘরে রেখে টক রেঁধে খাব!'

'পোঁকায় এবার ধান পাট সব শুকিয়ে পুড়িয়ে জেরবার করেছে। নয়ত আসতুম না—নাও রেখে দাও, খরার দিন কাজে দেবে—'

লোকটা নিজে নিজেই সামনের আলমারির খোলা তাকে একটা একটা করে তেঁতুল তুলে সাজিয়ে রাখছিল।

'নোংরা কর না। ঝামেলা ভাল লাগে না গায়েন'—হরনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, আবার চেয়ারে বসল। গায়েন কাপড়ের খুঁটে তেঁতুল তুলে নিয়ে ফুটপাথে নেমে গেল।

ভীষণ শীত পড়েছে, মুলোর দর এখনও নামছে না—এইসব ধানাই-পানাই বলে টাকার কথা না পেড়েই কোনও গতিকে ক্ষীরোদ রাস্তায় নেমে পড়ল। তেঁতুল নিয়ে দু'-দুটো হুমদো বুড়ো যা করছিল, চোখে দেখা যায় না। ফুটপাথের তেলেভাজা দোকানির তোলা উনুনের ধোঁয়া ফুঁড়ে সাদা রঙের লম্বাই চওড়াই গায়েন হুস হাস এগোচ্ছে। পরনের কাপড়ের খানিকটা গায়ে। ক্ষীরোদ একরকম দৌড়েই ধরে ফেলল, 'কতদূর যাওয়া হবে?'

রাস টেনে দাঁড়াল লোকটা, 'কোথায় দেখিচি বলুন তো?'

'কবিরাজের দোকানে—এই মাত্তব!'

দুই থাবা দিয়ে ক্ষীরোদের হাত ধরল। জানলার রডের পারা আঙুলগুলো আর একটু লম্বা হলে তার কুনই ধরে ফেলত।

'বুড়োর বাপ থাকতে তেঁতুল, অর্জুন ছাল কত কি দে আসতুম'—একটু থেমে বলল, 'আগে কত রুগী বসে থাকত—হরনাথই বা করবে কি!'

ক্ষীরোদের হাত ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষীরোদে দৌড়তে লাগল। 'ন'টা আটান্ন না ধরলে বাস পাবনি। এত আঁধার—এখন আর দু'কোশ একা হাঁটতি ভাল লাগে না।'

ক্ষীরোদ আর ভূমিকা করার সময় পেলে না, 'অনেকদিনের গাছ—'

দমকে বেরিয়ে যাবার আগে গায়েন আবার থামল, 'কোন গাছ?'

ফুটপাথে কথা বলা যায় না। লোকজন বন্ধ নেই কোনও সময়, 'তাই তো বলছিলেন গায়েন মশায়—সাতপুরুষের—'

একদম থেমে গেল গায়েন, 'ওঃ! আমাগে গড়াণবেড়ের—সে মশায় বড় অগড়ের গাছ—তার অগড়ের কথা কত বলব—'

'যদি বলেন তো একবার দেখে আসি—'

'যাবেন? গড়াণবেড়ে যাবেন?'

'খুব! সকাল-সকাল গিয়ে ঘুরে আসব। কালই সকালে—'

'কাল নয়—আট গাড়ি খড় নে খালিশপুর যেতে হবে—পরশু আসুন—ভোরের ট্রেনে চড়ে বাসুলিডেঙ্গা নামবেন, চাকবেড়ের মোড়ে আমায় পাবেন—না দেখলি হাঁক পাড়বেন নীলাম্বর গায়েন বলে—'

পরশু আর কথা বলতে পারেনি গায়েন। না ছুটলে ন'টা আটান্ন মিস্ হয়ে যেত।

সে রাতেই গোলায় ফিরে ক্ষীরোদ তিনখানা বড় করাত ভাড়া নিয়েছে। গরাণবেড়ের লোকজন লাগিয়ে তিনদিনে কুড়োলে কুড়োলে কেটে পুরো গাছটা খানকয়েক গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হবে। বাসুলিডাঙ্গা থেকে রেল বুক করে দিলে পরদিনই চিৎপুর ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারি। তারপর কয়েক খেপে লরিতে পুরো গাছটা গোলায়। তখন ভাড়ার করাতে চেরাই, প্লেন, পালিশ। অতকেলে গাছ—মোদ্দা কত হাজার সি এফটিতে দাঁড়াবে! মনে মনে হিসেব কষতে গিয়ে সব অঙ্ক গুলিয়ে গেছে। এসব কাগজ-কলম ছাড়া জুৎ হয় না। হাঁক দিতে হল না—বরং কানের কাছে গিয়ে আস্তে ডাক দিল ক্ষীরোদ, '—গায়েন মশাই, ও নীলাম্বর গায়েন—'

একটু নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খালপাড় থেকেই দেখতে পেয়েছে ক্ষীরোদ। পুকুরপাড়ে তুলে দেওয়া শুকনো কচুরিপানার ডাই জুড়ে মা-সুদ্ধ পাঁচ-ছ'টা কুকুরছানা রোদ পোহাচ্ছে। তাদেরই দুটোকে কোলেনিয়ে গায়েন ঝিম মেরে বসে।

'এসে গেছেন। ভাবলুম বেলাবেলি বেইরি আসতে দেরি হবে আপনার, তাই অঘোরের ঘরে বসতিই এই কাণ্ড—'। ভগ্ ভগ্ করে গন্ধ আসছে। সারা মুখে জোর গোটা আটেক দাঁত। তার ভেতর দিয়েই হেসে বলল গায়েন, 'অঘোর বেটে মুকুজ্যেদের চর-হাসিল দশ বিঘে খালি জমি কিনল। ওদের হয়ে অনেক খুনখারাবি করেছি—মুকুজ্যেরা তাই আমাকে দেখেই তিন হাজারের ভেতর সবটা জায়গা অঘোরকে লিখে দিলে। বেটে অঘোর সকালবেলাই তাই এসব ছাইপাশ গিলিয়ে দিলে—'

আল ধরে ধরে গায়েন এগোচ্ছে—ক্ষীরোদ খানিক দৌড়ে তাকে ধরল। দুই ছেলে নিয়ে এক চাষী পান্তা পেড়ে বসেছে। একটা উঁচু ঢিবিতে পাল্লা খাটিয়ে মাটের ধান মাঠেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেকথা বলতে গায়েন তিরিক্ষি হয়ে উঠল, 'লিভির ভয়ে পিচ-রাস্তায় ধান নে যাবার পথ নেই—চৌকি বসেছে—'

খানিক জায়গা জুড়ে ধানগাছ সব খাক্। এসব জায়গায় বর্ষার মুখে মুখে বিষপোকার ঝাঁক উড়ে গেছে—ধান দূরে থাক, ভাল খড়ও পাওয়া যাবে না।

পথ ভাঙতে ভাঙতে গায়েন নিচু হয়ে ঘাসের চেয়েও সবুজ খুদে খুদে বরবটি তুলে ক্ষীরোদের হাতে দিল, 'ভেঙে মুখে দিন—রাখাল কড়াই, বয়েসকালে গোরু চরাতে এসে ক্ষিধের চোটে এসব কত খেয়েছি—শুকিয়ে নিলি ভাল ডাল হয়—'

'গোরু ছিল বুঝি—'

'হেলে গোরুই বেশি—একাই বিঘেটাক দিন ভরে চষে ফেলেছি কত। সন্ধেবেলা চরানির মাঠ ঢেকে রেখে দিতুম—রাত থাকতি জোচ্ছনায় সেখানে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতুম, ভোর হলিই হালে জুতে—'

'সাপটাপ—'

'কোথায়? আজকাল আর দেখিনে—'

ক্ষীরোদ কিন্তু সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল। এমন দশ-বিশ হাজার বিঘের মাঠে যে-কোনও জায়গা থেকেই সাপ উঠে আসতে পারে।

'আছে দু'-একটা—খুব রাত না হলি বেরোয় না। ভয়ানক বিষধর। তবে আগে অনেক ছেল। সত্তর-আশিটে কেউটে আমিই সাবাড় করিছি—'

'লাঠি দিয়ে—'

'লাঠি কোথায়! এই হাত দে—' গায়েন দাঁড়িয়ে গেল।

আর কত দূর গরাণবেড়ে! অনেকক্ষণ বসতবাড়ির পরিষ্কার চিবি জায়গায় দাঁড়ানো হয়নি। নিশ্চয় সেখানে সাপ থাকে না।

'এখন যেখানে দাঁড়িয়ে—তার মাথায় অন্তত ষাট হাত জল ছেল—বিদ্যেধরীর জল, নৌকো এ জায়গায় এলি পয়সা ছুঁড়ে দিতুম—'

'এখানে? নদী?'

'এ জায়গা তো মধ্যিখান—তিন মাইল চওড়া বুক ছেল, আমিই চাল বোঝাই দে ধোসারহাট ঘুরে চেতলার আঢ্যিদের গোলায় কালীগঙ্গা ধরে নৌকো পৌঁছে দিতুম। ওই যে বাবলার ঝাড়—রাশ দশেক হবে, ওসব গাছ তো বছর সাতের—নদী ফুরে আসার মুখি পাখিদের কাণ্ড।'

ক্ষীরোদের আর কিছু বলতে হল না অনেকক্ষণ। নীলাম্বর আগে আগে হাঁটছে। পেছনে ক্ষীরোদ, সামনে কেউ নেই। সেই ফাঁকার দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর কথা বলছে। উলটো দিক থেকে বাতাস এসে তার কিছু শব্দ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীরোদ খানিকটা শুনতে পেল—তাকেও পথ দেখে পা চালাতে হচ্ছে।

'বিদ্যেধরীর বুক জেগে উঠতি দু'পাশে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। যার জমির লাগোয়া চর ওঠে সেই রাজা—দুশো-পাঁচশো বিঘে হামেশাই অনেকের খেতের গা দিয়ে জেগে গেল। কিন্তু দখলে রাখা চাই। আর লাঠালাঠি!' এখানটায় থেমে গায়েন দু'হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠল।

ক্ষীরোদ মানে না বুঝেও সঙ্গে সঙ্গে হাসল। গাছটা নীলাম্বরদের।

'আমি তখন বড় গুণ্ডো। বুকে বুকে খাড়াই গুতো মেরে খেলি—যার লাগে তার চড়চড় করে আওয়াজ হয়—আমি দাঁড়াইনে, ফেড়ে বেইরে যাই। মুকুজ্যেদের বড় তরফ ডেকে নে বললে, নারাণপুরের কাছে পাঁচ হাজার বিঘের চরটা দখল করে দিলি একশো বিঘে জায়গা লিখে দেবে—

'তা দেছেল—হোসেনপুরের মোড়লদের বড় ছেলেটাকে কেটে ফেললাম। জোয়ান বয়েস, রক্তের রঙ কী—জমি দখলে এমন কত হল।' গায়েন থেমে থেকে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে রূপশাল ধান দেখিছেন ওখানটায়—ঠিক ওই খাক্ মত জায়গাটায় খুনটো করি—'

ধান আছে—ভেতরের দুধ পোকার বিষে শুকিয়ে থাক্‌। এতক্ষণ দুজনে গোরুর গাড়ির লিক্‌ ধরে এগোচ্ছিল। এবারে গায়েনের সঙ্গে মাঠে নামল ক্ষীরোদ।

'খুনটা হয়ে যাওয়ার পর মন মুষড়ে গেল—কিন্তু তখন ছেলেরা ছোট, আমার ফাঁসি হলে ওদের দেখত কে? মাঠের মধ্যি বসেই মোড়লদের ছেলেটাকে ল্যাজা দে এতটুকুন টুকরো টুকরো করে চৌদিক ছড়িয়ে দেলাম—আর কী শকুন। তিনদিনের ভেতর সব সাফ!

'তারপর একশো বিঘে নে কি করব? আর কি মাটি! ধান ছড়িয়ে দি তো ধান বেরোয়—এই তার গোছ—কিন্তু মুশকিল দেখা দেল সাপ নে। যেখানে কোপাও নরম মাটি পেয়ে সাতদিনের ভেতর গোখরো তার ছানাপোনা নে হাজির। গোটা কয়েক মারার পর আমাকে দেখলি ওরা গর্তে গিয়ে লুকোত। আমি লেজ ধরে টানতুম—উলটো টানে গায়ের মাংস খাবলা-খাবলা উঠি যেত। সে অবস্থায় মাথার ওপর পাক দে ছুঁড়ে দিতুম—তারপর বাচ্চারাই পিটে মারত।'

'গরাণবেড়ে আর কতদূর?'

'এসে গিছি।'

নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আগেকার পাড়ে এসে উঠতে আরও আধ ঘণ্টা লাগল। সেখানেই মার খাওয়া নদীটাকে পাওয়া গেল। খানা কেটে দেওয়া ড্রেনের চেয়েও সরু—জলের ছিটেফোঁটাও নেই, দু'ধারে কিছু বুনো ফুল ফোটে।

'এই নদী গিয়েই আমাদের সব্বনাশের শুরু। নদীও গেল—মাছ গেল, ব্যবসা গেল—'

এত গাছ, আড়াল আবডাল নেই—শুধু মাঠ, হামেশাই দশ-বিশ বিঘের দিঘি—তাতে পলক পড়ে না এমন শালুকের পুরু চাদর, বাতাস একটু থামতেই শুকনো বকুলের ভারি গন্ধ। ক্ষীরোদ একটিপ নস্যি নিয়ে ফেলল।

'দেখতি পাচ্ছেন?'

দক্ষিণে তাকিয়ে ক্ষীরোদ থমকে দাঁড়াল। আকাশের সবখানি জুড়ে সবুজ একটা মাথা উঠে গেছে। পাতার চেহারা অন্য তেঁতুলের চেয়ে কিছু আলাদা। এক-একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যাবে। এ কেটে নিয়ে গোরুর গাড়িতে চাপাতে কম করেও মাসখানেক চলে যাবে।

'পিঁপড়ে হয়নি গাছে? পোকা?'

'নালসের ডিম আছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। পোকামাকড় নেই একদম। একটুও ঘুণ ধরেনি—'

গাছের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদ নীলাম্বরের সঙ্গে এক উঠোন লোকের মধ্যে এসে পড়ল। জনা ষোল ধান ঝাড়ছে। ইঁটের চেয়েও কঠিন মাটির দাওয়ায় এক তে-মাথা বুড়োর পাশে খেজুর পাতার চ্যাটাইতে বসতে হল। পরামাণিক বুড়োর গালে ফটকিরি বুলিয়ে ক্ষীরোদের থুতনি ধরে ফেলল।

'কামিয়ে নিন—আপনারা শহরগঞ্জের মানুষ—' নীলাম্বর নিজেই পরামাণিকের বাক্স এগিয়ে দিল।

গাল বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীরোদ সামনেই আবার তেঁতুলগাছটা দেখতে পেল। গোড়ায় একটা ভাঙা টিউবওয়েল।

'জল ওঠে না?'

'অনেক টাকা দে বসাই। দু'বছর না ঘুরতি বালি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেল—'

'কত ফুট?'

'সাতশো-সাড়ে সাতশো—জল এখানে অনেক নিচে—' সেই বুড়ো এক লাফে মাটিতে নেমে বলল, 'সোঁদরবনের মাটি তো—'

'তাই বুঝি।'

'লোলাম্বর তখন ছোট। ওর বাপ আর আমি দেখিছি—আমাদের খুড়োমশাই লাঙল টানতে পারতেন না। লাঙলের ফলা মাটিতে ঢোকেই না। ঢুকলিও গুচ্ছের শেকড়বাকড় আটকে যায়—'

'কী রকম?'

'তল্লাট ভরে তো শুধু গাছই ছেল। খুড়োমশাইয়ের বাপ কত গাছ সাবাড় করে লোকজন বসায়। ওই লাউ মাচার নীচি রোজ সন্ধেবেলা বাঘ এসে বসি থাকত্। পুকুর দেখিছেন—ওর ভিতর থিকি ওই ঘরের সামনে গাছের গুঁড়ি বেইরেছে—আঁধারের চেয়েও কালো।'

'খেত। তবে আমাদের কাউকি খায়নি। খুড়োমশায়ের বাপের জ়ন্যি—'

এক গাল কামানো হয়ে গেছে ক্ষীরোদের। এমন সময় গাঁয়ের চৌকিদার এল। খালি গায়ে লুঙ্গির ওপর পেতলের তক্‌মা বেলট্ ঝুলছে। চেঁচিয়ে বলে গেল, দশদিনের ভেতর 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' শ্রেণীর রেশন কার্ডের জন্য নাম লেখাতে হবে।

নীলাম্বর বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'খুড়োমশায়ের বিয়ের পর রেললাইন বসিছে ইদিকে। ওনাদের খুড়োর বাপ বড় তেজি ছেলেন। বাঘ-টাঘ তারি সমঝে চলত—'

ক্ষীরোদ পরামাণিকের হাত থেকে মুখখানা বাইরে এনে নীলাম্বরের খুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো বুড়ো এবারে সব ভেঙে বলল, 'আমাদের খুড়োমশায়ের বাপের লেজ ছেল—'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি ছেল। তিনি এ গাছ থিকি ও গাছে লাফাতি পারতেন—নিজিরই শোরের খোয়াড় ছেল। পাকাবাড়ির মেঝেয় চড় মেরে দাওয়া ফাটিয়ে দেতেন। শেষ বয়সে দাঁত পড়ে যাওয়ায় কড়া চাপানোই থাকত। আধপোড়া শোরের মাংস গিলি গিলি খেতেন।

—লাউ মাচার নিচে একবার এক বাঘ এসি ওনার হাতে প্রাণটা দেলে। এক মুগুরের ঘায়ে বাঘের মাথা ফাঁক—'

'কতদিন বেঁচে ছিলেন—'

'লোকে বলে দু'শো বছর—তবে অত নয়'—একটু থেকে নীলাম্বর বলল, 'তিনি কবে মরলেন কেউ তা দেখেনি।'

'মানে?'

'শেষ বয়সে নাকি একা একাই করাতি নদী পার হয়ে সোঁদরবনের দিকে হেঁটে চলে গেছেন—আর ফেরেননি।'

নীলাম্বরের খুড়ো বলল, 'আমরা তখন ছোট। লোলাম্মরের বাপ ওই তেঁতুল গাছের একখানা বড় ডাল কেটে গুছিয়ে রেখিছে। খুড়োমশায়ের বাপের শরীরটা হেলে গেছে কিছুকাল। মরলিই লাশ চিতেয় দিতে হবে। ছেলেপেলে মাগ কবে কাবার হয়ে গেছে। মুয়ে আগুন দেবার জন্যি আমরা নাতিরা টিকে আছি—একদিন সকালে উঠি দেখি আর নেই। দুপুরের দিকি দূর গাঁয়ের রাখালরা খবরটা দেলে, পোড়ো গায়েনকে তারা ডোঙায় চাপি সোঁদরবনের খাল ধরি এগুতে দেখিছে—সেই শেষ খবর।'

একটা ডাব কেটে নীলাম্বর ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিল, 'এই আমাগো অগড়ের তেঁতুলগাছ। খুড়োমশায়দের খুড়োর বাপ ছাড়া সবাই ও গাছের ডালে পুড়িছে। আমার মেজদি পুড়িছে, শৈলাদি পুড়িছে—আজকাল পাখিরা আর বসে না, আগে ঝাঁক ধরে ওই তেঁতুল ঠুকরে তলায় ঢলে পড়ি থাকত।'

যাকে নিয়ে এত কথা, ক্ষীরোদ দেখল, এমন বাতাসে মগডালে তার কিছু পাতা শুধু কাঁপছে। ধানকাটা মাঠে নীলাম্বরের বড় ছেলে লাঙল দিচ্ছে। কড়াই বুনবে। দূর রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে. গাছপালা বলে দেখা গেল না, ক্ষীরোদ শব্দ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এমন অমঙ্গুলে গাছ রেখে কি করবে গায়েন—যদি দিতে, নিয়ে যেতাম'—কথাটা গোড়াতেই এর চেয়ে আর খোলসা করে বলা যায় না।

'এত বড় গাছ কি প্রকারে নেবেন'—কিছু অবাক হয়েছে নীলাম্বরের খুড়ো, 'আমার এই বয়সে কত ঝড় দেখলাম ওকে নিতে এল—নড়াতিই পারল না।'

'লোকজন এসে নিয়ে যাবে। দশটা কুড়োল লাগালেই ভাগে ভাগে মাটিতে শুয়ে পড়বে। ন্যায্য দর যা তাই দেব।'

'বাজার যা তাই—একটা পয়সাও ঠকাব না। তবে গাছও কতকালের দেখতে হবে—ওতে কি আর কিছু আছে!' *এ কথাটা একেবারে মিথ্যে—কেননা, অমন* কাঠে কিছু না থাকলে কোথায় আছে—তাই ক্ষীরোদের গলা একটু কেঁপে গেল।

'আপনার কী কাজে লাগবে?'

'বিশেষ কোনও কাজে নয়—তবে, আপত্তি না থাকলে চেরাই করে নিমতলার গোলায় পাঠিয়ে দিতাম'—ক্ষীরোদের চোখের সামনে এক দশ হাজার ইজিচেয়ার, পঞ্চাশ হাজার পিলসুজ, এক লক্ষ পিঁড়ি নাচছে।

নীলাম্বর গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরামাণিক উঠোন পেরিয়ে গেল। বুড়ো বুড়ো বলল, 'লোলাম্বর হয়নি। বিদ্যেধরীর বুক বেয়ে আমাদের খুড়োমশায়ের বাপ কোনাকুনি পাড়ি দেতেন রেতেরবেলা—তখন জোচ্ছনায় এ গাছের পেল্লয় ভরি আঁধারের দিকে চেয়ে পাড়ে ফিরি আসতেন।'

হাতের একখানা পাকানো কাগজ কথা বলতে বলতে সোজা করে ধরল, 'এই যে চৌকো ঘর দেখিছেন—এগুলো বাড়ি, এই যে রেখার মাথায় চিকে দেওয়া ছবি—এ হল বৃক্ষ—এই আমাদের তেঁতুলগাছ—'

'সেটেলমেন্ট ম্যাপ?'

'উনত্রিশ সনের—তখনকার সেটেলমেন্ট সাহেবের সই দেখিছেন নীচি', বলতে বলতে খুড়ো ধান কাটা মাঠে শুকনো বাবলার ঝাড়টা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'সোত্ কম বলে ওইখেনটায় সাহেবের বোট বাঁধা থাকত—তিনিই আমাগে খুড়োমশায়ের বাপের ছবি তোলেন। কত টাকা দিতি চাইল সাহেব—পোড়ো গায়েন তবু তার লেজ দেখায়নি—'

'এমনিতে পোড়ো গায়েন রাতবিরেতে রাস্তা পার হত হেসে খেলে—দিনি দিনি কিন্তু রোদ বাড়লিই কানা, ছায়া বেছে নে বসি পড়ত ওই তেঁতুলতলায়, পিঁপড়ে কামড়ালি ধরতি পারত না। ঝাঁক ধরি কামড়ালি তবে উঠে গে তেঁতুল গাছে গা ঘষত—তখন শুকনো ছালবাকল খসি পড়ত। বৃক্ষের আদুল জায়গায় কী মোলায়েম করে হাত বুলে দেত পোড়ো গায়েন তখন।'

ম্যাপখানা মেলে ধরল ক্ষীরোদের চোখের সামনে, 'কেমন চওড়া নদী ছেল দেখিছেন,' বুড়ো ম্যাপের ওপরে একটা চ্যাটালো ড্রেনের গা দিয়ে আঙুল টেনে আনল? ক্ষীরোদ ধানকাটা মাঠে তাকিয়ে ফেলেছে। ঢলা রোদের আলো কাৎ হয়ে পড়ে। ন্যাড়া মাঠের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গোরুর ছোট ছোট ছায়া। তার ভেতর দিয়ে নীলাম্বর হেঁটে আসছে। পেছনে জনা পাঁচেক লোক। তাদের দু'-জনের কাঁধে দুটো কুড়োল।

বুড়ো বলছিল, 'এই পেল্লয় নদী সাঁতরে পোড়ো গায়েন পান্তার সঙ্গে ওই তেঁতুলজল খেয়ি ঘুম লাগাত। বেলাবেলি উঠতি চরের মাটিতে গর্ত করে ধান গুঁজে দেত, তখন তো আর লাঙল চলত না। দু'হাত শেকড়বাকড়—'

লোকজন সুদ্ধ নীলাম্বরকে ঢুকতে দেখে বুড়োর কথা কেঁপে গেল—

'ও তুমি দর ঠিক করে ফেল ক্ষীরোদবাবু—এ গাছ আমরা রাখব না—'

নীলাম্বরকে থামিয়ে দিল বুড়ো, 'বেচে দিবি? আমায় পোড়াবি কি দিয়ে—'

'সে আর ও গাছ আছে। বাবলাগুলো কি হবে?'

'তা বলে পোড়ো গায়েনের তেঁতুলতলা থাকবে না—অমন ছায়া রোদ এসে হুট করে দেবে?'

'তা দিক্ খুড়ো। এবার তো ধানের হালচাল দেখি মাথা ঘোরে। শ্রাবণ ভাদ্রে

টান ধরলি এতগুলো পেট তো আর তেঁতুল গিয়ে চলবে না।—এবার দাঁড়ানো লোকগুলোকে ধমকাল নীলাম্বর, 'নে নে তোরা হাত লাগা—কোথায় কোপাবে দেখে দাও—'

'দর ঠিক হোক্।'

'বেশি কথা কয়ে কাজ কি? না হোক্ তিনশো বছরের গাছ হবে—তিনশোটা টাকা দিয়ো—'

এতক্ষণে খুড়োর মুখে কথা এল, 'আমার ভাগ আমি বেচব না—'

'বাগড়া দিয়ো না খুড়ো—আটকুড়ো লোক তুমি, আমরাই তোমাকে দেখব—এতকাল দেখিনি?'

নীলাম্বর গোঁজ খেয়ে দাঁড়াল। পেটের খোঁদল বাতাসে ভরে গেছে। মাঠময় গোরু ফিরছে—শুকনো ধুলোয় মাটির ওপরে আধ হাত ধোঁয়া হয়ে গেছে। নীলাম্বরের বড় ছেলের বউ হবে, একগলা গোমটা দিয়ে ক্ষীরোদের জন্যে ভাতের থালা নিয়ে দাঁড়ানো।

'তোমার অংশের গুষ্টি মারি। এ সোঁদরবনের গাছ—যে নেয় তার। নে নে তোরা হাত লাগা এইবেলা।' এবার কিন্তু পাঁচজন নয়—লোকগুলোর মোটে একজন কুড়োল কাঁধে উঠে দাঁড়াল।

'পোড়ো গায়েন ফিরে এলি কি দেখাবি লোলাম্বর?' গলা ঘড়ঘড় হয়ে উঠতে একদলা কাশি ফেলে দিল খুড়ো।

তিনখানা একশো টাকার নোট। তোমার পোড়ো গায়েন আর ফিরবেনি। কী খেয়াল হতে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'কোন্ পথ দে আসবে শুনি? আড়াইশো তিনশো বছরের বুড়ো তো হেঁটে আসতে পারবেনি। নৌকোয় আসবে—করাতি বিদ্যেধরীর বুক শুকিয়ে কাঠ!'

এ সব কথার ভেতর দিয়ে বুড়ো শুধু বলল, 'ঠিক ফিরে আসবে রে। এবেলা দুষিসনে।'

কথাটায় কী ছিল। তেঁতুলগাছটার সামনেই জুতসই একখানা হাওয়া চৌদিকের অনেকটা ধুলো হুস্ করে শূন্যে তুলে দিয়েই ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বড় তেঁতুল শব্দ করে তলায় পড়ল। দাঁড়ানো লোকটা কাঁধ থেকে কুড়োল নামিয়ে ফেলেছে। সবার সঙ্গে ক্ষীরোদও গাছতলায় তাকাল। পরিষ্কার জায়গাটুকুর ওপর খানিক ঢলা-রোদ চৌকো হয়ে পড়ে। তার বাইরেটা পাতলা অন্ধকার। সেখানে গাছটা দাঁড়ানো। এতগুলো লোকের সামনে গুঁড়ি থেকে একটা কালো জিনিস নেমে এল—রোদে পড়তেই সবার আগে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'খড়িচোচ!'

বেশ লম্বা। সাপটা তেঁতুলগুলোর ওপর দিয়ে রোদের বাইরে নেমে এল। অবেলায় আর ভাত খেতে পারল না ক্ষীরোদ। থালা ঘেঁটে ঠেসে জল খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আঁচানোর জন্যেই পুকুরে যাচ্ছিল। এমন সময় নীলাম্বর বলল, 'মেয়েরা

মাছ ধুতে পুকুরে নামলিই দুটো এসে জ্বালাত রোজ। একটাকে কোঁচে গোঁথি ফেলিছি—এইটে তাহলে গাছে উঠে বসে ছেল।'

উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে নিল ক্ষীরোদ। খুড়ো-ভাইপোর এখন যা অবস্থা তাতে গাছের দর নিয়ে একটু চাপ দিলেই নীলাম্বর আড়াইশো কী স'দুশোয় রফা করে নিত। যোগাড়ন্তর করে ডেকে আনা পাঁচ-পাঁচটা লোক কুড়োলসুদ্ধ উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছে। ক্যাচকোচ করতে করতে ধানবোঝাই একটা গো-গাড়ি এসে হাজির হলে। সামনের গোয়ালে বউরা ধোঁয়া দিচ্ছে, মশার ঝাঁক সেখান থেকে বেরিয়ে উঠোনের মাথায় এক জায়গায় চাক বেঁধে উড়তে আরম্ভ করেছে। আজ আর গাছ কাটার কথা ভাবাই যায় না। ক্ষীরোদ ধুলো ঝেড়ে পাম্পসুতে পা গলাল। সন্ধের বাতাসে গেয়োবনের নরম ডালপালা মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ধান মাড়ানোর বলদটার পাক খাওয়া থামেনি—খুঁটি আলগা দেখে নীলাম্বর উঠে গিয়ে এঁটে দিল।

'এখন যাবেন কি? আমরা পোড়ো গায়েনের বাড়ির লোক, জেনেশুনে আপনাকে ছাড়তি পারিনে—' বলতে বলতে নীলাম্বরের কাকা এগিয়ে এল। কালচে অন্ধকারে বুড়ো উঠোনে—ওপরের দাওয়ায় ক্ষীরোদ। খুড়ো প্রায় লুফে ধরে ফেলল তাকে। জামার নিচের ফতুয়ার ঘড়ি-পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা গজ গজ করছে। খুড়োর মুখ দেখে বাল বোধ হল না ক্ষীরোদের। এই গাছ, পোড়ো গায়েনের ফেলে যাওয়া বিদ্যেধরীর শুকনো বাদা, চাকা-খোলা গরুর গাড়ির ধড়—এখান থেকে বৌবাজার-শেয়ালদার কাঠগোলায় কোনওদিন ফেরা যাবে না আর। খানিক আগে তবু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূর রাস্তায় বাসের হর্ন, ঘড় ঘড় আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এইমাত্র পোড়ো গায়েন এক চড়ে সব শব্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বাদার মাথায় পোকায় কাটা আধখানা চাঁদ উঠতেই নীলাম্বর তার খুড়োকে বোঝানো ছেড়ে দিল। এতক্ষণ কত রকমে পথে আনার চেষ্টা চলছিল ক্ষীরোদের সামনে। তিনশো টাকার মধ্যে কী বাবদ কত যাবে তার ফিরিস্তিও দিচ্ছিল নীলাম্বর। খুড়ো উলটো দাওয়ায় ভোম্ মেরে বসে। হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ধরা-জ্যোৎস্নায় ক্ষীরোদ শুধু পাঁচ হাত ছায়াটাকে উঠোনময় চক্কর খেতে দেখল। এতক্ষণে বাদার গর্ত থেকে লাল কাঁকড়ার কোটি ছানা বাইরের ঠাণ্ডায় উঠে এসেছে।

'তবে খুড়ো খতেন দেখাও—কার কত অংশ বুঝে নেব।'

খুড়ো দাওয়া ছেড়ে রাগে রাগে উঁচু ঘরটায় ঢুকলো, 'লম্ফ নে এসে দেখে যা—মালিক খতেনে আমার স'পাঁচ আনা অংশ—তোর বোন শৈলর ছেলেপেলেরা ভাগ বসালি ও গাছে তোর দু'আনাই নেই—'

গুলতিতে টান দিলেও এত জোরে গুরুল ছুটে যায় না। নীলাম্বর মাথায় ঠোক্কর খেতে খেতে অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল। তারপর খুড়োর কয়েকটা কথা বাইরের দাওয়া অবদি পৌঁছে শুধু একটা লম্বা চিৎকার হয়ে গেল শেষে। তাই বেশিক্ষণ

থাকল না। মেহগনির প্রথম পালিশেও গন্ধ উঠেই এমন উবে যায়। খুব ভারী নিঃশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মাড়াই হচ্ছে প্রায়। কয়লাখেকো পুরনো লোকাল ইঞ্জিনটা ভোরের ট্রেন টেনে বাসুলিডাঙ্গা এসে মাড়ি, দাঁত সব টলে ফেলে নীল ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ফেলছিল আজ সকালে।

পাম্পসু ক্ষীরোদের পায়েই ছিল। নদীর ফেলে যাওয়া মাটি শেষবারের মত জল চুঁয়ে নিয়ে পাথর হয়ে আছে। জুতো জোড়া বগলে রয়েছে অনেকক্ষণ। পায়ের নিচে কড়া ফেড়ে যাচ্ছে—তবু না দৌড়ে নিস্তার নেই। রশি দশেক দূরের বাবলার ঝাড়টা পেরোবার সময় এমন একটানা মাঠে এক-পোচড়া ভুষোকালির চেয়ে বেশি কিছু লাগল না তার। ওই জায়গাটায় সেটেলমেন্ট সাহেবের বোট বাঁধা থাকত। ফাঁকা দেখে চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। দৌড়োনোর ঝোঁকে একবার নীলাম্বরের গলা হাকড়ানি পেছু-ডাক ছুটে আসছে বুঝতে পেরেছিল। ল্যাজা দিয়ে পুরো একটা মানুষ সাইজে আনে কী করে। এখন দেখেশুনে পথ ঠিক করে নিতে হবে। ওই তো রূপশাল ধানের মাঠ। বোধহয় তাই। সবই একরকম লাগছে। উপরে তাকাতে ক্ষীরোদ চাঁদের কিছু উনিশ-বিশ বুঝতে পারল না। পোকা এবার ধানের দফা শেষ করেছে। বর্ষার মুখে মুখে আরও কম টাকা নিয়ে নীলাম্বরের উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভাইপো সুদ্ধু বুড়ো বুড়ো আজ এই সন্ধের পরেও টিকে থাকলে কাঁধে কুড়োল নেবে ঠিক। মগডালের রসাল কাঠে হলুদ রঙের পিঁড়ি বানিয়ে ক্ষীরোদ তখন রথের মেলা ছয়লাপ করে ছাড়বে।

হঠাৎ মাঠ নাবি নিতে থমকে দাঁড়াল। এ যে নেবেই যাচ্ছে। বাদা জুড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল, বিদ্যেধরী শুকোতে শুকোতে করাতি মুছে গেছে। বর্ষার জল দাঁড়ালে বেরুতে চায় না। সেই বাদা ডিঙিয়ে পোড়ো গায়েনকে নাকি ফিরতে দেখেছে নীলাম্বরের বড় ছেলে। যত্ত তেড়েল গেজেল!

উলটে পড়ল ক্ষীরোদ। পা ঠিক জায়গায় রাখতে পারেনি। পাম্পসু কুড়িয়ে উঠতে গিয়ে বসে পড়ল। করাতি-বিদ্যেধরীর শুকনো জল হু হু করে ফিরে আসছে। রুপো রঙের। পড়িমরি উঠতে গেল। হাঁটুর কলকব্জায় জং ধরে আছে কতদিন। পাম্পসু পড়ে গেলহাত থেকে। হামা টানার কায়দায় বুক ভরে দম নিয়ে ছিটকে বেরোবার চেষ্টা করল ক্ষীরোদ। দৌড় তো দূরের কথা—দাঁড়ানোর মত এমন চেনা জিনিসটাই কিছুতে হল না। হচ্ছে না। হাঁটুই খোলে না। যখন এখানে এভাবে থাকতেই হবে—তখন আর পাম্পসু খুঁজে লাভ নেই বুঝে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ক্ষীরোদ একটুও না নড়ে বসে গেল। কোথাও অন্ধকারের ছিটেফোঁটাও নেই। বাদা ভর্তি জ্যোৎস্না। ডোঙায় চড়ে পোড়ো গায়েন ইচ্ছে করলেই ফিরতে পারে এখন।

নরকের প্রহরী

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়নাটা ঠুনকো আর পুরনো। কয়েক জায়গায় পারা চটেছে। কাচের ভেতরে বসন্তের ক্ষতের মত কালো কালো দাগ। ভুতোর মুখে সেই কালো কালো, গোল গোল, ছোট বড় ছাপ। যেন ভুতোর বসন্ত হয়েছে। বিরক্তিতে চোখ কোঁচকাল। তারপর আয়নাটা কাছে এনে হাঁ করে খানিক মুখের ভাপ ছিল। ভাদ্র মাস। গরম আছে, গুমোট আছে, আবার থেকে থেকে বৃষ্টিও হয়। আয়নার কাচে ধুলোর আস্তরের মত জলের আভাস দিল। শুকনো গামছা দিয়ে আর্শিটা বারকয়েক ঘষল। কিন্তু দাগ উঠল না। কাচটা যেন আরও ম্লান এবং তেলচিটে ঠাহর হল। ভুতোর ছায়া এখন আর স্পষ্ট নয়।

পিচ কেটে থুথু ফেলল। বিরক্ত হয়ে ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। কয়েকগাছা চুল উঠল। দেখে আবার থুথু ফেলল। তারপর গামছা বেঁধে এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায় মাথার চুল সামনে ফাঁপিয়ে পেছনে ঢেউ খেলিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়াল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তা খেয়াল করেনি। করলেও হয়তো কারণ বুঝত না। ডান হাতের দু-আঙুলে খানিক সস্তা স্নো তুলে বাঁ হাতের চেটোতে রাখল। চেটোটা পুরু আর শুকনো আর খসখসে। এখান ওখানে ছুলি হয়ে চামড়া উঠেছে, যেন উইয়ে খেয়েছে। তারপর একটু একটু করে সারা মুখে স্নো মাখল, ঘষল, রগড়াল। যেমন ঠুঁটো ভিক্ষুক তার সারাদিনের উপার্জন একটা অচল সিকিকে ঘষে বাজারে চাল কিনতে যায়। তারপর চোখের তলায় কাজল দিল। কপালে তেল সিঁদুরের ফোঁটা দিল। গালে খেলো লাল পাউডার মাখল। মাথায় সেই টাল খাওয়া, রংচটা টিনের মুকুটটা পরল।

বছর তিন আগে মুকুটটা আস্ত আর ঝকঝকে ছিল। আলো ঠিকরে পড়ত। ছুঁতে ভুতোর ভয় করত। তিন বছর পরে এখন ভুতোর ভয় নেই। আর মুকুটটাও মিইয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেছে। জায়গায় জায়গায় কালো ছোপ ধরেছে। ঠিক ভুতোর গালের মতই, বুঝি ব্রণ উঠেছে। ভুতোর বয়েস ষোলো।

আবার আয়নাটা এনে মুখের কাছে ধরল। কাচের বসন্তের দাগ আর নিজের

ব্রণের চিহ্ন কেমন এ-ওকে দেখছে। ভুতো নিজেকে দেখল। অজ্ঞাতে চোখ দুটো বড়, ক্রূর আর কঠিন হয়ে উঠেছে। অভ্যেসে হয়েছে। নিজের স্বাভাবিক চেহারাটা রঙে যেই বদলেছে, নিজের স্বাভাবিক চাউনিও অমনি বদলাল। কপালে প্রকাণ্ড গোলা সিঁদুরের টিপ আর কাজল মাখানো ভয়ঙ্কর দুটি চোখ এবং কালো, চিমসোনো ব্রণের দাগভরা লালচে গাল। মাথায় ফ্যাকাশে, সাপের চামড়ার মত ঠাণ্ডা, ঝিমধরা টিনের মুকুটটা। ভুতো অভ্যেসে চোখজোড়াকে আরও ক্রূর করল এবং নিজেকেই ভয় দেখাতে লাগল।

আর সেই বাঘটা হঠাৎ গজরে উঠেছে। ভুতো চমকাল। তিনদিনেও অভ্যেস হয়নি। বাঘের ডাক কেমন উপোসী, হিংস্র। অথচ ভুতো জানে বাঘটা বুড়ো, রোগা পোষা। বছর চোদ্দর এক না-পুঁটিকে না-ডব্‌কা মেয়ে ওকে খেলায়, মারে, বকে; আবার আদর করে চুমুও খায়। ভুতো শিউরোল। সেই হলদে, শানানো কটা দাঁত; লাল-মাখা পাটকিলে ঠোঁট; রোঁয়া-ওঠা খসখসে মুখ এবং পিচুটি-ভরা জ্বলজ্বলে চোখ—বুড়ো বাঘটাকে ছুঁড়ি চুমু খায়! বাঘের গায়ে বোটকা গন্ধ। হাঁ করলে, হাই তুললে মুখ দিয়ে পচা বাসি মাংসের উৎকট গন্ধ। ভুতো জানে। কিন্তু মেয়েটার গন্ধ কি রকম, তা ভুতোর জানা নেই।

'এই ভুতো, ওঠ'। শশী বলল। ও অনেকক্ষণ বসে আছে।

'দাঁড়া, হয়ে নিক'। গম্ভীর হয়ে ভুতো উত্তর দিল। অকারণে মুকুটটা একটু নাড়ল-চাড়ল।

বৃষ্টিতে মাটি ভেজা। তাঁবুর কাপড় পাতলা এবং ছেঁড়া। তাই তাঁবুর মাটিও শুকনো নেই। কিছু খড় এখানে-ওখানে ছড়ানো। তার ওপর পাটের ছালা বিছনো। বাঁ পা-টা ছড়িয়ে হাতের নখ দিয়ে পায়ের নখ ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে বিরক্ত হয়ে শশী বলল, 'তোর দেখি বিয়ের বরের সাজন। ইদিকে আমার বাকি, গোবরার বাকি। মালিক আসছে'।

ভুতো হাসল, 'যা বে। মেয়েছেলের সাজ দিবি। তারঅবারা ক-ঘণ্টা টাইম চাই শুনি'?

শশী মিইয়ে গেল। ওর বয়েস তেরো, গোবরার নয়। শশী মেয়ে সাজে। মাথায় পরচুলো, চোখের তলায় কাজল, ঠোঁটে রং, কপালে কাচপোকার টিপ আর গালে লাল পাউডার। এই আয়নার সামনেই শশী বসবে, শশী সাজবে। তবে ভুতোর মত চোখে ভয়ঙ্কর হিংস্র চাউনি আনবে না। ভীত, করুণ, অসহায় চোখে তাকাবে। শশীর বয়েস কম, মুখটা এখনও পাকেনি। শশী মাকুন্দ। তাই মেয়ে সাজবে। আর দেখতে দেখতে আপনা থেকেই তার দুখানা চোখ ভয়ে, ক্লান্তিতে, ব্যথায় করুণ হয়ে উঠবে।

'কি বে, বল না'? ভুতো আবার খোঁচাল।

শশীর এতে লজ্জা। কারণ তাকে মেয়ে সাজতে হয়। ভুতোর ওই টিনের জীর্ণ

মুকুটটায় শশীর বড় লোভ। ভুতোর ভয়ঙ্কর দুটো চোখ আর একজোড়া উঠতি গোঁফকে তার বড় সমীহ। ভুতো জানে। তাই শশীর লোভের কথা, ভয়ের কথা, শ্রদ্ধার কথা বারবার শোনবার জন্য শশীকে ক্ষেপায়।

গোবরা এক কোণে কুঁকড়ে শুয়েছিল। ও যখনই ফাঁক পায় একটু শুয়ে নেয়। ওর হাড় নরম, মাস নরম, চামড়া নরম। তাই গায়ে বড় ব্যথা।

শশী ঝাঁকুনি দিল, 'আ বে ওঠ। সনঝে হয়ে যাচ্ছে না? ধোলাই খাবি যে'।

গোবরা উঠল, হাই তুলল, হাত আর পা মটকাল। বলল, 'এট্টা বিড়ি দে না বে'।

'বিড়ি নেই'। শশী নিজে বিড়ি ধরাল।

ভুতো উঠল। শশীর বিড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে টানতে টানতে বলল, 'বলি কি ব্যাপার রে তোদের, অ্যাঁ? মালিক এলে আমি কিন্তু—'

শশী ক্ষুব্ধ, লোলুপ দৃষ্টিতে একবার ভুতোর দিকে তাকাল। তারপর বোধহয় নিজেকেই খিস্তি করে উঠল, 'অ্যাঁহ্, মেয়েছেলে। জালকুমারী। শালা'! বলল আর আয়নাটা টেনে নিয়ে সাজতে বসল।

'এট্টা টান দে না বে এ ভুতো!' গোবরা বলল 'মাইরি। তোর গু খাই'।

শশী মুখে স্নো মাখাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'চেপে যা। সালা কচি পোনা সেজে মেয়েছেলের আঁচলে মুখ ঘসো আবার ঘরে বসে বিড়ি ফোঁকা'।

ভুতো গম্ভীর হল। পাশের তাঁবুর সেই মেয়েটার সঙ্গে গোবরার ভাব হয়েছে। আর শশী এতে বিরক্ত। তিনদিনের জন্য মেলায় এয়েছ, চারদিন বাদে চলে যাবে। জম্মে তোমার টিকি দেখব না। ইদিকে তুমি ভাই পাতিয়ে পিঠে হাত বোলাও। ঢঙ!

আসলে শশীর রাগ অন্য কারণে। কালো, সেই মেয়েটা—তাকে গোবরাকে ছোট ভাবে, আদর করতে চায়, একথা বুঝে সে বিরক্ত। গোবরাটা হ্যাংলা, গাবলু। ডাকলেই ল্যা ল্যা করে ছুটে যায়। শশী যায় না। ভারিক্কি হয়ে কথা বলে কি বলে না। যেমন ভুতো কালোর সঙ্গে কথা বলে কি বলে না।

তাছাড়া এত বয়সেও মেয়ে সাজতে হয় বলে মেয়ে জাতটার ওপরই তার কেমন একটা রাগ! ফিচির ফিচির হাসে। শশী জানে মেয়েরা ভাল নয়।

ভুতো গম্ভীর। বড় বড় তিনটে টানে বিড়ি শেষ করে বিরক্তভাবে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলল। শশীটা মাস্তানের মত কথা বলছে আজকাল। যেন বেজায় মাতব্বর হয়েছে। আর গোবরাটাও কচি সেজে পরের গায়ে গা ঘসটাচ্ছে। সাল্‌লা!

অভ্যস্ত হাতে শশী চটপট সাজা শেষ করল। টানা ভুরু, টানা চোখ, কপালে কাচপোকার টিপ জ্বলছে। লালচে গাল। ওর মুখে ব্রণ নেই। লালচে দুটো গালে মাথার চুল এসে পড়েছে। শশী মেয়ে সেজেছে।

গোবরা মুখ টিপে টিপে হাসছিল। রোজ হাসে। তারপর শশীর হাতে মার খেয়ে

মুখ গোঁজ করে সাজতে বসে। কিন্তু আজ শশী ওকে মারল না, ওর হাসিকে পাত্তা দিল না। ভুতোর মুখোমুখি সটান দাঁড়িয়ে। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে রে'? ভুতো আঙুল দিয়ে ওর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, 'সুকু সুকু'। গোবরা খিক খিক করে হেসে উঠল। তবু শশী ওকে মারল না, ভুতো ওকে ভয় দেখাল না। তখন গম্ভীর হয়ে সেই আবছা আয়নাটার সামনে গোবরাও সাজতে বসল।

ইতিমধ্যে মেলা জমেছে। সন্ধে হচ্ছে। এখানে ওখানে হ্যারিকেন, কারবাইডের বাতি আর পেট্রোম্যাক্স জ্বলে উঠেছে। বাতাসে ভাজা পাঁপরের গন্ধ। দোকানিদের হল্লা। মানুষজনের কলরোল।

মালিক ফিরেছে অনেকক্ষণ। তাঁবুর বাইরে একটা আর ভেতরে দুটো পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়েছে। বাইরে বাঁশের মাচার ওপর ছেঁড়া প্যান্ট ছেঁড়া গেঞ্জি মুখে চুনকালি শ্রীকেষ্ট বিচিত্র সব অঙ্গভঙ্গি করে ভিড় জমাচ্ছে। তিনটে লোহার চাকতি নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হঠাৎ সেটা গিলে ফেলছে। তারপর কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে, লোক হাসিয়ে, কখনও কান দিয়ে কখনও নাক দিয়ে কখনও পাছা দিয়ে সেই জ্বলন্ত সিগারেট টেনে বার করছে। আর মালিক সামনে টিনের ভাঙা সুটকেস খুলে বসে মাঝে মাঝে একটা কাঁশি বাজিয়ে বক্তৃতা করছে—এমন যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মিথ্যে বলে পাপ সেও করেছিল। নরকদর্শনে তার সমস্ত পাপ খণ্ডন হল, অক্ষয় স্বর্গবাস হল! এখানে কে আছে যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে পাপ করেনি? পৃথিবীরকে পাপী নয়? এক আনা দিয়ে নরকদর্শন করে সকলে পাপ খণ্ডন করুক। দেখে যাক কাটামুণ্ডু যমদূত। দেখে যাক জালকুমারী, যার শরীরটা মাকড়সার জাল অথচ মাথাটা মানুষের। দেখে যাক কুম্ভীপাকের পিশাচ—যার তিনটে ধড় একটা মাথা।

ভিড় জমছে। হাঁ করে মালিকের বক্তৃতা শুনছে, হাঁ করে শ্রীকেষ্টর কেরামতি দেখছে। মালিক জানে বেশিরভাগই ফোতো—মেলার চারদিকে ঘুরবে-ফিরবে দানা-বেঁধে দাঁড়াবে। কিন্তু কিছু কিনবে না, পয়সা ফেলে দেখবেও না কিছু। আর আছে একদল, যারা সব ঘুরে কিছু কিনবে, বাছাই করে কিছু দেখবে। আর আছে কয়েকজন, যারা সব জায়গাতেই টিকিট কাটবে। মালিক চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে তার আজকের অদৃষ্টটা মাপতে চাইছে।

মালিকের অবস্থা এখন পড়তির দিকে। ছেঁড়া তাঁবু। বাইরে কাপড়ের ওপর কাঁচা হাতে আঁকা পাতালের কয়েকটি দৃশ্য, ভুল বানানে লেখা দলের নাম, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কাটামুণ্ডু, জালকুমারী আর কুম্ভীপাকের পিশাচের বীভৎস ছবি। কিন্তু সে কাপড়ও ফেঁসে গেছে, রং চটেছে। বোঝা যায় কি যায় না। তিনটে ছোঁড়া, শ্রীকেষ্ট আর মালিক—এই নিয়ে দল। একজন পালালে বা অসুখে পড়লে সেদিন খেলা বন্ধ। তাই মালিককে চারদিকে নজর রাখতে হয়। এক-এক দফায় টিকিট

বেচা শেষ হলে বাক্স বন্ধ করে নিচে নামে। যারা পয়সা দিয়ে তাঁবুর ভেতরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তাদের সামনে এসে নরকের পরদা তুলে ধরে। বক্তৃতা দেয়। বাইরে মাচার ওপর তখনও শ্রীকেষ্ট অঙ্গভঙ্গি করছে, ভিড় জমাচ্ছে, লোক হাসাচ্ছে। খেলা শেষে মালিক সমস্ত দর্শককে বার করে দিয়ে আবার বাক্স খুলে বসে। ঢং ঢং করে কাঁশি বাজায়, চেঁচায়—'এমন যে রাজা যুধিষ্ঠির—'

পাশের তাঁবুটাও জীর্ণ, তবে আকারে বড়। দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাস। ওদের দলে তিনটে জোকার, চারটে কর্মচারী, কয়েকজন খেলোয়াড়; একটা একটা গাধা, খচ্চর, বাঘ এবং কালো—সেই ছুঁড়িটা—যে ঘুঙুর পরে নাচে, তারের ওপর হাঁটে, বাঘের সঙ্গে ছেনালি করে। বাইরের বিরাট মাচার ওপর তিনটে জোকার নানা বেশে সেজেছে। একজন বামন, আর দুটো তাদের স্বাভাবিক চেহারাকে নানা কৌশলে হাস্যকর করেছে। তাছাড়া একটা ছোঁড়া বিউগিল বাজাচ্ছে, সঙ্গে একটি বুড়ো ড্রাম পেটাচ্ছে। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে বাঘের ডাক আর ঘুঙুরের আওয়াজ ছিটকে আসছে। গেটকিপার হঠাৎ পলকের জন্য পরদাটা তুলে ধরছে। বাইরের মানুষগুলো চকিতে দেখতে পাচ্ছে কোমর দুলিয়ে একটা মেয়ে নাচছে। দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাস গুড়ের বস্তার মত মফস্বল শহরের সমস্ত মাছিকে টেনে নিচ্ছে।

আর ফিসফিস করে বৃষ্টি নামল। পাঁপরওয়ালা চিৎকার করে উঠল, 'এই যে ফুরিয়ে গেল—আর পাবে না। গরোম পাঁপোওড়'।

বৃষ্টি দেখে কিছু লোক এদিক-ওদিক চলে গেল। ফাঁক পেয়ে পেছনের কিছু এগিয়ে এল সামনে। মালিক মাচানের ওপর উঠে দাঁড়াল। বাঁশের খুঁটির ওপর নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা তক্তা। মচমচ করল। মালিক কাঁশিটা হাতে তুলে ঢং ঢং করে বাজাতে লাগল। পুরু কাঁশি, আওয়াজটা চেরা-চেরা, ভরাট। শ্রীকেষ্ট হঠাৎ লোহার চাকতি নামিয়ে রেখে, হাতের প্রায়-শেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে, মুখে চোখে তীব্র ভয় আর আতঙ্কের ছবি ফুটিয়ে গলা দিয়ে আঁ-আঁ শব্দে একটা জান্তব বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল। যেন তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে, মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুবে। যেন কিছু একটা হবে। আর মালিক ভারী গম্ভীর গলায় সুর করে বলে উঠল, 'এইবার শুরু হবে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। কাটামুণ্ডু কথা বলবে, জালকুমারী হাসবে, পিশাচ সেলাম দেবে। এইবার, নরকের দরজা খুলবে'।

তাঁবুর ভেতরে লোক দাঁড়াবার জায়গা বেশি না। গাদাগাদি করে জনাবিশের মত ঠাঁই হতে পারে। তারপর বাঁশের বেড়ার ওদিকে পর্দা ফেলা। পর্দার ভেতরে কাপড়ের দেয়াল তুলে তিনটে ঘর।

প্রথম ঘরটা কাটামুণ্ডুর। যে নরকের পাহারাদার। যে যমের দূত। যার কপালে

লাল রক্তের ফোঁটা। যার ভয়ঙ্কর দুটো চোখে জিঘাংসা। যার গোঁফ চুঁইয়ে, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ে।

পরের ঘরটা জালকুমারীর। যার শরীর মাকড়শার জাল, মাথা মানুষের। যার লম্বা চুল, টানা চোখ, রাঙা ঠোঁট, কপালে কাচ পোকার টিপ। যার দু'চোখে ক্লান্তি, বেদনা আর অসহায়ত্ব।

সব শেষের ঘরে কুম্ভীপাকের পিশাচ। তিনটে ধড় অথচ একটা মাথা, হাত-পাগুলো উলটে পালটে গেছে। আর বাড়তি দুটো ধড়ের দরুন সব মিলিয়ে বীভৎস। যার চোখেমুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। থাকলেও দেখা যায় না।

ওরা প্রস্তুত হয়ে ছিল।

ভুতো ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সের ভেতর হাঁটুগেড়ে কুঁজো হয়ে বসেছে। বাক্সের ওপরের তক্তাটা মধ্যিখানে গোল করে কাটা। সেই গোল ফুটো দিয়ে মাথাটা গলিয়ে ওপরে তুলেছে। তারপর মালিক এসে ন্যাকড়া দিয়ে ফুটোটা বুজিয়েছে। তার ওপর মাটি ছড়িয়েছে। মাটির ওপর শুকনো পাতা আর ঘাস এলোমেলো বিছিয়েছে। বেড়ার এপাশে দাঁড়ালে মনে হবে কাঠের একটা বাক্সের ওপর একটুকরো মাটি। তার ওপর কাটা একটা মুণ্ডু। গলা যেটুকু দেখা যায় তাতে কাদা-কাদা লাল রঙ। মাটি এবং ঘাসেও রঙের ছিটে। ঠোঁটের কষে লাল রঙ গড়িয়ে পড়ছে।

পাশের ঘরে শশী আর তারপর গোবরা। এখন কেউ কথা বলছে না। নিজের শরীরটাকে দুমড়ে বেঁকিয়ে, মনটাকে মচকে ভেঙে প্রস্তুত হচ্ছে নরকের পালার জন্য। একঘণ্টা পরে দশ মিনিট যার যার জায়গা থেকে বাইরে আসতে পারবে। হাত-পা ছড়িয়ে, ঝিম মেরে মাটিতে গড়াতে পারবে। যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে একজন আর-একজনের গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে। বিড়ি ধরাতে, রস গেলে চাইকি দুটো খিস্তি বা গানও করতে পারবে। তারপর আবার একঘণ্টা ধরে নরকের পালা। দশ মিনিট ছুটি! এমনি পাঁচবার, ছবার। সাধারণত এগারোটা পর্যন্ত হয়। মেলা জমলে বারোটা-একটাও হয়ে যেতে পারে।

পাশের তাঁবুতে তখন ঘুঙুরের আওয়াজটা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। মানুষজন হল্লা করছে। ভুতো দাঁতে দাঁত ঘষল। এখনও তাদের ফার্স্ট শো শুরু হল না। একঘণ্টা বাক্সটায় ঢুকে বসতে হবে। অথচ পাবলিক আসবে না। সবাই যাবে গ্রেট এশিয়ান সার্কাসে। দু-আনা আর চার আনার টিকিট কেটে মেয়েছেলের কোমরদুলুনি দেখবে, বাঘকে চুমু খাওয়া দেখবে। শালা, ঢ্যামনা।

পর্দার ওপাশে কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরক্তি আর কৌতূহলে পর্দাটা টেনে তোলার চেষ্টা করছে। অধৈর্যে শিস দিয়ে উঠে মালিককে খিস্তি করছে। কজন টিকিট কেটেছে? অন্তত দশ না পুরলে মালিক পর্দা খুলবে না। লোভী, বুড়ো খান্‌কি।

মালিকের গলা শুনতে পেল। কাঁশিটা বাজছে, ঢং ঢং। সেই পুরনো চাল দিচ্ছে,

আর দুজন, আর দুজন টিকিট কাটলেই শো শুরু হবে। আর একজন। আর একজন। আর একজন। আসুন, নরক দেখে যান। দেখে যান পাপের শাস্তি। আপনাদের মধ্যে কে এমন আছে যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে পাপ করিনি! এমন যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, নরকদর্শন করে তিনিও মিথ্যে বলার পাপ খণ্ডেছিলেন। আর আমাদের তো খেয়ে-পরে থাকার জন্য সব সময়ই পাপ করতে হচ্ছে। আসুন, দেখুন—কাটামুণ্ডু যমদূত, মাকড়সার জালে তৈরি মেয়ে, তিনটে ধড়ে একমাথা পিশাচ। আর একজন। মাত্র একজন।

ভুতো বুঝল এইবার পর্দা উঠবে। বার কয়েক ঢোক গিলল। চোখ বুজল। আর যেন নিজেকে দেখতে পেল। যমদূত! যে নরকের পাহারাদার। নরক। অন্ধকার। বাতাস নেই। আগুন। তেল ফুটছে কড়াইয়ে। মানুষ ফুটছে তেলে। চিৎকার, চিৎকার। ঢং ঢং ঢং। নরকের ঘণ্টা বাজছে। আর একজন। এইবার, এমন যে রাজা যুধিষ্ঠির। মাচার শব্দ। মালিক নামল। মালিক ঢুকেছে। বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা পরদার কোণাটা খুলছে। পর্দা উঠল।

বেড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া অনেকগুলো মাথা। দু-তিনটে বাচ্চা, একটি বউ! সবাই ভুতোর দিকে তাকিয়ে। মালিক বলল, 'দেখুন, এই কাটামুণ্ডু, গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। তাজা রক্ত। হাত দিয়ে ছুঁলে বুঝতেন এখনও গরম। কিন্তু ছুঁয়েছেন কি মরেছেন। এই হল নরকের পাহারাদার। এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে যমরাজও নরক থেকে নড়তে পারে না। যার পাপের ভোগ পূর্ণ হয়েছে, স্বর্গে যাবে—সেও এর হুকুম ছাড়া এক পা বেরুতে পারে না। আপনারা ভাববেন না একটা মাটির পুতুল বসিয়ে রেখেছি। এ কথা বলবে। কথা বলো কাটামুণ্ডু। বলো তুমি কে'!

'আমি যমদূত'।

'তোমার কাজ কি'?

'নরক পাহারা দেওয়া'।

পর্দা পড়ে গেল!

আর বড় ক্লান্ত, বড় নিঃশেষ মনে হল নিজেকে। যতবাব পর্দা উঠবে, ততবার এমন হবে। কতগুলি সংশয়ী, কৌতূহলী অথচ ত্রস্ত চোখের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাটামুণ্ডুর পালা। শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু তখন তীব্রতায় সজাগ। চোখে-মুখে জীবিত সুস্থ মানুষের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পেলে চলবে না। সমস্ত জীবনীশক্তিটাকে একজোড়া চোখ গুটিয়ে আনতে হবে। সে দুটো চোখ বড়, ভয়ানক, বীভৎস। বড় আর সজাগ। ভয়ানক আর সজাগ। বীভৎস আর সজাগ। কারণ এতগুলো দর্শকের ওপর নজর রেখে তার কাটামুণ্ডুটার প্রতিক্রিয়া দেখতে হচ্ছে। এবং সংশয়ী কেউ বখাটে কেউ রসিকতায় বা পরীক্ষার আগ্রহে চোখে একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে না মারে, মাথায় পোড়া সিগারেট না ফেলে—সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। তিন বছর আগে ভুতো যখন আলকুমারী, তখন একদিন এমনিভাবে তখনকার কাটামুণ্ডু [illegible]

চোখজোড়া নষ্ট হয়েছিল। সেই থেকে কেমন একটা আতঙ্ক। অন্যকে ভয় দেখাতে দেখাতে নিজের ভয়। অথচ সেটি প্রকাশ পেলে চলবে না।

পাশের ঘরে যখন পর্দা ওঠে, তখনও বুক টিবটিব করতে থাকে। এক লহমার জন্যও যদি অন্যমনস্ক হয়, তাহলে কেলেঙ্কারি। দলের সম্মান যাবে। এই মালিকটা আর তার কুচ্ছিত ব্যবসাকে ভুতো যতই ঘেন্না করুক, শাপ-মন্যি দিক—পাবলিকের সামনে দলের সুনাম নষ্ট হওয়া সে সইতে পারবে না। আর তাছাড়া যারা টিকিট কেটে দেখতে আসে—বেশির ভাগই জানে এ হয় না, এমন হয় না, কৌশল আছে! তবু কৌশলটা ধরতে না পারলেই খুশি হয়। বুঝলে চটে, খিস্তি দেয়, এমনকি ধরে মারতেও আসে। কাঠের বাক্সটার ভেতর ইঁদুরের মত ভুতো যখন আটকে বসে, তখন বেড়া টপকে কেউ চড়াও হতে এলেও ভুতো পালাতে পারবে না। আর কে না জানে সমস্ত মফস্বল শহরের মেলাতেই দু-একদল ছেলেছোকরা থাকে, যাদের কাজই রঙবাজি করা।

মালিকের বক্তৃতা কানে এল। 'এইবার দেখবেন জালকুমারী শরীরটা জালের অথচ মাথা মানুষের। দেখবেন এই মেয়ের মুখ কি সোন্দর, চোখ কি সোন্দর, ঠোঁট যেন জিলিপি। এই সুন্দরীর দুর্দশা এমন কেন হল জানেন?...আপনি জানেন?...তুমি? তা'লে আমি বলি শুনুন'। মালিক গলা চড়িয়ে হঠাৎ যেন পৃথিবীর গোপনতম সত্য প্রকাশ করল,'জ্যান্তে এই মেয়ে ছিল অপ্সরার পারা সুন্দরী লক্ষ্মীর মত কাজে-গুণে দড়। এর সব ছিল। কিন্তু নিজের রূপের গোমরে, গুণের দেমাকে সুন্দরীর মাটিতে পা পড়ত না। ইদিকে সোয়ামী ছিল ঢ্যাঙা, রোগা, কালো। মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গ করল। গঞ্জনা দিয়ে বুড়ি শাউড়িকে নবদ্বীপ পাঠাল। তাই, তাই দেখুন, অনন্তকাল একে মাকড়শার জালের শরীর আর ওই সোন্দর মুখ নিয়ে নরকে থাকতে হবে। ঘরের মেয়েছেলে নিজের ধর্ম পালন না করলে নরকে এই শাস্তি'।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হ্যা? ই যে দড়ির জাল বটে! লরকের মাকড় বুঝি দড়ির জাল বুনে'?

ভুতো বুঝলে পর্দা উঠেছে। আর মালিক সে প্রশ্ন কানে না তুলে নিজের আবেগে বলছে, 'আপনারা দেখুন। জালকুমারী নিজের মুখে সব স্বীকার করবে। কথা বলো জালকুমারী। বলো, তুমি কে'?

'জানি না'।

'দেখুন, আজ নিজের পরিচয়ও মেয়ে জানে না। বলো জালকুমারী, তোমার বয়েস কত? কতদিন এখেনে আছ'?

'জানি না'।

হা হা করে মালিক হেসে উঠল। 'দেখুন, তাও জানে না। জালের শরীর নিয়ে কেমন আছ তুমি?'

ভুতোর বুক কাঁপল। শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে শশীর ভুল হ্ল কেন? ইচ্ছে করে এত বড় ভুল করার সাহস ও কোথা থেকে পেল? তবে কি শশী সব ভুলে গেছে? দড়ির জালের মধ্যে নিজের মুখটা বার করে শরীরটা পুঁটুলির মত পাকিয়ে ছোট্ট বাক্সের মধ্যে থাকতে থাকতে ও কি সত্যিই জালকুমারী হয়ে গেছে? প্রথমবারেই? আস্তে আস্তে সেও সত্যিই একটা কাটামুণ্ডু হয়ে উঠবে। কিন্তু শশী কি এত তাড়াতাড়ি নিজের শরীরের অনুভূতিগুলো পর্যন্ত ভুলে গেল? কথা ভুলে গেল?

মালিক বক্তৃতা দিচ্ছে, 'শুনুন। জালকুমারী কিছু জানে না। কিছু জানবে না। অথচ এইভাবে ওকে চিরজীবন থাকতে হবে। ওর পাপের শাস্তি'।

পর্দা পড়ল। মালিক ম্যানেজ করেছে।

এইবার শেষ খেলা। মালিক বলছে, 'এ কোনও যাদু নয়, ভেল্কি নয়, ভোজবাজি নয়, হাতের কারসাজি নয়। আপনারা নিজের চোখে দেখছেন। এ বাঘের ডাক আর মেয়েছেলের নাচও নয়। ভগবানের লীলা। মানুষজনার কর্‌মোফল। এইবার দেখুন লোভের নিয়তি। ছোটবেলায় এ চুরি করত, মিছে কথা বলত। বড় হয়ে ব্যবসায় মানুষ ঠকাত। টাকা জাল, ওষুধ জাল, খাবারে ভেজাল, গরীব ঠকানো। এইভাবে সে লাখ লাখ টাকা করল। বাড়ি করল, গাড়ি করল। বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে করল। তার মান হ্ল, সম্মান হ্ল, দেশের সে দশজনার একজনা হ্ল, লাট-বেলাট তার কথা শুনে চলে। পরের বিধবাকে বাড়ি এনে পুষল, পরের বৌকে ঘরে এনে তুলল। আর দান করল, ধ্যান করল, মন্দির প্রতিষ্ঠা দিল। তারপর মরে গেল। তার আত্মা গেল নরকে। যমরাজের বিধান হ্ল। কি বিধান? দেখুন আপনারা—'

ভুতো জানে, পর্দা একবার তুলেই মালিক নামিয়ে দিয়েছে। চকিতে সকলের চোখে পড়েছে বিকৃত তিনটে শরীরে একটা মুণ্ডু। গোবরা। একটা উঁচু টেবিলের নিচে বসে। দু-দিকের পায়ায়া দুটো মাঝারি আয়না। মনে হবে আলমারির পাল্লা ফাঁক করে এক্‌টা। বীভৎস দুঃস্বপ্ন মাথা বাড়িয়েছে। পা দুটো ঘাড়ের ওপর তোলা, দুই হাতের ভরে পাছাটা মাটি থেকে একটু ওপরে। আয়না দুটো ঘাড় সমান। তাই ছায়া পড়েছে ঘাড় অব্দি। মনে হয় তিনটে ধড়, একটাই মাথা।

'দেখুন, মিথ্যে কথা বলার শাস্তি'।

আবার পর্দাটা তুলেই নামিয়ে দিল। কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাল করে তোল না হে, ভাল ক'র দেখাও'। মালিক সে কথা শুনতেই পেল না। গলা চড়িয়ে কঠিন শপথ উচ্চারণ ক.'র ভঙ্গিতে বলল, 'দেখুন মানুষকে ঠকানোর শাস্তি'। পর্দাটা তুলেই আবার নামাল। 'দেখুন, ভেজাল দিয়ে মানুষ খুনের শাস্তি'। পর্দাটা তুলেই নামাল। 'কিন্তু এও কথা বলে, কথা বোঝে। দেখুন যা বলব, তাই করবে'। পর্দা তুলতে তুলতে বলল, 'বলো জয়হিন্দ'। গোবরা বলল, 'জয়হিন্দ'। পর্দা নামল।

'খেল খতম, পয়সা হজম'। কে যেন সুর করে বলল। 'বলো হরি হরিবোওল'।

কারা যেন চেঁচাল। সকলে বেরুচ্ছে। কেউ কেউ হাসছে, কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা, জোচ্চোর। ঠকিয়ে পয়সা নিল। কেউ বা নীরব।

ভুতো এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে ছিল। পালা শেষ হতে সম্বিৎ ফিরে পেল। বুঝল ঘামে শরীর ভিজে গেছে। গুমোটে, উত্তেজনায়, ভয়ে। আর কাঠের তক্তার ওপরে গলাটা, মুখটা, মাথাটা। ধড় ও মুণ্ডুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান। কপালে ঘাম জমেছে, গাল চুলকোচ্ছে, কিন্তু দুটো হাতই বাক্সের ভেতরে বন্ধ। এবং গলাটা আঁট, আঁট। যেন নরকেরই আর এক ডাকিনী দুটো সরু আঙুলে তার টুঁটি চেপে আছে। জোরে চাপ দিয়ে মেরে ফেলছে না, ছেড়ে দিয়ে সহজভাবে নিশ্বাস নিতেও দিচ্ছে না।

এতক্ষণের সজাগ, উচ্চকিত কালযাপনের পর এখন অবসাদ, ক্লান্তি। অথচ আবার পর্দা উঠবে। আবার তৈরি হতে হবে।

হাঁটু গেড়ে কুঁজো হয়ে বসতে হয়। সোজা হওয়ার উপায় নেই। কারণ বাক্সটা চ্যাপ্টা। উঁচু হলেই মানুষের সন্দেহ বাড়বে। দুটো তুলোর পুঁটলির ওপর হাঁটু রাখে। প্রথম খানিকক্ষণ লাগে না। তারপর মনে হয় কাঠের তক্তার সঙ্গে তুলোর পুঁটলির কোনও তফাৎ নেই। বাক্সটা শুধু যে চ্যাপ্টা, তাই নয়। চওড়ায়ও ছোট। হাত ছড়ানো যায় না। আস্তে আস্তে কোমর থেকে একটা ব্যথা মেরুদণ্ড বেয়ে ওপরে উঠছে। গুঁড়ি মেরে উঠছে। ব্যথাটা ঘাড়ে হঠাৎ দাঁত বসাল। আর ঝিলিক দিয়ে তার জ্বালা দু-দিকের কাঁধে ছড়াল। বুকে খিঁচ ধরেছে। পিঠটা পেটটা কুঁচকে দুমড়ে পাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে এইবার মনে হচ্ছে হাড়গুলো বাখারির মত চাপ খেয়ে বেঁকেছে। আর একটু চাপ পড়লেই ভেঙে যাবে। শাদা শাদা, হলদে হলদে কতগুলো হাড়ের আঁশ মুখ বার করে থাকবে। মেরুদণ্ডটা ভাঙবে, ঘাড়টা দুমড়োবে, কাঁধের হাড়গুলো মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

আর কোমরটা যেন নেই। পিঠ এবং পেটের চামড়ার ভেতর কোমরের সব কটা হাড় খুলে উলটে পালটে যাচ্ছে! মশাই যেমন খণ্ড খণ্ড করে হাড়সুদ্ধ মাংস কেটে শালপাতার ঠোঙায় পুরে দেয়, তেমনি তার কোমরটাকেও যেন দাঁত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেউ কেটেছে। কেটে শালপাতার মত কর্কশ একজোড়া চামড়ার ঠোঙায় ভরে দিয়েছে। আস্তে আস্তে কোমর থেকে একটা ব্যথা হাঁটু বেয়ে নীচে নামছে। উরু দুটো শক্ত। হাঁটু দুটো অবশ। পা দুটো ঝিমঝিমারা। বেয়ে বেয়ে ব্যথাটা পায়ের পাতায়, আঙুলে, নখের ডগায় এসে জমেছে। যেন ফেটে পুঁজ হয়ে, রক্ত হয়ে পড়বে।

আর সমস্ত শরীরে ঘাম! পিঠ বেয়ে, পেট বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। কাঠের বাক্সে ঘাম পড়ছে। তুলোর পুঁটলিতে পড়ছে। পায়ের লোম ঘামে শিরশির করছে, যেন কেউ অনেকগুলো উইপোকা ছেড়ে দিয়েছে। গা চুলকোচ্ছে, গা টাটাচ্ছে। চিবুকে হাত যায় না, একটা ব্রণ খুঁটতে ইচ্ছে করছে। তেষ্টা পেয়েছে। আর একটা শো

হয়ে গেলে প্রথম ঘণ্টার ছুটি। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে গেল আর মনে পড়ল কষে রং আছে। চাটা হল না।

পাশের ঘরে শশী। তারপর গোবরা। গোবরাটা হয়তো এখন একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। কাটামুণ্ডুর ঘরে পর্দা উঠলেই কুম্ভীপাকের পিশাচ হয়ে যাবে।

গোবরা আর পারে না। ভুতো জানে, গোবরা চায় জালকুমারী সাজতে এবং শশীর সাধ কাটামুণ্ডু হওয়া। গোবরা কাঠের বাক্সে বসতে চায়, ও ভাবে তাতে শরীরে অনেক আরাম। শশী ছেলে থাকতে চায়। ও ভাবে যাবৎ কষ্টের মধ্যেও তাতে নিজের ইজ্জতটুকু বাঁচে। ভুতো শশীর মধ্যে, গোবরার মধ্যে অতীতকে দেখছে। দেখে।

বাইরে কাঁশি বাজছে ঢং ঢং। মালিক কাঁশি বাজিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। শ্রীকেষ্টও নিশ্চয়ই লোক জড়ো করছে। ঘুঙুরের আওয়াজ আর নেই। আহ্, হাত ছড়িয়ে পা ছড়িয়ে ইচ্ছেমত হাঁটায় কি সুখ। ছুঁড়িটা এখন নিশ্চয়ই শাড়ি ছেড়ে ফ্রক আর জাঙিয়া পরেছে। দুটো বিনুনি বেঁধেছে। বিনুনির মাথায় লাল হলুদ ফিতে। মাঝে মাঝে বিউগিল বাজছে, ব্যান্ড বাজছে, লোকের হাততালি। কালোটা খেলা দেখাচ্ছে, লোককে অবাক করছে, খুশি করছে, হাততালি পাচ্ছে। তারের ওপর টিপে টিপে হাঁটছে। ডানার মত দু-দিকে দুটো হাত ছড়ানো, ভার ঠিক রাখছে। ছোট ছোট দুটো তীক্ষ্ণ অথচ উদার। কালো হাঁটছে। ভুতো এই চ্যাপ্টা ছোট বাক্সটার ভেতর। ভুতোর হাত দুমড়োনো, পা মোড়া। ওখানে অনেক আলো, অনেক মানুষ, অনেক কোলাহল। এখানে পর্দা-ফেলা অন্ধকার একটা ঘরে সে একা। কালো একটা মেয়ে, সে বাঘকে চুমু খায়। খেলা দেখিয়ে পয়সা কামায়, আবার গোবরাকে আদর করে। ভুতো একটা কাটামুণ্ডু। সে নরক পাহারা দেয়। মানুষ ঠকায়। ভয় দেখিয়ে পয়সা কামায়। আর গোবরাকে হিংসে করে।

বুঝল, পর্দার বাইরে কিছু লোক হয়েছে। আবার একটি পালা এগিয়ে আসছে। মালিক বক্তৃতা দিচ্ছে, 'পাপ কে করেনি? আর চারজন, আসুন, কাটামুণ্ডু—'

আস্তে আস্তে অবশ স্নায়ুকটা আবার প্রখর হয়ে উঠছে। ভুতো জানে এখন শরীরে ব্যথা থাকলে চলবে না, এখন মনে ক্লান্তি জমলে চলবে না। এইবার পর্দা উঠবে। তাকে ভয়ঙ্কর দুটো চোখ মেলে তাকাতে হবে। ভয় দেখাতে হবে।

নরক। এই কাঠের বাক্সটা নরক। এই তাঁবুর ঘরটা নরক। এই তাঁবুর বাইরেটা নরক। হাত ছড়ানো যায় না, পা ছড়ানো যায় না, মন ছড়ানো যায় না। ভুতোর বয়েস ষোল। তার অতীত আছে। অতীতে বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই। একটা মা। একটা রাক্ষুসী। একটা লোভী। একটা অভাব। একটা ক্ষিধে। তারপর এই দল। তারপর এ-দেশ, সে-দেশ। তারপর এই বাক্স। তারপর জালকুমারী, তারপর কাটামুণ্ডু। আমি যমদূত। আমার কাজ নরক পাহারা দেওয়া।

ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে। নরকের দরজা খুলে যাবে। তারপর চাপা গুমোট। নিশ্বাস

নেওয়া যায় না। তারপর অন্ধকার। চোখ মেলা যায় না। তারপর বাতাস নেই, নিশ্বাস নেই। আলো নেই, দিশা নেই। আর, একটা জায়গা। অনেকগুলো মানুষ। শরীরটা মাকড়সার জাল, মুণ্ডুটি মেয়ের। তিনটে ধড়, একটা মাথা। মার মত, মালিকের মত, যারা ভিড় জমায় তাদের মত। সবাই নিশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। না পেরে দৌড়চ্ছে। না দেখে একজন আর একজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায়, ভয়ে খিমচে দিচ্ছে নিজেকে, অন্যকে। কিন্তু কেউ মরছে না। আবার দৌড়চ্ছে। আবার মুখ থুবড়ে পড়ছে। তারপর সেই ছোট্ট জায়গাটুকুতে সেই অনেকগুলো শ্বাসচাপা অন্ধ মানুষ এ-ওকে জড়িয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে, গড়াচ্ছে। আর তাদের গায়ে ঘাম। ঘাম নয়, গরম তেল। তেল ফুটে উপচে পড়ল। মাটিটা কাদা হয়ে গেল, পাঁক হয়ে গেল। ভুরভুরি কেটে তারা সেই পাঁকে ডুবতে লাগল! ডুবতে ডুবতে ভাসতে চাইল, ভাসতে ভাসতে দৌড়ে পালাতে গেল। আর মুখ থুবড়ে পড়ে শ্বাস টানার জন্য আঙুল দিয়ে মুঠো মুঠো পাঁক ধরল। ফুটন্ত পাঁকে তাদের চামড়া পুড়ছে। চামড়া পুড়ে উৎকট গন্ধ। সেই গন্ধ এক ঝলক নিশ্বাস হয়ে এতক্ষণে ফুসফুসে ঢুকল। তারা ভাবল আবার শ্বাস নিতে পারছে। আনন্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর গন্ধটা ফুসফুস থেকে সমস্ত শরীরে ছড়াতেই বমি করে উঠল। এ-ওর গায়ে বমি করল। থকথকে পাঁকের ওপর থকথকে বমি। তারপর বমিগুলো হঠাৎ শাদা আগুনের ফুলকি হয়ে ওপরে উঠতে লাগল। উড়তে উড়তে ছড়াতে লাগল। ছড়াতে ছড়াতে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ধাক্কায় বাজ পড়ার শব্দ। তারপর শুধু আগুনের বৃষ্টি। আর, আবার নিশ্বাস নেই, দৃষ্টি নেই। তবু হাত দিয়ে চোখ ঢাকল, মুখ ঢাকল। তারপর অসহায়ের মত ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত। একজন আর একজনকে জড়াল। একদল আর-এক দলকে জড়াল। তারপর সকলে পাঁকে ভুরভুরি তুলে গড়াতে লাগল, বমি করতে লাগল।

সমস্ত শরীরটা বমি পেয়ে ঝেঁকে উঠল। ঝাঁকুনিতে ওপরের মাটি ঝুরঝুর করেনিচে পড়ল। ঘেমো গায়ে মাটি লেগে কাদা হল। শ্রীকেষ্ট হঠাৎ সেই মৃগী রোগীর মত আঁ-আঁ শব্দে একটা উৎকট আর্তনাদ করে উঠল। ঢং ঢং ঢং। আর-একজন। একজন। এইবার নরকের দোর খুলে যাবে। খুলে গেল। পর্দা উঠল।

বেড়ার ওপাশে ঝুঁকে পড়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। আজ কয়েকবছর ধরে এমনি কিছু চোখের সঙ্গে তার পরিচয়। সংশয়ী, কৌতূহলী। বিশ্বাস করছে না, ফন্দিটা ধরতে চাইছে। আবার ভয়ও পাচ্ছে। হয়তো একটু করুণা।

ভ্যাঁ করে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠে তার মায়ের কাঁধে মুখ লুকোল। মাঝ-বয়েসী একটি বউ। মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুর। একটা হাতে শক্ত করে বাঁশের বেড়া চেপে আছে বিস্মিত সন্ত্রস্ত দুটো চোখ মেলে কাটামুণ্ডুকে দেখছে। বাচ্চাটা কাঁদছে ভয় পেয়ে। পাশের লোক বিরক্ত হচ্ছে। একজন বলল, 'কাঁদিস না খোকা। ও মিছিমিছি। একটা লক্কা পায়রার মত ছোকরা হেসে হেসে বলছে।

রাগে, ঘৃণায়, বিদ্বেষে ভুতোর দাঁত কষকষ করে উঠল। জীবনে এই একটি জায়গায় তার জিত। তাকেই ছোকরা অস্বীকার করছে। মিছিমিছি? কেন, নরক কি নেই? যমদূত কি নেই? পাপ করলে কি নরকে যেতে হয় না? ছেলেবেলায় নরকের গল্প কি শোনেনি তার সেই রাক্ষুসী মার কাছে, যার বড় ভয় ছিল ভুতো বখে যাবে? তাই পাপের শাস্তির গল্প বলে তাকে সাবধান করত, ভয় দেখাত। হয়তো ভুতোকে সামনে বসিয়ে নিজেকেই শোনাত। আর, মা কি নরকে পচে মরছে না? মিছিমিছি যদি, তবে মরতে এসেছিস কেন? বিশ্বাস নেই যদি, তবে দাঁত ক্যালাবার জন্য কেন ঢুকেছিস এখানে?

ভুতোর ভয়ানক সব ইচ্ছে হতে লাগল। যেন নরকের চুল্লি থেকে একটা টকটকে লাল শূল বার করে সে ছেলেটাকে তার ওপর চড়িয়েছে আর শূলের ছুঁচল মাথাটা তার ব্রহ্মতালু ভেদ করে ওপরে উঠেছে। যেন একটা অজগর সাপ এসে পাকে পাকে ছেলেটাকে জড়িয়েছে আর চাপের পর চাপ দিয়ে তার শরীরের সমস্ত কটা হাড়কে বালির মত গুঁড়ো করে দিয়েছে। অথচ লক্কা পায়রা ছোঁড়াটার মাথায় তেমনি তেড়ি আছে, ঠোঁটে তেমনি সিগারেট আছে, হাত আছে পা আছে, মাংস আছে, চামড়া আছে। সাপটা ছেড়ে যেতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে গেল আর একখানাও হাড় না থাকায় একতাল চর্বির মত দলা পাকিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

ভাবতে ভাবতে ভুতো ভয়ঙ্কর দুটো চোখে কটমট করে তাকাল। আর সেই বউটা শিউরে উঠল। আর সেই বাচ্চাটা অবাার ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। এবং কেমন একটা উৎকট আনন্দ হল।সেই ভয়, সেই বিস্ময়, সেই আতঙ্ক ভুতো চোখ দিয়ে চাটতে লাগল। আর হঠাৎ যেন সে সত্যিই যমদূত হয়ে গেল। নরকের পাহারাদার, যার চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। স্বয়ং যমরাজা নয়। যে স্বর্গে যাবে সেও না।

ভুতো দেখল বিহ্বল সেই বউটির প্রায় গায়ের ওপর পড়ে বুড়ো মত যে হিন্দুস্তানী অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়াবার ভান করছে, সে মোটেই কাটামুণ্ডুকে দেখছে না।

পাপ। ভুতো সেই লোকটার চোখে পাপ দেখল। পাপ। ভুতো সেই ছোকরার চোখে পাপ দেখল। কিসের, তা ভুতো জানে না। কেমন, তা ভুতো জানে না। কিন্তু ওর তোবড়ানো গাল, কালিমারা চোখ আর সিগারেট টানার ধরনে ভুতো পাপ দেখল। সেই মাঝবয়েসী বউটার চোখেও পাপ। নরকের গল্প বলতে বলতে মার চোখে যেমন আতঙ্ক ফুটে উঠত, কাটামুণ্ডু দেখতে দেখতে বউটার চোখেও তেমনি ভয়। আজ বোঝে মায়ের আতঙ্কের মূলে তার পাপ ছিল। বউটার চোখের ডরেও নিশ্চয় তারই জীবনের ছায়া। ভুতো প্রতিটি দর্শকের মুখে পাপ দেখতে লাগল। দেখে তার উৎকট আনন্দ হল। কাটামুণ্ডুর, চোখকে ফাঁকি দেবে কে? আর তারপর একদিন আসতেই হবে।

'কথা বল কাটামুণ্ডু। বলো তুমি কে!'

'আমি যমদূত'।

'তোমার কাজ কি'?

'নরক পাহারা দেওয়া'।

দেখল সেই বউটা দুহাত জোড় করে তাকে প্রণাম করছে।

আর হঠাৎ কি যেন হল।

হঠাৎ কি যেন হল। ইচ্ছে গেল চিৎকার করে ওঠে। ইচ্ছে গেল শ্রীকেষ্টর মত, একটা জন্তুর মত, একটা দানোয়-পাওয়া জোয়ান ছেলের মত চিৎকার করে বলে, আমায় প্রণাম কোরো না, আমি কাটামুণ্ডু নই, আমি যমদূত নই। আমি ভুতো, আমি শ্যামলডাঙার ভুতো।

পর্দা পড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ময়লা পর্দাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আহ্। কি অন্ধকার। কি গরম। কি ঘাম। কি ব্যথা। ঘাম বসে সর্দিগর্মি লেগেছে। হাঁচলো। খানিকটা সর্দি নাক দিয়ে ঝুলে গোঁফের ওপর পড়ল। হাত বাক্সে, মুছতে পারছে না। গোঁফের ওপর মাছি এসে বসেছে। হাত বাক্সে, তাড়াতে পারছে না। বড্ড তেষ্টা। মুখ শুকনো, জিভ লুকনো টাগরা শুকনো, শরীরটা শুকনো।

'তুমি কে জালকুমারী'।

'আমি জানি না'।

তুই কে কাটামুণ্ডু? আমি জানি না। তুই কে কাটামুণ্ডু? আমি জানি না। তুই কে কাটামুণ্ডু? আমি জানি না। তুই যমদূত? আমি জানি না। তুই কাটামুণ্ডু যমদূত? আমি জানি না। তুই নরকের পাহারাদার? আমি জানি না। তুই ভুতো? আমি জানি না।

'দেখুন এ জানে না। হা হা হা'। মালিক অট্টহাসি করল, 'জালের শরীর নিয়ে তুমি কেমন আছ জালকুমারী'?

শশী চুপ।

'বলো'। হাসির ছলে মালিক ধমক দিল।

ভুতো শুনল জালকুমারী অস্ফুটে বলছে, 'বড় কষ্ট'।

মালিক আবার অট্টহাসি করল, 'দেখুন আপনারা, চিরজীবন যাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হবে, আজই সে বলছে বড় কষ্ট'।

হঠাৎ যেন ফিসফিস করে, গুমরে গুমরে একটা কান্নার শব্দ। পর্দা ফেলার পর শশী কি কাঁদছে? মালিকের হাতে চড় খেয়ে দ্বিতীয় দফা থেকে শেষ প্রশ্নের জবাবটা ঠিকমত দিতে হচ্ছে, সেই দুঃখে? শেখানো জবাবটা সত্যি হয়ে উঠেছে আর মিথ্যের ছদ্মবেশ পরে সেই সত্যি বলতে হচ্ছে, তাই? হঠাৎ নূপুরের শব্দ। খুব ঢিমে, খুব মৃদু। কালো নাচছে। শশী কাঁদছে আর কালো নাচছে। মালিক সবশেষের খেলায় শেষ বক্তৃতা দিচ্ছে। দশ বছরের গোবরা...যার নরম পাছা, নরম গাল, নরম চামড়া, নরম হাড়—এখন কাঁধের ওপর দুটো ঠাঙ তুলে দু-হাতের ভরে একটা শকুনির মত মাটি থেকে একটু ওপরে উঠে তিনটে ধড়ে এক-মাথা পিশাচের খেলা দেখাচ্ছে।

'ছোটবেলায় এ চুরি করত, মিথ্যে কথা বলত। বড় হয়ে...'

অথচ গোবরার গায়ে বড় ব্যথা। ও ছোট্ট। আর গোবরা বড় ভীতু, চুরি করে ভুতোর একটা বিড়ি খাওয়ার সাহসও নেই। তুব তাকে নরকে ঢুকতে হয়েছে। এবং বড় হলে বড় জোর কাটামুণ্ডুর পালা অভিনয় করার সুযোগটুকু পাবে।

আর কালো নাচবে, শশী কাঁদবে। ঘুঙুরের আওয়াজ, কান্নার শব্দ—মৃদু, চাপা। হাততালি, কোলাহল। লোভ, লোভের পরিণাম। ঢং ঢং ঢং। বাঘটা ডাকল। ভুতোর এখন ভয় নেই। সে যমদূত। বাঘের মুখে পচা মাংসের গন্ধ। কালোর মুখে বাসি মিষ্টি গন্ধ। বুড়ো হিন্দুস্তানী কচি বউটার ঘাড়ে এসে পড়েছে। মা একটা রাক্ষুসী, তাকে ভাসিয়ে গলায় দড়ি দিল। পাপ। তার মায়ের পাপ। তার জন্মে পাপ। তার জন্মে পাপ। তার জীবনে পাপ। এই তাঁবুটায় মিথ্যে, প্রতারণা, অত্যাচার আর যন্ত্রণার পাপ। যে লোকগুলো পয়সার জোরে এই মজা দেখছে, তাদের চোখেমুখে পাপ। পৃথিবীটায় শুধু পাপ....

অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। বাতাস নেই, বাতাস নেই। তৃষ্ণা। ঘাম। গরম তেল। তার মধ্যে কালো নাচছে। সেই মানুষগুলো গড়াতে গড়াতে, বমি করতে করতে, নিশ্বাসের জন্য আঁকপাঁকিয়ে নখ উঁচিয়ে কালোর দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ নীল, নীরেট নীল একটা আগুন সরু সুতোর মত ওপর থেকে ঝুলতে ঝুলতে নিচে নেমে এল। সেই নীল আগুনে অন্ধকারটা আরও বীভৎস হল। ছায়া-ছায়া সেই মানুষগুলোকে দেখা গেল। তাদের চোখ, তাদের নখ। তাদের বমি দেখা গেল। কালোকে দেখা গেল। তারা গড়াতে গড়াতে যাচ্ছে। কালো নাচছে। আর হঠাৎ চারদিকে চারটে মাকড়সার জালের দেয়াল উঠল। ওপরে একটা জালের ছাদ উঠল। চারটে দেয়াল চলতে আরম্ভ করল। কাছে আসছে, ছোট হচ্ছে, জায়গা কমছে। মানুষগুলো আর গড়াতে পারছে না। একজনের ওপর আর একজন গাদা হল। এবং দেয়ালগুলো আরও কাছে আসছে, জায়গা কমছে। তারপর ওপর থেকে ছাদটাও নামতে লাগল। মানুষগুলো ভয় পেয়েছে। চারদিক থেকে জালের দেয়াল তাদের চেপে ধরেছে। অথচ জালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো নাচছে। ঘুঙুর বাজছে। সেই রোগা, বুড়ো, উপোসী বাঘটা এল। কালো তাকে জড়িয়ে ধরল। আদর করে গলায় হাত বোলাল। মুখে চুমু খেল। বাঘটা ঢিমে চোখে লেজ নাড়ছে। আর তাই দেখে এই লোকগুলো একসঙ্গে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকারে যেন আকাশে বাজ পড়ল। কালো চমকেছে, বাঘটা চমকেছে। তারপর কালো দৌড়চ্ছে, বাঘটা দৌড়চ্ছে। আর নীল আগুনের সুতোটা বাড়ছে, বাড়ছে, বাড়ছে। সামনে নরক বাড়ছে, বাড়ছে, বাড়ছে। কালোকে নীল আলোয় কখনও আশ্চর্য, কখনও ভয়ানক দেখাচ্ছে। বুড়ো বাঘটার দাঁত নীল আলোয় জ্বলছে। জালের মানুষগুলো তখন অন্ধকার আর নীল—দুই রঙের মাখামাখিতে অস্পষ্ট। তারা হা হা করে চিৎকার করছে। নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে জাল ছিঁড়তে চাইছে। আর কালো

দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে...ইতিমধ্যে হৈ হৈ করে তাঁবুর লোকজন বাইরে বেরিয়েছে। গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের তাঁবুতে প্রচণ্ড কোলাহল। সমস্ত মেলার মধ্যে বিদ্যুতের মত কথাটা ছড়াল। নাচুনে মেয়েটা আদর করে যখন বাঘের গলায় মুখ ঘষছিল, তখন বাইরে কটা বখাটে চ্যাংড়া বিনা টিকিটে ভেতরে ঢুকতে না পেয়ে মনের ঝালে পটকা ফাটিয়েছে। বাঘটা চমকে উঠে মেয়েটার ঘাড়ে থাবা বসিয়েছে। বাঁচে কি না বাঁচে।

পুলিশ এল। এশিয়ান সার্কাসের খেলা বন্ধ। মেলাটা হঠাৎ টাল খেয়েছে। বাঘ খাঁচায়। কালোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উত্তেজনা আর আতঙ্ক রইলই। নানারকম গুজব কানে কানে ছড়াল। এক-একজন প্রত্যক্ষদর্শী এক-এক ধাঁচে বর্ণনা দিলো। অষ্টাবক্র উত্তেজনায় সমস্ত মেলাটা থমথম করতে লাগল।

তারপর আবার ভিড় জমল। বেচা-কানা শুরু হল। আবার মাচার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীকেষ্ট নানা বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গি করে লোক হাসাতে লাগল। মালিক ঢং ঢং করে কাঁশি বাজিয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলল। পাশের তাঁবুতে নাচ নেই, ব্যাণ্ড নেই, জোকার নেই। এই তাঁবুতে ভিড় বাড়ল।

পর্দা তুলে মালিক কাটামুণ্ডুর দিকে হাত উঁচিয়ে বলল, 'কথা বলো কাটামুণ্ডু। বলো, তুমি কে'?

'আমি যমদূত'।

'তোমার কাজ কি'?

'নরক পাহারা দেওয়া'।

কিন্তু পর্দা ফেলার আগেই প্রথম সারির একটা বোকা বোকা চাষা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'লে বাব্বা। তোমার কাটামুণ্ডুর চোখে দেখি মানুষের মত জল'।

ভারতবর্ষ

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

'সঈদুল', রাখি বলল, 'আমাকে চুমু খেয়েছে'।

কিছু নদী আছে, যাতে জোয়ার-ভাটা খেলে না। হেমাঙ্গর মুখ সেই জাতীয়। মনোভাবের, মুখে দুরস্থান, তার মনেও কোনও ছায়া পড়ে না। অনুভব, আবেগ, এসব গ্রহণ করার মত তার মন আছে কিনা, সে নিজেও ভাল বোঝে না। থাকলে, মুখে-চোখে না হোক, অন্তত মনে ধরা দেবে এই যদি হয় পূর্ব-শর্ত, তাহলে মানতেই হয় যে ও-ব্যাপারে সে আজও প্রামাণ্য নয়। অনুভব, আবেগ—বিশেষত প্রেম সংক্রান্ত যেগুলো— সেসব সরল জিনিস। কিন্তু আবেগ সমূহের মধ্যে জটিলতম যেগুলো, যেমন ধরা যাক, জিঘাংসা কি রিরংসা—যে দুটো নাকি মানবিক হয়েও অনেকখানি পাশবিক, একটা প্রমাণ তো রেখে যাবে তারা! একটা দাগ রেখে যাবে। মুখে-চোখে না রাখুক, অন্তত মনে! কিন্তু হেমাঙ্গর ক্ষেত্রে প্রমাণ কই যে তারা ছিল বা আছে? বিশেষত ওই জিঘাংসার ব্যাপারটা। না-না, সেরকম নেই কেউ তার জীবনে, তার জীবনে কখনও দেখাও দেবে না সে-যে, খুন হতে পারে, তার মত মানুষের হাতে! হ্যাঁ, সেও একটা খুন বটে, আবার ঠিক খুন নয়ও। সেই জন্যই তো ফাঁসি হয় না, বা যাবজ্জীবন। প্রকৃত খুন হলে হত নিশ্চয়ই। তাছাড়া, তাই যদি হবে লোকে লিখে রেখে যায় কেন যে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়?' মানে তো একটাই। আমাকে কেউ 'খুন' করেনি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ খুনী নয়। তাই, রাগ-দুঃখ, আনন্দ-অভিমান থাকে থাক, না-থাকে না থাক, শেষমেস এমনিই দাঁড়িয়েছে তার ভাবখানা। জন্ম-প্রতিবন্ধী তো হয় অনেকে। হয় না? কালা, বোবা, জড়বুদ্ধি, বগলে-ক্রাচ, অন্ধ, হ্যাঁ, জন্মান্ধ....কতরকম তো আছে। জোয়ার-ভাটা নেই, এমন নদী আছে কত।

'ইন ফ্যাক্ট', প্রায় খবর পড়া গলায় রাখি বলল, 'আই হ্যাড টু স্লিপ উইথ হিম।'

হেমাঙ্গ চুপ করে আছে। থাকবে জানা ছিল। স্বামীকে ঠিক বুঝতে একটুও ভুল করেনি রাখি। ১৩ পেরিয়ে ১৪য় পড়ল তাদের দাম্পত্য, এ-টুকু না-বোঝার কথাও না। যাদের বলা যায় না, মেয়েরা এ-সব কথা তাদের বলে না। সেই সব স্বামীকে। মৃত্যু পর্যন্ত সে বোঝা বহে নিয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল না। তাই বোঝা নামিয়ে

রাখল। যদিও ঝাড়া দু'মাস ধরে ভেবেছে। কেননা, ঘটনা তো মাস দুই আগের। সেই যেদিন বাবরি। তারপর, আজ, অবশেষে বোঝা নামিয়ে রাখল। যে যা ছিল অবধারিত, অথচ, অযথা দেরি হচ্ছিল এবং অকারণে, তা ঘটে গেছে।

যা বলার, তা বলা হয়ে গেছে। অন্তত, মোদ্দা কথা যেটুকু। কিন্তু শত হলেও ব্যাপারটা তো সারমেয়-সমাজের নিয়মে হয়নি। যে, মেটিং সিজনে এক কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল এক কুকুরির। আর মদ্দাটা ছিল ভারি যণ্ডা, বাকিগুলো তাই লেজ গুটিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দেয়। আর তাই, যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে। এরপর এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করলে ব্যাপারটা ফলত তাই দাঁড়ায়। কিন্তু, গর্হিততম কাজ, এমন কি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে এলেও, মানুষ মানুষই থেকে যায়। ফাঁসির দড়ি থেকে যে ঝুলছে, দুলছে, সকলেই জানে, সে একজন মানুষ। সে তুলনায় ৬ ডিসেম্বর, বাবরি ভাঙার দিন যা ঘটে গিয়েছে সে তো কিছুই না। সত্যি বলছে বাবরি মসজিদ যে তখনই ভাঙছে, রাখি জানত না। জানা গেল তো বিকেলে ৭টার খবরে। আর ঘটনা ঘটেছে সেদিন দুপুরে। সঈদের টটি লেনের স্টুডিওয়। অবশ্য সঈদ হয়তো জানত মসজিদ ভাঙার ব্যাপারটা। বিবিসি তো তখন থেকেই দেখিয়েছিল, শাবল গাঁইতি নিয়ে যখন ওরা গম্বুজে উঠে গেছে। সে নিশ্চয়ই দেখেছিল। সে যে জানত সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল রাখি। দোতলার স্টুডিওয় অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ছেলে সৌম্যকে বসিয়ে রেখে সে যখন নিচে নেমে এসেছিল, মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে, কাঁধে হাত রেখেছিল রাখির। গুলি বর্ষণের মত তার চক্ষু-কোটর থেকে বেরিয়ে আসা, সে কী অনর্গল দৃষ্টিপাত। তার হাত ধরে সেভাবে বেডরুমে ঢুকেছিল সঈদ, যেভাবে, যুদ্ধের সময় মানুষ আত্মরক্ষার্থে ট্রেঞ্চে ঢোকে। যদিও সেদিন সন্ধ্যাবেলা, ওদের ট্যাক্সিতে তুলে দেবার সময় পর্যন্ত সঈদ কিছুই বলেনি। কিন্তু, মসজিদের প্রথম গম্বুজ তখনই ভেঙে পড়ে। সেদিন শনিবার! দুপুরবেলা যখন সঈদ বিছানা ভাঙছে। পরে, সময় মিলিয়ে দেখেছে রাখি।

রাখি তাই কথা বাড়াল, 'ইচ্ছে আমার ছিল না মোটেই। কিন্তু জানো তো, হাউ দিস থিংস হ্যাপেন। অ্যাণ্ড ইনস্পাইট অব ইওরসেলফ।'

ঠিক দু'মাসের মাথায় আজ আর এক শনিবার। আজও দুপুরবেলা। রাখির মাথা আজ হেমাঙ্গর বুকের কাছে। হেমাঙ্গর রোমবহুল লম্বা হাত তার উন্মুক্ত পিঠের ওপর মেরুদাঁড়ার প্রারম্ভ পর্যন্ত পড়ে আছে।

হেমাঙ্গ এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। কথা বলা দূরে থাক, একটা কিছু ভাবনাও তার মনে জাগেনি এখনও। ৬ ডিসেম্বর যখন বাবরি ভাঙা হচ্ছিল, সে ছিল ইন্দোরে। এন টি সি-র বন্ধ কারখানাগুলো নিয়ে লেবার সেক্রেটারি অহল্যা বান্দেকরের সঙ্গে মিটিং—সঙ্গে ওখানকার শ্রমিক নেতা লোকেশ গাউর, প্রকাশ জৈন এরা সব। হঠাৎ খবর এল। সেক্রেটারির অ্যান্টি চেম্বারে 'সোনি' টিভিতে তারাও বিবিসি-তে দেখল যা দেখার। তখন কি, যা ঘটছে, তার বেশি কিছু, কোনও ভাবনা, তাদের মনে এসেছিল? যা ঘটে যাচ্ছে,

তাকে, ফর্ম এবং কনটেন্টে, সর্বাংশে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল তখন? বলতে হয় তাই আমরা বলি, ওকে চিনি, ওটা জানি। এমনটা হবে জানতাম। কত ভুল জানি আমরা তা বোঝা যায়, জানার বাইরে যখন কিছু ঘটে যায়, তখন। ওই যে আমার হাতটা, যা এখন রাখির পিঠ জুড়ে পড়ে আছে, কতদিনের চেনা, তবু আমি কি ওকে চিনি। ওকি, সত্যিই আমার। আমার বুকে যার নিঃশ্বাস পড়ছে, যে একতরফা, একা-একা ভালবাসে আমাকে, হ্যাঁ, ভালই তো বাসে, ভালবাসায় যে রেখেছে বিশ্বাস, সেও কি আমার খুব চেনা, জানা? আমি তার আবেগ-অনুভবকে চিনি?

'কী ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না যে!'

কী যে বলা যায়, তা মনে এসে যাবে ভেবেই হেমাঙ্গ এতক্ষণ খাটের পাদদেশে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। সুশিক্ষিত ওষ্ঠলীলা ও দুই হাতের নিপুণ মুদ্রা সহযোগে বোবা ও কালাদের জন্য টিভিতে খবর বলা হচ্ছে। চৌকো খুপরির মধ্যে বিলম্বিত লয়ে খবর পড়ে যাচ্ছে আর একটি মেয়ে, যদিও শোনা যাচ্ছে না কিছুই। হেমাঙ্গ শুনতে চেয়েছিল। বাবরির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক জায়গায় সামিয়ানার নিচে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রামলালার বিগ্রহ। পূজা ও ভজন চলছে, তাও দেখাল। ভক্তবৃন্দের লম্বা লাইন। মিলিটারি। জনসভায় লালকৃষ্ণ আদবানি। কিন্তু বিছানা থেকে উঠে রাখি 'পরে শুনো আবার তো বলবে' বলে সাউণ্ড অফ করে দিয়েছে। কথার জন্য হেমাঙ্গ তাই ঘরজোড়া জিনিসপত্রের দিকে তাকায়। ডাইনিং স্পেসে চলে যায় তার দৃষ্টি, ঘর ছেড়ে। কাঁধে-পতাকা লেলিনের প্রাগ্রসর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে।

'সৌম্য কোথায়?'

'ওর তো আজ ছবির লেসন। ওর ওখানে গেছে।'

নামটা উচ্চারণ করল না রাখি। তাই হেমাঙ্গ জানতে চাইল, 'সঈদের ওখানে?' নইলে তার প্রয়োজন ছিল না।

আদবানির ঠোঁট নড়ছে। মন্দির ওঁহি বানায়েঙ্গে।

'লোকটার সঙ্গে হিটলারের একটা মিল আছে।' গণতান্ত্রিক শিল্পী সঙেঘর নেতৃস্থানীয় সভ্য সঈদল ইসলাম একদিন হেমাঙ্গর কাছে জানতে চেয়েছিল, 'কোথায় বলত?'

'দু'জনেই ফ্যাসিস্ট?'

'না', সঈদুল বলে ছিল, ক্যানভাসের মূল রঙ লালে সবুজ মিশিয়ে ও কিছুটা হরিদ্রাভ করে দিতে দিতে, 'দু'জনকেই মিডিওকার দেখতে।'

খুব হেসেছিল সেদিন ওরা দু'জনে। একসঙ্গে হো-হো করে। কোথা থেকে কী হঠাৎ মনে এল হেমাঙ্গর।

'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?' সে অবশেষে জানতে চায়।

'আমরা? আমরা কোথায়?' রাখি উঠে বসল, 'আমি গিয়েছিলাম।'

'কোন হোটেলে?'

'হোটেলে নয়। টটি লেনে। ওর স্টুডিওয়।'

'ফোন করেছিল?'

'না-না। আমি নিজেই চলে গেলাম। তোমার সোয়েটারের উল পালটাতে, গিয়েছিলাম নিউ মার্কেটে। কাছেই টটি লেন। ভাবলাম, যাই, সৌম্যর সঙ্গে ফিরব। বউ-বাচ্চা ছিল না।' হঠাৎ অকারণে ফিসফিস করে রাখি বলল, 'বহরমপুর গেছে।' যেন এটাই আসল কথা, যা গোপনতম গোপন।

'কী করে হল ব্যাপারটা, বল?'

'কী করে হল? কি বলছ তুমি? জন্তু-জানোয়ারের মত টেনে নিয়ে গেল!'

উঠে বসে চুল গোটাতে শুরু করল রাখি। উত্তেজনায় এত বড় নিঃশ্বাস নিল সে, যে এতক্ষণ হুকে আটকে-থাকা ব্রেসিয়ার খুলে তার কোলে পড়ে গেল, 'জাস্ট লাইক আ বুল। কোনও প্রিটেনশান নেই। কৈফিয়ত নেই। একটা কিস পর্যন্ত করেনি তখনও জানো? শুধু মনে হচ্ছিল যেন ডেস্ট্রয় করতে চাইছে কিছু। আমাকে। শাবল দিয়ে গাঁইতি দিয়ে শুধু ঘা দিচ্ছে আমায়। সর্বত্র। পারলে বোধ হয় ছিঁড়ে ফেলত। বিশেষ করে ভাষা। কি যাচ্ছে তাই জাত তুলে সব কথা। ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত একবারও অ্যাপোলোজাইস করল না।'

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। টিভিতে আজ দুপুরের মত প্রোগ্রাম শেষ। একটা খিসখিস আওয়াজ হচ্ছিল। এবার হেমাঙ্গ সুইচ অফ্ করে দেয়।

'তুমি ওইদিনটা', হেমাঙ্গ বলল, 'না গেলেই পারতে।'

'বাঃ! আমি কি জানতাম নাকি যে ঐদিনই সত্যি বাবরি ভেঙে ফেলবে। ও কিন্তু জানত, জানো? বিবিসি-তে দেখেও ছিল মনে হয়।'

'কী করে বুঝলে?'

'সে আমি বুঝেছি।' হঠাৎ আবার ফিসফিসিয়ে এল রাখির গলা, 'সে কি রোখ! সে কি আক্রোশ। যেন দাঙ্গায় নেমেছে। পুরো হিন্দু-মুসলমান করে তুলল ব্যাপারটা, বিশ্বাস কর—' এত বলে হেমাঙ্গর কব্জি চেপে ধরে রাখি। তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, 'যেন খুনী। যেন খুন করছে।'

'আজ ফের সৌম্যকে পাঠালে?'

'ও তো যাবেই। আঁকার নামে পাগল। আর মাস্টারমশাই বলতে অজ্ঞান। ও তো কিছু জানে না।' রাখি বলল, 'ওকে বলা যায় না। আটকাব কি করে?'

সেদিন মধ্যরাতে হঠাৎ খুব মেঘ ডাকাডাকি। তাতে ঘুম ভাঙেনি। একটি বজ্রপাতের শব্দে সে ধড়মড়িয়ে বিছানায় বসে।

সে দেখল, রাখি পাশে নেই। এমন অভিজ্ঞতা তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথম। বালিশের তলা থেকে রেডিয়াম-লাগানো রিস্টওয়াচ্ বের করে সে দেখল, রাত তিনটে।

পাশের ঘরে দিদিমার সঙ্গে সৌম্য ঘুমিয়ে। বাথরুমে নেই। রাখি বারান্দায় নেই।

তাদের ফ্ল্যাটের লাগোয়া ৭ তলা পর্যন্ত আর একটা ব্লক উঠছে। ৫ তলা অব্দি উঠে কাজ বন্ধ রয়েছে। ৬ তলা পর্যন্ত বিম লেগে গেছে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সে দেখল, নিচে ৫ তলার ছাদে একটা বিমের পাশে রাখি বসে আছে। আকাশ ঝুলে পড়ছে মেঘে মেঘে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেমাঙ্গ ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

হেমাঙ্গ কাঁধে হাত রাখে রাখির। রাতে খোঁপা দেখে ঘুমিয়েছিল। এখন ওর চুল খোলা। খোঁপা ভেঙে চুলের তোড় এখন প্রবল জোলো হাওয়ায় তার পিঠ ভাসিয়ে কেঁপে উঠছে।

'কী হয়েছে রাখি?'

উত্তর নেই।

'কী হয়েছে, রাখি?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু। বল আমাকে।'

সে এবার দু'হাতে রাখিকে তুলে দাঁড় করায়।

রাখির পিছনে বিরাট একটা জলার মত পুকুর। তার পিছনে মাঠ। মাঠ ফুঁড়ে উত্তোলিত ত্রিশূলের মত একটি বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। কিন্তু, আশ্চর্য, এবার মেঘের ডাক শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রাখি। বৃষ্টি শুরু হল বলে? না। দু'হাতে হেমাঙ্গকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওগো, এই নিয়ে আমি দু'বার পিরিয়ড মিস করেছি।' তার বুকের মধ্যেও ভিজে কবুতরের মত তিরতির করে সে কেঁপে যাচ্ছে।

'৬ ডিসেম্বর আমার কোনও প্রোটেকশন ছিল না।'

রাখি কেঁপেই চলেছে। বুকে চেপে ধরে সেই কাঁপুনি থামাতে পারে না। হেমাঙ্গ। তাদের দু'জনকে ঘিরে অঝোরে আবার বৃষ্টি নেমে আসে।

মহাভারত

রতন ভট্টাচার্য

তিনতলার ওপর এই ঘরখানা তিনজন বৃদ্ধার। তাঁদের নাম ঊষা, ডলি আর নিভা। ঊষা নামের বৃদ্ধাটির বয়েস চুয়াত্তর। নিভার হল আটষট্টি এবং ডলির সত্তর। ঘর বেশ বড়। যেদিকে দরজা তার উলটোদিকে প্রকাণ্ড দুটো জানলা। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে দেখা যাবে অন্ধকারে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হল বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল সন্ধেবেলা শুরু হয়েছিল, আজ সন্ধে পার হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘন্টায় বৃষ্টির বেগ একরকম নেই। কখনও জোরে হচ্ছে, কখনও আস্তে। কিন্তু থামছে না। এখন তো একেবারে মুষলধারে।

ক্রমাগত উঁচুনিচু হয়ে ছড়িয়ে পড়া এই বাড়িটায় ঘর আছে আশিখানা। এটা একটা ওল্ড হোম। অর্থের বিনিময়ে স্বজনহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখানে থাকতে পারে। এই মুহূর্তে এখানে একটাও সিট ফাঁকা নেই। সিট দুশো। একশোজন বৃদ্ধ এবং একশোজন বৃদ্ধা। সব ভর্তি।

বাড়িটার সামনের দিকে হাইরোড, পেছন দিকে খাল। হাইরোড বলতে সাধারণত আন্তঃরাজ্য রাস্তা বোঝায়। সে অর্থে একটা হাইরোড নয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় মিলিটারির তৈরি বলে হাইরোডের মতই চওড়া। সেইরকম মসৃণ, ঝকঝকে। প্রায় বিঘে কুড়ি জমির ওপর বাড়ি। শুধু বাড়ি কেন, বাড়ি, বাগান, ঝিল, কী নেই? ঝিলের দিকে খানিকটা আবার জঙ্গলও আছে। অবশ্য বাড়ি থেকে বেশ দূরে। যেমন ঘাসবন। বাঘ ডুব দিয়ে থাকতে পারে এমন ঘাসবন আছে এখানে। যেদিকে ঝিল ঠিক তার উলটোদিকে। কিন্তু কাছাকাছি নয়। বাড়ি থেকে অনেকখানি দূরে। বাড়ির কাছে সব কিছু একেবারে সাজানো। তকতকে। সারি দিয়ে বসানো ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এসে থেমেছে গাড়ি বারান্দার নিচে। রাস্তা দুটো। একটা ঢোকার, একটা বেরোবার। কিংবা বলা যায় একটাই রাস্তা, ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত একদিকে দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এবং আগাগোড়া রাস্তাটা ইউক্যালিপ্‌টাসের সুগন্ধ ছায়ায় আবৃত।

আজ রোববার। সাধারণত রোববারে বিকেলবেলা বাড়ির সামনেটা গাড়িতে গাড়িতে একেবারে ভর্তি হয়ে যায়। নানা রঙের প্রাইভেট আর ট্যাক্সি। কিন্তু আজ একখানা

গাড়িও আসেনি। এই ওল্ড হোম একটা দ্বীপের মত। মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে। রোববার রোববার মূল ভূখণ্ডের সজীব হাওয়া ও টাটকা খবর নিয়ে ছুটে আসে মানুষজন। যে বুকচাপা বিষণ্ণতা দ্বীপের স্থায়ীভাব, তাকে কয়েক ঘন্টার জন্যে কথায়-বার্তায়, হাসি, কোলাহলে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আজ তারা আসেনি। চব্বিশ ঘন্টার অবিরাম বৃষ্টি মূল ভূখণ্ড থেকে আজ নতুন করে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এই দ্বীপকে।

আজ দ্বীপবাসীরাও তাদের ঘর থেকে বেরুতে পারেনি। প্রতিদিন বিকেলে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে, জঙ্গলে, ঘাসের বনে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্যে ঝিলের ধারে অনেকগুলি বসবার জায়গা। বেড়িয়ে ক্লান্ত হলে তারা সেখানে বসে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু আজ সেসব শূন্য পড়ে আছে। উঁচু উঁচু বাতিদানে মৃতের চোখের মত আলো। সেই চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে বৃষ্টির জল নামছে।

চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা উষা নিজের খাটটিতে বসে একটা ছেঁড়া সায়া সেলাই করছিলেন। চোখে সুরু ফ্রেমের গোল চশমা। তাঁর চেহারাটি বেশ বড়সড়। মোটা হাড়। রং এখনও টকটকে ফর্সা। তিনজনের মধ্যে উনি সবচেয়ে লম্বা। যদিও গলার চামড়া ঝুলে পড়েছে, মাথার চুল পাকা, গোটা সাতেক দাঁত নেই, তা সত্ত্বেও হঠাৎ ঘরে ঢুকে তাঁর দিকে তাকালে মনে হবে বুড়ো মানুষটি আমাদের চেনা জগতের কেউ না। মহাভারত থেকে উঠে এসেছেন। গান্ধারীকে আমরা কেউ দেখিনি। তবুও তাঁকে দেখলে সর্বপ্রথম গান্ধারীর কথাই মনে হবে। যেন গান্ধারী কোনও কাজ না পেয়ে হঠাৎ একটা সায়া সেলাই করতে বসে গেছেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের মধ্যে টিউবলাইটের ঝকঝকে সাদা আলোয় রাজমহিষী গান্ধারী খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসে সায়া সেলাই করছেন।

নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে নিভা একটা উপন্যাস পড়ছেন। ঘরের তিন বাসিন্দার মধ্যে তিনি সবচেয়ে ছোট। আটষট্টি। নিভার রং ফর্সা নয়। কালো। কিন্তু চামড়া এই বয়সেও অসম্ভব মসৃণ। তাঁর দাঁত পড়েনি এবং একমাথা কোঁকড়ানো চুলের সবটাই কালো। এই আটষট্টি বছর বয়সেও তাঁর মুখ থেকে যৌবন যাই যাই করেও চলে যায়নি। তাঁরও চোখে চশমা আছে। কিন্তু সে-চশমা শৌখিন এবং দামি। তাঁর গলার ভাঁজ সবসময় চোখে পড়ে না। হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়। তখন মুহূর্তের জন্যে তাঁকে বুড়ি মনে হয়। না হলে তিনি দ্রৌপদী। হোমের সকলেই তাঁকে দ্রৌপদী বলে চেনে। আড়ালে এই নামেই তাঁকে ডাকে। কেন যে তিনি সকলের কাছে দ্রৌপদী হয়ে গেলেন তা কিন্তু কেউ জানে না। হয়তো মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর চেহারার কোনও সাদৃশ্য আছে। কিংবা উষা গান্ধারী হয়ে গেছেন বলেই একঘরের বাসিন্দা হিসেবে তাঁকেও দ্রৌপদী করে দিয়েছে।

বোধ হয় এই অনুমানই ঠিক। কেননা ঘরের তিন নম্বর মানুষটারও আছে একটা মহাভারতীয় নাম। সত্তর বছরের ডলিকে এ বাড়ির সবাই কুন্তী বলে জানে। পাণ্ডব-

জননী কুন্তী। অথচ মজা এই, পাঁচ সন্তান দূরের কথা তার মোটে একটা ছেলে। আর সেই ছেলেটি বোবা-কালা। কথা বলতে পারে না, শুনতেও পায় না কিছু। কোথায় মহাবীর পঞ্চপাণ্ডব আর কোথায় বোবা-কালা পঞ্চানন। ডলির সঙ্গে উষার চেহারার কিছু মিল আছে। ভুল হল। চেহারায় না। রঙে মিল আছে। তাঁরও রঙ ফর্সা। কিন্তু শরীর অনেক ছোটখাটো বলেই তাঁর গলায় সব সময় কতগুলো ফুলে ওঠা শিরা দেখা যায়। ঝুলে পড়বার মত তার শরীরে কোনও অতিরিক্ত চামড়া নেই। মুখে, গলায়, শরীরে, কোথাও না। আপাদমস্তক পাকানো। শুকনো বাঁশের মত অনেকটা।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ ঘরের জানলা দরজা হাট করে খোলা। জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে ঝাপ্‌টা এসে জানলার নিচটা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে যে মাঝে মাঝে হাওয়া চলছে তা একটু উলটোপালটা। কেননা জানলার বিপরীত দিকের দরজা দিয়েও ঝাপ্‌টা আসছিল। অবশ্য সেই ঝাপটায় ঘরে জল ঢুকছিল না। ঘরের বাইরে গ্রিল লাগানো টানা বারান্দা আছে। সেই বারান্দা ভিজে যাচ্ছিল। বারান্দাটা আগাগোড়া ভিজে গেছে।

খোলা দরজা দিয়ে গাছপালার মধ্যে দূরের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল। রাস্তা এবং রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ি। না। গাড়ি নয়। বৃষ্টি ভেদ করে হেড্‌লাইটের আলো ছুটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ডলি দরজায় হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ডলি মানে কুন্তী, যিনি এ সংসারে শুধু একটি ছেলের মা। ছেলেটি বোবা কালা এবং তার নাম পঞ্চানন। আর দুজন যখন ঘরের মধ্যে নিজের বিছানায় শুয়ে বসে আছেন তখন উনি ওভাবে হাওয়া ও বৃষ্টির পাশে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এই হোমে এমন একজন স্ত্রী পুরুষও নেই যে নিজের শরীর স্বাস্থ্যকে হেলা করে। চব্বিশ ঘন্টা একটানা বৃষ্টির ফলে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। রাত্তিরে গায়ে চাদর চাপাতে হবে। ঠাণ্ডার জন্যে আজ সারাদিন এ ঘরের পাখা খোলেনি কেউ। তাহলে উনি অমনভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

হ্যাঁ। ওঁর দাঁড়িয়ে থাকার একটা গুরুতর কারণ আছে। উনি বুদ্ধিহীন নন। সত্তর বছর বয়সে এইভাবে ভেজা হাওয়ার কাছাকাছি থাকলে নিমোনিয়া না হক, জ্বর যে হতে পারে তা উনি জানেন। শুধু দাঁড়িয়ে আছেন এই জন্যে যে বাইরের মতই ওঁর মনের ভেতরে একটা ভীষণ দুর্যোগ চলছে। সেখানে বৃষ্টির সঙ্গে হালকা হাওয়া নয়, সেখানে অন্ধকারে তুফান চলছে।

আজ ডলির চল্লিশ বছর বয়সের বোবা-কালা ছেলে পঞ্চাননের বিয়ে। মেয়েটিও বোবা-কালা। বয়েস আটত্রিশ। গত রোববারে ঝিলের ধারে বেঞ্চিতে বসে তাকে সব বলে গেছে ছেলে। বলে গেছে মানে তার সামনে বসে ক্রমাগত দু'হাতের দশটা আঙুল নেড়েছে আর ঠোঁট। সেই আঙুল এবং ঠোঁট থেকে এই খবরটুকু পেয়েছেন তিনি। তিনি বোবা নন। বোবা-কালা স্কুলে পড়েনওনি কোনওদিন। কিন্তু ছেলের আঙুল নাড়া আর ঠোঁট নাড়ার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেন। ছেলে বলে গিয়েছিল রেজিস্ট্রি হয়ে যাবার

পর সে সোজা বউকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে আসবে। তারপর এখান থেকে ফিরে বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি ও খাওয়া-দাওয়া করবে। তার আসার কথা তিনটে নাগাদ। এখন প্রায় সাতটা বাজতে চলল। মনে মনে তিনি বুঝে গেছেন ছেলের আজ আর আসবে না। আর তাইতেই অবুঝ নন হাজার দুশ্চিন্তার তুফান ছুটিয়ে দিয়েছে। শক্ত কাঠ হয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাই তিনি ভাবছিলেন কেন এল না পঞ্চানন।

ছেলের বিয়ের ব্যাপারটা ডলির নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্বেগ। এই খবর তিনি তাঁর ঘরের অন্য সদস্যদের দেননি। দু-একবার বলতে গেছেন, কিন্তু লজ্জায় পারেননি। ছেলে বিয়ে করবে, এতে মায়ের লজ্জার কি আছে? তবু তাঁর লজ্জা করেছে। হতে পারে, যাকে তিনি লজ্জা ভাবছেন সেটা তাঁর অভিমান। বিয়ে উপলক্ষে ছেলে তাঁকে দিন কয়েকের জন্যে একবারও বাড়ি যাবার কথা বলেনি বলে অভিমান। মেয়েটিকে তিনি চেনেন। বোবা-কালা স্কুলে পঞ্চাননের সঙ্গে পড়েছে। প্রায় বছর পনেরো-কুড়ির প্রেম। রেজিস্ট্রির কি দরকার ছিল? তাকে বললে দিন দশকের জন্যে বাড়ি গিয়ে তিনি তো সামাজিকভাবেই বিয়ে দিতে পারতেন ছেলের। হতে পারে, এই অভিমান থেকেই তিনি বলেননি কাউকে। কিংবা কে জানে হয়তো লজ্জাই হবে। দীর্ঘকাল বিধবার জীবনযাপন করছেন তিনি। প্রায় আটত্রিশ বছর। তাই হয়তো হঠাৎ ছেলের বিয়ের কথা শুনে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেছেন।

হঠাৎ ভয়ানক শব্দ করে কাছাকাছি বাজ পড়ল কোথাও। রং-মশালের আলোর মত তীব্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী আলোয় বৃষ্টিভেজা পৃথিবী মুহূর্তের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শঙ্কিতভাবে দরজা থেকে নিঃশব্দে সরে এলেন ডলি। ঊষা সেলাই থেকে মুখ তুলে ভয়ার্ত চোখে তাঁর দিকে তাকালেন একবার। কোনও কথা বললেন না। শুধু তাকালেন। কথা বললেন নিভা। ডলি পা ঝুলিয়ে নিঃশব্দে নিজের বিছানায় এসে বসলে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পড়তে নিভা বলে উঠলেন, 'আজ মহাপ্রলয়।'

তখন ঊষা বললেন, 'হ্যাঁ। প্রলয়। মমতাময়ীর জন্যে শোকে আকাশ ভেঙে পড়েছে।'

'উঁহু। মমতাময়ীর জন্যে নয়।' নিভা বললেন, 'বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল। আর মমতাময়ী মরেছে আজ দুপুরে। তার জন্যে নয়। প্রলয়ের অন্য কোনও কারণ আছে যা আমরা জানি না।'

'কি কারণ?'

'বললুম তো জানি না। একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হবে হয়তো।'

এটা যে তাঁকে নিয়ে মজা করতে বলা তা ঊষা বুঝতে পারলেন। তিনি গান্ধারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হলে তিনি সর্বস্বান্ত হবেন তাই বলা হয় কথাটা। তিনি একটু হাসলেন। হেসে চুপ করে গেলেন। শুধু জেগে থাকল বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর ঘরের মধ্যে মমতাময়ীর নাম। কে এই মমতাময়ী?

ভুল আমারই। মমতাময়ীর কথা অনেক আগেই আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু খেয়াল হল না। এই খেয়াল না থাকার জন্যে দাবী মমতাময়ী নিজে। তিনি এই হোমের

প্রাচীনতম বাসিন্দা। তিরিশ বছর আগে যে দশজন পুরুষ এবং দশজন স্ত্রীলোক নিয়ে হোম চালু হয়েছিল তিনি তাদের একজন। সেই কুড়িজনের তিনি ছিলেন শেষ প্রতিনিধি। বাকিরা অনেক আগেই হোম ছেড়ে চলে গেছেন। চিরকালের জন্যে চলে গেছেন।

যদিও একানব্বই বছর বয়সে আজ দুপুরে মারা গেলেন মমতাময়ী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল আরও বছর দশেক আগে। এই দশ বছর তিনি শুধু বেঁচে ছিলেন, জীবিত ছিলেন না। ডেলা হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটবার ক্ষমতা ছিল না। কাউকে চিনতেন না। প্রতিদিন বিকেলে প্যারামবুলেটরের মত একটা গাড়িতে তাঁকে চাপিয়ে যখন ঘোরানো হতো তখন খোলা চোখে অন্য গ্রহের মানুষের মত এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। গত দশ বছরে যারা হোমে এসেছে তাদের কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। প্রতি সপ্তাহে তাঁকে দেখবার জন্যে কেউ আসত না। অনিয়মিত কখনও-সখনও কেউ এসে পড়ত। তারও কারণ ছিল। তার চার ছেলের একজনও আর বেঁচে নেই। ছেলের বউদের মধ্যে শুধু একজনই বেঁচে আছে। ছোটছেলের বউটাই। এই বউটিই কখনও-সখনও এক আধটা নাতিকে সঙ্গে নিয়ে আসত। গাড়ি থেকে নেমে শুধু পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা। ব্যস। সাক্ষাৎকার শেষ। বুড়ি তাঁকেও চিনতে পারতেন না। তাই বলছিলাম মমতাময়ীকে খেয়াল না থাকার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী। পৃথিবীটা দশ বছর আগেই মরে গিয়েছিল তাঁর কাছে।

মমতাময়ী এ বাড়ির একতলার একটা ছোট ঘরে একলা থাকতেন। আজ দুপুরে মারা গেছেন তিনি। কিন্তু এখনও একটা সাদা চাদর ঢেকে তাঁর দেহটা সেই ঘরেই রেখে দেওয়া হয়েছে। থানা থেকে রেডিওগ্রাম করে খবর দেওয়া হয়েছে তাঁর বাড়িতে। সেখান থেকে কেউ এলে অন্ত্যেষ্টি হবে। ততক্ষণ তিনি ওইভাবে শুয়ে থাকবেন। চাদর ঢাকা তাঁর দেহটাকে দেখলে মনে হয় কোনও বাচ্চা শুয়ে আছে। বয়সের বোঝা এবং একাকিত্ব তাঁকে খর্ব করে দিয়েছিল। একসময় যিনি বিশালাকায়, বলশালী চারজন ছেলেকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি কি করে অত ছোট হয়ে যান কে জানে। অবশ্য সেই ছেলেরা আগেই চলে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে মায়ের এই খর্বাকৃতি দেখবার জন্যে তারা কেউ বেঁচে নেই।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, যখন পৃথিবী জুড়ে প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি চলছে তখন দুশো অধিবাসীর এই বাড়িটার একটা ছোট ঘরে চাদর ঢাকা একটি মৃতদেহ শায়িত আছে। মমতাময়ীর মৃত্যুর জন্যে এ বাড়ির জীবনযাপনে কোনও ছন্দপাত হয়নি। সমস্তই চালু আছে ঠিকমত। রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, সব। শুধু অধিবাসীরা যে, বাগানে, ঝিলের ধারে, ঝাউবনে বেড়াতে পারেনি তার কারণ প্রবল বৃষ্টি। মমতাময়ী নয়। তবু একটা কাঁটা কোথাও বিঁধে আছে। বোঝা যাচ্ছে না কোথায়, কিন্তু বিঁধে আছে। আসলে চাদর ঢাকা মমতাময়ীকে সবাই দেখে গেছেন একবার করে। আর তারই ফলে কেউ ভুলতে পারছে না তাঁকে। জীবিত অবস্থায় গত দশ বছর যাঁকে কেউ মনে রাখেনি আজ তাকে মন থেকে সরাতে পারছে না কেউ। গান্ধারী সায়া 'সেলাই করছেন, কিন্তু চোখের

ওপর ভাসছেন মমতাময়ী। দ্রৌপদীর বুকের ওপর ধরে রাখা উপন্যাসটির প্রতিটি লাইন প্রতিমুহূর্তে মমতাময়ী হয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত শুধু কুন্তী। আজ সন্ধের তাঁর যাবতীয় উদ্বেগ কেড়ে নিয়েছে তাঁর বোবা ছেলে পঞ্চানন। পঞ্চানন আর তার বোবা বউ। মমতাময়ীর মৃতদেহ সেখানে ঢুকতে পারছে না। এ বাড়ির সকলকে কাবু করে দিলেও কুন্তীকে কাবু করতে পারেননি মমতাময়ী।

গান্ধারী মানে উষার সায়া সেলাই হয়ে গেল। তাঁর সেলাইয়ের বাক্স থেকে ছোট কাঁচি বার করে তিনি সুতো কাটলেন। সাধারণত মেয়েরা সেলাই শেষে সুতো দাঁত দিয়ে কাটে। দশ-বিশ বছর আগে উষাও হয়তো তাই করতেন। কিন্তু চুয়াত্তর বছর বয়সে সামনের দাঁতগুলো শুধু সাজানোই আছে। জোর নেই। তার ওপর আবার লাইন ভেঙে ছ-সাতটা গত হয়েছে। এই দাঁতে আর সুতো কাটা যায় না।

সায়াটা ভাঁজ করা পায়ের ওপর থেকে নামিয়ে দু পা টান করে দিলেন উষা। সেলাইয়ের সরঞ্জাম বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন। টান হয়ে বসে দু হাতে কোমর চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমবস্যা কবে?'

কেউ উত্তর দিল না। ডলি যেমন বসেছিলেন বিছানায় পা ঝুলিয়ে, বসে থাকলেন। নিভা উপন্যাসে চোখ রেখে শুয়ে থাকলেন। বৃষ্টি পড়ে যেতে থাকল। অগত্যা আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুলে উষাই আবার কথা বললেন। নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে দু-একদিনের মধ্যে হবে। গা-গতর বড্ড ভারী হয়েছে। আর অমাবস্যা না গেলে এই বৃষ্টি ধরবে না।'

'যদি চারদিন বাদে অমাবস্যা হয়?' হাতের বই বুকের ওপর নামিয়ে চোখ বুজে নিভা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে বড়মা, চারদিন ধরে এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারটা চলবে?'

নিভা হল দ্রৌপদী। তাই গান্ধারীকে সে বড়মা বলে ডাকে। কুন্তীকে মা। আসলে তারা তিনজনে তিন বুড়ি ছাড়া আর কিছুই না। সংসারে এই তুচ্ছ ডাকাডাকি হল বেঁচে থাকার মশলা। অথচ কম বয়সে এসব একদম বোঝা যায় না। এসব মানে ডাকাডাকির এই তুচ্ছতা। তখন মনে হয় মানুষে মানুষে সম্পর্কের মত খাঁটি ও অকৃত্রিম আর কিছু নেই। কিন্তু যেই বয়স বাড়ে বোঝা যায় কি অসার এই ডাকাডাকি। সারাজীবন ধরে যে ফানুসটাকে ফোলাই আমরা, বয়স বাড়লে সেটা ফুটো হয়ে যায়। তখন সেটা শুধু একখণ্ড ন্যাত্পেতে রবার। এই তিন বুড়ি সেই রবারটাকে নিয়ে খেলা করতে ভীষণ ভালবাসে।

গান্ধারী বললেন, 'আমি বলছি না যে এরকম প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিই সর্বক্ষণ হবে। বৃষ্টি কমবে বাড়বে। হয়তো দু-এক ঘন্টার জন্যে বন্ধও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অমাবস্যা না কাটলে এই দুর্যোগ কাটবে না। সে কাল হোক কি চারদিন বাদে হোক।'

'তাহলে?' চোখ বড় বড় করে উঠে বসলেন দ্রৌপদী। 'চারদিন ধরে এরকম দুর্যোগ চললে মমতাময়ীর বাড়ির লোকেরা আসবে কি করে?'

'এর মধ্যেই আসতে হবে। কথায় বলে না, পিতৃমাতৃ দায় বড় দায়। রাস্তা ডুবে গেলে ভেলায় করে আসতে হবে।'

'তা নয় এল। কিন্তু পোড়াবে কি করে?'

'পোড়াবে পোড়াবে। ঠিক পোড়াবে। মড়া তো ফেলে রাখা যাবে না। দরকার হলে চিতার ওপর টিনের চালা তুলেও পোড়াতে হবে।'

'নাঃ বড়মা। আজ মনে হচ্ছে আমাদের এই মৃতদেহ দাহ করার সিস্টেমটা ভাল না।'

'কেন?'

'এই তো, বৃষ্টি নামলে কী অসুবিধে।'

'সে তো সবাইয়ের।' গান্ধারী হাসলেন। 'এরকম বৃষ্টি হলে কবরস্থানেও এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যাবে।'

আবার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল দ্রৌপদীর। 'আপনি কবরস্থান দেখেছেন বড়মা?'

উত্তর দিলেন না গান্ধারী। গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার শীত করছে বউমা। উঠে জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। তোমার শাশুড়ি কেন ওগুলো হাট করে খুলে রেখেছেন কে জানে।'

দ্রৌপদী জানলা দরজা বন্ধ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না। একবার শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সেদিকে। তারপর পুরনো কথার খেই ধরে একই ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে।'

'কি জানতে ইচ্ছে করে?'

'সকলের কথা। এ বাড়িতে যাঁরা আছে তাঁদের সকলের। এই যেমন মমতাময়ী। একানব্বই বছরে মারা গেলেন, এ বাড়িতেই ছিলেন তিরিশ বছর অথচ ওঁর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'আমিও জানি না।'

'না বড়মা। আপনি জানেন। আপনি আমায় একদিন বলেছিলেন, যে বিধবা বউটি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে ওঁর ছোটছেলের বউ। ওঁর নাকি চার ছেলে আর তারা সকলেই মারা গেছে।'

'হ্যাঁ। সে কথা ওই বিধবা বউটিকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম।'

'মমতাময়ীর জীবনের আর কোনও ঘটনা জানেন না আপনি?'

'না মা। আর কি করে জানব? বউটি ওইটুকুই বলেছিল।

দ্রৌপদী গালে হাত দিয়ে অবাক হবার ভঙ্গি করলেন। 'তাই যদি হবে বড়মা, বুড়ির যদি ছেলেপুলে কেউ নাই-ই থাকবে তাহলে ওর মৃতদেহ নিতে কে আসবে?'

'কেন? সেই বউটা। ওর ছোটছেলের বউ।'

সজোরে মাথা নেড়ে দ্রৌপদী বললেন, 'অসম্ভব। বউটা গাড়ি ড্রাইভ করতে জানে আমি দেখেছি। কিন্তু তাই বলে মেয়েছেলের এত সাহস হবে? ডেডবডি নিয়ে যাবে?'

মুহূর্তের জন্যে থেমে দম নিলেন দ্রৌপদী। 'উঃ! ভাবা যায় না বড়মা। পেছনের সিটে চাদর ঢাকা মমতাময়ীর মৃতদেহ শুয়ে আছে আর বউটা গভীর অন্ধকারে এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছে।'

গান্ধারী আপন মনে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ। এই একটা কাজ মেয়েরা পারে না। অন্তত এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি মেয়েদের। মৃতদেহের সৎকার করার কর্মটা পুরুষদেরই একচেটিয়া থেকে গেল। সে তুমি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াও আর কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে কবর দাও, কোথাও মেয়েমানুষ নেই। শুধু পুরুষ।'

'অথচ বড়মা, আমরা মেয়েমানুষেরা আগুন জ্বালতেও জানি, গর্ত খুঁড়তেও পারি।'

'তার মানে?'

'বাঃ! আমরা আগুন জ্বেলে রান্না করি না। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে উনুন তৈরি করি না! অর্থাৎ ইচ্ছে করলে আমরা মৃতদেহ দাহ করতেও পারি আবার গর্ত খুঁড়ে কবরও দিতে পারি।'

দ্রৌপদী হয়তো চেয়েছিলেন তাঁর কথা শুনে গান্ধারী একটু হাসুন। হয়তো তাই অমন লঘু সুরে তিনি কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু গান্ধারী হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, 'সংসারে সব জিনিসের উলটোটাও আছে। হাজার হাজার মাইল যেমন সমুদ্র আছে তেমনি আছে হাজার হাজার মাইল মরুভূমি। মৃত্যুর পর দাহকর্মটি পুরুষদের একচেটিয়া ঠিক কথা, কিন্তু জন্মের বেলায় যে আমাদের। আঁতুড় ঘরে কোনও পুরুষ ঢুকতে পারে? সেখানে শুধু মেয়ে। শ্মশান হল পুরুষের কিন্তু আঁতুড় ঘর প্রমীলার।'

অবাক দৃষ্টিতে গান্ধারীকে দেখতে দেখতে আলতো করে দুবার হাততালি দিলেন দ্রৌপদী। নিজের বিছানা থেকে নেমে গান্ধারীর সামনে গিয়ে তাঁর বিছানায় বসে বললেন, 'আপনি একটা জিনিয়াস বড়মা। এই সাংঘাতিক কথাটা আমি কোনওদিন ভাবিনি। কখনও মনে হয়নি আমার। শ্মশান এবং আঁতুড়ঘর। দা-রুণ। জীবনের এমাথা ওমাথায় দুটো দরজা। তার একটাতে পাহারা দিচ্ছে পুরুষ অন্যটায় স্ত্রীলোক। ভাবা যায় না।'

'খুব ভাবা যায়।' ডলির গলা। তিনি এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। নিজের বিছানায় পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন। এখন খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'আচ্ছা, ওই দিদির না হয় বাহাত্তর পার হয়ে গেছে, ভীমরতি হলেও হতে পারে, আপনার তো সত্তরও হয়নি, আটষট্টি, আপনি কেন তখন থেকে বকবক করে যাচ্ছেন? বেশ তো শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। হঠাৎ কি হল বলুন তো?'

নিভা উঠে ডলির সামনে চলে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মা, আপনি বোধহয় বড়মার কথাটা ঠিকমত বুঝতে পারেননি। উনি কিন্তু খুব জ্ঞানের কথা বলেছেন।'

ডলি আগের মতই খিঁচিয়ে বললেন, 'রাখুন.আপনার জ্ঞানের কথা। মেয়েছেলে আঁতুড় ঘরে শুয়ে বাচ্চা বিয়োবে এতে আবার জ্ঞানের কি আছে। চিরকাল পুরুষেরাই মড়া পুড়োবে। যার যা কাজ। উনি আমাকে জ্ঞান শেখাতে এলেন।' একমুহূর্তের জন্যে থামলে ডলি। থেমে বললেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কি একটু দয়ামায়া নেই। বয়সের

সঙ্গে সঙ্গে তাও হারিয়েছেন। নিচে একজন মানুষ দুপুর থেকে মরে পড়ে আছে। এ অবস্থায় আপনারা কিভাবে আজেবাজে কথায় মেতে থাকতে পারেন।'

নিভা বললেন, 'এই দেখুন। সেই মমতাময়ীর কথা দিয়ে শুরু করেই তো আমরা এখানে চলে এসেছি। কিন্তু কই, তেমন কোনও আজেবাজে কথা বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

ডলি গম্ভীর মুখে বললেন, 'ছেড়ে দিন। গতস্য শোচনা নাস্তি। নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে শুয়ে আবার বই পড়ুন।'

ঊষা বললেন, 'উনি বই পড়বেন কিন্তু আমি কি করব?'

'আপনি সায়া সেলাই করুন।'

ঊষা হাসলেন। আমার সায়া সেলাই হয়ে গেছে। দিদি, আজ সারাদিন দেখছি আপনার মেজাজ খারাপ। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। বললেও...., কি হয়েছে আপনার? শরীর-টরীর খারাপ করেনি তো?'

'ইয়েস। আমি এসে গেছি। কার শরীর খারাপ এ ঘরে?' ডাক্তার। এই হোমের যুবক ডাক্তারটি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা প্রতিটি ঘরে তার রাউণ্ড দেবার ডিউটি। সেই ডিউটি করতেই হঠাৎ নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে সে। চমৎকার স্বাস্থ্য। দারুণ সুপুরুষ চেহারা। তার দিকে তাকালে এ বাড়ির সব বুড়োবুড়ির বয়সের বোঝা যেন বুকের ওপর চেপে বসতে চায়। গলায় স্টেথো ঝুলছে। জামাকাপড় ভিজে জবজবে। ঊষা কথা বলছিলেন। কাজেই তিনিই বললেন, 'আসুন আসুন ডাক্তারবাবু। একদম ভিজে গেছেন দেখছি।'

'ইয়েস। কোয়ার্টার থেকে আপনাদের এই বিল্ডিং-এ আসতেই ভিজে গেলাম। তারপর তো ক্রমাগত বারান্দায় ঝাপটা খাচ্ছি। ভিজুক। মুষলধারে বৃষ্টি হবে আর আমি ভিজব না? তা দিদিমারা আপনারা এখন কোথায় আছেন? মহাভারতে? না এই হোমে?

ডাক্তারকে দেখেই নিভা তাঁর বিছানায় গিয়ে বসেছিলেন। উত্তরটা দিলেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, একটু আগে আমরা মহাভারতে ছিলাম। কিন্তু আপনারা ওই মেজ দিদিমাটির জ্বালায় থাকতে পারলুম না। হোমে ফিরে আসতে হল।' বলে ইশারায় ডলিকে দেখালেন।

ঊষা বললেন, 'আমি আপনার ওই মেজ দিদিমার শরীর খারাপের কথাই বলছিলাম।'

ডাক্তার গট্‌গট্ করে ডলির দিকে এগিয়ে গেল। 'উঁহু। ভাল কথা নয়।' গলা থেকে স্টেথো খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ইয়েস। দেখি দিদিমা, জিভ বার করুন।'

ডলি হেসে ফেললেন। ডাক্তার দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'হাসা ভাল। ইয়েস। হাসলে অসুখ-বিসুখ থাকে না।' বলে সিধে হয়ে দাঁড়াতেই ঘরের খোলা দরজা জানলার দিকে চোখ গেল তার। আঁতকে উঠে বলল, 'কী সাংঘাতিক! এ কি করেছেন আপনারা?'

তিন বুড়ি প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কি করেছি?'

'সব খুলে রেখেছেন। আপনাদের কি মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেছে? অ্যাঁ! কনকনে ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া। তার মধ্যে জানলা দরজা সব খোলা। যান। শিগ্‌গিরে বন্ধ করুন ওগুলো। ইয়েস। এই বয়সে একবার ঠাণ্ডা লাগলে কেউ বাঁচাতে পারবে না আপনাদের।'

নিভা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'ইয়েস এত কথায় কথায় ইয়েস কিসের? খোলা ছিল বন্ধ করে দিচ্ছি।' বলে উঠে গিয়ে দুটো জানলা বন্ধ করে ভেজিয়ে দিলেন। মুহূর্তে বৃষ্টির তাণ্ডবটা যেন তিন হাত পেছিয়ে গেল। তিনজনেরই মনে হল এতক্ষণ তাঁরা ফাঁকা মাঠে চার দেওয়াল খোলা কোনও চালার নিচে বসে ছিলেন। ডাক্তার এসে যেন তাদের ঘরে ঢোকাল। ফিরে এসে নিজের বিছানায় বসে নিভা বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার যখন সবই ইয়েস তখন ঠাণ্ডা লাগলে আমাদের বাঁচাতে পারবেন না কেন?'

সকলে হেসে উঠলেন। ডাক্তারও। হাসতে হাসতে উষা বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগলে "ইয়েস" "নো" হয়ে যায়। মমতাময়ীর যেমন হল।'

ডাক্তার নস্যি নিয়ে বলে উঠলেন, 'ইয়েস এত কথায় কথায় ইয়েস কিসের? খোলা ছিল বন্ধ করে দিচ্ছি।' বলে উঠে গিয়ে দুটো জানলা বন্ধ করে ভেজিয়ে দিলেন। মুহূর্তে বৃষ্টির তাণ্ডবটা যেন তিন হাত পেছিয়ে গেল। তিনজনেরই মনে হল এতক্ষণ তাঁরা ফাঁকা মাঠে চার দেওয়াল খোলা কোনও চালার নিচে বসে ছিলেন। ডাক্তার এসে যেন তাদের ঘরে ঢোকাল। ফিরে এসে নিজের বিছানায় বসে নিভা বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার যখন সবই ইয়েস তখন ঠাণ্ডা লাগলে আমাদের বাঁচাতে পারবেন না কেন?'

সকলে হেসে উঠলেন। ডাক্তারও। হাসতে হাসতে উষা বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগলে "ইয়েস" "নো" হয়ে যায়। মমতাময়ীর যেমন হল।'

ডাক্তার নস্যি নিয়ে ভিজে রুমাল বার করে নাক থেকে নস্যির গুঁড়ো মুছছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এই যা! আপনাদের আসল খবরটাই দেওয়া হয়নি' ডাক্তার জিভ কাটলেন। 'মমতাময়ীর নাম করতে মনে পড়ল। যে ঘরে আপনারা ভিডিও-শো দেখেন সেই ঘরে আজ রাত নটায় মিটিং। প্রধান বক্তা মমতাময়ী।'

ঘরের ছাদ ফুটো করে হঠাৎ বজ্রপাত হলেও বোধহয় তিন বুড়ি এতখানি চমকে উঠতেন না। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কে প্রধান বক্তা?'

'মমতাময়ী।'

'সে তো আজ দুপুরবেলা মারা গেছে।'

'ইয়েস। মারা গিয়েছিল। কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে। তার ঘর থেকেই আমি সোজা ওপরে আসছি। বুড়ি বেঁচে উঠেছে। সারাদিন চাদর ঢেকে শুয়ে থেকে এখন সেই চাদরটা গায় দিয়েই উঠে বসে আছে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখলে মনে হবে লক্ষ্মীপেঁচা। বুড়ি নিজের সম্পর্কে বক্তৃতা করবে। মিটিং-এ তার জীবনের ঘটনাবলি বলবে সকলকে।'

নিভা বললেন, 'আপনি একটা নাম্বার ওয়ান লায়ার। আপনার কথা আমরা বিশ্বাস

করি না। মরা মানুষ আজ পর্যন্ত কখনও বেঁচে ওঠেনি।'

ডলি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি নিজের চোখে দেখলেন বুড়ি লক্ষ্মীপেঁচার মত বিছানায় উঠে বসে আছে?'

'ইয়েস। নিজের চোখে।'

উষা বললেন, 'হতে পারে এই মুষলধারায় বৃষ্টির সঙ্গে তার বেঁচে ওঠার কোনও সম্পর্ক আছে। কিংবা, আমার মাথায় আর একটা চিন্তা আছে। মৃতদেহ ছুঁয়ে থাকা নিয়ম। মমতাময়ীকে একটা ঘরে একলা ফেলে রাখা হয়েছিল। হয়তো কোনও দুষ্টু আত্মা ফাঁকা পেয়ে তার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।'

ডাক্তার বলল, 'ইয়েস। হতে পারে। কোনও দুষ্টু আত্মা ঢুকে বাঁচিয়ে তুলেছে তাকে।'

বিছানা ছেড়ে নিভা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার বয়সের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই বেমানান হল। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না। উত্তেজনায় জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি নিচে গিয়ে দেখে আসছি। নিজে না দেখে আমি কিছু বিশ্বাস করি না।'

ডাক্তার পকেট থেকে চিরুনি বার করে তার ভিজে চুলগুলো আঁচড়াচ্ছিল। কথা না বলে শুধু হাত বাড়িয়ে বাধা দিল নিভাকে। তারপর পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে পকেটে চিরুনি ঢুকিয়ে বলল, 'গিয়ে লাভ নেই দিদিমা। সন্ধে থেকে ভীষণ ভিড় হচ্ছিল। মমতাময়ী বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই সব দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'দেখতে পাব না।'

'ইয়েস। পাবেন। নটার সময়। মিটিং-এর ঘন্টা পড়বে। তখন গেলেই দেখতে পাবেন।' পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল ডাক্তার। বস্তুটা রুমালে জড়িয়ে নির্বিকারে পকেটে চালান করে দিয়ে বলল, 'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনারা মমতাময়ী সম্পর্কে কে কি জানেন?

তিন বুড়ি একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কিচ্ছু জানি না।'

'আপনাদের পরস্পরের সম্পর্কে?'

নিভা বললেন, 'সব জানি। আমি পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী।' উষার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'উনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী আর আপনার সামনে বসে আছে পাণ্ডব জননী কুন্তী।'

ডাক্তারের মুখ দেখে মনে হল সে খুব ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে গিয়ে হেঁচে ফেলল ডাক্তার। হাঁচির পর পকেট থেকে সেই রুমালখানাই বার করল। সাবধানে নাক মুছে নিভার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিদিমা, এখানে আসার আগে আপনি কি যাত্রা করতেন?'

নিভা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, 'আজ্ঞে না। ডাক্তারি করতাম।'

ডাক্তার বলল, 'তাহলে ঠিক আছে।' প্রায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল সে কথাটা। পর্যায়ক্রমে তিন বুড়ির দিকে তাকাল একবার। তারপর খুব কেতাদুরস্ত কায়দায় বলল, 'ইয়েস। আমি এবার যাব। এখনও অনেক ঘর বাকি। আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য বেশ

মজবুতই মনে হচ্ছে। তাহলে ওই কথাই রইল। ঠিক নটার সময় ঘন্টা পড়লে যে ঘরে ভিডিও-শো হয়...। বাক্য শেষ করল না ডাক্তার। শেষ করতে পারল না। বিস্ফোরণের শব্দে আবার হাঁচি বেরিয়ে এল তার এবং আবার সেই রুমাল। নাকটাক মুছে ডাক্তার বলল, 'নাঃ কাল নির্ঘাত নিমুনিয়া। শুনুন দিদিমাগণ, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। ওই মহাভারত-টহাভারত হবে না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনারা কেউই কারও বিষয়ে কিছু জানেন না। আপনারা বলে নয়। এ বাড়ির সব ঘরেই এক অবস্থা। কেউ কাউকে...।'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ঊষা বলে উঠলেম, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললেন, 'এমা! আপনাকে তুমি বলে ফেললুম। কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু।'

'আরে না না। আমি কিচ্ছু মনে করিনি। আপনারা আমাকে তুমি বলেন না বলেই বরং মাঝে মাঝে আমার ভ্রম হয় আপনাদের আচরণ-টাচরণগুলো স্বাভাবিক না। যেতে দিন। ইয়েস, কি বলছিলেন। বলুন।'

'আমরা কারও সম্পর্কেই কিছু জানি না। এই দেখুন আজ সারাদিন আপনার মেজ দিদিমা মন খারাপ করে বসে আছেন। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। আপনি ঘরে ঢোকার আগেও বৃষ্টির মধ্যে দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ওনার কিসের দুশ্চিন্তা উনি বলেননি। আমরাও জিজ্ঞেস করতে পারিনি। চেয়ে চেয়ে দেখেছি খালি। এইরকম হয়। আমাদের প্রত্যেকের বেলায় এই জিনিস ঘটে। কেন এরকম হল বলুন তো। এত বছর একসঙ্গে আছি। কিন্তু কেউ কারও অতীত জানি না।'

'ইয়েস। আমি বড্ড ছেলেমানুষ। মানে আপনাদের বয়সের তুলনায় বলছি, খুবই ছেলেমানুষ। এখনও বিয়ে করিনি। তবে আপনাদের বলতে আপত্তি নেই বিয়ে আমি করব না। যদি এরা আমাকে ছাড়িয়ে না দেয়, সারাজীবন আপনাদের সেবা করে যাব। বিয়ে কেন করব না সেই গোপন তথ্যটুকু বলতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। কলেজে পড়বার সময় একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলুম। সেও ভালবেসেছিল। কিন্তু আমি গরিব বলে সেই ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে সে দেরি করেনি। সে এখন তার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় আছে। তার স্বামীও আমাদের বন্ধু। তুমুল বড়লোক। কাজেই বুঝতে পারছেন। ব্যাপারটা এমন কিছু না। আকছারই ঘটে। আমার অল্পবয়সে বাবা মারা যান। খুব ভাগ্য আমার যে বাবার চাকরিটা মা পেয়ে গিয়েছিল। না হলে আমার এটুকুও হতো না। মা এখনও চাকরি করে যাচ্ছেন। আমি মাকে প্রত্যেক চিঠিতে লিখি যে চাকরি ছেড়ে দাও, আমার কাছে এসে থাক। মা শোনে না। মা উলটে প্রত্যেক চিঠিতে লেখে তুই বিয়ে কর। বিয়ে করে সংসারী হয়ে যা।' হা হা করে হেসে উঠল ডাক্তার। আমি একেবারেই ছেলেমানুষ। এসব কথা আপনাদের বলার কোনই দরকার ছিল না। তবু দেখুন কেমন গড়গড় করে বলে গেলুম।

'ইয়েস। আমি বড্ড ছেলেমানুষ। তা সত্ত্বেও আপনারা যদি আমার পরামর্শ নেন

আমি বলব এভাবেই গড়গড় করে আপনারাও পরস্পরের কাছে আপনাদের অতীত বলে দিন। এখনও নটা বাজতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি আছে। দেড় ঘণ্টা যথেষ্ট সময়। আরম্ভ করে দিলেই জলের মত সোজা হয়ে যায় সব। সব বলা হয়ে গেলে বুঝতে পারবেন অতীত হল আমাদের মনের ওপর একটা অকারণ বাড়তি বোঝা। সেই বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিন। দেখবেন মনের ওপর দিয়ে কেমন ফুরফুর করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আসুন, সবাই মিলে আজ আমরা অতীত দিবস পালন করি।' একসঙ্গে এত কথা বলায় ডাক্তার হাঁপাচ্ছিল। এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে বলল, 'ইয়েস, আর একটা কথা। মমতাময়ী যে ঘরে বক্তৃতা দেবেন সেই ঘরে ঢোকবার সময় আপনাদের জিজ্ঞেস করা হতে পারে আপনারা তিনজন তিনজনের সবকিছু জানেন কিনা। তখন কিন্তু বোকার মত না বলবেন না। না বললে ঢুকতে দেবে না। বলবেন হ্যাঁ জানি। না জানলেও বলবেন, জানি। আর যদি এই দেড় ঘণ্টায় সকলের সব জানা হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই। বুক ফুলিয়ে বলে দেবেন, জানি।' ডাক্তার কথা বলতে বলতে দরজার দিকে পেছোচ্ছিল। কথা শেষ করে দরজা খুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন বুড়িকে কুর্নিশ করল সে। 'আপনারা আমার নামটাই জানেন না। আমাকে জানেন ডাক্তার ঘোষ বলে। আমার নাম হরনাথ ঘোষ। সেই ডাক্তার মেয়েটি আমার এই সেকেলে নামটাকেও পছন্দ করত না। ইয়েস। চলি। গুডবাই।' দরজা টেনে দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেল। সে যে ক-মুহূর্ত দরজা খুলে রেখেছিল তাতে দেখা গেল বাইরের তাণ্ডব একটুও কমেনি। সমানে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে।

প্রথম কথা বললেন নিভা। দু ঠ্যাং একসঙ্গে বিছানার ওপর তুলে খাটে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'এই ছোকরা ডাক্তারের একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। সব বানানো। নিজের সম্পর্কে যা বলল, তাও মিথ্যে। ডাক্তার বিবাহিত।'

ডলি বললেন, 'আমার তা মনে হয় না। আমি কানাঘুষোয় ওই রকমই শুনেছি। বিয়ে করেননি।'

উষা বললেন, 'আমাদের কিন্তু এই নিয়ে বিবাদ করা উচিত নয়। সময় মোটে দেড় ঘণ্টা। আসুন আমরা আমাদের অতীত নিয়ে বসি।'

'তার মানে দিদি আপনি বিশ্বাস করেন মমতাময়ী বেঁচে উঠেছেন!' খুব অবাক হয়ে নিভা বললেন, 'সাত ঘণ্টা আগে মরে গেছে। সে *হঠাৎ বেঁচে উঠল!*'

উষা বললেন, 'হামেশাই না হক মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা সংসারে ঘটে। এই নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কোনও মানে হয় না। একটু বাদেই তো নিজের চোখে দেখতে পাব সব।'

'না। আমি এখুনি দেখব। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই আমার।' বলতে বলতে খাট থেকে নেমে এলেন নিভা। দরজা খুলে বললেন, 'আসছি।' তারপর বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা খোলাই পড়ে থাকল। ফিরলেন প্রায় দশ মিনিট বাদে। ঝাপটায় শাড়ি ভিজে গেছে। চুলও। হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে শাড়ি পালটে মাথা

মুছে শুকনো মুখে বললেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড। সারা বাড়িতে বাইরে কোথাও একটা মানুষ নেই। মাঝরাতের মত খাঁ খাঁ করছে সব। আমার গা ছমছম করছিল।'

ডলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মমতাময়ী?'

'তার ঘরে তালা ঝুলছে। দরজা ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করলুম কিন্তু কিচ্ছু দেখা গেল না!'

'আলো ছিল না ঘরে?'

'হ্যাঁ, আলো জ্বলছে। তবে দরজার ফাঁক দিয়ে আর কতটুকু দেখা যাবে। তার ওপর চশমা নিয়ে যাইনি।'

উষা বললেন, 'বাগানের দিকে চলে গেলেন না কেন? ওদিকে একটা জানলা আছে। ওটা দিয়ে ঘরের ভেতরের সব দেখা যেত।'

'তা যেত। কিন্তু তাহলে বৃষ্টির জলে নেমে উঠতুম। এমনিতেই, শুধু ঝাপ্‌টায় কি অবস্থা হয়েছে দেখলেন না?'

'বাইরে একটাও লোক নেই?'

'না।'

'লাইব্রেরির দিকে গিয়েছিলেন?'

'ভয় করছিল খুব। তবু গেছিলাম। লাইব্রেরি বন্ধ। বিরাট তালা ঝুলছে দরজায়।'

'কি জানি কি ব্যাপার। যা শুরু হয়েছে। সত্যি সত্যি হয়তো প্রলয় হয়ে যাবে।' বলতে বলতে উষা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। 'ও দিদি! আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, একটা জানলা একটু ফাঁক করে দিন। সব বন্ধ থাকলে দমটা যেন কিরকম আটকে যেতে চায়।'

নিভা নিঃশব্দে গিয়ে একটি জানলার পাল্লা টেনে ফাঁক করে দিলেন। ফিরে এসে নিজের বিছানায় বসে বললেন, 'যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে, মমতাময়ী যদি বেঁচে উঠে থাকে, তাহলে ওর বাড়ির লোকেরা ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।' একটু থেমে পরক্ষণে নিজেই বললেন, 'তা কি করে হয়? একবার মরে গিয়ে কি কেউ আবার বেঁচে ওঠে?'

ডলির হঠাৎ রাগ হয়ে গেল, রাগের চোটে উনি বিছানা ছেড়ে উঠে নিভা ও উষার সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মমতাময়ীকে নিয়ে এই কচ্‌লানো আমার ভাল লাগছে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আমরা কি আজ আমাদের অতীত পরস্পরকে বলব? তাহলে এক্ষুনি শুরু করতে হবে। সময় নেই।'

এক মুহূর্ত ডলির মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন নিভা। তারপর তিনিও হঠাৎ রেগে গেলেন। বললেন, 'না। আমি আমার অতীত বলব না। কেন বলব?'

উষা বয়সে অন্য দুজনের চেয়ে বড়। তাই প্রায় সব ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা হল মধ্যস্থের। কিন্তু আজ তিনিও রেগে গেলেন। নিভার দিকে তাকালেন না। ডলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কারও অতীত বলবার জন্য কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। যার ইচ্ছে

হবে সে বলবে। আমি বলব। আপনি বলবেন। দিদি, আপনি শুরু করুন। বেশি ফেনাতে হবে না। দুচার কথায় বলুন। ডাক্তার যেভাবে বলল ওইভাবে।'

উষাকে সঙ্গে পাবার জন্যে ডলি ও নিভার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রেষারেষির ভাব আছে। আজ একেবারে অনায়াসে সেই উষাকে দলে পেয়ে স্ফূর্তিতে ডলির মনটা ভরে গেল। সারাদিন মনের ওপর যে বিষণ্ণতা বোঝার মত চেপে বসেছিল হঠাৎ এই স্ফূর্তির হাওয়ায় তা দূর হয়ে গেল। বড্ড হালকা লাগল। শুরু করতে গিয়ে দেখলেন তাঁর অতীত বুকের মধ্যে হালকা ডালে বসে একটা রঙিন পাখির মত ক্রমাগত দুলছে। তাঁর মনে হল বলাটা উলটোপালটা হয়ে যাবে। তবু তিনি শুরু করে দিলেন। 'হ্যাঁ। আমার বিয়ে হয় আঠারো বছর বয়সে। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল তাঁর ছিল সুদের ব্যবসা। ছোটবেলায় বাবার কাছে বড্ড সুখে মানুষ হয়েছিলুম। আলালের ঘরের দুলালি। তাই এই সুদের কারবারির ঘরে এসে দুঃখে একেবারে ডুবে গেলুম। খাওয়া পরার দুঃখ না, সেসব অঢেল ছিল। সবকছি ছিল ঝাঁকা ভর্তি। গলার হার এক ঝাঁকা। কানের দুল একঝাঁকা, বালা একঝাঁকা, বাউটি একঝাঁকা। এছাড়া ঘড়ি, সাইকেল, রেডিও, সবই ঝাঁকা ঝাঁকা। ফলে শ্বশুরবাড়ি হয়ে উঠেছিল একটা দুর্গ। যখন তখন যেখানে খুশি যেতে পারতুম না। কাউকে হঠাৎ ঢুকতেও দেওয়া হতো না বাড়ির মধ্যে। আমার দুঃখের কারণ এই বন্দিদশা। আরও একটা কারণ ছিল। সে আমার স্বামীর চরিত্র। একনম্বর ঠক ছিলেন তিনি, জোচ্চোর। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী কাউকে ঠকাতে বাকি রাখেননি। কারও জমি ঠকিয়ে নিয়েছেন। কারও বাড়ি। অবশ্য আমার তাতে কিছু এসে যেত না। পুরুষ মানুষ রোজগারের ধান্দায় কোথায় কি করে মেয়েদের দেখার দরকার নেই। কিন্তু তিনি আমাকেও ঠকাচ্ছিলেন। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে আমি ওনার চরিত্রদোষের কথা টের পেলুম। জানেনই তো মেয়েরা সব কিছুর ভাগ দিতে পারে, কিন্তু স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে পারে না। দিতে হলে কষ্টের সীমা থাকে না। আমারও ছিল না। বাধা দিয়েছি। প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কত যে মারধর খেয়েছি সে আর কি বলব। শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষে অরুচি হল তাঁর। কিন্তু নেশা গেল না। তখন একটা নতুন বুদ্ধি ঠাওরালেন। আমার ওপর হুকুম হল যখন কাউকে সম্ভোগ করবেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে তা দেখতে হবে। দেখতেই হবে। দেখতেই হবে। সে যে কি শাসন আপনাদের বোঝাতে পারব না।

'আমাকে বাঁচালেন ঈশ্বর। চল্লিশ বছর বয়সে সাপের কামড় খেয়ে উনি মারা গেলেন। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। আমার ছেলে তখন কলকাতার ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব্ স্কুলে পড়ে। বয়েস পনেরো। ঈশ্বরের দয়ায় টাকার তো অভাব ছিল না। তাই তাকে পড়া শেষ করতে বললুম। এদিকে নোংরা ব্যবসাটা বন্ধ করে দিলুম। আমি আর ধার দিতুম না। কাগজপত্র দেখালে সুদ না নিয়ে লোকের জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে দিতুম। তবুও ঝাঁকার জিনিস ঝাঁকাতেই পড়ে থাকল। শুধু আসল টুকু দিয়ে নেবার ক্ষমতাও দেখলুম লোকের নেই। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল ছেলে ফিরে

আসতেই। একদম বাপের মত হয়ে ফিরে এল ছেলে। আবার সুদের কারবার চালু হয়ে গেল বাড়িতে। আবার নতুন নতুন জিনিসে ঝাঁকা ভর্তি হতে লাগল। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। ছেলেকে বলতুম আমাকে কোথাও তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দে। সে বলত, না, তোমাকে আরও ভাল জায়গায় পাঠাব। খোঁজ করছি। শেষে এই হোম। দশ বছর হয়ে গেল। খারাপ আছি বলতে পারব না। কিন্তু আজ আমার ছেলের বিয়ে। সে বলে গিয়েছিল রেজিস্ট্রির পর গাড়ি নিয়ে সে সোজা এখানে আসবে, তাই আজ সারাদিন আপনারা আমাকে উদ্বিগ্ন দেখেছেন। বলে গিয়েও সে এল না কেন, সন্ধে থেকে এই চিন্তায় বুকটা তোলপাড় করছে আমার।'

যে জানলার পাল্লা একটু ফাঁক করা ছিল জানলাটা হঠাৎ হাওয়া লেগে পুরো খুলে গেল। জানলা খোলার শব্দে তিনজনেই ফিরে তাকালেন সেদিকে। কেউ দ্রুত উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন না। হাওয়ার সঙ্গে কিছু ডড়ো জলকণা ভেসে এল ঘরের মধ্যে। জানলার নিচে মেঝের খানিকটা অংশ আগে থেকেই ভিজে ছিল। এখন আবার ভিজতে লাগল সেই জায়গাটা। ডলির দিকে তাকিয়ে ঊষা বললেন, 'আপনার চিন্তা ও উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। এতদূর এই বৃষ্টির মধ্যে আসা আজ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন কেন দিদি? বসুন না এখানে।' বলে খানিকটা সরে বসে নিজের বিছানায় তাঁকে জায়গা করে দিলেন।

খুব অবসন্নের মত সেখানে বসে পড়লেন ডলি। বসে পড়ে বললেন, 'নিন। এবার আপনারটা শুরু করুন।'

ঊষা বললেন, 'হ্যাঁ। করি। তার আগে একটা কথা বলে নিই। হঠাৎ মনে এল। একটু আগে যে বাইরে কাউকে দেখা যায়নি আমার মনে হয় তার কারণ সবাই দরজা বন্ধ করে তাদের অতীত নিয়ে বসেছে। ডাক্তার ছেলেটি তো রাউন্ডে বেরিয়ে সব ঘরেই যায়, তাই না?'

ডলি অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। সব ঘরেই যায়।'

'তাহলে তাই। সব ঘরে গিয়ে আজ সে সকলের অতীত জাগিয়ে দিয়ে এসেছে। ওইজন্যেই তিনি সমস্ত বাড়ি ঘুরেও কাউকে দেখতে পাননি। ঠিক আছে। আমারটা শুরু করছি। আমি অত্যন্ত রক্ষণশীল গোঁড়া পরিবারে জন্মেছিলাম। আমাদের পরিবারে মেয়েদের বাইরে বেরুবার স্বাধীনতা ছিল না। আমি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপরই স্কুল ছাড়িয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখা হয়। বাবা ছিলেন ভীষণ রাগী মানুষ। মেয়েদের কোনওরকম বেচাল বরদাস্ত করতেন না। আমি স্কুলে গিয়ে আরও পড়বার জন্যে কত কান্নাকাটি করেছি, বাবা গ্রাহ্য করেননি। তাই বলে যেন মনে করবেন না তিনি আমাদের ভালবাসতেন না। আমরা চার বোন ছিলাম তাঁর বুকের পাঁজর। একদিন আমি তাঁর সেই পাঁজর ভেঙে দিয়েছিলাম। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে আমাদের পরিবারের আর একটু বিবরণ দিই। আমরা ভাইবোন ছিলাম দশজন। চার বোন ছ'ভাই। আমি বড়। আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু আমার পরের ভাইয়ের জন্যে

বাবা বাড়িতে মাস্টার রেখে দিলেন। মা একবার এই সময়ে আমায় একটু গান-টান শেখাবার কথা বলায় বাবা রাগ করে বলেছিলেন, মেয়েকে নটী বানাতে চাও। এত রাগ করেছিলেন যে তিনদিন মায়ের সঙ্গে কথা বলেননি ভাল করে।'

'বাবার বুকের পাঁজর আমি ভেঙে দিলাম। যে ছেলেটি আমার ভাইকে পড়াত, সে আমাদের বাড়িতেই থাকত আর মেডিকেল স্কুলে পড়ত। অত কড়াকড়ির মধ্যেও তার সঙ্গে আমার কি করে ভালবাসা হল এখন আর সেসব আমার মনে নেই। একদিন তার সঙ্গে আমি পালিয়ে গেলাম। এত সাহস কোথায় পেয়েছিলাম কে জানে। কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করলাম আমরা আর বাড়ি থেকে অল্প দূরে ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলাম। বাবার পক্ষে এটা যে কী সাংঘাতিক তখন বুঝিনি কিন্তু এখন চোখ বুজলেই বাবা কষ্ট যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। বাবা কিন্তু কিচ্ছু করেননি। তাঁর যে উষা নামে একটি মেয়ে ছিল এটা নিজেও ভুলেছিলেন, বাড়ির সবাইকেও ভুলে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আমার স্বামী চেম্বার খুলে ব্যবসা শুরু করলেন। গ্রাম থেকে একমাত্র মাকে নিয়ে এলেন। আমার একটি ছেলে জন্মাল। আর এই সময় মাত্র একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেলেন তিনি।'

'একটা দৃশ্য আমার ভীষণ মনে আছে। আমার বাপের বাড়ি ছিল একটা লম্বা গলির মধ্যে। রকঅলা দোতলা বাড়ি। গলিটা আমাদের বাড়ির কাছে ডানদিকে সামান্য বাঁক নেওয়ায় অনেকদূর থেকে দেখা যেত বাড়িটাকে। একদিন সন্ধেবেলা ছেলে কোলে নিয়ে একবস্ত্রে আমি গলিটার মধ্যে ঢুকে দেখলুম বাইরের রকে বসে বাবা আমার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমার চুল কাটা। গয়ে বিধবার থান। গলা ও হাত খালি। ভাল করে দেখবার জন্যে চোখ থেকে চশমা খুলে বাবা চশমা মুছলেন। তিনি বসেছিলেন, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।' একটা নিঃশ্বাস ফেললেন উষা। নিজেও চোখ থেকে চশমা খুলে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার ও বৃষ্টিপাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দৃশ্যটাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।'

"পরবর্তী ইতিহাস খুবই সাধারণ। বৈচিত্র্যহীন। আমার ছেলে বড় হল। লেখাপড়া শিখল এবং চাকরি পেয়ে গেল একটা। চাকরি পেয়েই সে আমাকে নিয়ে মামাবাড়ি ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে উঠে এল। ততদিনে আমার বাবা মারা গেছেন। ছেলের বিয়ে দিলাম আমি। চাকরি করা মেয়ে। ফলে অল্পদিনেই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে উঠে গেলাম আমরা। আমার সুখের আর অন্ত থাকল না। কিন্তু আবার সঙ্কটও দেখা দিল ঠিক এই সময়ে। এখন নাতি-নাতনিরা বড় হয়েছে। স্কুল ছেড়ে তাই কলেজে ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে গট্‌মট্‌ করে সমসময় ইংরেজি বলছে। রেকর্ডে ইংরেজি গান চালিয়ে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাত ধরে, কোমর ধরে নাচছে। এই আমার সঙ্কট। ওদের দেখি আর আমার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। এই জীবনধারা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। একদিন দেখলাম আমার বড় নাতনি তার কলেজের এক বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। আর থাকতে পারলুম না। ছেলেকে গিয়ে বললাম সব।

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'মা, তোমাকে এসব দেখতে কে বলেছে? ওদেরকে ওদের মত থাকতে দাও।' আমি অবাক। আমার বাবা বলতেন, আমার মত থাক। আর আমার নাতি-নাতনির বাবা বলছে, ওরা ওদের মত থাকুক। তখুনি আমার মনে হল আমার শেকড় আলগা হয়ে গেছে। এখানে আর নয়। ছেলেকে বললুম, তবে দে বাবা, আমাকে কোনও তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দে। সে নির্বিকার গলায় বলল, 'চলে যাবে? ঠিক আছে, যেতে চাও যাবে। তবে তীর্থেটীর্থে নয়। সে বড় নোংরা জায়গা। আমি তোমাকে ভাল জায়গায় রাখব।' সেই থেকে আজ দশবছর এখানে আছি। আপনাদের সঙ্গে। তীর্থ নোংরা কিনা জানি না, তবে এ জায়াগাটা ভাল। এখানে নিজের জীবন নিয়ে বেশ নিরিবিলিতে থাকা যায়। দশ বছর ছিলামও। শুধু কাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি আর আজ একুট আগে আসা ছোকরা ডাক্তার হরনাথ ঘোষের কথাবার্তা কেমন যেন এলোমেলো করে দিল সবকিছু। হঠাৎ মমতাময়ীর বেঁচে ওঠাটাও যেন কিরকম। ভাবলেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। দিদি, ভেতরটা যদি দেখাতে পারতাম, বুঝতেন দিনরাত হু হু করছে সেখানে। আলগা হয়েই তো ছিলাম। সেই কতকাল থেকে আলগা হয়ে আছি। এবার বোধ হয় বোঁটা থেকে খসে যাবারও সময় হল।" উষার চোখ দুটি অকারণ কান্নার জলে ছলছল করে উঠল। তিনি কাঁদলেন, কিন্তু তাঁর মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হল না। শুধু তার উঁচু হনু এবং ভাঙা গাল বেয়ে টস্‌টস্ করে ক' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

উষা থামতেই নিভা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমিও আমার অতীত বলব। যদিও জানি না কেন বলছি। সময় বেশি নেই। তাই সংক্ষেপ করব আমি। আপনি বোধ হয় ঠিক বলেছেন দিদি এই বৃষ্টি আর ডাক্তার আজ সব ওলটপালট করে দিয়েছে। আমি বিধবা নই। আমার স্বামী আছে। সে অন্য কোথাও অন্য কোনও মেয়েমানুষ নিয়ে থাকে। থাকে মানে ছিল। বেঁচে থাকলে এখন তার বয়েস সত্তর। আমি জানি না সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। তার সঙ্গে আমার কোনও ডিভোর্সের মামলা হয়নি। সে জাস্ট্ একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

'সারাজীবন মেয়েদের যারা নিয়ন্ত্রণ করে আপনাদের গল্পে তাদের তিনজনের কথা আছে। বাবা, ছেলে ও স্বামী। একজনের কথা নেই। সে হল প্রেমিক। আমার জীবনের গল্পে আমি সেই প্রেমিক পুরুষের কথা বলব।'

'আমি বাবার এক মেয়ে। ছোটবেলায় অপরিমিত স্বাধীনতা আর আদর পেয়েছি আমি। কিন্তু নষ্ট হয়ে যাইনি। এক চান্সে বি এ পাস করেছিলুম। বাবা আমাকে এম এ পড়াতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার আর পড়তে বাল লাগেনি। বাবা এই সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার বিয়ে দিলেন। বাবা লিখেছিলেন, আমার এক মেয়ে। ঘরজামাই থাকতে ইচ্ছুক এমন শিক্ষিত সুদর্শন পাত্র যোগাযোগ করুন।'

'বিয়ে হয়ে গেল আমার। ভাল ছেলে। এম এ পাস। কলেজে অধ্যাপনা করে। বছর খানেকের মধ্যে আমার একটা মেয়েও হয়ে গেল। খুবই সুখের সংসার। আর

তখনই দেখা দিল আকাশে কালো মেঘ। বাবা মা একসঙ্গে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। হাজারিবাগ থেকে ফিরছিলেন। একটা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে ইনস্ট্যান্ট ডেথ্ মানে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। বাবা মরে যাবার বছর খানেকের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে ভাঙন ধরল। দেখলুম লোকটা আমাকে আর সহ্য করতে পারছে না। ঠিক এই সময় আমার মেয়েকে কার্শিয়াং-এর এক মিশনারি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দিই।'

'আমার বাবা আমার জন্যে অগাধ সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। সারাজীবন দুজনে বসে খেলেও তা ফুরোত না। আমার স্বামী বিয়ের আগে থেকেই চাকরি করে। মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে এবার আমিও একটা চাকরি নিয়ে নিলাম। সারাদিন ঘরে বসে কি করব? তাই চাকরি। আর সেখানেই দেখা হল আমার প্রেমিকের সঙ্গে। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। খুব হ্যান্ডসাম দেখতে। দিন দুয়েকের মধ্যে সে আমার পুরো দখল নিয়ে নিল। আমরা ছুটির পর প্রতিদিনই অল্পস্বল্প আড্ডা দিতে লাগলাম। কোনওদিন সিনেমা দেখি, কোনওদিন থিয়েটার, কোনওদিন শুধুই ঘুরে বেড়াই। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা আমার স্বামীর দৃষ্টি এড়াল না। তার সঙ্গে ভাঙন আমার আগেই ধরেছিল। এখন ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু যেহেতু সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি সে আমাকে মাথা নিচু করে মেনে নিতে বাধ্য হল।'

'আমার প্রেমিক অবিবাহিত। সে দাদা-বউদির সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকত। তাই কোনওদিন আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেনি। আমিও তাকে কোনওদিন বাড়িতে আনিনি। এখন একদিন হল কি তার দাদা-বউদি কোথায় যেন একদিনের জন্য বেড়াতে গেল। সেদিন ছিল শনিবার। অফিস থেকে বেরিয়ে সে জেদ ধরল তার ফ্ল্যাটে যেতে হবে। অন্যদিন হলে কি হত বলা যায় না কিন্তু সেই শনিবার ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী। আমি রাজি হলুম না। স্বামীর সঙ্গে গোলমালের শুরুতেই আমরা কিছু আচরণবিধি তৈরি করেছিলাম। যেমন রোববার আমরা বাইরে কোনও কাজ রাখব না। সেদিন আমরা সারাদিন একসঙ্গে কাটাব। রোববার ছাড়া একসঙ্গে কাটাবার আর দিনগুলো হল আমাদের দুজনের জন্মদিন, মেয়ের জন্মদিন, বাবা-মায়ের মৃত্যুদিন আর আমাদের বিবাহবার্ষিকী। ফলে আমি কিছুতেই গেলুম না। আমার প্রেমিক অসম্ভব রেগে গিয়ে বলল, এই আমাদের সম্পর্কের শেষ। কাল থেকে সে আমার মুখ দেখবে না।'

'ইতিমধ্যে আমার স্বামী তলায় তলায় গোপনে একটি মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে নিয়েছে। আমি আমার নিজের প্রেমে এত মত্ত ছিলুম যে একটুও টের পাইনি। সেই রাত্রে টের পেলুম। বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের চার পাঁচজন বিশিষ্ট পারিবারিক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিলুম। সকলেই এল। কিন্তু আমার স্বামী এল না। সবাই অপেক্ষা করল। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল। সেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন, একটি বউ যাবার আগে আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে গেল, পুরুষমানুষকে বেশি

বিশ্বাস করতে নেই। ঠকতে হয়।'

'তাঁর সঙ্গে আমার পুরুষ মানুষটি নিয়ে আমি কোনও আলোচনা করলুম না। কিন্তু আমার বুঝতে বাকি থাকল না সে কি বলতে চাইছে। ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল আমার। মনের মধ্যে প্রেমিককে ফিরিয়ে দেবার জন্যে একটু দুঃখবোধ ছিলই। সবাই চলে যেতে নতুন করে আবার তার কথা মনে পড়ল। রাত বেশি হয়নি। সাড়ে দশটা। আমি ঠিক করলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমি আমার প্রেমিকের ফ্ল্যাটে যাব। এতক্ষণে নিশ্চয় আড্ডা-ফাড্ডা মেরে সে ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে।'

'নিচে নেমেই ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। আমি তখন দুটি সত্তায় ভাগ হয়ে গেছি। একটি সত্তা স্বামীর প্রতি আক্রোশে দিশেহারা, অন্যটি প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আকুল। হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে তার ফ্ল্যাটে কড়া নাড়তে সে দরজা খুলে আমাকে দেখে ভীষণ অপ্রস্তুত। বলল, তুমি? আমি বললাম, হ্যাঁ এলুম। যা ভয় দেখালে তখন। তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এল, এই, কে? কার সঙ্গে কথা বলছ? প্রেমিকটি ঢোক গিয়ে বলল, আমার কোলিগ্। একসঙ্গে চাকরি করি। ভদ্রমহিলার স্বামী এখনও ফেরেনি। তাই খোঁজ নিতে এসেছে। ভেতর থেকে ব্যস্ত গলা বলল, কাল সকালে আসতে বল। এখন তুমি কোথায় যাবে, চলে এস।'

'ব্যাপারটা কি হল নিশ্চয়ই আপনারা ধরতে পেরেছেন। তবু আমি বলে দিই। আমার প্রেমিক আমাকে না পেয়ে আর একটি মেয়ে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। সে একসঙ্গে দু তিনটে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত। কাজেই কোনও অসুবিধে হয়নি। শুধু হঠাৎ আমাকে দেখে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। একটা জিনিস আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। সে যে চট্ করে মেয়েটিকে বানিয়ে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল সেটা কিন্তু আদপেই মিথ্যে ছিল না। সত্যিই তো আমার স্বামী বাড়ি ফেরেনি। কি করে এমন একটা অদ্ভুত মিথ্যে সে বলল কে জানে।'

'আমি বোধ হয় সংক্ষেপে বলব বলে সবচেয়ে বেশি সময় নিলাম। এখুনি ঘণ্টা পড়বে। আর দু চার কথায় শেষ করে দিই। এখানে কিন্তু আমাকে কেউ পাঠায়নি। আমি নিজে এসেছি। আমার স্বামী আর ফেরেনি। আমার মেয়ে বড় হয়ে যেতে তার বিয়ে দিলাম। তারা ভালোই আছে। আমার চাকরি শেষ হতে আমি যোগাযোগ করে এখানে চলে এলাম। কারও দয়ার ওপর আমি থাকি না। আমার চাকরির টাকাই এত যে আরও কুড়ি বছর বাঁচলেও তা ফুরোবে না। তার বেশি যদি বাঁচি তাতেও...।'

বাক্য শেষ করতে পারলেন না নিভা। তার আগেই বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ভীষণ জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল। বাজতেই থাকল। গোটা বাড়ি জেগে উঠল সেই শব্দে। তিনতলা এই বিশাল বাড়ির সব ঘরের দরজা খুলে যেতে লাগল। বৃষ্টির ছাঁট অগ্রাহ্য করে সবাই বেরিয়ে এল বারান্দায়। আর তখন হঠাৎ গাঁক গাঁক করে বেজে উঠল মাইক। 'একটি জরুরি ঘোষণা। মনযোগ দিয়ে শুনুন। জরুরি ঘোষণা মমতাময়ী বেঁচে

উঠেছিলেন কিন্তু একটু আগে তিনি আবার মারা গেছেন। এইমাত্র তাঁর বাড়ির লোকেরা এসে ডেডবডি নিয়ে চলে গেল। অতএব ভিডিও রুমে আজ যে মিটিং হবার কথা ছিল তা হবে না। ইয়েস, একটা প্রশ্ন উঠতে পারে মিটিং যখন হবে না তখন ঘণ্টা কেন বাজানো হল। শুনুন, নটার সময় এ বাড়িতে এই ঘণ্টা রোজ বাজে। আপনাদের মনে করিয়ে দিই এটাই হল খাবার ঘণ্টা। ডিনার। ভিডিওরুমে নয়, আপনারা সকলে ডাইনিং হলে চলে যান। একসঙ্গে যাবেন না। দু ভাগে। প্রথমে পুরুষ, তারপর মহিলারা। ধন্যবাদ। যাঁরা ডাইনিং হলে যাচ্ছেন না, তাঁরা ঘরে চলে যান। বাইরে থাকবেন না। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এক মুহূর্তের জন্যে বাইরে থাকাও বিপজ্জনক। ইয়েস বিপজ্জনক।'

সমস্ত বাড়িতে একটা গুঞ্জন উঠল। গুঞ্জন না, প্রায় কোলাহল। কিন্তু বৃষ্টির শব্দে সেই কোলাহলের কিছুই শোনা গেল না। বিরক্ত হয়ে তিন বুড়ি যখন ঘরে ঢুকতে যাবেন, দেখতে পেলেন একটু দূরে ফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তার হরনাথ ঘোষ ভিজছে। তিনজনেই ভারি অবাক হয়ে গেলেন। বার দুয়েক ইয়েস শুনে বোঝা গিয়েছিল মাইকে যিনি বলছেন তিনি হরনাথ ডাক্তার। কিন্তু তাহলে এত দ্রুত লোকটা তিনতলায় উঠে আসে কি করে? 'এই যে, ডাক্তারবাবু!' বলে চেঁচিয়ে নিভা ডাকলেন তাঁকে। আগাপাশতলা ভেজা জামাকাপড় নিয়ে ডাক্তার কাছে আসতে নিভা বললেন, 'মাইকে কে অ্যানাউন্স করছিল মশাই? আপনি না?'

'ইয়েস। আমি।'

'তাহলে এর মধ্যেই এখানে চলে এলেন কি করে?'

'এখন আসিনি তো। অনেকক্ষণ এসেছি। ওটা টেপ বাজল। সন্ধেবেলা টেপ করে দিয়ে তবে তো রাউন্ডে বেরুলুম।' হাসল ডাক্তার। 'এখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম ওপর থেকে নিজের গলাটা শুনব বলে।'

নিভা অবাক। 'টেপ আপনি সন্ধেবেলা করেছেন? রাউন্ডে বেরুবার আগে?'

'ইয়েস।'

'তাহলে যে আমাদের বললেন মমতাময়ী বেঁচে উঠেছেন, তার মানে...।'

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'ইয়েস। সব মিথ্যে। মমতাময়ীকে বাঁচিয়ে না তুললে কি আর এভাবে আপনারা আপনাদের আমূল জানতে পারতেন দিদিমা। মিথ্যে বলেছিলুম। দিনরাত অবিরাম বৃষ্টির সম্মোহন সেই মিথ্যেকে সত্য করে তুলেছিল। আর তারাই ফলে আজ এত বছর বাদে আপনারা মহাভারত থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন।' এক টিপ নস্যি নাকে গুজে দিয়ে ডাক্তার বলল, 'ইয়েস, মহাভারত থেকে।'

যদি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাইরে বাচ্চাদের গলায় চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনে বেগম জাহানারা ইমাম বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বেগমের বয়েস এখন সত্তর বছর, কিন্তু মুখে এখনও তেমন বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি, শ্বেত কমলের মতন তাঁর গায়ের রং, তাঁর মুখে সন্ধ্যা সূর্যের লাল আভা। আজ উৎসবের দিন বলে তিনি একটি সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছেন।

হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। উঠোনে তাঁর নাতি-নাতনি ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা বাজি পোড়াচ্ছিল, তারা উঠে এসেছে বারান্দায়। উঠোনে একটা ঝুড়িতে অনেক বাজি রাখা ছিল, হঠাৎ বৃষ্টিতে সেগুলো ভিজে গেছে, সেইজন্য ছেলে-মেয়েদের ক্ষোভ।

সবচেয়ে ছোট নাতনি মিলি এসে জাহানারা বেগমকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, দাদিমা, আমার রং-মশাল জ্বলছে না! বৃষ্টি খুব পাজি! বিচ্ছিরি!

জাহানারা বেগম হাসলেন। বৃষ্টি দেখে তাঁর মন প্রসন্ন হয়েছে। সারাদিন অসহ্য গরম ছিল। শবে-বরাত-এর দিন বৃষ্টি না হলেই মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগে। আজ রাতে বেহেস্ত থেকে ফেরেস্তারা নেমে আসবেন, তার আগে বৃষ্টির জলে এই পৃথিবী পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া দরকার। জাহানারা বেগমের যতদূর মনে পড়ে, প্রত্যেক শবে-বরাত-এর বিকেলেই তিনি বৃষ্টি হতে দেখেছেন।

তিনি মিলির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, অনেক বাজি পুড়িয়েছিস মা। এবার চল সন্দেশ খাবি। খিদে পায়নি?

মিলি বলল, না! রেহানা তিনটে রং-মশাল জ্বেলেছে। আমি মোটে একটা!

জাহানারা বেগম তাঁর আর এক নাতিকে ডেকে বললেন, ফিরোজ, মিলিকে আর দু'একটা বাজি দে!

ফিরোজ বলল, আর নেই, দাদিমা, পয়সা দাও, দোকান থেকে কিনে আনব!

—এই বৃষ্টির মধ্যে কী করে দোকানে যাবি?

—ছাতা নিয়ে যাব। পয়সা দাও, দাদিমা!

আজকের দিনে বাচ্চারা আনন্দ করবেই। বৃষ্টিতে ভিজবে, কিছুটা অনিয়ম হবে, এই বয়সে সবই মানায়। আজ কেউ কিছু চাইলে না বলা যায় না। তিনি মিলিকে

জোর করে কোলে তুলে নিলেন, মিলি ছটফট করতে লাগল, সেও ফিরোজদের সঙ্গে বাজি কিনতে দোকানে যেতে চায়। জাহানারা বেগম বললেন, তুই ভেতরে গিয়ে আমার পাশে বসে বাজি পোড়াবি। ফিরোজ, তুই কামরুদ্দীনের কাছ থেকে আমার নাম করে কুড়ি টাকা চেয়ে নিয়ে যা, অনেকগুলি বাজি মিলিকে দিবি।

বাতাসে ভেসে এল মাগরেবের আজানের ধ্বনি। নতুন মুয়াজ্জিনের গলাটি অতি সুরেলা, জাহানারা বেগম একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই আজান শুনলেন। আজকের দিনটি বড় সুন্দর।

মিলিকে নিয়ে জাহানারা বেগম উঠে এলেন দোতলায়। সাদা রঙের বেশ বড় বাড়ি। এখ সময় এই অঞ্চলটি বেশ ফাঁকা ছিল, এ বাড়ির পেছন দিকেই ছিল ধান জমি, বাঁদিকে পুকুর, ডানদিকে চৌধুরীদের আমবাগান। কিন্তু ইদানীং কলকাতা শহর লকলকে জিভ বার করে চারপাশের মফঃস্বল গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসছে। বারাসত পর্যন্ত চলে এসেছে পাতাল রেল, চৌধুরীদের আমবাগান ধ্বংস করে সেখানে তৈরি হয়েছে টেলিফোন-এর কারখানা। অন্যপাশের পুকুরটি ভরাট করে তৈরি হচ্ছে কর্মচারীদের কোয়ার্টাস।

পাঁচ বছর আগে জাহানারা বেগমের স্বামীর ইন্তেকাল হয়েছে। কাজী হাসান হাবিব রিটায়ার করেছিলেন বেঙ্গল পুলিশের ডি আই জি হিসেবে। তারপরেও তিনি কয়েকটি প্রাইভেট ফার্ম থেকে চাকরির প্রস্তাব পেয়েও নেননি, সারাজীবন পুলিশের চাকরি করার পর তাঁর খুব শখ হয়েছিল বাগান করার। বাড়ির সামনের ছোট্ট জমিটিতে নানারকম ফুলগাছ লাগিয়ে তিনি তাই নিয়েই মেতে থাকতেন, চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তাঁর, ভোরবেলা উঠে এক হাতে একটি শবল ও অন্য হাতে জলের বালতি নিয়ে চলে আসতেন বাগানে। একদিন সকালে তাঁর সেই প্রিয় ফুলগাছগুলির ওপরেই তিনি হঠাৎ হার্টঅ্যাটাকে ঢলে পড়লেন।

তারপর থেকে জাহানারা বেগমই এতবড় সংসারটির হাল ধরে রেখেছেন। তাঁর চার ছেলে আর তিন মেয়ে, সবাই এখন বিবাহিত। বড়ছেলে চাকরি করে লাহোরে, সম্প্রতি সেখানে সে একটি বাড়ি কিনেছে, তার খুব ইচ্ছে আম্মাকে সেখানে একবার নিয়ে যাওয়ার। এ বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট বেশি দূর নয়, প্লেনে দু'ঘণ্টায় লাহোরে পৌঁছানো যায়। কিন্তু জাহানারা বেগম জীবনে একবারই মাত্র প্লেনে চেপেছেন, স্বামীর সঙ্গে আজমীর শরীফ-এ তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, সেই প্লেন-যাত্রা তাঁর পছন্দ হয়নি, কানে খুব চাপ লেগেছিল, সেইজন্য প্লেনে চাপতে তাঁর ইছে হয় না। লাহোরে ট্রেনে যেতে দেড়দিন লেগে যায়...আসলে এই বাড়ি, এই সংসার ফেলে জাহানারা বেগমের কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না।

মেজমেয়ে সেলিনা থাকে লন্ডনে, সেখানেই সে সিলেটের এক ডাক্তারকে বিয়ে করেছে। বাচ্চাদের নিয়ে তারা এখানে এসে পৌঁছেছে পরশুদিন। ছোটমেয়ে নীলুফার

গত বছর বিধবা হবার পর দুটি বাচ্চা নিয়ে ফিরে এসেছে মায়ের কাছে। বড়মেয়ে হামিদা থাকে বেনারসে, সে এ বছর আসতে পারবে না। তার শরীর খারাপ। অন্য ছেলে ও ছেলের বউরা সবাই এসেছে, বাড়ি ভর্তি এখন অনেক লোকজন।

ছোটছেলে সিরাজ একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে। এই ছেলেটিকে নিয়ে জাহানারা বেগমকে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে। সিরাজ যখন স্কুলের ছাত্র, তখনই সে একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যায় হরিদ্বারে, সে নাকি একা একা হিমালয়ের কোনও চূড়ায় উঠবে ঠিক করেছিল। কলেজ জীবনে সে যোগ দেয় উগ্রপন্থী রাজনীতিতে। যার বাবা পুলিশের বড় অফিসার, সে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে বেড়ায়। কাজী হাসান হাবিব একদিন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, জাহানারা বেগম, একদিন আমাকেই হয়তো তোমার ছেলেকে অ্যারেস্ট করে জেলে ভরতে হবে। বাবার হাতে অবশ্য গ্রেফতার হতে হয়নি সিরাজকে, কিন্তু বিহারে কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তিনমাস হাসপাতালে কাটিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।

বিয়ের পর অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে সিরাজ। এখনও সে রাজনীতি করে বটে কিন্তু একটা চাকরিও করে। তার স্ত্রী দীপা বারাসত কলেজে পড়ায়। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী আলাদা বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু জাহানারা বেগম এক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ওসব চলবে না। এ বাড়িতে এত ঘর খালি পড়ে আছে, তবু তোদের অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে কেন?

সিরাজ ও দীপার একমাত্র মেয়ে এই মিলি, ভাল নাম মিলিতা। এই নাতনিটি জাহানারা বেগমের বড় প্রিয়। অতি দুরন্ত মেয়ে, কিন্তু বকুনি খেয়ে খিলখিল করে হাসে। কয়েকদিন ধরে একটু একটু সর্দি কাশিতে ভুগছে, আজ বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাৎ অসুখে পড়বে মেয়েটা, তাই জাহানারা বেগম ওকে নিজের কাছে রাখতে চান। মিলির মা একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে ঢাকা গেছে, ফিরবে দু'দিন বাদে।

নিজের ঘরে এসে জাহানারা বেগম মিলির দু'হাতে দুটো নারকোলের সন্দেশ ধরিয়ে দিলেন। মেয়েটা এমনি সন্দেশ রসগোল্লা খেতে চায় না, কিন্তু নারকোলের মিষ্টি খুব ভালবাসে।

এবারে জাহানারা বেগম একটি ছোট জলচৌকির সামনে কোরান শরীফ খুলে বসলেন। শবে-বরাতের দিনে বারবার কোরান শরীফ পাঠ করে মনটাকে শুদ্ধ রাখতে হয়। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে খুব জোরে, আজ ছেলে-মেয়েদের বাজি পোড়াবার আনন্দটাই নষ্ট।

এক পাতা পড়তেই জাহানারা বেগমের মন নিবিষ্ট হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাপ-দাদার মুখে কোরান শরীফ পাঠ শুনেছেন। তিনি নিজেও পড়েছেন অধিকাংশ সুরা-ই তাঁর মুখস্থ। তবু যতবার পড়েন, ততবার ভাল লাগে।

এই কোরান শরীফটি তাঁর বাবা তাঁকে দিয়েছেন। ছাপা বই নয়, হাতে লেখা

পাণ্ডুলিপি, প্রত্যেক পাতায় সোনার জলের বর্ডার।

নারকোলের মিষ্টি দুটি শেষ করে মিলি তাঁর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, দাদিমা, কী পড়ছ তুমি?

জাহানারা বেগম বললেন, আমি কোরান শরীফ পড়ছি মা। তুমি ততক্ষণ একটু খেল্‌নাপাতি নিয়ে খেলা কর, আমি আর একটু পড়ে নিই...

মিলি অদুরে সুরে বলল, ওরা এখনও বাজি নিয়ে এল না। দাদিমা, তুমি আমাকে গল্প বলো।

—আচ্ছা গল্প বলছি! চুপ করে বোস!

—ওইটা কী বই, ওতে কী রাজা-রানির গল্প আছে?

—হ্যাঁ, তাও আছে। আমার পিঠ থেকে নেমে পাশে এসে বোস। এই তো ভাল মেয়ে! এক দেশে নোম্‌রুদ নামে এক রাজা ছিল। সেই রাজা খুব অহংকারী, সে ছিল ঈশ্বরদ্রোহী।

—ঈশ্বরদ্রোহী কী দাদিমা?

—ঈশ্বর হলেন আল্লা, ভগবান। যে ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করে, সে হল ঈশ্বরদ্রোহী। এই রাজা নোম্‌রুদ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে না মেনে নিজেকেই ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছিল। তার প্রজারা তাকেই ঈশ্বর বলে পুজো করত, কিংবা তার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করত। সেটা খুব খারাপ কাজ।

—কেন, খারাপ কেন?

—রাজা তো আর ঈশ্বর নয়। তারপর শোন, এব্রাহিম বলে সেই রাজ্যে একজন প্রজা ছিল। সে কিন্তু রাজাকে মানেনি, সে রাজাকে পুজোও করেনি। রাজা একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন আমার পুজো কর না? এব্রাহিম বলল, আমি নিজের ঈশ্বর ছাড়া আর কারুকেই পুজো করি না। রাজা তখন খুব গর্বের সঙ্গে বলল, আমিই তো ঈশ্বর! তখন এব্রাহিম বলল...

দরজার কাছে জুতোর শব্দ হল। জাহানারা বেগম মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, তাঁর ছেলে সিরাজের সঙ্গে একটি দম্পতি এদিকেই আসছে। বই পড়তে চশমা লাগে, সেই চশমায় দূরের মানুষদের চেনা যায় না। চশমা খুলে জাহানারা বেগম চিনলেন, সিরাজের সঙ্গে এসেছে দীপার দাদা আর বউদি, জয় ও ভাস্বতী।

জাহানারা বেগম তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই জয়-ভাস্বতী এসে তাঁর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন, মাসিমা?

জাহানারা বেগম দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সিরাজ কিন্তু তার মাকে প্রণাম করল না, সে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে, সে এসব আদিখ্যেতা পছন্দ করেন না। দীপার দাদা জয় একজন নামকরা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, গত বছর চীনের সরকার তাকে মাও জে ডং স্মৃতি পুরস্কার দিয়েছে, কিন্তু তার চালচলনে একটুও অহংকার নেই। এ বাড়িতে এলেই সে জাহানারা বেগমকে প্রণাম করে।

জাহানারা বেগম নিজের হাতে তাদের মিষ্টি পরিবেশন করে বাড়ির সকলের কুশল-সংবাদ নিলেন। ভাস্বতী বলল, মাসিমা, আপনি কোরান পড়ছিলেন? ইস্, আমরা এসে আপনাকে ডিস্টার্ব করলুম। এই চল, আমরা অন্য ঘরে গিয়ে বসি।

জয় বলল, মাসিমা, আপনি তো জানেনই, প্রতি বছর এই সময় আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয়। অনেক কালের পারিবারিক ব্যাপার, চলে আসছে। দীপা তো এখানে নেই, মিলিকে আর অন্যান্য বাচ্চাদের, মানে, মা আপনাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন, কিন্তু আপনাকে তো আর যেতে বলতে পারি না...

জাহানারা বেগম বললেন, তোমরা কিন্তু রাত্তিরে খেয়ে যাবে। শবে-বরাতের দিন অতিথিদের না খেয়ে যেতে নেই।

জয় বলল, খেয়ে যাব তো নিশ্চয়ই, একতলায় যা সুন্দর মাংস রান্নার গন্ধ পেলাম।

ভাস্বতী বলল, আপনাদের বাড়িতে চালের গুঁড়ো দিয়ে যা চমৎকার রুটি হয়...

সিরাজ মেয়েকে ডেকে বলল, এই মিলি, আয়, আমাদের ঘরে আয়।

মিলি বলল, আমি এখন যাব না। দাদিমা আমাকে বই পড়ে গল্প বলছে।

ওরা চেলে যেতে না যেতেই মিলি জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

নাতনির উৎসাহ দেখে খুশি হয়ে জাহানারা বেগম আবার গল্প শুরু করলেন।

—হ্যাঁ, কতদূর যেন বলেছি? নোমরুদ রাজা আর এব্রাহিম। নোমরুদ রাজার সেই অহংকারের কথা শুনে এব্রাহিম বলল, আমি কোনও রাজাকে ঈশ্বর বলি না। তিনিই ঈশ্বর, যিনি মানুষের প্রাণ দিতে পারেন আর প্রাণ নিতে পারেন! রাজা বলল, এ তো আমিও পারি। দেখবে? তিনি কয়েদখানা থেকে দু'জন বন্দিকে আনালেন। তাদের একজনের পরদিনই ফাঁসি হবার কথা। রাজা তাকে মুক্তি দিয়ে দিল, আর এব্রাহিমকে বলল, দেখলে, আমি প্রাণ দিতে পারি? আর অন্য যে বন্দিটির পরের দিনই মুক্তি পাবার কথা, এক কোপে তার মুণ্ডু কেটে নিয়ে বলল, দেখলে, আমি প্রাণ নিতেও পারি!

—তখন ওই প্রজাটা কী বলল?

—এব্রাহিম এবার আসল কথাটা বলল, সে বললে রাজা আমার ঈশ্বর প্রত্যেকদিন সূর্যকে আকাশের পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসেন। তুমি কি সকালবেলা সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে আনতে পারবে? সেই কথায় রাজা হেরে গিয়ে মুখ নিচু করল। বুঝলি মা, আল্লার শক্তিকে যারা প্রশ্ন করে...

আবার দরজার কাছে জুতোর শব্দ। দীপার দাদা ও বউদিকে নিজের ঘরে বসিয়ে একা ফিরে এসেছে সিরাজ। প্যান্টের ওপর টি-শার্ট পরা, সুপুরুষ দীর্ঘদেহী সিরাজের মুখখানা এখন দারুণ গম্ভীর।

ঘরের মধ্যে এসে সে হুকুমের সুরে বলল, মিলি, তোর মামাবাবু তোকে ডাকছে, একবার শুনে আয়।

গল্প শোনা শেষ হয়ে গেছে, তাছাড়া বাবার এই ধরনের গলার আওয়াজ শুনে সে ভয় পায়, মিলি তাই দৌড়ে চলে গেল। মায়ের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরাজ কঠিন গলায় বললো, আম্মা, তুমি মিলিকে কোরান শরীফ পাঠ করাচ্ছিলে?

জাহানারা বেগম বেশ অবাক হয়ে বললেন, না তো। মিলির বাজি বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে, নানারকম আবদার করছিল, তাই আমি ওকে গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখছিলাম। কেন, কী হয়েছে?

মাকে প্রায় ধমক দেবার ভঙ্গিতে সিরাজ বলল, কী হয়েছে মানে? দীপার দাদা-বউদি এসে দেখে গেল, তুমি মিলিকে কোরান শরীফ শেখাচ্ছ। দীপা বাড়ি নেই, সেই সুযোগে তুমি ওকে ইসলামি শিক্ষা দিচ্ছো! ছি ছি ছি আম্মা, তোমাকে আমি কতবার বলেছি, এসব চলবে না।

জাহানারা বেগম এবারও খানিকটা সরল বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুই কি বলছিস সিজু? মিলি তো এ বাড়িরই মেয়ে, বাপ-দাদার ধর্মকথা একটু আধটু জানবে না? ও নিজেই আমাকে গল্প বলতে বলছিল।

—আম্মা, দীপার সঙ্গে আমার বিয়েতে প্রথম শর্তই ছিল, কেউ কারুর ধর্ম বিশ্বাস পরস্পরের ওপর চাপিয়ে দেব না। দীপাকে বিয়ে করে আমি যেমন হিন্দু হইনি, তেমনি দীপাও মুসলমান হবে না। আর ছেলেমেয়েরাও সাবালক না হওয়া পর্যন্ত...

—আমি কি দীপাকে কখনও মুসলমান হবার জন্য জোর করেছি?

—দীপাকে করনি, কিন্তু মিলিকে তুমি...আম্মা, কেন তুমি মনে রাখতে পার না যে ধর্মান্তর করা এখন সারা দেশে বে-আইনি?

—পাগলের মতন চ্যাঁচামেচি করছিস কেন, সিজু? আমি তো কিছুই করিনি!

—আলবাৎ করেছ। তুমি চুপিচুপি ওই টুকু মেয়েকে কোরান মুখস্ত করাচ্ছো। ওই যে, ওই যে তুমি দেওয়ালে জিন্নার ছবি টাঙিয়ে রেখেছো...সাতচল্লিশ সালের পনেরই অগাস্ট জিন্না যখন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন, সেদিন তিনি কী বলেছিলেন মনে নেই, তোমার? লালকেল্লায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন জিন্না আর গান্ধী, একটু দূরে জওহরলাল, মৌলানা আজাদ আর অন্যরা, গান্ধী যখন জিন্নাকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন, তখন জিন্না সাহেব কী অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন! তিনি বলেছিলেন, আজ থেকে হিন্দু শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান শুধু মুসলমান নয়, সবাই স্বাধীন ভারতের সমান অধিকার সম্পন্ন নাগরিক। এখন থেকে যে-যার নিজস্ব ধর্মমত, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শুধু পালন করবে নিজের নিজের বাড়িতে, যদি কেউ অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে...

সিরাজের কথার মধ্যে একটা বক্তৃতার তোড় এসে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে এবারে জাহানারা বেগম কঠোরভাবে বললেন, তুই চুপ করত। খুব সবজান্তা হয়ে গেছিস, তাই না? মাঠে ময়দানে চ্যাঁচামেচি করে তুই ভেবেছিস এসব কথা আমাকেও শোনাবি? দীপা বউমাকে আমি কোনওদিন কোনও ব্যাপারে জোর করেছি? এ

বাড়িতে থেকেও সে যদি হিন্দু মতে পুজো আচ্চা করতে চাইত...

—দীপা কোনওরকম পুজো টুজোয় বিশ্বাস করে না, তা তুমি ভালই জানো!

—না করলেও, দীপাদের বাড়িতে লক্ষ্মী ঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুরের পুজো হয়, সেইসব ঠাকুর দেবতা বিষয়ে কী সে জানে না? সে কি মেয়েকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শোনায় না। আমিও তো রামায়ণ, মহাভারতের গল্প জানি। তা হলে মিলিই বা কেন কোরান শরীফের গল্প, বিষাদ সিন্ধুর গল্প জানবে না? ধর্ম বদল না করেও বুঝি অন্য ধর্মের কথা জানতে নেই! সিজু, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে তুই কি শেষ পর্যন্ত জরুর গোলাম হয়ে গেলি?

—আম্মা, আম্মা, তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে?

জাহানারা বেগমেরও হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সিরাজের বিহ্বল মুখ দেখে এবার থমকে গেলেন। না, সিরাজ সম্পর্কে এ কথা খাটে না। দীপাকে বিয়ে করলেও সিরাজ তার শ্বশুরবাড়িতে প্রায় যেতেই চায় না। সে একেবারেই হিন্দু ঘেঁষা হয়নি। ছাত্র বয়েস থেকেই এ ছেলেটা নাস্তিক, সে রোজা রাখে না, নামাজ পড়ে না, আবার দীপাদের বাড়ির পুজো টুজোতেও কক্ষণো যায় না!

উঠে এসে ছেলের মাথায় হাত রেখে জাহানারা বেগম বললেন, কেন মাথা গরম করছিস, সিজু? শবে-বরাতের দিনে এমন করতে নেই। তোর মেয়েকে আমি রাজ-রাজড়ার গল্প শোনাচ্ছিলুম শুধু।

—জয় আর ভাস্বতী দেখে গেল, তুমি মিলিকে কোরান শরীফ পড়তে শেখাচ্ছো।

—ওরা বলেছে সে কথা?

—না, বলেনি। কিন্তু ওরা নিজের চোখে তো দেখল!

—দেখলেই বা, মিলি যদি কোরান শরীফ পড়তে শেখে, তার মধ্যেই বা দোষের কী আছে? সবই পড়ুক, শিখুক, জানুক।

—আম্মা, তুমি ওদের আজ শবে-বরাতের জন্য দাওয়াত করলে। ওরা খেয়ে যেতে রাজিও হয়েছে। আজ বাড়িতে রান্না হয়েছে বড় গোস্ত, ওরা খাবেও ঠিক। কিন্তু তুমি কি ওদের বাড়িতে গিয়ে কোনওদিন লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেতে পারবে! যেখানে মূর্তি পুজো হয়, সেখানে তুমি কোনওদিন ভুলেও পা দেবে না। তবে কেন তুমি আমাদের বাড়ির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে ওদের খেয়ে যেতে বললে?

—বলাটা কি আমার ভুল হয়েছে? আজকের দিনে অতিথিকে না খাইয়ে ছাড়তে নেই।

—ওরাও ওদের পুজোর দিনে হয়তো সেরকমই বিশ্বাস করে!

—ঠিক আছে, তুই জয় আর ভাস্বতীকে বলে দে, ওদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর দিন আমি যাব। দীপা এখানে নেই, মিলিকে আমিই সঙ্গে নিয়ে যাব।

লক্ষ্মীপুজো ঠিক ন'দিন পর। বাড়ির সাতটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হলেন জাহানারা বেগম। অনেকদিন পর তিনি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। বেশি দূর অবশ্য

যেতে হবে না। দীপার বাপের বাড়ি যশোরের সাতক্ষিরা শহরে। সিরাজুল একটা স্টেশন ওয়াগন জোগাড় করে এনেছে, বারাসত থেকে সাতক্ষিরা মাত্র ঘণ্টা দু'একের পথ।

মাঝখানে পড়ে ইছামতী নদী। সদ্য সেখানে একটি অত্যাধুনিক সেতু তৈরি হয়েছে। সেতুটির দু'পাশে ঝুলছে সারি সারি দেশি-বিদেশি ক্যাকটাসের টব, মাঝখানে রয়েছে পথচারীদের জন্য কমনভেয়ার বেল্ট। উনিশ শো সাতান্ন সালে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হবার পরেও অনেক বছর সেটা অসমাপ্ত হয়ে পড়েছিল। তার কারণ আছে। চীন এবং বারত দু'ধরনের সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করছে বলে এই দুই দেশের রেষারেষি চলছিল বেশ কয়েক বছর। প্রতিবেশী দুই বিশাল দেশ, প্রায় সমান সমান জনসংখ্যা, এই দুই দেশের রেষারেষিতে ইন্ধন জুগিয়েছে পৃথিবীর অন্য দু'একটি বিরাট শক্তি। এর মধ্যে একবার ভারত-চীন যুদ্ধও হয়ে গেছে। মাত্র চার বছর আগে এই দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা কাশ্মীরে এক আলোচনা সভায় এমন এক সিদ্ধান্তে এসেছেন, যা শিশুরাও বোঝে। এই দুটো দেশ যদি আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য একটা সন্ধি চুক্তি করে, সীমান্ত থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেয়, তা হলে প্রতিরক্ষা বাজেটে হাজার হাজার কোটি টাকা বেঁচে যায়। চীন আর ভারত যদি সমান তালে পাশাপাশি পা ফেলে চলে, তা হলে রাশিয়া-আমেরিকাও ভয়ে কাঁপবে।

সেই সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতে শুরু হয়েছে রাস্তা বানানো ও সেতু নির্মাণের ব্যাপক তোড়জোড়। কলকাতার কাছে গঙ্গার ওপর এখন তিনটে ব্রিজ, সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের ওপর প্রতি কুড়ি মাইল অন্তর ব্রিজ, তৈরি হয়েছে বম্বে-করাচি সুপার হাইওয়ে, এদিকে কলকাতা থেকে ঢাকা পৌঁছতে গাড়িতে লাগে মাত্র চার ঘণ্টা!

ইচ্ছামতী সেতুর ওপর দিয়ে যখন স্টেশান ওয়াগনটা চলছে, তখন ফজল বলল, দাদিমা, দ্যাখো, দ্যাখো, এখানে মানুষজন হাঁটছে না, রাস্তাটাই চলছে!

জাহানারা বেগমও এই চলন্ত রাস্তা দেখে অবাক হয়েছেন। এই সত্তর বছরের জীবনে তিনি কত পরবির্তনই তো দেখলেন। তাঁর নিজের বড় ভাই ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে। সেই সময় তাঁরা ভেবেছিলেন ভারত ভাগ হবেই। কলকাতায় কিংবা বারাসতে আর থাকা যাবে না। চলে যেতে হবে কোথায়! স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স কমিশন ব্যর্থ হল। তারপর মাউন্টব্যাটন এল...জাহানারা বেগম তখন একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ হলেও লেখাপড়া জানতেন; খবরের কাগজ পড়তেন, একদিকে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা, অন্যদিকে মুসলিম লীগের আস্ফালন দেখে তাঁর রক্ত গরম হতো, হিন্দুদের তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ গান্ধী-জিন্নার সমঝোতা হয়ে গেল, দু'জনে এক যোগে ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশের ফোঁপর দালালি মানব না, দেশ বিভাগ হতে দেব না...প্রথম কয়েকটা বছর কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে তা থেমে গেল, গান্ধী-জিন্না একসঙ্গে শপথ করেছিলেন যে কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতায় কিংবা ভোটের সময় কেউ গুণাক্ষরেও ধর্মের কথা

উচ্চারণ করতে পারবে না, সংবিধানেও সেই ধারা যুক্ত হয়েছে। এখন তো দেখা যাচ্ছে, মন্দির, মসজিদ, গীর্জাগুলো খালি পড়ে থাকে, বিশেষ কেউ যায় না, সরকার থেকে বলা হচ্ছে, ওগুলোকে ন্যাশনাল মনুমেন্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে...

জাহানারা বেগম একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, ফজলের কথা শুনে বললেন, তোরা তোদের জীবনে আরও কত কী দেখবি। এখন তো দেখছিস মানুষ থেমে আছে রাস্তা চলছে, একদিন হয়তো দেখবি, মানুষ আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জাদু কার্পেটে, আরব্য উপন্যাসে যেমন ছিল...

একটু পরে তিনি আবার বললেন, ওরে ছেলেমেয়েরা, শোন। আমরা তো মিলির মামাবাড়িতে যাচ্ছি লক্ষ্মীপুজোর দাওয়াত খেতে। লক্ষ্মীপুজোটা কী জানিস তো? ও মিলি, তুই একটু বলে দে না, মা!

মিলি তাঁর কোলের কাছে মাথা রেখে বলল, তুমি গল্প বলো, দাদিমা!

অগত্যা জাহানারা বেগমই শুরু করলেন। তিনি বললেন, হিন্দু ধর্মে শিবঠাকুর নামে একজন দেবতা আছেন। তাঁর চার ছেলেমেয়ে। গণেশ-কার্তিক আর লক্ষ্মী-সরস্বতী!

ফজল বলল, ও দাদিমা, একটা শুঁড়ওয়ালা হাতির মতন লোককে হিন্দুরা বলে গণেশ ভগবান, তাই না? হি-হি-হি!

জাহানারা বেগম চোখ গরম করে বললেন, ফজল চুপ কর, বোকার মতন কথা বলিস না। কুটুমবাড়িতে গিয়ে বেয়াদপি করবি না!

সিরাজ বসে আছে ড্রাইভারের পাশে। সে সব শুনছে ও মজা পাচ্ছে। ফজলের কথায় সে দোষের কিছু পেল না। প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা তখনই আসবে, যখন এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মেরও খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারবে! একটা শুঁড়ওয়ালা দেবতা সম্পর্কে যদি ফজলের হাসি পায়, তা হলে জোর করে তার হাসি থামিয়ে দেবার তো কোনও কারণ নেই। যেমন শবে-বরাতের সেই গল্প শোনার পর রাত্তিরবেলা বাবার কাছে শুয়ে মিলি জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, একটা দুষ্টু রাজা যখন একটা লোকের মাথা কেটে ফেলল, তখন ভগবান কেন তাকে বাঁচিয়ে দিল না? সিরাজ বলেছিল, মানুষ যখন মানুষকে মারে, তখন তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা ভগবান বা আল্লার নেই রে, মামণি। মানুষকেই শিখতে হবে যে অন্য মানুষদের এমনভাবে বিনা দোষে মারতে নেই।

সিরাজ ভাবল, দীপার বাড়িতে গিয়ে ফজল বা অন্য বাচ্চারা যদি লক্ষ্মীপুজোর ধুমধাড়াক্কা দেখে হাসি ঠাট্টা করে, তাতে বেশ একটা মজাই হবে। দেখাই যাক না, তাতে ওদের কী প্রতিক্রিয়া হয়। যদি ওরা রেগে যায় বা বিরক্ত হয়, তা হলে সিরাজ নিজেই বলবে, আপনারা মুসলমানবাড়ির ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন করেছিলেন কেন? কে আপনাদের মাথার দিব্যি দিয়েছিল? দীপা তো কখনও এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ঢাকায় সেমিনার শেষ করে দীপা সোজা চলে আসবে সাতক্ষিরা, সে কথা জাহানারা বেগম এখনও জানেন না। শাশুড়ি আসছেন শুনে দীপা রাঙামাটি, কক্সবাজার ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসছে।

সাতক্ষিরায় দীপাদের বাপের বাড়িটি বেশ কয়েক পুরুষের পুরনো। বাড়ি তো নয়, প্রায় প্রাসাদ। সামনের নহবত খানায় সানাই বাজছে।

জাহানারা বেগমের বুকটা ঢিপঢিপ করছে। মূর্তি পূজা তিনি মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। ছেলের কথার পিঠে কথা রাখতে গিয়ে তিনি এখানে আসতে রাজি হয়েছেন। খুব অল্প বয়েসে তিনি হিন্দু পাড়ার পুজো-টুজো দেখেছেন বটে, স্কুলের হিন্দু মেয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প শুনেছেন, কিন্তু সতেরো বছর বয়েসে জ্ঞান হবার পর আর কখনও যাননি। এদের নিয়ম কানুন কীরকম কে জানে! একটা মাটির প্রতিমার সামনে প্রণাম করতে হবে। মরে গেলেও তিনি তা পারবেন না। এই বয়সে তিনি তাঁর বিশ্বাসকে বলি দিতে পারবেন না।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই জয় এগিয়ে এসে বলল, আসুন, আসুন মাসিমা আপনি আসবেন শুনে এমন অবাক হয়েছি!

সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় জয়, তখন সে সাহেবি পোশাক পরে, আজ সে পরে আছে কুঁচোনো ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। এতবড় বৈজ্ঞানিক সে, কিন্তু পারিবারিক প্রথা ঠিক ঠিক মেনে চলে। সিরাজের মতন তিরিক্ষি স্বভাবের নয়।

সাদা শাড়ির আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে তিনি পায়ে পায়ে এগোলেন। হিন্দুদের পুজোর একটা মণ্ডপ থাকে। সেখানে মাটির ঠাকুর থাকে। কোথায় সে মণ্ডপ?

জাহানারা বেগমের মুখের দিকে চেয়ে, যেন তাঁর চোখের ভাষা বুঝেই জয় বলল, মাসিমা এ বছর আমরা ঠাকুর আনিনি। আমরা ভাইরা সব বাইরে থাকি, বাড়িতে আসার সময় পাই না, সামনের বছর থেকে আর পুজো হবে কি না ঠিক নেই। এ বছর তাই শুধু ঘট পুজো করে কোনওরকমে নমো নমো করে সারা হয়েছে।

কথা নেই বার্তা নেই, জাহানারা বেগম প্রথমে বসে পড়লেন সেখানে, তারপর শুয়ে পড়লেন মাটিতে। পর মুহূর্তেই অজ্ঞান। হঠাৎ ইসকিমিয়ার ব্যথা মাথা চাড়া দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিরাট চ্যাঁচামেচি, হইচই, ডাক্তার ডাকার আবেদন। জাহানারা বেগমকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল ভেতরের ঘরে। সিরাজই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেশি। তার শ্বশুরবাড়িতে তার মা কোনওদিন আসেন না। আজই প্রথম এলেন, তাও একটা উৎসবের দিনে, আজই যদি তাঁর একটা ভালমন্দ ঘটে যায়....

জাহানারা বেগমের জ্ঞান ফিরল আধ ঘণ্টার মধ্যেই। তিনি লজ্জায় প্রায় অবশ

হয়ে গেলেন। কুটুম বাড়িতে এসে...উৎসবের বাড়ি....ইসকিমিয়ার ব্যথা ওঠার আর কি সময় হল না? তাঁর জন্য যদি উৎসব পণ্ড হয়ে যায়, ছি ছি ছি, এরকম নাটকীয় ঘটনা কোনওদিন তাঁর জীবনে ঘটেনি....

ভাল করে চোখ মেলার পর তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধু দীপাকে। একটা লাল পাড় সিল্কের শাড়ি পরা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কপালে একটা টিপ...। জাহানারা বেগমের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তিনি হিন্দু পাড়ায় গিয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি দেখেছিলেন, বাঙালি মেয়েদেরই মতন গড়ন, জরিপাড় শাড়ি পরানো, মাথার চুল দীপার মতন, অর্ধেকটা ঘোমটা টানা, ঠাকুর দেবতার মতন নয়, ঠিক বাঙালি মেয়েদের মতনই দেখতে, বেশ লাগত কিন্তু....

দীপা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, এখন কী রকম ফিল করছেন, মা? কষ্ট হচ্ছে?

জাহানারা বেগম দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

দীপা তাঁর পায়ের তলা ঘষতে বলল, আপনার কিছু হয়নি, ভয় পাবেন না, ডাক্তার এসে দেখে গেছে।

জাহানারা বেগম ফিসফিস করে বললেন, মিলি কোথায়?

দীপা বলল, মিলি এতক্ষণ আপনারা মাথার কাছে বসেছিল। এইমাত্র উঠে গেল। ডাকছি, মিলিকে ডাকছি। মা আপনি কিছু খাবেন? একটু গরম দুধ এনে দেব? দুধ খেলে ভাল লাগবে।

জাহানারা বেগম আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। এটা কার বিছানা কে জানে! তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দীপার মুখের দিকে। তার ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি প্রায় ফিসফিস করে, লাজুক গলায় বললেন, তোমাদের পুজো ঠিকঠাক শেষ হয়েছে তো? আতপ চাল, কলা আর বাতাসা দিয়ে তোমাদের একটা পুজোর প্রসাদ হয় না? ছেলেবেলায় খেয়েছি, খুব ভাল লাগত, সেই প্রসাদ একটু এনে দিতে পার?

শিকড়

প্রফুল্ল রায়

জানালার পাশে একান্ত নিজস্ব ইজি চেয়ারটিতে আধশোয়া ভঙ্গিতে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে চা খাচ্ছিলেন রাজমোহন। বারো বছর আগে রিটায়ার করেছেন। তারপর থেকে এভাবে চা খাওয়া তাঁর এক প্রিয় অভ্যাস।

দোতলার এই জানালা দিয়ে পুব এবং দক্ষিণের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আশি ফিট চওড়া একটা রাস্তা সোজা পুব দিকে চলে গেছে, দক্ষিণের বড় একটা পার্ক। এই দুটো দিক কোনওদিনই বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পার্ক সার্কাসের এই অঞ্চলটা এখনও বেশ নিরিবিলি আর খোলামেলা। চারিদিকে প্রচুর পাখি এবং গাছপালা। তবে কতদিন গাছ এবং পাখি-টাখি দেখা যাবে, জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা কলকাতার অন্য সব পাড়ার মত কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোর নজর এখানেও এসে পড়েছে। যেভাবে কড়কড়ে নতুন নোটের বান্ডিলে অ্যাটাচি-কেস বোঝাই করে তারা হানা দিচ্ছে, যাদের জমি-জায়গা বা ছোটখাটো বাড়ি আছে তাদের মাথা ঘুরে যাওয়াই স্বাভাবিক। পুব আর উত্তর দিকটা বাদ দিয়ে পশ্চিম এবং দক্ষিণে এর মধ্যেই পুরনো বাড়ি ভেঙে হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠতে শুরু করেছে। এভাবে চললে আর কতকাল। পাঁচ-সাত বছরে বাক্স টাইপের আমেরিকান আর্কিটেকচারে এ পাড়াও ছেয়ে যাবে।

একজন বড় প্রোমোটার বারকয়েক রাজমোহনের কাছেও ঘুরে গেছে। দশ কাঠা প্লটের মাঝখানে তাঁর এই দোতলা বাড়িটা ভেঙে তারা আটতলা হাইরাইজ তুলে একটা গোটা ফ্লোর তা দিতে চেয়েছেই, সেই সঙ্গে নগদ যা দিতে চেয়েছে সেটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখলে পরের পাঁচ জেনারেশনকে কিছু করতে হবে না, পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

রাজমোহন প্রথম দিনই 'না' বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটার অসীম ধৈর্য। তারপরও তিন চারবার এসে ধরনা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রূঢ়ভাবেই তাকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে। তিনি এখানে হাইরাইজ তুলতে দেবেন না।

রাজমোহনের এই সিদ্ধান্ত মণীশকে খুশি করতে পারেনি। মণীশ তাঁর একমাত্র ছেলে। সে বোঝাতে চেয়েছিল, এত ছোট বাড়ি এবং চারপাশে এতটা ফাঁকা জায়গা ফেলে রাখার মানে হয় না। তা ছাড়া অতগুলো টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে

গোঁয়ার্তুমি থাকতে পারে, দূরদর্শিতা নেই। ছেলের এসব কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি রাজমোহন। তবে তিনি জানেন, তাঁর মৃত্যুর পর খুব দেরি করবে না, মণীশ, দু'মাস কাটতে না কাটতেই নিজে গিয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনবে। গাছপালা পাখি নির্জনতা—এসব ব্যাপারে তার বাজে সেন্টিমেন্ট নেই।

দেশভাগের একমাসের মধ্যে তাঁদের ঢাকার বাড়ির সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে এখানে চলে এসেছিলেন রাজমোহন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ, মণীশের তিন। মা বাবা এবং তাঁর স্ত্রী মণিমালা তখনও বেঁচে ছিলেন। সেই যে এসেছিলেন, তারপর একচল্লিশ বছর কেটে গেল।

ঢাকার বাড়ির সঙ্গে অবশ্য এ বাড়ির তুলনা হয় না। সেগুন বাগিচায় প্রায় এক বিঘে জায়গার মাঝখানে ছিল তাঁদের মাঝারি মাপের তেতলা। সামনের দিকে বিরাট বাগান, পেছনে পুকুর। ওখানেই রাজমোহনের জন্ম। জীবনের মূল শিকড়টা ঢাকার বাড়িতেই থেকে গেছে। কিন্তু একচল্লিশটা বছর তো কম সময় নয়। পার্ক সার্কাসের এই বাড়িতে আসার পর পরই বাবা মারা গেলেন, তার বছর চারেক বাদে মা। মণিমালাও গত বছর তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন। মণীশ এখন চুয়াল্লিশ বছরের প্রৌঢ়, বিরাট মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সে একজিকিউটিভ। পুত্রবধূ পরমা একটা কলেজে 'লিভ ভ্যাকান্সিতে' পড়াচ্ছে। আপাতত টেম্পোরারি, তবে শিগগিরই পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে—রাজা আর বুনা। রাজার এখন আঠার, সেন্ট জেভিয়ার্সে ইকনমিকস অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ইয়ার। বুনার বয়স ষোল, সে এবার স্কুল ফাইনাল দেবে।

রাজমোহন অনুভব করেন, একচল্লিশ বছরে তাঁর অস্তিত্বের দ্বিতীয় একটি শিকড় পার্ক সার্কাসের এই বাড়িতে ধীরে ধীরে চারিয়ে গেছে।

নভেম্বরের বিকেল আস্তে আস্তে জুড়িয়ে আসছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মত।

চায়ে হালকা চুমুক দিতে দিতে অন্যমনস্কর মত দূরে পার্কটার দিকে তাকিয়ে আছেন রাজমোহন। রোজ যা চোখে পড়ে, আজও ওখানে সেই একই ছবি। কিছু বয়স্ক মানুষ বেঞ্চে বসে আছে, কেউ কেউ সবুজ মাঠের চারপাশের বাঁধানো রাস্তায় অলস ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। অজস্র বাচ্চা বল আর ব্যাট নিয়ে কম করে দশটা টেস্ট ম্যাচের আসর বসিয়ে দিয়েছে।

রাজমোহনের মস্তিষ্কে অন্য দিনের মত আজও এলোমেলো নানা ভাবনা ছায়া ফেলে যাচ্ছে। ইদানীং কিছুদিন ধরেই ঢাকার বাড়িটার কথা মনে পড়ে। অ্যালবামে রাখা পুরনো ফটোর মত স্মৃতির অনেকটাই আবছা হয়ে গেছে, তবু বড় ইচ্ছা হয়, একবার ঢাকায় যান। গত জানুয়ারিতে তিনি সত্তর পেরিয়েছেন। এখনও যদি না যেতে পারেন, আর কখনও যাওয়া হবে না।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। নিশ্চয়ই রাজা কি বুনা তাদের কলেজ কিংবা স্কুল থেকে ফিরে এসেছে।

জানলার বাইরে চোখ রেখেও রাজমোহন টের পান, পরমা ওধারের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। একটু পরে ফিরে এসে সে এ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। ডাকে, 'বাবা—'

মুখ ফিরিয়ে তাকান রাজমোহন।

পরমা বলে, 'ঢাকা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। নাম বললেন আবদুল করিম। তাঁর সঙ্গে একটি ছেলে আর একটি মেয়েও এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

ব্যাপারটা প্রায় টেলিপ্যাথির মত। কিছুক্ষণ আগেই ঢাকার কথা ভাবছিলেন রাজমোহন। আর তখনই কিনা করিম সাহেবের খবর নিয়ে এল পরমা। পার্ক সার্কাসের এই বাড়িটা একচল্লিশ বছর আগে ছিল করিম সাহেবদেরই।

নিজের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করেন রাজমোহন। ব্যস্তভাবে ইজি-চেয়ার থেকে উঠে পড়তে পড়তে বলেন, 'ওঁরা কোথায়?'

'নিচে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'চল, চল—'

শ্বশুরের সঙ্গে আবার একতলায় নামতে নামতে পরমার হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'এঁর সঙ্গেই কি বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে কলকাতায় এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' রাজমোহন বলেন, 'তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে দেখছি।'

পরমা উত্তর দেয় না, একটু হাসে শুধু।

ড্রইংরুমে করিম সাহেব বসে ছিলেন। তাঁর বয়স পঁচাত্তর ছিয়াত্তর। খাড়া নাক। প্রায় ছ ফিটের মত হাইট, চুলদাড়ি সাদা ধবধবে। পায়জামা পাঞ্জাবি। বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য বেশ ভালই বলা যায়। শিরদাঁড়া অবশ্য খানিকটা নুয়ে পড়েছে, গায়ের চামড়া আগের মত টান টান নেই। চুলের রং একেবারে পাল্টে গেছে। এটুকু ছাড়া শরীরের ফ্রেম প্রায় একচল্লিশ বছর আগের মতই রয়েছে।

করিম সাহেবের ডান পাশে কুড়ি বাইশ বছরের এক ঝকঝকে তরুণী। বাঁয়ে পনের ষোল বছরের একটি কিশোর। দু'জনেরই পরনে জিনস। মেয়েটি জিনসের ওপর ঢোলা শার্ট পরেছে, ছেলেটি পরেছে স্পোর্টসম্যানদের মত গেঞ্জি। দেখেই বোঝা যায়, দু'জনের পোশাকই বিদেশি—মেড ইন ইউ. এস. এ কিংবা কানাডা।

রাজমোহন ঘরে ঢুকতেই করিম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরেন। গাঢ় গলায় বলেন, 'ভাল আছেন তো?'

রাজমোহন বলেন, 'বয়েস কম হল না। একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার কথা বলুন—'

রাজমোহনকে বুকের ভেতর থেকে মুক্ত করতে করতে করিম সাহেব বলেন, 'আমারও একই কথা। একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, বাঁ কাঁধে আর্থরাইটিস,

দু'বছর আগে ছানি কাটিয়েছি। এরপরও যেটুকু ভাল থাকা যায় তা-ই আছি। আই অ্যাম হ্যাপি।' বলে হাসতে থাকেন।

বোঝা যায়, আয়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তাঁর কোনওরকম তিক্ততা বা হতাশা নেই। কৌতুকের সঙ্গে অম্লরস মিশিয়ে তিনি জীবনের ভালমন্দকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন।

রাজমোহন হেসে হেসে বলেন, 'বসুন, বসুন—'

দু'জনে মুখোমুখি বসে পড়েন। তরুণী এবং কিশোরটিকে দেখিয়ে রাজমোহন বলেন, 'এরা নিশ্চয়ই নাতি-নাতনি?'

করিম সাহেব মাথা হেলিয়ে জানান তহমিনা অর্থাৎ তরুণীটি তাঁর বড়ছেলের মেয়ে। কিশোরটি ছোটছেলের ছেলে। তার নাম শামিম। তহমিনার মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার চলছে। শামিম আসছে বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে।

রাজমোহন বলেন, 'ওদের নিয়ে এসেছেন। খুব খুশি হয়েছি।' বলে পরমার সঙ্গে করিম সাহেবের আলাপ করিয়ে দেন।

পরমা নমস্কার করে বলে, 'আপনার কথা বাবার কাছে অনেক শুনেছি। আপনারা গল্প করুন। আমি চা নিয়ে আসছি।'

পরমা চলে যাবার পর করিম সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজমোহনের সংসারের যাবতীয় খবর নেন এবং নিজের কথাও বলেন। তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড়ছেলে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বড় অফিসার, ছোটছেলে ডাক্তার। মেয়ে ইকনমিকসে এম. এ পাস করার পর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাই টরেন্টোতে রিসার্চ করছে। তাদের ছেলেপুলে হয়নি।

পরমা প্রচুর কেক, সন্দেশ, নোনতা খাবার এবং চা নিয়ে এল।

করিম সাহেব শুধু একটি সন্দেশ তুলে নেন। খেতে খেতে বলেন, 'মিষ্টি আমার কাছে টোটালি নিষিদ্ধ। তবু এই তালশাঁস সন্দেশটা খাব। অনেকদিন পর দেখলাম, লোভ সামলাতে পারছি না।' খেতে খেতে বলেন, 'আমাদের দেখে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছেন।'

অল্প হেসে রাজমোহন বলেন, 'তা একটু হয়েছি। হঠাৎ এভাবে, মানে চিঠি-টিঠি না দিয়ে—' বলতে বলতে থেমে যান।

রাজমোহনের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন করিম সাহেব। বলেন, 'ভেবেছিলাম আপনাদের সারপ্রাইজ দেব। কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে প্লেনে ওঠার পর চিন্তা হল, এ বাড়ি চিনতে পারব কিনা। হয়তো ভেঙে-টেঙে আরও বড় বাড়ি করেছেন, নইলে বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে গেছেন।' একটু থেমে বলেন, 'তারপর ভাবলাম, প্লেনে যখন উঠেই পড়েছি, একবার গিয়ে দেখাই যাক। আপনাদের সঙ্গে যদি দেখা না হয়, পুরনো বাড়ির জায়গায় যদি নতুন বাড়ি উঠে থাকে, আবার ঢাকায় ফিরে যাব।'

রাজমোহন চুপ করে থাকেন।

করিম সাহেব বলেন, 'ভাগ্য ভাল বলতে হবে। বাড়িটা সেই রকমই আছে। জানেন, রাজমোহন ভাই, বেশ কিছুদিন ধরেই বড় ইচ্ছা হচ্ছিল একবার এখানে আসি। এ বাড়িতে আমাদের তিনটে জেনারেশান থেকে গেছে। আমার জন্ম এখানে, শাদিও এ বাড়িতে, দুই ছেলের জন্মও হয়েছে। কত স্মৃতি!' আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে, 'জীবন তো শেষ হয়ে এল, কবে মাটির তলায় চলে যাব, ঠিক নেই। ভাবলাম, বাপ-নানার ভিটে শেষ বারের মত দেখে আসি। বুঝলেন কিনা, নাড়ির টান।'

করিম সাহেবের আবেগ রাজমোহনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল। আস্তে আস্তে তিনি মাথা নাড়েন।

করিম সাহেব আবার বলেন, 'তহমিনা আর শামিমকেও জোর করে নিয়ে এলাম। প্রতিটি মানুষের জানা দরকার, তার রুটটা কোথায়। দুনিয়ার কোথায় তার ওরিজিন, সেটা না জানলে কি চলে! পার্টিশান না হলে এখানেই ওরা জন্মাত, এখানেই থাকত।'

রাজমোহন বলেন, 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনাদের মালপত্র কোথায়?'

'দুপুরে এসে পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে উঠেছি। সুটকেশ-টুটকেশ ওখানেই রেখে এসেছি।'

ক্ষুব্ধ স্বরে রাজমোহন বলেন, 'এটা কী রকম হল! এ বাড়ি যেমন আমাদের তেমনি আপনাদেরও। আমরা একচল্লিশ বছর আছি আর আপনারা জেনারেশানের পর জেনারেশান কাটিয়ে গেছেন। আমার নাতি-নাতনি স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে আসুক, তহমিনা আর শামিমের সঙ্গে গিয়ে হোটেল থেকে আপনাদের লাগেজ নিয়ে আসবে। যে ক'দিন কলকাতায় আছেন, আমাদের কাছেই থাকবেন।' পরমাকে বলেন, 'এঁদের ব্যবস্থা করে দাও বউমা—'

পরমা বলে, 'দিচ্ছি বাবা।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে রাজা এবং বুনা ফিরে আসে। বুনার গায়ে স্কুল ড্রেস, রাজার পরনে জিনস এবং শার্ট। তাদের সঙ্গে করিম সাহেবদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়।

রাজারা করিম সাহেবকে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে। তহমিনাদের উদ্দেশে বলে 'হাই—'

শামিম এবং তহমিনা এতক্ষণ চুপচাপ দুই বৃদ্ধের বকর বকর শুনে যাচ্ছিল। দেখে মনে হয়, ওদের নিজস্ব এলাকা থেকে টেনে হিঁচড়ে এমন একটা আবহাওয়ায় এনে ফেলা হয়েছে যেখানে একেবারেই আরাম বোধ করছে না। রাজাদের দেখে দু'জনের মুখ চোখের চেহারা একেবারে বদলে যায়। হাত নেড়ে শামিমরা বলে, 'হাই—'

করিম সাহেব মজার গলায় বলেন, 'এখানেও হাই-টাই চলছে নাকি?'

রাজা হেসে হেসে বলে, 'চলবে না কেন? ওটা ইন্টারন্যাসনাল ল্যাংগুয়েজ ফর দ্য ইউথ।'

শামিম, তহমিনা এবং বুনা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

রাজমোহন বলেন, 'তোমাদের কিছুই বুঝি না বাপু।'

'জেনারেশন আর কমিউনিকেশন গ্যাপ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোকে আর বুনাকে একটা কাজ করতে হবে!'

'কী?'

'গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে তহমিনাদের নিয়ে ওদের হোটেলে যাবি। ওখানে ওদের মালপত্র রয়েছে। সেগুলো আনতে হবে।'

'ফাইন।'

'একটা কথা মনে রেখ।'

'বলো।'

'যাবে আর আসবে। জোরে ড্রাইভ করবে না।'

রাজা রগড় করে বলে, 'দাদু, তোমাদের যা বয়েস তাতে এখন ব্যাক গিয়ারে চলছ। আমাদের একটু ফরোয়ার্ড মোশানে চলতে দাও।'

করিম সাহেব বলে ওঠেন, 'আমার নাতি-নাতনিরাও ঠিক এই কথাই বলে এখনকার ছেলেমেয়েরা সব একরকম।'

রাজমোহন রাজাকে লক্ষ করে বলেন, 'তোমাকে যা বললাম তাই করবে।' তাঁর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

রাজামোহনের দিকে এক পলক তাকিয়ে হেসে ফেলে রাজা, 'একেবারে চিফ অফ দ্য আর্মিস্টাফের হুকুম। ঠিক আছে বাবা, তাড়াতাড়িই ফিরে আসব, র‍্যাশ ড্রাইভ করব না। ডোন্ট ওরি—'পরমার দিকে ফিরে বলে, 'মা, ভীষণ খিদে পেয়েছে এখানেই খেতে দাও—'

বুনা ওধার থেকে বলে, 'আমাকেও দিও মা। ওপর থেকে স্কুল ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসি।' বলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যায়। পাঁচ মিনিট পর দোতলা থেকে যখন নেমে আসে তার পরনেও জিনস আর শার্ট।

কোনও স্বয়ংক্রিয় নিয়মে একবার নিজের নাতি-নাতনি এবং পরক্ষণেই করিম সাহেবের নাতি-নাতনির দিকে তাকান রাজমোহন। নাঃ, এই জেনারেশনের পোশাক-টোশাকের দিক থেকে ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে কোনও তফাত নেই।

ঝড়ের বেগে খাওয়া সেরে তহমিনাদের নিয়ে চলে যায় রাজা।

করিম সাহেব বলেন, 'মডার্ন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা—সে ঢাকাতেই হোক কি কলকাতাতেই হোক—সব এক ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভাগ্যিস রাজা আর বুনাকে পাওয়া গেল, নাইলে ঢাকায় ফিরে যাবার জন্যে শামিমরা আমাকে পাগল করে ফেলত।'

সস্নেহে হাসেন রাজমোহন। বলেন, 'চলুন, ওপরে যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে অসীম ঔৎসুক্যে চারিদিকে তাকাতে থাকেন করিম সাহেব। সিঁড়ির পাশে যে লোহার গ্রিলের রেলিং তার মাথায় কাঠের কারুকাজ করা ঢাকনা। গভীর মমতায় তার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে করিম সাহেব বলেন, 'আমার নানার আব্বাজান ভারি শৌখিন মানুষ ছিলেন। রেলিংয়ে সিমেন্ট ঢালতে দেননি, চীনে ছুতোর ডেকে বার্মাটিক বসিয়েছিলেন। এ বাড়ির যত দরজা-জানালা সব বার্মাটিকের।'

দোতলায় নিজের ঘরে এনে করিম সাহেবকে পুরনো আমলের একটা চেয়ারে বসান রাজমোহন। পরমা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। নিজের ইজি-চেয়ারটিতে বসতে বসতে পুত্রবধূকে তিনি বলেন, 'করিম সাহেবকে আমার ঘরেই ব্যবস্থা করে দিও। বাড়তি সিঙ্গল-বেড খাট আছে না?'

পরমা জানায়, 'আছে।'

হারুকে দিয়ে ওটা এ ঘরে এনে বিছানা করে দিও।'

'আচ্ছা।'

রাজমোহন করিম সাহেবকে বলেন, 'আরেক কাপ চা হবে নাকি?'

করিম সাহেব বলেন, 'এখন আর খাব না। বেশি চা খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না।'

'তা হলে থাক।'

এদিকে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি এই সময়টায় বিকেলের পর থেকেই মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করে। দূরের পার্ক এবং সামনের রাস্তাটা এর মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে। অবশ্য রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে, তবু বাইরে কোনও কিছুই তেমন স্পষ্ট নয়।

পরমা সুইচ টিপে ঘরের টিউবলাইট জ্বেলে দেয়। তারপর বলে, 'আমি এখন যাই। হারুকে বাজারে পাঠাতে হবে। কিছু দরকার হলে ডাকবেন।'

রাজমোহন বলেন, 'আচ্ছা— '

পরমা চলে যায়।

এবার কুণ্ঠিতভাবে করিম সাহেব বলেন, 'হঠাৎ এসে আপনাদের উদ্ব্যস্ত করে তুললাম। হোটেলে—'

রাজমোহন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'দয়া করে এই কথাটা আর মুখে আনবেন না।'

করিম সাহেব হেসে ফেলেন, 'আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।'

খানিকক্ষণ দু'জনে পুরনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে যান। দেশভাগের কথা, দাঙ্গার কথা পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, শরণার্থীদের কথা নতুন করে তাঁদের মনে পড়ে যায়। এরকম একটু দুঃসহ সময়ে কীভাবে বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে চিরকালের মত তাঁর। এপার থেকে ওপারে এবং ওপারে এবং ওপার থেকে এপারে এসেছিলেন সেই সব ছবি তাঁদের সামনে অদৃশ্য কোনও টি.ভি স্ক্রিনে ফুটে উঠতে

থাকে। ঘরের বাতাস ক্রমশ ঘন বিবাদে ভারী হয়ে যায়।

একসময় রাজমোহন বলেন, 'চলুন করিম সাহেব, আপনার বাড়িটা একবার ঘুরে দেখবেন। দু'বছর বাদে বাদে রং করা ছাড়া আমরা কিছুই বদলাইনি। খাট আলমারি টেবল চেয়ার, যেমন রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই রয়েছে।'

এই বাড়ি যখন এক্সচেঞ্জ করা হয়, কিছুই নিয়ে যাননি করিম সাহেব। আসবাবপত্র সবই ফেলে রেখে খালি হাত-পায়ে চলে গিয়েছিলেন। রাজমোহনরাও ঢাকার বাড়ি থেকে একটুরো কাঠও আনতে পারেননি।

করিম সাহেব বলেন, 'আজ থাক। কাল নাতি-নাতনি দুটোকে নিয়ে সব দেখব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাজমোহন বলেন, 'একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।'

উৎসুক চোখে তাকান করিম সাহেব, জিজ্ঞেস করেন, 'কি?'

'আমাদের ঢাকার বাড়িটা কি সেই রকমই আছে? শুনেছি ঢাকা নাকি একেবারে বদলে গেছে।'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে আপনাদের বাড়িটা এখন পর্যন্ত আগের মতই রেখেছি। তবে আর কতদিন পারব বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'আপনাদের বাড়িতে প্রায় এক বিঘে জায়গা। কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোকেরা রোজ এসে জ্বালিয়ে মারছে। ওখানে মাল্টি-স্টোরিড বাড়ি করতে চায়। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি সবাইকে একটা করে বড় ফ্ল্যাট তো দেবেই তা ছাড়া কয়েক লাখ টাকা নগদও দেবে। ছেলেরা রাজি হওয়ার জন্যে আমার ওপর প্রেসার দিচ্ছে।'

হুবহু এক ব্যাপার। এখানকার প্রোমোটাররা এবং মণীশ কীভাবে তাঁকে হাইরাইজ বাড়ি করার জন্যে চাপ দিয়েছে, রাজমোহন জানিয়ে দেন। তারপর বিমর্ষ মুখে বলেন, 'দিনকাল পুরোপুরি বদলে গেছে। পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি একালের ছেলেমেয়েদের আর কোনও ফিলিংস নেই।'

একই রকম আক্ষেপ শোনা যায় করিম সাহেবের কথায়। সায় দিয়ে তিনি বলেন, 'যা বলেছেন রাজমোহন ভাই। ফর্টি সেভেনে যখন ঢাকায় যাই, আমার বড় ছেলের বয়স দশ, ছোটর ছয়। মেয়ের জন্ম তো ওখানেই। এতগুলো বছর যেখানে কাটল সেই বাড়ির ওপর ওদেরও এতটুকু মায়া নেই। আমি মারা গেলে একমাসও কাটবে না, ছেলেরা ওই বাড়ি বিল্ডারদের হাতে দেবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাজমোহন।

করিম সাহেব বলেন, 'একটা কথা বলছিলাম। ক'দিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে একবার ঢাকায় আসুন। এরপর গেলে হয়তো বাপ-দাদার স্মৃতিকে দেখতে পাবেন না।'

করিম সাহেবের একটা হাত নিজের করতলে তুলে নিয়ে রাজমোহন বলে, 'কিছুদিন ধরে এই কথাটাই ভাবছিলাম। যাব, খুব শিগগিরই একবার ঢাকা যাব। তার আগে আপনাকে চিঠি লিখে জানাব।'

দোতলায় রাজমোহনের ঘরে ছোট খাট আনিয়ে করিম সাহেবের বিছানা করে দিয়েছে পরমা। এই ঘরের সামনে দিয়ে প্যাসেজ চলে গেছে। ওটার শেষ মাথায় পাশাপাশি তিনটে ঘর। একটা ঘর রাজার, একটা বুনার, তৃতীয়টি মণীশ এবং পরমার। ঠিক হয়েছে বুনার ঘরে তহমিনা আর বুনা থাকবে। রাজার ঘরে তার সঙ্গে থাকবে শামিম।

সাড়ে ন'টা বাজতে চলল। রাজমোহন এবং করিম সাহেব একনাগাড়ে কথাই বলে যাচ্ছেন।

সন্ধের আগে সেই যে রাজারা হোটেলে চলে গিয়েছিল, এখনও ফিরে আসেনি। হঠাৎ তাদের সম্বন্ধে সচেতন হলেন রাজমোহন। বলেন, 'এখান থেকে পার্ক স্ট্রিটে যেতে আসতে কুড়ি মিনিটও লাগে না। আরও না হয় আধ ঘণ্টা বেশি দেওয়া গেল। গেছে ছ'টায়। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে কী করছে ওরা!'

করিম সাহেব হাসেন। বলেন, 'হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আরও আধ ঘণ্টা বাদে, দশটা পার করে রাজারা হইহই করতে করতে ফিরে আসে।

রাজমোহন বলেন, 'কী আশ্চর্য, তখন বলে দিলাম, যাবি আর আসবি। এতক্ষণে ফিরতে পারলি!'

রাজা বলে, 'বা রে, শামিমরা এই প্রথম কলকাতায় এল। আমাদের সিটিটা ওদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম।'

'জোরে ড্রাইভ করিসনি তো?'

'তোমার মাথায় ওই ব্যাপারটা ফিক্সেসানের মত আটকে আছে। তহমিনা আর শামিমকে জিজ্ঞেস কর। দশ কিলোমিটারের বেশি স্পিড তুলিনি। মাননীয় গ্র্যান্ড-ফাদারের হুকুমটা মানতে হবে না?'

'পাজলামো করতে হবে না। অনেক রাত হয়ে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে সবাই এবার ঘরে চলে এস।'

করিম সাহেবের হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ব্যস্তভাবে বলেন, 'মণীশ তো এখনও অফিস থেকে ফিরল না?'

রাজমোহন বলেন, 'অফিসের কাজে ও দিল্লি গেছে। সাতদিন পর ফিরবে।'

'তা হলে আর ওর সঙ্গে দেখা হল না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর করিম সাহেবকে নিয়ে নিজের ঘরে আসেন রাজমোহন। নিচু টেবলে দুটো কাচের গেলাস এবং জল রেখে যায় পরমা। আর রাজা তহমিনা শামিম আর বুনাকে নিয়ে তার ঘরে ঢোকে। বোঝা যাচ্ছে, বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা-টাড্ডা দিয়ে ওরা যে যার জায়গায় শুতে যাবে।

করিম সাহেব সস্নেহে বলেন, 'চারজনের বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি।'

রাজমোহন বলেন, 'বার্ডস অফ সেম ফেদার। ফেদার না ফ্লক কোনটা বলুন?'

'দুই-ই।' করিম সাহেব মজার গলায় বলেন।

কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করে দু'জনে পাশাপাশি খাটে শুয়ে পড়েন। পাশের ঘরে এই মুহূর্তে হালকা করে পপ মিউজিকের রেকর্ড চালিয়ে চারজনে হুল্লোড় চালাচ্ছে। ওদের কথা এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন রাজমোহনরা।

রাজা বলছে, 'থার্ড ওয়ার্ল্ডের সিটিগুলোতে কোন্য চার্ম নেই। আমার এক মামা ওয়েস্ট জার্মানিতে আছেন। বি. এ টা পাস করতে পারলেই তাঁর কাছে চলে যাব।'

বুনা বলে, 'তুই আগে যা। পাঁচ বছর পর আমিও যাচ্ছি।'

তহমিমা জানায়, তার পিসিও কানাডায় তার এবং শামিমের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দু-এক বছরের মধ্যে তারাও টরেন্টো চলে যাচ্ছে।

করিম সাহেব বলেন, 'শুনেছেন?'

রাজমোহন বলেন, 'হুঁ—'

রাজাদের কথা শুনতে শুনতে একসময় দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর দেখা যায়, রাজারা চারজন বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

করিম সাহেব বলেন, 'এ কি, ফোর মাস্কেটিয়ার্স এই সকালবেলায় কেথায় যাচ্ছ?'

রাজা বলে, 'আমার আর বুনার বন্ধুদের সঙ্গে তহমিনা আর শামিমের আলাপ করিয়ে দেব। কাল রাত্তিরে আমরা প্রোগ্রাম করে ফেলেছি, হোল ক্যালকাটা আজ চষে ফেলব।'

'কিন্তু তোমার কলেজ, বুনার স্কুল নেই?'

'আজ থেকে আমাদের কলেজে চারদিন ছুটি। বুনাদেরও তাই।'

'তোমরা ফিরবে কখন?'

'সেই রাত্তিরে। আমরা বাইরে খেয়ে নেব।'

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, তহমিনাকে আর শামিমকে আজ বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।'

তহমিনা বলে, 'পরে দেখব দাদা—' বলে প্রায় ঝড় তুলে রাজাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

করিম সাহেবকে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ দেখায়। কিছুক্ষণ পর রাজমোহনের সঙ্গে তিনি বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। মনে পড়ে যায়, দোতলার দক্ষিণের ঘরটায় তাঁর আব্বা আর আম্মা থাকতেন। পাশের ঘরে তিনি এবং তংার স্ত্রী। বিয়ের পর নতুন পত্নীকে নিয়ে প্রথম এ ঘরেই এসেছিলেন। স্ত্রী আর নেই। ঢাকায় যাবার পর আর মোটে পনেরটা বছর বেঁচে ছিলেন। একতলায় থাকতেন তাঁর এক বিধবা ফুফু আর নানা। তাঁরাও আজ আর কেউ নেই। সবারই এন্তেকাল হয়েছে।

মায়াবী আত্মার মত ঘুরতে ঘুরতে তিনি নিচে নেমে সোজা পেছনের বাগানে

চলে আসেন। একচল্লিশ বছর আগের প্রায় সবগুলো গাছ এখনও টিকে আছে। শিয়ালদার এক মেলা থেকে চারা কিনে এনে তিনি, তাঁর মা, স্ত্রী এবং আব্বজান নানা রকমের আম, গোলাপজাম, বাতাবি লেবু, জামরুল আর কালোজামের গাছ লাগিয়েছিলেন। তাঁদের পরিবারের সবারই গাছের খুব শখ। জাতিস্মরের মত প্রতিটি গাছ আলাদা চিনতে পারলেন।

তাঁর পেছন পেছন যে রাজমোহন ঘুরছেন, সেদিকে খেয়াল নেই করিম সাহেবের। পূর্বপুরুষের এই বাড়ি যেখানে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বত্ব নেই, তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে দিন তিনেক কেটে গেল। এর মধ্যে একদিনও ভাল করে তহমিনাদের বাড়িটা দেখাতে পারলেন না করিম সাহেব। রোজই রাজাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ওরা, ফেরার কিছুমাত্র ঠিক থাকে না। যেটুকু সময় বাড়ি থাকে, সারাক্ষণ হুল্লোড়। রাজা আর বুনার বন্ধুরা ঝাঁকে ঝাঁকে সকালে কি দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় হানা দেয়। রাজমোহন এবং করিম সাহেব যখন একচল্লিশ বছর আগের স্মৃতির জগতে ফিরে যান, ওরা তখন কম্পিউটার, পপ-মিউজিক, ক্রিকেট, ওয়ার্ল্ড-কাপ, ওয়েস্ট জার্মানি, জাপান, কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি নিয়ে বহুদূরের চমকপ্রদ এক পৃথিবীর দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলেছে। ওদের কোনও পিছুটান নেই।

পাঁচদিন পর করিম সাহেবদের প্লেনে তুলে দেবার জন্য রাজমোহনরা সবাই দমদমে এলেন।

করিম সাহেব রাজমোহনের দু'হাত ধরে আন্তরিক গলায় বলেন, 'বেশি দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন একবার ঢাকার বাড়িটা দেখে যাবেন।'

রাজমোহন বলেন, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

'ক'টা দিন ভারি চমৎকার কাটল। কিন্তু একটা বড় আপশোস থেকে গেল রাজমোহন ভাই।

'কী?'

কিছুটা দূরে রাজা তহমিনা শামিম আর বুনা হেসে হেসে প্রচুর কথা বলছিল। নাতি-নাতনিকে দেখিয়ে করিম সাহেব বলেন, 'পূর্বপুরুষের বাড়িঘর ওরা ভাল করে দেখলই না। নিজের ওরিজিন সম্পর্কে ওদের কোনও টানই নেই। একেবারে রুটলেসের দল।'

করিম সাহেবের দুঃখটা বুঝতে পারছিলেন রাজমোহন। গাঢ় বিষাদ তাঁর মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে থাকে।

উত্তরের ব্যালকনি

শীর্ষেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উলটোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রং ঘন নীল। পরনে একটা খাকি রঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দুচারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাথের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনও চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রং, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ওই গাছতলায় বসে আছে। ওইখানে বসে থেকে থেকেই তার চুলে জট পাকাল,

গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে-সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের, তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ওই চোখে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধ—এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনও ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ্‌গিজ্‌ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনও পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনও তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাস মত বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট-শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাস মত বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে সোমা। এখন ও কেবল গাছ লতাপাতা, আঁকে। আর আঁকে খোঁপাসুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। তার আঁক গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিমপাতার মত পাতাওয়ালা একটি গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ওই এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ওই সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন তখন দেখবে। সময় মত স্নান খাওয়া, সময় মত সব কিছু। এই সব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনও কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কি করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ করছে ও। ভয় করলে কি চলে!

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিঙ থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ-মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ওই ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ওই একবার। তাও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে-ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এস।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম...টেলিগ্রাম...! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনও ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই

কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা জানলা খুলত না।

—চল, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিও। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিও। ও তো কোনও ক্ষতি করছে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দুবেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন স্রোত কুল কুল করে তার মাথার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাড়ার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেই সব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের

ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়র থেকে। এখন সে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানলার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মত আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকিটিক করে নড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিভ। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোনও কোনও দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনও কোনও দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে। দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মত গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা খেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা হোলার বীমের গায়ে টং টং করে ছুঁড়ে মারছে! ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দটা শোনে তুষার! শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মত ইট কাঠ পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনও শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙক্ষা জাগে—ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কিসের ছুটি। কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই

লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনও পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছা করে না। বাড়ি ফেরা—সেই এক-ঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওলাকে বলে—সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব! কোথায়? তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবন।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কি একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছব আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরনো

বাড়ির তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—এখনও নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখানে আছে কিনা সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কাঁমড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পালটেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছো! বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছো কিনা! তোমার স্বামী পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উলটে বলল—আমার ওসব নেই। এস।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাষা করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনও সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

তুমিও। কিন্তু তুষারের ভিতরের তীব্র ইচ্ছাটা এখনও অস্থির অন্ধের মত বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখ এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় কর না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতাময় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বীমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মত লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে--গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরে ব্যালকনি, উলটোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মত দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল পাগলটা হাতে বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার।

কখনও নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি, কখনও চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনও মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে। তার মন বলছে এখানে নয়।

এখানে নয় চল সমুদ্রে যাই। কিংবা চল পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কী চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কী সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারি বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না! আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেকটা রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়!

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব? রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝ না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মত বসে থাকে—দেখ না? এখনও আগের মতই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রং। চেয়ে দেখ না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনও গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনও নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঁঝকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বীমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কিসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মত লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এস তো, এস তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মত দেখে তুষার, চুমু খায় তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্য ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পার তো?

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মত উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক্-ধক্ করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কিসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মত। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার! অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চল সমুদ্রে! চল পাহাড়ে! চল ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরের খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মত সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মত অন্ধকার ক্লান্তি নামে চারধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না। এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মত বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনও বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুলগাছ তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মত পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট্-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুঁক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নিচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চল, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চল। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিঙ শিলঙও দেখা।

—অন্য কোথায়। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—না নাঃ। বলেই চমকায়। কিসের না? কেন না?

ছোকরা স্টোনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—ন্ নাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মত কী একটা ঘিরে আছে চারিদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরও জোরে...আরও জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারিদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মত একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটি লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার আছে থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের ঘরে। যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু'বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারও জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন!

—বলি, ওইরকম মহাপ্রাণ হয়ে উঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার। দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—ন্ নাঃ। চমকায়! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুল গাছটার তলায়।

—চল অরুণ। একবার আমার ঘরে চল। কোনওদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চল। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্‌ঠিন্ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছে থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসিদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে, তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকি প্যান্টের রং পালটে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনও অকৃপণ সুন্দর, সুগন্ধ বকুল ফুল ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নীচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ আমার ঘরদোর। ওই মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরও কত কী...

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো' মেয়ে!

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না?

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ। থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার।

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্য লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনও সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তুরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনও। কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনও দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ওই যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে। অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষ তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মত অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনও ফুল বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

অভয়ারণ্য

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা। থমকানো পরিবেশ। জল মেশানো দুধের মত আলো। এখানে জীবন আর মৃত্যুর লড়াই চলে অহরহ। ঝকঝকে লাল মেঝে। নিষ্প্রাণ একসার বসার আসন। বাতাসে ওষুধের গন্ধ। মাঝে মধ্যে একটা দুটো ট্রলি প্রায় নিঃশব্দে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। সাদা পোশাক পরা নার্স। মাথায় বিচিত্র টুপি। ব্লাউজের দু'কাঁধে দুটো কলার। কেউ ফর্সা। কেউ কালো। কোঁদা চেহারা। পাথরের মত মুখ। কারোর মুখে কোনও কথা নেই। প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। শুধু নির্দেশ আছে।

প্যাপ্ল করিডরের একেবারে শেষ মাথার ঘরের দরজার মাথায় আলোর অক্ষরে লেখা অপারেশন থিয়েটার। সাদা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ এক মানুষ। বুকের দিকটা অ্যাপ্রনে ঢাকা। চোখে রিমলেস চশমা। আলো পড়ে সোনার ডাঁটি ঝিকমিক করছে। একমাথা এলোমেলো চুল। এই শহরের সেরা গাইনি। হাতের আঙুলগুলো অবিশ্বাস্য রকমের লম্বা।

ধীর পায়ে তিনি এসে ঢুকলেন ভিজিটার্স রুমে।

দেয়ালের ঘড়িতে রাত দশটা। ঘরে চারজন পুরুষ তিনজন মহিলা। পুরুষদের দু'জন প্রৌঢ়। দু'জনেরই চোখে চশমা। দু'জন মহিলাও প্রৌঢ়া। তৃতীয়জন তরুণী। ছিপছিপে শরীর। ধারালো মুখ। ভীষণ ফর্সা। চোখে পাতলা সোনালি চশমা। পুরুষদের বাকি দু'জন তরুণ। সুসংস্কৃত চেহারা। একজনের পরনে জিনস। কারোর মুখেই কোনও কথা নেই। উদ্বেগ থমকে আছে।

ডাক্তারবাবু ঘরে ঢোকা মাত্রই সাতজন উঠে দাঁড়ালেন। ঘরটা যেন ছোট হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'বসুন বসুন'। তিনি নিজে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এলোমেলো চুলে একবার হাত বোলালেন। অ্যাপ্রনের পকেট থেকে সাদা একটা গ্লাভস উঁকি মারছে। ডাক্তারবাবু ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট গুঁজে ট্রাউজারের পকেট থেকে লাইটার বের করে হাতে নিলেন। সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও ধরালেন না। সাতজোড়া চোখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালেন। একটাই প্রশ্ন বাতাসে

দুলছে বিশাল এক ঘণ্টার মত, 'কি হল ডাক্তারবাবু?' তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে প্রশ্ন ভাষা হারিয়েছে।

ডাক্তারবাবু ঠোঁট থেকে সিগারেটটা বার করে নিলেন, না ধরিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনাদের একটা ডিসিশন নিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। বেশি সময় দিতে পারব না।' সাতটা 'কি' প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হল।

'কি ডিসিশন ডাক্তারবাবু?'

'হয় বাচ্চা না হয় মা যে কোনও একজনকে মারতে হবে। বাচ্চা চাইলে মাকে পাবেন না, মাকে চাইলে বাচ্চা। দু'জনকে একসঙ্গে বাঁচানো যাবে না, আই অ্যাম সরি। আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমাকে জানান উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার। আমি আমার ঘরে আছি।'

সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে লাইটার জ্বালালেন। দীর্ঘ শিখা নেচে উঠল নাকের সামনে। লাইটারের আগুনে আলোকিত মুখটা মনে হল নির্দয় কোনও মুখোশ। এক ভলক ধোঁয়া ছেড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাতজনের একজন, যিনি একটু সাহসী, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

ডাক্তারবাবু ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। মেজাজি মানুষ। মুখে অসন্তোষের ছাপ। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সার্জেন?'

প্রশ্ন করেছিলেন মেয়ের মা। মেয়ে শুয়ে আছে ঠাণ্ডা অপারেশন থিয়েটারের ধাতব টেবিলে। একটু আগেই সে ছটফট করছিল যন্ত্রণায়। নতুন একটি প্রাণ নেমে আসতে চাইছে। মেয়েটির এই প্রথম বাচ্চা হবে। ডাক্তাররা যাকে বলেন, ফার্স্ট ডেলিভারি।

মেয়ের মা ভয়ে চুপ করে রইলেন।

ডাক্তারবাবু নিজেকে সংযত করে বললেন, 'বাচ্চা যে পজিশনে আছে, অ্যাকিউটি পজিশন। এক্সরে প্লেট দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমার সামনে একটা পথই খোলা, যে-কোনও একজন। এনি ওয়ান অফ দি টু।' তিনি ধীর পায়ে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে গেলেন। আত্মবিশ্বাসী মানুষের চলার ধরন যেমন হয় আর কি! শহরের সেরা গাইনির যেমন হওয়া উচিত।

মেয়েটির নাম সুমিতা। তার স্বামীর নাম ধীমান। ধীমানের বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক ও শালাজ, সকলেই এসেছেন। সুমিতা একমাত্র মেয়ে। গুণী মেয়ে। ধীমান খুবই ভাল ছেলে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। দুটি পরিবারই সম্পন্ন। উচ্চবিত্ত। মধ্যবিত্তের ঠুনকো নোংরামি থেকে মুক্ত। ছোট পাপ নেই। বড় পাপ কিছু থাকতে পারে। আবার বড় মানুষের পাপ, পাপই নয়। সেটা তাঁদের পুণ্য। যেমন পণ্ডিতেরা শব্দপ্রয়োগে ভুল করলে বলা হয় আর্য-প্রয়োগ। এই সুবিশাল নার্সিংহোমের বাইরে দুটি গাড়ি অপেক্ষা করছে। জানলা আঁটা অন্ধকার যেন অপেক্ষা করে আছে ঘটনার পরিণতি জানার জন্যে।

ধীমান ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার। ধীমান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একটু জোর গলাতেই বলে ফেলল, 'বোগাস! আমি অন্য স্পেশ্যালিস্টের পরামর্শ নেব। প্রয়োজন হলে মেডিকেল বোর্ড বসাব।'

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই বেমানান লাগল। সুন্দর এক স্তব্ধতাকে এভাবে চমকে দেওয়া ঠিক হয়নি। উত্তেজনায় সে অসভ্যতা করে ফেলেছে। না, ব্যাপারটা শুধু একজনের জীবনমৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ধীমান নিজের মান-সম্মানকেও জড়িয়ে ফেলেছে এর সঙ্গে। ধীমান তার প্রযুক্তির ধারায় ভাবছে। সন্তানের জন্ম একটা দুর্ঘটনা বা ভাগ্য নয়। একটা টেকনোলজি। সেই টেকনোলজিতে সে কি এমন ভুল করে ফেলল, যার ফলে সুমিতার গর্ভে তারই সন্তান চলে গেল—দুরূহ কোণে! সে কি এক আনাড়ি ইঞ্জিনিয়ার! ইলেকট্রনিকসে যার এত সুনাম এই বয়সেই!

ধীমানের পিতাও এক নামি মানুষ। সেরা কলেজের সুখ্যাত প্রিনসিপ্যাল। তিনি ছেলেকে একটু তিরস্কারের গলাতেই বললেন, 'ডোন্ট বি সিলি। চিৎকার করে মাথা গরম করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ডক্টর মল্লিক একজন ইন্টারন্যাশনাল স্পেশ্যালিস্ট। তাঁকে অবিশ্বাস করা মানে তাঁকে অসভ্যের মত ইনসাল্ট করা। তাছাড়া টাইম ইজ এ ফ্যাক্টার। এটা আমেরিকা নয়, আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নই যে আধঘণ্টায় বোর্ড বসিয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা যাবে! বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় ধীমান। আপনি কি বলেন মিস্টার ব্যানার্জি!'

ব্যানার্জি হলেন ধীমানের শ্বশুর। আই. এ. এস অফিসার ছিলেন। এখন অবসর পেয়ে গেছেন। এক বেসরকারি সংস্থায় অ্যাডভাইসার হয়ে আছেন। ছেলে ব্যবসা করে বড়লোক। খানতিনেক গাড়ির মালিক। অর্থে, প্রতিপত্তিতে ধীমানদের চেয়ে অনেকটা উঁচুতে। সরকারি বড় চাকরি ও অর্থ, ক্ষমতার অহঙ্কারে তাঁর কথাবার্তা বহুকালই একটু বেঁকে গেছে। বাংলা বলেন, ইংরেজের উচ্চারণে, আর ইংরেজি বলেন, বাঙালির উচ্চারণে।

ব্যানার্জি বললেন, 'আঃ সিওর। এখানে মাথা হল একটা গ্রেট ফ্যাক্টার।'

ধীমানের শ্যালক, অরিন্দম যে তিরিশ বছর বয়সেই মিলিয়নিয়ার, সে বললে, 'অলরেডি দশ মিনিট চলে গেছে। সেকেন্ড ওপিনিয়ান যখন নেবার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই, তখন ডিসিশন একটাই, কিল দি বেবি, অ্যান্ড সেভ দি মাদার।'

ঘরের বাতাস যেন আলকাতরার মত থকথকে হয়ে গেল হঠাৎ। সিলিং ফ্যান ফিন্‌ফিন্ করে ধারালো ব্লেডের মত বাতাস ছড়াচ্ছে। আজ শহরে বেশ একটু বৃষ্টি হওয়ায় উত্তাপ পাঁচ-সাত ডিগ্রি নেমে গেছে। সকলেরই একটু শীত শীত ভাব।

ধীমান বললে, 'তা কেন? হত্যার অধিকার কে দিয়েছে আমাদের! সন্তান হল ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতকে আমরা মেরে ফেলব?'

অরিন্দম বললে, 'আমি ঠিক এই সন্দেহটাই করেছিলুম। তুমি এই কথাটাই বলবে।

তুমি তোমার অফিসের এক মারাঠি মহিলার সঙ্গে ইনভলভড, সে খবর আমাদের কাছে এসেছে। তোমার সামনে এই এক সুযোগ। সুমিতাকে সরাতে পারলে তোমার পথ পরিষ্কার।'

ধীমান জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অরিন্দমের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'নার্সিংহোম না হলে আমি এই নোংরা কথার জবাব এখুনি তোমাকে অন্যভাবে দিতুম।'

ধীমানের শ্বশুর ব্যানার্জি বললেন, 'সে আবার কি? শুনিনি তো! সামথিং ফিশি!'

অরিন্দম বললে, 'আজকাল এইটাই ফ্যাশান হয়েছে বাবা। বাঙালির পুরনো স্বভাব আবার ফিরে এসেছে। ঘরে এক বাইরে এক। ওসব তুমি বুঝবে না।'

ধীমানের বাবা বললেন, 'আলোচনাটা অবনক্সাস দিকে চলে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে ওই আলোচনা চলে না। এ-বাড়ির সঙ্গে ও-বাড়ির ফাটলটা ক্রমশই বাড়ছে। ধীমানের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগের কোনও বেস নেই। বেসলেস অ্যালিগেশান। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ধীমান কিন্তু একটু বেশিমাত্রায় বউ-কাতর। সময় সময় আমরাই তাকে স্ত্রৈণ বলি। ও বেচারা দু'তরফেই মার খাচ্ছে।'

ধীমানের মা বললেন, 'ইদানীং ওঁদের বেশ টাকার অহঙ্কার হয়েছে। আর টাকা থাকলে যা হয়, যাকে যা খুশি তাই বলা যায়।'

সুমিতার মা ছিলেন নামকরা এক স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। এখনও তাঁর চেহারাটি জাঁদরেল। গম্ভীর মুখ। গোটা পৃথিবীটাকেই তিনি মনে করেন, নিজের স্কুল। সেই মন নিয়েই বললেন, 'আমরা কেউ রামকৃষ্ণ নই। টাকা আছে তাই টাকার অহঙ্কারও আছে। আপনারা তো মেয়েটাকে একটা থার্ডক্লাস নার্সিংহোমে ফেলে রেখেছিলেন। কৃপণরা যা করে থাকে। আমরাই এখানে এনেছি। প্রশ্ন হল, আমার মেয়ের এই অবস্থার জন্যে কে দায়ী! করা দায়ী! আপনারা! নেগলেক্ট করেছেন। প্রপার চেক-আপ হয়নি। ক্রিমিনাল নেগলিজন্স। মেয়েকে আপনারা সবাই মিলে যে টর্চার করেননি তাই বা কে বলতে পারে! আমার মেয়ের যদি কিছু হয়; তাহলে আমি সোজা থানায় যাব। আপনাদের সব কটাকে আমি জেল খাটাব।'

ধীমানের মা হঠাৎ বলে ফেললেন, 'আ মোলো। বসে বসে তিলকে তাল করছে দেখ!'

ধীমানের মা তেমন আধুনিকা নন। জেলা শহরের মেয়ে। সহজ, সরল, আন্তরিক। মনে তেমন প্যাঁচও নেই। আধুনিক জগতের খবরও তেমন রাখেন না। সোজাসুজি কথা বলার সময় গ্রাম্য শব্দ বেরিয়ে আসে।

সুমিতার মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই তো এ-বাড়ির কালচার! বস্তির ভাষায় সব কথা বলে।'

সুমিতার বাবা বললেন, 'এঁদের সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল।

মেয়েটাকে আমরা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি।'

ধীমান একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনছে সব। সত্য কিভাবে বিকৃত হয়। সুমিতার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, তার মা, বাবার কি সম্পর্ক, তা একমাত্র সুমিতাই জানে। সে কিন্তু এই মুহূর্তে উঠে এসে প্রতিবাদ করতে পারবে না, কারণ সে অসহায়! ধীমান ভেবে পেল না, কেন সে হঠাৎ অমন একটা কথা বলে ফেলল! সত্যিই কি সে চায় না সুমিতা বাঁচুক। অবশ্যই চায়। আবার এটাও ভাবতে পারছে না, নিষ্পাপ একটা প্রাণকে সার্জেনের শিক্ষিত চিমটে হত্যা করে ফেলছে! কে বলতে পারে কালে সেই প্রাণটি এক মহাপ্রাণ হয়ে উঠত না! চৈতন্য, বুদ্ধ, কি যীশু, কি আইনস্টাইন! আবার প্রবাদেই আছে, এক স্ত্রী মারা গেলে, আর এক স্ত্রী পেতে কতক্ষণ! স্ত্রী পুরনো হয়ে আকর্ষণ হারায়। জীবন্ত ফার্নিচারের মত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলে। সন্তান এক অসীম সম্ভাবনা। চারা গাছের মত। ভবিষ্যতের মত। যত বড় হতে থাকে, ততই কৌতূহল, কি হয়, কি হয়। সেই আশাতেই তো মানুষ বাবা হয়।

অরিন্দম বললে, 'মেয়ে আমাদের সিদ্ধান্তও আমাদের। কিল দি বেবি, সেভ দি মাদার।'

ধীমানের বাবা বললেন, 'সে আবার কী? মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর, সব মেয়েই শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি। তার টাইটেল পর্যন্ত পালটে যায়। এইটাই তো হিন্দু আইন। আপনাদের সিদ্ধান্ত নেবার তো কোনও অধিকার নেই। সিদ্ধান্ত নেবে স্বামী। নেবে ধীমান।'

মিস্টার ব্যানার্জি, সারাটা চাকরিজীবন যিনি কানের কাছে শুনে এসেছেন, ব্যানার্জি সায়েব আর স্যার স্যার সম্বোধন, তিনি ফুঁসে উঠলেন, 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টটা তাহলে আমাকে একবার দেখতে হচ্ছে। মেয়ে শ্বশুরের সম্পত্তি, না বাপের সম্পত্তি! মেয়ে কি ছাগল? আমরা খাইয়ে দাইয়ে শিক্ষিতা করে কষাই শ্বশুরের হাতে তুলে দেব!'

ধীমানের বাবা বললেন, 'আপনার সরকারি চাল ছাড়ুন। আমি মনুসংহিতা খুলে দেখিয়ে দোব মেয়ে কার! আর আমাকে কষাই বললেন তো? আপনি কী? সারা জীবন পরের পয়সায় মদ গিললেন, ঘুষের টাকায় বাড়ি হাঁকালেন। আপনারা ক'দিন এসে মেয়ের খবর নিয়েছেন?'

ব্যানার্জি বললেন, 'আ গেলো! লোকটা বড় অসভ্য তো! আনসিভিলাইজড, ব্রুট।'

অরিন্দম বললে, 'এর জবাব আমরা দোব। একটা মানহানির মামলা ঠুকে দিলেই ঠাণ্ডা।'

ধীমানের মা বললেন, 'আমি, আ মোলো বলেছিলুম, আপনারা কিন্তু আ গেলো, বললেন!'

সুমিতার মা বললেন, 'আ মোলোর চেয়ে আ গেলো অনেক বেটার।'

ছিপছিপে, বুদ্ধিমতী মেয়েটি হল অরিন্দমের স্ত্রী। সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, 'আপনাদের সকলেরই দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

সুমিতার মা, মেয়েটির শাশুড়ি অমনি বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তার মানে? যত বড় মুখ না, তত বড় কথা। মুখ সামলে বউ-মা।'

অরিন্দম লাফিয়ে উঠল, 'কেন মুখ সামলে কেন? ওর কি নিজস্ব কোনও ওপিনিয়ান থাকতে নেই। তুমি কি ভাব ও তোমার বাড়ির ঝি-চাকর।'

সুমিতার মা অমনি স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে আমি কি বলেছিলুম, বউয়ের ভেড়া হয়ে গেছে। বড়লোক শ্বশুর হলে এইরকমই হয়। বাপ-মা পর হয়ে যায়। তখন বিশ্বাস করিনি। আজ এতগুলো লোকের সামনে এই অপমান সহ্য কর। আমরা না কি পাগল! মেয়ের বয়সী মেয়ের ঔদ্ধত্যটা একবার দেখ। এরা হল কুকুরের জাত। লাই দিলেই মাথায় চড়ে।'

ব্যানার্জি বললেন, 'আমার বাবা, মা-ও তোমার সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলতেন।'

সুমিতার মা বললেন, 'ও তাই না কি? তাই আজ ছেলের বউকে দিয়ে সকলের সামনে অপমান করাচ্ছ। দেখব, দেখব, তোমার ছেলের বউ শেষ পর্যন্ত তোমাকে কেমন আদর করে!'

অরিন্দমের স্ত্রী বললে, 'আপনি তো আজকাল মা খুব কথামৃত পড়েন। সেখানে পড়েছেন নিশ্চয়, রজ্জুতে সর্পভ্রম। আসলে আমি একটা নিরীহ দড়ি। আপনি ভুল করে আমাকে বিষধর সাপ ভাবছেন।'

ব্যানার্জি বললেন, 'পড়লে কি হবে! মনের কোনও উন্নতি নেই। সেও ওই ঠাকুরেরই কথা—পাঁজিতে বিশ আড়া জলের কথা লেখা আছে, নিঙড়োলে এক ফোঁটাও বেরোবে না।

ধীমান বললে, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে।'

তরুণী বললে, 'সিদ্ধান্ত তো হয়েই গেছে। গাছ আগে না ফল আগে! গাছ বাঁচলে ফলের কি অভাব! তা ছাড়া একালের হিসেবিরা তো পরিবার ছোট রাখার জন্যে হামেশাই অ্যাবরশান করায়। হাসতে হাসতে। বিবেকের কোনও প্রশ্নই শোনে না। স্বার্থের অপর নাম মানুষ। আপনি অত ভাবছেন কেন? এ তো অকারণে নয়, মহা এক কারণে! অকারণে একটু সুখে থাকার জন্যেই যখন আকচার হচ্ছে, কারণে হতে আপত্তি কি? আপনি কি দিদিকে ভালবাসেন না?

ধীমান স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ভালবাসা এমন এক শব্দ যে ভালবাসি বললেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, রজনীগন্ধার পোকার মত। ধীমান বুঝতে পারছে, কিছু বলতে

গেলেই গলাটা ধরা ধরা শোনাবে। এইসব অবিশ্বাসী কুচুটে লোকগুলোর সামনে সে তার আবেগ প্রকাশ করতে চায় না।

তরুণী বললে, 'যান, গিয়ে বলে আসুন।'

ধীমান সেই দরজাটার দিকে এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। বাইরে থকথকে রাত। সামান্য বাতাসও নেই। প্রকৃতি যেন মহাযোগীর মত কুম্ভক করে বাসে আছে। দরজার মাথায় লাল আলোর সঙ্কেত। ধীমানের অনেকটা পেছনে ছটি চরিত্র। একটু ছাড়া ছাড়া। সকলেই অল্পবিস্তর আহত। তাঁরা হাঁটছেন থমকে থমকে, পায়ে পায়ে। ধীমান পৌঁছবার আগেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। একটি শিশুর তীব্র চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সাদা সার্জেন। এক ভলক ঠাণ্ডা ধীমানের মুখে এসে লাগল।

পেছন থেকে ছুটে এল এক নারীকণ্ঠ, 'যাঃ মেয়েটাকে মেরে ফেললে।'

কান্নার শব্দে ধীমানের ভেতরটা নেচে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই ভয়ে তার চলা বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে। ঈশ্বরের মুখ না কোনও জল্লাদের। দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, দীর্ঘদেহী সার্জেন। সাদা অ্যাপ্রন নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। বুকের কাছে পড়ে আছে চেন-ঝোলা চশমা। মাথার ওপর লাল আলো। হঠাৎ কোথা থেকে একচুমুক বাতাস এসে তাঁর চুলে দোল খেয়ে গেল। থমকে গেছে ধীমান। ধীমানের পেছনে ছটি চরিত্র।

ডাক্তারবাবু ডান হাত তুলে বললেন, 'ভয় বললেন, 'ভয় নেই। দু'জনেই সেফ। অসাধ্য সাধন করা গেছে। তবে!' তিনি থেমে গেলেন। ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

সাতটি কণ্ঠের একসঙ্গে একই প্রশ্ন—'তবে?'

ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে সামনে লাইটার ধরলেন। বাঁ হাতের আড়ালে শিখা জ্বলে উঠল। এক ভলক ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার বললেন, 'তবে আর কোনও বাচ্চা হবে না। ওই একটিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

পেছন থেকে প্রশ্ন, 'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে।'

'কত পাউন্ড?'

'সিক্স।'

'সুন্দর?'

'সুন্দর।'

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে আসছে একটা ট্রলি। সাদা চাদরে ঢাকা। সবাই একপাশে সরে গেলেন। সুমিতা তার বেডে ফিরে চলেছে। অ্যানেসথেসিয়া

এখনও জড়িয়ে আছে। ধীমানের মনে হল সুমিতার ঠোঁটের কোণে লেগে আছে এক ঝিলিক হাসি। পেছন পেছন চলেছেন সিস্টার। তাঁর দুহাতে সাদা তোয়ালে জড়ানো এতটুকু একটা মানুষ। লাল টকটকে। ছোট্ট এতটুকু একটা বাতাবি লেবুর মত মুখ। মিছিলটা করিডরের ও-প্রান্তে হারিয়ে গেল। যেন কোনও চার্চের শোভাযাত্রা। ফাদার বয়ে নিয়ে চলেছেন পবিত্র ক্রশ।

ডাক্তারবাবু পাশের দাঁড়ানো অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কাল সকালে।'

সাতটি চরিত্র এক হয়ে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ ব্যানার্জী থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা এরকম করলুম কেন?'

ধীমানের বাবা বললেন, 'স্নেহে।'

ধীমান বললে, 'ভোলা যাবে!'

অরিন্দম বললে, 'অবশ্যই যাবে। সবাই জানে জঙ্গল খুবই সুন্দর, কিন্তু বাঘ, ভাল্লুকও কিছু থাকে। মানুষ হল সেই অভয়ারণ্য। আমাদের কথাই হল, ধারালো নখ আর দাঁত।'

দুই বেয়ানে হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। দুধসাদা আলো।

সবাই যে যার গাড়িতে উঠে বসার আগে বললেন, 'মিষ্টিমুখ পাওনা রইল।'

দুটো গাড়ি চলে গেল দু'দিকে বাঁক নিয়ে। দু'সার গাছের মাঝে পড়ে রইল নির্জন পথ।

জরিপ

দেবেশ রায়

কলকাতা শহরে এই জলসত্রের ব্যাপারটা ভারি মজার। ট্রাম-বাস-ট্রাক-ঠেলা-রিকশায় ট্রাফিক জ্যামের মোড়ে চারচালা একটা চৌখোপি, 'কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি।' ঘাড়টা নামিয়ে দুই অঞ্জুলি পেতে জলপানের সময়টুকুতে এই সব কলকাতা, ট্রাফিক, মিথ্যা হয়ে যায়, তখন করপুটে জলধারার আড়ালে পুরাণ বা অন্তত মধ্যযুগ—জলদান আর জলপানের সামাজিক ক্রিয়া। সুনীল জল খাওয়ার জন্য গিয়ে ঘাড় হেঁট করল। দুই হাত জড়ো করল ঠোঁটে। ওপর থেকে জলধারা নেমে এল। হাতের গোড়া দিয়ে জল ঠোঁটের ভিতরে, মুখের ভিতরে, গলার ভিতরে চলে যায়। আর কিছু জল হাত বেয়ে, কনুই বেয়ে মাটিতে ঝরে যায়—হিন্দুদের পিতৃতর্পণে এ-রকম মুদ্রা আছে।

মাত্র কয়েক ঢোঁক জল খেয়েছে কি খায়নি হঠাৎ পেছন থেকে কে সুনীলের জামার কলারটা চেপে ধরে হেঁচকা টান দিল। আচমকা টানে জল ছিটিয়ে চোখে মুখে লাগল। গলার কলার গলায় কামড়ে বসল। চোখ খোলবার আগেই প্রবল একটি ঘুসি দ্রু—ম্ করে সুনীলের বাঁ-চোয়ালে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সুনীলের মনে হল, লোকটি কি ন্যাটা, আর, এই আবার আজ শুরু হল। এ সব ঘুসোঘুসির নিয়ম যেন সুনীলের খুব ভাল জানা—সুনীলের এমনই দুহাত ঝুলিয়ে রাখা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি। যেন, তার জানাই, অঙ্কের নিয়মে এরপর তার মার দেয়ার আর লোকটার দু-হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আসবে, প্রায় যেন হিন্দি ফিল্মের মারামারির নিয়মে। সারা মুখেচোখে জলের ছিটে লেগেছিল বলেই হোক আর লোকটা পরের ঘুসিটা কত জোরে মারবে সেটার আন্দাজ পাচ্ছে না বলেই হোক—সুনীল চোখ বুজে ছিল।

প্রথম ঘুসি আর দ্বিতীয় ঘুসির মাঝখানের ফাঁকটা তো সবসময় আওয়াজ দিয়েই ভরাতে হয়। একটা গালাগাল হতে পারে, শা—আ—আ—লা। এই শব্দের ঝোঁক না পেলে ঘুসি ঠিকমত পড়ে না। আবার অনেক সময় পর পর ঘুসি চলতে থাকে আর ঘুসিগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে মারার কারণটা বলা হতে থাকে। কিন্তু চোখ বুজে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুনীল বুঝতে পারে দ্বিতীয় ঘুসির সময়টা পার হয়ে

যাচ্ছে। তাহলে, এবার কি লোকটা প্রথম ঘুসি মেরেই ভুলটা বুঝতে পেরেছে। সুনীল দুই চোখ খুলল—পিট পিট করে। অনেকসময় এই খোলার সময়টিতেই দ্বিতীয় ঘুসিটা এসে পড়ে একেবারে চোখের ওপর। তাতে চোখে খুব ব্যথা হয়। পিটপিটিয়ে সে দেখে লোকটা মুখ হাঁ আর চোখ গোল করে ঘাড়টা উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে, ফেলফেলিয়ে, দুই হাত দু পাশে ঝোলানো। সুনীলকে চোখ খুলতে দেখেই সে দ্রুত চোখ পিটপিটায়, সে বোঝে এবার তার চোখ বোজার পালা। সুনীল ডান হাতটা তুলতেই সে সামান্য একটু চমকায় বা শিউরায় কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ে না, যেন হিন্দি ফিল্মেরই মারামারির নিয়মে। সুনীল হাতটা তুলেছিল তার মুখ থেকে জল মুছতে। জামাটা থেকে জল ঝেড়ে ফেলে সে কলারটাও ঠিক করে। তাদের ঘিরে ভিড় ক্রমেই জমে উঠছে। সুনীলের পেছনে জলসত্রের কাঠের দেয়াল। এই ভিড়, এই লোকটি সমস্ত কিছুই সুনীলের একটা ভূমিকা সাব্যস্ত করে রেখেছে—এখন তাকে ঘুসিটা মারতে হবে, একটা নয়, অন্তত দুটো-তিনটে।

তার জন্য নির্ধারিত ভূমিকাটি সে যে গ্রহণ করবে না সেটা বোঝাতে, সুনীলকে মুখের জল মুছতে হয়, জামার জল ঝাড়তে হয়, কলার ঠিক করতে হয়, তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে হয়। আর এ সব কিছুকেই লোকজন ভাবে, তার প্রস্তুতি। যত দীর্ঘ প্রস্তুতি, লোকের আশাও তত বাড়ে। পাশে যদি বাস এসে দাঁড়াত, সুনীল লাফিয়ে উঠে চলে যেত। এখনও পারে, সামনের মোড়টাতে ছুটে গিয়ে বাস ধরতে। কিন্তু এতটা রাস্তা ছুটে গিয়ে বাস ধরলে সবাই ভাববে সে দলবল নিয়ে আসতে যাচ্ছে। ভিড়টা তাহলে আরও জমে থাকবে। তেমন ভাবে সে যেতে চায় না। সে এটা নিশ্চিত জানিয়ে চলে যেতে চায় যে তার কোনও ভূমিকা নেই। তাছাড়া এ-রকম ছোটার অন্য বিপদ আছে। লোকটার যদি দলবল থাকে, তারা যদি আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে, তাহলে তাদের ভিতর কেউ সুনীলের মাথায় বা পায়ে ডাণ্ডা মেরে তাকে ফেলে দিতে পারে—যাতে সুনীল তার দলবলের কাছে পৌঁছতে না পারে।

এতটা স-য় পেরিয়ে গেলে সামনের লোকটি প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'দাদা।' সুনীল উত্তর দেয় না। 'দাদা' বলে লোকটি সুনীলের দু-হাত জড়িয়ে ধরে, 'আমি আপনাকে সেই মিনিবাসের প্রোপ্রাইটার ভেবেছিলাম, সেই যে মানিকতলার, খুব রোয়াব দেখিয়েছিল তো, দাদা।'

সুনীল লোকটার হাত ছাড়িয়ে এবার ভিড়টা ঠেলে বেরিয়ে যেতে থাকে। 'দাদা', পেছন থেকে লোকটার মিনতি শুনতে পায়, 'কিছু মনে করবেন না দাদা, ভুল হয়ে গেল।' তাহলে, কলকাতা শহরে আজ অন্তত একটা লোককে তার কৃতকর্মের জন্য সারাদিন অনুতাপে রাখতে পারলাম, ভেবে, কয়েক পা এগিয়ে, সুনীল যখন ভিড়টার মাঝখানে তখন ভিড়ের ভিতর থেকে রব উঠল, 'মানে, কী হল, মানে'—যেন ভিড়টা আবার সুনীলকে ভিতরে ঠেলে দেবে। কিছু লোক থাকেই যারা সব ব্যাপারই আগে বুঝে নেয়। 'আবার কী হবে? এই ভদ্রলোক ওনাকে আর একজন ভেবে

ঘুসি মারলেন। এখন দাদা-দাদা করছেন।' 'মানে? একটা লোককে আপনি খামোখা ঘুসি মারলেন?' ভিড়টা ওই-লোকটাকে ঘিরে ধরতে থাকে। ফলে সুনীল বেরিয়ে আসার ফাঁক পায়। সে পেছনে ফেরে না। কিন্তু পেছন থেকে শুনতে পায়, 'আরে, ওই ভদ্রলোক বাস থেকে নেমেছেন আর এই লোকটা গিয়ে দুমদাম করে ঘুসি মারতে শুরু করেছে।' 'কে বলল মশাই উনি বাস থেকে নেমেছেন, উনি তো এই ফুট দিয়ে হাঁটছিলেন' 'আরে রাখুন মশাই ফুট। মানেটা কি? আপনি একটা লোককে কথা নেই বার্তা নেই দুম করে ঘুসি মারলেন? এ কি মগের মুলুক মশাই?' 'মগের মুলুক কি মশাই? মানুষের ভুল হয় না? বলছি তো, সরি'। মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে সুনীল ভাবে, লোকটা তার কাজের পক্ষে যুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, সে আর অনুতাপ করবে না। 'সরি? আপনাকে দুটো দিয়ে সরি বলি?' 'আপনারা অত রোয়াব নিচ্ছেন কেন মশাই, ও-ভদ্রলোক তো কিছু বললেন না, আমাদের মিউচুয়াল হয়ে গেছে, এর ভিতর আপনারা নাক গলাচ্ছেন কেন', 'আপনার নাক ভাঙব বলে, আপনি ভদ্রলোককে মারলেন কেন', 'বেশ করেছি, যা করতে পারেন করুন গে।' ট্রাফিক সিগন্যাল বদলে যায় আর সেই ভিড় আর সুনীলের মাঝখান দিয়ে হু হু করে ট্রাফিক চলে যেতে থাকে।

সুনীল বাসস্টপে এসে দাঁড়ায়। পিছনে ওই ভিড় আর এই বাসস্টপের মাঝখানে মাত্র একটা রাস্তা—কোনাকুনি। অথচ ওই ভিড় থেকে সুনীল কতদূরেই সরে আসতে পারে। এখন ওখানে গিয়ে সুনীল যদি বলে, আমিই সে লোক, ওই ভিড়ের মানুষরা সেকথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যে-লোকটি তাকে ঘুসি মারল, সে-ও কি এখন তাকে চিনতে পারবে, ঠিক চেনা যদি না-ও চেনে, অন্তত আরেকবার ভুল-চিনতে পারবে?

সুনীল একটা এইট-বি ছেড়ে দিল। দুই-দরজা আর সামনে পেছনে লোক ঝুলিয়ে টিন পিটিয়ে, ধরম্তলা হাঁকতে-হাঁকতে প্রাইভেট বাস কিছু এল। গেল। নীরব একটা এগার নম্বর গম্ভীর চলে গেল। সুনীল কোনওটাতেই উঠল না। সে যেন জানে এত ভিড়ের বাসে উঠলে তাকে পকেটমার বলে কেউ চেঁচাবে। আজ। আজ যখন একবার তাকে ভুল-চেনা শুরু হয়েছে, তখন, সারাদিন এই ভুল চেনাই চলতে থাকবে। আর এই এক-একবারের ভুল-চেনা তো প্রতিবারই সুনীলের নতুন-নতুন পরিচয় বের করবে। সুনীলের মত মিনিবাসের মালিক, বা পকেটমার সুনীলের মত, হতে পারে। আর যতবারই এই নতুন-নতুন পরিচয় সুনীল জানতে পারবে ততবারই সে তার নিজের আসল পরিচয়টা থেকে সরে আসবে যে সে, কি বলে, চাকরি করে, সিটি-প্ল্যানিঙের টেকনিক্যাল স্টাফ, এখুনি যদি কেউ জানে সে সি-এম-ডি-এতে চাকরি করে, তাহলে...। রাস্তার উলটোদিকের দুই ফুটেই লোহার রেলিঙে লেখা সি-এম-ডি-এ। এই রাস্তার মোড়টা নিশ্চয়ই বড় করা হয়েছে—এত কাজের খবর কে রাখে।

সুনীলের সামনে দিয়ে বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি-লরি চলে যায়। পাছে কেউ তাকে বাসে বা ট্রামে পকেটমার ভেবে বসে সেই আশঙ্কায় সুনীল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই গাড়ির মিছিলই দেখে যায়। সব গাড়িরই ড্রাইভারের দরজায় 'জাতি এগিয়ে চলেছে', ইংরেজিতে অথবা বাংলায়, ট্যাক্সির দরজায়, খুব ছোট হরফে, এত দূর থেকে পড়া যায় না, কিন্তু জানা হয়ে থাকে এতদিনে, একটা প্রাইভেট গাড়িতে পেছনের কাচে দুটো ফোলা লাল ঠোঁটের মাঝখানে লেখা 'ডোন্ট কিস', সানগ্লাস লাগানো কমলা আর নীল রঙের 'সুন্দরী' 'জরুরি অবস্থার দুটি প্রাপ্তি, আর্থিক অবস্থার উত্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি', কবিতার ছন্দে নাচাতে-নাচাতে দুলে যায় বিপরীত দিকের ডবলডেকারের দ্বিতলজোড়া। জন্মনিয়ন্ত্রণটাকে শুধু প্রকট রেখে, তার একতলা ঢেকে, বেরিয়ে গেলেই 'যাদু', দূরদৃষ্টি আর অনুশাসনের, তার পরমুহূর্তে এই চলৎশব্দ থেমে যায়, থেমে থাকে আর সমকোণী রাস্তাটা এতক্ষণের অবরোধের আক্রোশে ফেটে যায়। কলকাতার এই এক মজা তো, মুহূর্তেই স্থির আবার মুহূর্তেই গতি! দেখতে হয় হে, দেখতে হয়, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে হয়, দেখতে দেখতে দাঁড়াতে হয়! সুনীল নিজেকে বলতে পারে।

আবার, পথের বাধা খুলে যায়। যতবার খোলে ততবারই কোথা থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, স্পষ্ট শোনা যায়, ফোঁ—স্ শব্দে সেই শ্বাসপতন, হয়তো গিয়ারের, হয়তো চাকার আচমকা ঘর্ষণের, আর তারপর এতক্ষণের ঠেকানো ছোটো, ছোট গাড়ির দরজায়-দরজায়, ট্রাকের গায়ে গায়ে, বাসের পেছনে-পাশে ট্রামের সারা শরীরে বিরাট-বিরাট সাইজের সব অক্ষর লাফিয়ে-লাফিয়ে, নেচে-নেচে, ছুটে-ছুটে যায়। সুনীল সব পড়তে পারে না, সব পড়ে উঠতে পারে না, কিন্তু বোঝে, বুঝে যায়, এতদিনে বোঝা হয়ে গেছে, রাস্তা জুড়ে কবিতা নাচছে, ছড়া নাচছে, কথা নাচছে, কলকাতার রাস্তার শব্দরা এখন নেচেই চলে, কারণ...

কারণ, সি-এম-ডি-এ কলকাতা খুঁড়ে রেখেছে।

জল খেতে গিয়ে সেই লোকটির ঘুসি খেয়েই সুনীল বুঝতে পেরেছিল, আবার, আবারও তাকে কেউ আর-কেউ বলে ভুল করল। আর তার পর থেকেই সুনীল একটু-একটু করে আর-কেউ হয়ে উঠতে পারছে। সুনীলের এই একটু-একটু করে আর-কেউ হয়ে ওঠার সঙ্গে সুনীলের চারপাশ, আপাতত এই কলকাতা একটু একটু করে আর-একটা-কিছুর মত হয়ে উঠছে। উঠবে। কিন্তু সুনীলকে তো শেয়ালদায় যেতে হবে, উল্টোডাঙ্গা-দমদম থেকে বেলঘরিয়া পর্যন্ত সার্ভে আছে। ঠিক এই সময় একটা ডাক শোনা গেল, 'সুনীল'। সুনীল ফিরে তাকাল না। ফলে মুহূর্তেই তার মনে হতে লাগল, কেউ ডাকেনি, 'সুনীল' বলে কেউ ডাকেনি। তখনই আবার ডাক শোনা গেল, 'সুনীল'। এবার অনেক কাছে, পেছনে বা পাশে। সুনীল শক্ত হল। আবার তাকে কেউ ভুল ডাকছে। 'এই সুনীল' বলে পিঠে চড়। একটুও না হেসে সুনীল তার পাথরের মত মুখটা ঘুরিয়ে দেখে, অমরেশ, তারপর মুখে চেনাভাব

ফিরিয়ে আনতে যে-সময় যায়, সেই সময়টুকুতে অমরেশ বলে বসে, 'আরে বানচোত্ হাঁ করে আছিস কেন? কোথায় যাচ্ছিস?' 'অফিসের কাজে। দাঁড়া, এই বাসটা ধরব।' 'আরে চ, চ, ওই-দোকানে বসে এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে তারপর যাবি।' তার মানে, অমরেশ সুনীলকে আবার সুনীলে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু সুনীলের তখন একটু নেশা লেগেছে, যেন অমরেশের এ-রকম সুরে 'সুনীল' বলে ডাকার কোনও কথা ছিল না। 'না রে, আমার দেরি হয়ে গেছে' বাসটা এসে দাঁড়াতে সুনীল এগিয়ে যেতে-যেতে বলে। 'সন্ধ্যায় আসছিস তো'? পেছনে অমরেশের প্রশ্নের জবাবে সুনীল একটি হাত তুলে দেয়—সেই হাতটাকেই নামিয়ে হ্যান্ডেল খোঁজে, হ্যান্ডেল পেয়ে গেলে পাদানিতে একটু পা-রখার জায়গা খোঁজে—অনেক পায়ের ভিতর হাতড়ে-হাতড়ে একটুখানি জায়গা পেয়ে যেতেই বাস একটা প্রবল ধাক্কায় ছেড়ে দেয়—এই বাসটায় হাত-পা ছোঁয়ানোর একটু জায়গা পেলেই যেন সুনীল সেই অরা-একটা-কেউ হয়ে থাকতে পারবে, কলকাতাও আর-একটা-কিছু হয়ে উঠতে পারবে। সুনীলকে মুখটা বাইরে বের করে রাখতে হয়েছিল, বাসের সীমার ভিতরে নেবার জায়গা ছিল না, পা রাখার চাইতে মাথা রাখতে মানুষের বেশি জায়গা লাগে নিশ্চয়ই। হাসপাতালের বাউন্ডারি দেয়ালের মাঝখানটা জুড়ে কালো রেখার মোটা ধারা বয়েই চলেছে। দেয়াললিখন মোছা হয়েছে। 'কলকাতাকে পরিষ্কার রাখুন।' 'আপনার শহর পরিষ্কার থাকলে আপনারই গৌরব।' 'আসুন, আমরা কলকাতাকে সুন্দর করি।' এখন আর লেখার দরকার হয় না। সুনীল মাথায় বাতাসের ঝাপট, আর হাতের ওপর অনেক লোকের শরীরের ওজন নিতে-নিতে মাথাটা বাসের বাইরে রেখে পড়ে যেতে পারে।

সুনীল শেয়ালদায় নেমে যায়। নর্থ স্টেশনের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নতুন বিল্ডিংটায় মেইন গেট দিয়ে সবাইকে ঢুকতে হয়। 'সব ঋতুতেই আপনার চামড়া বাঁচান।' টিকিট ঘরের দিকে এগোতে-এগোতেই সুনীল ভাবে, আজ ডুব মারলেই হয়। টিকিট ঘরের কাউন্টারে পয়সা দিতে নিতে সুনীল বিরক্ত হয়, কখন ট্রেনে চাপবে, নামবে, তারপর শুরু হবে, টিকিট আর চেঞ্জটা পকেটে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সুনীল ভাবে, সার্ভে নাকি কী! কিন্তু সুনীলের কেমন আশা থাকে, একটা জলজ্যান্ত ঘুসিই যখন চোয়ালে পড়েছে তখন কি আজ আর-কোনও ঘটনাই না-ঘটে থাকতে পারে! এত বড় স্টেশন, গিজগিজ লোক সিরসির করে বেরিয়ে আসছে, ভিতরে ঢুকছে—এর ভিতরে একজনও কি সুনীলকে আর-কেউ ভেবে নিয়ে একবার ডাকতে পারে না। 'নিয়মানুবার্তিতা শুধু রেলে নয়, আপনার জন্যও। মনে রাখবেন অন্যের নামে ট্রেনে ভ্রমণ করা আইনত অপরাধ।' 'যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা শুধু অশোভন নয়, আইনত অপরাধ।'

সুনীল রেগে যায়। সে কি বুড়ো খোকা, যে, তাকে কখনও আদুরে গলায়, কখনও ধমকে, কখনও ভয় দেখিয়ে শেখানো হবে আর জানানো হবে। জানানো হবে মানে

করানো হবে। যেন কোথাও কোনও গার্জেন আছে! আসলে সুনীল এই ট্রেনটার ওপরই চটে ছিল। ট্রেনটা তাকে তার কাজের জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে তাকে সার্ভে করতে হবে। একটা কামরায় উঠে পড়ে বসে, বাইরে তাকাতেই সুনীল দেখতে পায় 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। ভালবাসার ব্লোহট্ নাটক।' দেখে সুনীল যে হেসে ফেলে তাতেই সে খানিকটা স্বাভাবিক হতে পারে। যাক, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তাহলে একটা কিছু আছে। একটা সিগারেট ধরায়। 'কথা কম, কাজ বেশি।'

সুনীল স্টেশনে নেমে রেললাইন ধরে এগোতে থাকে। উল্টোডাঙ্গা থেকে আগরপাড়া পর্যন্ত রেললাইনের দুপাশে রেলের জায়গাতে ঝুপড়িবস্তির লাইন। কিছু সাবেকি। কিছু হালের। আসলে জায়গাটা রেলের। লাইনের দুপাশে এ-রকম জায়গা রাখতে হয়। সেখান থেকে দরকারে মাটি কেটে রেলের বাঁধ মেরামত চলে। জায়গাটা জলা ও নিচু। এই জায়গাটিতেই হোগলা-টিন-প্লাইউড, ত্রিপল-পিচবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে ঝুপড়ি তুলে টানা বস্তির লাইন গড়ে উঠেছে। রেলের কয়লাপোড়া ছাইয়ে কোনও-কোনও জায়গা উঁচু। বেশির ভাগই চারপাশে অতি নোংরা জলের মাঝখানে একটু উঁচু মত ডাঙা মাত্র। কলকাতার যে-নতুন সম্প্রসারণ পুর্বদিকে ঘটছে—উপনগরী, স্যাটেলাইট টাউনশিপ, দি আউটারসিটি—সেই সম্প্রসারণ ঠেকে যেতে পারে ঐই টানা বস্তিগুলো সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা না করলে। এই জায়গাটাকে কিছু করা যাবে না—কারণ রেল এই জায়গাটা ছাড়বে না। ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে বা পরে যে-শহর গড়ে উঠবে তার প্ল্যান ছকাই যাবে না যদি রেল লাইন ও সেই প্রস্তাবিত নতুন শহরের মাঝখানে এ-রকম একটা বস্তির টানা লাইন থাকে, পচা খাল বা মজা নদীর মত। সুনীলকে তার প্রাথমিক সার্ভেতে যেতে হচ্ছে।

রেললাইন ধরে এগিয়ে আন্দাজমত একটি জায়গায় সুনীল ঢাল বেয়ে নিচে নামে। কয়লাপোড়া ছাই ছিল, তাতে পা পড়তেই হড়কে যায়। কিন্তু পড়ে না। বাঁ পায়ের জুতোটা অনেকখানি গেড়ে যায়। পা-টা তুলে একটু ডাইনে সরে, একটু কাত হয়ে সুনীল নামতে থাকে। তাকে যেন অনেকটা নামতে হচ্ছে—এত সাবধানে, প্রায় পা টিপে-টিপে তাকে নামতে হয়। নামতে-নামতে দেখে, নেমে কোথাও নামার জায়গা নেই, নেমেই যেতে হবে। ঢালটা যেখানে জলে মিশেছে সেখানে তাকে বাধ্যতোই দাঁড়াতে হয়। একটুখানি জল—পেরলেই এক ঝাঁক বস্তি। আশেপাশে তাকিয়ে সুনীল বোঝে ওই জলটা পেরিয়েই যাতায়াত চলে, জলে নামার ও জল থেকে ওঠার জায়গাটা ঘাস-ওঠা। জলের ঠিক ওপারেই দুটো বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ছিল—তারা সুনীলের দিকে ফিরে তাকায় না। বাঁ পা উচুতে আর ডান পা নিচুতে রেখে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে সুনীল রেললাইন বরাবর হাঁটে। একটা কোথাও থেকে কাজ শুরু করতে হবে কিন্তু ঢোকে কোথা দিয়ে। আর

একজায়গায় ঢুকলেই তো হবে না, এ তো সবই দ্বীপের মত। এই এত নিচুতে নেমেও সুনীল ঝুপড়ির চাল দেখতে পাচ্ছে।

সুনীল পকেট থেকে প্রস্তাবিত উপনগরীর একটা প্ল্যান বের করে। মাত্র কয়েকটি আঁকাবাঁকা রেখা ছড়ানো, যাতে শুধু বিস্তার বোঝা যায়। ভিতরের শাদা অংশটায় নীল ছোপ আছে কোথাও কোথাও। ম্যাপে তো জল বোঝাতে নীলই দিতে হয়। কিন্তু এই জলের রঙ সবুজ। আর কালো।

সুনীল একটা শুকনো জায়গা পেয়ে যায়। কয়লার ছাই দিয়ে উঁচু করা। পা দিতেই নরম ঠেকে। দেবে যাবে না কি দেখতে সে ডান পা-টায় চাপ দিতে থাকে। শক্ত বুঝে হাঁটতে শুরু করে। বেশ খচমচ আওয়াজ তুলে সুনীল পেরিয়ে যায়।

পেরিয়ে কোথাও যাওয়ার ছিল না—একটি ঝুপড়ির ভিতর ঢুকতে হয়। ঝুপড়িটার মাথা ছাপিয়ে সুনীল দাঁড়িয়ে থাকে—বিজ্ঞাপনের ছবিরা যেমন নির্দিষ্ট মিলের তৈরি স্যুট পরে শহরের মাথা ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুনীল দেখে তার সামনে একটি মানুষ। তার মাথাও ঝুপড়ি ছাড়িয়েই উঠেছে। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে সুনীলের গলা থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি নামিয়ে চোখটা আর না তুলে চলে যায়, যেন সুনীলের চোখমুখ তার কাছে অবান্তর। তার চলার সময়ও সেই পোড়াকয়লার ছাইয়ে মচমচ শব্দ ওঠে। সুনীল একটু এগিয়ে যায়। আসলে তাকে জানতে হবে এরা আগে কোথায় ছিল, এখানে কবে এসেছে, কী কাজ করে। এ প্রশ্নগুলি খুব নিরীহ। কারও সঙ্গে কারও নতুন পরিচয় হলেই এই প্রশ্ন করা যায়, কোথায় থাকেন, কী করেন। কিন্তু প্রশ্নের জন্য পরিচয়টুকু করতে হয় বলেই যেন সুনীল সেই লোকটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। সুনীল এগিয়ে যায়। কোনও ঝুপড়ির সামনে নারীরাই বসে, এ ওর চুল আঁচড়ানোর সাবেকি ভঙ্গিতে, দু-চারটে শিশু প্রায়-প্রায়ই সুনীলের পায়ে পায়ে সরে-সরে যায়, চোরকাঁটাভরা মাঠে হাঁটলে যেমন হয়, আর হঠাৎ-হঠাৎ কোনও ঝুপড়ির সামনে থেকে, যেন মাটি থেকেই এক-একটা লোক মাথা তুলে দাঁড়ায়, ঝুপড়ি বস্তি ছাপিয়ে, তারপর কখনও সুনীলের দিকে না তাকিয়ে, আবার কখনও সুনীলকে গলা থেকে পা পর্যন্ত দেখে, চলে যায়। সুনীল কারও চোখে চোখ মেলাতে পারে না। সুনীল এগিয়ে যায়। তাকে প্রায়ই ছোট্ট ছোট্ট নালামত জায়গা একটু লাফিয়ে পেরতে হয়। কখনও একফালি শুকনো মাঠ পেরতে গিয়ে পচা জলে পা পড়ে। ধীরে-ধীরে জল থেকে পা বাঁচানোর চেষ্টাটা তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। আর যতই সে এগতে থাকে সে দেখে তার সামনে সেই ঝুপড়ি বস্তি ততই সরে-সরে যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার মুখ-কাঁধ-গলা-ঘাড় ঘামতে থাকে। জিভের টাকরাটাও শুকিয়ে আসে। তখনও পর্যন্ত একটি লোকের সঙ্গেও কথা বলতে না পেরে প্রশ্নের ব্যাপারটা সে মন থেকে সরিয়েই দিয়েছিল। এটাই-বা নেহাত মন্দ কী। এটা তো আসলে খুব কঠিন ও জরুরি সার্ভেই করা হচ্ছে—এই পুরো দৈর্ঘ্য

ও প্রস্থটা পায়ে হেঁটে দেখা। সুনীল পরিষ্কার বলতে পারবে, কোথা থেকে এর শুরু আর কোথায় এর শেষ।

সুনীল দাঁড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে, পাশে তাকিয়ে রেললাইনের, সিগন্যাল বা স্টেশনের বাড়ি এই রকম কোনও চিহ্ন বের করার চেষ্টা করে—যার মাপে সে বুঝতে পারবে সে কোথা বাড়ি এই রকম কোনও চিহ্ন বের করার চেষ্টা করে—যার মাপে সে বুঝতে পারবে সে কোথা থেকে কোথায় এসেছে। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে, পাশে তাকিয়ে, সামনে তাকিয়ে সে কোথাও, সে-রকম কোনও চিহ্ন পায় না। সে ঘুরে তার চারপাশে তাকায়—চারপাশ জুড়েই সেই ঝুপড়ির সারি দিগন্ত ছুঁয়েছে বা যেন দিগন্ত পেরিয়েছে। সুনীলকে এগিয়ে যেতে হয়। এর ভিতর তাকে কখনও হাঁটুসমান কাদা পেরতে হয়। তাকে জিরবার জন্য সেই কাদার ওপরই প্রায় বসতে হয়। পোড়াকয়লার কুচিতে তার পায়ে ফোস্কা পড়ে। তবু তাকে বাধ্যত এগিয়েই যেতে হয়।

ইতিমধ্যে বিকেল ঘটে যায়।

সূর্যাস্তে পাখিরা ঘরে ফেরে ও শিশুরা খেলা করে। সুনীল মাথার ওপর তাকায়। আকাশে-আকাশে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় আকাশজোড়া একটি কালো পাখি সারা আকাশ ছেয়ে একা উড়ে যায়। সুনীল তার চারপাশে তাকায়। ঝুপড়ির অলিতে গলিতে শিশুরা নৃত্যের ভঙ্গিতে মাটি থেকে মাথা তোলে, বাতাসে, আবার মাটিতে মিশে যায়, বাতাসেই। আর সুনীলের চারপাশে, সুনীলকে ঘিরে তার কোমরের সমান, উচ্চতায়, সেই সূর্যাস্তের ছায়ায় আঁধারে বিস্তারিত তরঙ্গমালার মত ঝুপড়ির তরঙ্গ উঁচুনিচু, উঠছে-ভাঙছে-উঠছে-ভাঙছে—সুনীল যেন সমুদ্রস্নান করছে, এমনি ভঙ্গিতে হাঁটে।

তারপর সুনীলের খুব তৃষ্ণা পায়। সে কোমর বেঁকিয়ে সেই কালো পচা জলে হাত ডুবিয়ে দুই আঁজলা ভরতে-ভরতে অপেক্ষা করে ফেলে, এখন কে তাকে পেছন থেকে দুই হাতে গলা চিপে ধরে মারবে, মারবে, মারবেই।

কপাটে করাঘাত

তপোবিজয় ঘোষ

এক ধরনের খুটখুট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভূধরবাবুর। চোখ না খুলে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে শব্দটার স্বরূপ বুঝতে চাইলেন। প্রথমে মনে হ'ল উপরের পাখা থেকে উঠছে। অনেকদিনের পুরনো পাখা, মাঝে মাঝে কট্ কট্ শব্দ করে। চোখ খুলে অন্ধকারে উপরের দিকে তাকালেন। তখন মনে হ'ল, খাটের তলা থেকে উঠছে। তাহলে কি ইঁদুর? খাটের তলায় রাজ্যের জিনিসপত্র স্তূপাকার করা আছে। পুরনো বাসন, বাক্স-প্যাঁটরা, চালের টিন, গমের টিন। দল বেঁধে ইঁদুরেরা ঘুরে বেড়ায়। ওদের শরীরে লেগে টিনে বা তোরঙ্গে নানারকম শব্দ হয়, ভূধরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। বয়সের জন্য এবং অম্ল ও অজীর্ণে ভুগে ভুগে তাঁর ঘুম এখন বড় পাতলা। সাধ্যসাধনা করে ডেকে আনতে হয়। ভেঙে গেলে আর ফিরে আসতে চায় না।

কিন্তু শব্দটা ইঁদুরেরও না। এতক্ষণে পুরোপুরি ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মনে হ'ল কেউ দরজার কড়া নাড়ছে। কোথায়? এই তিনতলার কোনও ঘরে কি? অথবা দোতলায়? সহসা ভূধরবাবুর শ্রবণশক্তি যেন অতিমাত্রায় প্রখর হয়ে উঠল। সমস্ত ইন্দ্রিয় তীব্র সচেতনতা পেল। মনে হ'ল নিচের তলায় সদর দরজার কড়া ধরে কেউ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শক্ত সবল হাতের খট্ খট্ কড়া-নাড়ার ধাতব শব্দ এই মান্ধাতার আমলের বাড়িটার ঘর-বারান্দা-দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বন্ধ-কপাটের এ-পাশে ভূধরবাবুর শয়নকক্ষে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে প্রবেশ করছে।

কে কড়া নাড়ছে? এখন রাত কত?

ভূধরবাবুর বয়স্ক কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল। ভ্রূ কুঁচকে গেল। বালিশ থেকে মাথাটা আরও একটু উপরের দিকে তুলে ধরলেন। কেমন একটা ভয়-ভয় দৃষ্টিতে ঘরের নীরন্ধ্র অন্ধকার, অন্ধকারে পাখার গোল মাথা থেকে বিচ্ছুরিত হাল্কা নীল আলোর স্পার্ক লক্ষ করলেন। ডানদিকের হ্রস্ব জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখে সময় অনুমানের চেষ্টা করলেন। খেয়ে দেয়ে যখন শুয়েছিলেন তখন রাত এগারোটা। তারপর ঘণ্টা দুই অন্তত ঘুম আসেনি তাঁর। এখন রাত আড়াইটে তিনটে। এই নিঝুম নিশুতি রাতে নিঃস্তব্ধ বাড়িটার সদররাস্তার অর্গলবদ্ধ কপাটে কে ঘা দেয়?

কে এল এই সময়? একটু বেঁকে ভূধরবাবু স্ত্রীর শরীর দেখার চেষ্টা করলেন। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে হেমপ্রভা। সারাদিন খাটাখাটুনির পর ঘুমটা গভীর, নিরুদ্বিগ্ন। ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝলেন, হাত দিয়ে না ঠেললে জাগবার সম্ভাবনা নেই। এখুনি তাকে ডাকবেন কি ডাকবেন না ভাবতে ভাবতে মনোযোগে ভূধরবাবু আরও ক'মুহূর্ত শব্দটা শুনলেন। কতক্ষণ ধরে উঠছে কিন্তু কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না! একতলার মানুষগুলো কি মরে গেল! সদর দরজার পাশেই তো শশাঙ্ক হাজরার ঘর। হাঁপানির টানে তার বুড়ি মা-টা তো সারারাত জেগেই থাকে— ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন ভূধরবাবু। তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। ঠিক এই সময় অন্ধকারে কোথাও একটি টিকটিকি কুৎসিতভাবে টক-টক করে ডেকে উঠতে এবং খাটের নিচে গোটা তিনেক ইঁদুর একসঙ্গে ছুটোছুটি করে হুল্লোড় বাঁধিয়ে বসতে যেন আরও চমকে উঠলেন। তাঁর দুর্বল বয়স্ক হৃৎপিণ্ড অল্প লাফাতে লাগল, হাত-পা কেমন অবসন্ন বোধ হ'ল। পাশ ফিরে হেমপ্রভাকে মৃদু চাপা গলায় ডাকলেন, 'শুনছ, এই...'

হেমপ্রভার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অল্পকাল চুপ করে থেকে ভূধরবাবু বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বিছানায় পিঠ ঘষে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর শরীরে হাত ঠেকালেন, 'এই...'

ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে কিছু একটা ভেবে হেমপ্রভা গোঁ গোঁ শব্দে গুঙিয়ে পাশ ফিরল। নিঃশব্দ ঘরে গোঙানির শব্দটা এমন বিকৃত অদ্ভুত শোনাল যে ভূধরবাবু আরও বেশি ভয় পেয়ে স্ত্রীর মুখে হাত চাপা দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতে আরও জোরে চিৎকার করে উঠতে পারে আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার ডাকলেন, 'শুনছ, এই! ধুত্তোরি ছাই, ওঠ না!'

মনে হ'ল হেমপ্রভা শুনতে পেয়েছে। কেননা এবার স্বাভাবিক গলায় 'উ'-জাতীয় একটা কিছু উচ্চারিত হ'ল এবং নিঃশ্বাস-পতনের ভারী শব্দ ক্রমশ শিথিল এলোমেলো হয়ে গেল। ভূধরবাবু রুদ্ধশ্বাস চাপা গলায় বললেন, 'কারা দরজা ধাক্কাচ্ছে!'

যেন কথাটা অতিশয় ভয়ঙ্কর, যেন বাইরের পৃথিবীতে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, অথবা বন্যার জল লাফিয়ে ঘরে উঠে এসেছে, হেমপ্রভার ঘুম মুহূর্তে ছুটে গেল খুব দ্রুত বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসে বলল, 'কারা ধাক্কাচ্ছে? কোন দরজা?'

ভূধরবাবু বললেন, 'শ্ শ্ শ্, আস্তে।'

হেমপ্রভার মুখ সাদা হয়ে গেল, 'আমাদের দরজা?'

'না, নিচে! ওই শোন...'

হেমপ্রভা কান পাতলা। তার শরীরও অল্প অল্প কাঁপছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। গলার স্বর আরও খাদে নামিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'এইরকম শব্দ...?'

'হ্যাঁ!'

'পুলিশ না তো?'

'পুলিশ!'

'হ্যাঁ, সেবারের মত...'

বলে অন্ধকারেই ভূধরবাবুর হাঁটুর কাছটা খামচে ধরল হেমপ্রভা। ভূধরবাবুর সমস্ত রক্তধারা অকস্মাৎ গতি হারিয়ে বরফের মত শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন তিনি, এই ভয়ই করছিলেন: এখন স্ত্রীর মুখ থেকে একই আশঙ্কা উচ্চারিত হওয়ামাত্র ভূধরবাবু যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে কাঠের পুতুল হয়ে গেলেন।

সদর-কপাটে করাঘাতের শব্দ প্রবল হয়ে উঠছে। অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ হাতের আঘাত। কেউ যেন চিৎকার করে কিছু বলছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

এত রাত্রে এই বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই বাইরে নেই। থাকার কথা নয়। যা দিনকাল! এখানে কার্ফু, ওখানে ক্যম্বিং, সেখানে গুলি। সন্ধ্যা হতে না হতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক একটা এলাকার উপর। এখানে ওখানে পড়ে থাকে মানুষের মৃতদেহ। ভয়ে উত্তেজনায় সারা শহর সন্ধ্যা থেকেই কাঁপে। রাত দশটা বাজতে না বাজতে শহরের সমস্ত কোলাহল থেমে যায়, ট্রাম-বাসের গতি উর্ধ্বশ্বাস পলায়নপর হয়। এই পাড়ার গলিপথগুলো মৃত অজগরের মত এঁকে বেঁকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। কদাচিৎ কারও পায়ের শব্দে আশেপাশের বাড়ির লোকেরা চমকে ওঠে। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও দরজা জানালা খুলে শোবার সাহস পায় না কেউ। রাতের দিকে জোরে চেঁচিয়ে মা ছেলের নাম ধরে ডাকতে ভয় পায়।

এই পুরনো ত্রিতল ভাড়া-বাড়ির খোপে খোপে যারা থাকে তারা দশটা বাজার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ে। তার কিছু পরে সদর দরজায় খিল দেওয়া হয়।

এ ব্যবস্থা আগে ছিল না। সারারাত হাট করে খোলা থাকত দরজা। মধ্যরাত পর্যন্ত লোক যাওয়া-আসা করত। অযত্নে অব্যবহারে চওড়া দরজার একটা পাল্লা ভেঙে পড়েছিল, কব্জাগুলো জং ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পাড়ায় গোটা দুই খুন হবার পর বাসিন্দারা ভয় পেয়ে যায়। তারপর তিন নম্বর খুনটা এই বাড়ির গায়ে হওয়ায় ভয়টা রীতিমত আতঙ্কে পরিণত হয়। নিচের তলার মনোহর পাল দোতলার কম্পাউন্ডার অনিল দাসকে একদিন ফিসফিস করে বলে, 'রাতে কারা যেন আসে উঠোনে। দাঁড়িয়ে জটলা করে।'

অনিল দাসের মুখ শুকিয়ে ওঠে, 'কারা আসে?'

'কি করে বলব? ভয়ে বেরুই না ঘর থেকে।'

তিনতলার সরোজবাবুর চাকর বৃন্দাবনও বলে, 'সেদিন আমিও দেখেছি। উঠোনে

দাঁড়িয়ে কারা কথা বলছিল।'

'খালি হাত?'

'না বাবু! কি যেন ছিল হাতে, বুঝতে পারিনি...

শুনে মনোহর ও অনিল দু'জনেরই বুক কাঁপতে থাকে। কথাটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করার সময় হয় না। তার আগেই ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে যায়। সবাই শোনে, সদর দরজা খোলা পেয়ে গভীর রাতে কারা যেন আসে। উঠোনের বাঁধানো চত্বরে গোল হয়ে বসে শলাপরামর্শ করে। সিগেরেটের লাল আগুনে তাদের চোখ মুখ চক চক করে; তাদের হাতের কাছে শোয়ানো থাকে লম্বা লোহার রড, বন্দুক, ধারালো তরবারি...

বাসিন্দারা আঁতকে ওঠে, 'কি সর্বনাশ! পুলিশ ঢুকবে ঘরে ঘরে। ঠেঙিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দেবে।'

সরোজবাবুর বউ বলে, 'কেন, আমাদের কি দোষ!'

অনিল দাস নিচে থেকে চেঁচায়, 'এখন দোষগুণের বাছাবাছি নেই বউদি, ওদের ওপর ঢালাও হুকুম, ধরো আর মারো! বউবাচ্চা মানে না।'

এই বাড়ির প্রবীণতম মানুষ ভূধরবাবু। আর বছর খানেকের মধ্যে চাকরি থেকে রিটায়ার করবেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র ছেলেকে অনেক কষ্টে ডাক্তারি পাস করিয়েছেন। সে এখন মুর্শিদাবাদের এক হেলথ সেন্টারে কাজ করে। এ বাড়ির সকলেই ভূধরবাবুকে সমীহ করে। উপদেশ পরামর্শ নিতে আসে। সব শুনে ভূধর বললেন, 'সদর দরজার পাল্লা ঠিক করুন আপনারা, মজবুত দেখে খিল লাগান। রাত সাড়ে দশটায় খিল এঁটে দেবেন।'

পরামর্শটা মনোমত হয়। বাড়ির গঠনটা এমন যে বাইরের দরজা বন্ধ করলে ঢুকবার পথ থাকে না। চারদিকে নোনাধরা ইঁটের দেয়াল ছোট ছোট সেকেলে জানালা নিয়ে সোজা খাড়া হয়ে থাকে। এমনকি দরজার ঠিক উপরে সিঁড়ির চাতাল থাকায় ওই দিকটাও নিরাপদ। কারও টপকে আসার জো নেই।

পাল্লা মেরামতের জন্য বাড়িওলার কাছে তদ্বির চলে। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা বেঁধে বাড়ির স্বত্ব-স্বামিত্ব এখন রিসিভারের হাতে। কেউ কানে তোলে না। শেষপর্যন্ত ভাড়াটেরাই চাঁদা তুলে নতুন কাঠের পাটা, স্ক্রু, কব্জা, লোহার খিল কিনে আনে। বাড়ির ভেতরটা ভাঙাচোরা, চুনবালি খসে খসে পড়ে, দমকা হাওয়ায় জানালা কপাট থরথর করে কাঁপে। তা থাকুক, বাইরের দরজাটা শক্তপোক্ত হোক! এখন সময় বড় ভয়ানক। বাইরের গোলমাল যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা চাই। নইলে কেউ নিরাপদ নয়।

ঠিক হয়, রাত এগারোটায় বৃন্দাবন দরজা বন্ধ করবে। তারপর শুয়ে থাকবে সিঁড়ির চাতালে। কেউ ডাকাডাকি করলে সে এই বাড়িরই লোক কিনা ভাল করে

জেনে-বুঝে দরজা খুলবে। এর জন্যে প্রতি মাসে সে কিছু পাবে।

কয়েক সপ্তাহ নিরুপদ্রবে কাটে। ইতিমধ্যে পাড়ায় পুলিশের চর সন্দেহে নামকরা একটা দাগী গুণ্ডা খুন হয়ে যায়। তার লাশটা ভাঙা শিব-মন্দিরের কাছে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকে। না অ্যাম্বুলেন্স, না পুলিশভ্যান—কেউ নিতে আসে না। ঘণ্টা দুই পরে মিলিটারি এসে ঘিরে ফেলে গোটা পাড়া। শুরু হয়ে যায় ক্যাম্বিং। পাড়ার ছাত্রদের একটা মেসবাড়ি থেকে গোটা কয়েক ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় ওরা। পরের দিন চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায় নিকটবর্তী সদর রাস্তার ধারে, ভবানী মিস্ত্রির লেনের গলিতে!

তারও দু'দিন পরে এই বাড়ির সদর দরজার কড়া সশব্দে বেজে ওঠে। চাতাল থেকে সদ্য ঘুমভাঙা গলায় বৃন্দাবন সাড়া দেয়, 'কে বটে? এত রাতে?'

বাইরে থেকে গালিগালাজের সঙ্গে জবাব আসে, 'তেরে বাপ, শালা জল্‌দি খোল্‌, নেহি তো তোড়্ দেঙ্গে!'

গলা ও ভাষা শুনে বৃন্দাবন খাড়া হয়ে ওঠে! কি করবে ঠিক করতে পারে না। উপরের হরিশ সামন্ত মদ গিলে মাঝে মাঝে ধাক্কায়। খুলতে দেরি হলে খিস্তিখাস্তা শুরু করে, 'কোন শুয়োরের বাচ্চা দরজা বন্ধ করেছে, কার হুকুমে বন্ধ করেছে, আমি কি শালা মাগ্‌না থাকি! আভি খোল্ দরজা।' কিন্তু হরিশের মতো এদের বেহেড়্ মাতাল মনে হচ্ছে না। ভারী বুটজুতোর খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে টর্চের জোরালো আলো ঝিলিক দিচ্ছে। বৃন্দাবন দরজার কাছে এসেও খুলল না। ভয় পেয়ে বোকা বনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ইতিমধ্যে দরজায় সবুট পায়ের লাথি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বাজল। টর্চের উর্ধ্বমুখী আলো বাড়ির জানালা-দরজায় হিংস্রভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই তীব্র পরিষ্কার আলোর সর্বত্র অগাধ সঞ্চরণ দেখে বৃন্দাবন পায়ে পায়ে পিছিয়ে প্রথমে রামদাস পরে মনোহরের দরজায় ঘা দিয়ে বলল, 'বাবু উঠুন, উঠুন শিগ্‌গির...'

রাতের বেলা রামদাস বালবাচ্চা নিয়ে মড়ার মত ঘুমোয়। তার সাড়া পাওয়া গেল না। মনোহর দরজা খুলে বাইরে এল, 'কি হয়েছে? কারা?'

বৃন্দাবন বলল, 'পুলিশ! ওই শুনুন বুটজুতোর শব্দ!...দরজা খুলব?'

'খুলবি? তা ইয়ে, খুলে দে। আমরা কি করেছি? আমাদের কি দোষ!'

'তাহলে খুলছি বাবু?'

'হ্যাঁ, খুলে দে! আমরা কি করেছি...'

বৃন্দাবন সাহস পেয়ে দরজা খুলতে গেল। তার পেছনে মনোহর। খিল খোলা মাত্র দরজার একটা পাল্লা বৃন্দাবনের মুখে এসে আছড়ে পড়ল। তার নাকটা এক পাশে বেঁকে গেল, কপালের কিছু অংশ দেখতে দেখতে জামরুলের মত ফুলে উঠল। মাথা ঘুরে বৃন্দাবন মাটিতে বসে পড়বার আগে তলপেটে আর একটা সদর্প

লাথি এসে তাকে শুইয়ে দিল। কাণ্ড দেখে মনোহর ছুটে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, 'শালা এতক্ষণ দরাজ খুলতে কি হচ্ছিল'—বলে কে যেন রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় মারল। টর্চের ঝলসানো আলোতে মনোহর নিজের ক্ষতস্থানের রক্ত নিজেই টপটপ করে ঝরতে দেখল।

তারপর সারা বাড়ির ঘর বারান্দা জুড়ে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কেউ কিছু ভাল করে বোঝার আগেই উদ্যত রাইফেল আর জোরালো টর্চের মুখোমুখি চোখ বন্ধ করে হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। মেয়ে-বউরা খোলামেলা হয়ে শুয়েছিল, জেগে উঠে শাড়ি-সায়া গুছিয়ে নিতে ভুলে গেল। নিবারণের পিসি বাচ্চার মুখ শক্ত হাতে চেপে ধরে কান্না বন্ধ করতে চাইল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীলবর্ণ মুখে বাচ্চাটা প্রায় শক্ত হয়ে চেপে ধরে কান্না বন্ধ করতে চাইল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীলবর্ণ মুখে বাচ্চাটা প্রায় শক্ত হয়ে গেল! বুট জুতোর লাথি খেয়ে নীলমণির বেড়ালটা দোতলা থেকে সটান উঠোনে ছিটকে পড়ল। তিনতলার একটা পাখির খাঁচাও উঠোনে ছিটকে পড়ায় পাখিটা বিকট আর্তনাদ শুরু করল।

আরও কয়েক মুহূর্ত পরে তিনতলার ভুবনমাস্টারের ঘর থেকে তার বড় ছেলেকে ওরা চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করল। ভুবন বাধা দিতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে একপাশে ছিটকে পড়লেন। তার স্ত্রী বাইরে বেরুতেই পারল না, কে যেন ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজার শেকল তুলে দিল। আর্ত চিৎকারের সঙ্গে বন্ধ-কপাটে মাথা কুটতে কুটতে সে যখন জ্ঞান হারাল, তখন ভীত বিবর্ণ একরাশ মানুষের মধ্যে দিয়ে পশুকে বধ্যভূমিতে টেনে নেওয়ার মত নিষ্ঠুর পৈশাচিক উল্লাসে কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেটাকে টানতে টানতে ওরা সদর্পে বাড়ির বাইরে চলে গেল।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির প্রভাতে এই বাড়ি থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে একাট মাঠ ও পুকুরের মধ্যবর্তী জায়গায় আরও একটি সমবয়স্ক মৃতদেহের সঙ্গে এই ছেলেটিরও গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ আবিষ্কৃত হ'ল।

ক'দিন ধরে বাড়িটা শোকে-দুঃখে ভয়ে-বেদনায় স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে থাকল। রেডিওতে প্রাত্যহিক খবর ছাড়া গান বাজল না। সন্ধ্যারাতে শশাঙ্কের ঘরে তাসের আসর বসল না। মনোহর একটু খরচ করে ছেলের মুখে ভাত দেবে ভেবেছিল, দিনটা পিছিয়ে দিল। সরোজবাবু তাঁর বড়ছেলেকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ভূধরবাবুর পুরনো বুকের ব্যথা ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় অফিস থেকে ক'দিন ছুটি নিলেন। ছেলেকে চিঠি দিতে গিয়েও দিলেন না। যদি চলে আসে!

দিনের বেলায় তেমন সাড়াশব্দ নেই কিন্তু রাত্রির দিকে ভুবনমাস্টারের স্ত্রীর কান্নার শব্দ কখনও নিম্নগ্রামে কখনও উঁচুপর্দায় এই বাড়ির ইট-কাঠ, দরজা-জানালা, আসবাবপত্র ছুঁয়ে যেতে লাগল। একটা সকরুণ বিষণ্ণতা ঘরে ঘরে সংক্রামিত হয়ে গেল। কান্নাটা না-থামা পর্যন্ত ভূধরবাবু ক'দিন কিছুতেই ঘুমোতে পারলেন না।

হেমপ্রভার চোখেও জল ছলছল করতে লাগল।

বৃন্দাবন জানাল, সে আর নিচে শোবে না। পাঁচ কেন পঞ্চাশ দিলেও না। জীবনের চেয়ে টাকা কি বড়! উপায় থাকলে সে এখানকার কাজ ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে যেত—এখানে প্রাণের কোনও দাম নেই।

শেষপর্যন্ত ভূধরবাবুর মধ্যস্থতায় ঠিক হ'ল, শশাঙ্ক দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে যাবে। রাতে কেউ ডাকাডাকি করলে যার ঘরের লোক সে দরজা খুলে দেবে। অন্য কেউ উঠবে না।

কিন্তু রাত এগারোটার পর এ-বাড়ির কোনও লোক বাইরে থাকল না। এমনকি বদ্ধ মাতাল হরিশও দশটার মধ্যে ঘরে কিছুক্ষণ আপন মনে চেঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। শশাঙ্কর প্রতিবেশী বিষ্টু তিন নম্বর শিফ্‌টের কাজ শেষ করে বাকি রাতটুকু কারখানাতেই শুয়ে কাটিয়ে দিতে লাগল। বাসিন্দারা বদ্ধ দরজার অন্তরালে ঘুমের মধ্যে কখনও বোমা বা ক্র্যাকার, কখনও রাইফেলের গুলি ফাটার প্রচণ্ড শব্দে বউছেলেমেয়েসহ চমকে জেগে উঠে শব্দটা বাড়ির কত কাছাকাছি তার হিসাব শুরু করল। তারপর কয়েকমুহূর্ত নিঃশব্দ নির্বাক থেকে যখন বুঝল এ-বাড়ির দরজার কাছে এখনও দলবদ্ধ ভারী বুটজুতোর শব্দ উঠছে না বা কড়া ধরে কেউ বেপরোয়া খট্ খট্ শব্দ তুলছে না—তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে অথচ বুকের গভীরে সন্দেহজনক একটা আতঙ্ক গোপন রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। ওই দরজাটা তাদের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়—অভিজ্ঞতায় তা জানার পরেও কেমন অসহায় দুর্বলভাবে ওরই উপর নির্ভর করে মানসিক স্বস্তি খুঁজতে চাইল।

...বেশ কিছুদিন পরে দরজার কড়া আবার নড়ে উঠেছে। জীর্ণ বাড়িটার ঘরে ঘরে তার প্রতিধ্বনি। হয়তো সবাই জেগেছে, শুনেছে, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র সাড়া নেই। গভীর রাতে গোটা বাড়িটা যেন আরও বেশি ঠাণ্ডা, আরও নিঃশব্দ হয়ে গেছে। শুধু শেই প্রাণহীন শীতলতার বুকে থেকে থেকে ধাতব শব্দের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে...

ভূধরবাবু চাপা গলায় বললেন, 'আলোটা জ্বালাই?'

হেমপ্রভা বাধা দিল, 'না, কি দরকার!'

'ঘড়িটা দেখতাম।'

'কি হবে? চুপ করে থাক, কথা বলো না।'

ভূধরবাবু চুপ করে গেলেন।...কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে। রুগ্‌ণশিশুর কান্নার মত কেমন কাঁপাকাঁপা গলা। গভীর রাতে এমন করে কুকুর-বেড়ালের কান্না ভাল নয়। গ্রামে মড়ক লাগে, শহরে দুর্ভিক্ষ আসে, যে-গৃহস্থ শোনে তার অমঙ্গল হয়। ভূধরবাবুর বুকের ভেতর যেন একটা ঝড় বইতে লাগল। স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়ছে। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

হেমপ্রভাকে একটু জল দিতে বলবেন সে সাহসও নেই। তাহলে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে হবে, কুঁজোয় গ্লাসে ঠন্ঠন্ শব্দ হবে। এখন এই মুহূর্তে তারা কেউ আলো জ্বালতে চায় না, বাইরের শব্দ কান পেতে শোনা ছাড়া অন্য কোনও শব্দ তুলতে চায় না। সেবার মাতাল হরিশের ঘরে আলো জ্বলতে দেখেই তো বেদম পিটিয়েছিল ওকে। সে না-কি জেগে ছিল, তবু দরজা খোলেনি। মাতালেরা তো মাতাল চেনে না!

একটানা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হেমপ্রভা আবার ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না!'

ভূধরবাবু বললেন, 'কে দেবে?'

'ওরা দরজা ভেঙে ঢুকবে।'

'ভেঙে?'

'হ্যাঁ!'

দু'জনেই আবার চুপ করে গেল। সেবারের কথা নতুন করে মনে পড়ল। বিশেষ করে ভুবনমাস্টারের ছেলের কথা। মাঠ থেকে কুড়িয়ে লাশটা আনা হয়েছিল বাড়িতে। বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত দেহ। কেউ যেন সাঁড়াশি দিয়ে গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে, মাথার চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়েছে, একটা চোখ উপড়ে ফেলেছে। তার ওপর বুক জুড়ে দগ্‌দগে গুলির চিহ্ন! মৃতদেহ দেখে ভূধরবাবু মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। মনোহর তাঁকে ধরে উপরে নিয়ে আসে।

ভূধরবাবু আজও জানেন না ছেলেটা কেন মরল, তার অপরাধ কি! কানাঘুষোয় অবশ্য নানাকথা শুনেছেন। তবে এ বাড়ির সকলেরই সন্দেহ, ছেলেটার সঙ্গে না-কি তাদের যোগাযোগ ছিল যারা বন্দুক কেড়ে বেড়ায়, জোতদার-জমিদার-পুলিশ খুন করে। মাস দুই আগে সে-যে একমাসের জন্য নিখোঁজ হয়েছিল এবং ইদানীং সে যে প্রায়ই রাত্রে ঘরে থাকত না, এ কথাটাও প্রথম জানলেন ভূধরবাবু। ভুবনবাবু অবশ্য বাড়ি ছেড়ে যাবার আগের দিনও বলে গেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ, নিরপরাধ, শুধু সন্দেহের বশে...

আসল সত্য কেউ জানে না। ভুবনমাস্টারও জানেন না। সবই অনুমান, শোনা কথা। আদালতে বিচার হলে হয়তো কিছু বোঝা যেত, জানা যেত। কিন্তু তা তো হল না। সাক্ষিসাবুদে দলিলপত্রে তাকে তো অভিযুক্ত করা হ'ল না। বিনা প্রমাণে বিনা বিচারে একটা তরতাজা ছেলে খুন হয়ে গেল। আর হ'ল তাদেরই হাতে অভিযোগ এনে আদালতে প্রমাণ করার দায়িত্ব যাদের ওপর। এটা কেমন করে হ'ল? কেন হ'ল?

ছেলেটা মরার পর থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন ভূধরবাবু। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। আর না-পেয়ে এই শেষ বয়সে থানাপুলিশ সম্পর্কে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত

হয়ে উঠেছেন তিনি। রাইফেল হাতে ওদের কাউকে কোথাও দেখা মাত্র কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। নাগরিক হিসেবে ওদেরই হাতে তাঁর জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা—কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। এক একটা রাইফেলধারী পুলিশকে এক একটা জীবন্ত ঘাতক বলে মনে হচ্ছে তাঁর!

না-হলে পুলিশের নাম শুনে ভয় পাবেন এমন মানুষ তিনি ন'ন। এক সময় তাঁর চার মামার দুই মামা টেররিস্ট দলের সদস্য ছিলেন। কথায় কথায় ইংরেজের পুলিশ ঢুকত বাসায়। বড়মামাকে কোনওদিন ধরতে পারেনি। সেজমামা ধরা পড়েছিলেন। তিন বছর ধরে আদালতে বিচার হয়েছিল। বিচারে দশ বছর জেলও হয়েছিল। কিন্তু রাজবন্দির সম্মান পেয়েছিলেন সেজমামা। এখনও জীবিত আছেন। মাস গেলে ক'টাকা যেন বিপ্লবীভাতা পান। মাঝে মাঝে সেটা বন্ধ হয়ে গেলে তদ্বির-তদারকের জন্য ভূধরবাবুকে চিঠি দেন। শৈশবে অনেক দিন মামাদের বাসায় কাটিয়েছেন ভূধরবাবু। বিচারের সময় আদালতে গেছেন দু'একবার। তখন তো দেশটা পরাধীন ছিল! এখন এদেশে কি ভয়ঙ্কর নিয়ম চালু হ'ল? বিচার নেই, প্রমাণ নেই, শুধু সন্দেহের বশে, ইচ্ছে হলেই...

সেই কুকুরটা এখনও কাঁদছে। কি কর্কশ করুণ কণ্ঠস্বর! শহরে-গ্রামে একটা মড়ক-মহামারী কি আসন্ন? একটা ভয়ঙ্কর কোনও পরিবর্তন!

দরজায় এখন ক্রুদ্ধ লাথি পড়ছে। ওরা কি ভেঙে ফেলবে? একটা মানুষও উঠবে না? সত্যি সত্যি যদি দরজা ভেঙে ঢোকে...একতলা দোতলা পার হয়ে দলবেঁধে এই তিনতলায় উঠে আসে...

ভাবতে গিয়ে ভূধরবাবুর শিরা-উপশিরা ঝনঝন করে বেজে উঠল। নিজের ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজার দিকে বিপর্যস্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না বলে চোখ জ্বালা করে উঠল। মাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত ভয় পেতে পেতে এখন ভয়ের অনুভূতিটাই যেন ভোঁতা হয়ে গেল। তাঁর মনে হ'ল, কুকুরের কর্কশ কান্নার সঙ্গে দরজার প্রবল করাঘাতের শব্দ মিলেমিশে এই ঘরের বায়ুমণ্ডলে একটা ভয়ঙ্কর ধ্বনিবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর শব্দায়মান বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হতে হতে হেমপ্রভাসহ তাঁকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। গোলাকার ঘূর্ণি ঝড়ের মত।

অনেকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ভূধরবাবু শরীরটা শক্ত করে ফেললেন। দু'হাত মুঠো করে আবার খুলে দিলেন। তারপর সহসা বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলেন নিচে। সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে আলো জ্বালিয়ে ফেললেন। হেমপ্রভা ভয় পেয়ে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি করছ! নেবাও, শিগ্‌গির নেবাও...'

ভূধরবাবু উত্তর দিলেন না। একবার স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সারা

ঘরময় পরিব্যাপ্ত পরিষ্কার উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখলেন। তারপর আবার কান পেতে শুনলেন সেই শব্দটা...

এখনও কি কেউ শোনেনি? ঘরে ঘরে সব মানুষ কি বোবা-কালা? সবাই কেন একসঙ্গে উঠে দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে না? সে'বার সবাই যদি একসঙ্গে দাঁড়াত, যদি ঘরে ঘরে বাতি নিবিয়ে খিল দিয়ে কাপুরুষের মত লুকিয়ে না থাকত, সবাই যদি একজোট হয়ে ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে থানায় যেত, প্রমাণপত্র দাবি করত, আদালতে মামলা তুলতে বলত, তাহলে কি প্রাণে বাঁচত না? মরত অমন করে? অন্তত সব জানাজানি তো হত!

আজ কপাটে করাঘাত কার জন্য? কার ছেলেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা? কোন ঘরের? কোন মায়ের?

ভুবনমাস্টারের ছেলের মুখটা মনে পড়ল আবার। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের। দেয়ালের দিকে তাকালেন ভূধর। ফ্রেমে বাঁধানো অমলের ছবি। কনভোকেসনের কালো পোশাক পরনে, হাতে গোল-করে-ধরা সার্টিফিকেট। মুখখানা কচিকাঁচা, টলটলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ভুবনমাস্টারের বউয়ের কান্না শুনলেন, 'ওরা আমার কি সর্বনাশ করে গেল গো...'

ভূধরবাবু শক্ত সবল হাতে নিজের ঘরের দরজা খুললেন। বিছানা থেকে নেমে আসতে আসতে হেমপ্রভা কি যেন বলল, শুনতে পেলেন না। দরজার খিলটা হাতে নিয়েই বাইরের বারান্দায় এসে অস্থির উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, 'কে দরজা ধাক্কায়? কে? আমি ভূধর বলছি, ওঠ দেখি তোমরা, ওঠ সব...'

আবির্ভাব

দিব্যেন্দু পালিত

প্রিয়নাথরা যে গরিব, দিন চালায় কায়ক্লেশে, এটা সকলেই জানত। যে-পাড়ায় ওরা থাকত সেই পাড়ার মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। তাদের সচ্ছলতার সঙ্গে অবশ্য কোনও তুলনাই চলত না প্রিয়নাথদের। তবে সচ্ছল মানেই তো আর খারাপ নয়। পাড়ার যারা পুরনো বাসিন্দা এই গরিব পরিবারটিকে তারা আগলে রাখত ভালবাসা ও মমতা দিয়ে। নতুন কেউ এলেও চেষ্টা করত চিনিয়ে দিতে, যাতে প্রিয়নাথদের প্রতি তারাও হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল।

এমনতর পরিবেশে গরিব হওয়ার সুবিধা আছে। পাড়ার যে-কোনও বাড়িতে উৎসবের উপলক্ষ থাকলে এবং খাওয়া-দাওয়া হ'লে লিস্টের সবচেয়ে ওপরে নাম থাকত প্রিয়নাথদের। দু'ঘরের সংসারে স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে থাকা—দরজা খুললেই খ'সে পড়ে আব্রু। ব্যাপারটা সকলেই জানত বলে কেউই আর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করত না। দরজায় দাঁড়িয়েই বলত, রবিবার আমার বড়ছেলের বিয়ে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসবে—, ইত্যাদি। প্রিয়নাথ বা তার স্ত্রী শ্যামা বলত, একটু বসে যাবেন না? সকলেই জানত এটা ভদ্রতার কথা। বলত, না, না। এখন অনেক জায়গায় যেতে হবে তো! বরং আর একদিন। তারপর বলত, শুধু রাত্রে নয়, দিনের বেলাতেও আসবে সকলে, খাবে—

প্রিয়নাথের তিন ছেলেমেয়ের বড় দু'টির বোধবুদ্ধি হয়েছে কিছুটা। আড়ালে থেকে এইসব কথোপকথনে কান দিত ওরা এবং আহ্লাদে আটখানা হতো যখন শুনত দু'বেলারই নেমন্তন্ন পেয়েছে তারা। ওদের লোনাঝরা আহ্লাদ প্রত্যক্ষ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলত শ্যামা। আর প্রিয়নাথ? দীর্ঘশ্বাস না ফেললেও একরকম বোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত সে। ক্ষুধা ও খাদ্যের সম্পর্কটা গোলমাল হয়ে যেত মাথার মধ্যে।

তবে এই কাঙালপনায় শুধুই যে দুঃখ ছিল তা নয়। কিছু মজাও ছিল। অভাবের সংসারে যেদিন কোনও কারণে হাঁড়ি চড়ত না বা শুধুই ভাতে ভাত হতো, প্রিয়নাথের ছেলেমেয়েরা সেদিনও খাবার জন্যে বায়না করত না কোনও। সেদিন কবে, কোথায়, কাদের বাড়িতে কী কী ভাল খাবার খেয়েছে এই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত তারা এবং বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্পর্কিত আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

এই ধরনের কাঙালপনা পছন্দ হতো না প্রিয়নাথের। গোড়ার দিকে তো অপমান লাগত রীতিমত। কিছুতেই ভুলতে পারত না সে এম. এ. পাস, সুতরাং শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক। কিন্তু তার পরেই ভাবতে বাধ্য হতো, কী হলে এসব তকমায়! মানুষের বিচার হয় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে—এই দুটোর কোনওটাই পায়নি সে। কোনও চাকরিতেই পার্মানেন্ট হয়নি, কোনও কাজেই এঁটে বসতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনও কাজ করতে না পারায় এখন সে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে করবার চেষ্টা করে এবং কোনওটা থেকেই সেরকম উপার্জন করে না। টাকার দাম কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের দামও কমে গেছে অনেক—সংসারের কোনও ইচ্ছাই পূরণ করতে পারে না। এই অবস্থায়, তার সক্রিয় চেষ্টা ছাড়া ইচ্ছাগুলি যদি পাড়া-প্রতিবেশীরাই পূরণ করে দেয়, তাতে সে বাধা দেবে কোন সাহসে!

ভাবনাটা একটা আপোস শিখিয়ে দেয় প্রিয়নাথকে। নিজে শেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকেও ব্যাপারটা শিক্ষিয়ে দেয় সে। আপোসটা হল, নেমন্তন্ন পেয়ে কাঙাল ছেলেমেয়েগুলোকে ক্ষুধা নিবৃত্তিতে পাঠালেও সে বা শ্যামা যুগ্মভাবে কখনও তাদের সঙ্গী হতো না। অর্থাৎ কখনও প্রিয়নাথ যেত, কখনও শ্যামা। যে যেত না সেদিন সে অসুস্থ থাকত। এইভাবে, লোকের চোখে না হ'লেও, নিজেদের চোখে তারা পুরোপুরি কাঙাল হওয়া ঠেকিয়ে রাখত।

কিন্তু, শুধু খাবার জন্যেই যে ডাক পড়ত তাদের তা নয়। পাড়ার কোনও বাড়িতে কোনও মান্যিগণ্যি বা বড় মানুষ এলেও ডাক পড়ত তাদের। যারা ডাকত, বড় মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তারা বলত, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, আমাদের খুব প্রিয়জন। বড় ভাল মানুষ। এই ওর স্ত্রী, শ্যামা। আর এরা—ভুনি, টাকু, বিনি—ওদের ছেলেমেয়ে। বলত, চুপ করে কেন, প্রিয়নাথ! আলাপ কর ওঁর সঙ্গে। তুমি তো অনেক কিছু জানো। এসব কথায় বিলক্ষণ লজ্জা পেত প্রিয়নাথ, কথা ফুটত না মুখে। কোলের ওপর জড়োসড়ো হাত দু'খানি রেখে ও দেখত বড় মানুষটির সান্নিধ্য পাবার জন্যে অনেকেই ঘুরঘুর করছে আশপাশে, কিন্তু সান্নিধ্য পাচ্ছে শুধু তারাই। ভুল ক'রে হ'লেও কখনও নিজেকেই বড় মানুষ ভেবে ফেলত সে।

বাড়ি ফিরে বড় মানুষের গল্প করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত ভুনি, টাকু, বিনি। তখন সে ও শ্যামা বড় মানুষ নিয়ে সাধারণ গল্প ছেড়ে ঢুকে পড়ত বিশেষ গল্পে। তারপর তারাও ঘুমিয়ে পড়ত।

এইভাবেই একদিন একটা অদ্ভুত কথা ব'লে ফেলল শ্যামা।

'পয়সা নেই ব'লে আমরা না হয় কাউকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পারি না। কিন্তু একজন বড় মানুষকেও কি ডাকতে পারি না কোনওদিন?'

প্রিয়নাথ কথাগুলি শুনল, কিন্তু আমল দিল না কোনও। শুধু বলল, 'কোন্ বড় মানুষটিকেই আর চিনি আমরা!'

'কেন! তোমার সেই হ-বাবু, তিনি তো বিখ্যাত হয়েছেন!'

'হ-বাবু!' মনে করার ধরনে প্রিয়নাথ বলল, 'হ্যাঁ, তাঁকে এখন বড় মানুষ বলা যেতে পারে।'

'এককালে তাঁর জন্যে তুমি অনেক খাটাখাটি করেছ, তাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করেছ।' শ্যামা বলল, 'বিয়ের পরেও অনেকদিন তুমি তাঁর গল্প করতে। একদিন এসেও ছিলেন, মনে আছে?'

প্রিয়নাথ বলল, 'তখনও তিনি বড় হননি। সেসব অনেক বছর আগেকার কথা। এখন হয়তো মনেই নেই আমাকে—যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে তাঁর পাশে অনেক অনেক অন্য মানুষ। আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন না। চেহারাটাও কত বদলে গেছে আমার!'

শ্যামা বলল, 'যে সিঁড়ি দিয়ে উঠল সেই সিঁড়িটাই ভুলে যাবে, এমন হয় না কি!'

'তা হয়তো হয় না।' প্রিয়নাথ বলল, 'তবে আমাকে সিঁড়ি ভাবা ভুল। হয়তো সিঁড়ির একটা ইঁট—হয়তো তাও নয়।'

'এগুলো তোমার ধারণার কথা। সামনে গিয়ে পড়লে ঠিকই চিনতে পারবেন।'

ভুনি তার ফ্রকে হাঁটু ঢাকতে ঢাকতে বলল, 'কোন হ-বাবু, মা, যাঁর নাম কাগজে বের হয়?'

'হ্যাঁ। এককালে তোর বাবার খুব চেনাশোনা ছিল। বয়সে যদিও বড়, অনেকটা বন্ধুর মত—'

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় খুব শ্রদ্ধা সহকারে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল ভুনি। তারপরে বলল, 'একদিন তাঁকে নিয়ে এস না, বাবা? আমরা দেখতাম, অন্যদেরও দেখাতাম!'

'বাড়িতে!' প্রিয়নাথ বলল, 'এই বাড়িতে কাউকে ডাকা যায়, মা?'

'বাড়ির দোষ দিচ্ছ কেন! নিয়ে এস। তারপর দেখো এই বাড়িই ধুয়ে নিকিয়ে কেমন ঝকমকে ক'রে দিনই। আজকাল কেউই আমাদের বাড়িতে ঢোকে না। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে, যেন চিড়িয়াখানার জন্তু!'

প্রিয়নাথ জবাব দিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল শুধু। ভাবল, খাঁচাটা ভাগ্যের দান; দোষ যারা দেখে তাদের নয়।

শ্যামা বলল, 'যে-কোনও বড় মানুষের পায়ের ধুলোই মঙ্গল আনে সংসারে।'

একজন বড় মানুষকে বাড়িতে নিয়ে আসার ভাবনাটা ঘুরপাক খায় মাথায়; বন্ধ বন্ধ দু'টি ঘরের আনাচে-কানাচে। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করে শ্যামা আর ভুনি। খবরের কাগজে বেরুনো হ-বাবুর একটা ছবি কেটে দেয়ালে সেঁটে রাখে টাকু। বড় মানুষ—বড় মানুষ, অন্তর্নিহিত গুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়ে চাপা উত্তেজনা, মনে হয় পুজো আসছে। কবে, কখন, এ-সবের হদিশ থাকে না যদিও।

ঠিকানা খুঁজে একদিন সকালে হ-বাবুর বাড়িতেই পৌঁছে গেল প্রিয়নাথ। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে নিল নিজের কল্পনার সঙ্গে। ভাবল, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারও আসে। এই বাড়ি তারই নিদর্শন। এতদূর উচ্চতায়

পৌঁছুতে ইট-সুরকির সিঁড়ি কাজ দেয় না, স্বর্গের সিঁড়িই দরকার হয় বুঝি বা। তবু, নিজেকে সেই সিঁড়িরও একটা ইট ভাবতে ভালো লাগল প্রিয়নাথের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগে এক দুঃসময়ে তার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিলেন হ-বাবু, টাকাটা ফেরত দেবার সুযোগ পাননি। তখনকার পঞ্চাশ টাকার দাম আজ কয়েক গুন হবে। সে যেভাবে ভাবে, হ-বাবু নিশ্চয়ই সেভাবে ভাবেন না। এখন তাঁর অনেক টাকা। ধারের কথাটা মনে পড়লে লজ্জা পাবেন নিশ্চিত।

বাড়িতে ঢুকে হলঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকা লোকগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারল এরা সকলেই দর্শনপ্রার্থী; অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধ'রে। হয়তো তাকেও অপেক্ষা করতে হবে।

একটি লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

বিনীতভাবে প্রিয়নাথ বলল, 'হ-বাবুর সঙ্গে দেখা করব একটু।'

'আপনারা নাম?'

'প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। অনেককালের চেনা, নাম বললে চিনতে পারবেন।'

লোকটি চ'লে গেল এবং ফিরে এসে বলল, 'লোক আছে। বসতে হবে।'

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়ল। ভাবল, ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক।

প্রায় আধঘণ্টা পরে লোকটি ফিরে এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে।

দোতলার হলঘরের কোণে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন হ-বাবু। সোফার একদিকে তাকে বসিয়ে দিয়ে লোকটি চলে যাবার পর মুখোমুখি হল প্রিয়নাথ।

হ-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'চিনতে পারছেন? আমি প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। মেসে একসঙ্গে থাকতাম।'

'নাম শুনে বুঝিনি।' সূক্ষ্মভাবে হাসলেন হ-বাবু, 'চেহারায় চেনা লাগছে। একটু-একটু মনেও পড়ছে—'

কৃতার্থ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল প্রিয়নাথ।

'কী করা হয় এখন?'

'আজ্ঞে, বিশেষ কিছু নয়। দু' তিনটে টিউশন করি, পোস্টাপিসে মানি অর্ডার, চিঠি লিখে দিই। পাকা কিছু আর হল কোথায়। কষ্টেই আছি—'

কথা শেষ করার আগেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ হল প্রিয়নাথ।

'চাকরির খোঁজে এসেছ?'

কুঁজো-হাওয়া ঘাড়ে ছোট্ট একটা ঘা লাগল প্রিয়নাথের। তার পরেই অবশ্য ভাবল, আজ তাঁর যে-অবস্থা, সম্মান, প্রতিপত্তি, তাতে এ-ধরনের ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। এরকম অনেকেই হয়তো নিত্য আসে যায় হ-বাবুর কাছে এবং তাদের অনেকেই চাকরি-টাকরি চায়। দোষ হ-বাবুর নয়। তখন চোখ তুলে বলল, 'সেজন্যে আসিনি। আমার ছেলেমেয়েদের ভারি শখ একদিন আপনাকে দেখে। যদি একদিন পায়ের ধুলো দেন আমাদের বাড়িতে—'

'ছেলেমেয়ের শখ। নাকি নিজের ইমেজ বাড়াতে চাও?'

'আজ্ঞে!' থতমত খেয়ে বলে উঠল প্রিয়নাথ, 'তা নয়। গরীবের ইমেজ কি আর বদলায় কিছুতে!'

'ঠিক। ঠিকই বলেছ।' হাসলেন হ-বাবু, 'তবে এসব শখ মেটানোর সময় কোথায়, বল? পৃথিবীর মজাই হল যারা শখ মেটাতে চায় তাদের চেয়ে যারা শখ মেটাবে তাদের সংখ্যা অনেক কম। সময় কোথায়!'

প্রিয়নাথ চুপ করে থাকল।

'থাক কোথায়?'

'সেই বাড়িতেই। আপনি গিয়েছিলেন একবার—অনেক বছর আগে—'

'বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল না?'

'এখন নেই। এখন সেখানে তিনতলা বাড়ি উঠেছে।'

'ঠিকানাটা রেখে যাও।' চিন্তিভাবে বললেন হ-বাবু, 'কথা দিচ্ছি না। সময় কোথায়! তবে ছেলেমেয়ের নাম ক'রে বললে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কখনও ওদিকে গেলে একবার ঢুঁ মারার চেষ্টা করব।'

'কবে?'

'সে কি বলা যায়! যে-কোনও একদিন। তবে—কথা দিচ্ছি না—'

না-বোঝা কিছু আশা এবং কিছু হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরল প্রিয়নাথ।

শ্যামা জিজ্ঞেস করল 'দেখা হল?'

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়ল।

'কি বললেন গো? আসবেন?'

'আসতেও পারেন। তবে ব্যস্ত মানুষ তো! কবে আসবেন কিছুই বললেন না।'

'তোমার কী মনে হল?'

'আগে হ'লে বলতে পারতাম। এখন অনেক বদলে গেছেন—বড় মানুষই শুধু নন, দূরের মানুষও। পুরোপুরি অচেনা লাগল। ইচ্ছে হ'লে আসবেন—ঠিকানাটা নিলেন—'

'তাহ'লে নিশ্চয়ই আসবেন।'

শ্যামার ইচ্ছায় এবং ভুনি, টাকুর লাফালাফিতে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল পাড়ায়—হ-বাবু আসবেন প্রিয়নাথদের বাড়িতে। অনেকেই বিশ্বাস করল এবং আবির্ভাবের দিন, ক্ষণ সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতে শুরু করল। যারা বিশ্বাস করল না, প্রিয়নাথদের প্রতি ভালবাসা হেতু তারা বলাবলি করল, বাজে কথা। প্রিয়নাথের বাড়িতে আসবার মত সময় কোথায় তাঁর! ওটা কথার কথা।

শ্যামা, ভুনিদের বিশ্বাসে চিড় ধরল না তবু। যবেই আসুন, বড় মানুষের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বাড়তি উৎসাহ নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল শ্যামা। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ করল প্রিয়নাথ, ঘরদোরের চেহারা ফিরে গেছে তার। পুরনো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে

যা-কিছু সঞ্চয় ছিল তা-ই দিয়ে সস্তার কাপড় কিনে পর্দা বদলেছে জানলার; তাদের বিয়ের ছবির ঘুণধরা ফ্রেমটা পাল্টিয়ে লাগিয়েছে নতুন ফ্রেম। শ্রীযুক্ত এই ঘরদোর মেঝের দিকে তাকালে কেউই আর গরিব ভাববে না তাদের। মনে মনে খুশি হ'লেও একটা আশঙ্কাও পেয়ে বসল তাকে।

একদিন স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এসব যেমন ছিল তেমন থাকলেই হতো। হ-বাবু এলেই কি জীবন বদলে যাবে?'

'তা হয়তো বদলাবে না। তবে মানুষের দয়া থেকে তো বাঁচা যাবে।'

'হ-বাবু এলেও দয়া করেই আসবেন।'

চুপ করে থেকে কিছু ভাবল শ্যামা। তারপর বলল, 'বড় মানুষের দয়ায় পুণ্য থাকে। যদি আসেন, বুঝব ভাগ্য। সকলের বাড়িতে তো আর পা পড়ে না তাঁর।'

'তা অবশ্য ঠিক।' প্রিয়নাথ বলল, 'না এলে সবাই হাসবে। এখনই হাসছে অনেকে—'

'ঈর্ষায়।'

হয়তো ভুল বলেনি শ্যামা, প্রিয়নাথ ভাবল, ঈর্ষা মানুষকে ছোট ক'রে দেয়, আলাদা ক'রে দেয়। এই চিন্তা কিছুটা বিপর্যস্ত ক'রে দিল তাকে।

কয়েকদিন পরে একদিন বিকেলে তুমুল বৃষ্টি নামল। শহর-ভাসা বৃষ্টি; জল পড়তে লাগল প্রিয়নাথের ছাদ চুঁইয়ে। বৃষ্টি থেমে যাবার পরেও বন্ধ হল না জল পড়া। ঘরদোর বাঁচানোর জন্যে বালতি আর বাটি নিয়ে জলের নীচে দাঁড়াল শ্যামা আর ভুনি।

শ্যামা বলল, 'আর দিন দুয়েক এই অবস্থা চললে আমরা ছাদ চাপা পড়ে মরব।'

'তা ঠিক।' প্রিয়নাথ বলল, 'মৃত্যুই দয়া। আজকাল মনে হয় শুধু মৃত্যুই পারে আমাদের বাঁচাতে।'

কথাগুলোয় অর্থ ছিল। প্রিয়নাথের দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত মুখে শ্যামা বলল, 'কী যে বলো। সারাক্ষণ অমঙ্গলের চিন্তা।'

এই সময় হঠাৎ সজোরে ধাক্কা পড়ল দরজায়।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলল প্রিয়নাথ এবং শূন্য চোখে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করল, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বড় মানুষ—হ-বাবু। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'শ্যামা, ভুনি, দেখে যাও—'

'যা বৃষ্টি! তেমনি কাদা!' প্রিয়নাথ স'রে দাঁড়াতেই চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন হ-বাবু, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তা, তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'আছে—'

পুরনো সুজনি-পাতা চৌকির দিকে তাঁকে নিয়ে যেতে যেতে প্রিয়নাথ লক্ষ করল, হ-বাবুর কর্দমাক্ত জুতোর দাগ শ্যামার হাতে নিকানো মেঝেয় ছাপ ফেলে যাচ্ছে পরিষ্কার। এত কাদা কোত্থেকে এল ভাবতে না ভাবতে শ্যামা ও ছেলেমেয়েরা ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

'ইস্ ভুল হয়ে গেল তো! জুতোটা বাইরে খুলে রেখে এলেই পারতাম!'

'না, ও কিছু নয়—', তাঁর পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে বলল প্রিয়নাথ, 'সামান্য কাদা। মুছলেই উঠে যাবে। আপনি আরাম ক'রে বসুন—'

'বসবার সময় কোথায়! গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এখুনি চ'লে যাব হে। নেহাত ছেলেমেয়েদের নাম ক'রে বলেছিলে—'

'তবু, একটু বসুন!'

প্রিয়নাথের ইশারায় ভুনি, টাকু এসে প্রণাম করল হ-বাবুকে।

'মঙ্গল হোক।' আলগোছে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে হ-বাবু তাকালেন ছাদের দিকে, ঘরের আশপাশে। বললেন, 'এটা তো শুনেছিলাম বড়লোকের পাড়া। এরকম বাড়িও আছে নাকি!'

প্রিয়নাথ বলল, 'পুরনো ভাড়াটে ব'লেই টিকে গেছি কোনওরকমে—'

বলতে বলতে চোখ পড়ল শ্যামার দিকে। হাত নেড়ে ডাকল শ্যামা। কাছে পৌঁছুতে বলল, 'কি বিশ্রী কাদা হয়ে গেল মেঝেটা! মুছে দেব?'

'না, না। উনি বিব্রত হবেন। পরে করলেই চলবে। তুমি বরং একটু চা-টা কর।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ ক'রে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্যামা বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম না! দরজার বাইরেটা দ্যাখো। কত লোক!'

শ্যামার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে তাকাল প্রিয়নাথ এবং লক্ষ করল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন পাড়ারই কয়েকজন; অদ্ভুত দৃষ্টি তাঁদের চোখে—কখনও হ-বাবুকে দেখছেন, কখনও মেঝের ওপর তাঁর জুতোর দাগের দিকে। স্বাভাবিক নয় ব'লেই দৃশ্যটা বিমূঢ় ক'রে দিল প্রিয়নাথকে। এঁদের কেউ কেউ তাঁদের বাড়িতে উপলক্ষ হ'লে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন দরজার বাইরে থেকে—ভিতরে ঢোকেননি; সে ঠিক বুঝতে পারল না, আজ ওঁদের ভিতরে ডাকবে কি না। তারপর ভাবল, এই বড় মানুষটির আবির্ভাবের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না তারা, সেইজন্যে আয়োজনও রাখেনি কোনও। এখন ডাকলে বসতে দেবে কোথায়! তখন হ-বাবুর দিকে তাকিয়ে ভাবল, দারিদ্র্যের সংসারে এই মানুষটির আবির্ভাবের আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল কি না। নিজের কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে সে ছুটে গেল হ-বাবুর দিকে।

হ-বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হঠাৎ।

'এরা কারা, প্রিয়নাথ?'

'পাড়া-প্রতিবেশী। আমাদের প্রিয়জন, আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

'এই ভয়ই পাচ্ছিলাম। ভিড়, যেখানেই যাই সেখানেই ভিড়। লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের কোনও পজিটিভ কনট্রিবিউশন নেই। এরা শুধুই ভিড়!'

'দরজাটা বন্ধ করে দেব?'

'না, তা'হলে লোকের কৌতূহল বাড়বে। তোমার এখানে আসা হল—এবার চলি—।'

কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হ-বাবু।

তখনও কোনও আপ্যায়ন ক'রে উঠতে পারেনি শ্যামা। তাঁর চ'লে যাওয়ার শব্দে ছুটে এসে বলল, 'এ কেমন আসা! এর চেয়ে—'

'হ্যাঁ, না এলেই ভাল হতো।' কিছু বা বিরক্তি ও হতাশায় অদ্ভুত শোনাল প্রিয়নাথের গলা, 'ওঁকে ধরে রাখা কি আমাদের সাধ্যে কুলোয়! যাক্‌গে, মেঝেটা কাদা হয়ে গেছে একবারে। মুছে নাও।'

তখনই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। বিব্রত, অন্যমনস্ক প্রিয়নাথকে সম্বোধন ক'রে শ্যামা বলল, 'শুনছ, এ কেমন কাদা! এত ঘষছি, কিছুই তো উঠছে না!'

প্রিয়নাথ বলল, 'কাদা কাদাই। ঠিক ক'রে ঘষো, উঠে যাবে।'

'ঘষছি তো! আর কত ঘষব!' বিরক্ত গলায় বলল শ্যামা, 'কী যে ছাই বড় মানুষ! লাভের মধ্যে শুধু ঘরদোর নোংরা!'

প্রিয়নাথ চুপ ক'রে থাকল।

কিন্তু হাজার ঘষা ও ধোয়ামোছা সত্ত্বেও উঠল না দাগগুলি। ন্যাতা ঘষে না, ঝাঁটা ঘষে না, ঝামা ঘষেও না। প্রিয়নাথের গোটা সংসার তখন সেই দাগগুলির ওপর ঝুঁকে এল এবং লক্ষ করল, দাগগুলি দেখবার জন্যে আরও অনেকে এসে জড়ো হয়েছে, তাদের পিছনে। তাদের চোখে কৌতূহল এবং বিস্ময় ছাড়াও আরও কিছু ছিল। ব্যাপারটা রটনা হতে দেরি হল না। ক্রমশ আরও অনেকে এসে জড়ো হতে লাগল প্রিয়নাথের দরজায়। প্রতিবেশীদের অনেকেই অনেকরকম পরামর্শ দিল এবং দাগগুলি মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুতেই কিছু না হওয়ায় সকলেই ধরে নিল ব্যাপারটা মোটেই মঙ্গলসূচক নয়।

সে যাই হোক, অদ্ভুত এবং অলৌকিক এই ঘটনার পর একটু অন্যরকম হয়ে গেল প্রিয়নাথদের জীবন। তারপর ক্রমশ অন্যরকম হতে লাগল। পাড়ার কারও বাড়িতে কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান হলে কিংবা কোনও বড়ো মানুষের আবির্ভাব ঘটলে আর কেউই ডাকত না তাদের। প্রিয়নাথ বা শ্যামা এই নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করলেও স্বভাববশত ভুনি, টাকু ও বিনি কোন্ বাড়িতে কী কী সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশিত হতে পারে এবং কী ঘটনা আলোচিত হতে পারে, এই নিয়ে চাপা আলোচনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। বাড়ির দরজায় ঘা পড়লেই তারা ধ'রে নিত, বড় মানুষের পায়ের দাগ দেখবার জন্যে কেউ না কেউ এসেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে সরে দাঁড়াত তারা। দর্শনার্থীরা চ'লে গেলে আবার ছিটকিনি তুলে দিত দরজায়। নিঃশব্দে।

একদিন দরজা খুলল না। তখন পুলিশ এল। এবং দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখল, বড় মানুষের পায়ের দাগগুলিকে সামনে রেখে পর পর শুয়ে আছে প্রিয়নাথের পরিবারের শীর্ণ, কঙ্কালসার পাঁচটি মানুষ। কেউই জানতে চাইল না কেন এমন হল।

তবে, অনেকেই বলল, কোনও বড় মানুষের আবির্ভাবের পর অনেক সময়েই এমন হয়।

শেষ খোঁচা না দিয়ে

শেখর বসু

কেমন যেন অভিমানের গলায় মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "তখন থেকে শুধু যাই-যাই করছেন কেন বলুন তো! আমাদের ভাল লাগছে না, না?"

কিছু-কিছু 'আমরা' আছে যার মানে শুধু 'আমি', কিন্তু এখানে আমরা বলতে আমরাই। সৌমিত্র ফ্যাকাশে মুখে বলল, "ন্‌না, সে-কথা নয়, তবে আকাশ কালো হয়ে এসেছে, বৃষ্টি নামলেই—।"

"নামুক না।"

"এক জায়গায় যাবার কথা ছিল যে।"

"এক জায়গা মানে তো আড্ডা, না?"

"হ্যাঁ, অনেকটা তাই, তবে—"

"তবে-টবে কিছু শুনতে চাই না, আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারুন।" কথাটা শেষ করেই মিসেস সেনগুপ্ত ঘরের দুদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বললেন, "কাকু থাকলে মজা হয়, না?"

সঙ্গে সঙ্গে মুনমুন আর ববি বেতারের শিশুশিল্পীদের ঢঙে বলে উঠল, "হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা।"

সৌমিত্র আর একবার জানলা দিয়ে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখ কালো করে সিগারেট ধরাল।

মিসেস সেনগুপ্তর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে, এককালে বোধহয় দেখতে মন্দ ছিলেন না, কিন্তু এখন চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা ঝাড়খণ্ডি ভাব এসে গেছে। চোখেমুখে কিশোরীর ভাব ফুটিয়ে তুলে ভদ্রমহিলা বললেন, "মুনমুন, কাকুকে আর একটা কবিতা শুনিয়ে দাও।"

মুনমুন বোধহয় তৈরিই ছিল, বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যিখানে এসে অ্যাটেনশন হয়ে বলতে শুরু করল, ঝিনেদের জমিদার কালাচাঁদ রায়রা/সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা...

মুনমুন যখন ওর একমাথা কোঁকড়ানো চুল নাচিয়ে হাত নেড়ে কবিতা পড়ছিল

মিসেস সেনগুপ্তর মুখ ঝলমল করছিল খুশিতে। কবিতা শেষ হতেই নকল বিস্ময় চোখেমুখে ফুটিয়ে বললেন, "বাব্বা! এত তুই মুখস্থ রাখিস কী করে রে!"

মা'র কথায় মুনমুনের কোনওরকম ভাবান্তর হল না, কিন্তু সৌমিত্রর বলতে ইচ্ছে করছিল, থাক, আপনার আর অত আদিখ্যেতা করতে হবে না, সব বাচ্চারই কিছু-কিছু ছড়া-কবিতা মুখস্থ থাকে। তবে ও মুখে বলল "বাহ্! আপনার মেয়ে তো খুব মেরিটোরিয়াস। পটাপট আট-নাট কবিতা শুনিয়ে দিল।"

মেয়ের প্রশংসা শুনে মায়ের মুখ আবার কিশোরীর মত হয়ে উঠেছিল। "মেরিটোরিয়াস ঠিকই, একবার পড়লেই ওর সব মুখস্থ হয়ে যায়, কিন্তু ওকে পড়তে বসানো যে কী ঝামেলা! যেমন দিদি তেমন ভাই—ববিটা তো আবার হাতে-পায়ে দুরন্ত—কী ববি, তুমি আর একটা রাইম বলবে নাকি?"

ববি সোফার মাথায় উঠে বসেছিল। ওখান থেকেই ও চেঁচাতে শুরু করে দিল—"হিগ্‌লেডি পিগ্‌লেডি মাই ব্ল্যাক হেন...জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ দ্য হিল...।" তারপরেই ও গলা আরও তুলে স্কুলের পড়া পড়তে শুরু করে দিল, "আইসক্রিম ইজ মেড অব মিল্ক অ্যান্ড সুগার, চেয়ারস আর মেড অব উড, ব্রেড ইজ...।"

ছোট্ট একটা ধমক মেরে ওকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "দুষ্টু কোথাকার, এখন খুব পড়ায় মন বসে গেছে, অথচ পড়ার সময় রাজ্যের খেলা!"

সৌমিত্র কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ওকেও থামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, "অসম্ভব দস্যি, সব সময় ছটফট করছে, তবে শান্ত শুধু ছবি আঁকার বেলায়। আরুণ কে দত্তগুপ্তের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, মস্ত শিল্পী, তাঁর কাছেই ও ছবি আঁকা শেখে। ববি, যাও তোমার ড্রয়িং খাতা নিয়ে এসে কাকুকে দেখাও।"

ববি বাড়ির ভেতর দিকে ছুটল ড্রয়িং খাতা আনতে। সৌমিত্র হতাশ চোখে তাকাল বাইরের দিকে। আকাশ দেখার আর উপায় নেই, সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। দমকা হাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা ভাব, বোধহয় ধারেকাছে কোথাও বৃষ্টি নেমেছে।

ববি তিনটে মোটা-মোটা ড্রয়িং খাতা এনে কাকুর কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। হাঁ-হাঁ করে উঠে মিসেস সেনগুপ্ত বললেন "ছিঃ ওভাবে দিতে নেই ববি।"

সৌমিত্র হাসবার চেষ্টা করল—"তাতে কী হয়েছে, ছেলেমানুষ।" তারপর প্রথম খাতাটার পাতা উলটেই বলল, "বাহ্!"

কী বাহ্? কেন বাহ্? দেখার কৌতূহল চাপতে না পেরে মিসেস সেনগুপ্ত ডিভান ছেড়ে উঠে বসে সৌমিত্রর পাশে দাঁড়ালেন। ড্রয়িং খাতার প্রথম পাতায় লাল, নীল, সবুজ রঙের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে কী যেন একটা ঘুড়ির মত, কী যেন একটা গোরুর মত, কী যেন একটা বেগুনের মত।

সৌমিত্র আর একবার বলল, বাহ্!

তাই শুনে মিসেস সেনগুপ্তই কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গিয়ে বললেন, 'আর্টের ব্যাপার-স্যাপার আমার মাথায় কিচ্ছু ঢোকে না, তবে দত্তগুপ্ত বলেছেন, ববির পাওয়ার অব ইমাজিনেশন নাকি সাঙঘাতিক!'

"সত্যিই তাই, সাঙঘাতিক!" যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনটে মোটা-মোটা খাতা ওলটাবার পরে মাথা তুলতেই সৌমিত্র দেখতে পেল, সেন্টার-টেবিলের ওপর হারমোনিয়াম সাজিয়ে বসে আছে মুনমুন। ওর দিকে তাকাতেই মুনমুন চেঁচিয়ে উঠল, "কোনটা গাইব মা? আগুনের পরশমণি?"

"বেশ।" মিসেস সেনগুপ্ত ওদিকের সোফায় বেশ তদগত হয়ে বসলেন।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হারমোনিয়াম থেকে সাতটা অবাধ্য পাখি লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল সমানে। চোয়াল শক্ত করে ঘড়ি দেখল সৌমিত্র। রেকর্ডের একটা গান শেষ হতে সাধারণত মিনিট তিনেক সময় লাগে, এটা না হয় ছ-মিনিট লাগুক, কিন্তু ছ-মিনিট পরে উঠতেই হবে ওকে।

তবে, মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। আগুনের পরশমণির মধ্যে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে। বৃষ্টি দেখে সৌমিত্রর চোখে জল এসে গেল প্রায়। শনিবারের জমাটি আড্ডাটা নিছক মাঠে মারা গেল। এ যা বৃষ্টি, চট করে ধরবে বলে মনে হয় না। তার ওপর এদিকে আবার এক পশলা বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় রাস্তায়।

ওদিকে বৃষ্টি পেয়ে বেজেই চলল মুনমুন—সখী বয়ে গেল বেলা...কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি...দিনের শেষে ঘুমের দেশে...আমি জেনেশুনে বিষ...।

গান শেষ হবার পরের কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে রইলেন মিসেস সেনগুপ্ত, তারপর সামান্য বিহ্বল চোখে তাকালেন সৌমিত্রর দিকে। সন্ধের আড্ডা মাটি করে দেবার জন্য সৌমিত্র এইমাত্র যে গলাগালিটা মনে মনে দিল সেটা লেখা যায় না, বলোও যায় না পাঁচজনের সামনে।

মিসেস সেনগুপ্ত চোখের বিহ্বলতা আর একটু গাঢ় করে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন শুনলেন মুনমুনের গান?"

"ওহ্ দারুণ। এই টুকু মেয়ে এত ভাল গায়, ভাবাই যায় না। কারও কাছে শেখে নিশ্চয়ই।"

ভদ্রমহিলা নিজের মনে একটু হেসে নিয়ে বললেন, "আর বলবেন না, ছেলেমেয়েদের পেছনে খেটে-খেটেই আমার দিন-রাত্তির কেটে যায়। ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে একজন রেডিও আর্টিস্টের কাছে, আর ক্ল্যাসিক্যাল এক ওস্তাদের কাছে। গানের ক্লাসে ওকে পৌঁছে দিয়ে আমি ববিকে নিয়ে যাই সাঁতার শেখাতে আর ট্যুইশন দিতে। রোববার সকালে মুনমুন আবার নাচ শিখতে যায়।"

"নাচ!" সৌমিত্রর মাথার মধ্যে এক হাজারটা ঘুঙুরের বোল ফেটে পড়ল একসঙ্গে।

"হ্যাঁ, ও তো কথ্থক শেখে রামস্বামীর কাছে, মুনমুন—"

প্রায় আঁতকে উঠে সৌমিত্র বলল, 'ন্‌না, ওকে এখন আর নাচতে বলবেন না। আসলে, এত সুন্দর-সুন্দর গান শুনিয়েছে যে গানের রেশটা এখনও...।

প্রতিভার প্রশংসা শুনে প্রতিভাময়ীর মা বেশ খুশি হলেন, তারপরে মৃদু আদেশ আর সামান্য ভালবাসা মিশিয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, তাই না? তোমরা এক কাজ কর, এই বৃষ্টি পড়া নিয়ে দুজনে দুটো কবিতা লিখে নিয়ে এস তো। ওই ঘরে বসে লেখ, আমি আর কাকু ততক্ষণ একটু গল্প করি, কেমন?'

ব্যাজার মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুনমুন আর ববি।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে আড্ডার শেষদিকটা ধরার শেষ আশা বিসর্জন দিয়ে সৌমিত্র বলল, 'ওরা কবিতাও লেখে?'

রত্নগর্ভা লজ্জা পেলেন আর একবার, তারপর একটু থেমে থেমে বললেন, 'ওদের এদিকের ঝোঁকটার কথা আমি জানতাম না দিগন্তবাবুই ধরিয়ে দিলেন একদিন। দিগন্তবাবু মানে লেখক দিগন্ত রায়। ইস কী দারুণ লেখেন! আর, ভদ্রলোক মেয়েদের মনের কথা এত জানেন কী করে, কে জানে! একদিন চেপে ধরেছিলাম, এতসব গোপন কথা আপনি জানলেন কী করে বলুন তো?'

"কী বললেন?"

'কিছু না, স্রেফ মুচকি-মুচকি হাসলেন। তা, দিগন্তবাবু আমাদের বাড়িতে আসেন মাঝে মাঝে, ওঁর কাছেই একদিন শুনলাম, ছেলেমেয়েদের ঝোঁক আছে সাহিত্যের। শুনে তো আমি অবাক। তবে ওঁর একটা উপদেশ আমি মেনে চলি। বলেছেন, যত পারেন গল্পের বই পড়িয়ে যাবেন ছেলেমেয়েদের। ওতে নাকি ওদের ভাষাটাষা ভাল হয়, কল্পনাশক্তি বাড়ে। তবে ওদের সময় কম তো, তাই আমি রুটিন করে ওদের গল্পের বই পড়তে দিই।'

"রুটিন করে! বাহ্!"

মিসেস সেনগুপ্ত আবার নিজের মনে একটু হেসে নিয়ে বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু আমাদের চাইতে অনেক বেশি লাকি, তাই না? আমাদের বাবা-মা'রা আমাদের পেছনে এত খাটতেন না। অবশ্য যুগও পালটে গেছে। আমরা ছোটবেলায় বাবা-মাকে দেখলেই পালাতাম, আর এখন? আমি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে একেবারে বন্ধুর মত মিশি, এই যে—'

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ একটা লজ্জার হাসি হেসে নিয়ে মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "আজকাল টিভিতে কী বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি সব বিজ্ঞাপন দেয়। ছেলেমেয়েরা দেখলেই জিজ্ঞেস করত, মা ওটা কী? আগে কথা ঘোরাতাম, তা একদিন ওদের মত ক'রে বুঝিয়ে দিলাম।"

"ওদের মত করে!"

"হ্যাঁ, মানে, এই বয়েসে ওদের পক্ষে যতটুকু বোঝা সম্ভব সেইভাবেই বোঝালাম।"

"বুঝল?"

"কিছুটা বুঝেছে নিশ্চয়ই। ওই বিজ্ঞাপনটা দেখে, কই, আর কখনও তো কিচ্ছু জিজ্ঞেস করেনি। মুনমুন অবশ্য টিভিতে তেমন ইন্টারেস্টিং প্রোগ্রাম না থাকলে বসে বসে উল বোনে!"

"ওইটুকু মেয়ে, উলও বোনে!"

"হ্যাঁ, মোটামুটি মন্দ পারে না, আমিই জোর করে শিখিয়েছি। শুধু খেলাধুলো করে সময় নষ্ট না করে একটু-আধটু কাজ শেখা ভাল, তাই না?"

সৌমিত্র অন্যমনস্ক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়েছিল বসে সায় দেওয়া আর হয়ে উঠল না। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, আড্ডার বন্ধুরা ওকে বোধহয় এখন খিস্তি করে উঠে পড়ার তাল করছে।

মিসেস সেনগুপ্ত হয়তো আগের প্রসঙ্গের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিলেন। একটু থেমে বললেন, "ববিটাকে ফুলগাছের নেশা ধরাবার তালে আছি। ভোর হলেই ছাতে নিয়ে গিয়ে ফুলগাছের গোড়ায় জল দেওয়াই, গাছ চেনাই। তবে কি জানেন, গাছের চাইতে ওর সাইকেলেই উৎসাহ বেশি। ছোট্ট একটা দু'চাকার সাইকেল কিনে দিয়েছি, মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই শিখে যাবে। শিখে গেলেই সাইকেলটা তুলে রাখব।"

"কেন?"

মিসেস সেনগুপ্ত কিশোরীর মত দুলে দুলে হেসে উঠলেন, তারপর শরীরের সব তরঙ্গ থেমে গেলে বললেন, "শুনেছি সাঁতার আর সাইকেল কেউ একবার শিখে গেলে আর ভোলে না। শিখে যাওয়া জিনিসের পেছনে আর সময় নষ্ট করাবার কোনও মানে হয়? আমি তো আর আমার ছেলেকে চ্যাম্পিয়ন সাইক্লিস্ট বা সুইমার বানাতে চাই না।"

"বাহ্! বাহ! তা, এরপর আপনার ছেলেকে কি ঘোড়ায় চড়া শেখাবেন?"

ভদ্রমহিলা সরল বিশ্বাসে প্রশ্নটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে ঘোড়া কোথায় পাই বলুন তো! তা ছাড়া, ঘোড়ায় চড়া শিখেই বা কী লাভ?"

বহুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে থাকার পরে এই প্রথম মজা পেতে শুরু করল সৌমিত্র। চোখ বড়-বড় করে বলল, "লাভ নেই? কী বলছেন আপনি? ধরুন আপনার ছেলে বড় হয়ে আই পি এস-এ কোয়ালিফাই করে ট্রেনিং নিতে গেলে মুসৌরি কিংবা মাউন্ট আবুতে, তখন ঘোড়ায় চড়া মাস্ট। ছেলেবেলায় শেখা থাকলে তখন ওর কত সুবিধে হবে।"

সৌমিত্রর কথায় ভদ্রমহিলা বোধ হয় সত্যি-সত্যি একটু চিন্তার মধ্যে পড়লেন।

বাইরে তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে। ওই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সৌমিত্র পরিষ্কার বুঝতে পারল, শনিবারের আড্ডা টেনেটুনে যতই লম্বা হোক না কেন আজ ওর পক্ষে সেটা ধরা আর কোনওমতেই সম্ভব নয়। একটা দিক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে আর একদিকে তাকায় মানুষ। মজা করার ঝোঁকটা এবার ওকে পেয়ে বসল আস্তে আস্তে। দেয়ালে ঝোলানো অয়েলপেন্টিংটা একবার দেখে নিয়ে সৌমিত্র বলল, "আপনার মেয়ের গানের গলা সত্যিই দারুণ! ক্লাসিক্যাল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে, ভাল, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি—"

"সেই সঙ্গে কী?"

"একটু যদি বাউল গান শিখত! মানে বলছিলাম কি, আজকাল বাউল গান তো বিদেশে দারুণ পপুলার হয়ে উঠছে, তাই...।"

ভদ্রমহিলা হঠাৎ অসম্ভব উৎসাহী হয়ে উঠে বললেন, "কোথায় শেখানো যায় বলুন তো?"

কপালে অনেকগুলো ভাঁজ ফেলে সৌমিত্র বলল, "শেখাবার তো জায়গার অভাব নেই, তবে ভাল বাউল শেখাতে হলে আপনাকে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। পারবেন কি আপনি?"

জেদী ভাল ছাত্রীর মত উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা "খু-উ-ব পারব, বলুন না কোথায়?"

"ধরুন এই ভোরবেলায় উঠে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, ফিরলেন রাত্তিরে। প্রথম-প্রথম সপ্তাহে একদিন, তারপরে না হয়—।"

"জায়গাটা কোথায় বলুন না?" রীতিমত ছটফটে হয়ে উঠলেন মিসেস সেনগুপ্ত।

সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সৌমিত্র, তারপর আরও সময় নিয়ে মুখের সব ধোঁয়া বার করে দিয়ে বলল, "বীরভূমে।"

ভদ্রমহিলা কেমন যেন আঁতকে উঠে মুখ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ বার করলেন।

সৌমিত্র মনোযোগ দিয়ে অয়েলপেন্টিং দেখতে শুরু করে দিল আবার। বাইরে আগের মতই একটানা বৃষ্টি, একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ আর ঘরের মধ্যে একই রকমের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া।

মিসেস সেনগুপ্ত বোধ হয় মনে মনে কলকাতা-বীরভূম দূরত্বের অঙ্ক কষছিলেন, হঠাৎ সেটা থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে আর এক কাপ কফি দিই?"

"ন্‌না, এখন আর কফি খাব না, উঠতে হবে এবার। আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

ভদ্রমহিলা সুরেলা ঘড়ির ঢঙে ডাকলেন, "মুনমু-উ-উ-উন, ববি-ই-ই-ই।"

ওদিক থেকে কোনও সাড়া ভেসে এল না।

"আসছি" বলে উঠে গেলেন ভদ্রমহিলা, একটু বাদে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললেন, "বাঁদর দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে।"

সমব্যথীর গলায় সৌমিত্র বলল, "সন্ধে থেকে ওদের ওপর তো কম ধকল যায়নি, ঘুম তো পাবেই। রাত্তিরের খাওয়াও বোধ হয় হয়নি?"

"খাবে।"

বিব্রত হয়ে উঠল সৌমিত্র। "খেতে দিয়ে দিন ওদের, আমি একটু বসছি।"

"কটা বাজে এখন?"

"পৌনে নটা।"

ভদ্রমহিলা সোফার ওপর বেশ গুছিয়ে বসে বললেন, "ওদের খেতে দিই সোয়া-নটায়।"

"সে কি? রোজ অতক্ষণ ওরা জেগে থাকতে পারে?"

"না পারলে ঘুমোয়, ঘুম থেকে তুলে খাওয়াই। আমি ওদের খাওয়ার সময়টা পাংচুয়ালি ফলো করি।"

সৌমিত্র এই প্রথম লক্ষ করল ভদ্রমহিলার নাকের পাশে, চোখের ধারে সরু সুতোর মত কয়েকটা রেখা ছড়িয়ে গেছে। চোখের কটা মণিদুটোর ওপরে কেমন যেন একটা খটখটে ভাব। ওর নিজের মধ্যে আগের সেই মজা করার ভাবটা নেই, তার বদলে বিচিত্র একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। খোঁচা দেবার অদ্ভুত একটা ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। হাতের আধখানা সিগারেট অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সৌমিত্র থমথমে গলায় বলল, "কিছুদিন আগে কী একটা কাগজে নামকরা সাইকিয়াট্রিস্টের একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম, পড়েছেন আপনি?"

হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট একটা হাই তুলে মিসেস সেনগুপ্ত মাথা নাড়ালেন দুদিকে।

"ভয়ংকর সব খবর জানিয়েছেন ভদ্রলোক। কলকাতায় বাচ্চাদের মধ্যে মেন্টাল কেসের সংখ্যা নাকি হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে।"

"কেন?"

"তার জন্যে নাকি বাচ্চাদের মা-বাবারাই দায়ী।"

নড়েচড়ে বসলেন মিসেস সেনগুপ্ত। "সে কি!"

"হ্যাঁ, তাই তো লিখেছে। সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক বেশ কয়েকটা কেস-হিস্ট্রি রেফার করে জানিয়েছেন, কলকাতার বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েছে। অবস্থা নাকি রীতিমত অ্যালার্মিং, আর এ জন্যে মা-বাবারাই নাকি...।"

"কিন্তু এর জন্যে মা-বাবারা দায়ী হবে কেন?" কেমন যেন অসহিষ্ণু গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা। বাইরে আগের মতই বৃষ্টি পড়ছে, তবে হাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাব আগের চাইতে বেশি। হঠাৎ দমকা বাতাসে পেডেসট্যাল ল্যাম্পের টুপি নড়ে

গিয়ে অদ্ভুত সব ছায়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। সাইকিয়াট্রিস্টের একটা নাম বানিয়ে নিয়ে সৌমিত্র বলল, "ভদ্রলোকের নাম ডক্টর আচারিয়া, একগাদা বিলিতি ডিগ্রিটিগ্রি আছে, ওঁর কথা একেবারে ফেল্‌না বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

অসহিষ্ণুতার শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। "কিন্তু উনি বাবা-মাদের ঘাড়ে দোষ পাচ্ছেন কেন বলুন তো?"

"দোষ নয়, আসলে উনি যা-যা জানিয়েছেন সে সব তো ফ্যাক্ট?"

"কী ফ্যাক্ট?"

"ডক্টর আচারিয়া জানিয়েছেন, কিছু কিছু বাবা-মা চাইছে তাদের ছেলেমেয়েরা রাতারাতি সব ব্যাপারে পণ্ডিত হয়ে উঠুক। তার ফলে তারা বাচ্চাদের ওপর এত চাপ দিচ্ছে যে বাচ্চারা ওভারওয়ার্কড হয়ে যাচ্ছে, তাদের ব্রেন আর ঠিকমত কাজ করছে না। এব রেজাল্ট হচ্ছে মাথার দোষ—।"

"মাথার দোষ!" কেমন যেন শিউরে উঠলেন মিসেস সেনগুপ্ত।

"মাথার দোষ মানে পুরোপুরি পাগল নয়, তবে প্রচণ্ড চাপ পড়ার ফলে কোনও কোনও বাচ্চা অসম্ভব ভীতু, কেউ কেউ ভায়োলেন্ট টাইপের হয়ে যাচ্ছে। কেউ বাড়ি থেকে পালাচ্ছে, কেউ ক্রাইম করছে। আবার কেউ কেউ জড়ভরতগোছের হয়ে যাচ্ছে, তোতলাও হয়ে পড়ছে কেউ কেউ।"

"তোতলা?" প্রায় তোত্‌লার মত করেই জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সেনগুপ্ত।

"ডক্টর আচারিয়া তো তাই বলেছেন। এ সবই নাকি বাচ্চাদের মাথাকে খুব বেশি ট্যাক্স করার কুফল। আসলে বাবা-মারা নাকি নিজেদের শখসাধগুলো বাচ্চাদের দিয়ে মেটাতে গিয়ে এই কাণ্ডটা করে ফেলছে। বিদেশে বাচ্চাদের ছ বছরের আগে অক্ষর চেনানো হয় না, অথচ এখানে ওই বয়সী বাচ্চারা নাকি গিনেস বুক অফ রেকর্ডসের এক-একটা পকেট-এডিশন। আপনার কী মনে হয়? কথাগুলো সত্যি?"

কেমন যেন একটু সিঁটিয়ে গিয়ে মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "আমি কী করে বলব!"

"না, মানে, আপনি তো আর পাঁচটা বাচ্চাকে দেখে থাকেন, আপনার কী মনে হয়?"

মিসেস সেনগুপ্ত কোনও উত্তর দিলেন না, কিন্তু ওঁর চোখমুখ দেখে সৌমিত্রর মনে হল, ভদ্রমহিলা এই মুহূর্তে মনে মনে দুটি বাচ্চার আচার-আচরণের ছবি দেখছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বৃষ্টির জোর কমে গেছে, হাওয়ায় বেশ একটু ফুরফুরে ভাব। শোধ তুললে পারলে যেমন মেজাজ হয় ঠিক সেই রকম একটা মেজাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল সৌমিত্রর। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "এই সব বাচ্চারা নিজেদের বাবা-মাকে সব চাইতে বড় শত্রু বলে মনে করে। ডক্টর আচারিয়া তো পর পর কয়েকটা

কেস-হিস্ট্রি তুলে দিয়েছেন। একটায় আছে—মা ঘুমোচ্ছে, আর সেই সময় তার ছোট ছেলে এক বোতল চিলি সস এনে মায়ের কানে—!"

মিসেস সেনগুপ্ত প্রায় আঁতকে উঠে সৌমিত্রকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।"

ভদ্রমহিলা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সৌমিত্র বেশ আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল। বৃষ্টি ধরে এসেছে প্রায়। এখন ওঠা যেতে পারে, তবে এখন ওঠাও যা দু-দশ মিনিট পরে ওঠাও তাই। আড্ডা বলে তো আজ আর কিছু নেই, এখান থেকে বাড়ি ফিরতে হবে সোজা।

আরামের কিং-সাইজ অর্ধেক পুড়ে যাবার পরে দরজার দিকে তাকাল সৌমিত্র। কী ব্যাপার, ভদ্রমহিলা ফিরছেন না কেন এখনও। ভেতরের ঘর থেকে কোনও রকম সাড়াশব্দ ভেসে আসছে না, তার মানে বাচ্চারা যেমন ঘুমোচ্ছিল ঠিক তেমনিই ঘুমোচ্ছে। কী করছেন তাহলে মিসেস সেনগুপ্ত? ও ঘরে একবার উঁকি দিতে পারলে মন্দ হত না, কিন্তু এত সামান্য পরিচয়ে ভেতরের ঘরে যাওয়া যায় না।

কৌতূহল আরও বেড়ে উঠতেই সৌমিত্র নিজের চোখ দুটোকে এক্স-রে আই বানিয়ে ফেলল। আর বানিয়ে ফেলতেই দেখতে পেল, ফুলের মত দুটো বহুমুখী প্রতিভার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তাদের মা।

সময় গড়াতে গড়াতে সোয়া ন'টা বাজতেই রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল সৌমিত্র। এখন তো বাচ্চাদের খাওয়ার সময়। ভদ্রমহিলা নাকি ঘড়ি ধরে বাচ্চাদের খাওয়াতে বসেন, কিন্তু কই, ঘুমন্ত বাচ্চাদের ঘুম ভাঙার কোনওরকম সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো! খাওয়ার ঘরটা আবার এপাশে, নিঃশব্দে হেঁটে এলেও লম্বা বারান্দায় ওদের কাউকে না কাউকে ঠিক দেখা যেত। তাহলে কি ঠিক সময়ে বাচ্চাদের খাওয়ার নিয়ম আজকেই প্রথম ভাঙল।

ন'টা পঁচিশে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সৌমিত্র। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুক-খুক করে কেশে জুতোর শব্দ তুলল। একটু পরেই ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা। মনে মনে শেষ খোঁচাটা সাজিয়ে রেখেছিল সৌমিত্র। ভেবেছিল—বলবে, বীরভূমের একজন নামকরা বাউলের সঙ্গে আমার চেনাশোনা আছে, যদি চান তো আলাপ করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বারান্দার অল্প আলোয় ভদ্রমহিলার মুখ এত অসম্ভব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল যে খোঁচা-দেওয়া শেষ কথাটা মুখেই এল না ওর। কোনও মতে "আজ তাহলে চলি" বলে লম্বা পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সৌমিত্র।

তুমি খুন করেছ

সুব্রত সেনগুপ্ত

ভীষণ চটে অপু বলল, তোমার এত বাহাদুরি দেখানোর কী দরকার?

বাহাদুরি!—ভাস্বর ডান হাতে মাথার ব্যান্ডেজটা একবার ছুঁয়ে প্রতিবাদ করে, বাহাদুরির কী আছে? আমি একজন পেশাদার। আমার কাজ ছবি তোলা। ছবি তো আমাকে তুলতেই হবে।

—তাই বলে নিজের জীবন বিপন্ন করে?

—দ্যাখো তোমাকে এর আগেও বলেছি, জীবন বিপন্ন-টিপন্ন বুঝি না, চোখের সামনে ছবি তোলার সাবজেক্ট পেলে আমাকে ক্যামেরার শাটার টিপতেই হবে। তাতে যা হয় হোক।

—যা হয় হোক! কতগুলো খুনে গুণ্ডা ইলেকশনের বুথ দখল করার জন্য রিভলভার হাতে ছোটাছুটি করছে তুমি সেই ছবি তুলতে গেছ! যদি ওরা গুলি চালাত?

—তুমি যা বলছ তাতে তো চাকরি-বাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকতে হয়।

—বসে থাকতে কে বলেছে। আরও তো কত প্রেসফোটোগ্রাফার আছে, তারা সবাই তো এত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে না।

—যে করে না, সে করে না। তাছাড়া...

—এই যে অম্বিকাদা বা ধর মুকুল, ওরাও তো চিত্রসাংবাদিক, নাকি? ওদের খাতির কিছু কম?

—দূর যার যা অ্যাসাইনমেন্ট, অফিস যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেবে...

—ওদের দায়িত্ব কী শুনি?

—কেন তুমি জান না? অম্বিকাদার কাজ হল জলসা-টলসা—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবি তোলা। মাঝে মাঝে গায়ক-গায়িকাদের পোর্ট্রেট করতে হয়। আর মুকুল তো স্পোর্টসের লোক। ওর কাজ রোজ ময়দানে যাওয়া। কোথায় ফুটবল মাঠের বারপুজো হচ্ছে, কারা-কারা মাঠে প্র্যাক্টিস করছে এসব ছবি তুলে আনে; ব্যস।

—এগুলোও তো কাজ, নাকি?

—কাজ তো বটেই।

—তাহলে তোমাকেই শুধু কোথায় দাঙ্গা লেগেছে, কোথায় কী ঝামেলা হয়েছে সেখানেই ছুটতে হবে কেন?

ভাস্বর হেসে বলে, যার যা কাজ। তবে আমি তো অন্যরকম ছবিও তুলি। অবশ্য মাঝে মাঝে। ক'দিন আগে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসবের ছবি তুলতে গিয়েছিলাম...

—সেও তো এক কাণ্ড করেছ। গাছে উঠে নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে তারপর ছবি তুলেছ!

—বাহ্ ছবি তোলার জন্য দু'টো হাতই কাজে লাগাতে হবে তো। এক হাতে গাছের ডাল ধরে রেখে আরেক হাতে তো ছবি তোলা যায় না। আবার কোনওভাবে নিজেকে আটকে না-রেখে ছবি তুলতে গেলে, তখন তো আর খেয়াল থাকে না; একটু এদিক-ওদিক হলেই ব্যস নিচে পড়ে যাব।

—কী দরকার তোমার গাছে ওঠার?

—যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বল কেন? ওপর থেকে না-তুললে পুরো ভিউটা পাব কী করে? থাকগে...

—তুমি আমাকে ওরকম বাজে ভাবে বললে কেন: যা বোঝো না?—এত কী বোঝার আছে? ওখানে নিশ্চয় আরও ফোটোগ্রাফার গিয়েছিল। তারা সবাই হনুমানের মত লাফিয়ে গাছে উঠেছে? ওঠেনি। তাদের ছবি কাগজে ছাপা হয়নি?

—তোমাকে কী করে বোঝাই, সবার কাজের ধরন এক নয়, এক হতে পারে না।

—সে যাই বল, তোমার একটু বাড়বাড়ি করার দিকে ঝোঁক আছে।

—একে তুমি বাড়াবাড়ি বলছ! নিখুঁতভাবে একটা ছবি তোলার জন্য এককেজন ফোটোগ্রাফার কি আমানুষিক পরিশ্রম করে, কষ্ট আর ধকল সহ্য করে, কীরকম ঝুঁকি নেয় তুমি ধারণা করতে পারবে না।

—আমার ধারণা করে কাজ নেই।

ভাস্বর আবার তাঁর ডান হাত নিজের মাথার ব্যান্ডেজে ছোঁয়ায়। ছুঁয়ে সে কিছু বলার আগেই অপু উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করে, তুমি বার বার মাথায় হাত দিচ্ছ কেন, এখনও ব্যথা আছে?

—ব্যথা ঠিক নয়, মাঝে মাঝে কেমন চিন চিন করে উঠছে।

—ডাক্তারকে বলেছ?

—বলিনি। বিকেলের দিকে একবার যাব ভাবছি।

—ভাবাভাবির কিছু নেই। যাও।

ভাস্বর মিটিমিটি হেসে বলে, তুমি এখানে শুয়ে পড় না বেশ শুয়ে শুয়ে গল্প করি?

—ধুত যা মুখে আসে তাই বলে...

—কী হয়েছে? মা-তো বাড়ি নেই। বোনও কলেজে গেছে...

—তুমি শুয়ে পড়। তোমার নিশ্চয় ক্লান্ত লাগছে। আমি বেশ বসে আছি। তুমি আর বেশি কথাও বলো না।

ভাস্বর হঠাৎ অপুর কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে সামনের দিকে টানে। বাধা দেয় অপু, এই একদম জোরজবরদস্তি করবে না। তোমার শরীর এখন দুর্বল।

কিন্তু ভাস্বর তার কথায় কান না-দিয়ে আচমকা সবলে আকর্ষণ করতে অপু তার পর্যাপ্ত পরিমাণ স্তনভার নিয়ে ভাস্বরের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাতর স্বরে বলে ওঠে, আহ্ করছ কী, তোমার মাথায় লেগে যাবে।

নরম গলায় ভাস্বর বলে, কিচ্ছু লাগবে না।

অপু ভাস্বরের জামার একটা...

প্রথমে একটা তারপর দু-টো বোতাম খুলে দেয়।...তারপর খোলা রোমশ বুকে একবার নাক ঘষে নিয়ে স্বগতোক্তির মত বলে ওঠে, তুমি লোকটা সত্যি একটু অদ্ভুত টাইপের।

বুকের ওপর অপুর ভার নিয়ে আস্তে আস্তে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে ভাস্বর বলে, একটু অদ্ভুত যদি না হতাম...

তার মুখে হাত চাপা দিয়ে অপু বলে, ব্যস ব্যস আর তোমাকে অহঙ্কার দেখাতে হবে না।

হাত সরাতে বিস্মিত ভাস্বর প্রশ্ন করল। অহঙ্কার দেখাব মানে?

—আমি তো জানি তুমি কী কী বলবে।

—কী বলব?

—বলবে, প্রথমে মফস্সলের কাগজে, তারপর কলকাতার ছোট একটা দৈনিকে, সেখান থেকে প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে তারপর সারা ভারতে প্রচুর কাটতি আছে এরকম একটা ইংরেজি নিউজ ম্যাগাজিনে...

ভাস্বর বলল, ধুস, আমি কী ভাবছি আর তুমি কী বলছ!

—কী ভাবছ তুমি, শুনি?

ভাস্বর দু-হাত অপুর পিঠের ওপর রেখে জোরে চাপ দিয়ে বলল, একটু অদ্ভুত না হলে কি এরকম সুন্দরী একটা মেয়েকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখতে পারতাম, সাহস পেতাম দেখার?

—তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ নাকি!

—তা অবশ্য ঠিক। স্বপ্নটপ্ন আমার খুব একটা আসে না। পেশাদারিত্বের চর্চা করতে করতে কীরকম যেন হয়ে যাচ্ছি, নিজেই বুঝতে পারি।

—পেশাদাররা স্বপ্ন দেখে না?

—কী জানি?

—কীরকম হয়ে যাচ্ছ যখন বুঝতেই পার...

—বুঝেও কিছু করার নেই। আমার ব্যবহারে অনেকে আঘাত পায় কিন্তু আমি আঘাত দিতে চাইনি, শুধু নিজের কাজটা করতে চেয়েছি...আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া, আড্ডা দেওয়া এসব তো উঠেই গেছে...যাক ওসব কথা। তোমাকে বোর করছি।

—না বোর টোর নয়। এ তো একটা সমস্যা।

—হয়তো সমস্যা, কিন্তু সব জায়গাতেই তো এই কথাটা চলছে প্রফেশন্যালিজম...

—সত্যি। এমনকী খেলার মাঠেও...আমাদের ছেলেবেলায় একটা কথা শুনতাম —স্পোর্টসম্যানশিপ...খেলোয়াড়িচিত মনোভাব। এখন শুনি প্রফেশন্যালিজম...প্রফেশন্যালদের মধ্যে কিলার ইনস্টিংক্ট থাকতে হবে। যে করে হোক প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে হবে। জয় কেড়ে নিতে হবে। জয় চাই জয়। এথিকস টেথিকস মাথায় থাক, বিরোধী পক্ষকে যেনতেন প্রকারেণ থামিয়ে দিতে হবে, দমিয়ে দিতে হবে। কারণ জয় চাই জয়। খেলোয়াড়িচিত মনোভাব খেলার মাঠে তো নেই-ই; কথাটাও যেন অর্থহীন হয়ে গেছে...

ভাস্বর হাসল। তুমি যখন এক টানা কথা বল মনে হয় যেন তোমার পেছনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলছে! যে কোনও সময় তুমি হাতে চক নিয়ে লিখতে শুরু করবে!

রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলে অপু, তুমি কিন্তু আমার প্রফেশন নিয়ে ঠাট্টা করছ।

—না মিস। তা কি আমি করতে পারি! আচ্ছা, তুমি তো কেমিস্ট্রি পড়াও, সাবজেক্টটা কেমন?

—দারুণ সাবজেক্ট! সব কিছুর মূলেই রসায়ন। এই যে জগৎ, জীবন...

ভাস্বর অপুর কোমরের মসৃণ খাঁজে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, এই আবার বক্তৃতা শুরু হল!

ভাস্করের শরীরের ওপর উপুড় হয়ে থাকা প্রায় নাচের ভঙ্গিতে হাত এবং পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চেঁচাতে লাগল, অ্যাই...আই...না...না...

অপু উঠে পড়ল, অবিন্যস্ত শাড়ি-ব্লাউজ ঠিক করতে করতে বলল, তুমি জানো না আমার ভীষণ সুড়সুড়ি...

উঠে পড়ল ভাস্বরও।

এরপর ভাস্বরের সঙ্গে অপুর দেখা হল বেশ কয়েক দিন পর। এক বিয়েবাড়িতে। অপুর মাসতুতো বোন তিস্তার বিয়েতে। মাঝখানে ভাস্বরকে কয়েক দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। অফিসের কাজে। অপু ভাস্বরের অফিসে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। প্রতিবারই শুনেছে, ও একটা কাজে বাইরে গেছে।

অপু ভেবে পায় না, কী এমন গোপন কাজ যে কোথায় গেছে তাও বলা যাবে না! কী কাজ, জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়েছে, অফিসেরই কাজ। আবার কোন বিপদের কাজে লোকটা ছুটে গেছে কে জানে? দৈনিক পত্রিকা হলে না হয় কাগজে ছাপা

ছবি নিচের নাম দেখে সে বুঝতে পারত, কেমন জায়গায় গেছে, কাজের ধরনটাই বা কী? কিন্তু ও এখন যেখানে কাজ করে সেটা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মাত্র দিন দুয়েক আগে পত্রিকাটার একটা সংখ্যা বেরিয়েছে, পরেরটা বেরোতে দেরি আছে। সেটা বাজারে আসার আগে ভাস্বরই হয়তো ফিরে আসবে। তখন তো সবই জানা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গেছে, যাওয়ার আগে একটা খবর দিয়েও গেল না? একটা ফোন করলেও তো হত। ওর মা-ও জানেন না, ছেলে কোথায় গেছে। অফিস থেকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নাকি শুধু বলেছে, জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি।—অদ্ভুত, একবারও মনে হয়নি, অপুকে একটা খবর দেওয়া উচিত!—নাহ্ এই লোকটা তাকে জ্বালাবে। সেদিন ভোটের ছবি তুলতে গিয়ে মাথায় লাঠি পড়েছে। এবার কী হবে কে জানে? অপুর সমস্ত ব্যাপারে এত দুশ্চিন্তা হয়, উদ্বেগ হয় এত। এর জন্যই ওকে হয়তো একদিন ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে। খোঁজ নিতে হবে, দুশ্চিন্তা কমানোর কোনও ওষুধ আছে কি না? আচ্ছা, অপুর এত চিন্তা, ভাস্বর কি কখনও তাকে নিয়ে ভাবে? কোনওরকম দুশ্চিন্তা হয়?—দেখে তো মনে হয় না। আর ও এই যে কিছু না বলে বাইরে চলে গেল, না-বলে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে? সময় পায়নি, নাকি কাজটার কথা, কাজের জায়গার কথা সে তার কাছেও গোপন করতে চায়? তার মানে তাকেও সে বিশ্বাস করে না? আরেকটা কারণ, অবশ্য হতে পারে। ভাস্বর জানে, অপু সব কিছুতে খুব টেনশনে ভোগে, সেজন্য কাজের ঝুঁকির কথা ওকে আগে থেকে জানায়নি?—নাহ্ তার সম্ভাবনা খুবই কম। ভাস্বর নিজেকে নিয়ে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাবে না, ভাবে? কীরকম হয়ে যাচ্ছিটাচ্ছি—এসব মুখে যতই বলুক ও ষোলোআনা পেশাদারই হতে চায়, নিজের মধ্যে দেখতে চায় সেই কিলার ইনস্টিংক্ট।—আচ্ছা, কিলার ইনস্টিংক্টের বাংলা কী?...হত্যার প্রবণতা? খুনের প্রবণতা...নাকি খুনে জেদ? নাহ্ ঠিক হচ্ছে না...তবে...ধুস রাগের মাথায় বড্ড বাড়াবাড়ি করছে অপু। হতেই পারে ভাস্বরের সত্যি কোনও অসুবিধে ছিল, সেজন্যই যাওয়ার আগে ওকে জানাতে পারেনি।

ভাস্বর যখন ফিরল—এমন লোক ফিরেও একটা ফোন করেনি—নেহাত অপু সেদিনও ওর অফিসে ফোন করেছিল তাই যোগাযোগটা হল—ফোন ধরেই কীরকম নিশ্চিন্ত গলায়, যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে বলল, কী খবর ডার্লিং, শুনলাম তুমি বাড়িতেও এসেছিলে? বিশেষ কোনও খবর আছে?

—খবর আছে তোমার মুণ্ডু আর আমার মাথা।

—আমার মুণ্ডু আর তোমার মাথা।

—যাওয়ার আগে ফোন করে একটা খবর দিতে পারনি?

—একদম সময় পাইনি বিশ্বাস কর।

—তুমি গিয়েছিলে কোথায়, কী কাজে, কোনও ঝামেলার কাজ?

—ফোনে এসব নয়। দেখা হলে সব বলব।

—তোমার শরীর-টরীর ঠিক আছে তো?

—একদম ঠিক। মাথা ফাটেনি, পা ভাঙেনি। তবে হতে পারত অনেক কিছু...

—মানে?

—বললাম যে দেখা হলে সব বলব।

—আজ কখন অফিস থেকে বেরোচ্ছ, কোথায় দেখা হবে?

—আজ তো দেখা হবে না। যেগুলো তুলে এনেছি, সে সব প্রিন্ট করাতে হবে। বাছতে হবে। আরও অনেক কাজ আছে। আমি তো এখনই ডার্করুমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আরেকটু পরে ফোন করলে পেতে না।

—তোমার এসব কাজ মিটবে কখন?

—কোনও ঠিক নেই।

—আচ্ছা, তুমি কেন বোঝো না, আমি সবসময় কীরকম টেনশনে ভুগি?

—টেনশনের কিছু নেই, বিলিভ মি। আর টেনশনে ভোগা খুব খারাপ। তাতে...ভাস্বরকে থামিয়ে অপু জিজ্ঞেস করল, তাহলে করে দেখা হবে কাল?

—কাল।

—কাল?

—কাল তিস্তার বিয়ে, তোমার মনে ছিল না?

—মনে ছিল, আবার ছিলও না।

—মানে?

—এই যে বাইরে গেলাম তার আগে মনে ছিল। তারপর কাজের মধ্যে ঢুকে ভুলে গেছি। কিন্তু কাল...

—তুমি না গেলে কিন্তু তিস্তা ভারি কষ্ট পাবে।

—না, আমি যাব। তুমি কখন যাচ্ছ?

—আমার তো অনেক আগেই যাওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, এক কাজ কর তুমি তোমার মত চলে যেও। আমি সরাসরি ওদের বাড়িতে যাব। একটু দেরি হতে পারে। এখন ছেড়ে দিচ্ছি কেমন?

বলেই লাইন ছেড়ে দিল ভাস্বর। ওর মাথায় এখন ডার্করুম ছাড়া আর কিছু নেই। আশ্চর্য অপুর আবেগের কোনও দাম নেই ওর কাছে?...নেই?...আছে?...কে জানে?...অপু তো জানে না।

তিস্তার বিয়েতে ভাস্বর এল বেশ দেরিতে। অপুর তো চিন্তা হচ্ছিল, লোকটার যা কাণ্ডজ্ঞান—হয়তো এলই না। না এলেই হল, পরে 'সরি' বললেই দায়িত্ব শেষ। ভাস্বর আসার আগেই বর আর বরযাত্রীরা এসে গেছে। বিয়ের লগ্ন অবশ্য দেরিতে। মেয়েরা ঘিরে বসে আছে কনেকে। এক পাশে অপুও আছে। কিন্তু সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। কিছুক্ষণ বসছে আবার ভিড় ঠেলে বাইরে সে দেখছে, ভাস্বর

এল কি না? এর মধ্যে তিস্তাও দু-দুবার খোঁজ নিয়েছে, ভাস্বরদা এল না?

অপু আর কী বলবে? বলেছে, আসবে তো বলেছে?

অপু আবার একবার, ভাস্বর এল কি না দেখতে বাইরে গিয়েছিল। তাকে দেখে মাসি আবার একটা ছোট কাজের কথা বলেছেন। কাজ সেরে ফিরে এসে অপু দেখে, শ্রীমান ভাস্বর হাজির। খুব সেজেছে! বসেছে একবারে তিস্তার সামনে। যেন জামাইবাবুটি। বিয়ের আগেই জামাইবাবু! অপুর হাসি পায়।

এদিকে ভাস্বর এসেই মেয়েমহলে জমিয়ে নিয়েছে। ওস্তাদ আছে তো! ও আবার মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর ব্যাপারেও পেশাদার হতে চায় নাকি? তাহলে তো মুশকিল।

অপু পেছন থেকে এসে শুনছে, ভাস্বর বলছে, বর এর মধ্যে এসে গেছে?

তিস্তার বান্ধবী মন্দিরা বলল, ওমা আসবে না! ক'টা বাজে বলুন তো?

ভাস্বর বলছে, বর যখন এসেই গেছে, ক'টা বেজেছে জেনে আর কী হবে। আমি কী ভাবতে-ভাবতে আসছিলাম জানো তো?

দু-তিনটে মেয়ে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কী-ঈ?

—আমি ভাবছিলাম...'অপুর সংসার' ছবিতে অপুর কীভাবে বিয়ে হয়েছিল মনে আছে তো? বন্ধুর সঙ্গে অপু একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল...তারপর...ভুলে গেছি...কী যেন একটা গণ্ডগোল হল...যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা তার সঙ্গে হল না। তখন অপুই সেই মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলল।...তো আমি ভাবছিলাম, এখানে বর যদি আসতে দেরি করে তবে...

মন্দিরা চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে, তবে আপনি কী করতেন?

—দেখছ না কেমন সেজেটেজে এসেছি। আমার একটা কর্তব্য আছে তো? বেচারি তিস্তার কথা ভেবে আমি গিয়ে চুপচাপ বরের পিঁড়িতে বসে পড়তাম।

মেয়েদের হাসিতে ঘর ভরে গেল। অপুর সঙ্গে চোখাচোখি হল তিস্তার। তিস্তা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, তাতে খুব একটা সুবিধে হত না ভাস্বরদা।

—কেন-কেন?

—আপনার কান ধরে বিয়ের পিঁড়ি থেকে তুলে দিত।

—কে গো?

—যে আপনারা ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার গার্জেন।

ভাস্বর ঘাড় ঘুরিয়ে অপুকে দেখে বলে উঠল, আরে অপু এস। বোনের বিয়েতে এত দেরিতে আসতে হয়? দেখ আমি কেমন সময়মত এসে গেছি।

আবার হেসে উঠল মেয়েরা। তিস্তা বলল, দিদি আপনার অন্তত বারো ঘণ্টা আগে এসেছে।

—আমার এত আগে এসেছে, এতক্ষণ কী করছিল তবে?

তিস্তা বলল, বিয়েবাড়িতে কাজ আছে না?

মন্দিরা যোগ করল, তাছাড়া মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে দেখতে হচ্ছিল, আপনি এসেছেন কি না? এতক্ষণে অপুদির মুখে কেমন হাসি ফুটেছে দ্যাখো।

তিস্তার আরেক বান্ধবী অমৃতা বলল, অ্যাই, তোরা ফাজলামি বন্ধ কর তো। ভাস্বরদা, আপনি খবরের কাগজের গল্প বলুন?

অপু ভাবে, ভাস্বর আসার পর তিস্তা নিশ্চয় এদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। নইলে এতগুলো মেয়ে কি আগে থেকেই ওকে চেনে বা ওর নাম জানে? ও কি এতটাই বিখ্যাত হয়ে গেছে! কিন্তু ও যেভাবে এখানে গল্পে মত্ত হয়ে উঠেছে অপুর সঙ্গে ওর কথা হবে কখন? তার মধ্যে যে অনেক প্রশ্ন জমে আছে, অনেক কথা বলার আছে। এদিকে ভাস্বর অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলছে, খবরের কাগজের কী গল্প বলব?

—কীভাবে আপনারা কাজ করেন? আপনার একটা ছবি না আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

অপু বলল, এই তোরা আর ওকে ফোলাস না তো, এমনিতেই যা অহঙ্কার।

অমৃতা বলে, না অপুদি, আমাদের জার্নালিজম ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছবিটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোন ছবিটার কথা বলছি জানো তো, তুমিও নিশ্চয় দেখেছ, কী একটা বিক্ষোভ সমাবেশ-টমাবেশ। তার মধ্যে একটা বোমা এসে পড়েছে। বোমাটা এখনই ফাটবে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আচ্ছা, ভাস্বরদা এত কাছ থেকে আপনি ছবিটা তুললেন, বিপদের ভয় আছে তো, আপনার ভয় করে না?

অপু বলে, বিপদের ভয় কী বিপদই আছে তো। এই তো ক'দিন আগে ভোটের ছবি তুলতে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে এসেছে।

ভাস্বর বলল, তোমরা এ সব বলছ, আমার ভীষণ লজ্জা করছে। আমি কে? ওই সব দেশে এমন সব ফটো-জার্নালিস্ট আছে, তারা ছবি তোলার জন্য কী পরিশ্রম করে; কী ঝুঁকি নেয় শুনলে তোমরা তাজ্জব হয়ে যাবে।

আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক অপু বুঝতে পারে, ভাস্বর যা বলছে বিনয় দেখানোর জন্য নয়, বিশ্বাস থেকে বলছে। কাজের কথা উঠতেই এতক্ষণের ফাজিল-ফাজিল ভাবটা খসে পড়েছে, গম্ভীর হয়ে উঠছে ভাস্বর। ও বলছে, সাংবাদিকদের সম্পর্কে একটা চালু গল্প বলছি, শোনো। ও দেশের গল্প।...একটা বাড়ি থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে লোকজন ছুটে পালাচ্ছে। তাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওই বাড়িটার ভেতর ভয়াবহ কিছু ঘটেছে। তাই ওখান থেকে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে সবাই।...তখন যদি দেখা যায়, সবাই যেখান থেকে পালাতে চাইছে, জনা কয়েক লোক সেই বাড়িতেই ঢোকার চেষ্টা করছে, তা হলে বুঝতে হবে, তারা সাংবাদিক।...একজন ফোটোগ্রাফারের কথা বলি, তাঁর নাম রবার্ট কাপা। একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধের ছবি তুলছেন। গুলি খেয়ে এক সেনা পড়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তের ছবি তুলেছিলেন তিনি। সেই সেনার কতটা কাছাকাছি ছিলেন, বোঝাই যাচ্ছে,

তার মানে গুলি তার গায়েও লাগতে পারত। পরে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান কাপা। ভারতের রেল নিয়ে ফোটোফিচার করতে এসেছিলেন স্টিভ ম্যাক্‌কারি। ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনে হেঁটো লোকরা ট্রেনের ছাদে বসে যাচ্ছিল। তিনিও চলন্ত ট্রেনের ছাদে উঠে ছবি তুলছিলেন। রেললাইনের পাশের একটা পোস্ট থেকে বেরিয়েছিল একটা রড। অল্পের জন্য রেহাই পান তিনি।...সিংহের লাফিয়ে শিকার ধরার ছবি তোলার জন্য এক ফোটোগ্রাফার ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শুধু তার শারীরিক-মানসিক কষ্ট নয়, প্রাণের আশঙ্কাও ছিল। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির লাভার ছবি তুলতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন এক ফোটোগ্রাফার। এরকম আরও কত আছে। এঁরা সবাই একশ' শতাংশ প্রফেশন্যাল। এদের কাছে পৃথিবীতে আর কিছু নেই। একমাত্র ধ্যানজ্ঞান যে ছবিটা যেভাবে তুলতে চান সেই ছবিটা ঠিক সেরকম তোলা। তাতে যা হয় হোক, এমনকি নিজের যা খুশি ঘটুক কোনও পরোয়া নেই।

অমৃতা বলে, ওদের ভয়ডর বলে কিছু নেই!

অপুর মন্তব্য: এদের মায়ামমতাও কম থাকে। একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়।

ভাস্বর অদ্ভুত চোখে তাকায় তার দিকে। কিছুক্ষণ পর হাসার চেষ্টা করে সে বলল, দূর বিয়েবাড়িতে এসব সিরিয়াস কথা বলে পরিবেশটাই মাটি করে দিলাম।

মন্দিরা বলল, এর চাইতে আপনি একটা গান গাইলে,

ভাস্বর বিস্ময়ের গলায় বলে, আমি গাইব গান!

অপু জিজ্ঞেস করল, তুমি এসে হাসির সঙ্গে দেখা করেছে?

—না তো।

—চল তাহলে?

ভাস্বর উঠে পড়ল। অপুও। তিস্তা বলল, ভাস্বরদা না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। আর যাওয়ার আগে বলে যাবেন।

বাইরে এসে অপু বলল, তুমি তিস্তার জন্য কী প্রেজেন্টেশন আনলে দেখা হল না তো?

ভাস্বর জিভ কেটে বলল, এ মা একদম খেয়াল ছিল না। তাছাড়া আমি যখন এলাম, গিফ্‌টগুলি খোলাও ছিল না মনে হয়।

অপু ভাস্বরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর শান্ত গলায় বলল, ঠিক আছে। আমাদের বাড়ি থেকে যা দিচ্ছে, ভেবেছিলাম, আমি তার বাইরে আলাদা করে কিছু দেব। ওদের না হয় বলব, ওটা আমরা দু-জনে মিলে দিয়েছি। দুর এত ধাক্কাধাক্কির মধ্যে কথা বলা যায়, চল নিচে যাই!

—তাই চল।

—আজ তোমার মাসির সঙ্গে দেখা না করলে হবে না?

—আমার বাড়ির লোকরাও এসেছে।

—আজ থাক...

—তোমার কোনও কাজ আছে?

—আছে একটু।

তাহলে তো তোমার খেতে বসে যাওয়া উচিত ছিল।

—আমি আর খাব না। তেমন খিদে নেই...

—তা হয় নাকি! কিছু অন্তত খাও। অন্তত একটু দই মিষ্টি? আচ্ছা, চল দেখছি...

নিচে খোলা জায়গায় ছড়িয়ে রাখা চেয়ারে বসে কেউ কফি খাচ্ছে, কেউ কোল্ড ড্রিংকস। একটা চেয়ারে ভাস্বরকে বসিয়ে অপু বলল, আমি এখনই আসছি।—ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই। হাতে একটা বড় প্লেটে দই আর মিষ্টি। প্লেটটা ভাস্বরের হাতে দেওয়ার পর পাশের বসে অপু বলল, আমার সাজটা কেমন হয়েছে বললে না তো?

—টেরিফিক লাগছে। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে তোমার একটা ছবি তুলে রাখতাম।

—তুমি ক্যামেরা আননি! তুমি অফিসের গাড়িতে এসেছ তো?

—হ্যাঁ।

—আমি ভাবলাম তুমি গাড়িতে ক্যামেরা রেখে এসেছ। এখন কী হবে? তুমি বিয়েবাড়ির ক'টা ছবি তুলবে না? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার তরফ থেকে সেটাই স্পেশ্যাল গিফ্‌ট হবে।

খাবারের প্লেট থেকে মুখ তুলে ভাস্বর বলল, আমি বিয়েটিয়ের ছবি তুলি না। তার জন্য অন্যরা আছে।

—নিজেদের লোকের ছবি তুললেও তোমার প্রেস্টিজে লাগত! ছিঃ ছিঃ আমি তিস্তাকে বলে ফেলেছি, দেখবি তোর বিয়ের কেমন আনকমন ছবি তুলে দেবে তোর ভাস্বরদা।

তুমি বললে কী করে? তুমি তো জানো...এসব অ্যামেচারদের কাজ।

রেগে গিয়ে অপু বলল, তারা তোমার চাইতে কিছু খারাপ ছবি তোলে না।

ভাস্বরদা কোনও জবাব দেয় না। নিঃশব্দে খাবার শেষ করে প্লেটটা মাটিতে নামিয়ে রাখে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলি?

অপু বলল, চলে যাবে! তোমার সঙ্গে তো কোনও কথাই হল না?

—তোমার এখন মুড ঠিক নেই। পরে কথা হবে।

চলে গেল ভাস্বর। অপুর চোখে জল এসে গেল। 'তারা তোমার চাইতে কিছু খারাপ ছবি তোলে না'—এই কথাটা বলা তার উচিত হয়নি ঠিকই। তাই বলে এভাবে চলে যাবে! এখন সবাই জিজ্ঞেস করবে। সে কী উত্তর দেবে? কী বলবে—বলতে হবে সেই একই কথা, যে কথা শুনে শুনে অন্যদেরও মুখস্থ হয়ে গেছে—'অফিসের কাজ আছে।'—যেন আর কেউ অফিসে যায় না।...এরকম লোক ছবি তুলবে না বলে সঙ্গে ক্যামেরাই আনেনি। ভাল কথা, ও এসব ছবি তোলে না

কিন্তু অপুর বোনের বিয়ের ছবি—তার মানে অপুর সম্মানের প্রশ্ন—তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই ভাস্বরের?...আর বাইরে যে গিয়েছিল সে সম্পর্কেও কিছু বলল না অন্য মেয়েদের কাছে। এত ফালতু কথা বলল এতক্ষণ ধরে। কিন্তু ওই প্রসঙ্গটা তুললই না। তার মানে অপুকে বলবে না। তার মানে বিশ্বাস করে না সে।

দু-দিন পরে হঠাৎ দেখা ভাস্বরের সঙ্গে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। জল জমে গেছে রাস্তায়। এদিকে যে এত জল হবে, অপুর কোনও ধারণাই ছিল না। ভাস্বর একটা দোকানে সিগারেট কিনছে।—তুমি এখানে?

—তুমি?

—আমার আজ অফ-ডে এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অপু জানে এমনি ঘুরে বেড়াবার ছেলে নয় ও। বেরিয়েছে হয়তো ছবির খোঁজে। যদি হঠাৎ কিছু পাওয়া যায়। ভাস্বর জিজ্ঞেস করে, তুমি এদিকে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অপু জিজ্ঞেস করল, তুমি তো বললে না বাইরে কোথায় গিয়েছিলে?

—ওরে বাব্বা ওটা না জেনে তুমি ছাড়বে না! একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গোপন সম্পত্তির খোঁজে গিয়েছিলাম। তুমি আমাদের পত্রিকার সামনের সংখ্যাটা দেখলেই সব জানতে পারবে। সেই মন্ত্রীর রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি। সেই বাড়িটার ছবি তুলেছি চলন্ত গাড়ি থেকে। ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে ছিল না। যাক তুমি এই সময় এখানে?

—এখানে একটা নাম করা গানের স্কুল আছে না? সেখানে একবার যাব। একটু কাজ আছে।

—আমি যাব তোমার সঙ্গে?

অপু হেসে বলে, যাবে তো কিন্তু এখানে এত জল...

—এই দ্যাখো কীভাবে যেতে হয়—বলে ভাস্বর হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে নিল। অপু তাকাল এদিকে-ওদিকে তারপর সেও শাড়ি সায়া কিছুটা টেনে তুলল। সুন্দর গড়নের মসৃণ ফর্সা পা জলে ফেলল। তারপর জল যত বাড়ছে শাড়িও একটু-একটু করে ওপরে উঠছে। এভাবে হাঁটুর কিছুটা ওপর পর্যন্ত। অপুর লজ্জা করছে, মজাও লাগছে। ভাস্বর কিছুটা এগিয়ে গেছে। ডাকছে, এস, চলে এস।

জলের মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় নাকি? ভাস্বর তাকে ডেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। তারপর অপু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ক্যামেরা বার করল। হাঁটু ভাঁজ করে প্রায় বসে পড়ল জলের মধ্যেই। ওর কোমরের নীচের অংশ পুরো ভিজে গেল। সেদিকে খেয়াল না-করে জলের সামান্য ওপরে ক্যামেরা ধরে ও সাটার টিপতে লাগল ক্লিক-ক্লিক...

'অ্যাই করছ কী, কী করছ'—বলতে বলতে অপু তার কাছে এসে পৌঁছল।

ততক্ষণে ভাস্বর উঠে পড়ে ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকাচ্ছে। অপু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল কী করলে বলত?

—এই অবস্থায় তুমি আমার ছবি তুললে! ছিঃ ছিঃ।

—শুধু তোমার ছবি তুলব কেন জল, জলে ডোবা রাস্তার পাশের বাড়ি, হেঁটে যাওয়া আরও কয়েকজন, রিকশা, জলে লাফানো বাচ্চা—সব কিছু নিয়েই ছবি তুলেছি।

—এ ছবি তোলা উচিত হয়নি তোমার। এগুলো প্রিন্ট করাবে না। ফিল্ম আমাকে দিয়ে দেবে।

অপু হাসছে না। বেশ রাগের গলাতেই কথাগুলো বলছে। ভাস্বর উত্তর দিচ্ছে না। মিটি মিটি হাসছে শুধু।

সেই ছবি ছাপা হল দু সংখ্যা পর। লজ্জায়-ঘৃণায় গা রি-রি করে উঠল অপুর। যার সঙ্গে বিয়ের কথা তার নগ্ন পা এভাবে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা! এ তো অসভ্যতা-বলতে গেলে ইতরপনা। নাম কেনার জন্য এই লোক সব পারে। অপু ঠিক করল যথেষ্ট হয়েছে। ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখা চলে না।

ওর সঙ্গে আর দেখা করা দূরে থাক ফোন করেও অপু নিজের রাগ বা ঘৃণার কথা জানাবে না। কিন্তু ফোন করল ভাস্বর। কে করেছে না-জেনে অপু ফোনটা তুলেছিল। ওপাশ থেকে ভাস্বরের গলা, এই সংখ্যাটা দেখেছ? সবাই তো ছবিটার খুব প্রশংসা করছে!

অপুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। কোনও উত্তর দিল না। নিঃশব্দে ফোনটা নামিয়ে রাখল। ভাস্বর একদিন দেখা করতে এল। অপু দেখা করল না। নতুন শ্বশুরবাড়ি থেকে তিস্তা একদিন ফোন করল। তুই এভাবে ছবি তুলতে দিলি! ছিঃ। দেখে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

না, ভাস্বরের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই। লোকটা কলকাতায় আছে কী নেই, কী করছে, অপু কিছুই জানে না; জানতেও চায় না। সে ওদের সাপ্তাহিকটা নেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ তার আর কোনও আগ্রহও নেই। হঠাৎ একদিন তার কলেজের এক সহকর্মিণী লজিকের হৈমন্তীদি বললেন, আরে ভাস্বর তো এবার প্রাইজ পাবে! কী ফাটাফাটি ছবি তুলেছে! সত্যি প্রাইজ পাচ্ছে, ও কিছু বলেছে তোমাকে?

অপু কোনও উত্তর দেয় না। হৈমন্তীদি বললেন, কী হল? তুমি কিছু বলছ না?

—নাহ্ সকাল থেকে মাথাটা ধরে আছে, তাই...

হৈমন্তীদির মুখ দেখে মনে হল, কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি।...অপু বাড়ি ফেরার পথে কী ভাবে একটা স্টলের সামনে দাঁড়াল। ভাস্বরদের সাপ্তাহিক কিনল এক কপি। বাড়িতে ফিরে দেখল ছবিটা।

ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি জ্বলছে। আগুন আর ধোঁয়ার চেহারা দেখে দম বন্ধ হয়ে

আসে। তার মধ্যে যন্ত্রণায় আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছে এক বালিকার মুখ। তার ফ্রকে আগুন ধরে গেছে। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায়, ভয়াবহতায় সেই মুহূর্তে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কী করবে বুঝতে পারছে না যেন।

কাঁপতে কাঁপতে অপু ফোনটা তুলল, ডায়াল করল। ওপাশ থেকে কেউ ফোন তুলতে ভাস্বরের নাম বলল। ভাস্বরের গলা : হ্যালো?

—আমি অপু বলছি। ওই মেয়েটা বেঁচে আছে?

—কী ব্যাপার এতদিন...কোন মেয়েটা?

—তোমার আগুনের ছবির মেয়েটা?

—বোধহয় না।

—বোধহয়? মানে তোমার মনে হয়নি, খোঁজ নেওয়া দরকার? তাই তো, তাই না? চেষ্টা করলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতে তুমি। পারতে, তাই না? কিন্তু তুমি তা না করে ছবি তুলেছ, নিজেকে ছবি তুলতে ব্যস্ত রেখেছ। তুমি...তুমি একটা ক্রিমিন্যাল। হ্যাঁ ক্রিমিন্যাল। তুমি মেয়েটাকে খুন করেছ। তুমি একটা পেশাদার খুনি...হ্যাঁ খুনি...

ফোন ফেলে দিয়ে হাঁফাতে থাকে অপু। সে যেন দেখতে পায়, কারা যেন তার শাড়ি ধরে টানাটানি করছে। তাদের মধ্যে একজন তার আঁচলে আগুন ধরিয়ে দিল। ভাস্বর দেখছে। প্রতিবাদ করছে না। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে ছবির পর ছবি তুলছে শুধু। তার বুকের ভেতর থেকে আর্তনাদের মত, জমে থাকা কান্নার মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল : মাগো।

সীমান্ত

অভিজিৎ সেন

বিভূতি ছেলেকে নিয়ে সীমান্ত দেখাতে চলেছে। সীমান্ত না বলে বর্ডার বলা ভাল— ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার। বর্ডার শব্দটাই বেশি চালু। যে শহরে তারা থাকে সেখান থেকে বর্ডার মাত্র তিরিশ মাইলের রাস্তা। অথচ খোকার বর্ডার দেখা হয়নি, এটা তার একটা আফশোস ছিল। এখন সে বাসের জানালার ধারে বসে উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করছে, যা তার চোখমুখ দেখলে সহজেই ধরা পড়ে।

উত্তেজনা বিভূতির ভিতরেও যে নেই, এমন না। খোকার উত্তেজনার কারণ এক, বিভূতির আর এক। আগেও কাজে-কর্মে বর্ডারের কাছাকাছি এলে সে চেকপোস্টের অফিসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নস্ট্যালজিয়া হোক, আর যাই হোক, গেট পার হয়ে এসে ওপারের মাটি হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে। না, সে তেমন শিহরন অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে অনুভব করেনি ঠিকই, কিন্তু মনটা তো দূরবর্তী হয়েছে, ব্যথা বেদনার একটা আবেগ তো টের পেয়েছে গলার কাছে।

অথচ, এত আবেগ বোধ করার কী-ই বা কারণ এখন আর থাকতে পারে? এখন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর, গত বত্রিশ বছর ধরে ও দেশটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তেরো বছর বয়সে সেই যে আসা, সেই শেষ। আর যাওয়া হয়নি। অবশ্য সম্পর্ক একেবারে ছিল না, সে কথা বললে একটু ভুলই হবে। বাবা-মা ছিলেন ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আরও দশ-বারো বছর। কিন্তু বিভূতির আর যাওয়া হয়নি।

আবেগের কারণ অবশ্যই আছে। জীবনের প্রথম তেরো বছর, শৈশব আর কৈশোরের জাদু এবং বিস্ময়ের পৃথিবী বিভূতি আর কি কোথাও খুঁজে পাবে? কেউ কখনও আর পায় না। মাত্র একবারই পায় মানুষ সেসব। এখন খোকার বয়স এগারো বছর, এখন খোকা পাচ্ছে। একটু আগেই সে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিগ্যেস করেছে, রোপা কাকে বলে, বাবা?

ফিসফিস করে বলেছে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়। বাসে নিত্যযাত্রী অনেক আছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক বা ব্লক ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কর্মচারী।

বেশ কয়েকজন শহরের ফড়ে বা ছোট ব্যবসায়ী, যারা কোনও হাটে যাচ্ছে। এরকম একজন তার সঙ্গীকে কথাটা বলেছিল, শ্রাবণ মাসে রোপার এমন চেহারা অনেকদিন দেখিনি, ভাই। কথাটা বিভূতিরও কানে গেছে। সত্যিই মাঠের চেহারা এবার দেখার মত। প্রায় একমাস বয়সের ধানগাছ মাইলের পর মাইল বিস্তৃত, ঘন সবুজ আদিগন্ত। কী সুন্দর আর কী আশাব্যঞ্জক যে মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই হয়তো অবাস্তব।

খোকার কথাটা বক্তার কানেও যায়। তার দু'হাঁটুর মধ্যে একটা হাটুরে ছাতা, হাতে পাটের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা কয়েকটা খালি বস্তা। নিঃসন্দেহে মানুষটা হাটের ফড়ে।

লোকটি বলে, রোপা জানো না, খোকা? কাচলায় বিছন ফেলতে হয়। সেই বিছন যখন গাড়ার উপযুক্ত হয়, তখন মাঠের জমিতে হাল মই দিয়ে তাতে ওই বিছন গাড়তে হয়। বিছন গাড়া হয়ে গেলে তখন তাকে বলা হবে রোপা। বুঝলে খোকা?

খোকা আরও অন্তত দুটো নতুন শব্দ শোনে—'কাচলা' আর 'গাড়া'। সে লাজুক ধরনের ছেলে, এখন বাবার মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নেয়। বিভূতি জানে এই নতুন শব্দ দুটোর অর্থ খোকা তাকে পরে জিজ্ঞেস করবে।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাবে, খোকা?

খোকা বলে, আমরা বর্ডার দেখতে যাচ্ছি।

—বর্ডার? ওই তো বর্ডার। ওই যে মাঠের মধ্যে গাছ আর ঘরগুলো দেখছ, ওগুলো সব বাংলাদেশ।

খোকার চোখেমুখে চকিত বিস্ময়। সে সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওপারের গাছপালা, ঘরবাড়ি দেখে। এত কাছে! অথচ আর একটা দেশ। সে বলে, ওই মানুষগুলো সব বাংলাদেশের মানুষ? লোকটি বলে, হ্যাঁ, বাংলাদেশেরই তো।

বস্তুত রাস্তাটার দীর্ঘ প্রলম্ব জুড়ে ডান দিকে এক মাইল আধা মাইল তফাতে বাংলাদেশের সীমান্ত।

লোকটিকে বেশ ভাল লাগে বিভূতির। কেমন খোকার মত মুখচোরা ছেলের সঙ্গেও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। এমনকি খোকাকে ওপারের কয়েকটা গ্রাম দেখিয়ে তাদের নাম অবধি বলে দিল। খোকা এখন জানলায় হাত রেখে তার উপরে চিবুক চেপে ওপারের গ্রাম দেখছে।

ওপাশের সিট থেকে আরেকজন লোক এই লোকটিকে ডাক দিয়ে বলে, ও নরেন দেশলাইটা দেও।

এই লোকটি পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করে বিভূতির সামনে ধরে। মুখে বলে, খাবেন নাকি একটা খাকিপদ?

বিভূতি একটু হেসে বলে, না।

লোকটি, যার নাম নরেন, নিজেই একটা বিড়ি ধরায় এবং দেশলাইটাও পাশের

সঙ্গীর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে সে বিড়ির আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বর্ষার বিড়ি একদিকে জ্বলছে। বিড়িটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডগার আগুন সমানভাবে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নরেন। তারপর বিড়িতে আবার টান দিয়ে বিভূতিকে জিজ্ঞেস করে, বাড়ি কি ওপারে ছিল দাদার?

বিভূতি একটু হেসে বলে, হ্যাঁ।

—তাই মায়া ছাড়তে পারেন না।

বিভূতি হাসে।

—কোথায় ছিল বাড়ি?

—একদম দক্ষিণে, বরিশালে।

—গেছি একবার, ভাল জায়গা।

বিভূতি ভাবে, এবার ধান আর নারকেল সুপারির কথা আসবে।

কিন্তু নরেন বলে, আমার বাড়ি ছিল বগুড়া। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কয়েক ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। বিভূতি বলে, কয়েক ঘণ্টার রাস্তা? তাহলে তো মাঝেমধ্যে যেতে পারেন?

নরেন বলে, যাই মাঝেমধ্যে, তবে শালারা কী করে ফেলেছে এখন!

বিভূতি সন্ত্রস্ত হয়ে খোকার দিকে তাকায়। না, খোকা এই 'শালারা' শব্দটা শোনেনি। নরেন আবার বলে, শুয়োরের বাচ্চারা এমন বেইমান, বুঝলেন, এত কাণ্ডের পরেও হিন্দুর নাম সইতে পারে না।

বিভূতি ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে খুব একটা স্পর্শকাতর হয়তো নয়, কিন্তু এখন বিষয়বস্তুর কদর্যতায় মুখ সরিয়ে নেয় এবং শঙ্কিত হয়ে খোকার দিকে তাকায়। স্পষ্টতই সে নিজে এ ধরনের বিশ্বাসের উত্তরাধিকার নিয়ে বড় হয়নি এবং এই বিশ্বাসহীনতা খোকার ভিতরেও সংক্রামিত করতে চায় না সে। তারপরে সে ভাবে, নরেন হয়তো প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের দলে। কিন্তু তাতেও সে স্বস্তি পায় না। প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত এ দেশে অসংখ্য মানুষ। সে কি নিজে ওই দলে নয়? আসলে নরেনকে প্রথমদিকে তার ভাল লেগেছিল, তাই হয়তো এভাবে একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

বত্রিশ বছর আগে গ্রাম সম্পর্কে কাকা হয় এমন এক ব্যক্তি ভুবন নুরুলকে চড়চাপড়টা মেরেছিল একদিন। পাশে দাঁড়িয়ে বিভূতির নিজের কাকা ভুবনকে আদেশ করছিল 'মারো—আরও মারো—' বলে। নুরুলকে বাবা কিছু পুরনো কাঁসার বাসন বিক্রি করতে পাঠিয়েছিল গঞ্জের দোকানে। শেষ দিকে এভাবেই চলছিল। ভুবন সেখানে ছিল এবং দেখেছে নুরুল কত টাকার বাসন বিক্রি করেছে। ফিরে এসে পরে মায়ের কাছে খোঁজ নিয়েছে নুরুল কত টাকা দিয়েছে। দুইয়ের মধ্যে ফারাক ছিল। ভুবন ছিল মারদাঙ্গায় উৎসাহী মানুষ। সে নুরুলের হাত ধরে প্রথমে কাকার কাছে টেনে নিয়ে যায় তারপর মারে।

বাবা তখন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করছিলেন। নুরুলের হাউমাউ

কান্না শুনে খাট থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। শব্দ লক্ষ করে প্রায় ছুটে গিয়ে ভুবনকে ধরলেন এবং কোনও কথা না শুনেই তিন-চারটা চড় কষালেন তার গালে। ভুবন অনেক কষ্টে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছিল তাঁকে। তাতে বাবা আরও খেপে যান। বলেন, তুই আমারে কবি, তারপরে আমি বুঝুম যে নুরুল্যা পয়সা চুরি করছে! নুরুল্যা চোর, তার বাপে চোর, তার নানায় চোর। আমার বাড়ির খাইয়া পইরা চুরি কইর‍্যা অরা তিন পুরুষ আছে—আমি জানি না এসব? কিন্তু তুই হারামজাদা, কোন সাহসে আমার চাকরের গায়ে হাত তোলো?

বাবা নুরুলের হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ বাবা ভুবনকাকাকেও খুব পছন্দ করতেন। কেননা ভুবনকাকা ছিল ভারি সৎ ও সাহসী। মাছ ধরা, ফুটবল খেলা এবং ফিয়েটার করা খুব উৎসাহী যুবক ছিল সে। বাবা এই ধরনের মানুষ খুব পছন্দ করতেন।

যেমন পছন্দ করতেন জিয়ল গাজীকে। বিভূতিরা তাকেও কাকা বলে ডাকত। জিয়লের ছিল দৈত্যের মত চেহারা। বাবার থিয়েটারে জিয়ল ভীম, ঘটোৎকচ এইসব সাজত। জিয়ল ছিল অদ্ভুত শক্তিশালী মানুষ, বিভূতির বাবার চোখে বীর।

বাবা বলতেন, ক্যারে জিয়ল, আমারে কাটবি?

জিয়ল হা—হা, হা—হা করে হাসত।

বাবা বলতেন, গর্দানের মাপটা লইয়া যা জিয়ল।

আসলে এসব তখন আর নেহাতই রসিকতার কথা ছিল না বোধ হয়। বরিশালের বিভিন্ন জায়গায় তখন দাঙ্গা শুরু হয়েছে। হিন্দুরা সব পালাচ্ছে। বাতাসে গুজব চৈত্রের তুলোর থেকেও দ্রুত ছড়াত।

তাছাড়া জিয়ল সম্বন্ধে নানারকম কানাঘুষা আগেই ছিল, তখন আরও বেড়েছিল। সে থাকত বিভূতিদের গ্রাম থেকে মাইল তিন-চার তফাতে। কাজেই নিয়মিত যোগাযোগ তাদের ছিল না। বাবা জিয়ল সম্বন্ধে অপপ্রচার বিশ্বাস করতেন না।

তারপর সেই ঘটনা।

বিভূতিদের প্রাচীন দোতলা বাড়িটার উপরে লোভ ছিল মানুষের। দূরে দূরে তখন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছিল। গ্রামের যে ক-ঘর হিন্দু তখনও ছিল, সন্ধ্যার আগেই তারা এই প্রাচীন বাড়িটার কোনও না কোনও কোটরে সুরক্ষার জন্য ঢুকে পড়ত।

তখন একদিন রাতে জিয়ল এসেছিল তার দলবল নিয়ে। প্রথমে আধা ফার্লং দূরের খালপাড়ে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি এবং মশালের আলো দেখা যায়। তার কিছুক্ষণ পড়ে বৈঠকখানা ঘরের সামনে সেই আলো ও ধ্বনি।

বাবা আরও দু-তিনজন মাত্র পুরুষ মানুষের সঙ্গে দোতলার একপাশের ছাদের উপরে ছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরে নিচ থেকে জিয়লের গলা সবাই শুনতে পায়। জিয়ল একা, তার সঙ্গীরা বৈঠকখানার উঠোনেই ছিল তখনও।

বাবা ছাতের উপর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেডা তুই?

তিনি অবশ্যই চিনেছিলেন জিয়লকে।

জিয়ল নিচ থেকে বলেছিল, আমি জিয়ল, বসন্তদাদা নিচে আছেন।

বাবা একাই নিচে নেমে এসেছিলেন, অন্যদের নিষেধ তিনি শোনেননি। জিয়লকে তিনি বলেছিলেন, তুই এত রাত্তিরে মশাল আর দলবল লইয়া আমার বাড়ি আইছ, ক্যান?

জিয়ল আমতা আমতা করে বলেছিল, পাহারা দিতে বাইর অইছি, বসন্তদাদা।

বাবা অন্ধকারের মধ্যে জিয়লের মুখ পড়বার চেষ্টা করছিলেন বোধহয়। বেশ কিছু সময় পরে ভারী গলায় বলেছিলেন, জিয়ল হারামজাদা, তোর কথা বিশ্বাস করলাম না। তুই এক্কারে নষ্ট অইয়া গেছ। তুই আমারে মাইরা যা, আমার পোলাপানরে কাইটা যা।

জিয়ল তারপরে ফিরে গিয়েছিল। অন্যরা বাবাকে বলেছিল যে ওই সময় তার নিচে যাওয়া ঠিক হয়নি। ওই কথা বলা ঠিক হয়নি। কেননা যদিও জিয়ল শেষ পর্যন্ত এখানে দাঙ্গা করতে সাহস কিংবা নিজের ভেতর থেকে তাগিদ বোধ করেনি, কিন্তু বাবার ওই অবিশ্বাস এবং ভর্ৎসনার ফলে নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে একটা বিস্ফোরণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এ সমস্ত কথার উত্তরে বাবা কিছু বলেননি। কেমন বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন বাকি রাত। রাত শেষ হলে বলেছিলেন, নাঃ, আর এ দেশে থাকা যাবে না।

বিভূতির তিন দিদি বড় হয়েছিল তখন। সে জন্যই চিন্তা ছিল বেশি। বিষণ্ণ বাবা জোগারযন্তর করে আধা সংসার কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আত্মীয়দের গলগ্রহ করে। কিন্তু নিজে অন্যের গলগ্রহ হতে আর পারেননি শেষ পর্যন্ত। দেশের বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন বাবা, মা এবং ছোট তিন ভাই বোন।

বাবা জিয়লকে সেই শেষবারেও 'হারামজাদা' বলেছিলেন। কথাটা তার মুখের লব্‌জ ছিল। কারও উপর খুশি হলে সেই খুশির স্বীকৃতি জানাতেন ওই শব্দটা দিয়ে, আবার অভিমান করলেও প্রকাশ করতেন ওই শব্দ দিয়েই। কিন্তু আশ্চর্য, কাউকে প্রত্যাঘাত করবার জন্য বা যথার্থ ক্রুদ্ধ হয়ে কখনও 'হারামজাদা' শব্দটা ব্যবহার করতেন না তিনি।

এখন বাসের মধ্যে নরেন বলে 'শুয়োরের বাচ্চা' এবং 'বেইমান'। তার গলায় উপচে ওঠা বিষ, যা ঢাকা চাপা দেওয়ার কোনও চেষ্টাই নেই। বাবা বলেছিলেন, বোঝছ ভুবন জাতটা বোধহয় সত্য বেইমান, না হইলে জিয়ল—! কেডা জানে, আমি তারে আমার জাগায় দাঁড়াইয়া দেহি, আর হে দ্যাহে হের জাগায় দাঁড়াইয়া আমারে। আঃ কি বা আফশোস। কি বা আফশোস!

আর নরেনের কথা এবার খোকার কানে যায়। সে জানলা থেকে মুখ সরিয়ে এনে তার বাপের মুখের দিকে তাকায়। ফলে বিভূতিকে গম্ভীর উদাসীনতায় জানালার বাইরে দৃষ্টি রাখতে হয়।

কিন্তু নরেনের বোধহয় ধারণা হয় যে, সে যথেষ্ট যুক্তি এবং হৃদয় গ্রাহ্য করে বলতে পারছে না বলেই বিভূতিকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। সে বলে, আপনি কি জয় বাংলার বছরে এখানে ছিলেন?

পশ্চিমবাংলার কোনও জায়গাই নিশ্চয়ই হায়দরাবাদ, কানপুর, লখনউ, মোরাদাবাদের মত না। পশ্চিমবাংলার মানুষ নিশ্চয়ই অনেক বেশি সহনশীল ও বিশ্বাসপ্রবণ।

তাই কি?

চৌষট্টি সালে কলকাতার দাঙ্গায় বিভূতিদের পাড়া ছাড়তে হয়। দাদা বলেছিল, তুই সব জায়গায় খালি ঝামেলা বাঁধাস। এতে কোনও লাভ হয়?

দাঙ্গার দিন দুয়েক আগে সন্ধেবেলা পাড়ার মাস্তানরা এসে চাঁদা চেয়েছিল।

—কিসের চাঁদা?

—ডিফেন্স ডিফেন্স?

—আমাদের কাছে খবর আছে, মুসলমানরা এ পাড়া অ্যাটাক করবে।

—থানায় খবর দিচ্ছেন না কেন?

—থানা আপনাকে বাঁচাবে?

—আমাকে মারবে কে, তাই তো আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

—চাঁদা দেবেন না?

—এই সব ঝমেলা।

দুদিন পরে দুপুরবেলা অফিসে দাদার ভীত সন্ত্রস্ত টেলিফোন, অফিসের পর বাড়ি ফিরিস না, পাড়ায় দাঙ্গা হচ্ছে।

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। কী দুশ্চিন্তা! পাড়ায় যদি দাঙ্গা হয়, ওরা কোথায় গেল? টেলিফোনের লাইন কেটে গেল কেন?

অফিসের উপরওয়ালাকে অনুরোধ করে বিভূতি ড্রাইভারসহ তার গাড়িটা নিয়েছিল। পার্ক স্ট্রিট দিয়ে পার্ক সার্কাসে গাড়ি ঢুকতে ভীত সন্ত্রস্ত শয়ে শয়ে মানুষকে বিভূতি বড় বড় বাড়িগুলোর নিচে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। পার্ক স্ট্রিট থেকে সারোয়ার্দি এভিনিউ, সেখানেও একই দৃশ্য। সন্ত্রস্ত মানুষ কিছু একাট আশঙ্কা করছে যে কোনও মুহূর্তে। আর এই আশঙ্কার উৎস রাস্তার ঠিক ডাইনে পার্ক সার্কাস ময়দানের ভিতরে বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকীর বিরাট প্যান্ডেল আগুনে জ্বলছে। সেখানে পুলিশ এবং দমকলের কর্মীরা।

তারপরে সিআইটি রোড। সেখান থেকে গোবরা যাওয়ার সরু রাস্তা এবং রেললাইনের উপর লেভেল-ক্রশিং। প্রায় দু-তিনশো শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যুবকের জনতা রেললাইনের উপর দিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। পড়ছে, আবার উঠে ছুটছে। তাদের পোশাক ও চেহারা দেখলেই পরিষ্কার তারা ওই অঞ্চলের বস্তিবাসী মুসলমান। তাদের পেছনে লাঠিসোটা হাতে লাইনের খোয়া ছুঁড়ে তাড়া করে আসছে বিশ-পঁচিশজনের একটা বাহিনী।

লেভেল-ক্রশিং পার হয়ে খানিক দূর এগিয়ে বিভূতি গাড়ি নিয়ে পাড়ায় ঢুকছিল। পাড়া সরগরম, যেন উৎসব হচ্ছে। মুহূর্তে মা'গানরা গাড়ি ঘিরে ফেলল। আর নেহাতই হিন্দু বলে বিভূতিকে তারা ছেড়ে দেয়।

তিনদিন পরে আমির আলি এ্যাভিনিউর উপরে মিলিদের বাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়েছিল বিভূতি। তালাবন্ধ বাড়ি।

দুদিন পরে আবার।

তখনও তালাবন্ধ। কোথায় গেল মানুষগুলো? দশদিন পরে কড়া নাড়তে মিলির ছোট বোন মুন্নি এসে বন্ধ কাচের জানালার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল। বিভূতিকে দেখে মুন্নি সরে যায়। একটু পরে মিলি এসে ওই একই জানালায় দাঁড়ায়। জানালার সঙ্গে লাগানো মিলির অপরিচিত মুখ বাদামের খোলার মত শুষ্ক এবং বর্ণহীন। মিলি তার শৈশব ও কৈশোরের খেলার সাথী, প্রেমিকা কখনওই ছিল না। কিন্তু বিভূতি কোনও রমণীর এরকম মুখ দেখতে চায় না।

অন্তত কয়েক মুহূর্ত মিলি কাচের ভিতর দিয়ে বিভূতিকে দেখে। কাচের বাধা ভেদ করে তার কণ্ঠস্বর বাইরে আসে না। তার ঠোঁট নড়ে ও মুখমণ্ডলে প্রশ্নের বাস্তব মুকাভিনয় হয়। অর্থাৎ কী? অথবা কী চাই?

দোতলার ছাদ থেকে নেমে এসে বাবা বলেছিলেন, জিয়ল, হারামজাদা, তোর কথা বিশ্বাস করলাম না।

গোবরার রেললাইনের উপরের ঘটনার থেকে এ কিছু কম অভিজ্ঞতা নয়। আহত বিভূতি কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, আরে দরজা খোলো, দরজা খোলো।

জানালার ওপাশে দাঁড়ানো মিলির প্রোফাইল তখন ভঙ্গি বদল করে। সম্ভবত তার মায়ের সঙ্গে ইঙ্গিতে ভীষণ অর্থবহ সংলাপ তৈরি করে মিলি। বিভূতি অপেক্ষা করে।

তারপর দরজা খোলে। বিভূতি স্বাভাবিক মুখ করে ঢোকে, মুখ তুলে হাসে এবং পরক্ষণেই বোঝে তার হাসিমুখ কী নির্বোধের মত দেখাচ্ছে এখন। কেননা অন্তর্বর্তীদের মুখ তখনও অপরিচিত আর সেখানে সেই একই প্রশ্ন।

শেষে সে হতাশ হয়ে বলে, আমি কি চলে যাব?

মিলি বলে, না, বোসো।

মিলির মা বলেন, বড় ভয় পেয়ে গেছি, বিভূতি।

—এতদিন কোথায় ছিলেন মাসিমা?

—রাজভবনে। উঃ, কী ভয়ংকর, ভয়ংকর সব টেলিফোন আসত সারাদিন। দেশ ছাড়ার দিন পনেরো আগে একটা বড় বড় লোমওয়ালা সাদা ধবধবে কুকুর কোত্থেকে এসে যেন হাজির হয়েছিল। বিলেতি কুকুর বিভূতিদের ওদিকে বড় একটা দেখা যেত না। পরিশ্রমে কুকুরটা দালানের একপাশে বসে ভীতি উদ্রেককারী লম্বা জিভ বের করে হাঁফাচ্ছিল। আর তখনই দেখা যায় কুকুরটার চোয়ালের নিচের

দিকে একটা আঘাতের চিহ্ন। পুরনো নয়, সব শুকিয়ে উঠেছে।

বাবা তখন পুকুর থেকে স্নান করে ফিরে আসছিলেন। কুকুরটার সামনে এসে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ভীষণ আশঙ্কা ও আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বিভূতিকে বললেন, তোর মায়রে ডাক!

পাশের ঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মা বেরিয়ে এসে বাবাকে ও অবস্থায় দেখে আকুল হয়ে ওঠেন—কী অইল? অ্যাঁ? কী অইল?

বিভূতি দৃশ্যটা আজও চোখের সামনে দেখে। বাবা কথা বলতে পারছেন না। চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে ঝাপসা। মুখ, ঠোঁট, গলা ও পেটের পেশি অবরুদ্ধ কান্নার দাপটে কাঁপছে। তারপর সমস্ত অবরোধ একটা দমকায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন—লক্ষণের সোহাইগ্যা কুত্তা—মাঘ মাসে যখন গেছিলাম তখন দেইখ্যা আইছিলাম—কুত্তার কত নাচন কোন্দন রে—

কোনও বিবৃতি নয়, সবটাই বাবার কান্না। ফলে নিমেষে এই কুকুর এবং তার নির্বাক দৈত্য সসম্ভ সম্ভাবনার ভয়াবহতাকে উপস্থিত সবার মধ্যে অমোঘভাবে ছড়িয়ে যায়। চিরকালের সংযতবাক বাবা গ্রাম্য অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের মত চিৎকার করতে থাকেন কুকুরের সামনে বসে—ওরে সোনার কুত্তারে, ওরে মোর বুইনের খবর করে—ওরে নুরুইল্যা, ওরে হারামজাদা, ওরে নাওয়ের জোগাড় কর—আমি কলসপুর যামু—

লক্ষ্মণ বিভূতির পিসেমশাই। কলসপুর তাদের বাড়ি থেকে অন্তত বিশ মাইলের নদীপথ। বাবাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সময় তখন বড় নিশ্চত ঘটনার জন্ম দিত। তবুও অসম্ভব শক্ত মা বলেছিলেন, আগেই উতলা হও ক্যান? হয়তো কুত্তা অ্যামনেই পলাইয়া আইছে, হয়তো ঠাউরঝিরা ঠিকই আছে।

কুকুরটা থাকে না। যেমন অদ্ভুত শূন্যতা নিয়ে সে এসেছিল, তেমনি শূন্যতা নিয়ে আবার উদ্‌ভ্রান্তের মত সে চলে গেল। বাবাকে যেতে দেওয়া হল না। নুরুল আরও দুজন মাঝিকে নিয়ে কলসপুর গেল। আর নুরুল ফিরে আসার আগেই কলসপুরের নৃশংস ঘটনার কথা সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবা চিৎকার করে কাঁদতেন, মুসুলমানদের সম্বন্ধে অশ্লীল গালাগাল করতেন এবং নুরুলকে মারতেন। আর নুরুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেত।

কমলার হাট স্টপেজে বাসের অর্ধেক লোক নেমে গেল, সেই সঙ্গে নরেন নামের সেই লোকটিও। বিভূতি একটু স্বস্তি পায়। খোকা নরেনের শেষ কথাগুলো শুনেছে। বিভূতির সব সময়ই একটা প্রয়াস থাকে যাতে খোকা স্বাভাবিক সুস্থ বিচারবোধসম্পন্ন মানুষ্‌ হয়। কিন্তু নিজের কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় যে, খোকাকে সে যেভাবে আগলে রাখে বা আড়ালে রাখে, তার মধ্যেই কোনও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে কিনা। আড়ালের একটা আড়াল থাকে। আগল দিয়ে চোরাগোপ্তা সুড়ঙ্গ দিয়ে দূষিত বাতাস, বেনোজল ঢুকতে পারে। এসব সম্বন্ধেও সতর্ক থাকতে হয়।

একদিন খোকা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সোৎসাহে খবর দিয়েছিল, বাবা, আমাদের ক্লাসে একটা মোছলা ছেলে ভরতি হয়েছে।

বিভূতি যেভাবে চমকে উঠেছিল তাতে শঙ্কিত খোকার মা কাজ ফেলে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। না, বিভূতি খোকাকে সঙ্গে সঙ্গেই মারেনি। বরং একদিক থেকে বালই হয়েছিল। বিভূতি জানতে পেরেছিল এইসব প্রান্তিক বিষয়ে খোকার কী ধারণা হচ্ছে।

এই শহরটায় এক সময় যে বেশ কিছু মুসলমান বাস করত তার প্রমাণ এখনও আছে। একটা বেশ বড় এবং প্রশস্ত মসজিদ আছে। আছে ওয়াকফের বেশ কিছু সম্পত্তি—যেমন ছাত্র-হস্টেল, পুকুর, জমি, এইরকম। সেসব সম্পত্তি এখন বারো ভূতে বারো কায়দায় লুটে খায়। শহরের স্থায়ী বাসিন্দা কোনও মুসলমান পরিবার এখন আর নেই। শুধু সামান্য দু-চার ঘর সরকারি কর্মচারী আছে বদলির চাকরির কারণে। তাও সরকারি কর্মচারী যদি নিম্নপদস্থ হয় তবে তার পক্ষে বেশি দিন এখানে থাকা সম্ভব নয়। কেননা তার পক্ষে বাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। অথচ শহরটায় কোনওদিন দাঙ্গা হয়নি। শহরটার উপরি কাঠামোতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোনও প্রভাব বিভূতি প্রত্যক্ষভাবে কখনও অনুভব করেনি।

খোকা মুসলমান চিনেছে ইতিহাসের বইতে, নরেনের মত মানুষের কথাবার্তায়, ইস্কুলের পাকা বন্ধুদের বিশ্লেষণে। তার পরিচিতিতে মুসলমান এতকাল ছিল না। কাজেই কোনও সমস্যাও হয়নি। এখন সমস্যা হচ্ছে, বা হয়েছে, কেননা প্রতিপক্ষীয়রা কিন্তু থেমে নেই। থেকে ছিল বিভূতি। বিভূতি জানত যে খোকার ইস্কুলে দু-তিনজন মাস্টারমশাই আছে, যারা নানারকম আপাতধর্মীয় সংগঠন করে, শহরের দেয়ালে বেদ, উপনিষদ, সাম্য, বিপ্লব, গুরু কৃপাহি কেবলম, রাণাপ্রতাপ-শিবাজি ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপরে স্লোগানধর্মী লেখা লেখে। বিভূতি এসব জানত, আর এও জানত যে এইসব মাস্টারমশাইরা খোকারও শিক্ষক।

সে শুধু বলে, ও কী? ওটা কী কথা? ওই শব্দটা তুমি কার কাছে শিখলে?

খোকা প্রমাদ গোনে এবং চুপ করে থাকে।

—ওই কথাটা তুমি কোনও বইতে পেয়েছ?

কথাটা বলার পর প্রমাদ গোনে বিভূতি। কে জানে কোনও বইতে আছে কিনা। থাকলেও বিচিত্র কী? আনন্দমঠে এর থেকে অনেক বেশি ঘৃণা বিদ্বেষপূর্ণ কথা যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। খোকা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে এবং খোকা আনন্দমঠও পড়েছে। খোকা যদি এমন সর্বজনমান্য কোনও বইয়ের কথা বলে? তাহলে অবশ্যপাঠ্য 'আনন্দমঠের জন্যও কি একটা শিশুবোধ্য ভূমিকা থাকা উচিত?

খোকা কোনও কথারই উত্তর দেয় না। সে নিচের দিকে তাকিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটে। বিভূতি সেই অধোমুখ বালকের দিকে তাকিয়ে

নানারকমের সম্ভাবনার কথা ভাবে। খোকা ইতিমধ্যেই এই বিষ আত্মস্থ করে বসে আছে নাকি! না হলে, প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্রই সে এমন ধরাপড়া চোরের মত চুপ করে আছে কেন? তার মুখে এই মুহূর্তে ও কিসের ছাপ? অপরাধের? অপরাধবোধের? ধরা পড়ার?

এতক্ষণ পরে বিভূতি তার গালে সশব্দে একটা চড় কসায়—তোমাকে এসব অসভ্যতা কে শিখিয়েছে? এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার ভিতর থেকে কেউ একজন বলে ওঠে—তুমি! তুমি বিভূতি! তোমার অসাবধানতাই এর জন্য দায়ী।

কলকাতার ইস্কুলে পড়ার সময় সে আর শহিদ একদিন মারামারি করেছিল। অন্য ছেলেরা তাকেই সমর্থন করেছিল। পরদিন শহিদের বাবা এসেছিলেন ইস্কুলে। হেডমাস্টারমশাই বিভূতিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শহিদের বাবা বড় চাকরি করতেন, হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সময় বলে বসলেন, ইস্কুলে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হচ্ছে। বৃদ্ধ হেডমাস্টার মশাই আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর কথায়। ক্ষোভ এবং হতাশায় বিভূতিকে বেত মেরেছিলেন তিনি, যদিও বিভূতিকে ভালবাসতেন খুবই।

পরে শহিদ 'সাম্প্রদায়িকতা' কথাটা ব্যবহার করত খুব। বাংলা বইয়ে ডি এল রায়ের একটা নাটকের অংশ ছিল। ক্লাসে পড়াবার সময় শহিদ 'যবন' শব্দটা এবং তার ব্যবহার নিয়ে আপত্তি করে। শহিদ পড়াশুনায় ভাল ছিল, সে কারণে বিভূতি তার সঙ্গে রেশারেশি বোধ করত। সে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল যে, ওই একই কারণে ওই একই নাটকের 'কাফের' শব্দটায় হিন্দুরা আপত্তি করতে পারে।

শহিদের সঙ্গে বিভূতির আর সদ্ভাব হয়নি। বিভূতি চেষ্টা করেও করতে পারেনি। শহিদ ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ভীষণ অভিমানী। বিভূতি সেই সময়েই বুঝতে পারে স্পর্শকাতরতা এবং অভিমান সাম্প্রদায়িক সন্দেহকে কী পরিমাণে বাড়ায়। এর কিছুদিন পরে শহিদরা এ দেশ ছেড়ে ঢাকায় চলে যায়।

মাথা ঠাণ্ডা হলে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় লজ্জা পেয়েছে বিভূতি। খোকার বয়স এবং অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা না করে বড় বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। সেদিন সে বেরুল না কোথাও। খোকাকে নিয়ে খাটে শুয়ে সারা সন্ধ্যা এবং অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছে সে। ছেলেবেলার গল্প, দেশের বাড়ির গল্প, বাবার গল্প—দেশ ভাগ, শৈশব ও কৈশোর, কলকাতার দাঙ্গা এবং তার দেখা অজস্র মানুষ।

বাসের ভিড় কমতে ভাদ্রমাসের গুমোটটাও কম লাগল বিভূতির। অল্প কয়েকজন লোক আছে বাসে, এমনকি কতগুলো বসার আসন এখন খালিই পড়ে রয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যবয়সী এক দম্পতি গাড়ির মেঝেতে বসে আছে একপাশে। ভূপতি বলে, সিটে উঠে বসুন, জায়গা তো আছে।

তারা ওঠে না।

কনডাকটর এসে তাদের সামনের আসনটায় বসে। বলে, মিঁয়া বিবি দোনো জনায়ই বিনি পয়সায় যাবা? ক্যান্? আমি তা হবার দিমো ক্যান্? পয়সা বার কর, পয়সা বার কর।

লোকটি একটু করুণ হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলে, থাকলে দিই না? পয়সা নাই।

—পয়সা নাই, গাড়িৎ ওটার শখ ক্যান্? পয়সা নাই, হাঁইটে যাও।

—শখ নয় বাবু, দরকারে আসিছিলাম। এত দূর রাস্তা—

—দেখি বিবির বোচকা খোল, পয়সা আছে কিনা দেখমো।

নোংরা এবং ছেঁড়া ঘোমটার আড়ালে স্ত্রীলোকটির মুখ দেখা যায় না। কনডাকটর টান দিয়ে বোচকা নেয় এবং খুলে ফেলে, ছড়ায়। বস্তুত, তার হাবেভাবে এটা পরিষ্কার যে সে পয়সার জন্য যতটা না ব্যগ্র, তার থেকে অনেক বেশি উৎসাহী রগড় করতে।

—যাবা কুন্ঠি? ওপারে?

লোকটি মাথা নাড়ায়।

পাশফোট আছে?

লোকটি করুণ দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকায়। আরও দু-চারজন মানুষ রগড়ের গন্ধ পেয়েছে। একজন বলে, আরে বয়সা নাই তো পিরানটা খুইলে ল্যান।

লোকটি বক্তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নেয়।

এক যুবক উগ্র হয়। বলে, নামায় দ্যান গাড়ি থিকা। শালা বেইমানের জাত! এপাড়েৎ শালারা যেথা খুশি সেথা ঘুরে বেড়ায়, হাঁরা কিছু কই না। আর ওপাড়েৎ যান—শালার মিৎচ্যাংড়া ছোলগুলা পর্যন্ত পাছু নাগবে—'কুন্ঠি যাবেন,' 'বাড়ি কোথায়'—নামো শালা।

আরেকজন ভুক্তভোগী।

বিভূতি লোকটির কাঁধে হাত দেয়। চোখ ফিরিয়ে লোকটি বিভূতির চোখে চোখ রাখে।

বিভূতি বলে, সিটে উঠে বসুন।

লোকটি বিভূতির পাশে সন্তর্পণে বসে।

—কোথায় যাবেন?

শেষ পর্যন্ত যাবে তারা।

পকেট থেকে টাকা বের করে কনডাকটরের দিকে বাড়িয়ে দেয় বিভূতি। বলে, এদের টিকিট দুটো দিন। সে বাঁ হাত দিয়ে টাকাটা বাড়িয়ে দেয় এবং কনডাকটরের মুখের দিকে তাকায় না। কনডাকটর টিকিট দেয়। সেই উগ্র যুবকের সমর্থনেও লোক পাওয়া যায়। 'জয় বাংলা' অর্থাৎ বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় এই 'নিমকহারাম' মানুষগুলোর জন্য কে কী করেছে, তার একটা হিসাবও হয়। ছোকরা বিভূতিকে শুনিয়ে শ্লেষ করে—মুসুলমানের সঙ্গে পিরিত, হুঁ!

এক জ্ঞাতি জ্যাঠামশাই কথাটা বলতেন ছড়া কেটে:

শ্যাখের সঙ্গে দোস্তি,
ল্যাজা রাখবা মধ্যস্থি।
যদি শ্যাখ রোখে—
ল্যাজা মারবা কোঁখে।

দেশের বাড়ির বৈঠকখানা থেকে এক ফার্লং দূরের কাঠের পোল দিয়ে একজন মজুরশ্রেণীর মুসলমান মালকাছা দিয়ে লুঙ্গি পড়ে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের আদেশে নুরুল তাকে বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে আসে।

—বসেন, মেঁয়া, বসেন।

জ্যাঠামশাই চেয়ারখানা তাকে এগিয়ে দেন।

লোকটির অজ্ঞান হতে বাকি থাকে।

—আহা আপনাগোরি তো দ্যাশ। বসেন। আমরা তো দয়ায় আছি আপনাগোর।

জ্যাঠামশাই তার হাত ধরে তাকে চেয়ারে বসান। হাত দুটো ভারী কঠিন তাঁর। দেশ ভাগাভাগির ব্যাপারে তার কথা ভাবেনি। সেই আক্রোশ।

লোকটি বসার সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, যেন জ্বলন্ত উনানে কেউ চেপে বসিয়েছে তাকে।

জ্যাঠামশাই তার হাবভাব লক্ষ করেন এবং আচমকা ব্যাঘ্র গর্জনে ফেটে পড়েন।

—মেঁয়া, এত সাহস তোমার, তুমি আমার বাড়ির সামনা দিয়ে পাছার কাপড় তুইল্যা যাও! ভাবছোডা কী? উঁ, আমি মইরা গেছি। খবরদার মেঁয়া, এ গেরাম এখনও পাকিস্তান হয় নায়, হে কথাটা খেয়াল রাখবা! পাছার চাম তুইল্যা লমু, হ!

বিভূতি অন্যদের কথা 'শোনে না', কিন্তু খোকা শোনে এবং এক একটা মন্তব্যে হঠাৎ হঠাৎ বাপের দিকে চোখ তুলে বাপের দিকে তাকায়।

বিভূতি বলে, আপনারা, কি ওপারে যাবেন?

লোকটি বলে, হ্যাঁ, বাবু।

—পাসপোর্ট আছে?

—না।

—তাহলে যাবেন কী করে?

—কত লোক তো যাতায়াত করে। তবে আজ খুব অ্যাটা অসুবিদা হোবে না।

—কেন?

আজ না খুশির ঈদ?

বিভূতির মনে হয় আজ যদিও রবিবার, কিন্তু ক্যালেন্ডারে তারিখটার পাশে ইদলফেতরের কথাও লেখা আছে! সে বলে, তাতে কী?

বাস তার গন্তব্যের শেষ সীমায় এসে যায়। সবাই নামে। মুসলমান দম্পতির

পিছন পিছন খোকার হাত ধরে বিভূতিও নামে। নেমে বিভূতি একটা চা-মিষ্টির দোকানের দিকে হাঁটে। খোকার কিছু খাওয়া দরকার। মধ্যবয়সী লোকটি তার দিকে এসে নিচু হয়ে কপালে হাত তোলে। বলে, চিনা নাই, জানা নাই, তবু আমার মান বাঁচালেন।

বিভূতি লোকটির শুকনো মুখের দিকে তাকায়। বলে, তাতে কী হয়েছে। আসুন একটু চা খাই। বিবিকে ডাকুন।

চা-মিষ্টি দিতে বলে বিভূতি জিজ্ঞেস করে, এপারে এসেছিলেন কেন?

লোকটি তার বিবির দিকে একবার তাকায়। তারপর বলে, সে তো অনেক কথা বাবু।

অনেক কথা?

লোকটির দৃষ্টি অনির্দিষ্ট হয়ে যায়। বিবির মাথা ঘোমটার তলে একেবারে অদৃশ্য হয়।

বাংলাদেশের গণ্ডগোলের সময় আরও অনেকের সাথে তারাও পালিয়ে এদিকে এসেছিল। তাদের কোনও সন্তান নেই। কিন্তু পথে এক সন্তান জুটে যায়। বছর আটেকের একটি মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে ছিল। বাপ নাকি গণ্ডগোলের প্রথম ধাক্কাতেই খুন হয়েছিল। এখন মা-বেটিকে নিয়ে পালিয়ে আসছে অনেকের সঙ্গে। পথে মাটাও মরে। পথ যে মানুষকে কত দেয় আর কত নেয়! মরার আগে বিবির হাতে মেয়েটাকে ধরিয়ে দিয়ে যায় সেই মা। বলে, দিদি, মোর বেটিটাক্ দেইখো। তখনই জানা যায় এরা হিন্দু। হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে মানুষ। বিয়েসাদির চিন্তা কালক্রমে করতে হয় মিঁয়া-বিবিকে। আল্লা রহমান। মেয়ের রূপ ছিল। মুসলমানের ঘরে বিয়ে করতে উৎসুক ছেলের অভাব ছিল না। কিন্তু এরা খোঁজখবর করে হিন্দুর ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দিল আরতির। ধর্ম বলে একটা কথা আছে তো! ছেলেটি হাটে হাটে সময়ের মাল কেনাবেচার ব্যবসা করত। সে সব তিনবছর আগের কথা।

বিয়ের একবছর পরে মেয়ে-জামাই পার হয়ে আসল এদিকে। এদিকে জামাইয়ের পাঁচ-সাত বিঘা জমিজমা বেশ ছিল। মাস ছয়েক খোঁজখবর লেনদেন ছিল। তারপরে আর খবর নেই। বিবি কেঁদে আকুল হয়। তবুও তো নিজের পেটে ধরেনি। আল্লার রহস্য কে বোঝে। মুরগি দিয়ে হাঁসের ডিম ফোটানো দেখেছে কি বিভূতি? হাঁসের বাচ্চা জলে নেমে যায় আর মুরগি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পুকুরের পারে। কেই বা কারে দোষে? তারপরে কে যে খবর দিয়ে গেল, মেয়েকে নাকি ছেড়ে দিয়েছে জামাই। শেষ পর্যন্ত খবর নিতে আসতেই হল এপারে।

না, মেয়ের খোঁজ তারা পায়নি। জামাইয়ের বাড়ির লোকজন অযথা অপবাদ এবং অপমান দিয়েছে তাদের। গ্রামের বদমাশ লোকেরা টাকাপয়সা, রাহাখরচের জন্য—বেটির জন্য যা এনেছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।

গল্প শুনে বিভূতি স্তব্ধ হয়ে থাকে। চুপ করে থাকে খোকাও। মিয়াঁ চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার কতা ভোলবার পারমো না। আফির কোনওদিন দেখা হবে, অ্যাংকা আশা কম। ছোলপোল নিয়া সুখে থাকেন, আল্লার খোরৎ এই আর্জি।

তারা চলে যেতে বিভূতি চা নিয়ে আর কিছু সময় বসে থাকে। তারপর খোকাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে চেকপোস্টে আসে।

দূরের থেকে চেকপোস্টের ভিড় দেখে তারা, লোকজনের গুঞ্জন শোনে। দু-পাঁচশো মানুষ ভারত-বাংলাদেশের সীমানার চিহ্ন মুছে দিয়ে ভারি সমারোহ শুরু করেছে সেখানে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। বসে, দাঁড়িয়ে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানুষ। অনেকদিন পরে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সব। একসঙ্গে খাবারদাবার খাচ্ছে কোথাও গোল হয়ে বসে, কোথাও সরব সহর্ষ গল্পগুজব, কোথাও জড়াজড়ি করে কান্নাকাটি। মেলার মেজাজে মনিহারি এবং মিষ্টির দোকান বেশ কয়েকটি। খাকি ইউনিফর্ম, কাঁধে ঝোলানো সাব মেশিনগান নিয়ে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সৈনিকরা যে নেই, এমন নয়। তবে আজ যেন তারাও খুব নিস্পৃহ।

বিভূতি খুব অবাক হয় ভাবতে থাকে ব্যাপারটা কী। সমস্ত চত্বরটা এমন স্বাভাবিক যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও তার সংকোচ হচ্ছে।

সে আবার একটা চায়ের দোকানে বসে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দোকানিকে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করে, আজ এখানে এত ভিড় কেন ভাই? দোকানি বলে, আজ ঈদ না? ওপারের মানুষ এপারের মানুষ সব এখানে এসে কান্নাকাটি করবে সারাদিন।

—এখানে অনেক হিন্দুও তো আছে!

—আছে তো।

—প্রতি বছর এমন হয়?

—হ্যাঁ, দুবার করে হয় বছরে। এই ঈদের সময় একবার, ফের বিজয়া দশমীর সময় একবার।

—বি. এস. এফ, কাস্টমস, এরা বাধা দেয় না?

—মানুষের মেলামেশায় কেউ বাধা দিতে পারে দাদা!

বিভূতি খোকাকে নিয়ে বসে থাকে। একসময় খোকাকে সে জিগ্যেস করে, খোকা এর মধ্যে কোন লোকটা হিন্দু, কোন লোকটা মুসলমান খুঁজে বের করতে পারবি?

খোকা ভিড়ের ভিতর চোখ ফেরায়।

বিভূতি মনে মনে প্রার্থনার মত স্তব করতে থাকে। পারিস না, খোকা—পারিস না।

মেহগনি

সাধন চট্টোপাধ্যায়

পুরনো ফটকের কাছে ভট্‌ভটিয়া থামল। এতক্ষণ, ইট-পাথরের ট্যারা-বাঁকা পথে ধুলো উড়িয়ে লাল বাইকটা ছিল ফ্যাসিস্টের মত ডোন্টকেয়ার। ইস্ত্রি করা খাকি ইউনিফর্ম, চামড়ার খাপ, রিভলবার, তক্তার কাঁধ, পাট্টা গোঁফ—সব কিছু। টাকটা ক্যাপে ঢাকা।

এখন লোমশ গিটের কালো থাবাজোড়া ব্রেক কষে, মিহি ধুলোর লাল বুটের ডগা মাটি ছোঁয়, ভুরু ধনুক হয়, ত্যাড়চা গর্দানে হাঁকোর ওঠে—আই! আই বুঢ্‌ঢা! ফটক থেকে বে-শ দূরে উঁচু পুরনো দালানটা। মাঝের মস্ত জমিনটায় ঝোপঝাড়, ঘাস জঙ্গল। বাকল শ্যাওলার আদিম কিছু বৃক্ষ। অর্জুন, ভুরকুণ্ড আর সাদা সরল শান্ত গোটাতিন ইউক্যালিপ্‌টাস। রাস্তার ডানপাশে উদোম ফাঁকা মাঠ, দূরে ঝাঝা-কিউল লাইনের রু রু হাওয়ায় ক্যালিপটাসের ডগাল পাতা দিন দুপুর শুনশান করে তোলে।

উঁচু বারান্দায় কিছু ছুটির মুডের মানুষ—ভিনপ্রদেশি। লাল বাইকটায় তাদের ঢিমেল মেজাজে চায়ে চুমুকের কিছু হেরফের হয়নি; কেবল সিঁড়ির কোণে কাঠ ফাড়তে থাকা বুড়োটা ধুলো পায়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল রাস্তার দিকে। ভুরুর ঘামে ছোট চোখজোড়া ভয়ে গভীর। হাতজোড় করে বাইকটার সামনে যখন দাঁড়াল বুধান মুসাহারের পাঁজর আর ফুসফুসে কুড়ুল চালানোর হ্যাপা বেরোচ্ছে।

—লড়কা কোথায়?

—হুজৌর, এখানে নেই।

—কোথায় আছে?

—কি জানি? মহল্লায় থাকতে পারে। দূরে ন্যাড়া পাহাড়ের পাশে মুসাহার টৌলার দিকে বুধান মুসাহার আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।

—খবর রাখিস না?

—না, হুজৌর! বুধান মুসাহার হাসতে চেষ্টা করে।

—বেট্টিচুতের কপালে এই গোলি সাজিয়ে রেখেছি, বুঝলি বুঢ্‌ঢা? চামড়ার খাপটা

আলতো ছুঁয়ে দেন। ভাল চাস তো থানায় পাঠিয়ে দিস! পাণ্ডে ভয় দেখান।

—হজৌর! বুধান কি যেন কাকুতি জানাতে চায়। হয়তো 'তুই আমার মা-বাবা!' এ ধরনের কিছু। পাণ্ডের চোখজোড়া হঠাৎ দূরের বারান্দার লোক-জনের দিকে ঘোরে।

—কারা?

—হজৌর, কলকাত্তার আদমি। পরশু উঠেছে।

—স্টেশনের কাছ ফেলে এতটা ভেতরে?

পাণ্ডের চোখজোড়া নাচছে, ঘুরছে; কখনও বুধান মুসাহারের দিকে, কখনও বাকল ও শ্যাওলাধরা গাছে। হঠাৎ চাউনিটা পড়ল সীমানার একটি বৃক্ষ-গুড়িতে, যেন চেটে খেল গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত। কালো কুমিরপিঠের মত সোজা গাছটা তিন মানুষের বেড় হয়ে জল-ঝড়, খরায়, 'ধুপ' আর 'জাড়ে' আদিম বৃক্ষ; ধনুকভুরু মিলিয়ে গেল। পাণ্ডের চোখজোড়া এখন কাদা, পাট্টাগোঁফ সকাল আটটার বাতাসে ঝুরঝুর।

—বুঢ়া?

—হজৌর!

—কি গাছ? ওই! হাঁ, মোটা লম্বা!

—মেহগনি।

বুধানের চোখে সটান তাকিয়ে দারোগা সাহেব পাণ্ডেজি বললেন—দে! আমায় দিয়ে দে।

তাঁর চোখে ভাসে চকচকে পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার—বিরাট আসবাবপত্তরের গুদাম। লড়কির শাদিটা কাটিহারের এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। বরাত আসবে সাড়ে তিনশো লোকের।

নগদ আর সোনা-দানা, জমি বাদেও, মেহগনির পালঙ্ক ও আসবাবপত্তর দাবি করেছে। বার্নিশ, ফুল আঁকা, টাটকা চেরা কাঠের গন্ধে পাণ্ডের মনে ভাবনার প্যাঁচ জাগে।

দরকার হলে ভুটান মুসাহারকে...হ্যাঁ, বলবে ধরতে পারল না। মুসাহার টোলার একটা সামান্য হরিজনের বাচ্চা খরার তাণ্ডবে যদি ছিঁচকে চোর হয়, বয়েই গেল। পাণ্ডে গত রাতের ভূমিহার ও রাজপুত ব্যবসায়ীদের বাড়ির গোপন মিটিং-এর 'সিদ্ধান্ত' গোলি মারলেন! ও শালারা কম খচ্চর! ছোট্ট চৌসা শহরটার জোঁক! হাঁ করে কম রক্ত গিলছে? তবে?...যাক্, ছুপা রুস্তমের মত তলে তলে তিনি ওদের সাহায্যে ঝাঝা থানায় বদলিটাও হাতাবেন, আবার, বুধান মুসাহারের এই মেহগনি গাছটাও।

—হজৌর, ইতো বাবুর গাছ! আপনি বলছেন...কেমন করে! বুধান মাথা চুলকোয়।

—ইস্ আমার হরিশচন্দ্র! বলবি দারোগাবাবু চেয়েছিল। দশ-বিশ রূপয়া লাড্ডু খেয়ে নিস।

—হুজৌর, কিন্তু মালিক...

পাণ্ডের কানে বুধানের কথা ঝাপসা হতে থাকে। শোনেন না। চোখের সামনে শুধু গাছটা। প্রয়োজনে সব ভেটই মুঠোয় আসার অনায়াস অভ্যাসে, পাণ্ডের মগজে মেহগানি সংক্রান্ত হিসেব একে একে শেকল গাঁথতে থাকে। গুঁড়িখানা কত সি এফ টির? হ্যাঁ, সাদির আসবাব হয়েও, পাটনার নতুন বাড়ির দরজা-জানলা হবে না? নিজেই বলেন—হবে। বড় ছেলে পাটনায় বাড়ি করছে। কিন্তু ট্রান্সপোর্ট কস্ট নিয়ে...তা, মোহর সিং—চৌসার একমাত্র পেট্রল-পাম্পের মালিক, তার ঘনিষ্ঠ শাগরেদ...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সস্তায় লরির ব্যবস্থা করে দিলে পাটনায় গিয়ে কত খরচা পড়বে?

চোখের সামনে গাছটা হাওয়ায় নাচছে। তেজি, জাতঘোড়া বুকে পা তুলে যেমন লাফিয়ে ওঠে! মোটা ডালটা। চৌসার পাথুরে মাটির পেট ফাটিয়ে শিকড় পাতাল চমকাচ্ছে, বাকলে সময়ের ফাটল, মানুষকে ঘাড়-কাত-করানো আস্পর্ধায় গুঁড়ির মেজাজটা পাহাড়; পাতা, শাখা আর তার জটাজাল—এই বাগানের আকাশ যারা আঁকি-বুকি দিয়ে রেখেছে—দুপুরের হলকানো তাতে দাঁত কামড়ে থাকে, জ্যোৎস্নায় চোখ মারে, আঁধি আর পাথরবৃষ্টিতে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়ায়ের পর ফিক্ করে হাসে—ফের দেখা হবে! ঘুঘুরু—ঘু—ঘু! আবডালে বসা নিভীক, স্বাধীন ঘুঘুটা ঘাড় বাঁকিয়ে ফটকের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ডেকে উঠল।

—মালিকের কাছে কি জবাব দেব হুজুর? গোসা করবেন না। দশ রোজ বেগার দিব আপনার কাছে, গাছ আমি কি করে দেই?

পাণ্ডে হাসলেন। দাঁত, ঠোঁট, গালের পেশি অনড়, কেবল গর্দানের গুহা থেকে খুক্ খুক্ শব্দ আর কপাল চিরে শিরাটা দপদপিয়ে উঠল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

—ছোড় দে! তোর বিট্রিচুতকে আমার চাই! এ গোলিয়া রেখে দিলাম, কেমন! ফের লৌটেগা হাম!

বাইকটা ছুটল কাঁচা রাস্তার দিকে। সিঁড়ি থেকে ছুটে এসেছিল যে পথে, ফিরতে মনে হল চারগুন হয়ে গেছে বুধানের। আন্ডারওয়ার পরা কলকাতার বাবু জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার? ভোলেভালা বুধান সব চেপে গিয়ে বলে—দারোগা বাবু! আপনাদের খোঁজখবর নিচ্ছিল।

—কেন? এখানে নক্‌শাল আছে?

বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে, দ্বিতীয় বাবুটি বলে—গোলি মার! তুই বাবা একটু বাংলু ম্যানেজ করে দিবি?

চৌসায় খরা চলেছিল। ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশনটায় এখনও রুক্ষ ছাপ কামড়ে আছে।

ঘাস জ্বলছিল, নদী তালাও ছিল শুকনো হাড়ের করোটি, ধান মকাই বাজরার ক্ষেত এখনও সেই প্রলম্বিত দগ্ধবাণী বহন করে চলেছে। ভাদ্রের শেষে নিয়ম রক্ষা করেছিল বটে, তা নামে মাত্র। ফলে, আশ্বিনের মাঝামাঝি, বাঙালি চেঞ্জারদের সংখ্যা খুব কম। অন্যান্য বার এ সময়ে বাড়ির সন্ধান পাওয়া মুশকিল, এবার অনেক ফাঁকা। ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। প্রকৃতি বলে রক্ষে, নইলে ভূমিহার ও কিছু রাজপুত—লোক্যাল মার্কেট যাদের মুঠোয়—খরার বিরুদ্ধে মামলাই করে বসত। দাদনের টাকাও হয়তো উঠবে না। পেটরোগা বাঙালিরা প্রোটিন-প্রেমিক, তাই ঝাঝায় এদের মাছের দাদন দেওয়া আছে, গাঁয়ে গাঁয়ে মুরগি, পাঁঠা, ছানার। লোক্যাল লোক সারা বছর এ সময়টার জন্য চেয়ে থাকে, নইলে অজ অঞ্চলে কী আছে? ভূমিহার আর রাজপুতদের বেশ কয়েক হাজার টাকা এবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে জমা। যে দুচার জন চেঞ্জার আসতে শুরু করেছিল, তাও হয়তো পাততাড়ি গুটিয়ে ডাউন এক্সপ্রেস কি মেল ধরে হাওড়া পালাবে। চুরি হচ্ছে খুব। শহরের চতুর্দিকে দুসাদ, মুসাহার, খাড়িয়া আর অসংখ্য গরিবগুরবোদের টোলা থেকে আইন শৃঙ্খলায় ঘুণ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খুব বড় রকমের কিছু নয়; ভাত, থালা, গেলাস, ঘড়ি, কনডেন্সড্ মিল্ক, গন্ধ তেল, লুঙ্গি ইত্যাদি। চেঞ্জে এসে চুরির উৎপাতে—তা যে ধরনেরই হোক—মানুষ আতঙ্কেই তড়িঘড়ি ফিরে যাচ্ছে। লালা আর ভূমিহারদের মাথায় হাত। এভাবে কয়েক হাজার গলিয়ে দিয়ে নিছক তারা 'শিউজির' চরণামৃত বা হরিকীর্তন গেয়ে চুপ থাকতে পারে না। কাছেই একটি চৌকি আছে বটে—সিপাইগুলো দিনরাত খৈনি টেপে, এক চোখ বুঁজে বাঁ হাতের পয়সা ট্যাকে ফেলে—তাই থেকেও নেই। ফলে গতরাতে, আটমাইল দূরের চৌসা-সিরোহি থানার বড়বাবু পাণ্ডেকে সঙ্গে নিয়ে মুখিয়া শিউকান্ত নিজের বাড়িতে শলাপরামর্শে বসেছিল। আর এ মতলব বাতলে দিয়েছিল লালা ও ভূমিহাররা, লোক্যাল মার্কেট যাদের কব্জির মুঠোয়।

—দারোগা সাব, লো অর্ডার আপনার দেখভাল করার কথা! বেওসা মার খেলে আমরা কি বাজরা খেয়ে লড়কা-লড়কি বাঁচিয়ে রাখব? বৃদ্ধ শিউকান্ত পদমর্যাদায় কথা বলে। বয়স সত্তর পেরিয়েছে, তবু চওড়া হাড়ে দুধ-ঘিয়ের দাপট যায়নি। ভাই মন্নিয়া মাছের এবং মাংসের বড় কারবারি। চৌসায় একমাত্র এজেন্ট। গাঁয়ের লোক মাছ, ছাগল সরাসরি বাজারে নিয়ে এলে গলাধাক্কা খায়, মাল সিজ্ হয়। এছাড়া স্টেশনের পাশের জ্বালানি কাঠের মস্ত গোলার মালিক জগৎ লালা, ছানার কারবারি মুঠা সিং, কেরোসিন, স্টোভ, হাঁড়ি কড়াইয়ের গোপাল সরাফ—আরও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

—চৌকিতে সিপাইরা কি তুলসীদাস পড়ে? ছিঁচকে চুরি নজর রাখতে পারে না? পাণ্ডে জিজ্ঞেস করেন।

শিউকান্ত ক্যাপস্টেন ধরায়। কালো আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ফক্ ফক্ করে।

প্যাকেট এগিয়ে দেয় পাণ্ডের দিকে। পাণ্ডে ধূমপান করেন না, শরাব ছোঁন না। খাঁটি বাউন। তবে পেটুক। লুচি, লাড্ডু আর নরম খাসির তৃপ্তিকর ঢেঁকুর তুলে বলেন—আমি ডাকাচ্ছি সিপাইদের।

—কোনও ফায়দা নেই। শিউকান্তের কঠিন ধূসর চোখজোড়া স্থির। আপনাকে সব করতে হবে।

চৌসার নির্জন রাত, দু'চারটে কুকুরের ডাক, সাড়ে দশটার দিল্লি এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার ঝমঝম লোহার ঘসটানি দূর ফাঁকা মাঠে মিলিয়ে গেছে। পাণ্ডের মনে হয়েছিল শিউকান্ত কিছু আদেশ করছে। সে অধিকার ওর আছে—পাণ্ডে বোঝেন। জগৎ লালা কফ ঘড় ঘড়ে গলায় বলে—সাব, কাঠের গোলাটা দেখেছেন আমার? অন্য বছর আদ্দেক হয়ে যেত, এবার দেখুন কাঠের টাল যে কে সেই! লোকে না কিনলে জ্বালানি চিবিয়ে খাব?

সবাই যে-যার দুর্দশার বিবরণে ব্যস্ত। তাছাড়া মুসাহার, দুসাদ—যাদের টিপে মারা যায় তাদের উৎপাত অসহ্য। মুন্নিয়া খোলাখুলিই বলল—ঝাঝা থেকে রোজ বিকেলে চার টুকরি রুই কাতলা আসত আমার। এবার বরফ গলে জল হচ্ছে, টিপে দেখারও লোক নেই। শুয়োরের বাচ্চা দুসাদ মুসাহারদের ভয়ে ভূমিহার রাজপুতরা বাপ ঠাকুদ্দার ব্যবসা বন্ধ করবে? চৌসা আমাদের রক্তে গড়া দারোগা সাব!

পাণ্ডে চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ শিউকান্তকে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন—এম এল এ সাব সুলতান সিং নাকি আপনার দোস্ত? পাটনায় ওঁর দহরম-মহরম আছে?

—কেন? কিছু কাজ করিয়ে নিতে চান? শিউকান্ত হাসে।

—বদলির ব্যাপারে...

—কোথায়?

পাণ্ডে হেসে বলেন—আমার ইচ্ছায় কি হবে? পেলে ঝাঝা যেতাম। চৌসা-সিরোহি ক্ষেতি এলাকা। ঝাঝায় কিছুদিন থাকলে...বুঝতেই পারছেন!

—এ আর এমনকি? কোথায় যেন ইঙ্গিতে বোঝাপড়া হল। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পাণ্ডে দাপিয়ে উঠলেন—চৌসা ঠাণ্ডা করে দিয়ে যাব। কিছু ইনফরমেশন চাই।

সে রাতে যে গোপন পরিকল্পনা হয়েছিল, যে ডেঞ্জারাস পার্সনদের নাম উঠেছিল—ভুটান মুসাহার তাদের একজন। বুড়ো বুধান মুসাহারের বছর বিশের ছেলে। পাণ্ডে বুধানকেও চেনেন না।

জগৎ লালা বলে—বুঢ়া সচ আদমি। চালিশ বছর জঙ্গলের দিকের বাড়িটা আগলাচ্ছে...কলকাত্তার এক বাঙালি বাবুর।

বুধানকে সার্টিফিকেট দিল সবাই। আজ পর্যন্ত মুখ তুলে কথা বলতে দেখেনি কেউ। ধার্মিক ব্যক্তি। তারই ছেলে কিনা ভুটান মুসাহার।

সে রাতে দরজা পেরিয়ে বাইকে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধ মুখিয়া শিউকান্ত। গড়ানো রাতে ঠাণ্ডার আমেজ। টর্চের আলো অন্ধকার ছ্যাঁদা করে রাস্তা পর্যন্ত এল। শিউকান্তের গলা থেকে গিট্টির মত এক একটি কথা ঝরে পড়ে—দারোগা সাব! আমাদের চৌসাকে নওয়াদা, রোটাস বা বিহার শরিফ হতে দেওয়া যায় না। দুসাদ মুসাহাররা ওখানে খেতিয়ালদের ওপর গোলি চালাচ্ছে। আপনি ব্রামহন, আমি ভূমিহার। আমাদের মধ্যে যাই থাক না, আমি কিন্তু চৌসার এ ব্যবস্থা ভাল চোখে দেখছি না। এভাবে চললে—কথায় বলে পহেলা রাতে বিল্লি ঠ্যাঙানো দরকার—বর্ষা পড়লে ক্ষেতির কাজ করাতে পারবেন এদের দিয়ে? আঁখ ফেরে কথা বলবে। আমাদের সরকারও তেমন ভেড়ুয়া। ঝাঝার ব্যাপারটা ভাববেন না...এ আর এমনকি! কিন্তু...

জমানো অন্ধকার চিরে চাকা ছুটেছিল চৌসা সিরোহির পথে।

দারোগা পাণ্ডের শিরার দপদপানি ফিরে আসার পথে আর নেই। বুঢ়ঢার সরল স্বভাবে তিনি খুশিই হন। দেশের সব আদমি যদি শিউকান্ত বা জগৎ লালা হয়ে যেত, কিংবা দেশ বললেই যদি চৌসা-সিরোহি বোঝাত, সে এক অসহ্য ব্যাপার। খাট্টা, মিঠাই, নিমক—সব না হলে কি জিভ মজা পায়? তবে বুধানদের মত মানুষদের কাছে কার্যোদ্ধার কী প্যাঁচে করতে হয় পাণ্ডে জানেন। ঘিউ কি বাঁকা আঙুলেই শুধু ওঠে, আগুনে গলালে পড়ে না? ভয়-ধর্ম্ম-মিষ্টি কথা—অনেক পথ। আর নিজের ছেলের প্রাণভিক্ষা কে না চায়? মুসাহার দুসাদ হলে কি, বাপ আর ছেলে তো! গাছটাকে সে পাবেই। এই চৌসা-সিরোহিতে কোন কামনা তার মুঠোছাড়া হয়েছে? গাছটাকে বিস্ময় ও লোভের জিভে বাইকের স্পিড কমিয়ে চাখতে চাখতে গেল।

দূরের একটা মস্ত কাণ্ড অদ্ভুত এগিয়ে আছে, যেন ঘোড়ার লেজ। বাতাসে পাতা ডাল ছির ছির করে। পথের উড়ানো ধুলো পশ্চিমা বাতাসে ভর করে মেহগনির ঝুঁকে পড়া অংশ গৈরিক করে দিতে চায়। ঝাঝা-কিউল রাস্তায় যখন যে দাপটে ছোটে, মেহগনির ডালপাতারা বুক পেতে সাক্ষ্য ধরে রাখে। পাণ্ডের বাইক, থানার জিপ, লালাদের লরি, এমনকি একশ বছর আগে ভুজগড়ের রাজা রায়বাহাদুর দীপনারায়ণ সিংয়ের ঘোড়সওয়াররা যে কিউল-ঝাঝা পথে আনাগোনা করত, সে ধুলোর চিহ্ন ও বাকলের গভীর খাঁজ-খোঁজে জমা।

ইঁদারায় জল তুলে বুধান যখন বারান্দায় এল মাংসের ঝোলে ফুট ধরেছে। স্বাদু গন্ধ। আশপাশের ইঁদারাগুলো প্রায় শুকনো, ভাল সিদ্ধর জন্য দেড় মাইল দূর থেকে বুধান এদের জল এনে দেয়। এক ফুটেই গন্ধ। সিঁড়ি আর উঠোনে কিছু কাচ্চা-বাচ্চা আর মেয়েছেলে। বুধানের বংশলতা, কিছু প্রতিবেশী। এখানে রান্না চাপলেই টোলা থেকে দলটা হাজির হয়। বুধানের কালা-বোঝা বউটা অঙ্গারের মত চেহারা

নিয়ে সিঁড়িতে দিনরাত বিড়ি বাঁধে। মাঝে মাঝে রান্নার দিকে তাকায়, ক্যালিপটাস ছাড়িয়ে আকাশ দেখে, যন্ত্রের মত আঙুল নাড়িয়ে যায়। কেবল গুনে দিতে বুধান সাহায্য করে।

বুড়ি এক থেকে ছয় পর্যন্ত গুনতে পারে, পরেই সব গুলিয়ে যায়। ফলে বুধান পঁচিশটি বিড়ি গুনে দিয়ে যায়। সারাদিনে ওকে কেউ দাঁতে কাটতে দেখে না। বোবাদৃষ্টিতে রান্নার দিকে তাকায়, কারও সঙ্গে চোখাচুখি হলে ফিক করে হেসে ফেলে।

—বাবু, পানি আর চাইবেন না। অত কে টানবে? বুধান দম ছেড়ে ছেড়ে বলে।

—একা টানবি কেন, ওই ছোঁড়াগুলোকে পাঠা। বল না ওদের চা খাওয়াব। দশ বছরের নাতিটাকে দেখিয়ে, একজন অভিযোগ করতে বুধান হেসে জবাব দেয়—চৌসায় মাত্র দুটো ইঁদারায় পানি আছে। আর কোথাও বালতি ডোবে না। কলজের জোর চাই বাবু।

তবু ছেলেমেয়েগুলো ফাইফরমাস খাটতে বসে থাকে। যতবার খুশি বাজারে পাঠাও, কাঠ টানাও, ইট বওয়াও, জল আনতে বলো—মুখে রা নেই। অদ্ভুত হাসিতে ক্লান্তি চেপে রাখে। অতিরিক্ত ভাতও দাবি করে না। বুধান আর তার স্ত্রীর বরাদ্দ ভাত, ঝোল, নিজেরা কুণ্ঠায় বোঝা-পড়া করে নেয়। কেবল চঞ্চল হয় ভাতের গন্ধে। চাল বা ঝোল ফুটে উঠলেই, মুসাহারদের ছোট্ট দলটা কেমন যেন স্থির। যেন কিছুতে ওম্ দিচ্ছে। ছুক ছুক করে না। চোখের পাতা, ঘাড় গলায় ঘা নিয়ে ফরমাইস তালিমের জন্য হাঁ করে বসে থাকে।

গত দু'দিন ধরে বাবুদের অনেকেই লক্ষ করে দারোগা পাণ্ডের দ্বিতীয় রাউন্ডের পর, ঠিক শুনশান্ দুপুরে, রান্নাঘরের পেছনের ঝোপঝাড়ের সরু পথে একটা ছায়া ঘুরে সিঁড়িতে উঁকি দেয়। সাপের চেয়েও নিঃশব্দ। বুধানের বউ উঠে যায়। শুধু মশলার কুলোটা কেন্দু পাতার ছড়ানো ছাটে পড়ে থাকে। ভাঙা ঘরটায় খুট-খাট্ ছাপছুপ কিছু গেলার শব্দ হয়। একটু পরই বুড়ি কুলোটা তুলে নেয়, বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে ছায়াটার সন্ধান পাওয়া যায় না।

চুরি কিন্তু কমে না। চেঙ্গারদের দু'এক বাড়িতে বা গাঁয়ের দিকে ছোটখাট সিঁদ দেয়ার খবর বাজারে আসতেই থাকে। মরশুম এখন মধ্য পর্বে, তবু চৌসার বাজার হাট জমছে না। মুখিয়া শিউকান্ত লোক মারফত চৌসা-সিরোহি থানায় খবরাখবর দেয়, নয়ত মাঝে মাঝে দারোগা পাণ্ডেকে ডেকে পাঠায়। ঠারে ঠোরে ঝাঁঝ ঢালতেও ছাড়ে না।

—দারেগাসাব, আপনার লুচি-পুরির অভাব হচ্ছে না তো? গলতি থাকলে বলবেন।

দারোগা পাণ্ডের লোমশ কান এবং গালের ভুঁড়ি অপমানে টসকে বেগনি হয়ে

যায়।

শিউকান্ত বলে চলে—চৌসা-সিরোহি থেকে বদলির আগে কিছু কৃপা করে যান? মেহমানরা যদি আমাদের মত রাম-শ্যামদের কৃপা না করে, কোথায় যাই বলুন তো!

—আপনি লজ্জা দিচ্ছেন চৌধুরী!

—ছিঃ ছিঃ! শিউকান্ত জিভ কাটে। তা করতে পারি আমরা? হাঁ, সেদিন এম এল এ সাব আমার কোঠিতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন; শুধু মুখেই নওয়াদা, বিহার শরিফের খবর কিছু পেলাম।

পাণ্ডের মেজাজ অনুগ্রহের প্রত্যাশায় লালায়িত হতেই ঝিমিয়ে আসে। এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। শালা, পদমর্যাদা ছেড়েই দেওয়া যাক, খাঁটি ব্রামহনের রক্ত নিয়ে একটা ভূমিহারের মিষ্টি বিদ্রূপ শুনতে হচ্ছে? কিন্তু আজ এই চৌসায় মুখিয়াকে চটিয়ে লাভ নেই। ঝাঝায় বদলির প্রয়োজনটা অনেক বেশি। সমস্ত ঝালের বোঝাটা পড়ল মুসাহারদের উপর। বুধানের ধর্মভীরুতা বা সৎ চরিত্রের প্রশংসা মনে ফিকে হয়ে গেছে। ঘি একই ভাবে তুলতে হয়—বাঁকা আঙুলে। চৌসার কর্মজীবনে পাণ্ডের গোঁয়ার্তুমি সামান্য এক মুসাহারের জন্য উস্কে উঠল।

থানায় এসে পরদিনই অর্ডার করল চৌসার মুসাহার টোলার সমস্ত মালপত্তর কেড়ে নেওয়া হোক। ঘটি-বাটি তৈজসপত্র যা আছে, থানায় উঠবে। দেখা যাক, ডাল টেনে ধরলে ফল হাতের কাছে আসে কিনা। চৌসার পুলিশ পোস্টকে জানানো হল না, ওসব গদ্দারদের পাণ্ডে এক ছটাক বাজরার দামেও বিশ্বাস করেন না।

দশেরার সন্ধ্যারাতে থানার জমাদারের নেতৃত্বে পাণ্ডের নিজস্ব সিপাইরা মুসাহার টোলা ছিঁড়ে-কুড়ে চলে এল। পুরুষদের বিশেষ পাওয়া যায়নি, দশেরার মেজাজে অধিকাংশই ভাটিখানায়। ঘর আগলাচ্ছিল মেয়ে-বউ-বৃদ্ধরা। ন্যাড়া পাহাড়ের নিচে, টোলার অন্ধকারে ভয়ে কেউ চেঁচামেচিও করেনি। অসহ্য যন্ত্রণা, যোনির রক্তক্ষরণ, দাঁত নখের আঁচড় কামড় খেয়েও প্রাণে বেঁচে যাওয়ার ভাগ্যে ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঘণ্টা চারেক পর, থানায় ফিরে এসে দলটা খবর দিল, সমস্ত মুসাহার টোলা চষে ফেলেও কেড়ে আনার মত কোনও সম্পত্তি পাওয়া গেল না। চালের খড় যে টেনে নামিয়ে আনবে, তাও পচা, তিন বছরের। সারা মহল্লায় উনুন মাত্র তিনখানা। ছাগল নেই, বলদ নেই; কেবল গোটা চারেক মুরগির কড়্কড়ানি শোনা গিয়েছিল। যত্রতত্র ধর্ষণের মাতামাতিতে তারা অন্ধকারে মাঠে উড়ে গেছে। একজন সেপাই শুধু ঝুপড়ি থেকে দু'পসেরী বীজধান পেয়েছিল, এনে পাণ্ডের সামনে জমা দিয়েছে।

পরদিন সকালে এ বাড়ির ট্যুরিস্টরা এত কাছে থেকেও বিষয়টা টের পায়নি। প্রতি দিনের মত ভাত ফুটতেই মুসাহার টোলার ছোট্ট দলটা নিঃশব্দে উঠোন আর সিঁড়িতে চুপচাপ। ফোটা ভাতের গন্ধে আজ ওরা যেন ঈষৎ ছটফট করছে। দশেরার পরদিন বলে জুটেছিল চা এবং লাড্ডু। সেই যোশেই সূর্য মাথায় চড়া পর্যন্ত ইঁদার

দড়ি-বালতি ফেলতে ফেলতে হাঁপিয়েছে, কাঠ এনেছে, ফেড়ে দিয়েছে, বাসন মেজে দিয়েছে। বুড়ো বুধান মুসাহার সামান্য রংয়ে ছিল। দশেরার উৎসবে এ বাড়ির লোকেরা যে উৎসবের গেলাস উড়িয়েছিল, সকালে ভাগ্যে জুটেছিল বেশ খানিকটা। বুড়োর মুখ চোখ লাল, নাকটা খুব ঘামছিল। মুখে ফুটছিল কথার খই। ধর্ম্ম আর অধ্যাত্ম দর্শনে টইটম্বুর হয়েছিল সে।

—হুজুররা, এই মায়াজাল ছিঁড়ে, সব জঞ্জাল কাটিয়ে যে চলে যেতে পারে, সেই খুশি। পুণ্যবানেরাই পারে জগতের মায়া মোহর বন্ধন কাটাতে। সে হেঁড়ে গলায় হাত নাড়িয়ে গান ধরে—ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে!

রাস্তা দিয়ে পাশের গাঁয়ের জগদীশ—রেল বিভাগের গ্যাংম্যান—চলেছিল স্টেশনের পথে। বুধান দেখেই চেঁচায়—জগদিশোয়া! জগদিশোয়া!

কলকাতার এই বাবুদের সামনে এ ধরনের সম্বোধনে জগদীশ ক্ষুণ্ণ—জগদিশোয়া, জগদিশোয়া করে চেঁচাচ্ছ, কেনা গোলাম তোমার? আমার নাম নেই? তারপর বুধানকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে খবর দিল ভুটানের। গত রাতে সিরোহি থানায় তিনজনকে ধরা হয়েছে; ভুটানের হদিশ কবুল করাতে এমন ধোলাই চলেছিল, রক্ত বমি করে ওরা পুলিশ পাহারায় হেল্‌থ সেন্টারে। প্রথম ধাক্কায় বুধান মুসাহারের ঘোলা চোখ গভীর হয়, গালের পেশি নিশ্চল, ফের টসকে ওঠে, হাসতে হাসতে ক্যালিপটাস, ভুরকুণ্ডের ছায়া পেরিয়ে মেহগনির তলায় দাঁড়িয়ে গুনগুন করে—ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে! গাছটা গম্ভীর, কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। জগৎ লালা চেরাই কারবার জন্য লোভ দেখিয়েছিল, কত লোকের নজর শাঁস ডালপালায়! এখন দারোগা পাণ্ডে! বুধান রুক্ষ বাকলে হাত বুলিয়ে কি এক অপার অনুভূতিতে ধ্যানস্থ হয়ে যায়।

দশেরা পার করিয়ে চৌসায় বৃষ্টি এল। শাল, শিশু এবং কুসুম গাছের মাথায় আকাশ নেমে যায়। ন্যাড়া পাহাড় বিষণ্ণ। লাল জমিন গলতে শুরু করেছে। চেঞ্জারদের মরশুম শেষ—ফের জমবে ডিসেম্বরের শেষে। ভূমিহার আর রাজপুত ক্ষেতিয়ালরা রবি মরশুমের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেওসার যা হাল, উশুল করতেই হবে। দারোগা পাণ্ডের বদলির সব ব্যবস্থা হয়েও, কোথায় যেন সামান্য সুতোয় আটকে আছে। শিউকান্ত মুখিয়া একটু বেঁকে আছে মনে হয়। এদিকে লড়কির শাদির দিন এগিয়ে আসছে, কিন্তু মেহগনি?

তক্কে তক্কে তিনি চৌসা আসেন, ওঠেন ভূমিহার রাজপুতদের কোঠিতেই। এদের এখন ব্যস্তের সময়। সিঁদুরে লেখা 'শুভ লাভ'—এ মরশুমে ছিল মরীচিকা। এখন তারা ক্ষেতিয়াল। মুন্নিয়ার সাতান্ন বিঘা জমিন, জগৎ লালার বিয়াল্লিশ, শিউকান্তের পঁচাত্তর, এমনকি এম এল এ সাব সুলতান সিংয়েরও চৌসায় জমি আছে। এখন আশার সমস্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে জমিয়েছে মুগ, ছোলা, মটর তুলবার জন্য; খরা গেল,

গঁহুর মার্কেট চড়বে। তাই উনো জমির দুনো ফসল তোলা চাই। চৌসার লাল, ঝুর ঝুর. মাটি কয়েক দিনের বর্ষার ঝলকানিতে গলতে শুরু করেছে। কিন্তু খেতে নামানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। দুসাদ, মুসাহারদের আব্দারে এদের ব্রহ্মতালু চিড়বিড় করে ওঠে।

—চাল আর ছাতুর মজুরিতে কাজ চলবে না?

—হুজুর, খরায় খড় খুঁটি জ্বলে গেছে, ঝুপড়ি না সারালে ছাতু রাখব কোথায়? রুপিয়া দিতে হবে।

—চৌসা বাজারে কাঁচা টাকার কল বসিয়েছি আমরা! জগৎ লালা হেসে বলে। খরায় তোরা জ্বলে মরলি, আমরা বুঝি পানি মাথায় ছিলাম? মিলেমিশে যখন আছি দুখকেও ভাগ করে নিতে হবে।

বুড়ো রামভল দুসাদ বলে—মালিকরা যদি এ কথা বলেন! মাটির ড্যালা আর পাথর, এক হল? রুপিয়ার মজুরি না দিলে আমরা ক্ষেতে নামতে পারব না।

মুন্নিয়া চমকে যায়। পান চিবানো বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ।

—খরায় আমাদের বেওসা মার খায়নি? একথা না বলে গলায় কাঁচি বসিয়ে দে! চৌসায় টাকার মজুরি বাপ ঠাকুদ্দারা শোনেনি। রোজ তোদের নিয়ম পাল্টাবি?

—নওয়াদা, বিহার শরিফে কি করে দেয় হুজুর?

মুখিয়া শিউকান্ত খাটিয়ায় হুঁকো টানছিল। পাকা গোঁফ, ভুরুর মাঝে চোখজোড়া টিকার আগুন। এতক্ষণ শুনেই যাচ্ছিল। আস্তে টান থামিয়ে বলে—নওয়াদা, বিহার শরিফে আমিররা থাকে, ওরা দিতে পারে। আমরা গরিব আদমি! পারলে আসবে, না হলে আর কি! ঝুটমুট ঝামেলায় কি লাভ?

তিনদিন ওরা ক্ষেতে নামেনি। চতুর্থ দিন পাণ্ডেকে ডাকিয়ে আনল শিউকান্ত। আজ আর পুরি, লাড্ডু কিংবা কচি খাসির মাংস নেই। বিপদের দিনে আতিথেয়তা থাকে না। পাণ্ডে এ অভাবটুকু বোঝেন, ক্ষুব্ধ হন, তবু ভাব-ভঙ্গিতে গায়ে মাখতে চান না।

—অনেক তো করলেন দারোগাবাবু, এবার আমাদের ভাগ্য আমাদেরই সামলাতে দিন।

—এ দেশে তাইতো সবাই করে! হঠাৎ কি হল চৌধুরী? পাণ্ডে হেসে হালকা হতে চান।

—সরকার বাহাদুরের ক্ষমতা অনেক দেখলাম! হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে—তিনদিনে জমিনে যদি লাঙল না নামে, চৌসা লাল হয়ে যাবে! আমরাও মায়ের দুধ খেয়েছি!

—আপনি চটবেন না।

—জরুর চটব। তিন মাহিনা হতে চলল, কি ব্যবস্থা করেছেন? আমি আঁখির

মেঘ টের পাই। আজ সত্তর বছর বয়সে চোখ রাঙানি শুনতে হল। রুপিয়া ছাড়া ক্ষেতির কাজ হবে না। দোহাই, আমরা যা করি, চুপ করে থাকবেন।

পাণ্ডে বেকায়দায় পড়েন। সত্যিই তিনি ভুটানদের পাননি। আর আজ যদি চৌসার ইমানদাররা ক্ষেপে যায়, কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন? অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার উপর।

—চৌধুরী একটা আইন তো আছে?

—ও আপনারা কিতাবে লিখে রাখুন।

—আপনি একজন মেহমান হয়ে...

—থাক দারোগা সাব! ও আইন আমরা মানি না, থুকে দেই।

—মুখিয়া হয়ে কি বলছেন? আইন-কানুন, বিচার...

—আমাদের বিচার আমরা করব। আপনার কোনও ভয় নেই দারোগা সাব, আপনি শুধু চোখ বুজে থাকুন। পাণ্ডের মুখে কথা জোগায় না। শিউকান্তের উত্তেজনা হঠাৎ আড়ালে চলে গেছে। হুঁকোটা খাটিয়ায় রেখে উপদেশের ভঙ্গিতে হেসে বলে—যুধিষ্ঠিরও সগ্‌গে যাওয়াক আগে পেছন তাকায়নি। জীবনে কিছু করতে গেলে খুঁতখুঁত করবেন না। ঝাঝা যান, কাটিহার বদলি হোন, চাইকি বড়িয়া অফ্‌সার হয়ে খোদ পাটনায় বসুন। ভগবানের করুণা আর নিজের তেজ—জগতে আর কি আছে? এক গ্লাস ভয়সা দুধ খাইয়ে পাণ্ডেকে বিদায় জানানো হল। বাইকে চেপে দারোগার মনে হল ভাগ্য গড়তে নিজেকে যত্নবান হতে হবে।

দিওয়ালির সন্ধ্যা ছিল কুয়াশায় ঢাকা। সূর্য চলেছেন দক্ষিণায়নে, হিম নামছে, সন্ধ্যার মুসাহার টোলার আকাশ হাত বিশেক উঁচু সাদা ধোঁয়ায় হামা দিচ্ছে। ক্ষেতের আল ধরে আসা, খাঁকি উর্দি পরা জনাচারেক মানুষের দলটাকে কোনও দাওয়া থেকে ঠাহর করা গেল না। টোলার মুখেই এক বুড়ি থমকে দাঁড়াতেই কর্কশ প্রশ্ন আসে—এ মুসাহার টোলা?

—হ্যাঁ, হুজুর।

—ভুটানের কোঠি কোথায়?

—কেন? কেন?

—একটা শব্দ হল। রক্তে ভেজা নুড়ি শনের চুল নিয়ে, বুড়ি দলা পাকিয়ে উলটে পড়ল। দলটা টোলায় ঢোকে। ভুটান টাট্টি করছিল ক্ষেতির মধ্যে। চমকে উঠে দাঁড়ায়। চোখজোড়া লাট্টুর মত ঘোরে। কানে আসে মুসাহার টোলার চারপাশ ঘিরে ঝিমোনো বাতাস ফুঁড়ে ক্যাট ক্যাট শব্দ। কিছু কান্না, চিৎকার গোলা পাকিয়ে আতঙ্কে ছোটাছুটি করছে। প্রদোষের অন্ধকারে, ফাঁকা মাঠে ভুটানের আঙুলের ডগা কাঁপছে। আর কোনও শব্দ নেই। ন্যাড়া পাহাড়ের মত কিছু সময়ের বোঝা নৈঃশব্দ্য মাথায় চোখের

সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই আগুনের ফুলকিগুলো কালো আকাশে ছিটকে ছিটকে ভস্মের কণা হয়ে যায়। ঝুপড়িগুলোর মাথায় আগুনের লতা ফনফনিয়ে ওঠে, এগিয়ে যায়, বাঁশের গিঁট ফাটে—মুসাহার টোলা জ্বলে। তার গাঁও! সে কেঁদে ফেলে দুবার অন্ধকারে এধার ওধারে ঝুঁকল। নিশ্চয়ই মাঠ ঘের দিয়েছে! মুহূর্তের জন্য সব ওলট-পালট হয়। ধরুক তাকে, খাটুক জেল, এর বেশি তো নয়। তবু টোলা বাঁচানো দরকার। শুধু হো হো চিৎকার আসছে। ঘণ্টাখানেক পর, আট মাইল পাড়ি দিয়ে, সে যখন চৌসা সিরোহি থানার দোরগোড়ায় এল, দিওয়ালি জমছে জুয়ো আর মদে। আজ কোনও নিষেধ নেই। পুলিশ ঢিলে ঢালা, থানা মিট মিট করছে, পাণ্ডে উঠি উঠি করে চেয়ারে বসে কি যেন লিখছিলেন। ভুটানের বুকের ছাতিতে ঢেঁকির পাড়েও তার হুঁশ ভাঙে না।

—হুজুর, আগ!

—কোথায়?

—চৌসা মুসাহার টোলা!

—কি করে দেখলি? পাণ্ডে মুখ তুলে খেলাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেন। ফের লিখতে থাকেন!

—হাঁ হুজুর, আমি দেখলাম। টোলা সব জ্বলে যাচ্ছে।

—তুই দেখলি? কি করে দেখলি? লিখতে লিখতেই তিনি নিরুদ্বেগ প্রশ্ন ছোঁড়েন। কি নাম তোর?

—ভুটা মুসাহার...। না, হুজুর!

একজোড়া আরক্ত চোখ টেবিল ছেড়ে ছিটকে উঠল। ইউনিফর্ম ঢাকা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতির বাঁ দিকের ভাল্বগুলো হঠাৎ রক্ত চাপে থরথরিয়ে ওঠে। হিসোনো গলায় পাণ্ডে যাচাই করে নিলেন—ভুটান মুসাহার? না, কিরে?

টেবিলের সামনে মিটমিটে আলোয় বছর বিশের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। কালো, টিকালো নাক, সাদা দুটো ঢ্যালা, ভাঙা কোলে ঘাম জমে আছে। লোমশ জোড়া ভুরু, সরু গোঁফ। ঘাড়ে, পাঁজরায় ঘা। কণ্ঠ থেকে বুক বরাবর দৌড়োনোর ফলে ভেজা। ঠোঁট ফাঁক করে দম নিচ্ছে। পাণ্ডের চেয়ার সরিয়ে উঠবার শব্দ হল।

—বস! এই বেঞ্চে!

দূরে দিওয়ালির বাজি ফাটার শব্দ হয়।

পরদিন চৌসায় ডি. এম., এস পি, এম এল এ, পাণ্ডে, শিউকান্ত, ভূমিহার, রাজপুত, দুসাদ, খেড়িয়ারা ভিড় করল। ছাই ঘেঁটে আধপোড়া, এলোপাথাড়ি ক্ষতচিহ্নের জন্য এগারো পুরুষ, মহিলা ও বালবাচ্চার সঙ্গে একটি দেহও গুনতি হয়ে গেল। তার পোড়ার চিহ্ন নেই, এলোপাথাড়ি ক্ষতও ছিল না। দেহে কেবল

আঁকা ছিল কপালের নিচে, জোড়াভুরুর মাঝে ক্রোজ রেঞ্জের একটি শট্‌। সরু রক্তের ধারাটি নাকের পাশ গড়িয়ে ইঞ্চি দুয়েক এসে থমকে কালচে। ঢ্যালা দুটো স্থির, ধসা আকাশ। আঙুলগুলো কিছু বাধা দেওয়ার মুদ্রায় শীতল, বিভঙ্গ। নিশ্চিন্তে তদন্তের জন্য শিউকান্ত বড়িয়া অফিসারদের প্রস্তাব দিল—আপনারা সব ভুখা আছেন। যদি কৃপা করে গরিবের কোঠিতে পায়ের ধুলো দেন! দলটা খানিক বিশ্রামের জন্য চলে আসে।

পাণ্ডে সাতদিনের মাথায় ঝাঝায় বদলি হয়ে গেলেন। আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ভগবানের করুণা আর নিজের তেজ! হার তিনি মানেননি, মানবেনও না। মোটর সাইকেলে কিউল, ঝাঝা রোডে চৌসা ত্যাগ করার দিন মনে হল সবকিছু সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। প্রতিবার বদলির সময় এটামনে হয়। অনায়াস শান্তিতে মন ভরে থাকে।

ফটকের সামনে বাইকটা থমকে দাঁড়ায়। চমকে দেখেন সবকিছু নিয়ে গেলেও একটা জিনিস রয়েই গেল। ছুঁতে পারেননি তিনি। মেহগনি। আদিম বৃক্ষ, প্রাচীন বল্কল, গভীর শিকড়, অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও পত্ররাজি বিস্তীর্ণ আকাশমুখী! অন্ধকার পাতালপুরীর গভীরে দীর্ঘদিনের ধন্যা ও মৌন প্রতীক্ষায়, ঝড় ও রৌদ্রের শাসন উপেক্ষা করে আপন মূল গ্রথিত। বুড়ো বুধান মুসাহার এক মনে জঙ্গল পরিষ্কারে ব্যস্ত। কোনও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে!

সামান্য আপশোস নিয়ে দারোগা পাণ্ডে ইট-পাথরে ঠোকর খেতে খেতে চলতে থাকেন। সুমুখে প্রসারিত ঝাঝার একমাত্র পথ।

গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি

অমর মিত্র

বুনোপাড়া থেকে কায়স্থপাড়া আর কতদূর। দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পায়ে হাঁটলে দশ মিনিট। কম বেশি হতে পারে। ঘড়ি ধরে তো কায়স্থপাড়ার দিকে এই মহিষবাথান বুনোপাড়ার মানুষ হাঁটেনি কেউ কোনদিন। সে প্রয়োজন হয়নি, কেননা কায়স্থপাড়ায় রেল স্টেশন নেই যে টাইমের ট্রেন দরে কেউ কোথাও যাবে। বাসস্ট্যান্ড নেই যে বাসে চেপে কেউ শহর কলকাতায় ছুটবে সময় নির্ধারিত কোনও কাজ করতে। লঞ্চঘাটও নেই কায়স্থপাড়ায়। ছিল না কোনদিন, বরং ছিল এই বুনোপাড়ার উত্তরে, খালাপাড়ে। তখন খাল ছিল নাব্য, লঞ্চ চলত, তাতে চেপে চলে যায়া যেতন দক্ষিণ-পশ্চিমে কারামাইকেল হাসপাতাল, শ্যামবাজার, বাগবাজার। হুগলি-নদীতে গিয়ে পড়া যেত। কিন্তু তখন তো লোকের হাতে ঘড়ি ছিল না, পথেঘাটে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কোয়ার্টাজ ঘড়ি কিনতে পাওয়া যেত না। সে অনেককালের কথা। জানে শম্ভুর ঠাকুমা বুড়ি। বুড়ি বলে, এখান থেকে লঞ্চে, নৌকায় চেপে বাঁদিকে শ্যামবার্জার, ডানদিকে বসিরহাট, সুন্দরবন, খাল গিয়ে পড়েছিল বিদ্যাধরী নদীতে। সে নদীও কি আর আছে বাবারা, খোঁজ জানো? কুলটি গেটের কাছে পৌঁছে ঢেউ উথালপাথাল, কখন যে এই খাল, নদী হয়ে গেল টের পাবারও উপায় নেই।

বুনোপাড়ার মানুষের ইদানীং বেশ কয়েকবছর কায়স্থপাড়ায় যেতেই হতো না। তারা বরং হাতে ঘড়ি নিয়ে মণ্ডলদের ভেড়ির পাশ দিয়ে উঠত রেডক্রশের বড় বাড়িটার কাছে। তা পার হেয় ফিলিপ্স কোম্পানির কাছে, সেখান থেকে তো বাস পাওয়া যায়, অটোরিকশাও। তারপর সল্টলেক আর কতদূর। হ্যাঁ রেডক্রশ বিল্ডিং, ফিলিপ্স কোম্পানির সল্টলেকের ভিতরে, তবে জনবসতি তো আরও দূরে। অটোরিকশায় ভেড়ির কোল থেকে করুণাময়ী পাঁচ-সাত মিনিট। এইভাবেই তো গত বছর আষ্টেক যাওয়া আসা চলছে। তার আগে হাঁটতে হতো আরও। সল্টলেক ক্রমশ এগিয়ে আসছে এদিকে। এগিয়েই এল। বুনোপাড়া ঢুকে গেছে সল্টলেক মিউনিসিপ্যালিটিতে। আর বুনোপাড়ার মানুষের যাত্রাপথও বদলাবে এবার। তাদের যেতে হবে কায়স্থপাড়ায়। খালের উপর দিয়ে রাস্তা উড়াল দিয়ে নামছে কায়স্থপাড়ায়। বাইপাস রোড। বুনোপাড়ায়, বিশ্বাসদের মস্ত বাড়ি পার হয়ে রাস্তার কোলে। খালের ওপারে নতুন নগর, নিউ ক্যালকাটা, এপারে

সল্টলেক সিটি। বুনোপাড়ার মানুষ এখন সকাল-সন্ধে হিসাব করছে সল্টলেক ভাল হল, না নিউ ক্যালকাটা ভাল হবে।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, সল্টলেকই ভাল, হয়ে আছে সব, মেগাসিটি তৈরি হতে হতে সময় লেগে যাবে, শম্ভু সিংহবাবুকে পাকা কথাটা বলে দাও, উনি অ্যাডভান্স করবেন কাল পরশু।

পাকা কথা শম্ভু বলেই দিয়েছে। পঁয়ত্রিশের কম হবে না। ব্যানার্জিবাবু যখন তিরিশে নিয়েছিলেন, তখনই তো দর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। সল্টলেকে ঢুকবে ঢুকবে করছে বুনোপাড়া, টাকার খুব দরকার ছিল শম্ভুর, তাই তিরিশেই দিয়ে দিল, এই তো নভেম্বরের কথা। এখন জুনের শেষ, শীত এল, শীত গেল, রোদ গরম হল, ঝাঁ ঝাঁ বোশের জষ্ঠি এসে চলেও গেল। এখন আকাশে মেঘের অলস বিচরণ, বৃষ্টি নামছে, নামছে। ঘোর বর্ষা নামল বলে। বুনোপাড়া সল্টলেক হয়ে উঠল বলে, বাইপাস রোডে মানুষ তো গাড়ি নিয়ে ইতস্তত ঘোরফেরা করছে ওই মেঘের মত। মেঘ দেখলে এখন শম্ভুর মারুতি, অ্যাম্বাস্যাডারের কথা মনে পড়ছে।

শম্ভু বসেছে মাদুরে। তার পাশে ব্যানার্জিবাবু। শম্ভু আর ব্যানার্জিবাবুকে ঘিরে মিছিল দঙ্গাল। মাছির জন্যই সিংহাবাবুর স্ত্রী এক্ষুনি উঠে গেছে এখান থেকে। ঘুরছে শম্ভুর মেজবোন বনির সঙ্গে বাগানে, গাছগাছালির তল দিয়ে।

সিংবাবু বসেছেন চেয়ারে। শম্ভুদের বাড়িতে আদ্যিকালের দুটো কাঠের চেয়ার। ওই চেয়ার দুটো পেয়ারাতলায় নামানো ছিল আগে থেকেই। কিন্তু ব্যনার্জিবাবু আর তার ছেলেকে ধরে মানুষ তো চারজন। তাই মাদুর পাততে হয়েছে। সিংহ্বাবু আর তার স্ত্রী বসেছিলেন চেয়ারে। আশ্চর্য। মাছির দঙ্গল ললিতার পায়ের কাছে লুটোনো সিনথেটিক সিল্ক ঘিরে ধরেছিল। দুবার ঝাড়া দিয়ে ললিতা চলে যেতে চেয়ারটা এখন ফাঁকা। ব্যানার্জিবাবু উঠছেন না মাদুর থেকে।

চেয়ার আর মানুষের মাথায় এখন করমচা আর পেয়ারাগাছের মেঘ। মেঘই বটে। এখন রোদ না থাকলেও, বোশেখ জষ্ঠিতে কম ছিল। সেই রোদের দিনেও তো এই ভিটেয় মানুষ আসার বিরাম ছিল না সকাল-বিকাল। তখনই চেয়ার ও মাদুর রেখে কথা বলা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে শম্ভুর, সে বলল, পঁয়ত্রিশের কম হবে না দাদা, টাকার দরকার না হলে কেউ ভিটে বেচে, আমাদের তো আর কিছু নেই।

সিংহমশায় বললেন, তা বলে ছ'মাসের ভিতরে পাঁচ হাজার করে বেড়ে যাবে, আমরা তো তিরিশ শুনেই এসেছি শম্ভুবাবু।

শম্ভু হাত কচলায়, আমাকে বাবু বলতে হবে না, শম্ভুই বলুন, আমি আপনার ছোট ভাই-এর মত, পঁয়ত্রিশ করে চার কাঠা একলাখ চল্লিশ হাজার আলাদা দিতে হবে, একলাখ চুয়াল্লিশ সব সমেত, দাম তো রোজ বাড়ছে, খালপোলের কাজ আরম্ভ হয়েছে, বাইপাস চালু হলে কি আর এই দামে পাবেন দাদা, কী বলেন ব্যানার্জিদা?

ব্যানার্জিবাবু বললেন, তোমার কাছে আমি আমার বন্ধুকে এনে দিয়েছি, জমি দেখে চলে যাবে না, তুমিই ঠিক কর, আমি এর ভিতরে মাথা গলাব না।

শম্ভু খুশিই হল। তার ভয় ছিল ব্যানার্জিবাবু মাঝখান থেকে না কমিশন খেয়ে বসেন। দালাল তো লেগেছে তার এই কাঠা বারোর ভিটেবাস্তুর পিছনে। দালাল দর ঠিক করে দুপক্ষ থেকে টাকা খেয়ে বসে। শম্ভুকে তেমন কিছু বলেননি ব্যানার্জিবাবু। বলবেনও না। তিনি হলেন এই জমির প্রথম তিন কাঠার ক্রেতা। তারপর তো লোক আসছে, দেখেই যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে ব্যানার্জিবাবুর কাছে যায় শম্ভু। ভিটের ভিতরে দেখেশুনে লোক ঢোকাবে তো। বারো কাঠার দু-টার কাঠা তো থাকবেই তাদের। তারা তো বাস করবেই। শম্ভু ভেবেছিল ব্যানার্জিবাবু হয়তো তাঁর বন্ধুর হয়ে সওয়াল করবেন, না করায় সে জোর পেল, বলল, এই টাকায় পাকাঘর, দুটো বোনর বিয়ে, আমি তো সামান্য কাজ করি দাদা শ্যামবাজারে কুণ্ডু ক্লথ স্টোর্স-এ, ভাই শ্যামও এখন কোনও কাজ পায়নি, আমরাটাও দেখবেন স্যার।

সিংহবাবু শুনছিলেন। শুনতে শুনতেই আচমকা কথা ঘুরিয়ে দিলেন, তোমরা এখানে কত বছর আছ শম্ভু?

শম্ভু বলে, আমার তো চৌত্রিশ, আমার জন্ম এখানে, ঠাকুর্দা এসেছিলেন, তাই জানি।

ওই যে খালের কথা বলছিলাম না, কেষ্টপুর ক্যানেল, ওই খাল তো ডাউনে কুলটিতে গিয়ে বিদ্যাধরী নদীকে হুগলি নদীর সঙ্গে কানেক্ট করেছিল, ওই খালের ভরসায় লোকবসতি হয়েছিল এখানে, খালে, লঞ্চ, নৌকো, বলেছিলেন ব্যানার্জিবাবু, সল্টলেকে তো শুধু মাছের ভেড়ি, বিদ্যাধরীর শাখা প্রশাখাও তো ঢুকেও পড়েছিল এদিকে, নৌকোয় করে শুধু মাছ আর মধু যেত শ্যামবাজারে, গোয়ালারা ছিল এখানে বহুকাল ধরে।

শম্ভু শুনতে শুনতে মাথা দোলায়, আমার বাবার দুধের ব্যবসা ছিল ব্যানার্জিদা।

আশ্চর্য। সিংহবাবুর গলায় বিস্ময়, বিশ্বাস হয় না একটুও।

ব্যানার্জিবাবু বললেন, তারপর ক্যানেল মজতে শুরু করল।

কেন বলুন দেখি?

আবার কেন? ব্যানার্জিবাবু সিগারেট ধরালেন, উড়ন্ত মেঘ-বাষ্পের মত ধোঁয়া ভাসিয়ে দিলেন করমচা গাছের নিচে, বললেন, জলের জোগান কমে গেল।

কেন? বৃষ্টি হল না নাকি?

হাসলেন ব্যানার্জিবাবু, তা কেন, প্রথমত খালে পলি জমতে লাগল, ড্রেজিং হল না ঠিক মত, ব্রিটিশ আমলে তো কাজ হতো, আমাদের আমলে সবাই স্বাধীন, যেন ক্যানেল নিজে নিজেই তার পলি সরাবে, আর বড় কারণ তো হুগলিন নদী, মানে গঙ্গায় জল কমে আসা, ফারাক্কা বাঁধ, বিহার, ইউ পি'র নানান বাঁধ, স্বাধীনতার পর আচ্ছা করে নদী বাঁধতে লাগল সবাই, গ্রিন রিভোলিউশন হতে আরম্ভ করল সারা দেশ, জল টানতে অরম্ভ করল সবাই, জল নিয়ে কত কাণ্ড, বাংলাদেশের সঙ্গে ঝগড়া তো এই গঙ্গার পানি নিয়ে।

এ তো জানা কথা। বললেন সিংহমশায়, কিন্তু ওরা তো বলে জল সব টেনে নিচ্ছে, আমরা, আবার আপনি বলছেন জলের জোগান কমে গেল।

যেমন হয়, খালটা মজে যেতে এইসব এলাকা বিশ্ব সংসারের বাইরে চলে গেল, সভ্যতকা শেষ।

আশ্চর্য! আপনি সব জানলেন কোথা থেকে?

ব্যানার্জিবাবু নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। জবাব দিলেন না। দারুণ কথা বলছেন তো টের পেয়ে সামান্য সময় অন্তর বললেন, খাল মজে যাওয়া মানে বিদ্যাধরীতেও জলের জোগান কমে যাওয়া, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নদী শেষ হতে আরম্ভ করল। আপনি যদি কুলটি গেটের দিকে যান, দেকবেন সেই নদীর কী করুণ অবস্থা।

আশ্চর্য! মাটির পার্টস আর মোটর গাড়ির ব্যবসায়ী সিংহমশায়ের বিস্ময় শেষই হয় না, বললেন, অবাক লাগে না ভাবলে?

অবাক হওয়ার কী আছে, এইভাবেই তো মানুষ শেষ করছে প্রকৃতিকে, ধরুন সল্টলেক, ছিল তো জলাভূমি, বড় বড় মানুষের মত সব মাছের ভেড়ি, তাকে গঙ্গা মাটি দিয়ে বুজিয়ে শহর গড়ে তোলা হল, ফল কী হল?

বলুলোক বাস করছে, এত চমৎকার সিটি ইন্ডিয়ার কোথাও আর আছে। বললেন সল্টলেক-এচি-এ ব্লক নিবাসী সিংহমশায়।

বিরক্ত হলেন ব্যানার্জিবাবু, আমি ওকথা বলছি না, বলছি এতটা জলাভূমি কত জল টানত বলুন কলকাতার, এখন তো একবৃষ্টিতেই কোমর জল, কেন তা ধরতে পারেন?

সিংহমশায় মাথা নাড়লেন, যা বলুন, সল্টলেক না হলে এত লোক যেত কোথায়, আর এই বুনোপাড়ারই বা হতো কী, হ্যাঁ শম্ভু ফাইনালি কী হল যেন, আবার চার হাজার কেন? তাহলে তো ছত্রিশ করেই পড়ে যাচ্ছে।

শম্ভু বলল, ওটাতো চেয়ে নিচ্ছি স্যার।

সিংহমশায় শুনলেন কিনা বোঝা গেল না, তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণেই অন্যমনস্ক, বিভোর হয়ে যাচ্ছেন। কত গাছ শম্ভুদের বারোকাঠা ভিটেয়। একধারে মাটির বাড়, একটুখানি উঠোন, তা বাদে বাকি সবটায় নারকেল, খেজুর, সুপুরি, আম, জাম, পেয়ারা, আতা, খুব উঁচু কেওড়াগাছ, নোগাছ। পাখি এ ডাল ও ডালে লাফ দিচ্ছে।

হ্যাঁ শম্ভু তোমরা যাতায়াত কী করে? এতকাল যাওয়া আসা হতো কী করে?

ব্যানার্জিবাবু বললেন, পায়ে হেঁটে।

তখন মাটির ঘর থেকে কোমর ভাঙা এক বুড়ি বেরোচ্ছিল। বুড়ি হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠোনে নেমে এল। সোজা হতে পারে না বোধহয়, উঠোনে বসে আচমক ডেকে উঠল, অ্যাই শম্ভু, শম্ভু।

শম্ভু বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরোয়, তুমি নামলে কেন?

বুনি বলল, তোর বাবা কীরকম ভাবে মরল তা বলে দে।

আহ্ ঠাম্মা!

বুড়ি বলল, হেঁটে হেঁটেই মরে গেল, তা বলে দে।

শম্ভু ডাকল, অ্যাই বুল, বুল্, ঠাম্মাকে ভিতরে তুলে নে।

আহা থাক না। ব্যানার্জিবাবু হাসলেন, কী যেন ছড়াটা বলে তোমার ঠাকমা, কুটনো কোটো বাটনা বাটো।

শম্ভু হি হি করে হাসে, বাবা যাওয়ার পর ঠাকমা কেমন যেন হয়ে গেছে, ঠাম্মা চুপ করো, স্যার চার হাজার আমাকে দেবেন, চেয়ে নিচ্ছি।

সিংহমশায় বিড়বিড় করলেন, আশ্চর্য! কী বলে তোমার ঠাম্মা?

বুড়ি গুনগুন করে, পুত মরল, হেঁটে হেঁটে মরল, ও শম্ভু বল।

শম্ভু বিরক্ত হয়। মূল কথাটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। একস্ট্রা চার হাজার, পঁয়ত্রিশ করে কাটা। কোনওটাতেই হ্যাঁ বলেনি সিংহমশায়, নাও বলেনি। শম্ভু বলে, ঠাম্মাকে ঘরে নে বুলু।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অতি শীর্ণ বছর তিরিশের একটি মেয়ে। নেমে এসে বুড়ির হাত ধরল, কী হচ্ছে বলেচ না কথা বলবে না।

বুড়ি গুনগুন করছে, কুটনো কোটো বাটনা বাটো...।

বছর তিরিশের অবিবাহিতা বুলু সিংহমশায়ের দিকে চেয়ে হাসে, ঠাম্মা ওরম বলে, ও ঠাম্মা উঠে পড়।

আশ্চর্য। সিংহমশায় তাকিয়ে আছেন রোগাভোগা যুবতীর দিকে। যুবতী মাথা নামিয়ে বিড়বিড়ি করে, কানের সোনাটি নড়ে, ও ঠাম্মা আমি বলছি হি হি....। কুটনো কোটো বাটনা বাটো, কানের সোনাটি নড়ে, আমার কটি পুত মেরেচে, তাকি মনে পড়ে?....ও বুনি বুনি, খোকাটা ঝোপের দিকে যাচ্ছে, বারণ কর, ওর হাতে ওটা কী, বন্দুক?

ব্যানার্জিবাবু বললেন, শম্ভু এক গ্লাস জল আনো দেখি।

সিংহমশায় বললেন, অবাক, অবাক লাগছে মশায়, কী করে হাঁটতে লোকে এত পথ, সল্টলেক হল তো মাত্তর ক'বছর।

দুই

ব্যানার্জিবাবুর আটবছরের ছেলে রনিকে ছুটে গিয়ে ধরল শম্ভুর মেজ বোন বুনি, ও ছেলে, ভিতরে যায় না সাপ আছে।

ললিতা ডাকে, রনি এদিকে এস।

টয়গান হাতে রনি বড় মানুষের মত গম্ভীর পা ফেলে ফেলে হাঁটছে, ঘুরে তাকিয়ে বলল, কুক্কুটো কাথায় গেল বলো দেখি, আমি তাকে গুলি করে দেব।

হি হি করে হাসে বুনি, কক্কু মানে কোকিল, ও ছেলে তুমি কোকিল মারবে?

ললিতা শ্লথ পায়ে এগিয়ে এল, এটা তো রেইনি সিজন, রনি এখন কোকিল কোথায় পাবে, স্প্রিং-এ যদি আসতে দেখতে পেতে।

রেনি সিজন মানে বর্ষাকাল, স্প্রিং মানে বসন্তকাল, হ্যাঁ ফাল্গুন চোত মাসে কী ডাকা

ডাকে, একজোড়া বসে থাকে মাদারি গাছে, আর এক জোড়া থাকে ওই দিল্লিশ্বর কাকুর আম গাছে। বুনি বলল।

ওরা কি রেইনি সিজনে থাকে না? জিজ্ঞেস করল ললিতা।

থাকবে না কেন, ডাকে আবার ডাকে না, এইতো একটা উড়ে গেল ওদিকে। বলল বুনি।

আশ্চর্য! সিংহমশায়ের স্ত্রীর বিস্ময়বোধ স্বামীর মতই, ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, পুরো বসন্তকাল তোমরা কোকিলের ডাক শোনো?

হ্যাঁ শুনিই তো। বুনি উৎসাহ ভরে বলল, আপনারা এলেও শুনবেন।

ললিতা চোরা চোখে মেয়েটিকে দেখতে লাগল। কত বয়স হবে? কুড়ি-বাইশ, না চোদ্দ পনের। আশ্চর্য! এদের বয়স ধরাই যায় না রোগা বেলে। রং জ্বলা ছিট কাপড়ের শালোয়ার কামিজ, মাথার লালচে চুলের গোড়ায় তেলচিটে লালফিতের বাঁধন। দেখতে দেখতে ললিতা জিজ্ঞেস করে, আর কী কী পাখি আছে এখানে?

সবরকম পাখি। নিচুস্বরে বলল বুনি।

সবরকম! আশ্চর্য তো! কী কী পাখি?

দোয়েল, টিয়া, বউ কথা কও, চোখ গেল, ফিঙে—ওদিকের ভেড়িতে পোনকৌড়ি, কতরকম যে আছে বউদি, নামও জানিনে।

নাম জানোনা! পাখি দেখ নাম জানোনা? আশ্চর্য!

হাসে বুনি; সব নাম কি জানা যায়, আপনি জানেন?

ললিতা বলে,নাম জানি, পাখি চিনিনে, আশ্চর্য!

আপনারা বাড়ি করবেন তো? বুনি জিজ্ঞেস করে।

না হলে কিনছি কেন?

আপনার এলে সব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। বুনি বিড়বিড় করে।

কী হয়ে যাবে?

বুনি চুপ করে থাকে। কী হয়ে যাবে তো সে মনে মনে ভেবে নিচ্ছে যেন, শেষে হাসতে হাসতে বলল, এই ধরুন দিদির বিয়ে।

বাহ্! তারজন্য আমাদের আসতে হবে কেন?

বুনি বলল, আমার মনে হচ্ছে তাই, সম্বন্ধ শুধু দেখাই হচ্ছে, দিদির বদলে আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে, কেউ, কেউ কিছুই বলছে না, পঞ্চাশ হাজার নগদ চায়, তারপর মেয়ে...।

আশ্চর্য! তা কেন হবে?

বুনি বলল, আপনাদের গাড়ি আছে তো?

আছে।

খুব ভাল হবে, ভেড়ি, রেডক্রশ, ফিলিপ্‌স, বাঁদিকে চলে গেলে নিকোপার্ক।

গেছ তুমি নিকোপার্কে? ললিতা জিজ্ঞেস করে।

বুনি মাথা নাড়ল, সামনে দিয়ে গেছি, ভেতরে ঢুকিনি, কী আছে ভেতরে বলুন?

কী আর আছে মানে? ললিতার চোখে বিস্ময় যে কেন ফোটে তা টের পাওয়া ভার।

বুনি বলল, আমি আইসক্রিম খাই না, দাঁত নষ্ট হয়ে যায়, আপনার বাড়িতে তো ফ্রিজ আছে, আছে না?

আছে-এ। বলল ললিতা।

তাহলে তো আইসক্রিম গলবে না, হি হি করে হাসে বুনি, বাড়িতেও আইসক্রিম করতে পারেন, ওই যে খাল দেখা যাচ্ছে, অনেক আগে লঞ্চ চলত।

আশ্চর্য। ললিতার কৌতূহল নেই, আছে বিস্ময়।

ওই খালের ওপারে মেগাসিটি, নিউ ক্যালকাটা, এপারে আমরা সল্টলেকে, কী দারুণ ব্যাপার বলুন।

তা ঠিক। ললিতা তার দৃষ্টিতে বেঁধে ফেলেছে দিগন্ত, খালপাড়, তাপরে গাছগাছালির অন্ধকার, বিষয় আকাশ, রৌদ্রবিহীন মাঠ পাথারে ফড়িং-এর ওড়াউড়ি।

ওপারে মেগাসিটি, এপারে সল্টলেক, আমাদের দুদিকে দুইরকম, আর একটা জায়গা হল যাওয়ার।

তার মানে?

বুনি গুনগুন করে ওঠে, ওপারে তুমি শ্যাম, এপারে আমি, মাঝে নদী বহেরে।

কী আশ্চর্য! এর মানে?

ওপারে সল্টলেক, এপারে মেগাসিটি আমরা 'মাঝে নদী বহেরে'। হি হি করে হাসতে থাকে বুনি।

তা কেন, এটাও তো সল্টলেক।

তাই তো বলছি, মাঝে নদী বহেরে, সল্টলেক তো ওই, ফিলিপ্স রেডক্রশ দেখা যাচ্ছে, জল ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে, বাড়ির পর বাড়ি, এইরকমভাবে মেগাসিটি-নিউ ক্যালকাটা দেখা যাবে, কী দারুণ হবে, আমি আপনাদের বাড়ি যাব বউদি?

যাবে, আজই চল।

না না অন্যদিন, এইচ-এ-তে তো।

তুমি চেন?

ঘাড় কাত করে বুনি, চেনে সে।

আশ্চর্য! কী করে চিনলে?

বুনি বলল, ওরশুই গিয়েছিলাম, ওদিকে তো যাই।

যাও, কেন যাও?

এমনি, আমি দিদি আর দিল্লিশ্বর কাকুর মেয়ে শিখা, আর মণ্ডল জ্যাঠার মেয়ে টিঙ্কু, দেখলাম এইচ-এ নম্বর একশো বত্রিশ, নিজেদের বাড়ি, না ভাড়াবাড়ি?

সত্যি গিয়েছিলে?

তাছাড়া কী বলছি, দোতলার বারান্দায় লালরঙের টালির মত কী যেন দেয়া, সিমেন্টের, টালি, কী সুন্দর বাড়ি, ভাড়ায় থাকেন?

ললিতা বলল, তো ভিতরে ঢুকলে না কেন?

কী করে ঢুকবে, আপনি কি চেনেন আমাদের, চিনলেন তো আজ।

আশ্চর্য! ঠিকানা দিল কে?

দাদা বলছিল এইচ-এ একশো বত্রিশ, চলে গেলাম, বুনি হাসল।

বাহ্! দারুশ তো, চলে গেলে, দেখে এলে?

হ্যাঁ, আমরা তো যাই।

যাও, কোথায়, এইচ-এ তে? জিজ্ঞেস করল ললিতা।

এইচ-এ, এফ-ডি, পূর্বাচল, করুণাময়ী, বৈশাখি, বি-ডি সব জায়গায়।

সব জায়গায়, আশ্চর্য! কেন যাও?

এমনি ঘুরতে যাই, আপনাদের বাড়ি যাব?

কেন যাবে না?

বুনি ঘুরছে ললিতার চারপাশে। মুখটিপে হাসছে নিজের মনে। ললিতা অবাকই হয়েছে মেয়েটার কথা শুনে। এইচ-এ, একশো বত্রিশ, ঘুরে এসেছে? দেখে এসেছে বাইরে থেকে। আশ্চর্য! কী দেখল? সল্টলেক ঘুরতে যায়। হাসি ফুটছে ললিতার মুখে। তখন শম্ভু ডাকল, বউদি, আর চার হাজার চেয়ে নিচ্ছি, বোনগুলো বিয়ে দিতে হবে তো?

বুনি ঘুরে এল, দাদাটা ওই রকম।

কী রকম?

চার হাজার চেয়ে নিচ্ছি। চেয়ে নেবে কেন?

তোহলে কীভাবে নেবে, কেড়ে? ললিতা হেসে ফেলল।

বাহ্‌রে, তা কেন, ছত্রিশ করে বললেই তো হতো। দাদাটা যে কী রকম! বুনি বিনবিন করতে থাকে।

বাব্ব, ছত্রিশ, ব্যানার্জিদা তো তিরিশে নিয়েছে।

ব্যানার্জিবাবুর কাছ থেকেও এক্সটা দু'হাজার নিয়েছে, চেয়ে নিয়েছে, কেন নেবে?

ললিতা বলল, চেয়ে নিচ্ছে কেন?

তাহলে জমির দাম কম হল, আবার চাওয়াও হল, বুনি বলল।

চেয়ে লাভ?

বুনি বলল, চেয়ে নিতে দাদার ভাল লাগ, তিনটি বোন আমরা রয়েছি কাঁধে, একটা ভাই রয়েছে, দাদার একার উপরে তো সব, তাই চেয়ে নেয়, চেয়ে নিয়ে তো আমাদের খাওয়া চলত এক সময়, দাদাটা যে কী।

কী? জিজ্ঞেস করল ললিতা।

দোকান থেকেও চেয়ে নেয়, এই ধরুন আলু কিনল, একটা চেয়ে নিল, শ্যামবাজারে কুণ্ডু ক্লথ-এ সাতশো টাকা দেয়, পঞ্চাশ টাকা চেয়ে নেয়, দু'বছর তাই মাইনে বাড়েনি।

বাহ্ চমৎকার তো। ললিতা উপরে তাকাল, পাতার অন্ধকারে কী দেখল কে জানে, কথায়, দৃষ্টিতে বিভোরতা ফটে উঠল, ঘন ডাল পাতার মাথার উপরে অন্ধকারের চাঁদোয়া। পাতার আড়ালে অবডালে, ফাঁক ফোকরে যেন মেঘ এসে ঢুকেছে। অনেক ফল হয়েছে মাদারি গাছে। দেখতে বেশ লাগে।

বুনি ডাকল, বউদি আপনাদের কি কালার টিভি, ওনিডা?

হ্যাঁ, কী করে জানলে?

জানি! মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি এল বুনির, সল্টলেকে ওই টিভিই সব ঘরে।

কে বলল?

আমরা জানি, আপনার ভি সি পি আছে?

হ্যাঁ আছে তো, কী করে জানলে?

জানি, ওসব থাকে, আপনাদের ফ্ল্যাট খুব বড়, ঢুকতেই সোফাসেট?

বড় তো বটেই, হ্যাঁ সোফাসেটও, কী করে জানলে তুমি?

জোনি। বুনি তার হাতের আঙুল টেনে ফুটোতে লাগল, ডাইনিং, থ্রিরুম, ওয়াশিং মেসিন আছে?

ঠিক আছে তো, তুমি কি ঢুকেছিলে আমাদের ফ্ল্যাটে।

বুনি হি হি করে হাসে, আমার দিদি বুলু, আমার বোন বুটু, শিখা সবাই তো গেছি সল্টলেকের সব জায়গায়, তাই জানি, দেওয়ালে বড় ছবি আছে?

কী ছবি?

জঙ্গলের, তার নিচে টেলিফোন, তাই না?

কী আশ্চর্য। তাই তো। ললিতা হাসছে।

বুনি বলল, ঠিক ধরেছি, আমি বলছিলাম দিদির বিয়ে যদি, এ-ডি, বি-ডি, এফ-ডি, এ-জে, এইচ-এ, এইচ-বি, সি-ই, সি-এফ হিহিহি, কত ব্লক আছে না, এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, দিদির বিয়ে যদি এ-ডি, বি-ডি-তে হতো।

কোথায় হচ্ছে?

বুনি বলল দেখাশুনা চলছে, আজ বিকেলে পাত্রপক্ষ আসবে বি-বি থেকে।

বি-বি! আশ্চর্য! বি-বিতে তো আমার মাসি থাকে।

হি হি করে হেসে ফেলেছে বুনি, বি-বি মানে বি-বি নয় বউদি, আমরা বলছি বি-বি, বি-বি মানে বাগবাজার, বজবজ, বজবজ জানেন?

জানি তো।

কতদূর?

অনেক দূর। বলতে বলতে ললিতা চোখ ভাসিয়ে দিল দিগন্ত রেখায়। মেঘে মেঘে কালো হয়ে গেছে পূর্বদিক। ওদিকে বৃষ্টি এল নাকি?

বুনি বলল, বি-বি মানে বজবজ, গঙ্গার ধারে বজবজ। যদি লঞ্চ থাকত খালে তাহলে লঞ্চেচেপে তারা বজবজ থেকে চলে আসত আমাদের বাড়ি, দিদিকেও পছন্দ হয়ে যেত,

ইস কত রোগা দিদি, গায়ে মাংসই নেই, তাই না?

তাই পছন্দ করে না কেউ, যদি খালে জল থাকত দিদি লঞ্চে করে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারত, তখন পছন্দ হয়ে যেত।

আশ্চর্য। ললিতা তাকিয়ে আছে মাটির বাড়ির দাওয়ায়। সেখানে বসে আছে লাজুক মুখের বছর তিরিশ প্রায় মেয়ে। চোখের দৃষ্টিতে কোনাও আলো নেই। মেঘ অন্ধকারে মিশে একাকার।

বুনি বলল, বউদি আপনার গার্ডেন সিল্ক আছে?

আছে তো, কী করে জানলে? ললিতা হাসে।

জে সি টি ভিলওয়ারা শুটিং আছে দাদার? ইয়ে জে—সিইই—টি। কী রকম ডাকে।

তাইতো পরে।

পার্ক এভিনিউ শার্ট?

বাহ্‌রে কী করে জানলে তুমি? ললিতা হাসছে।

ডেলিম আফটার শেভ?

হ্যাঁ, আজও তো গালে দিয়েছে, তুমি কি আমার বাড়ি ঢুকে পড়েছিলে?

বুনি খিল খিল করে হাসে, আমি জানতে পারি, আপনি ওসব নিয়েই তো আসবেন এখেনে?

আনবই তো।

ডাভ সাবান, আনবেন?

বাহ্‌ না আনলে কী মাখব গায়ে? হাসতে থাকে ললিতা।

তখন বুনোপাড়া, মহিষবাথান, সল্টলেক, 'মাঝে নদী বহেরে' হবে না। হাসতে থাকে বুনি, ইস বুনোপাড়া, কী লজ্জাই না করে, অথচ মহিষবাথান, বুনোপাড়া না লিখলে চিঠিই আসবে না।

নামটা বদেল যাবে।

নিউ সল্টলেক তো, মেগাসিটির রাজারহাট নিউক্যালকাটা, রাজারহাট নাম তো থাকবে না বউদি, নিউ-উ ক্যা—অ্যাল—কাটা, কত সুন্দর।

বউদি শম্ভু ডাকল, আসুন, বউদি, ওইটাই ঠিক হল।

ললিতা এগোয়। তখন বুনি ডাক দেয় ব্যানার্জিবাবুর ছেলেকে, রনি রনি, ওদিকে যেও না, বাবারা চলে যাচ্ছে। বুনি দৌড়ায়। দৌড়ে গিয়ে রনিকে ধরে, রনি ঘুরে তাকিয়ে বলল, টাইগার, টাগার কাঁহা? গুলি করে দেব। টয়গানে কড়কড় করে শব্দ হয়।

ইস। টাইগার মানে বাঘ, কাঁহা মানে কোথায়? রনি রনি তুমি কি ভাল? ঝপ করে রনিকে কোলেতুলে নেয় বুনি, আবার বলো, আবার গুলি কর, কী সুন্দর বন্দুক।

রনি বলল, কুক্কু, উড় গয়ি? গুলি করে দেব। বলতে বলতে রনি টয়গান বাড়িয়ে ট্রিগার টেপে। গুলির পর গুলি ঝাঁজরা করে দেয় অদৃশ্য কোনও প্রাণীকে।

হি হি হি, ও দাদা, কুক্কু উড় গয়ি। রনিকে কোলে নিয়ে বুনি এগিয়ে এল ভিটের

সামনে, কী সুন্দর বলে রে দিদি, কুক্কু উড় গয়ি, উড়ে গেল আমরা হলে বলতাম কোকিল উড়ে গেল, ওপারে, ভেড়ির ওদিকে নিকোপার্ক এমনিই বলে, ঠিক এইরকম।

ঘর থেকে খনখনে ডাক আসে,বুনি, অ্যাই বুনি।

ও ঠাম্মা।

কারমাইকেল যাবার পথ নেই, ওদিকে বালির মাঠ, এদিকে খাল বুজে গেল, মরেই গেল বাপ আমার। ঘরের অন্ধকার থেকে আবার খনখনে কণ্ঠস্বর ভাসতে ভাসতে, প্রায় মেঘের মত শ্লথ চরণে, উদ্দেশ্যহীন হয়ে উড়ে এল উঠোনে, কুটনো কোটো...। আমার ক'টি পুত মেরেচো, তী কী মনে পড়ে?

বুনি বলল, বাবার কথা বলছে ঠাম্মা, ভি আই পি থেকে হাঁটতে ফিরে বুকে ব্যাথা উঠল, আমার মনে নেই, কত ছোট তখন। ঠাম্মা চুপ কর দেখি, তোমার পুত কেউ মারেনি, নিজে মরেছে।

ললিতা ফিসফিস করে আশ্চর্য! এসব কথার মানে?

তিন

শম্ভু বাড়ি ফিরে গল্প করছিল ব্যানার্জিবাবুর। দিন পাঁচেক বাদে সে আজ ব্যানার্জিবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। খবর পেয়েছে সিংহবাবুরা নেবেন। চার হাজার টাকা আলাদাই দেবেন। সামনের সপ্তাহে অ্যাডভান্স করবেন।-

শম্ভু খুশি। একলাখ চল্লিশ, তাছাড়াও চার হাজার। আগের বিরানব্বই হাজার যা পেয়েছিল ব্যানার্জিবাবুর কাছে তিনকাঠা বিক্রি করে, তা থেকে খরচ হয়েছে কম না। ইট কিনেছে, পাকা ঘর করবে বলে, মাটি ফেলেছে নিচু জায়গায়। এইবার সে দুই বোনের বিয়ে একসঙ্গেই দেবে। বজবজের পাত্র না পছন্দ করলে কী হবে, যাবে উলুবেড়ে, খোঁজ পেয়েছে আর একটা। জুটমিলে কাজ করে। টাকা থাকলে বিয়ে না হয়ে যাবে কোথায়! তাই দুইবোন, বুলু আর বুনি। ছোট বুটুর এখনও তো সময় হয়নি।

শম্ভু বলছিল, বাবা রেখে গিয়েছিল, তাই বাঁচলাম, আর ধর ওই বাইপাস রোড, সেদিন ওরা বাইপাস দেখে ফিরেছে, তাতেই মন স্থির করে ফেলেছে, কী চওড়া রাস্তা বল, খালের উপর দিয়ে উড়ে যখন নামবে না।

শম্ভু নিজেই বলছিল, বুনি শুনছিল, কাছে বসে। অনেকটা দূরে বুড়ি ঠাম্মা আর বুলু বসে, রান্নাঘরে মার কাছে বুটু। শ্যাম বাড়ি ফেরেনি। বাইরে অন্ধকার থকথকে।

শম্ভু বলছিল, এবার ব্যানার্জি বউদি আসবে দেখতে।

রনি আসবে, রনি! কী সুন্দর বন্দুকটা, টয়গান, কী রকম কড়কড় শব্দ হয়।

স্টেনগানের শব্দ। বিড়বিড় করে শম্ভু, ওরা আসবেই তো, নিজেদের জমি ওদের, দেখতে আসবে না, ব্যানার্জিদার মত মানুষ হয় না, চল্লিশ করে বিক্রি হচ্ছে, অথচ দালালি গেলে না একপয়সাও, নির্লোভ মানুষ সৎ লোক, ও শুধু চাষ নিজের লোক এসে বসুক, পরিবেশটা রাখতে হবে তো।

বুনি মাথা দোলায়, ঠিক বলছিস দাদা।

আমরাও পাকাঘর লাগাবো তোদের দুটোকে পার করে, সাত কাঠা বিক্রি হলো, আমাদের বাকিটা রেখে দেব, কালার টিভি আমাদেরও হবে।

হবে?

হবে, ফ্রিজ হবে, পাকাঘর হবে, শম্ভু হাসে,আগে তোদের বিয়ে দিই, ব্যানার্জিদা বলেছে তাঁকে না জানিয়ে যেন কারও সঙ্গে কথা না বলি, তিনি লোক আনবেন সিংহবাবুর মত।

বুনি বলল, সিংহবাবুর বউটা কী সুন্দরী বল?

তা তো হবে।

ব্যানার্জিদার বউও ওই রকম?

দেখিনি, তবে ওইরকমই হবে, ছেলেটা কী সুন্দর। শম্ভু বিড়বিড় করে।

বুনি বলল, পাকাঘরটা আগে কর।

কেন?

দিদির বিয়ে তো...। থেমে যায় বুনি। ওপারের অন্ধকারে কেশে উঠল যেন বুলু। তার কথাটা কানে গেছে ওর। বুনির দিদির স্বভাবটা দিন দিন ওর ঠাম্মার মত হয়ে যাচ্ছে। চুপচাপ, মাঝেমধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন।

বুনি গলা তুলে বলল, দিদির বিয়েটা শ্রাবণে কী অঘ্রানে দে, তারপর পাকাঘর তোল, তারপর তোর বিয়ে দিই দাদা, বউ আনি, আর কবে বিয়ে হবে তোর?

এ বাড়িতে আলো নেই। হেরিকেন জ্বলে। এ বাড়িতে টিভি নেই, বুনিরা টিভি দ্যাখে দিলিশ্বর বিশ্বাসের বাড়ি। তাদের আলো আছে। টিভিও আছে। ওই অবধি আলো এসেছে। এতদুর আনতে হলে পোস্টের দাম দিতে হবে।

শম্ভু বলল, আগে ইলেকট্রিক আনব।

হ্যাঁ, তোর বিয়ের আগেই, পাকাঘর তুলতে কতদিন লাগেরে দাদা?

টাকা থাকলে আর কতদিন। শম্ভু পা ছড়িয়ে বসে, ইট তো কিনে ফেলেছি।

তাহলে পোস্টটা নিয়ে নে। বুনি বলল, পাত্রীপক্ষ তো দেখতে আসবে তোকে।

তখন ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে গলা বাঁকারি উড়ে এল, বুলু ডাকল, ও বুনি বুনি।

বুনি বিরক্ত হল, কী বলছিস?

উঠোনে কেউ এল?

তাই! চট করে উঠে পড়েছে শম্ভু, ছ'ব্যাটারির টর্চ উঠোনের দিকে বাগিয়ে ধরে। আলো ঘুরোয়। গাছগাছালির গায়ে আলো পিছলে পিছলে যায়। গাছগাছালি, আম, পেয়ারা, নারকেল, খেজুর, মাদারি আতা গাছের কাণ্ডকে আচমকা মানুষ মনে হয়। সে বসে পড়ে, কেউ তো নেই।

বুনি বলল, তোর জন্য সুন্দরী মেয়ে আনব দাদা, সুন্দরী বউ।

শম্ভুর ভাল লাগে বুনির কথা শুনতে। বুনি বলছে সিংহবাবুর বউ-এর মত সুন্দরী,

না না তার চেয়েও সুন্দরী। সে তো সল্টলেকে ঘোরে। এক একটা এমন সুন্দরী চোখে পড়ে যায় যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। কী সুন্দর সব। অ্যাঙ্কেল ঘোরের পা লুটানো ফ্রক, মাথার চুল েনে সিল্ক সিল্ক, মুখ দেখলে চোখ ফেরে না আর। সে মেয়ে হয়েই তাকিয়ে থাকে।

বুড়ি ঠাম্মা এবার ঘড়ঘড় করে ওঠে, কেউ যেন আম পাড়ে, ও শম্ভু শম্ভু।

শম্ভু বিরক্ত হয়। অভ্যাসে টর্চটা জ্বালিয়ে নিভিয়ে দেয়, ধমকে ওঠে ঠাম্মাকে, আষাঢ় মাস শেষ হতি গেল, তোমার গাছে আম ভানচে, থামো দিকিনি।

বুড়ি বলে, হবে তো ফের জষ্ঠিমাসে, ফাল্গুন মাসে বোল হবে, চোত মাসে গুটি ধরবে, বোশেখ মাসে বড় হবে....।

আহ্! চুপ করবে, হ্যাঁ বুনি, তোদের বিয়েটা হোক আগে।

হবে, হবে, কত সম্বন্ধ তো দেখছিস! বলল বুনি।

পঞ্চাশ হাজার নগদ চায়, বুলুর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেল।

তাইতো বলছি তোর বউ আগে আনি, বুনি বলল ফিসফিসিয়ে। কিন্তু কত আস্তে আর বলবে, অন্ধকার নির্জনতা তো আর দেওয়াল নয় যে তার কথা তার কাছেই থাকবে। ওধার থেকে গলা খাঁকারি শোনা যায়, বুনি, বুনি, লোক ঘুরছে, জমি বেচা হচ্ছে, লোক তো ঘুরবেই।

খুব বিরক্ত হল শম্ভু, এত বাজে কথা বলিস কেন রে বুলু, টাকা ঘরে থাকে নাকি, টাকা থাকে ব্যাঙ্কে, ইউ বি আই সেন্ট্রালপার্ক, সল্টলেক, হ্যাঁ বুনি তুই কী বলছিলি?

বুনি বলল, তোর বিয়েতে তো বাধা নেই, তোর বিয়ে দেব আমরা ধুমধাম করে, ওই ওপারের মত মেয়ে আনব বউ করে, ফর্সা, সুন্দরী, গান গায় ভাল, দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে...। গুনগুনিয়ে উঠল বুনি।

শম্ভু তার হাতের টর্চ জ্বালতে থাকে, নিভোতে থাকে। অনিচ্ছায় যেন মাথা নাড়ে, তা হয় না, জমি বেচেই নিজের বিয়ে, বুলুর ব্যবস্থা করতেই হবে, লোকে কী বলবে, মা কী বলবে।

বুনি চাপা গলায় বলে, কত সম্বন্ধ তো এল গেল।

তুই এবার ধারে কাছে থাকবিনে।

আমি তো থাকিইনে এখন, তবু তো! বুনি যেন শম্ভুর কানে কানে কথা বলে।

শম্ভু চুপ করে থাকে। বুনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। খুব আস্তে আস্তে বলে, দিদির বিয়ে কী হবে! কবে হবে, কে পছন্দ করবে, দিনদিন পেত্নী হচ্ছে, বরং তোর বিয়েটা দিয়ে দিই, দাদা ওই চার হাজার যে চেয়ে নিলি, কী করবি?

কী করব?

ওটা তোর টাকা, তুই বরং তোর বউ-এর বেনারসির জন্য রেখে দে।

হেসে ফেলেছে শম্ভু, যাহ্!

যাহ্, কী, ওটা তো তোর টাকা, তুই চেয়ে নিলি।

শম্ভু চুপ করে থাকে। দূরের অন্ধকারে কাশির শব্দ শোনা যায়। শম্ভু ডাকে, ও বুনি? কী বলছিস?

শম্ভু বলতে পারে না বুনিকে কিছুই। বুনি বলুক, যা বলছিল বলুক। শম্ভুর বুক ছলছল করে বুনির উপরে কৃতজ্ঞতায়। শিহরণ লাগে সমস্ত শরীরে। না, তা হয় না। তিনটে বোন ঘাড়ে, তিনটের বিয়ে দিতে ওই টাকা শেষ হয়ে যাবে ঠিক। পাকাঘর শেষ হবে কিনা ঠিক নেই। তবু একটার বিয়ে না দিয়ে সে বিয়ে করে কী করে? শম্ভু হাত বাড়িয়ে বুনির মাথা ছোঁয়। ঘাড় নিচু করে আছে তার বোন। শম্ভু বুনির চুলে বিলি কাটে। বুনি বলে, তোর জন্য বিশটা মেয়ে দেখব আমি।

শম্ভু বলল, আচ্ছা বদলে যদি তোরটা আগে হয়ে যায়।

ইস দাদা, না, না।

না কেন?

তা হয় না, খারাপ দেখাবে।

খারাপ কী, তোরও তো বিয়ের বয়স হয়েছে, একটা বোন পার করতেই হবে, ও বুনি, তুই যদি রাজি হস তো বারাসতের তাদের বলি।

অন্ধকারে খ্যানখেনে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কে এল রে, কে এল?

কে আসবে? বুনির গলায় বিরক্তি, ও দিদি, দ্যাখনা তুই।

তুই দ্যাখ না, বুনির গলায় বিরক্তি, ও দিদি, দ্যাখনা তুই।

তুই দ্যাখ না, উঠোনে মানুষ ঘুরছে, ঠাম্মা! বুলুর গলায় ডাক। সেই ডাকে দূর আকাশে মেঘের ডাক মিলেমিশে যায়। দিন পাঁচছয় বৃষ্টিই হয়নি, অথচট মেঘ আছে বেশ। মেঘ বৃষ্টি হয়ে নামতে চাইছে, অথচ নামতে পারছে না। পারছে না তাই ডেকে ডেকে ঘুরছে। গুমোট বাড়ছে। গাছের পাতা থমথমে। আষাঢ়ের অর্ধেক হয়ে গেল। আচমকা বৃষ্টির নাম গনধ নেই, মেঘ ডাকছে, বুনি এই বুনি, বুনি শোন!

বুনি বলল, কেউ নেই, থাম দিকিনি, তোর বড় হিংসে রে দিদি, দাদার সঙ্গে দুটো কথাও বলতে দিবিনে।

বুড়ি ঠাম্মা গুনগুন করে,....আমার ক'টি পুত মেরেচো, তাকি মনে পড়ে? ও বুনি, বুনি, জল এল?

শম্ভু বলল, চুপ কর দিকিনি, দেখছ না ক'দিন বৃষ্টি নেই, হ্যাঁরে বুনি, তোর বিয়েটাই তালে ঠিক করি।

বুনি ফিসফিস করে, আমি জানিনে, তুই বড়দা, যা করবি মেনে নেব, যা দিবি মেনে নেব, হাসিমুখে নেব। বলতে বলতে শিহরিতা মেয়ে দু'হাঁটুর ভিতরে মুখ গোঁজে।

শম্ভু বলল, আমার না, ভয় হয়!

কী ভয়!

তুই যদি শেষে বুলুর মত হয়ে যাস, পঞ্চাশ হাজার তোর পিছনেও গুনে দিতে হয়।

বুনি কাঁপতে থাকে। কোনও কথা বলে না।

বুলুর চেহারা খারাপ ছিল না, কিন্তু তখন তো উপায় ছিল না যে বিয়ে দিই, ফুটোপয়সা ঘরে নেই তো বিয়ে, জমি তখন কেনে কে? বুনোপাড়ার জমি কে নেয়?

বুনি ডাকল, দাদা!

আর দেরি করা ঠিক হবে না, এখন তোকে পছন্দ করছে বুলুকে দেখতে এসে, পরে যেদি এমন হয় তোকে দেখতে এসে বুটুকে পছন্দ করে!

বুনি চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, দাদা!

তখন একখণ্ড জলভরা মেঘ বুনোপাড়ার মাথায় হাঁসফাঁস করছিল। ঘর হারানো গাভীর মত ডেকে যাচ্ছিল একনাগাড়ে। মেঘ মাটি চিনতে পারছিল না, ঘর চিনতে পারছিল না। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে যাচ্ছিল তার।

আচমকা বুলু ডাকল, অ্যাই কী বলছিস রে তোরা?

কিছু না। চেঁচিয়ে ওঠে বুনি।

বুলু বলে, ও টাকায় সবার ভাগ।

দাদা কি একা নেবে?

চার হাজারে সবার ভাগ। বুলু হিসহিস করে ওঠে।

শম্ভু রেগে গেল, যা যা ভাগ করতে হবে না, হপ্তায় হপ্তায় উলুবেড়ে, বজবজ, ফলতা ইছাপুর, বারাসত দৌড়চ্ছি, তোর পিছনে কম যাচ্ছে!

কী যাচ্ছে রে, টাকা দিলে আবার বিয়ে হয় না?

শম্ভু টর্চ মারে বুলুর মুখে। জোরালো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় বুনির বড়বোনের। দু'হাতে মুখ ঢাকে। শম্ভু গজগজ করতে থাকে, তোর পিছনে সব দেব, আমাদের ভবিষ্যৎ নেই।

আমার ভাগটা তো দিবি।

দেব দেব। শম্ভু খুব রেগে ওঠে, কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব, কেন সবার কি বিয়ে হয়! টাকা উড়োব তোর বিয়ে দিয়ে, আর বোন নেই?

বুলু কাঁদল ফিসফিস করে। কাঁদতে কাঁদতে ঠাম্মাকে বলল, কাল সকালে উঠে যেদিকে ইচ্ছে চলে যাব আমি ঠাম্মা।

বাতাস কমে গেছে। কেউ কোনও কথা বলছিল না।

সেদিন মাঝরাতে বুনির পাতলা ঘুম আচমকা ভেঙে গেল, তাকে ডাকছিল বুলু, ও বুনি বুনি।

বুনি পাশ ফিরে শোয়, ঘুমো।

আমি তোর দিদি না?

ওফ্ দিদি, মাঝরাত্তিরে কী আরম্ভ করলি।

বুলু বলল, তোর মন খারাপ হয় না।

কেন রে। বুনি উঠে বসেছে না পেরে।

সব বেচা হয়ে যাচ্ছে।

তাতে কী, এ ভিটেতে আমরা থাকব না।

কেন থাকব না?

আমাদের বিয়ে হবে।

বুলু চুপ করে থাকে, একটু বাদে বিড়বিড় করে, সবার কি বিয়ে হয়?

বুনি অন্ধকারে বালিশ টেনে বুকে চাপে, হয়, এখন না হলে পরে হবে।

কবে?

বুনি বলল, শুয়ে পড় তো।

কবে হবে বললিনে?

পরেরবারে। বুনি বিড়বিড় করে।

সে কবে?

বুনি চুপ করে থাকে। পরেরবার মানে কোন্ বছর, কবে? পরেরবার মানে কি পরের বছর? আবার শীত, আবার চোত, আবার আমের বোল, কোকিল বুনো গন্ধ মম, আবার আমের গুঁটি, বোশেখ মাস! তখন যদি ব্যানার্জিবাবু সিংহবাবু এসে পড়ে। খোকাটার হাতে স্টেনগান কড় কড়। ঝলকে ঝলকে আগুন। কোকিল মারতে গিয়ে আমের বোল মেরে দেবে। কাক মারতে কোকিল।

বুনি বলল, পরের জন্মে, ঘুমো তো দিদি।

বুলি বিড়বিড় করে, তখন আমি ছোটবোন তুই বড়বোন, নাকি আমি বড়ভাই?

দিদি পাগলামি করিসেন, লোকে কী বলবে?

টাকা হয়েচে, এখন যদি না হয়, আর হবে না।

বুনি শুয়ে পড়ল। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বুলু বসে থাকল অনেকটা সময়। তারপর উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরুল দরজার খিল খুলে। দাওয়া পার হয়ে নামল উঠোনে। আকাশ কালো হয়ে আছে। অন্ধকার তার মুখের মত। বুলু সেই অন্ধকারে হাঁটতে লাগল। কোথায় গেল? খালপাড়ে। খালপাড়ে লঞ্চ আছে, নাকি ধোঁয়া ছাড়া মস্ত বাস। বুলু কোথায় যে চলে গেল!

বুলুকে খুঁজতে শ্যাম গেল। শ্যামের সঙ্গে বুলুর ভাব বেশি। শ্যাম ফিরল না।

শ্যামকে খুঁজতে তার মা গেল, ফিরল না।

মাকে খুঁজতে বুনি বেরুল, সেও ফিরল না।

শেষে শম্ভু না বেরিয়ে পারে না। বুলি বুনি শ্যাম বুটু আর বিধবা মাকে খুঁজতে বেরুল শম্ভু। শেষরাতের অন্ধকারে হাঁটতে লাগল সে। ফিরল না।

শেষে শম্ভু না বেরিয়ে পারে না। বুলি বুনি শ্যাম বুটু আর বিধবা মাকে খুঁজতে বেরুল শম্ভু। শেষরাতের অন্ধকারে হাঁটতে লাগল সে। ফিরল না।

শম্ভু ফিরল না দেখে গাছ হাঁটল উঠোনের। করমচাগাছ গেল, ফিরল না। পেয়ারাগাছ গেল, ফিলর না। ঘাক গেল উঠোনের, ফিরল না। মৌমাছি গেল, ভীমরুল গেল, ফড়িং গেল, ফিরল না। ঘাস গেল উঠোনের, ফিরল না। মৌমাছি গেল, ভূমরুল গেল, ফড়িং

গেল, ফিরল না। শীত গেল, বসন্ত গেল বোশেখ জষ্ঠি আষাঢ় গেল, ফিরল না। বাতাসও গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বুড়ি তবুও থেকে যায়, চিৎকার করে, রাক্ষসী রাক্ষসী, সব গেল।

বুড়ি বিড়বিড় করে,....কানের সোনাটি নড়ে।.....তাকি মনে পড়ে?

মাটি ঢেকে গেল কংক্রিটে। একদিন ব্যানার্জিবাবুর বউ জিজ্ঞেস করে, শম্ভু কোথায় গেল?

ব্যানার্জিবাবু বলে, মা ভাই বোন খুঁজতে।

বুনি কোথায়?

বুটুকে খুঁজতে।

বুটু কোথায়?

ওর মাকে খুঁজতে।

ওর মা কোথায়?

শ্যামকে....

শ্যাম?

বুলুকে...।

বুলু?

ব্যানার্জিবাবু বলতে থাকেন, এইরকমই হয়, নদী মরে গেলে সভ্যতা যায় তা তো তুমি জানোমন্দিরা, এখেনে কত নদী ছিল...। ওদের তো আগেই চলে যাওয়া দরকার ছিল। দেরিতে গেছে...। শোনো মন্দিরা, শহর এইভাবে গড়ে ওঠে এখন, ওরা থাকবে কী করে, আমরা কি থাকতে দিই, এইভাবেই তো আমরা....। ব্যানার্জিবাবু বলতে থাকেন।

জানতাম।

আশ্চর্য। সিংহবাবুর বউ বলেন, কী করে জানতেন? এটাই তো চিন্তা ছিল।

জানেন ব্যানার্জিবাবু। এই নিয়ে কত গবেষণা, কত কথাবার্তা। জানেন বলেই তাঁর সুবিধে হয়েছিল অনেক। কিনতে পেরেছিলেন। লোকে বলে, তাঁর দূরদৃষ্টির কথা। ব্যানার্জিবাবু বললেন, কিন্তু বুড়িটা যে কেন গলে না? তবে আর বাঁচবেই বা ক'দিন, থাক।

শম্ভু নেই, তার ঠাম্মা নেই, বুলু বুনু বুটু কেউ নেই। আকাশের সেই মেঘখণ্ডটিই আছে শুধু। অন্ধকারে ডেকে ডেকে বেড়ায়। কী ভাবে জল নামিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে হয় তা ভুলে গেছে সে। এক একদিন সেই মেঘের ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যায় গবেষক, পণ্ডিত ব্যানার্জিবাবুর। সেই রাতে আর ঘুমই আসে না।

হবা

আবুল বাশার

সুন্দরতম মিলন মুহূর্তেও অরুন্ধতী স্বামীকে অদ্ভুতভাবে অপমান করতে পারে। বুকের দিকে হাত উঠে এল অরুন্ধতী ঈষৎ বিরক্তিতে সেই হাত সরিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম সুনেত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। বুক থেকে হাত সরিয়ে দেয় কেন, কেবল মুখে 'লাগছে' বলে একটা কাতরতা শোনায়, পরে একদিন সুনেত্র বোঝে, অরুন্ধতী যে কাতর হচ্ছে তা ঠিক নয়, সেটা ওর লাগছে বলার স্বভাব মাত্র। আসলে সে স্বামীর স্পর্শকে পছন্দ করছে না, পাছে বুক দ্রুত যৌবন অপচয়িত হয়ে ঢলে পড়ে। একদিন জোর করে হাত ওঠাতে গেলে অরুন্ধতী কটু গলায় বলে—চাষার মত কেন, বলেছি না ওইভাবে হাত দেবে না। ওইজন্য চাষার বউদের বুকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। দু'দিনেই নেতিয়ে আমসি হয়। বলেছি না এসব কথা?

সুনেত্র থমকায়, বোকার মতন কষ্টে হাকে, হাত টেনে নেয়। বরং ভেবে পায় না কবে অরুন্ধতী তাকে বলেছে। তার আচরণ যে চাষার মতন, কেননা সে বউয়ের বুকের সৌন্দর্যহানি ঘটাচ্ছে, এটুকু ভেবেই গ্লানিতে মনে ভরে যায়, সে প্রচণ্ড আহত হয়।

ঘরের নীল আলো থেকে সে বাইরের অন্ধকারে চলে আসে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে বুঝে পায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায়। বারান্দার চেয়ারটা কাঠির আলোয় সামান্য খোঁজার চেষ্টা করে। অনেকখানি দূরে অস্পষ্ট দেখতে পায়। সেদিকে এগোয়। হাতড়ে নিয়ে সশব্দে টেনে বসে। বসার পরই মনে হয়, একটা বাজে অতৃপ্তি শরীরে সর্বত্র দৌড়ুচ্ছে আর গা যেন ডুমো ডুমো হয়ে যাচ্ছে ঘায়ের মতন। সুনেত্রার অদ্ভুত কিছু বিচিত্র অনুভব মনে সহসা পয়দা হয়। যেমন এখন মনে হচ্ছে গা ডুমো ডুমো ঘা মতন হয়ে যাচ্ছে। অনুভূতির এই সূচি-তীব্রতা তার শিল্পী স্বভাবের দোষ, সে অন্তত তাই মনে করে। মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া যে এমনই হবে, শরীরে ফুটে উঠবে, অন্ধকারে বোঝা না গেলেও, সুনেত্রর আলো জ্বেলে ব্যাপারটা যাচাই করতেও ইচ্ছে হয়। অথচ সে চেষ্টা সে করে না। মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া যে এমনই হবে, শরীরে ফুটে উঠবে, অন্ধকারে বোঝা না গেলেও,

সুনেত্রার আলো জ্বেলে ব্যাপারটা যাচাই করতে ইচ্ছে হয়। অথচ সে চেষ্টা সে করে না। চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। রাত্রি বেড়ে যায়। সিগারেট টানতে থাকে। রাত্রি প্রবীণ হয়। সিগারেট ধরায়। টানতে থাকে। বারান্দায় সারারাত একটি আলোর ফোঁটা সহসা ক'দণ্ড সুনেত্রর আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল। এখন বাথরুমে ভিজতে ভিজতে সেই ইচ্ছা ধুয়ে যেতে তাকে। ভিতে ভিজতে সুনেত্র কেঁদে ফেলে।

স্নান শেষে তোয়ালেয় চুল মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুনেত্র দেখে সকালের নরম আলো ফুটে গেছে। কোণের ঘরে যোগ-ব্যায়ামের নারী-শীৎকার শোনা যায়। অরুন্ধতীর যোগ-শ্রমের শব্দকে শীৎকার মনে হওয়ায় নিজেকে যথার্থ বিকৃত মনে করে সুনেত্র। ফের তার স্নান করতে ইচ্ছা হয়। খুবই অশ্লীল এই মন, সিদ্ধান্ত করে সুনেত্র। ঘর্মাক্ত অরুন্ধতী ঘাড়ে তোয়ালে ফেলে বেরিয়ে আসে। মুখ মোছে, তোয়ালে অরুন্ধতী কি চোখ আড়াল করে বাথরুমে চলে গেল? অরুন্ধতীর চোখে এরপর চেয়ে দেখা ঠিক নয়। সুনেত্রর এক ধরনের ব্যাকুল লজ্জা মনে আচ্ছন্ন হয়।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে স্বামী-স্ত্রী সামনাসামনি কেউ কাউকে দেখে না। ঘাড় নিচু করে খায়। অল্প পরে মুখ নাড়া থামিয়ে চোখ তোলে অরুন্ধতী। স্বামীকে স্পষ্ট চেয়ে সামান্য স্নেহ দেখে। ক্ষীণ হাসে। এসব কিছুই দেখে না সুনেত্র। একটা অভিজাত নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ত্রী। সেই শব্দে চমকে ওঠে সুনেত্র। কেমন ভয় পায়। সেই দীর্ঘশ্বাসে একটা বিষণ্নতাও ছিল, সুনেত্র অনুভব করে না। ঠিক এমন সময় অরুন্ধতীর দিদি অনুসূয়া কাঁধে স্বাস্থ্যবতী ভ্যানিটি ঝুলন্ত, কপালের পাশে উড়ন্ত গুচ্ছ চুল, ঠোঁটে রং, স্লিভলেস স্যান্ডো ব্লাউজ, ঘামে ভিতরে পাতলা কঞ্চুলীভিজে, একটা ফিতের মতন, ঠোঁটের কানাতে ঘামের ভেজা মোম-তেল, এইসব সহ সজমকালো পাতলা ঢাকাই জামদানি পরা, পায়ে চটপটে স্লিপার এবং বুকে আলুথুলু বদমায়েশি করা দামাল শিশু পিছলে পড়ছে, তাকে সামলে নামানের পরই শ্বাস ফেলে 'বাবাঃ'! বলে নিজেকে জানান দেয়। এবং বলে ট্রেনে কী বিষম ভিড় হয়েছিল, পথে কোনও রিকশ পাওয়া যাচ্ছিল না। ইত্যাদি। তাছাড়া তারপরই 'তোরা কেমন আছিস' কুশল। পরপরই ছেলে কাঁদে, কোলে উঠতে চায়। অন্যমনস্ক কোলে তোলে অনুসূয়া। উঠেই বাচ্চা বক আঁচড়ায়, সেই অসভ্যতার প্রত্যুত্তরে মৃদু বখিল ধমকায় এবং বাচ্চাকে চিমটে দেয়, কোল থেকে একপ্রকার ফেলে দেয় নিচে। ডাইনিং টেবিলের একটি চেয়ারে বসে পড়ে মা। বাচ্চা ও মায়ে খুনসুটি ওঅতি দুর্বল দুপক্ষের মারামারি হয়। বাচ্চাকে কোনও মা চিমটি দেয় কখনও দেখেনি সুনেত্র। এই ঘটনা কেন যেন তার অশ্লীল মনে হয়।

অনুসূয়া শুধায়—তোর দুধ আছে অরু?

অরুন্ধতী বোনপোকে এক হাতে বাহু আঁকড়ে নিজের দিকে টেনে রাগে ফুলতে থাকা মুখ সস্নেহে নিরীক্ষণ করে বলে—আছে। দাঁড়াও খেয়েনি, তারপর দিচ্ছি।

অনুসূয়া বলে—অসভ্য ছেলে সেকথা শুনবে না, বুকের দুধ চাইছে।

সুনেত্র বল—তাই দিন না ওকে।

অনুসূয়া সহসা আকাশ থেকে পাতালে পড়ে যায়। বলে, কী বলছেন আপনি? এ কি রাস্তার ভিখিরি যে বুকের দুধ খাবে? আপনি মাঝে মাঝে খুব গ্রাম্য কথাবার্তা বলেন। দীপিকা ওর বাচ্চাকে নিয়ে স্টেশনে আসতে চায় না, ফুটপাতে হাঁটে না, বস্তির ওদিক দিয়ে স্কুল অবদি যায় না। কারণ প্রকাশ্যে মেয়েগুলো বুক আলগা করে বাচ্চাকে বুক চোষায়, বিশ্রী, তা-ও তো বাচ্চার মনে 'এফেক্ট' করে, করে কিনা বলুন?

তারপর নিজেই উত্তর দেয় অনসূয়া, করে। করেই। সেই জন্যই বলছি, দীপিকা ভালই করে। আজই আসতে অস্তে যা দেখলাম, উফ্! ভাবা যায় না।

বাচ্চা মনোযোগ দিয়ে সহসা মায়ের কথা শুনতে শুরু করেছিল, আবার কাঁদতে শুরু করল। বোধহয় অতি ক্ষীণ কৌতুকে সুনেত্র শুধাল—কী দেখলেন দিদি?

অতি ক্ষীণ কৌতুকও কানে গিয়ে বিঁধল অনসূয়ার। বলল—যা দেখলাম, তা কি আপনাকে বোঝাতে পারব। শিশু হলে কী হয়, মুখ না চঞ্চু বুঝে পাই না। নারীর এই দেহ তো ভাগাড় নয় সুনেত্র।

—ভাগাড়? চমকে ওঠে সুনেত্র। চা চলকে পড়ে।

—এমন করে চোষে আর গুঁতোয় যে বাচ্চা যে মানুষের সেকথা গায়ের জোরে বলতে হয়। আমি সহ্য করতে পারি না। মাথা ঘোরে। অথচ রাস্তার মায়েরা কী নির্বিকার। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখবে নারীর মতন অসহায় কে আছে। দিয়ে যাও। কেবল দিয় যাও। হাড় মাস নিংড়ে দাও। কী জ্বালা সুনেত্র আপনি বুঝবেন না। স্লিম ফিগার দাও, ফের 'ফরেন-কাউ'গুলোর মতন দুধ দাও। সব তো আমরা পারব না সুনেত্র। দেহ তো একখানাই।

বলতে বলতে অনসূয়ার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ছেলে কথা শুনতে শুনতে সম্পূর্ণ চুপ করে গেছে। অরুন্ধতী উয়ে গিয়ে গেলাস ভর্তি দুধ নিয়ে আসে। শিশু নিঃশব্দে দুধ খায়। তারপর দুধ শেষ করে আঙুল ঢুকিয়ে চুষতে থাকে। অরুন্ধতী বলে—আরও খাবে মনে হচ্ছে।

অনুসূয়া সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়—না। ও আর খাবে না। ওই ওর স্বভাব। কী সুখ, ওই জানে। একেবারে গণ্ড! হাত নামাও রাজা! হাত নামাও।

শিশু ভয়ে হাত নামিয়ে টেবিলে আঙুল ঘষে কী যেন হিজিবিজি আঁক দেয়। অরুন্ধতী সেকি চেয়ে দেখে শুধায়—কী লিখলে রাজা?

রাজা ঠোঁট ফুলিয়ে কোলে মুখ ঢাকে অরুন্ধতীর, কী বলে বোঝা যায় না।

সুনেত্র বলে—আমার ছোট ভাই অয়ন ছিল ভয়ানক দুষ্টু। ও অনেক বড় হয়েও মায়ের দুধ খেয়েছে।

অরুন্ধতী হঠাৎ-ই রেগে গেল। বলল—সেটা কোনও কৃতিত্বের কেথা নয়। মাঝে মাঝেই কেথাটা এমন আহ্লাদ করে বলো যে তোমার মোটিভেশন বুঝতে পারি, তুমি

খুব পুরনো মানুষ, তোমাকে ঠাকুদ্দা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমার সব আহ্লাদই আমি মেটাতে প্রস্তুত নই।

সুনেত্রের মাথায় সহসা আজ আগুন আগুন ধরে যায়। প্রথমে সে স্থির করতে পারে না, কী জবাব দেবে। ফস করে দিয়াশলায়-কাঠি জ্বেলে ফেলে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। হাতের কাছে সিগারেট পায় না। উঠে পড়ে। আবার বসে পড়ে বলে—পুরনো কিন্তু কত পুরনো তুমি জানো না অরুদেবী। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পেছনে তুমি আমাকে ঠেলে দিয়েছ, আমি তোমাদের সভ্যতা চিনতে পারি না। হয়তো তোমরাই ঠিক। অতীতের মায়ায় মজে থাকা ঠিক নয়। তবু এটুকুই কেবল আমার সামনের নাতনিটিকে বলব যে তার স্লিম-ফিগারের দিকে আমার কোনও আর্টিস্টিক অ্যাফেকশন নেই। না। একদম না। কোনও দুধে আর্দ্র করুণ নারীই আমার সন্তানের জননী হবে, সেই স্বপ্ন আদি, সেই একটা স্মৃতি দিয়েই আমি আমার মাকে দেখতে পাই। আর এদিকে তলোয়ারের মতন তীক্ষ্ণ দেহ আমাকে কাটে। আমার সন্তানকেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে। আমি আমার সন্তান ও আমার মাঝখানে কোনও ধারালো তরবারি শুইয়ে রাখতে চাই না। একজন আধুনিকার ও যৌন-সংস্কার কিন্তু খুব কুৎসিত হয়। সন্তানকে একলা করে। স্বামীকে পর করে। তারপর সেই স্ত্রী নিজেও একা হয়, আত্মরতির পূজা করে। ছিঃ!

অনুসূয়া বলল—আপনি কি আমাদের সঙ্গে কবিতায় ঠাট্টা করছেন?

—না। আমি খুব বিভোর আছি। উত্তর কেরে সুনেত্র। নিজেকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

—তাই তো থাকবে, তুমি যে শিল্পী! খোঁচা দেয় অরুন্ধতী।

—হ্যাঁ। সন্দেহ কর নাকি? গলা ভারী করে সুনেত্র।

—না। তা কেন করব? তবে তোমার ছবি আর মূর্তিগলোই বলে দেয় মডার্ন সিভিলাইজেশনের প্রবমে বা ক্রাইসিস ধরবার ক্ষমতা তোমার নেই। তোমার বেশির ভাগ ছবিই তো ন্যুড। বর্বর।

—হ্যাঁ। বর্বর বৈকি। কিন্তু হিংস্র নয়। স্বার্থপর নয়। ইনোসেন্টলি এইনশিয়েন্ট, বার্‌বারিক্। ঠিক। বাট ইট্‌স আ প্রিমিটিভ ড্রিম। আদি স্বপ্ন। একটা স্ট্রিম। বুঝবে না, বুঝবে না। কিছুতেই বুঝবে না। কী সেই স্রোত আমার মনের মধ্যে বইছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম, জেনারেশন আফটার জেনারেশন আমি সেই সহজ আদিমতাকে স্বপ্নের মতন বহন করছি। মস্তিষ্কের স্মৃতি-কোষে মানুষ শ, বিবর্তনেও সেই স্বপ্ন লুকিয়ে রেখেছে। কিছুতেই আমি তা ভুলতে পারি না। আমি ধরে রাখব। কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেব না।

বলতে বলতে কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুনেত্র। তারপরই শীতল মূর্তির মতন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। খুব নরম গলায় বলে আমার বিশ্বাসের পৃথিবী নিজেই গড়েছি এমন

নয়। আদিম একটা স্মৃতি দিয়ে কেবল নিজেকে নিজে ঘিরে রেখেছি এমনও নয়। সেটা বাস্তব, তাই আছে। সেখানে নেই কোনও অরুন্ধতী। হ্যাঁ। নেই। সেখানে আছে...

থাক্ আর শোনাতে হবে না। দিদি খুব বোরড 'ফিল্' করছে। তুমি তো একটা পাগল বল দিদি, এনিয়ে চলা যায়। মুখে শুধুই স্বপ্ন, এদিকে ও কেমন 'রাফ্' যে চিন্তাও করতে পারবি না, বুঝবেও না কিছু।

আবার রাত্রের ঘটনাকে ইঙ্গিত করল অরুন্ধদী। সেকথা মাথায় আসা মাত্র সুনেত্র টেবিল ছেড়ে ঘরে ঢুকে গেল। তার ভেতর তোলপাড় হতে লাগল। তার মাকে মনে পড়তে লাগল। অয়নকে মনে পড়ছিল।...

অপরপক্ষে দুই বোন পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে যোগ-ব্যায়ামের পদ্ধতি আলোচনা করল। রান্নার নানান মুসাবিদা পাঠ করল। সেলাই ফোঁড়াইয়ের চর্চা করল। চুল বাঁধার গল্প করল। হিমানি মাথার গল্প করল। শাড়ি সংক্রান্ত রং জমিন পাড় সুতো ইত্যাদির মিলিমশি তর্ক করল। শাড়ি দেখাল। শাড়ি দেখল। প্রশংসা করল। গলগল করে ওরা গলে যেতে লাগল। পাছা ও জঙ্ঘার বা উরুতের বিশদ আলোচনা করল। অভিনেত্রী রেখাল যোগ-ব্যায়ামের মুদ্রাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওরা। টিভিতে সাবানের ও পানীয়ের অর্ধনগ্ন জলকেলি লক্ষ করল। ওদের ভারি আনন্দ হতে লাগল। দেহে এল ভয়ানক আরাম। ওরা মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে খাটে শুয়ে গেল। চোখ মুদে এল। ওরা বিউটি স্লিপ দিল। ওরা জেগে ডঠল। দেখতে দেকতে ওরা স্বপেনর মত হয়ে গেল। ওরা আর বাস্তব রইল না। শ্লথ গলায় ওরা সিনেমার মতন কথা বলতে লাগল। হ্যাঁরে। ও কি খুব রেখা? ও কি খুব ন্যাতানো? না। ও কি বিকৃত? না। তবে কী ও? ও খুব ছেলেমানুষ। বোকা। ভ্যাট্। হ্যাঁ দিদি। আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি। তাহলে অনেককাল ধরে রাখতে পারবি। কী? এই যে সব কেমন টসকে দু দিনে পানেসে হয়ে যায় না? স্বামীর অত্যাচার হয়। সেইকথা বলছি। একটু না-ছুঁই না-ছুঁই থাকা ভাল। সেটা যদি সংস্কার মতন হয়, তা-ও ভাল। তাতে ফল ফাল হয়। কী রকম হয়? এই ধর অন্য পুরুষরাও গায়ে লাগতে চায়, স্বামী তাতে হিংসে করতে শেখে, সেটাই লাভ, তখন এঁটেল মাটির মতন লেগে থাকে, পালায় না। সেটাই তো আরাম রে! আসলে আমাদের সঙ্কট কেউ বুঝবে না। একেক সময় মনে হয় দু'পাশে দুই শত্তুর নিয়ে শুয়ে আছি। বাপ খাব কাব করে। ছেলেও করে। দু'পক্ষই নিংড়ে নেবে। তারপর ফেলে দেবে। মাঝে একলা মেয়েমানুষ আমি কি করব? তরবারি না হয়ে উপায় আছে। ভাবলে খুব কান্না পায় আমার। দুনিয়াটা ঠিক যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। কোথায়? তা তো জানি না অরুন্ধতী। অরু, তুই কখনও কাঁদিস না?

অরু ওরফে অরুন্ধতী দেখল দিদির চোখ চিকচিক করছে। কেন যেন দিদির এই কান্না অরুন্ধতীর ভাল লাগে না। কিঞ্চিৎ ঘেন্নাই লাগে। কেন লাগে সে বুঝতে পারে না। ওর সংকট আরও অদ্ভুত ঠেকে তার নিজের কাছে। অরু বলে— টেস্টটিউব বেবি

হয়েছে কলকাতায়। কাগজে পড়েছি। ব্যাপারটা আরও ডেভেলপড হলে ভাল হত। অন্য মেয়ের পেট ভাড়া নিয়ে বাচ্চা করানোতেও কষ্ট দিদি। যন্ত্রে প্রসব করলেও মন বোধ হয় মানবে না। অথচ সেইসবই চালু হয়ে যাচ্ছে। খারাপই লাগে। আবার হলে ভালই হত। এমন মনে হয়। কী করি? যন্ত্রকে মানুষ ধীরে ধীরে আর সামলাতে পারবে না মনে হচ্ছে। এসবও ভাবনা করি। কাঁদি-ও। কিন্তুভয়ও করে। আমি বোধ হয় মোটা হয়ে যাব। বাচ্চা হলেই আমাদের বংশে মোটা হয় সব। কেবল তুইই কিছুটা সামলে আছিস।

—হ্যাঁ। রোজই একটু একটু কাঁদবি। শরীর পাতলা থাকবে। যন্ত্রের ভয়েও কাঁদবি, মানুষের ভয়েও কাঁদবি। আমি তাই করি। বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনসুয়া। দুই বোনের চোখ ঘুমে চুলের মতন জড়ানো।

গড়ানো মধ্যাহ্নে এ-ঘরে ঢুকে এসে সুনেত্র দুই বোনের ঘুম জড়ানো মদির চোখ দেখে বুকের গভীরে আশ্চর্য এক শীতল ঘৃণা অনুভব করে। বলে আমি যাচ্ছি অরু।

সুনেত্র কোথায় যেন চলে যাচ্ছে পোশাকে-আশাকে তৈরি, ওরা দুই বোন দেখতে পায়।

দুই বোনের একজন কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই ঘরের দরোজার কাছ থেকে সুনেত্র যেন উড়ে যায়। সুনেত্রর স্বভাব খুব নরম! সে এতই আহত হয়েছে যে সমগ্র জীবনকে তার মিথ্যা মনে হয়। ভুল মনে হয়। দাম্পত্যকে তার আর মানবীয় মনে হয় না। তার মনের মধ্যে রোগ তৈরি হয়। সে পালাতে থাকে।

রাত্রে অরুন্ধতী সুনেত্রর আঁকার ঘরে এসে টেবিলে একটা সাদা আঁকিবুকি লক্ষ করে ঘাড় নামিয়ে। তলায় সুনেত্রর নিজস্ব ভাষায় কতকগুলি লেখা পঙ্ক্তি চোখে পড়ে। সুনেত্র লিখেছে:

আদিম পৃথিবীর আকাশ ছিল আরও নীল। অত্যন্ত গাঢ় আর প্রসন্ন নীল। মটরশুঁটির ফুলের চেয়েও নীল। জীবনানন্দের কবিতার মতন নীল। সুনীল গঙ্গোর কবিতার মতন গাঙ্গেয় নীল। সেই আকাশে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ উঠত। সেই চাঁদের নিচে বনজোছনায় রুপালি শিশিরে ঝলমল করত আর সেখানে শুয়ে থাকত মধ্যরাত্রে এক রূপসী কাজল-পরা হরিণী, গায়ে তার পয়সা ফুলের মতন চিতি গোল দাগ বড়ই মনোহর, সে জাব কাটত স্মৃতির স্মরণে আর পুরানো কথা মনে করত। তার ছিল এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি, সেই তীব্র মিলনে নাভিতে তার সুগন্ধির জন্ম হয়। এ-ইতিহাস কেউ জানে না। বর্বর বুনো বনমানুষের সঙ্গম-আর্তনাদে তোলপাড় বনানীর এই হরিণী একদা ভয়ে মূর্ছা গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে সেকালের মানুষ দয়ায় আর্দ্র হয়, সে তখন যৌনবিদ্যা শেখে। বনমানুষ থেকে মানুষ আলাদা হয়ে যায়। তখন নারীর বুকে দুধে আর্দ্র করুণ স্তন প্রস্ফুটিত হয়, তা ছিল সুগোল অমৃত ফলের মতন রাঙা, লবঙ্গ কুঁড়ির গন্ধ ছিল মিশে, তা খেয়ে পৃথিবীর মানুষের প্রথম প্রসিদ্ধ মস্তিষ্ক তৈরি

হয়। তা ছিল শীতল ও অহিংস। আমি অরুন্ধতীদের ঘৃণা করি। কারণ তারা আমার কোনও কাজে লগে না।

পড়া শেষ করে অরুন্ধতী কেমন তীব্র মকে গলায় কান্না উথলে ফেলে, ফেটে যায়। দিদি এসে ওকে সান্ত্বনা দিলে শোনে না কিছুতে। সে পাগলের মত কাঁদতে থাকে।

তারপর একদিন পথ চলতে চলতে কোনও এক ধূলিগ্রামে এক ইভের সঙ্গে দেখা হয় সুনেত্রর। ইভের অন্য নাম হুবা। গল্পে তার নাম হুবা বিবি। সে একটা গান গাইতে গাইতে মাঠ ভাঙছে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার ঢের আগের প্রখর বিকালে। আকাশ নিষ্করুণ। প্রকৃতি তাপে উতলা। চরাচর ধুঁকছে। খেতমজুর বেকার। ওদের দাড়ি ধুলোর ঝাপটায় সাদা হয়ে গেছে। তেমনি এক খেতমজুরের কন্যার নাম হুবা বিবি। কোনও প্রকারে একটা সাদা পাতলা কাপড় ওর দেহকে বেষ্টনের চেষ্টা করেছে মাত্র। তা ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। কিন্তু প্রয়োজনও ঢের। ইজ্জত যাকে বলে, তা-ও বড় উদাসীন করেছে ওই কাপড়ের বাহানা। সুনেত্র বিহ্বল হয়ে পড়ে। সুনেত্রর বিশ্বাস ছিল না, পৃথিবীতে এমন মানুষ এখনও পাওয়া যায়। হুবা আপন মনে গাইছে:

ওরে শিমুল ফুল
তুমি থাক গাছের ডগালে
আদর কেহ্ করে না
তোমার গন্ধ নাই বলে। ও শিমুল ফুল...

সুনেত্র পেছন থেকে সহসা প্রশ্ন করে— কে গো সেই শিমুল ফুল? কোথা থাকে?

হুবা আচমকা প্রশ্নে মৃদু চমকে পেছন ফেরে। এতদিনে সুনেত্রর মুখে দাড়ি গোঁফ ছেয়েছে বেপরোয়া। জামাতে ধুলাবালি। একেবারে আলাভোলা পাগলের মত। তা দেখে অকারণ হেসে ফেলে হুবা। বুঝতে পারে লোকটা পথ-ভোলা মুসাফির। বা সত্যিই পাগল। বা যে ইচ্ছে সে, তবে ভাল মানুষ। হুবা বলে— সে কথা ডগালে বুলছিই তো ভাইজান।

—বটে?

—হ্যাঁ। গায়ে ছন্দ ফুটিয়ে হ্যাঁ বলে হুবা।

—নাম কী শুনতে পাই?

—কার নাম? আমার না তার?

—দু'টিই বল।

—আমি হনু হুবা জুলানী, জোলার বিটিগো, বাপের তাঁত উঠে যেয়েছে। আর যা ভাবছ তা ল। উনি হলেন সোয়ামি।

—বেশ তো। নাম বল?

—নাম? তুমি নমস্কার কর না?

—করি।

—মোছলমান কী করে?

—সালাম।

—জি।

—অ্যাঁ?

—ওইডেই নাম। শিমুল ফুল। ছোটজাত আমরা। ছোটনোক।

—তাতে কী?

—সেইডেই তো গানের কথা। এ-জাতের আদর নাই বুজলে?

—কে বললে?

—বুললে গানী সমসের আর কানাই পাগলা।

—তারা কারা?

—গায়েন।

—ও। আসছ কোথা থেকে?

—ইস্টিশন। ফের হাজারি তালতলার বাগান থিকে 'আছর' শুনে।

—ইস্টিশন কেন?

—খাবার লিয়ে য়েয়েছিনু। শিমুল ফুল পানি-খাবার খেয়ে মাল বইবে। আসা পথে বাগানে গান। শুনে লিই খানিক।

—তোমার বর কী করে?

—ওই তো বলুন মাল বহে। মুঠে। ছোটনোক।

—শিমুল ফুল?

—হয়।

শুনতে শুনতে মন মজে যায় সুনেত্রর। বুঝতে পারে, কিছুক্ষণ আগেই হবা বাগানে শব্দ -গান শুনছিল। প্রশ্ন করে—বাগানে শব্দ-গান শুনছিলে?

উত্তর করে হবা, জি। ধড়-বিচারি আর জাত-বিচারি গান। পাল্লা হয় দুজনায়। আলম দরবারি হলেন ওনাদের উস্তাদ।

সুনেত্র অনুমান করতে পারে, পাগলা কানাই আর গানী সমসের পাল্লা দিয়ে গান করছে, আমল দরবারি দুজনেরই গুরু। দরবারি টাইটেল সুনেত্র নতুন শুনছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় সুনেত্র। প্রকৃতির মত সচ্ছল এই দীর্ঘাঙ্গি রমণী তার বিষয়। বিষয়ই শুধু নয়, রমণীর স্বাস্থ্য-প্রাচুর্য যেভাবে রেখায়িত ভরাট ও পূর্ণ সেই বলিষ্ঠতা যে কখনও দৃষ্টিগোচর হবে সে বাবতে পারেনি। হবা নামটিকে মেয়েটি সার্থক করেছে। তার স্মৃতির সঙ্গে হুবহু সব মিলে যাচ্ছে। হবা ভিনদেশি লোকটিকে শুনিয়ে বলল—এ বচ্ছর আকাল লাগবে মুনে লিচেছ, আসমান হামেশা শওন(শকুন) উড়ছে। বিষ্টি নাই। ছানাপোয়ালি বাঁচবে না। সোমামি বাঁচবে না। গেরস্তর বলদ বাঁচবে না। ছাগলগুনা

ভিটের মাটি চেটে যে বেঁচে থাকবে, সেই ভিটাও চলে গেল, মুরগিগুনা খুদ পায় না, মাঠের ধান হয়্যাছে পাতান বুকের ভিতরি খাঁ খাঁ করে।

শুনতে শুনতে চমকে ওঠে সুনেত্র। মেয়েটির ভিটা চলে গেল কীভাবে? শুধায় সে। কীভাবে গেল তোমার ভিটা?

সুনেত্রকে চলে যাওয়া ভিটেয় এনে তোলে হবা। কঞ্চির বেড়া দেওয়া ঘর, মাটি লেপন করা। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে নিম। নিমের গা বেড়ে দড়ি। ছাগল ধুঁকছে। কষে ফেনা। সেদিকে চেয়ে দেখে সুনেত্র শুধোয় তোমার ভিটে চলে গেল কেন?

হবা বলে, ভিটে চষা পুঁড়ে আর এঁড়ে চষা কাওট, কেথাডা মুনে রাখবেন ভাইজান। এমুন সুবচন যে ধন্দ গো। শুনেছেন?

—না। অবাক হয়ে হবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সুনেত্র। হবা বলে, ধীরে ধীরে সব কথা ভাঙব তুমাকে। আগে থির হও। এখ্যানে বসেন তুমি। এই ছিমায় (ছায়ায়) বসেন।

ছায়া পড়েছিল ঘরের চারিতে। মাটি থেকে এক বিঘত উঁচু সেই দাওয়া। একটা চট পেতে দেয় হবা। সুনেত্র ঘাড়ের বড় ব্যাগ নামিয়ে রেখে বসে পড়ে। ঘর থেকে ঘুমন্ত বাচ্চাকে ডেকে তুলে হবা দূরের অন্য একটি নিমের জড়ে গিয়ে বসে। বুক খুলে দেয়। তারপর কেমন বিষণ্ণ-উদাস হয়ে পড়ে। বাচ্চা দুধ খেতে শুরু করে। হবা সুনেত্রকে লজ্জা করে না। পাতলা সাদা মেঝের শাড়িতে হবার সব রেখা অতি স্পষ্ট। বুকখোলা। কাপড়ের আড়াল দেওয়ার মতন গা-ঢাকা কোপড় তার নেই। তা নিয়ে সে বিড়ম্বিত নয়। সে নির্বিকার। ছেলেকে সে ঘরে ফিরেই যেমন করে সাত তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিয়ে দুধ দিতে লাগল সে তাতেই বোঝা যায়, ছেলেকে রেখে গিয়ে তার মন ভাল ছিল না। হবা বলল, গায়ে খানিক হাওয়া লাগিয়ে এসে বুকে দুধ নামে। ছেলে তাগড়া হবে, জোয়ান হবে, বাপের সাথে মাল টানবে, গাধে দুধ না লাগলে চলবে, কহেন ভাইজান। আমার ভিটা নাই, মাটি নাই। এইটুকুন ভরসা। ফের এই বাছাও মাকে দেখে না আর। মা তবো তাকে দুধ দেয়। তাগড়া করে। মুটের বাচ্চা হাতির বাচ্চা, সেই গতর বানায় মা। সেই তাগড়া সুনা মা-কে লাঠি মারে, চড় মারে। লাথি দেয়। ভাত দেয় না। বোঝেন তুমি ভাই।

সুনেত্র বলল, তোমার তো শিমুল ফুল আছে। সে তোমার ভরসা নয়?

—নাহ্! সে-ও লয়। অভাবের টানে জেবন বৃথা যায় খোদা মালুম। পুরুষ যখন পারে না,তখন পালায়। লয় তো তালাক দেয়। ইখানে কচুপাত পানি কখন চলকাবে নবীও জানে না ভাইজান। তবো এই ভিটার জন্যি মুন বহলায়, ছাওয়ালকে দুধ দি। ক্যানে দিই বুঝতে পারি না। আপনি তো বুঝমান, কহেন, ক্যানে দিই।...ওহ্।

বাচ্চা মা-কে কামড়েছে। কাতরোক্তির বদলে যেন খেদোক্তি করে হবা। ছেলে মাকে গুঁতোয়। নিঁড়ে নেয়। নিঃস্ব করে দিতে চায়। মা তবু জানে না, কেন সে আশ্চর্য

সুখে ইভের মতন এখনও পরিপূর্ণ। শেষ হয়ে গিয়েও সে শেষ হচ্ছে না। মুছে যেতে গিয়েও যাচ্ছে না। ভিটে চলে যাওয়ার পরও সেই ভিটোয় পড়ে আছে হবা। সুনেত্র শুধাল—পুঁড়ে কে গো মেয়ে?

হবা বলল—সে একজনা। জাত তার পুঁড়ে লয়, স্বভাব তার পুঁড়ে।

—সেটা কেমন কথা?

—সে এক ধন্দ কথা, শউরে নোক বুঝবে না।

শহুরে সুনেত্র সত্যিই কিছু বুঝতে পারছিল না। ভিটে চলে যাওয়ার পরও ভিটে থাকে কী করে? কেনই বা যায়? বাচ্চা জ্বালাতন করছে। গুঁতোচ্ছে। নিংড়ে খাচ্ছে। ভরাট বুক আর তেল-পিছলানো বলিষ্ঠ দেহ রেখায় রেখায় অদ্ভুত আদিম। সুনেত্রর আঁকার বিষয়। সুনেত্র দেখতে তাকে। ভাবে, ক্যানভাসে এই ন্যুড, এই বর্বর স্বাস্থ্যের তীব্র জীবন এঁকে ফেলবে কিনা। মেয়েটিকে তাহলে অ্যাপ্রোচ করতে হয়। দশ-বিশটা টাকার লোভও দেখাতে হয়। এইসবই ভাবছিল সুনেত্র। এমন সময় লোকটি এলেন। দেখেই মনে হল, এই সেই পুঁড়ে যে, হবাকে ভিটে ছাড়া করেও ভিটেয় রেখেছেন। হবা আর পুঁড়ের চোখ চালাচালির মধ্যেই একটা গোপন ইশারা ফুল্ল হয়ে ওঠে। হবা কি রক্ষিতা ও মুটে-স্ত্রী? লোকটি প্লুতসুরে নাটকের মতন হবাকে 'হাওয়া' বলে ডাকলেন। আছিস নাকি? খিক্ খিক্। পুঁড়ের অশ্লীল হাসি উঠোনে ঢুকে এল। হবা বাচ্চাকে বুক ছাড়িয়ে মাটিতে মৃদু ধাক্কায় ঠেলে দিল। বলল—বসেন মিঞাসাব।

পুঁড়ে সুনেত্রকে দেখে শুধালেন—কে বটে?

—আমি শহর থেকে আসছি। এখানে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। একটু জল খাব।

—বেশ। খান। জল খান। বাতাসা খান। এই লে হাওয়া। মেহমানকে বাতাসা দে। পানি দে। বলেই পুঁড়ে একা ঠোঙা এগিয়ে দিল হবাকে। শালপাতার ঠোঙা। বাতাসা এনেছেন। পুঁড়ে বললেন—এই ভিটে আমি কিনে লিয়েছি। বুঝলেন। ভিটে আমি খাই, নাকি ওরাই ভিটেখাকী, বিছনখাকী, বলদ-খাকী সেডা নির্ণয় করেন, আপনিই বলেন ব্রাদার। হাওয়া ক্যানে কাঁদে উ রে বোঝান তো। এত দিই, তবু মন ভরে না। আমিই ওদের রাখ্যাছি। তাড়িয়ে দিইনি। ছুপিয়ে ছুপিয়ে কত 'হেলপ' করি, শুন্তি কে করে। তবু মন ভরে না। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ। বলতে বলতে যেন কৈফিয়ত দেওয়া হল এমন নিশ্চিন্তে উনি সুনেত্রর পাশে খানিক বসে থাকলেন।

হবা সুনেত্রকে জল খেতে দিয়ে বলল—চাষার লোভ ভিটের পানে। যেতিসে হারামি পুঁড়ে-খাসলত (স্বভাব) পায়। ক্যাওট হলেন কইবত্ত। চাষা। সে তো বলদ চুষে বাঁচে। আর ওই পুঁড়ে পরের ভিটে ছিনিয়ে লতানে ফসল ফলায়। এইডাই ধম্ম। কী গো মিঞা ভুল কইছি?

উত্তরে হেঁ হেঃ শোনা যায়। চোখে সুতো-টানা চশমার একটা কাচ আধাআধি ফাটা, সেই দাগ মণির উপর পড়ে একটা চোখ বেশি তেরছে গেছে। হবা বলে—চাষা ভয়

পায় বলদ মরলে। বউ মরলে তত লয়। আর পুঁড়ে পরের ভিটে দেখে বেড়ায়। এখুন তেনরাই দয়ায় আমরা আছি ভাইজান।

আবার হেঃ হেঃ হাসি। কিছুক্ষণ বাদে লোকটি উঠে চলে যায়। একটা আশ্চর্য ভিটেখোর সাঙঘাতিক লোককে দেখে সুনেত্র। সহসা হবা একেবারে চোখের উপর এসে চাপা শ্বাসভরা গলায় সুনেত্রকে শুধায়—আমার কাছে কী দরকার তুমার?

হবার গলা গম্ভীর। যেন সন্দের মাখা। সুনেত্র সচকিত হয়ে পকেট থেকে একখানা নোট বার করে এগিয়ে ধরে হবার সমুখে। হবা বলে—যা করার করবা। মিঞাসাব আসবে। বলেই হবা গায়ের কাপড় ফেলে দেয়। বলে—ভিত্রি চল।

সুনেত্র মিষ্টি হেসে বলে—না। এখানেই থাক। আমি তোমাকে আঁকব।

সুনেত্র আঁকতে শুরু করে। হবা গান করে, 'ওরে শিমুল ফুল।' গানের ফাঁকেই শুধায়—ধন্দ কথা শুনলে তুমি? তারপরই 'ওরে শিমুল ফুল'। গান চলে। আঁকা চলে। মাঠ থেকে একটা খর বাতাস মুখে আগুনের লম্বা শিখা তুলে নিয়ে হবার গায়ে জিভ চালিয়ে শুষতে থাকে। অনুভব করে সুনেত্র। সহসা হবা বলে—মিঞাসাব আমার ভিটার জগদ্দল। উনি লড়বে না। শুষবে। আমার ভাতারপুত কঙ্কাল হবে। আমি তখনও গান করব, তুমি আঁকবা, কী গো শহর-ভাই? কথা বুলেন?

একেবারে আমূলে নড়ে উঠে শিল্পীর সব সত্তা। হবা বলে—সব দিব আমি। শুধু ঘর দেও। অন্ন দেও। আমাকে বসতি দেও। আমার মরদ দেও। আমি হাওয়া। আমাকে আদমদেও খুদাজি।

নগ্ন নারী কাঁদতে থাকে। ইভের দেহ থরথর করে রেখায় রেখায় রেখায় চুরমার হয়ে অজস্র তরঙ্গ তৈরি করে শিল্পীর স্মৃতিতে আন্দোলন তোলে। বাচ্চাটি উঠোনে ছাগলের পেটে কান পেতে থলিতে দুধ জমা হওয়ার শব্দ শুনছে। ছাগলরা ভিটের মাটি চাটছে। লেজ নাড়ছে আকালের শুষ্ক পৃথিবীতে, যেন দুর্ভিক্ষ তাড়াতে চায়।

ছবির নাম হবা। শিক্ষিত মানুষ শুধায়, সেটা কে? সুনেত্র বলে দেয়, উনিই ইভ। চারপাশে ওঁর পশুপাখিরা আছে। পাশে পড়ে আছে ভাতার-পুতের কঙ্কাল। হবা আমাকে সেই রকমই বলেছিল। এত লম্বা কঙ্কাল কখনও দেখেনি মানুষ। এত লম্বা কেন? না, আমি স্টেশন এক লম্বা কুলিকে দেখেছিলাম। ছোট কঙ্কালখানি ইভেন সন্তান। আকাশ থেকে শকুন নামছে। মাঠে খেলছে আগুনের জিহ্বা। শুষতে আসছে। তবু ইভ বেঁচে আছে। তার সমগ্র বলিষ্ঠতা, দেহের প্রচণ্ড তাকত, রেখার ভারী চাপ লেগেছে ছবিতে। পৃথিবীতে ইভের কখনও মৃত্যু হবে না।

অরুন্ধতীকে বলতে থাকে সুনেত্র। অরুন্ধতী দেখে কী বিশাল দেহ। কী প্রচণ্ড অমৃত ফলে মতন সুগোল স্তন, পরিপূর্ণ দুধে স্ফীত, নাভির কুণ্ড কি মস্ত বিবর। তলপেট কী তীব্র পুরু। উরু কী মারাত্মক থামের মতন কিন্তু অদ্ভুত কোমল। আঙুর দিয়ে ছুঁয়ে ফেলে অরু। হঠাৎ দেখে ঘরে সুনেত্র নেই। নিজেকে ভয়ানক একা মনে

হয়। অরুন্ধতী শরীরের কাপড় খুলে ফেলে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়। একবার নিজেকে দেখে, একবার ছবিকে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কান্না পায়। অরুন্ধতী কেঁদে ফেলে। ছবির নারীও কাঁদতে চাইছে, আবার অদ্ভুত প্রসন্নতাও ঠোঁটে, চুলে কী বিষণ্নতা। সে কঙ্কাল দুটির দিকে কেমন সকাতর স্নেহময় এবং ভরাট প্রসন্নতায় দুঃখে মাখামাখি।

অরুন্ধতীর চোখ সহসা ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। ফের নিবে যায়।

সুনেত্র এই ছবিকেই ভালবাসে। কখনও সে অরুন্ধতীকে দেখে না। অরুন্ধতী তার প্রয়োজনে লাগে না। বন্ধুদের বলে, আমি যা সৃষ্টি করেছি, তাই জীবনের জন্য যথেষ্ট। বাস্তব জীবনে চেয়ে অমার বিশ্বাসের জগৎ বড়। আমার স্মৃতিই মহার্ঘ। আমি আর কিছুই চাই না।

বন্ধুরা বলে, এই বিমুখতা, এই ইনডিফারেন্ট অ্যাটিচ্যুড ঠিক নয় সুনেত্র। অরুর জন্য কিছুটা আগ্রহ থাকা উচিত।

সুনেত্র ফের বলে—কিন্তু ও তো আমার কোনও কাজেই লাগে না। ও এই ছবিকে ঈর্ষা করে।

অরুন্ধতী সব শুনে বলে—হ্যাঁ, হিংসে করি। ছবিই কি জীবনের সব? ওকে বুঝিয়ে বলুন, ও লাগল হয়ে গেছে।

বন্ধু বলল—সুনেত্র তুমি পাগল।

সুনেত্র হেসে ফেলল। বলল—হ্যাঁ পাগল বই কি। কোনও একটা গভীর বিশ্বাসই তো মানুষকে পাগল করে। আমি পাগল হয়ে ভাল আছি। সুস্থ আছি। অরুকে আমার লজ্জাকরে। চোখ তুলে দেখতে ভয় লাগে।

অন্ধুরা কথা শুনে চমকে উঠল বলা যায়। সুনেত্র বিভোর হয়ে ভাবে, সে সত্যিই তবে ঠিকঠাক আছে। দিব্যি আছে। সে তার স্মৃতিকে স্টুডিও-তে রোজ প্রত্যক্ষ করছে। ইভের ভিটে নেই। বসতি নেই। সন্তান নেই। আদম নেই। কেউ নেই। সে হবাকে একা করে দিতে পেরেছে। এবার সে হবার কষ্ট প্রত্যক্ষ করবে। যন্ত্রণা দেখবে। কামনার রূপ দেখবে। অরুন্ধতী পাশের ঘরে একলা থাকে। স্বামীর কাছে আসতে সাহস পায় না। পৃথক দুই ধরা প্রান্তে বাস করে স্বামী -স্ত্রী। আদম আর ইভ। একথা ভাবতে ভাল লাগে সুনেত্রর। আনন্দ হয়। অরুন্ধতীর চোখের তলায় কালি পড়ে। স্বাস্থ্য শুকিয়ে যায়। সেই ম্লান চোখ তুলে অরুন্ধতী স্বামীর ফটোর দিকে চেয়ে থাকে। বিছানায় যেন একটা কঙ্কাল শুয়ে থাকে। একদিন হঠাৎই এই দৃশ্য চোখে পড়ে যায় সুনেত্রর। কঙ্কালটা কী যেন চিঁ চিঁ করে কথা বলছে, সুনেত্র বুঝতে পারে না। সে বেরিয়ে চলে আসে বাইরে। কোথায় চলে যায়।

সেদিন স্টুডিও-য় ঢুকে সুনেত্র দেখে ঘর অন্ধকার। লোডশেডিং হয়েছে। আলো জ্বালবার চেষ্টাও বৃথা। সে অন্ধকারেই একা চুপচাপ বসে থাকে চেয়ারে। হঠাৎ নাকে লাগে অদ্ভুত সুবাস। এমন গন্ধ কখনও সে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করেনি। না।

করেছে বোধ হয়। করেছে। বিয়ের রাতে একটা ভীষণ অচেনা বিদেশি নির্যাস অরুন্ধতীর গায়ে জড়িয়ে ছিল। ঠিক কতকটা সেইরকম গন্ধ। যে গন্ধে মন কোনও দূরপ্রান্তে কিসের গন্ধ আর কিসের হাহাকারে হারিয়ে যায়। সারা ঘর শির শির করছে। শ্বাস ফেললেও মনে হচ্ছে সেই সুগন্ধি বেরুচ্ছে। এমনটা হল কিসের দরুন। কে অমন করল। বুঝে পায় না সুনেত্র। হঠাৎ কানে আসে কিসের যেন খসখস শব্দ হচ্ছে। কেউ কি আছে এখানে? সুনেত্র মোম ধরায়। দেখে ইভের পায়ের তলায় কে যেন শুয়ে আছে। তাবত গায়ের কাপড় কোমড়ে জড়ো করা। বুকের স্তন বুকে শুকিয়ে এসেছে। গা কঙ্কালের মতন কাঁটা কাঁটা। সুনেত্র চিনতে পারে না কে এই মহিলা। প্রশ্ন করে, তুম কে? কঙ্কাল নড়ে ওঠে। চোখ খোলে। কাঁদবার চেষ্টা করছে। পারছে না। গন্ধটা আরও গাঢ় হয়ে নাক লাগছে সুনেত্রর। সুনেত্র ধীরে ধীরে টের পায় গন্ধটা কঙ্কালের দেহ থেকে উঠছে। নাভি থেকে উঠছে। কতকাল পর এরকম একটা গন্ধ উঠছে। কঙ্কাল উঠে বসে। ওর চোখ হরিণীর মতন কাজলটানা সুন্দর। ওর গায়ের শাড়ি পয়সা ফুলের ছাপ দেওয়া চিতিরং। মোমের আলো জোছনার মতন স্নিগ্ধ। প্রশ্ন করে, কে তুমি? কঙ্কাল কাঁদতে চেষ্টা করে, পারে না। তারপর কোনও প্রকারে বলে ওঠে, সেই নারী, তুমি পাগল হয়ে গেছ সুনেত্র।

সুনেত্র বলে ওঠে, তুমি অরু? তোমার গায়ে গন্ধ কিসের?

গন্ধ?

অবাক হয় অরুন্ধতী। তার বারবারই মনে হয় স্বামীকে সে পাগল করে দিয়েছে। গলা কেঁপে যায়, অরুন্ধতী বলে—আমায় তুমি একটুখানি ছোঁবে না সুনেত্র?

সুনেত্র বলে—এখন পৃথিবীতে বড় আকাল অরু। হবা তার ভিটে বিক্রি করে দিয়েছে। একটা জগদ্দল পাথর ওর বুকে চেপে বসে আছে। ওর কোনও আশ্রয় নেই।

অরুন্ধতী বলে—ওর পাষাণ নামিয়ে দাও সুনেত্র। আমিও নিঃশ্বাস পাচ্ছি না। কষ্টের এত ভার আমিও বইতে পারছি না। আমারও একটা ছবি আঁক সুনেত্র। প্লিজ।

—পাষাণ ভার নামানোর শক্তি আমার হাতে নেই অরুন্ধতী। তারপর স্বগতোক্তি করে, তোমার গায়ের গন্ধ কি ভুল অরু? বিড়বিড় করে সুনেত্র একাকী। তারপরই হঠাৎ তার মনে হয়, পাষাণ কথাটা কি গোলাকার? হবার বুক থেকে গড়িয়ে এসে অরুন্ধতীর বুকে উঠেছে। এই ঘটনা কীভাবে সম্ভব? আশ্চর্য সচকিত হয় শিল্পী। গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে নাকে লাগে। ওর মস্তিষ্কে স্মৃতির প্রবাহ শুরু হয়। সুনেত্র ফের ছিন্ন হয়ে তলিয়ে যায়। অরুন্ধতীকে কিঞ্চিৎ অনুভবের চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু আর পারে না। অরুন্ধতী সহসা সুনেত্রর পা জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে। বলে—আমাকে একটু চেয়ে দ্যাখো সুনেত্র। আমাকে স্বাস্থ্য দাও। আমার বুকের থলি দুধে পূর্ণ কর। আমাকে ইভের মতন সচ্ছল কর। আশ্রয় দাও।

কিন্তু এসব কথা গলায় জোর নেই বলে অরুন্ধতীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে না। সে কেবল পা জড়িয়ে ধরে। পা ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সুনেত্র। সে গন্ধটা কিসের ঠিক মতন নির্ণয় করেত পারে না। ওর স্মৃতি ওকে ধোঁকা দেয়। আহা। যদি তার সেই মৃগ-গন্ধ মনে পড়ত!ট

মনে পড়ে না। কারণ অরুকে সুনেত্র বিশ্বাস করতে পারে না। অরু বোঝে, সে আর স্বামীকে পাবে না। সে তখন ছবি ও নিজের গায়ে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। হু হু করে পুড়তে থাকে সুনেত্রের স্মৃতি আর বাস্তব।

বাইরে চেয়ারে অন্ধকারে বসে চাঁদ দেখে সুনেত্র। নীল কস্তুরী আভার চাঁদ। বারন্দায় চাঁদের আলো এসে লাগে। শিশির ঝলমল করে। যৌনার্ত কোনও পশু কাছের জঙ্গলে দাপাচ্ছে। সেই তোলপাড় শোনা যায়। মৃগীর নাভিমূলে সুগন্ধি জন্মাবার ইতিহাস স্মরণ করে। ঘরে অরুন্ধতী পুড়ে যেতে থাকে।

রাস্তায় নামে সুনেত্র। হবা বিবির ভিটেয় এসে দেখে, ওরা কেউ নেই। কুটিরখানাও নেই। সেখানে চাষ পড়েছে। ভাল লতাপাতা জন্মেছে। ফুল ও ফল হয়েছে। মিঞাসাব পাহারা দিচ্ছেন উৎপন্ন ভিটার আবাদী। সুনেত্রকে দেখে হাসলেন। বললেন—কারে খোঁজেন বাবু। সে তো নাই। পানিতোয়া বিল পেরিয়ে ওই আসমানের তলায় সরু পথ, সেই ধারে গেলছে। যাবেন?

পাগল লোকটির চোখমুখ কঠোর হয়ে উঠল। মিঞাসাব বললেন—হাওয়াকে ওর সোয়ামি ত্যাগ করেছে বাবু। সেই দুঃখে মেয়েডা ওই পানে চলে গেল। আম্যি ভিটা দখল নিলাম।

এই প্রথম পাগল সুনেত্র 'অরু' 'অরু' করে হু হু করে কেঁদে উঠল। তারপর সে ছুটে চলল চিগন্দের ওপারে।

একটি সার্থকতম নারী-মিলন তার খুব জরুরি।

কাননে কুসুম কলি অথবা ছোটদের গল্প

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

জ্যামে যখন মিনিবাসটা আটকে পড়েছে, জানালাগুলো কাচ্চাবাচ্চা জাঁতি দিয়ে সুপরি কুচোচ্ছে। খুশি হল।

দেবাশিস টেলিভিশনে চাকরি করে। শিশুশ্রমিকদের উপর কেটা ডকুমেণ্টারি করার কথা ভাবছিল বেশ কিছুদিন। এ ব্যাপারটাও লাগানো যেতে পারে। 'এর চেয়ে হাঁটলে আগে পৌঁছব' কণ্ডাকটারকে এই কথা ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেল দেবাশিস।

ডানহাতে জাঁতি বাম হাতে সুপুরি কী দ্রুত চলছে দু'হাত। কালো বুটিজামার মেয়েটা বলল আজ আমি আইস্‌কিরিম, তুই? হলদেটে হওয়া, আসলে সাদা টেপ জামার আরও ছোট মেয়েটা বলল মাংস, বলেই ও ফুটপাতে বসা রোগা লোকটার পেল্লায় এ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চির দিকে তাকায়। সিগারেট কিনতে ও ফুটপাতে গেলে একটুর জন্য মরা কমি ও মাছিসমেত মণ্ড মাড়িয়ে ফেলত। কাছেই ওই মাংসওলা। উবু হয়ে বসা দুটো লুঙ্গি পরা লোক যা খাচ্ছে, তা হল ছোট করে কাটা নাড়িভুড়ি। গন্ধে বুঝল পাশেই কোথাও চুল্লু বিক্রি হয়।

কুচো সুপুরির স্তুপের সামনে বাচ্চারা কথা বলছে :

—তোর ক কেজিরে চিনু?

—এই ধামা হ'লে পাঁচ হবে।

—ইস্‌রে, আমার তিন চলছে। মাথাটায় উকুন খাজালাচ্ছে, চুলকোতে গেলে হাত বন্ধ। তোর উকুন না বেচে দিইচি সেদিন, চারটে চুলকানি পাওনা আছে, ওটা দিবি এখন?

—কাজের পরে সন্ধেবেলায় দেব। তই এখন ডিস্কো কাটনা, তাড়াতাড়ি হবে।

মেয়েটা বাম হাতের তালুতে দুটো করে সুপুরি একসঙ্গে রাখে এবং জাঁতি দিয়ে একসঙ্গে কাটতে কাটতে বলে ডিস্‌-কো-ডিস্‌-কো।

দেবাশিস মেয়েটাকে নাম জিজ্ঞাসা করে।

—হাসি।

—না-না, হেলেন। অন্য একটা ছেলে বলে। কথা বলার সময় নাচে, মালিক তাই হেলেন নাম দিয়েছে। দাঁত ফোকলা ছেলেটা হাসে।

—সারাদিনে কতটা কাটতে পার?
—আমি চার কিলো।
—আমি পাঁচ কিলো।
—আমি একদিন ছ' কিলো করেছি।
—কিলোতে কত করে মজুরি?
—আধা ফালা চার আনা, চৌকো আট আনা, ছক্কা এক্টাকা, ঝিরি ঝিরি দুটাকা।
—সারাদিন কত রোজগার কর?—
—তিনটাকা—
—সাড়ে তিন।
—পয়া দিনে চার টাকার উপর।

দেবাশিস পয়া দিন ব্যাপারটা অনুমানে অনুধাবন করে।

মাথায় উকুন কম থাকবে, কিংবা যেদিন ঘন ঘন ঘাম মুছতে হবে না, কিংবা যেদিন পায়ে ঝিম ধরবে না। পয়া দিন।

—কখন এসেছ আজ?
—আমি সাইরেনের আগে।
—আমি বাবুদের রেশন তুলি। যখন এলাম তখন কলের জল চলে গেছে।
—তোমাদের মা-বাবা কী করেন?
—আমার বাবা মরে গেয়ে। মা.....
—ওর মা ভিকিরি। দাঁত ফোকলা বললে।
—তোমার মা-বাবা?
—আমার আসল মা চলে গেছে। বাবার নতুন বউ আমায় প্যাঁদায়। আমি যা কামাই, খেয়েলি। রাস্তায় শুই।

দেবাশিসের তেমন কোনও প্রেমিকা নেই। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা মারে। সেদিন ওখানে না গিয়ে মামারবাড়ি গেল। দুটো মামাতো বোন আছে। একজন বি.এ বিটি করে বিয়ের জন্য বসে আছে, ছোটটা এম.এ পড়ছে রবীন্দ্রভারতীতে। টি.ভি. তে চাকরি পাবার পর মামারবাড়িতে ওর গ্ল্যামার হয়েছে। এখন মামারবাড়ির সবাই ওকে ঘিরে বসে। দেবাশিস সংবাদ পাঠক অমুকের চরিত্রদোষ, বিখ্যাত প্রযোজক অমুকের পদোন্নতির গোপন রহস্য বা অমুকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ ইত্যাদি রকম টিভি-স্টারদের গোপন কথার গল্প বলে।

আজ মামারবাড়ি যেতেই—আরে এস এস দেবাশিস, বলেই উচ্ছ্বসিত ছোটবোন হাত ধরে ভিতরে নিয়ে তার দুই বান্ধবীর কাছে গিয়ে বলল—এই যে দেবাশিসদা, যার কথা বলি।

—টি. ভি.-তে?

মেয়ে দুটোর চোখে টুনি বাল্বের অস্তিত্ব টের পায় দেবাশিস। এও মওকায় বলে

ফেলে—মামাতো বোনের দিকে চেয়ে—একটা যা প্রোগ্রাম প্ল্যান নিয়েছি না সুজাতা—টেরিফিক। ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে লাইটার হাতে নিল।

চাইলড্ লেবারদের নিয়ে।—সিগারেট ঠোঁটে নাচাল।

দেবাশিস অফিসে এই প্রোগ্রামটার ব্যাপারে প্রোপোসাল পাঠাল। প্ল্যানিংটা এই রকম।

চায়ের দোকানের বয়।

ট্রেনের শিশু হকার।

ট্রেনের মোটবওয়া কিশোর।

সুপুরিকাটা বাচ্চাগুলো।

হাওড়ার লেদকারখানাগুলোর শিশুশ্রমিক।

শিশুশ্রম সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যা এবং ল-ইয়ারের সঙ্গে ইন্টারভিউ,

শিশুশ্রম সম্পর্কে একজন সমাজতাত্ত্বিকের সঙ্গে ইন্টারভিউ।

স্টেশন ডিরেকটার ডেকে পাঠালেন।

—কোন্ ল-ইয়ারকে ইন্টারভিউ করতে চাও?

—ঠিক করিনি, স্যার।

—ঠিকাছে। আমি একজনকে ফোন করে দিচ্ছি।

—সোসিওলজিস্ট?

—ডাঃ বিনয় বসু।

—ওত লেবলড্ লোক। পাল্টাও।

—কাকে নেব স্যার?

—সেটা তুমি দেখ। এমন কাউকে নিও না যে রুট টুট্ খুঁজবে। তা'হলে টেলেকাস্ট করা যাবে না। আর একটা কথা, প্রোগ্রাম ওটা রাখনি? হাউ গভ্মেণ্ট ট্রাইস্ টু প্রিভেন্ট দিস্ প্রাক্টিস অফ্ ইউজিং চাইলড্ লেবারস্? লেবার কমিসনারের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ রাখ। রিভাইস্ ইওর প্ল্যান। ওকে?

গাড়িতে বসেই ক্যামেরা প্যান করানো হ'ল।

রাস্তা, লোকজন, যানবাহন, দোকানের সারি। মিড্শট।

একটা দোকান।

ক্লোজ মিড্শট। দোকান মালিকের বাস্ট। সামনে সুপুরির স্তূপ।

জুম ইন-। সুপুরির স্তূপ।

(একজন মালিক বলল—ক্যা হোতা হায় সার?—

সুটিং হোতা হায়, সুটিং সিনেমাকা।

কেয়া নাম স্যার সিনেমাকা?—

—নসীব কলকাত্তা কি)

ক্লোজ্‌শট। সুপুরির স্তূপ।

ক্যামেরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন সাইজের সুপুরি কুচির স্যাম্পল রাখা মাটির সরাগুলি উপর দিয়ে প্যান করে।

পরের শট-এ রাস্তায় বসা বাচ্চাগুলো সুপুরি কুচোচ্ছে।

প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ক্লোজশট্ নিল দেবাশিস। দেবাশিস পকেট থেকে একমুঠো টফি বের করে দেখাল, বলল, ছবি তোলা হ'য়ে গেলে সব্বাইকে দেবে। তারপর বলল যে যে পার, ডিস্কো সুপুরি কাটো। সিনেমার ছবি উঠবে।

একটা ১৪/১৫ বছরের ছেলে বলল বুঝেছি, সিনেমা উঠবে, আসল সিনেমার আগে হয়। দেবাশিস হাতের উপর এম্‌ফাসিস্ দেবার জন্য ক্যামেরা তাক করে।

ক্লোজশ্‌ট। বাচ্চাদের হাত, হাতের খেলা, সুপুরি ঝরে পড়ছে।

একসঙ্গে দুটো করে সুপুরি, জাঁতিতে চাপ, শিরা ফুলে যাচ্ছে, হাতের শিরাগুলো টানটান, সুপরি খসে খসে পড়ছে।

আবার দুটো সুপুরি জাঁতিতে, আঙুলের আড়ালে। অন্য হাত কাঁপছে, চাপ, ছিটকে গেল জাঁতি, ছড়িয়ে গেল সুপুরি, নখসমেত আঙুলের একটু অংশ কুচানো সুপুরির পাশে পড়ে আছে। সুপুরির কুচি শুষে নিচ্ছে রক্ত। ক্যামেরা টালমাটাল।

মেয়েটার জমা রক্তময় হয়ে উঠেছে, কী ঘটনা বুঝতে মেয়েটার কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। এবার মেয়েটা তুমুল আর্তনাদ করে ওঠে। ছিন্ন ডানার মত ঝাপট মারে হাত, আর রক্তে ছিটোয়। কি সর্ব্বনাশ হ'ল সমবেত স্বরে এই আর্তনাদ, দেবাশিস পেছোতে থাকে। ক্যায়া হো গিয়া রে?—মালিকেরা নেমে আসে।

দেবাশিস ছুটে গিয়ে গাড়িতে ঢোকে, স্টার্ট, এখুনি। ড্রাইবার গাড়ি স্টার্ট দেয়, তীব্র বাজে ইলেক্‌ট্রিক হর্ন।

প্ল্যানিংটা একটু চেঞ্জ করল দেবাশিস। সুপুরির ব্যাপারটা শেষের দিকে। জাতিতে আঙুল কেটে টুকেরা হয়ে পড়ে যাওটা অদ্ভুত এসেছে। নাম রাখল 'এইসব শিশুগুলি।' টেলেকাস্ট হ'ল। পরদিন অফিসে ঢুকতেই একজন সহকর্মী হাত বাড়িয়ে দিল।

—এ রিয়াল ডকুমেন্ট, মাইরি, এক্‌সিলেন্ট। দেবাশিস তার সবগুলি আঙুল সমেত হাত করমর্দনের ঝাঁকুনি পেল, তখন থ্যাংকিউ উচ্চারণ বড় দুর্বল ও কাঁপা শোনাল।

সমাজসেবিকা গায়ত্রী দেবী শিশুমেলার তরফ থেকে স্টেশন ডিরেক্টারকে ফোন করলেন দুঃসাহসিক প্রোডাক্‌শনের জন্য। ওয়ার্লডলুথেরান ফোন করল।

দেবাশিসের কলিগ্‌রা অনেকেই বলল, রীলটা একবার দেবেন তো, পরে দেখে নেব। স্টেশন ডিরেক্টার ডেকে নিয়ে বললেন—এ গুড প্রডাক্‌শন। আই উইল সেন্ড ইট ফর ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড।

চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডায় যেতেই 'এই যে এসেছে শালা, মার', বলে হাসল। শালা গোবিন্দ নিহাল্‌নি। কেমিস্ট কিন্তু ফিল্‌ম পত্রিকার সম্পাদক-বন্ধু বলল—মেয়েটার আঙুলখানা নিয়ে নিলি?

দেবাশিস, বলল—না মাইরি, ওটা একটা এ্যাক্সিডেন্ট। হয়ে গেল। বড্ড গিল্টি লাগে নিজেকে।

—ক্যামেরাই কি মেয়েটার এ্যাটেনশন ডাইভার্ট করেছিল?

দেবাশিস বাসের টিকিট পাকাচ্ছিল।

একজন লেকচারার বন্ধু বলল, বাচ্চাগুলোর কাজটার মধ্যে তো রিস্ক্ ইন্‌ভল্‌ভড রয়েছে। হয়তো এমনিতেই হতে পারত, একসিডেন্টালি ক্যামেরটা সেখানে গিয়ে পড়েছিল। এ আগেও হয়তো এরকম ঘটে গেছে, তখন তো ক্যামেরা যায়নি।

এই ব্যাখ্যাটা দেবাশিসের সবচেয়ে ভাল লাগল। সিগারেট ধরাল।

ইঞ্জিনিয়ার অথচ ছোট গল্পকার বন্ধু বলল, আই এগ্রি। সেদিন না হলেও অন্যদিন হ'তে পারত। আসলে রেক্‌লেস প্রফিট ওরিয়েন্টশনের আউটকাম এসব। একজন এডাল্টের ওয়ান ফোর্ত পেমেন্ট দিয়ে হাফ কাজ পাওয়া যাচ্ছে মানে হানড্রেড পার্শেন্টি মোর প্রফিট ইন রেসপেকচ অফ লেবার পেমেন্ট।

বয় চা নিয়ে এল। গল্পকার দুটো টাকা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট অনতে পাঠাল। কুইক্।

ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বলল—এ-ও কিন্তু শিশুশ্রমিক দাদা। বয় সিগারেট এনে টেবিলে রাখল। ওর হাতে চামড়া কিছুটা কুঁচকে আছে।

—কী হয়েছে রে এখানে?—

—চায়ের জলে!

—কবে?—

— পুজোর সময়ে।

—পুজোর সময়?—অথচ...

ওরা এ ওর চোখের দিকে তাকাল। এবং আলোচনার মোড় ঘোরাল। বল দেবাশিস, তোর বোনের বান্ধবীর খবর কী?

দেবাশিস আজকাল বাসে উঠবার আগে জিজ্ঞেস করে নেয়—ভায়া এস. এন. ব্যানার্জি?—কন্ডাকটার যাবে না বললেই ও নিশ্চিন্তে ওঠে। সুপুরির দোকানগুলোর সামনে দিযে বাসে যেতেও ভয় পায় ও।

খবর কাগজে টিভির 'এইসব শিশুগুলির' রেফারেন্‌স্ দিয়ে শিশুশ্রমিক আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটা চিঠি বেরিয়েছে। ফিচারও বের হ'ল। এইভাবে শুরু।

কলকাতা কর্পোরেশন দেয় ট্রেড লাইসেন্‌স্ কি ট্রেড সিক্রেট আছে যাতে কর্পোরেশন ভবনের নাকের ডগায় সারবন্দী শিশুরা বিপজ্জনকভাবে সুপুরি কুচোচ্ছে?

কিছুদিন পর দিল্লি থেকে খবর এল জাজেরা বলেছে দেবাশিসের এইসব শিশুরা বেস্ট ডকুমেন্টারি যার নগদ আড়াই হাজার টাকা এ্যাওয়ার্ড।

যে প্রডিউসারটি সর্বদা দেবাশিসের নিন্দা করে সে ডান কাঁধে মৃদু থাপ্পড় দিল। এ এস ডি; গতবার যিনি খুব খারাপ সি আর দিয়েছিলেন, বাম কাঁধে মৃদু থাপ্পড় দিল।

যে সুন্দরী মহিলা লাইব্রেরিয়ান্টির সাথে বই ফেরত দেওয়া দিয়ে বিশ্রী ঝগড়ার পর তিক্ত সম্পর্ক বহু চেষ্টাতেও দেবাশিস ভাল করতে পারেনি, সেই মহিলা সিঁড়িতে লাল আঁচলের বাতাস দিয়ে ন্যাপথলিন গন্ধের সাথে জানাল দারুণ খবর। এমনকি দেবাশিসের নামটা বেল্টের স্টিলের বগলসে একবার টোকা মারল। বলল লাইব্রেরিতে আসবেন, কফি খাওয়াব।

দেবাশিস হাফ্ সি. এল. নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ফ্যান ছেড়ে ঘুমোল। মা, বোন, কাউকে জানাল না এ্যাওয়ার্ডের কথাটা। সন্ধ্যায় ছাতে উঠলে, যখন বাতাস মাথার চুল ফালি ফালি করে ওড়াচ্ছিল, তখন দু'হাতে মাথার চুল চেপে ধরল, ঝাঁকাতে লাগল। সূর্য ডোবার পর আকাশের শেষ লাল রং ওই মেয়েটার আঙুলের চোঁয়নো রক্তের মত। ছাতের রেলিং-এর ধারে চলে আসে। গা গোলাচ্ছে। অফিসে গেলে ও যেন খাটালের পাশের পাঁচিল। সবাই ঘুঁটে মারছে—কনগ্র্যাচুলেশন, এ্যাওয়ার্ড, পুরস্কার। পরের দিন টেলিফোনে অসুস্থতার কথা জানাল অফিসে। সহকর্মীটি জিজ্ঞাসা করল—কী অসুখ—এ্যাওয়ার্ডের গ্যাস?

চায়ের দোকানের আড্ডায় বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করল অ্যাওয়ার্ডের পুরো টাকাটাই যার আঙুল কেটে গেছে, সেই মেয়েটাকে দিয়ে দেবে।

তিনমাস পরে এ্যাওয়ার্ডের টাকাটা এলে দেবাশিস ওর চার বন্ধুর দল নিয়ে এস. এন. ব্যানার্জী রোডে এল। ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বলল—ক্রিমিনোলজির সেই ট্রাডিশন—দ্যাখ,—অপরাধী যাচ্ছে অকুস্থলে।—যাবেই। দেবাশিস বলল—ও দূর থেকে চিনিয়ে দেবে মেয়েটাকে, তারপর বাকি বন্ধুরা যা হয় করবে। মেয়েটার বাড়ি গিয়ে ওর অভিভাবকের হাতে তুলে দেবে টাকাটা। দেবাশিস পিক্চারে থাকবে না।

এই যে সুপুরির দোকানগুলো। কিন্তু কই? ফুটপাথের ধারের সারবন্দী বাচ্চারা তো নেই! কী ব্যাপার? আজ তাহলে ওরা আসেনি?

দেবাশিস পিক্চারে নেই তাই ওর এক বন্ধু এক দোকান মালিককে জিজ্ঞাসা করল— যেসব বাচ্চালোগ সুপারি চিপ্স্ করতা থা, কাঁহা গিয়া?

—কই নেহি হ্যয় সার। আপনা মর্জিসে সব বিলকুল মিশিন বৈঠা দিয়া সার।

আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝল ওরা। গভর্নমেন্ট থেকে চাপ দিয়ে ওদের সুপুরি কুচো করার মেশিন কিনিয়েছে সম্প্রতি। ওদের সরকারি অফিসার ভেবেছে। তাই লস্যি মাঙিয়েছে। বাচ্চাকাচ্চাগুলোর খবর ওরা জানে না। যার আঙুল কেটে গিয়েছিল সেই মেয়েটার খবরও ওরা রাখে না।

ইঞ্জিনিয়ার অথচ ছোট গল্পকার বন্ধুটির প্রশ্নের উত্তরে মালিকেরা জানাল বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে হাটিয়ে এখন অনেক ঝামেলা কমে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, মেশিনে লেবার খরচ কম। 'যো হুয়া সার আচ্ছাই হুয়া, সার আচ্ছাই হুয়া।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ। কিন্তু দেবাশিস পুরো ব্যাপারটা বলতে গেলে আর একটু না বলে পারবে না।

কিছুদিন পরে 'শিল্পগঠনে ব্যাংক' এই নামে ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে ব্যাংকের সাহায্যে গড়ে ওটা বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা গ্রাইন্ডিং মেশিনের কারখানা প্রিকভারেজ গিয়ে দ্যাখে কারখানার মালিক ওর সহপাঠী ঘোতন। পরীক্ষায় ভাল টুকতে পারত আর গুলির টিপ ছিল খুব। যাক্ ঘোতন 'এইসব শিশুগুলির' ব্যাপারে কিছু বলল না, জানে না বাঁচা গেল।

ঘোতন খুব খুশি হ'ল, মনের কথা বলল দেবাশিসকে। বলল, তুই আছিস ভাল মাইরি, টিভিতে কত মেয়ে ফেয়ে...।

ঘোতন কারখানার কথা বলল মন্ত্রীর চামচে থেকে ব্যাংক—অফিসার পর্যন্ত কাকে কি ধান্দা করতে হয়েছে, কাকে কত দিতে হয়েছে। এসব কাহিনী তো আর টিভিতে বলা যাবে না।

ঘোতন একদিন বিয়ার খাওয়াতে চাইল।

কতজনকেই তো খাওয়াতে হয়।....বিয়ে করিসনি! বাঃ। চাস্ তো নিয়ে যেতে পারি।

বাঁধা আছে।...

ঘোতনের খুশি মুখ থেকে সুঘ্রাণ সিগারেট ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওড়ে। ভাল প্রফিট থাকছে। ডোমেস্টিক্ গ্রাইন্ডারের সাথে আর একটু ভারী ধরনের বিট্‌লনাট চিপিং মেশিন তৈরি করছি। একটা মেশিনেই বিভিন্ন সাইজের সুপুরি কাটা যায়। গভর্নমেন্টের লেবার ওয়েল ফেয়ার ডিপার্যমেন্টের থুরুতে সুপুরি মার্চেন্টরা কিনছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ফাইব্ পাসেন্ট দি। সাউথ ইন্ডিয়া থেকেও দুচারটে অর্ডার পেয়েছি। চ'না, কারখানা দেখবি। ষোলজন কাজ করে।

দেবাশিস কারখানায় গিয়ে দেখল পাঁচ-ছজন বাচ্চা ছেলে, কেউ ঘষছে লোহার পাত, কে্উ দুহাতে চক্‌চকে ইস্পাতের ফলা টানটান করে ধরে রেখেছে ঘুরন্ত লোহার চাক্‌তির উপর। শান দিচ্ছে। তারাবাজির মত ঠিক্‌রোচ্ছে আগুন।

আমি আজ আইস্‌কিরিম্।

তুই?—

আমি ঘুগ্‌নি।

লোহার শব্দে, মেশিনের শব্দে ওই বাচ্চাগুলোর কথাবার্তা শোনা যায় না।

দুটো বাচ্চা মেয়ে সরু তামার তার জড়াচ্ছে তাদের সরু সরু আঙুলে। আঙুলগুলো ঠিকই তো আছে আপাতত।

জীবনীপঞ্জী (বয়সভিত্তিক)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। তিনি বি. এ পাস করেন এব কিছুকাল প্রথমে ২৪ পরগনা জেলার হরিণাভিতে স্কুল-মাস্টারি করেন, তারপর ভাগলপুরের নিকটে জমিদারি স্টেটের ম্যানেজর করেন। পরে পুনরায় স্কুল-মাস্টারি করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' বাগলপুরে রচিত। ১৯৫১ সালে 'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১ নভেম্বর, ১৯৫০ সালে ঘাটশিলায় পরলোকগমন করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম: ২৩ আগস্ট, ১৮৯৮ সালে বীরভূম জেলার লাভপুরে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ পড়বার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও কারাবরণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৩০টি। 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৫ সালে সাহিত্য আকাদেমি ও ৯৫৬ সালে পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। 'গণদেবতা'র জন্য ১৯৬৬-তে জ্ঞানপীঠ লাভ করেন। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে পরলোকগমন করেন।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) : জন্ম : ১৯জুলাই, ১৮৯৯ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলর মনিহারতে। ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করে ভাগলপুরে তিনি কর্মজবন শুরু করেন। বহু গ্রন্থ রচয়িতা বনফুল বাংলাসাত্যি ক্ষুদ্রতম ছোটগল্প রচনাপ পথিকৃৎ। ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন 'হাটে বাজারে' উপন্যাসের জন্য। ১৯৭৬-এ পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ'। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯-তে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সালে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা এবং ঢাকায় পড়াশুনা করেছেন। বহু জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা, প্রযোজনা করেছেন। আকাশবাণতেও যুক্ত ছিলেন। বইয়ের সংখ্যা প্রায় দেড়শো। কিশোর সাহিত্যের জনপিরয়তা লাভ করেন। 'সাগর থেকে ফেরা' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ সালে আকাদেমি পুরস্কারলাভ করেন।১৯৫৮ সালে একই গ্রন্থের জন্য পান রবীন্দ্র পুরস্কার। ৩মে, ১৯৮৮ সালে পরলোকগমন করেন।

সতীনাথ ভাদুড়ি : জন্ম : ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। ১৯৩০ সালে পাটনা তেকে এম.এ পাস করেন। ১৯৩১ সালে বি.এল পাস করেন। বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯৪৬ সালে 'গাগরী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য ১৯৫০-এ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যু : ৩০ মার্চ, ১৯৬৫ সালে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম : ১৯মে, ১৯০৮ বিহারের দুমকা শহরে। বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই.এস.সি পাস করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে পড়েন।১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়। এরপরই প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাস। বাংলা সাহত্যে আলোড়ন পড়ে যায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। নিদারুণ

দারিদ্রের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়েছেন তথাপি সাহিত্য-সাধনা থেকে কখনও বিরত হয়নি। ১৯৫৬ সালে, ৩ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি।

আশাপূর্ণা দেবীঃ জন্ম : ৮ জানুয়ারি, ১৯০৯। স্কুল কলেজে পড়েননি। অল্প বয়স থেকেই কবিতা, গল্প লিখতেন ও তা প্রকাশিত হত। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশোরও বেশি। ১৯৬৬সালে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। ওই একই গ্রন্থের জন্য ১৯৭৬-এ জ্ঞানপীঠ পেয়েছেন। মৃত্যু : ১৩জুলাই, ১৯৯৫ সালে।

সুবোধ ঘোষ ঃ ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বরে হাজারিবাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট কলমবাস কলেজে পড়াশুনা করেন। ফসিল, অযান্ত্রিক, ভারত প্রেমকথার মত গল্প ও বিতর্কিত উপন্যাস 'তিলাঞ্জলী' লিখে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিনী' পদক পেয়েছেন। মৃত্যু : ৯ মার্চ, ১৯৮০ সালে।

কমলকুমার মজুমদার ঃ জন্ম, ১৪ নভেম্বর, ১৯১৪ সালে কলকাতায়। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন। কখনও জনগণনা বিভাগে, কখনও স্কুলে। বহু বিচিত্র বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান ছিল। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, ডকুমেন্টারির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গল্পসমগ্র, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, অন্তর্জলী যাত্রা, সুহাসিনীর পমেটম ইত্যাদি। 'গল্প সমগ্র'র জন্য বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেছেন। মৃত্যুঃ ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ সালে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ জন্ম : ৩০ জানুয়ারি, ১৯১৭ সালে, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরদিতে। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। বহু গল্প লিখেছেন। প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ'। ১৯৬১ সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যু ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সালে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ১৯১৮ সালে দিনাজপুরের বালিয়াডঙীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বহু স্মরণীয় গল্প-উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট-চরিত্র 'টেনিদা' সবার প্রিয়। মৃত্যু : ৮ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার ঃ জন্ম : ২২মার্চ, ১৯১৮ সালে, কোচবিহারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ডাক ও তার বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নয়নতারা, রাজনগর, মহিষকুড়ার উপকথা, মধু সাধু কাঁ, বিাস বিনয় বন্দনা ইত্যাদি। বহু স্মরণীয় ছোগল্পের স্রষ্টা। ১৯৮৬-তে পেয়েচেন বঙ্কিম পুরস্কার। ওই একই বছর 'রাজনগর' উপন্যাসের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ ঃ জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সালে বাংলাদেশর ফরিদপুরে। তাঁর রচিত 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে অন্য ধারার এক শক্তিশালী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ৯৭২ সালে 'শে, নমস্কার; শ্রীচরণেষু মাকে' গ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২৬ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিমল কর ঃ জন্ম : ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২১ সালে চব্বিশ পরগনা জেলার টাকির নিকটে। বি.এ পাস করেন ১৯৪৫ সালে। ১৯৫৪-১৯৮২ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন দেশ পত্রিকায়।বহু মনেরখার মত গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৭ সালে। ১৯৭৫ সালে 'অসময়' গ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

রমাপদ চৌধুরী ঃ জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে খড়গপুরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ। 'এখনই' উপন্যাসের জন্য ১৯৭১ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার ও 'জগত্তারিণী' সুবর্ণ পদক পেয়েছেন। ১৯৮৮ সালে 'বাড়ি বদলে যায়' গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি।

ননী ভৌমিক ঃ জন্ম : ১৯২১ সালে, বীরভূমে। রাজনীতিতে হাতেখড়ি ছাত্রাবস্থাতেই। পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অনুবাদকের চাকরি নিয়ে রাশিয়া চলে যান এবং ১৯৫৬ সাল থেকে মস্কো প্রবাসী ছিলেন। সেখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ; ধানকানা, পূর্বক্ষণ, ধুলোমাটি। মৃত্যু: ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে। মৃত্যুর পর বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেন।

গৌরকিশোর ঘোষ ঃ জন্ম : ২২ জুন, ১৯২৩ সালে বাংলাদেশের যশোরে। ১৯৪৫ সালে আই.এস.সি. পাশ করেন নবদ্বীপ থেকে। স্বনামে 'রূপদর্শী' ছদ্মনামে বহু স্মরণীয় লেখা লিখেছেন। ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ কোরয়িা 'কো জয় উক' স্মৃতি পুরস্কার তিনিই প্রথম পান। ১৯৮১ -তে ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন। 'প্রেম নেই' উপন্যাসের জন্য বঙ্কিম পুরস্কার পেয়ছেন ১৯৮২ সালে।

সমরেশ বসু ঃ জন্ম : ১৯২৪ সলে। তাঁর জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। ১৯৪৬ সালে পরিচয় পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' প্রকাশিত হয়। 'নয়নপরের মাটি' তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। 'কালকূট' ছদ্মনামে বহু গ্রন্থ এবং এই নামেই বিখ্যাত উপন্যাস 'অমৃত কুম্ভের সন্ধ্যানে' ও 'কোথায় পাব তারে' রচনা করেন। ১৯৮০-তে 'শাম্ব' রচনা করে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১২ মার্চ, ১৯৮৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাশ্বেতা দেবী ঃ জন্ম : ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬ সালে ঢাকায়। শান্তি নিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯৭৯ সালে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বহু স্মরণীয় উপন্যাসের স্রষ্টা। ১৯২৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিতা। ১৯৯৭ সালে 'হাজার চুরাশীর মা' উপন্যাসের জন্য 'ম্যাগসেসে' পুরস্কারও পেয়েছেন।

অসীম রায় ঃ জন্ম : ৯ মার্চ, ১৯২৭ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ পাস করেন। পেসায় ছিলেন সাংবাদিক। ১৯৮২ সালে 'শিশিরকুমার ঘোষ' পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গোপাল দেব, শব্দের খাঁচায়, একদা ট্রেনে ইত্যাদি। মৃত্যু, ৩ এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ ১৪ অক্টোবর, ১৯৩০ সালের মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০-৫৬-এ রাঢ় বাংলায় আলকাপ দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। উপন্যাস ও গল্পের বইয়ের সংখ্যা প্রায় একশোটি। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের জন্য ১৯৯০-এ ভুয়ালকা, ১৯৯৪-এ বঙ্কিম পুরস্কার পান। একই উপন্যাসের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৩০ সালে ঢাকায়। বিজ্ঞানে স্নাতক। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। তাঁর প্রথম গল্প 'বজরা'। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; বনবিবির উপাখ্যান, নিশীথ ফেরি, বাগ্‌দা।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম: ২৮ নভেম্বর, ১৯৩২ হুগলি শহরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, বাংলায় অনার্সসহ। প্রথম গল্প 'প্রলেপ' প্রকাশিত হয় রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে, ১৯৭৫-এ সাংবাদিক জীবন শুরু। ১৯৫৮ সালে পরিচয় পত্রিকায় তাঁর 'বেহুলার ভেলার ভেলা' গল্প প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে তা সাড়া ফেলে দেয়। 'সাদা খাম' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি

পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর 'ক্রিকেট রেকর্ডস' (১৯৬৬) একটি উল্লেখযোগ্য বই।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় : জন্ম : ১৯৩৩ সালে। অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কুবেরের বিষয় আশায়' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। 'শাহজাদা দারাশুকো' গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার।

দীপেনন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম : ১০ নভেম্বর, ১৯৩৩ সালে কলকাতায়। মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা কেরেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: তৃতীয় ভুবন, অশ্বমেধের ঘোড়া, চর্যাপদের হরিণী, হওয়া না হওয়া ইত্যাদি। ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭৯ সালে পরলোকগমন করেন।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় : জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৩৩ সালে। এক স্বতন্ত্র ধারার লেখক। উল্লেকযোগ্য গ্রন্থ: ক্রীতদাস ক্রীতদাসী, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি, সোনালি ডানার ঈগল ইত্যাদি ৫০টি গল্প। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সুধা বসু' স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৮ সালে। বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৫-এ।

রতন ভট্টাচার্য : জন্ম : ১৯৩৩ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা নিয়ে এম. এ পাস করেছেন। শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম উপন্যাস 'স্বপ্নের পুরুষ ও জীপগাড়ি'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪-এ, বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ১৯৬৬ সালে শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কবিতার ভুবনকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সনাতন পাঠক, নীললোহিত এবং নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে বলিষ্ঠ গদ্য লেখক। ১৯৮৩-তে 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫ সালে সাহিত্য আদাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।

প্রফুল্ল রায় : জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪-এ ঢাকায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পূর্ণপার্বতী' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তিনি বঙ্কিম, ভুয়ালকা, শিরোমণি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কেয়াপাতার নৌকা, রামচরিত্র, মহাযুদ্ধের ঘোড়া, মানুষের মহিমা প্রভৃতি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : জন্ম : ২ নভেম্বর, ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহ জেলায়। পিতার রেলের চাকরির জন্য তাঁর শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। কলকাতার কলেজ থেকে বি. এ পাস করেন। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। এই উপন্যাস-ই তাঁকে এক মহৎ অনুভবী লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৮৫ সালে কিশোর সাহিত্যে 'বিদ্যাসাগর' এবং ১৯৮৯ সালে 'মানব জমিন' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দূরবীন, অপার্থিব প্রভৃতি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সালে কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁর শ্বেত পাথরের টেবিল, সোফা কাম বেড, পায়রা, কলকাতাআছে কলকাতাতেই প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

দেবেশ রায় : জন্ম : ১৭ডিসেম্বর, ১৯৩৬ সালে বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। জলপাইগুড়ের আনন্দচন্দ্র কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা। দীর্ঘদিন পরিয় পত্রিককা সম্পাদনা করেছেন। কলকাতায় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু স্মরণীয় গল্প-

উপন্যাসের স্রষ্টা। 'তিস্তাপারের বিত্তান্ত' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : যযাতি, মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, জীবনচরিত্রে প্রবেশ।

তপোবিজয় ঘোষ ঃ জন্ম: ১৯৩৭ সালে (২১ শ্রাবণ, ১৩৪৪-এ) বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। আজীবন নিষ্ঠাভরে শিক্ষকতা করেছেন বিভিন্ন কলেজে। সব শেষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; সামনে লড়াই, দহন দাহন দর্শনে প্রতিবিম্ব, কালচেতনার গল্প, নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৮৭ সালে (১০ ভাদ্র, ১৩৯৪)।

দিব্যেন্দু পালিত ঃ জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৮-এ বিহারের ভাগলপুরে। তুলনামূলক সাহিত্যে এম.এ। ১৯৮৪-তে আনন্দ, ১৯৮৬-তে ভুয়ালকা, ১৯৯০-এ বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৯৮-তে 'অনুভব' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ; অনুভব, অবৈধ, আড়াল, ঢেউ, দুই নারী, মাইন নদীর জল, সহযোদ্ধা, হিন্দু ইত্যাদি।

শেখর বসু ঃ জন্ম : ১৯৪০ সালে, কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। পেসা সাংবাদিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ; পরম্পরা, মাঝখান থেকে, অপরাধী চিহ্ন রাখেনি, নেতাজির সহধর্মিণী ইত্যাদি।

সুব্রত সেনগুপ্ত : জন্ম : ১৯৪২ সালে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। প্রকাশিত গ্রন্থ; জামা, সব বিক্রির জন্য, কলকাতা ৩০০, হাজার বছর ইত্যাদি।

অভিজিৎ সেন ঃ জন্ম; ১৯৪৩ সালে। চাকরি সূত্রে মালদহে আছেন। কুশলী গল্পকার। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসের জন্য বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন। অন্যান্য গ্রন্থ: দেবাংশ্রী, অভিজিৎ সেনের গল্প, অন্ধকারের নদী।

সাধন চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। পদার্থবিদ্যায় স্নাতক। মূলত লিটল ম্যাগাজিনে-ই লিখে আসছেন প্রায় তিন দশক ধরে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন, পক্ষবিপক্ষ, গহীন গাঙ, গল্প সংগ্রহ ১ ও ২, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ইত্যাদি।

অমর মিত্র ঃ জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের খুলনায়। রসায়নে স্নাতক। পেশায় সরকারি চাকুরে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দানপত্র, সমাবেশ, ভি আই পি রোড, অমর মিত্রের গল্প, বসন্ত বিলাস ইত্যাদি।

আবুল বাশার ঃ জন্ম : ১৯৫১ সালে মুর্শিদাবাদে জেলার লালবাগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যে স্নাতক।১৯৮ সালে 'ফুলবউ' উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার ও ১৯৯৪ সালে 'অগ্নিবলাকা' গ্রন্থের জন্য শিরোমণি সাহিত্য পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সইদা বাঈ, মাটি ছেয়ে যায়, সিমার, রাজাবালি ইত্যাদি।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ঃ জন্ম : ২ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে। কর্মস্থল : আকাশবাণী, কলকাতা। শক্তিশালী গল্পকার। ১৯৯৮২-তে প্রথম বই 'ভূমিসূত্র'। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: অষ্টচরণ ষোল হাঁটু, জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা, চতুষ্পাঠী, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প ইত্যাদি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন বাংলা
ছোটগল্পের প্রবহমান ধারা থেকে
হীরকখণ্ডের মত দীপ্তিমান,সুনির্বাচিত,
কিছু ছোটগল্প নিয়ে এই সম্ভার—
'অভিজাত গল্প সংকলন'।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রমুখ প্রোথিতযশা সাহিত্যিকের
হাত ধরে যা সমাপ্ত হয়েছে তরুণ
প্রজন্মের সিদ্ধ-কলমে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র